রবীন্দ্র-রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

কবিতা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

নিবেদন

কোনো প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিকের রচনাবলী প্রকাশ, বিশেষত যাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ কোনোক্রমেই দুর্লভ হয়ে ওঠে নি, সচরাচর সরকারী প্রকাশন উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হয় না। সেই বিবেচনায় বর্তমান রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ সরকারী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ১৯৬১ সালে তদানীন্তন রাজ্য সরকার সুলভ মূল্যে রবীন্দ্র-রচনাবলীর যে-সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন তার একটি বিশেষ উপলক্ষ ছিল দেশব্যাপী কবির জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব। কিন্তু এবারের রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের পটভূমিকায় কোনো উৎসবের পরিবেশ নেই, বরং এক বিপরীত প্রয়োজনের তাগিদেই বর্তমান রাজ্য সরকার এই রচনাবলী প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ দেশব্যাপী যে-সংকীর্ণতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং সুস্থ জীবনের পরিপন্থী ভ্রান্ত মূল্যবোধ আমাদের মানবিক আবেদনকে ক্ষুণ্ণ করতে উদ্যত, সেখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরম অবলম্বন। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের রচনা বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার এই আয়োজন।

অপর দিকে বিপুল আয়তন রবীন্দ্রসাহিত্যের সামগ্রিক সংকলন অদ্যাবধি সম্পূর্ণ হয় নি। অথচ যাঁরা রবীন্দ্রনাথের জীবিতকাল থেকে রবীন্দ্রসাহিত্য সংকলন ও প্রকাশ-কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান পুরুষ এখনো এই সংকলন কার্যে নিরত রয়েছেন। তাঁদের সহায়তায় রবীন্দ্র-রচনাবলীর এই সংস্করণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার রবীন্দ্র-রচনা সংকলনের কাজকে যতদূর সাধ্য সম্পূর্ণ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। রবীন্দ্র-রচনা রক্ষা, সংকলন এবং সুসম্পাদিতভাবে প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরবর্তীকালের উপরেই বিশেষভাবে ন্যস্ত। যতই কালক্ষেপ ঘটবে ততই রবীন্দ্র-রচনার সম্পূর্ণ সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ জটিল ও কঠিন হয়ে পড়বে।

রাজ্য সরকার এ-যাবৎ অসংকলিত রচনা-সংবলিত বর্তমান রচনাবলী প্রকাশের উদ্দেশ্যে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করে তাঁদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আনুমানিক ষোলো খণ্ডে এই রচনাবলী প্রকাশের আয়োজন করেছেন।

কেবল এ-যাবৎ অসংকলিত রচনা সংকলন নয়, অদ্যাবধি প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনায় পাঠের বিভিন্নতা হেতু অচিরে যে-জটিল সমস্যা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে সে-কারণেও আদর্শ পাঠ-সংবলিত রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করবেন। বর্তমান রচনাবলী এই দিক দিয়ে ভাবীকালের কাজকে বহুলাংশে সুগম করে তুলবে আশা করা যায়। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ৫০ বৎসর পর, ১৯৯১ সালে কপিরাইট উত্তীর্ণ হবার পূর্বে রবীন্দ্র-রচনার পাঠ ও সম্পাদনকর্মে যে-যত্ন প্রত্যাশিত সে-বিষয়ে সম্পাদক-মণ্ডলী বিশেষভাবে অবহিত।

রাজ্য সরকার সাধারণ পাঠকের সীমিত ক্রয়ক্ষমতার কথা চিন্তা করে এবং একই সঙ্গে প্রকাশন সৌষ্ঠব ও সম্পাদনার মান অক্ষুণ্ণ রেখে এই রচনাবলী প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন। কাগজ মুদ্রণ ইত্যাদির দুর্মূল্যতা সত্ত্বেও রচনাবলীর দাম সাধারণ পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে রাজ্য সরকার সরকারী তহবিল থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন।

মানবিক মূল্যবোধের কঠিন পরীক্ষার দিনে সংঘবদ্ধ জনশক্তি আজ 'মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে' না মেনে নিয়ে সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী তাঁদের শক্তি সঞ্চার করতে সক্ষম হলে রাজ্য সরকারের এই প্রকল্প সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

বিশ্বভারতী
রবীন্দ্র-ভারতী-সমিতি
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
বসু-বিজ্ঞান-মন্দির
শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

এই রচনাবলী সম্পাদনকার্যে সম্পাদকমণ্ডলীর সহায়কবর্গের নিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশ-ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও মুদ্রণকার্যে শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেডের কর্মীগণ সহযোগিতা ও বিশেষ শ্রমস্বীকার করেছেন। সম্পাদনা, মুদ্রণ সৌষ্ঠব, বিশেষত চিত্র নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে যাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশ পাওয়া গিয়েছে তাঁদের কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

সম্পাদকমণ্ডলীর নিবেদন

'...কবি-কাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়।...আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু এই বইখানা ছাপাইয়া...আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন। তিনি যে কাজটা ভালো করিয়াছিলেন তাহা আমি মনে করি না...শুনা যায়, সেই বইয়ের বোঝা সুদীর্ঘকাল দোকানের শেল্‌ফ এবং তাঁহার চিত্তকে ভারাতুর করিয়া অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছিল।'

'উৎসাহী বন্ধু' প্রবোধচন্দ্র ঘোষ-কর্তৃক প্রকাশিত 'কবি-কাহিনী'[১] সম্বন্ধে 'জীবন-স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করলেও এর ফলে তাঁর সাহিত্যচর্চা বা গ্রন্থপ্রকাশ ব্যাহত হয় নি। দু বছরের মধ্যেই ১৮৮০ সালে দাদা সোমেন্দ্রনাথের 'অন্ধ পক্ষপাতের উৎসাহে' কাব্যোপন্যাস 'বন-ফুল' গ্রন্থাকারে এক হাজার কপি ছাপা হয়। এইসব 'বাল্যকীর্তি' লোপ না পেয়ে 'কোনো কোনো সঞ্চয়বায়ুগ্রস্ত পাঠকের হাতে' রক্ষা পাওয়ায় পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ 'হতাশ' হলেও সেই সূচনাপর্বে তাঁর সাহিত্যচর্চা অব্যাহত ছিল। এ কথা তাঁর ক্রমশ প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ও বিষয়বৈচিত্র্য থেকে স্পষ্ট হয় এবং অচিরে একটি সংকলন গ্রন্থের প্রয়োজনও অনুভূত হয়। ফলে ১৩০৩ বঙ্গাব্দে (১৮৯৬ খ্রী) তাঁর নিকট-আত্মীয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশ করেন 'কাব্য গ্রন্থাবলী'—রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য-সংগ্রহ। কবির বয়স তখন ৩৫ বছর। এই সময়ের মধ্যেই তাঁর অন্তত চল্লিশখানি কাব্য-কবিতা, কাব্যোপন্যাস, গীতিকাব্য, গীতিনাট্য, নাট্যকাব্য, নাটক-নাটিকা, প্রহসন, সংগীত, উপন্যাস, ভ্রমণ, গল্প ও প্রবন্ধের গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে।[২]

সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রকাশিত ক্রাউন কোয়ার্টো সাইজের এই কাব্যগ্রন্থাবলীতে (পরে টার্লি সংস্করণ নামে খ্যাত) যে-সব গ্রন্থ বা রচনা স্থান পেয়েছে তার সূচী :

কৈশোরক, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, বাল্মীকি প্রতিভা, সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ, কড়ি ও কোমল, মায়ার খেলা, মানসী, রাজা ও রানী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, সোনার তরী, বিদায় অভিশাপ, চিত্রা, মালিনী, চৈতালি, গান, ব্রহ্মসংগীত ও অনুবাদ।

'কৈশোরক' অংশে ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড ও শৈশবসংগীত-গ্রন্থভুক্ত কবির ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সের কবিতা চয়ন করা হয়েছে। 'গান' ও 'ব্রহ্মসংগীত' অংশে সংকলিত গানগুলির অধিকাংশ 'গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৯৩) গ্রন্থের অন্তর্গত ছিল। 'অনুবাদ' কবিতাগুলি 'প্রভাতসংগীত' ও 'কড়ি ও কোমল' থেকে সংকলিত।

'কাব্য গ্রন্থাবলীতে কবিতা ছাড়া কয়েকটি নাটক ও গীতিনাট্যও স্থান পেয়েছিল। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'মালিনী' ও 'চৈতালি' ইতিপূর্বে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি।

এই সংকলনের দায়িত্ব কবি স্বয়ং গ্রহণ করেন এবং কোনো কোনো রচনার পূর্বপাঠ পরিবর্তন বা নূতন রচনা সংযোজন করেন (দ্রষ্টব্য, 'ভূমিকা', কাব্য গ্রন্থাবলী[৩])।

[১] প্রকাশ ১৮৭৮, মুদ্রণ সংখ্যা ৫০০, পৃষ্ঠা সংখ্যা আখ্যাপত্র (৮০)-৫৩, মূল্য ছয় আনা।

[২] কবি-কাহিনী (১৮৭৮), বন-ফুল (১৮৮০), বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১), ভগ্নহৃদয় (১৮৮১), রুদ্রচণ্ড (১৮৮১), য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র (১৮৮১), সন্ধ্যাসংগীত (১৮৮২), কাল-মৃগয়া (১৮৮২), বউ-ঠাকুরানীর হাট (১৮৮৩), প্রভাতসংগীত (১৮৮৩), বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮৩), ছবি ও গান (১৮৮৪), প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪), নলিনী (১৮৮৪), শৈশবসংগীত (১৮৮৪), ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪), রামমোহন রায় (১৮৮৫), আলোচনা (১৮৮৫), রবিচ্ছায়া (১৮৮৫), কড়ি ও কোমল (১৮৮৬), রাজর্ষি (১৮৮৭), চিঠিপত্র (১৮৮৭), সমালোচনা (১৮৮৮), মায়ার খেলা (১৮৮৮), রাজা ও রানী (১৮৮৯), বিসর্জন (১৮৯০), মন্ত্রি অভিষেক (১৮৯০), মানসী (১৮৯০), য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি : প্রথম খণ্ড (১৮৯১) দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৯৩), চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২), গোড়ায় গলদ (১৮৯২), গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৯৩), সোনার তরী (১৮৯৪), ছোটগল্প (১৮৯৪), বিচিত্র গল্প (১৮৯৪), কথা-চতুষ্টয় (১৮৯৪), গল্প-দশক (১৮৯৫), নদী (১৮৯৬), চিত্রা (১৮৯৬)।

[৩] বর্তমান খণ্ডে (পৃ. [২৩]) উদ্ধৃত।

'কাব্য গ্রন্থাবলী' প্রকাশের কয়েক বছর পরে ১৯০০-০১ খ্রীষ্টাব্দে দুই খণ্ডে—'গল্পগুচ্ছ' ও 'গল্প' নামে—রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্পসংগ্রহ প্রকাশ করেন মজুমদার এজেন্সি। দুই খণ্ডে প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা ছিল ৫৩। পূর্বে প্রকাশিত ছোটোগল্প, বিচিত্র গল্প (দুই খণ্ড) গ্রন্থের অধিকাংশ এবং কথা-চতুষ্টয় ও গল্প-দশকের সমুদয় গল্প এই সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। এর পরে ১৯০৮-০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইন্ডিয়ান প্রেস পাঁচ ভাগে 'গল্পগুচ্ছ' নামে ৫৭টি গল্পের একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতী 'গল্পগুচ্ছ' নামে খণ্ডে খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সমুদয় গল্প সংকলনের আয়োজন করেন। বর্তমানে চার খণ্ডে প্রচলিত 'গল্পগুচ্ছ' এরই পরিবর্ধিত এবং সম্পূর্ণ সংস্করণ। এই চার খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের গল্পের সংখ্যা ৯৪।

সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রকাশিত 'কাব্য গ্রন্থাবলী'র সাত বছর পরে ১৯০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দে মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় ক্রাউন ১৬-পেজী আকারে নয় খণ্ডে 'কাব্য-গ্রন্থ' নামে 'কাব্য গ্রন্থাবলী'র 'দ্বিতীয় সংস্করণ' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্ররচনার সংকলনগ্রন্থগুলির মধ্যে এই কাব্য-সংকলনের পরিকল্পনা কিছুটা অভিনব। 'রবীন্দ্রবাবুর কবিতা বুঝিতে গেলে কোন কোন পাঠকের পক্ষে কোনও অন্তরায় থাকা সম্ভব' এই বিচারে কাব্যগ্রন্থের সম্পাদক মনে করেন, 'বর্তমান সংস্করণ তাঁহাদিগকে দুই একটি বিষয়ে সাহায্য করিলেও করিতে পারে'। 'কাব্য-গ্রন্থ'টি কবির প্রকাশিত গ্রন্থের ক্রমানুসারে বিন্যস্ত না হয়ে 'বিষয়গুণে যে সকল কবিতা পরস্পর সদৃশ সেগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিতর একত্র করা' হয়েছে। এই শ্রেণীগুলির মধ্যে কয়েকটির নাম পূর্বপ্রকাশিত গান ও কবিতাগ্রন্থের অনুরূপ হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওই শ্রেণীবিভাগের সংগে উক্ত গ্রন্থগুলির কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন 'সোনার তরী' অংশে মূল 'সোনার তরী' গ্রন্থের তিনটি মাত্র কবিতা আছে। 'সোনার তরী' কাব্যের অন্যান্য অধিকাংশ কবিতা অন্যান্য বিভাগে সন্নিবিষ্ট। ভূমিকায় সম্পাদক মোহিতচন্দ্র সেন লেখেন, 'এই সংস্করণে রবীন্দ্রবাবুর কতকগুলি কবিতা এবং কোনও কোনও কবিতার কতক অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে'। বস্তুত কবিতা দ্বিখণ্ডিতও হয়েছে, যথা 'সোনার তরী'র 'বসুন্ধরা'-র প্রথম অংশ 'বিশ্ব' শ্রেণীতে 'মানস-ভ্রমণ' নামে এবং দ্বিতীয় অংশ ওই শ্রেণীতেই 'বসুন্ধরা' নামে মুদ্রিত। 'গ্রন্থাবলী নূতন আকারে বাহির করিবার জন্য অন্তরের' তাড়ায় কালানুক্রমের প্রচলিত রীতি ত্যাগ করে নিম্নলিখিত বিষয়ানুক্রমে বা ভাবানুক্রমে সাজানো হয় :

১ম ভাগ (ক)। যাত্রা, হৃদয়ারণ্য, নিষ্ক্রমণ, বিশ্ব
১ম ভাগ (খ)। সোনার তরী, লোকালয়
২য় ভাগ (ক)। নারী, কল্পনা, লীলা, কৌতুক
২য় ভাগ (খ)। যৌবনস্বপ্ন, প্রেম
৩য় ভাগ। কবিকথা, প্রকৃতিগাথা, হতভাগ্য
৪র্থ ভাগ। সংকল্প, স্বদেশ
৫ম ভাগ। রূপক, কাহিনী, কথা, কণিকা
৬ষ্ঠ ভাগ। মরণ, নৈবেদ্য, জীবনদেবতা, স্মরণ
৭ম ভাগ। শিশু
৮ম ভাগ। গান
৯ম ভাগ (ক)। নাট্য : সতী, নরকবাস, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ, বিদায়-অভিশাপ, চিত্রাঙ্গদা, লক্ষ্মীর পরীক্ষা
৯ম ভাগ (খ)। নাট্য : প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিসর্জন, মালিনী
৯ম ভাগ (গ)। নাট্য : রাজা ও রানী।

মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের চতুর্থ ভাগে 'সংকল্প' ও 'স্বদেশ' অংশের অধিকাংশ কবিতা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'স্বদেশ' নামে প্রচারিত হয়, পরে এই সংকলন গ্রন্থটি 'সংকল্প ও স্বদেশ' নামে মুদ্রিত হয়েছে।

কাব্যগ্রন্থের পঞ্চম ভাগের 'কাহিনী' ও 'কথা' অংশের কবিতাগুলি একত্রে 'কথা ও কাহিনী' নামে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারিত হয়। বর্তমানে প্রচলিত 'কথা ও কাহিনী' এই গ্রন্থেরই পুনর্মুদ্রণ এবং সেই বিচারে এটি সংকলনগ্রন্থরূপে বিবেচিত।

এই কাব্যগ্রন্থ মুদ্রণের সমকালে রচিত কিছু কবিতা কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হবার পূর্বে এই কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন ভাগে মুদ্রিত হয়। পত্নীর মৃত্যুর পরে তাঁর স্মৃতিতে রচিত অধিকাংশ কবিতা 'স্মরণ' ভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'শিশু' ভাগের অনেকগুলি কবিতাও নূতন রচিত হয়। অধিকাংশ ভাগের জন্য রবীন্দ্রনাথ নূতন 'প্রবেশক' কবিতা লিখে দেন, পরে সেগুলি 'উৎসর্গ' গ্রন্থে (১৯১৪) স্থান পায়। 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর পূর্ববর্তী কবিতা, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' বাদ দিলে, সামান্যই রক্ষিত হয় এবং অনেক কবিতায় পরিবর্তন পরিবর্জন হয়। শিশু (১৯০৯), স্মরণ (১৯১৪) ও উৎসর্গ (১৯১৪) 'কাব্য-গ্রন্থ' প্রকাশের পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।

কাব্যগ্রন্থের এই সংস্করণ সম্পাদনের ভার রবীন্দ্রনাথ মোহিতচন্দ্রকে দিয়েছিলেন। তবে রচনায় পরিবর্তন-পরিমার্জনের ভার সম্ভবত মোহিতচন্দ্রের উপরে বিশেষভাবে ন্যস্ত ছিল না। বিষয় বিভাগের ক্ষেত্রেও কবিতাগুলি যে একা সম্পাদকের 'দায়িত্বে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া নূতন রকমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা নয়। এই কার্যে কবির নিজের হাত ছিল চোদ্দ আনা'।

মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'কাব্য-গ্রন্থে'র প্রায় সমসাময়িককালে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 'হিতবাদীর উপহার' হিসাবে এক খণ্ডে 'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হয়। হিতবাদী-প্রকাশিত 'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী' বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্র-রচনা-সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের ইতিহাসে প্রথম নিয়মিত প্রকাশকের উদ্যোগ এবং সেইকাল পর্যন্ত প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার প্রথম সংকলনগ্রন্থ বলা যায়। এই গ্রন্থাবলীতে উপন্যাস অংশে 'বউ-ঠাকুরানীর হাট', 'রাজর্ষি'র সঙ্গে 'নষ্টনীড়' প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়। নষ্টনীড় পরে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় ভাগে স্থান পায়। হিতবাদী-গ্রন্থাবলীতে 'সংসারচিত্র', 'সমাজচিত্র', 'রঙ্গচিত্র' ও 'বিচিত্র চিত্র' এই চার বিভাগে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পগুলি সংকলিত হয় এবং 'রঙ্গচিত্র' বিভাগে ছোটো-গল্পের সঙ্গে 'চিরকুমার সভা' প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়; পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

নাটক অংশে রাজা ও রানী, বিসর্জন, গোড়ায় গলদ, চিত্রাঙ্গদা, বিদায়-অভিশাপ, বৈকুণ্ঠের খাতা ও মায়ার খেলা স্থান পায়। 'গান' অংশে 'গানের বহি' এবং তা ছাড়া সমালোচনা, আলোচনা ও য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র এই গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী'তে নষ্টনীড় ও চিরকুমার সভা ছাড়া অন্যান্য সকল গ্রন্থ বা রচনাই পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রবীন্দ্রনাথের 'গদ্যগ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের বহু গদ্যরচনা এই ক্রমশ প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে স্থান পেয়েছে।[১]

মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'কাব্য-গ্রন্থ' প্রকাশের এগারো বছর পরে ইন্ডিয়ান প্রেস পুনরায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা, নাটক ও গানের সংকলন প্রকাশ করেন 'কাব্যগ্রন্থ' নামে। ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই 'কাব্যগ্রন্থ' দুই ভাবে অর্থাৎ পাতলা ইন্ডিয়া কাগজ ও

[১] গদ্যগ্রন্থাবলীর খণ্ডগুলি নিম্নরূপ :

এক : বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭); দুই : প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৭); তিন : লোকসাহিত্য (১৯০৭); চার : সাহিত্য (১৯০৭); পাঁচ : আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭); ছয় : হাস্যকৌতুক (১৯০৭); সাত : ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭); আট : প্রজাপতির নির্বন্ধ (১৯০৮)—'চিরকুমার সভা' নামে হিতবাদী-প্রকাশিত রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীতে অন্তর্ভুক্ত; নয় : প্রহসন (১৯০৮)—এই খণ্ডে 'গোড়ায় গলদ' ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা' স্থান পেয়েছে; দশ : রাজা প্রজা (১৯০৮); এগারো : সমূহ (১৯০৮); বারো : স্বদেশ (১৯০৮); তেরো : সমাজ (১৯০৮); চোদ্দ : শিক্ষা (১৯০৮); পনেরো : শব্দতত্ত্ব (১৯০৯); ষোলো : ধর্ম (১৯০৯)।

জাপানী বাঁধাইয়ে পাঁচ খণ্ডে ও পুরু অ্যান্টিক কাগজে দশ খণ্ডে মুদ্রিত হয়। এই কাব্য-গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টত ঘোষণা করেন, 'সন্ধ্যা-সংগীতের পূর্ববর্তী আমার সমস্ত কবিতা আমার কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে বাদ দিয়াছি। যদি সুযোগ পাইতাম তবে সন্ধ্যা-সংগীতকেও বাদ দিতাম। কিন্তু সকল জিনিসেরই একটা আরম্ভ তো আছেই। সে আরম্ভ কাঁচা এবং দুর্বল, কিন্তু সম্পূর্ণতার খাতিরে তাহাকেও স্থান দিতে হয়।'

'সন্ধ্যা-সংগীত হইতেই আমার কাব্যস্রোত ক্ষীণভাবে শুরু হইয়াছে।' সেই কারণে 'সন্ধ্যা-সংগীতকে দিয়া কাব্যগ্রন্থাবলী আরম্ভ করা' হয়। এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ আবার গ্রন্থানুক্রমে ফিরে গেছেন। নবম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'ফাল্গুনী' ও 'বলাকা' ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দেই স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। (দ্রষ্টব্য, 'ভূমিকা', কাব্যগ্রন্থ[১])

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র-কর্তৃক প্রকাশিত 'রবিচ্ছায়া' রবীন্দ্রনাথের গানের প্রথম সংগ্রহ-পুস্তক। রচয়িতার নিবেদনে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'এ গানগুলি আজ সাত আট বৎসর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে, আমি ছাপাইতে চেষ্টা করি নাই।' প্রকাশক জানান যে, '১২৯১ সনের শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রবাবু যতগুলি সংগীত রচনা করিয়াছেন প্রায় সেগুলি সমস্তই এই পুস্তকে দেওয়া গেল।' বইটিতে বিবিধ সংগীত, ব্রহ্মসংগীত, জাতীয় সংগীত ও পরিশিষ্ট—এই বিভিন্ন বিভাগে ২০০টি গান মুদ্রিত আছে।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৩০০ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত 'গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা'-তে ১২৯৯ পর্যন্ত রচিত 'নূতন পুরাতন সমস্ত গান' সন্নিবিষ্ট হয়। সংকলনটি গানের বহি, বাল্মীকি-প্রতিভা ও ব্রহ্মসংগীত—এই তিন ভাগে বিভক্ত। এর পর কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬)-তে গান ও ব্রহ্মসংগীত, কাব্যগ্রন্থ (১৯০৩) অষ্টম ভাগে 'গান', এবং হিতবাদী-সংস্করণ রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীতে (১৯০৪) 'গানের বহি' সংকলিত হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে যোগীন্দ্রনাথ সরকার স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে যে 'গান' প্রকাশ করেন সেখানে বিবিধ সংগীত, মায়ার খেলা, বাল্মীকি-প্রতিভা, জাতীয় সংগীত, বাউল ও ব্রহ্মসংগীত সন্নিবিষ্ট হয়। ইন্ডিয়ান প্রেস ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে 'গান' নামে একটি সংকলনগ্রন্থে 'কিশোরকালের সকল শ্রেষ্ঠ গান হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত যত গান রচনা হইয়াছে, সমস্ত প্রকাশ করিবার চেষ্টা' করেন। 'এই পুস্তকে সাত শত সাতাশটি গান আছে।' পরবর্তীকালে (১৯১৪) এই অখণ্ড 'গান' বহুশ পরিবর্তনসহ 'ধর্মসংগীত' ও 'গান' নামে পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়।

ইন্ডিয়ান প্রেস-প্রকাশিত 'কাব্যগ্রন্থ' সংকলনের দশম খণ্ডটি (১৯১৬) 'গান' নামে চিহ্নিত। এই খণ্ডে বাল্মীকি-প্রতিভা, মায়ার খেলা ছাড়া বিবিধ সংগীত, জাতীয় সংগীত ও ধর্মসংগীত সন্নিবিষ্ট।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত 'গীতি-চর্চায় 'পূজনীয় রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিভিন্ন সময়ের রচিত গান হইতে সংগ্রহ করিয়া বিশেষভাবে আশ্রমবাসী ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য' প্রকাশ করা হয়।

পরের বৎসর (১৯২৬) প্রকাশিত 'ঋতু-উৎসব' বিভিন্ন ঋতুতে অভিনয়োপযোগী নাটকের সংকলন হলেও সংকলিত পাঁচখানা নাটকই গীতপ্রধান, সেই কারণে এটিকেও একটি গানের সংকলন বলা যায়।

১৯৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিন খণ্ড 'গীতবিতান'-এ রবীন্দ্রনাথের গানের সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। এর প্রথম দুই খণ্ডে 'কৈশোরক পর্যায়ের গান হইতে বাং ১৩৩০ সালের 'বসন্ত' গীতিনাট্য অবধি, মোট ১১২৮টি গান' গ্রন্থানুক্রমে সন্নিবিষ্ট হয়। তৃতীয় খণ্ডে এর পরবর্তীকালের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে গান সংকলন করা হয়। প্রথম দুটি খণ্ডে, 'কবির নির্দেশমতো ১৪৮টি গান বাদ পড়িল। ইহার গোড়ার দিকের অনেকগুলি গান বাং ১৩০৩ সালের কাব্যগ্রন্থাবলীর ক্রম-অনুসারে সাজানো হইয়াছে'।

'গীতবিতান'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত

[১] বর্তমান খণ্ডে (পৃ. [২৩]) উদ্ধৃত

হয় ১৩৪৮ সনের মাঘ মাসে (১৯৪২) অর্থাৎ কবির মৃত্যুর পরে, যদিও এই দুই খণ্ডের মুদ্রণ শেষ হয় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই দুই খণ্ড রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সম্পাদিত। পূর্বে প্রকাশিত গীতবিতানে গানের গ্রন্থানুক্রমিক বিন্যাস রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয় নি। তিনি দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপনে মন্তব্য করেন—'গীতবিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলন কর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করতে পারেন নি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেইজন্যে এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে।' রবীন্দ্রনাথ গানগুলি বিষয়ানুক্রমে সাজিয়ে দিয়েছিলেন :

পূজা : গান, বন্ধু, প্রার্থনা, বিরহ, সাধনা ও সংকল্প, দুঃখ, আশ্বাস, অন্তর্মুখে, আত্মবোধন, জাগরণ, নিঃসংশয়, সাধক, উৎসব, আনন্দ, বিশ্ব, বিবিধ, সুন্দর, বাউল, পথ, শেষ, পরিণয়

স্বদেশ

প্রেম : গান, প্রেমবৈচিত্র্য

প্রকৃতি : সাধারণ, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত

বিচিত্র

আনুষ্ঠানিক

পরিশিষ্ট।

গীতবিতানের প্রথম দুই খণ্ডের যে নূতন সংস্করণ পৌষ ১৩৫২ ও আশ্বিন ১৩৫৪ সনে প্রকাশিত হয় তা বস্তুত পূর্ববর্তী সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হতে পারে নি এরূপ যাবতীয় গান ও সমুদয় গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য অচ্ছিন্ন আকারে আশ্বিন ১৩৫৭ সনে তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্প ও গান যেমন নানা সময় একত্র সংকলিত হয়, তেমনি পূর্বে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত তিন খণ্ড চিঠিপত্রও একত্র গ্রথিত হয়ে 'পত্রধারা' নামে মুদ্রিত হয় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। পত্রধারায় 'ছিন্নপত্র' (১৯১২), 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' (১৯৩০), 'পথে ও পথের প্রান্তে' (১৯৩৮) সংকলিত হয় এবং 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থে মুদ্রিত ভূমিকাটি এই পত্র-সংকলনে ভূমিকারূপে যোজিত হয়।

সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় -প্রকাশিত 'কাব্য গ্রন্থাবলী'-র সময় (১৮৯৬) থেকে যেমন গ্রন্থানুক্রমে, সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগক্রমে বা ভাবানুক্রমে সমগ্র রচনা সংকলনের প্রয়াস দেখা যায়, তেমনি পরবর্তীকালে সীমিত পরিসরে চয়নগ্রন্থ অর্থাৎ বাছাই করা কবিতা বা অন্য রচনা প্রকাশের উদ্যোগও দেখা যায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমকালে প্রকাশিত 'স্বদেশ' (১৯০৫) এই জাতীয় উদ্যোগের সূচনা বলা যেতে পারে।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস 'চয়নিকা' নামে একটি কবিতার চয়নগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই চয়নিকা কয়েকবার পুনর্মুদ্রিত হয় এবং প্রতিবারেই কিছু-না-কিছু পরিবর্ধন ঘটে। পঞ্চম পুনর্মুদ্রণে ১৩৬টি কবিতা স্থান পেয়েছিল। এর পর ১৩৩২ সনে বিশ্বভারতী চয়নিকার যে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন সেখানে নূতনভাবে কবিতা নির্বাচন করা হয়। ৩২০ জন পাঠকের ভোটের দ্বারা মোটামুটি লোকপ্রিয়তা অনুসারে ২০৮টি কবিতা সংকলিত হয়। এ সময় গান ও নাটক বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত কবিতার সংখ্যা ছিল প্রায় ১২০০।

চয়নিকার পরবর্তী সংস্করণগুলিতে এই তৃতীয় সংস্করণের চয়নিকার সমস্ত কবিতার সঙ্গে পরে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে অনেক কবিতা স্থান পেয়েছে।

চয়নিকায় যেমন নির্বাচিত কবিতা স্থান পেয়েছিল, তেমনি রবীন্দ্রনাথের 'গদ্যগ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া' 'সংকলন' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয় ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে। কারণ 'গদ্য-গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া পাঠ্য-পুস্তক ব্যতীত কোনো বই এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই'।

এই সংকলনে 'গল্প ও উপন্যাস ভিন্ন আর সকল রকম লেখাই' আছে। এমন-কি 'কোনো বইতে এখনও গ্রথিত হয় নাই এমন লেখাও' সংকলনে গৃহীত হয়। এবং 'লেখাগুলি বিষয় অনুযায়ী ভাগ করিয়া লেখার তারিখ অনুসারে' সাজানো হয়েছে।

চয়নিকার কবিতা নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথ খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না মনে হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'সঞ্চয়িতা' প্রকাশের আয়োজন হয় তার 'কবিতাগুলি সংকলনের ভার' কবি নিজে নেন (দ্রষ্টব্য, 'ভূমিকা', সঞ্চয়িতা[১])। সঞ্চয়িতা কবির সপ্ততিবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'যে-সকল কাব্যগ্রন্থ দীর্ঘকাল পাঠকদের পরিচিত, এই গ্রন্থে তাদেরই থেকে বিশেষ করে সংগ্রহ করা হয়েছে'। 'ছাপা অগ্রসর হতে হতে আয়তনের স্ফীতি দেখে' কবি 'ভীত মনে আত্মসংবরণ' করেছিলেন বটে, তবে পরবর্তী দুটি সংস্করণে কবি পূর্বে সংকলিত বহু কবিতা সংস্কার বা বর্জন করেছেন, আবার বহুতর নূতন কবিতা সংযোজন করেছেন। আরো পরবর্তীকালের কাব্য থেকে কবিতা চয়ন করে ১৩৪৮ সনের ২২ শ্রাবণের পর প্রকাশিত সংস্করণে সংযোজনরূপে দেওয়া হয়।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে যে 'সঞ্চয়ন' প্রকাশিত হয় তা বস্তুত সঞ্চয়িতার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে কবির জন্মশতবর্ষে বিশ্বভারতী কবিতা-নাটক-গল্প-প্রবন্ধ-ভ্রমণ-চিঠি-পত্র অর্থাৎ সর্বাঙ্গীণ রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি চয়নগ্রন্থ প্রকাশ করেন 'বিচিত্রা' নামে। এর দু বছর পরে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে যে 'দীপিকা' প্রকাশিত হয় তা 'বিচিত্রা'রই সমগোত্রীয় এবং পরিপূরক গ্রন্থ।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম 'কাব্য গ্রন্থাবলী' থেকে শুরু করে ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইন্ডিয়ান প্রেস-প্রকাশিত 'কাব্যগ্রন্থ'-তে বা তার পরবর্তীকালে যে-সব চয়নগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার কোনোটিতেই সমগ্র রবীন্দ্র-রচনা সংকলনের প্রয়াস ছিল না। তখন রবীন্দ্রনাথ নিত্য নূতন রচনা সৃষ্টি করে চলেছেন, তদুপরি এই সংকলন বা চয়নগ্রন্থগুলিতে সব শ্রেণীর সমগ্র রচনা অন্তর্ভুক্ত করার চেয়ে শ্রেণীবিশেষ নিয়ে অর্থাৎ কবিতা, নাটক বা গদ্য রচনা অবলম্বনে সংকলন প্রস্তুতির প্রয়াস অধিক ছিল। সমগ্র রচনাবলী প্রকাশে প্রথম উদ্যোগ নেন বিশ্বভারতী। তবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির একদা রবীন্দ্রনাথের বাংলা রচনার সুলভ সংস্করণ প্রকাশে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে এই বিষয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কিছু প্রাথমিক আলোচনাও হয় এবং সেখানেই দেখা যায় যে সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের চিন্তা তখন থেকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের মনেও ছিল। বসুমতীর সেই প্রচেষ্টা অবশ্য ফলবতী হয় নি। বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রধানত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের উদ্যোগে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশ শুরু হয় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই রচনাবলীর প্রত্যেক খণ্ডে কবিতা ও গান, নাটক ও প্রহসন, উপন্যাস ও গল্প, এবং প্রবন্ধ—চারটি ভাগ থাকবে স্থির হয়। প্রতি খণ্ডে 'রচনাগুলি যথাসম্ভব গ্রন্থপ্রকাশের কালানুক্রম অনুসারে মুদ্রিত' হয়। এই রচনাবলী প্রকাশের সময় 'বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত কবির' যে-সব রচনা পূর্বে কোনো পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয় নি, সেগুলি 'প্রকাশকাল অনুসারে' যথাস্থানে যোজনা করা সম্ভব না হলেও সংগৃহীত হবার পর পরবর্তীকালে এক বা একাধিক খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করা হবে স্থির হয়।

'বিভিন্ন সংস্করণে অনেক গ্রন্থের স্থানে স্থানে কবি অল্পাধিক্যতর পরিবর্তন' করেছেন। বিশ্বভারতী-রচনাবলীতে 'বর্তমানে যে পাঠ তাঁহার অনুমোদিত' সেই পাঠই অনুসৃত হয়েছে। তবে এই রচনাবলীর কয়েক খণ্ড প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে রচনাবলীর প্রথম সাতটি খণ্ড ও অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রথম কয়েকটি খণ্ডের প্রুফ সংশোধনকালে রবীন্দ্রনাথ রচনার সংশোধন পরিবর্তন ও পরিবর্জন করেছেন, তার নিদর্শন রবীন্দ্রনাথ-সংশোধিত প্রুফ কপি থেকে পাওয়া যায়। বিশ্বভারতী-রবীন্দ্র-রচনাবলী এ পর্যন্ত ১-২৭ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং দুটি অচলিত সংগ্রহ। এই

[১] বর্তমান খণ্ডে (পৃ. [২৪]) উদ্ধৃত।

রচনাবলীতে 'গীতবিতান' ও 'চিঠিপত্র' ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বাংলা গ্রন্থ স্থান পেয়েছে এবং প্রতি খণ্ডের শেষে গ্রন্থপরিচয়ে বহু তথ্য ও আনুষঙ্গিক অসংকলিত রচনা সংগৃহীত হয়েছে।

বিশ্বভারতী-রচনাবলীর ভূমিকা-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ যে-ভূমিকাটি বিশেষভাবে লিখে দেন তা প্রথম খণ্ডের সূচনায় মুদ্রিত হয় এবং কবির সপ্ততিবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণটি 'অবতরণিকা' নামে প্রথম খণ্ডের প্রারম্ভে তাঁর সমগ্র রচনার সূচনা-স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া রচনাবলীতে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে-ঊনিশটি কাব্য উপন্যাস ও নাটকের বিশেষ ভূমিকা বা ভণিতা লিখে দিয়েছিলেন, তাও প্রতিটি গ্রন্থের সূচনায় মুদ্রিত হয়।

বিশ্বভারতী-কর্তৃক রচনাবলী প্রকাশের পরিকল্পনাকালে সমগ্র রচনা একত্র প্রকাশের ব্যাপারে ববীন্দ্রনাথ কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। সমসাময়িককালে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে (১৬।৭।৩৯) তিনি লেখেন—

> বিশ্বভারতীর প্রকাশক সংঘ আমার সমগ্র একটা গ্রন্থাবলী বের করতে উদ্যত হয়েছেন। আমার কাছে আমার রচনার যে অংশ বেঁচে আছে, যার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটে নি তাকেই আমি চিনি। যারা আছে কবরস্থানের মধ্যে তাদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে মৃত্যুর নৈরাশ্য চেপে ধরে মনকে, সাহিত্যিক জীবনের ধ্বংসাবশেষে ব্যর্থতার স্তূপগুলো মরুপ্রদেশের চেহারা দেখিয়ে দেয়। সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গানকে নতুন সংস্করণের ওঝা ভূত নামিয়ে দেখাচ্ছেন—তাদের সত্যতা চলে গেছে অথচ তারা বেঁচে থাকার ভান করচে। আমার লেখার যে অংশে ভুতুড়ে বাড়ি সেইখানে আমি আছি সম্প্রতি। এখানে পরাভবের ইতিহাস আমার মনে একটা অবসাদ ঘনিয়ে রেখেছে।
>
> দুর্ভাগ্যক্রমে বিস্তর লিখেছি, অগত্যা তার মধ্যে বিস্তর আছে যা ভালো নয়। যেমন জীবনটা তেমনি তার সাহিত্যরচন ভালোমন্দ জড়িয়েই। সে তো অন্যায় নয়। অতি বিশুদ্ধ বাছাইয়ে বাস্তবতার ক্ষতি হয়। আমার আপত্তি হচ্চে সেই অংশে যেখানে একহাঁটু কাদা ভেঙে এসেছি, ঘাটে এসে পৌঁছই নি। নিষ্কৃতি নেই। ত্যাজ্য যারা কেবলমাত্র জন্মস্বত্বের দোহাই দিয়ে মিতাক্ষরার আইন অনুসারে তারা উত্তরাধিকারের দলিল বার করে। শাস্ত্রে আছে মৃত্যুতেই ভববন্ত্রণার অবসান নেই, আবার জন্ম আছে। আমাদের যে লেখা ছাপাখানার প্রসূতিঘরে একবার জন্মেছে তাদের অন্ত্যেষ্টি সংকার করলেও তারা আবার দেখা দেবে। অতএব সেই অনিবার্য জন্মপ্রবাহের আবর্তন অনুসরণ করে প্রকাশকেরা যদি বর্জনীয়কে আসন দেন সেটাকে দুষ্কর্ম বলা চলবে না।
>
> সে এক সময় গেছে যখন সমস্ত দেশেরই মন আর তার ভাষা ছিল কাঁচা, তার মনের জমি ছিল নিচু। তখনকার উপাদানে কমদামী করে দিত উৎপন্ন জিনিসকে। আমরাই নিজের সাধনায় স্তরে স্তরে জমি উঁচু করেছি, আর আঁট করেছি তার মাটি। এখন একটা সাধারণ উৎকর্ষ সহজ হয়েছে সমস্ত সাহিত্য জুড়ে। তাই তখনকার লেখার সঙ্গে এখনকার লেখার জাত গেছে বদল হয়ে। আমার তো মনে হয় আমার রচনার দুই বয়সের মধ্যে ঐক্যই নেই, কী ভাবের দিক থেকে কী ভাষার দিক থেকে। আমাদের চিত্তের জন্মান্তর হয়ে গেছে। তাই আমার এই গ্রন্থাবলীর গোড়ায় রয়েছে চৌরঙ্গীর মিউজিয়ম আর তার সঙ্গে জোড়া হচ্চে আলিপুরের পশুশালা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বয়সের অনেক রচনা অত্যন্ত অপরিণত বলে বর্জন করতে ইচ্ছা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান—

> ভূরিপ্রমাণ যে-সকল লেখাকে আমি ত্যাজ্য বলে গণ্য করি আপনাদের সম্মিলিত নির্বন্ধে সেগুলিকে স্বীকার করে নিতে হবে। আমার লজ্জা চিরন্তন হয়ে যাবে এবং তাতে আমার নাম স্বাক্ষর থাকবে। অর্থাৎ ভাবী কালের সামনে যখন দাঁড়াব তখন গাধার টুপিটা খুলতে পারব না। আপনারা তর্ক করে থাকেন, ইতিহাসের আবর্জনা

> দিয়ে যে গাধার টুপিটা বানানো হয় ইতিহাসের খাতিরে সেটা মহাকালের আসরে পরে আসতেই হবে। কবির তাতে মাথা হেঁট হয়ে যায়। ইতিহাসও বহু অবাস্তবকে বর্জন করতে করতে তবে সত্য ইতিহাস হয়। মানুষের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের দেহে যে একটা লম্বমান প্রত্যঙ্গ ছিল সেটাকে সর্বদা পশ্চাতে যোজনা করে বেড়ালে মানুষের ইতিহাস উজ্জ্বল হয় না, এ কথা মানবসন্তান মাত্রেই স্বীকার করে থাকে।

তবে শেষ অবধি একটা আপস-নিষ্পত্তি হয়। যে-সব রচনা তিনি বর্জনীয় বলে মনে করেন তার অধিকাংশ পরিশিষ্ট খণ্ডে স্থান পাবে স্থির হয়। এই পরিশিষ্ট খণ্ড 'অচলিত সংগ্রহ' নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই দুই খণ্ড সম্পাদনায় সহযোগিতা করেন সজনীকান্ত দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপুলিনবিহারী সেন। 'অচলিত সংগ্রহে'র প্রথম খণ্ডে 'কবির কৈশোর ও যৌবনের রচনা কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশকালানুক্রমে' মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থগুলি অধিকাংশই পুনর্মুদ্রিত হয় নি। অপরিণত মনে করে কবি এগুলি বর্জন করেছিলেন এবং 'এই অচলিত রচনাগুলি আর প্রচলিত না হয়' এই তাঁর অভিপ্রায় ছিল (দ্রষ্টব্য, 'ভূমিকা', অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ড[১])। রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগকালেও তিনি একটি পত্রে লিখেছিলেন—

> বিশ্বভারতী-গ্রন্থপ্রকাশমণ্ডলী আমার সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সমগ্র গ্রন্থাবলী বলতে বোঝায় অনেকখানি অংশ যা প্রাগৈতিহাসিক। যার সঙ্গে আমার সাহিত্য-ইতিহাসের দূরবর্তী যোগ আছে কিন্তু তার চলতি কারবার বন্ধ হয়ে গেছে। অতীতের ঘষে-যাওয়া-তামার ফলকে তার বাণী যে অক্ষরে চিহ্নিত, তাকে গুপ্ত-যুগের লিপি বলা যেতে পারে। সেই লিপির অস্পষ্টতা থেকে অর্থ উদ্ধার করবে বসে বিজ্ঞানী, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা তাকে স্বীকার করতে চায় না। কেননা যে বাণীর শিল্প-আবরণ গেছে জীর্ণ হয়ে, সাহিত্যের দরবারে তার প্রবেশ করবার মতো আব্রু নেই।...

এই রচনাগুলি সম্বন্ধে কবির বিতৃষ্ণা ও ঔদাসীন্য সুগভীর জেনেও বিশ্বভারতী নিজেদের পূর্ণ দায়িত্বে এগুলি প্রকাশ করেন ও কৈফিয়তস্বরূপ প্রকাশকের 'নিবেদন'-এ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন—

> ইতিহাসের খাতিরেই যে এই বর্জিত রচনাগুলি পুনঃপ্রকাশে ব্রতী হইয়াছি তাহা নয়— যদিও তাহা করিলেও অন্যায় হইত বলিয়া মনে করি না; এই রচনাগুলি যে শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাসের দিক দিয়াই প্রয়োজনীয়, যে বয়সে এগুলি তিনি লিখিয়াছিলেন সে বয়সের পক্ষে বিস্ময়কর, এমন নহে; এগুলির রচনাকালে বাংলা-সাহিত্য উৎকর্ষের যে পর্যায়ে ছিল তাহার পক্ষে এগুলির অধিকাংশই পরম বিস্ময়, এইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র একদিন রবীন্দ্রনাথকে জয়মাল্য পরাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভাব-ঐশ্বর্যের দিক দিয়াও এগুলি যে রচয়িতার দীনতাই ঘোষণা করিতেছে, এমন কথা অনেক পাঠকই মনে করেন না।... রবীন্দ্রনাথের রচনার কোন্ অংশ বর্জনীয়, কোন্ দান শ্রদ্ধার যোগ্য, তাহার বিচার-ভার কবিকে দিলে সুবিচার হইবে মনে করি না, আমরা নিজেরাও সে ভার গ্রহণ করি নাই—ভাবীকালের উপরে রাখিয়াই এই গ্রন্থগুলি সংকলন করা হইল।

অচলিত সংগ্রহে সংকলিত রচনাগুলির দুই ভাগ। 'পুস্তক বা পুস্তিকা আকারে যেগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল এবং লেখকের ইচ্ছায় পরবর্তীকালে আর মুদ্রিত হয় নাই' এবং পুস্তিকাকারে প্রকাশিত কয়েকটি রচনা, যা 'অনবধানবশতই কোনও পুস্তকসংগ্রহে স্থান পায় নাই'—এই রকম লেখা স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া 'দুই একটি পুস্তক পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ পুনর্লিখিত বা পরিবর্জিত-পরিবর্ধিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলিরও মূল সংস্করণ' অচলিত সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত, দ্বিতীয় ভাগে যে-সকল রচনা 'সাময়িক পত্রিকার

[১] বর্তমান খণ্ডে (পৃ. [২৫]) উদ্ধৃত।

পৃষ্ঠাতেই রহিয়া গিয়াছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার গৌরব লাভ করে নাই' সেগুলি সংকলিত হয়েছে। এর 'অধিকাংশই লেখক স্বয়ং বর্জন করিয়াছেন, তবে কয়েকটি এমন রচনাও আছে যাহা নিতান্ত ভুলক্রমে বাদ পড়িয়াছে' এ ছাড়া অচলিত সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক রচিত বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকাবলীও মুদ্রিত হয়েছে।

অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র লেখেন (১৮ কার্তিক ১৩৪৭) তা প্রণিধানযোগ্য :

> আপনাদের কর্তৃক প্রকাশিত আমার অচলিত রচনার কিছু কিছু অংশ অপটু শরীরে পড়েছি। এই শ্রেণীর লেখা সম্বন্ধে আমার বিতৃষ্ণা পূর্বেই জানিয়েছি। এখন আর অধিক বলবার শক্তি নেই, কেবল একটা নতুন কারণ আমার মনে আঘাত করেছে, সংক্ষেপে বলব, সে এই— অকৃত্রিম কাঁচা রচনায় কোনো দোষ নেই, বরঞ্চ তা স্নেহ-হাস্যের যোগ্য। যেমন শিশুর কাঁচা হাতের ছবি সমালোচনা করবার সময় তার যেটুকু স্বাভাবিক রমণীয়তা আছে, তা গুণীরা দেখতে পান। কিন্তু বক্ষ্যমাণ রচনাগুলির মধ্যে যা নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, সে হচ্ছে অকালে উদ্গত নকল কবিত্ব। বড়ো বয়সের যোগ্য বড়ো বড়ো কথা বলবার স্পর্ধা এই সব লেখার মধ্যে সর্বত্র অত্যন্ত কাঁচা ভাষায় দেখা দিয়েছে। সেটাকে ছোটো লেখা বলে স্নেহ করা যায় না, বড়ো লেখা বলে মাপও করা অসম্ভব হয়। এই সব ভর্ৎসনাসহ-বর্জনীয় প্রগল্‌ভতা যখন দেখা যায় তখন বয়স গণনা করে তাকে কিছুমাত্র সমাদর করা যায় না। বেশি লেখবার শক্তি আমার নেই, কিন্তু এই রচনাগুলির প্রতি আমার বিমুখতার কারণ লিপিবদ্ধ করে আপনাকে জানানো কর্তব্য মনে করে কষ্টস্বীকার করেও এই কটি পঙ্‌ক্তি দূতহস্তে পাঠিয়ে দিলুম।
>
> একটা কেবল সান্ত্বনার বিষয় শুধু ক্ষণে ক্ষণে মনে জেগে ওঠে— সেই যুগটাই নকলের যুগ। পূর্ববর্তী সাহিত্যের আবির্ভাব তখনো সে সম্পূর্ণ আপনার করে নিতে পারে নি। সে-যুগের ইংরেজ কবিদের মধ্যে যাঁদের রচনা গ্রহণ করবার শক্তি জেগেছিল, সেটা বাইরে থেকে ব্যঙ্গরূপেই প্রকাশ পেয়েছে। তখন আমাদের যাঁরা প্রশংসা করেছেন, তাঁরা নকল শেলি বায়রন রূপে আমাদের অভিহিত করে আমাদের গৌরব দান করেছেন। অর্থাৎ আমরা সে-সকল আহরিত সাহিত্য-সম্পদ তখনো স্বকীয় করে নিতে পারি নি। সুতরাং আমাদের মধ্যে যদি তাঁদের প্রভাব অক্ষম অনুকরণের পথে চালনা করে থাকে, তবে হয়তো সেই যুগের লজ্জার ভাগী আমরা সকলেই। যে-বয়সে এই যুগ স্বভাবত উপনীত হতে পারে নি, সেই বয়সকে ডিঙিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে।
>
> তখন যে এ দেশের কচিসাহিত্যসমাজে কেবল বিদেশী কবির গোঁপদাড়ির চর্চা চলেছিল তা নয়— বালখিল্য গ্যারিবল্‌ডির দলকেও খোঁড়া গতিতে সদর রাস্তায় কুচকাওয়াজ করিয়ে তরুণরা গৌরব বোধ করছিল। এবং তার মধ্যে মধ্যে নকল গ্যারিকের প্রতি হাততালি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল।

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুলভে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯৬১-৬৬ সালের মধ্যে ১৫ খণ্ডে এই জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে মুখ্যত বিশ্বভারতী-রচনাবলীর প্রচলিত সংস্করণের পাঠ অনুসরণ করা হলেও রচনাবিন্যাসের ক্ষেত্রে কবিতা-নাটক-উপন্যাস ইত্যাদি শ্রেণী পর্যায়ে গ্রন্থের কালানুক্রম অনুসরণ করা হয়। বিশ্বভারতী-রচনাবলীর 'অচলিত সংগ্রহ'-ভুক্ত অধিকাংশ রচনা এই সংকলনে সংগ্রথিত হয়। বিশ্বভারতী-রচনাবলীর অতিরিক্ত বিশ্বভারতী-প্রকাশিত কিছু স্বতন্ত্র গ্রন্থ যথা, গীতবিতান, ছিন্নপত্রাবলী ইত্যাদি এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সংস্করণে বিশ্বভারতী-রচনাবলীর জন্য লিখিত রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটি বা কোনো গ্রন্থপরিচয় যুক্ত হয় নি বটে, তবে পঞ্চদশ খণ্ডে উল্লেখপঞ্জী, নির্দেশিকা ও সূচী সংযোজিত হয়।

বর্তমান রচনাবলীর পরিকল্পনা

রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের বাংলা রচনা কবিতা গান নাটক উপন্যাস ছোটো-গল্প প্রবন্ধ এই শ্রেণীবিভাগ অনুসারে সংকলিত এবং প্রত্যেক বিভাগে গ্রন্থপ্রকাশের কালানুক্রম অনুসৃত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ ইন্ডিয়ান প্রেস-কর্তৃক প্রকাশিত 'কাব্যগ্রন্থে'র (১৯১৫) ও 'সঞ্চয়িতা'র (১৯৩১) ভূমিকায় 'সন্ধ্যাসংগীতে'র পূর্ববর্তী সমস্ত কবিতা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, সে কথা মনে রেখেই এই রচনাবলীতে কাব্যখণ্ড 'কবি-কাহিনী' থেকে শুরু না করে 'সন্ধ্যাসংগীত' দিয়ে শুরু করা হয়েছে। তবে, সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ববর্তী কবিতা মূল কাব্যধারা থেকে বাদ দিলেও বিশ্বভারতী-প্রকাশিত অচলিত সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথ এই সকল কাব্যগ্রন্থের সংকলন অনুমোদন করেছিলেন। সেই কারণে এই রচনাবলীতে সন্ধ্যা-সংগীতের পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ, গ্রন্থাকারে অসংকলিত সে যুগের কবিতা কাব্যখণ্ডের উপসংহারে স্বতন্ত্র ভাগে স্থান পাবে।

এই রচনাবলীতে প্রতিটি গ্রন্থের ক্ষেত্রে সেই গ্রন্থের প্রচলিত সংস্করণে রচনার যে-ক্রম অনুসৃত (যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথমাবধি স্বতন্ত্র সংস্করণের অনুরূপ), সেই ক্রমই অনুসরণ করা হয়েছে। কোনো কোনো গ্রন্থে, বিশেষত কাব্যগ্রন্থে, পরবর্তীকালে কোনো সংস্করণ থেকে কবি কোনো কোনো রচনা বর্জন করেছেন। পাঠকদের লক্ষগোচর করাবার উদ্দেশ্যে সেই বর্জিত রচনা বা কবিতা সেই গ্রন্থের শেষে 'সংযোজন' অংশে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের পঞ্চম ভাগের 'কাহিনী' ও 'কথা' অংশের কবিতাগুলি পরবর্তীকালে 'কথা ও কাহিনী' নামে সংকলিত, সেই কারণে 'কথা ও কাহিনী' সংকলনগ্রন্থরূপে বিবেচিত। এই 'কথা ও কাহিনী' নামে প্রচলিত গ্রন্থের 'কাহিনী' অংশের বহু কবিতা 'কথা' নামে স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থে এবং অন্যান্য কবিতা অপরাপর কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রচলিত 'কথা ও কাহিনী' একটি সংকলনগ্রন্থ মাত্র, এই বিবেচনায় তা বর্তমান রচনাবলীতে স্থান পায় নি। 'কথা ও কাহিনী'র 'কাহিনী' অংশের কবিতা হয় 'কথা', আর না-হয় অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। কেবল 'দীন দান' কবিতাটি 'কথা ও কাহিনী'র 'কাহিনী' অংশে ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থভুক্ত ছিল না বলে কবিতাটি 'কথা'র 'সংযোজন'-এ মুদ্রিত হয়েছে।

বিশ্বভারতী-রচনাবলী প্রকাশকালে তখনকার পরিকল্পনা অনুযায়ী কোনো কোনো কবিতা প্রচলিত স্বতন্ত্র গ্রন্থ থেকে সরিয়ে গ্রন্থান্তরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বর্তমান রচনাবলীতে সেই কবিতাগুলি আবার মূলগ্রন্থে, অর্থাৎ স্বতন্ত্র সংস্করণে যেখানে আছে, সেখানে ফিরে এসেছে। বিশ্বভারতী-রচনাবলীতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রন্থভুক্ত গান সেই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে অন্যত্র অর্থাৎ পরবর্তীকালে যে গীতিনাট্যে গানটি ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে বা পরিকল্পিত স্বতন্ত্র 'গান' খণ্ডে ব্যবহারের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান রচনাবলীতে এ-জাতীয় গানগুলি মূলগ্রন্থে যথাস্থানে মুদ্রিত হয়েছে, অধিকন্তু স্বতন্ত্র গানখণ্ডে বা গীতিনাট্যেও সেগুলি সন্নিবিষ্ট।

বিশ্বভারতী-রচনাবলী প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ যে-ভূমিকা লিখে দেন সেটি এই রচনাবলীরও ভূমিকাস্বরূপ মুদ্রিত হয়েছে। উপরন্তু সপ্ততিবর্ষজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন এবং যা 'অবতরণিকা' নামে বিশ্বভারতী-রচনাবলীতে ব্যবহৃত হয়েছিল তা এই রচনাবলীর সূচনাতেও দেওয়া গেল।

বিশ্বভারতী-রচনাবলী প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন গ্রন্থের জন্য বিশেষ ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন, এই রচনাবলীতে সেই ভূমিকাগুলি গ্রন্থসূচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তদুপরি প্রথম প্রচলিত সংস্করণের জন্য লিখিত ভূমিকাও গ্রন্থসূচনায় মুদ্রিত হল—যেমন 'মানসী', 'কথা'। অন্যান্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ-রচিত প্রথম বা অন্যান্য সংস্করণের ভূমিকা গ্রন্থপরিচয়ে স্থান পাবে।

কাব্যখণ্ডের পরে গানখণ্ড প্রচলিত গীতবিতানের ক্রমানুসারে ও ওই বিন্যাসে মুদ্রিত হবে।

ছোটোগল্প প্রচলিত গল্পগুচ্ছের ক্রমানুসারে এবং নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধ মুদ্রিত গ্রন্থের কালানুক্রমে বিন্যস্ত হবে।

বিশ্বভারতী-অচলিত সংগ্রহে সংকলিত কাব্য (কাব্য, নাটক ইত্যাদি) ভিন্ন অন্যান্য গদ্য-রচনা এবং অচলিত সংগ্রহে অসংকলিত সমগোত্রীয় গদ্যরচনা প্রবন্ধখণ্ডের উপসংহারে স্থান পাবে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বিষয়ক্রমে যে-সব রচনা নানা গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে সেগুলি স্বতন্ত্র পর্যায়ে মুদ্রিত হবে। একমাত্র 'শেষলেখা' কাব্যগ্রন্থের ক্ষেত্রে কেন এর ব্যতিক্রম করা হল, তা পাঠকসাধারণ বুঝতে পারবেন। এই সকল বিষয়ানুক্রমে সংকলনগ্রন্থের কোনো কোনো রচনা রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় কোনো গ্রন্থ থেকে সংকলিত। সে ক্ষেত্রে সেই রচনা মূল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েই এই রচনাবলীতে স্থান পাবে, কিন্তু যদি তাঁর মৃত্যুপরবর্তী কোনো সংকলন গ্রন্থের অঙ্গহানি হবে মনে হয়, তবে সেখানেও রচনাটি দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হতে পারে, অন্যথায় সেখানে উল্লেখমাত্র থাকবে।

যে-সব গদ্যরচনা বা কবিতা এখনো পর্যন্ত কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নি অথবা পাণ্ডু-লিপিতেই আবদ্ধ আছে, সেগুলির সন্ধান পেলে স্বতন্ত্রভাবে বিষয়ানুগ খণ্ডের উপসংহারে যথাযথ টীকাসহ মুদ্রিত হবে।

এ ছাড়া এই রচনাবলীতে যে গ্রন্থপরিচয় সংযোজিত হবে সেখানে আনুষঙ্গিক তথ্যের সঙ্গে রচনার খসড়া বা ভিন্ন পাঠ এবং গ্রন্থভুক্তিকালে বর্জিত গদ্যাংশ যথাযথ মন্তব্যসহ সন্নিবিষ্ট হবে।

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রচনাবলী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণে যে-সকল বাংলা রচনা সংকলিত হয় নি সেগুলি বর্তমান রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করার যথাসাধ্য প্রয়াস করা হয়েছে। এই জাতীয় রচনার মধ্যে রয়েছে :

১. গ্রন্থাকারে অসংকলিত অর্থাৎ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রচনা
২. প্রথম বা তার কাছাকাছি সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু পরবর্তীকালে কবি-কর্তৃক বর্জিত, অর্থাৎ যা বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণে না থাকায় আধুনিক পাঠকের অগোচর
৩. পাণ্ডুলিপিতে আবদ্ধ অসংশয়িত রবীন্দ্র-রচনা
৪. প্রচলিত রচনার ভিন্নতর বা পূর্বতন এমন সব পাঠ যা বিশ্বভারতী-রচনাবলীতে বা কোনো কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থপরিচয়ে উদ্ধৃত।

বর্তমান রচনাবলীতে এ-যাবৎ অসংকলিত রচনা সংকলনের প্রয়াস যেমন আছে তেমনি এ-যাবৎ প্রকাশিত সংস্করণসমূহে রচনার পাঠে যে-বিভিন্নতা দেখা যায় তা যতদূর সাধ্য নিরসনের যত্নও নেওয়া হয়েছে। সব রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ও তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত স্বতন্ত্র গ্রন্থের শেষ সংস্করণের পাঠকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে স্পষ্টত মুদ্রণপ্রমাদক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সংস্করণের সাহায্যে সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে।

এই প্রয়াসে যে-সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে সে-বিষয়ে পাঠকবর্গকে অবহিত করার অভিপ্রায়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা গেল। পাঠকবর্গের সুবিধার্থে দৃষ্টান্তগুলি প্রথম খণ্ড থেকে চয়ন করা হল।

কবিতার ছত্রবিন্যাসে বিভিন্ন সংস্করণে বা মুদ্রণে অসামঞ্জস্য দেখা যায়। যেমন, 'সোনার তরী' কাব্যের 'গানভঙ্গ' কবিতা (পৃ. ৪৬৬)। 'সোনার তরী'র প্রথম সংস্করণে ছত্রবিন্যাস ছিল,

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা,
ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি

বর্তমান ছত্রবিন্যাস বিশ্বভারতী-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণের অনুসরণে।

একই রকম ছিল 'চিত্রা' কাব্যের 'পুরাতন ভৃত্যে' (পৃ. ৫৯৫),

ভূতের মতন চেহারা যেমন
নির্বোধ অতি ঘোর

বর্তমান ছত্রবিন্যাস বিশ্বভারতী-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণ থেকে অনুসৃত।

'ক্ষণিকা' কাব্যের 'সমাপ্তি' কবিতার (পৃ. ৯৫৩) ছত্র ও স্তবকবিন্যাস 'ক্ষণিকা' কাব্যের প্রথম সংস্করণ ও বিশ্বভারতী-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণের অনুসারে করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বভারতী-রচনাবলীর প্রচলিত সংস্করণের প্রথম ছত্র নিম্নরূপ,

পথে যতদিন ছিনু, ততদিন অনেকের সনে দেখা।

এবং কোনো স্তবকভাগও নেই।

স্তবকবিন্যাসের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু অসামঞ্জস্য দেখা যায়। 'নৈবেদ্য'র কবিতাগুলির স্তবকবিন্যাসে এ-জাতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিশ্বভারতী-রচনাবলীর প্রচলিত সংস্করণে সন্ধ্যাসংগীতের 'হৃদয়ের গীতিধ্বনি' কবিতার প্রথম স্তবকের শেষ ছত্রটি সন্ধ্যাসংগীতের প্রথম সংস্করণ অনুসারে পরের স্তবকের প্রথম ছত্র। বর্তমান সংস্করণে প্রথম সংস্করণের বিন্যাস অনুসৃত।

রবীন্দ্র-রচনায় বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণের যতিসূচক ও অন্যান্য চিহ্ন-বিন্যাস পরবর্তীকালে প্রায়শ পরিবর্তিত হয়েছে। উত্তরপর্বে রবীন্দ্রনাথ যতদূর সম্ভব স্বল্প চিহ্ন ব্যবহারে আগ্রহী ছিলেন। তবে সমাসবদ্ধতার কারণে যেখানে বিভক্তিলোপ ঘটে সেখানে 'হাইফেন' চিহ্ন প্রয়োগ পরবর্তীকালের সংস্করণেও অব্যাহত ছিল।

যতিচিহ্নের ব্যবহারে রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ও প্রথম সংস্করণের মুদ্রণে সর্বত্র মিল নেই। মনে হয়, হয় প্রুফ সংশোধনকালে রবীন্দ্রনাথ যতিচিহ্ন পরিবর্তন করেছেন, অথবা পাণ্ডুলিপি বা প্রেস-কপিতে যাই থাকুক-না-কেন, মুদ্রণকালে যতিচিহ্ন প্রসঙ্গে কবির কোনো সাধারণ নির্দেশ ছিল যা অনুসরণ করা হয়েছে। যতিচিহ্ন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মুদ্রিত সংস্করণ বিচার করে কবির যথার্থ অভিপ্রায় অনুধাবন করা সহজ বা সম্ভব নয়। তবে পরবর্তীকালে কবি-কর্তৃক চিহ্ন লাঘবের প্রবণতা এবং সমাসবদ্ধ শব্দের ক্ষেত্রে 'হাইফেন' চিহ্ন প্রয়োগের প্রবণতা স্মরণে রেখে জীবিতকালের শেষ সংস্করণের ভিত্তিতে যতি ও অন্যান্য চিহ্ন যতদূর সম্ভব অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে যতিচিহ্ন প্রয়োগ বা বিলোপের ফলে অর্থান্তরের সম্ভাবনা আছে, সেখানে অর্থের প্রয়োজনে যতিচিহ্ন অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস করা হয়েছে। এই সূত্রে বলা যায় যে 'কড়ি ও কোমলে'র 'আহ্বানগীত' কবিতার (পৃ. ২৭৮) সপ্তদশ ছত্রে বর্তমানে প্রচলিত বিশ্বভারতী-রচনাবলীতে আছে—

তরঙ্গ তুলিব তরঙ্গের 'পরে।

রচনাবলী প্রথম সংস্করণে 'পরে'র পূর্ববর্তী ঊর্ধ্ব-কমাটি ছিল না। বর্তমান সংস্করণে রচনাবলীর প্রথম সংস্করণ অনুযায়ী 'তরঙ্গের পরে' মুদ্রিত হয়েছে। পাঠকের পক্ষে সহজেই লক্ষণীয় যে 'তরঙ্গের 'পরে' এবং 'তরঙ্গের পরে'-র মধ্যে অর্থগত পার্থক্য আছে।

বানানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী-রচনাবলী মুদ্রণের সমকালে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা বানানসংস্কার-সমিতির যে বিধানকে স্বীকার করে নেন, বর্তমান রচনাবলীতে সেই বিধানসম্মত বানানপদ্ধতি রাখা হয়েছে। তবে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জানা আছে যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা বানানকে যথাসম্ভব সরল করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি তদ্ভব শব্দের অন্তিম অক্ষরের দীর্ঘ 'ঈ' স্থানে হ্রস্ব 'ই' এবং বিদেশী ও দেশজ শব্দের অন্ত্য অক্ষরেও হ্রস্ব 'ই' ব্যবহার করতেন। এ-সব ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য দীর্ঘ 'ঈ' ও হ্রস্ব 'ই' উভয় প্রয়োগকেই সিদ্ধ বলে স্থির করেন। বর্তমান রচনাবলীতে সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়কে মানা না গেলেও বানানের ক্ষেত্রে যাতে পূর্বাপর সামঞ্জস্য থাকে সেদিকে যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ অনেক রচনার পাঠেই বিভিন্ন সংস্করণে স্থানে স্থানে অল্পবিস্তর পরিবর্তন করেছেন। কবিতার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান রচনাবলীতে যদিও কবির জীবিতকালের শেষ সংস্করণের পাঠকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে, তা সত্ত্বেও পাঠ-

নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে।

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র ৩-সংখ্যক পদে (পৃ. ১৬৮) তৃতীয় ছত্রের পাঠ বিশ্বভারতী-রচনাবলীতে 'বহি গেল'। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণে (আশ্বিন ১৩৭৬) প্রথম স্বতন্ত্র সংস্করণ অনুযায়ী আছে 'বহি গল', এই পাঠই বর্তমান সংস্করণে অনুসৃত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'গেল' অর্থে 'গল' ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর অন্য একটি পদেও করেছেন—দ্রষ্টব্য ৬-সংখ্যক পদের চতুর্থ ছত্র (পৃ. ১৭০)।

'কড়ি ও কোমল'-এর 'সমুদ্র' কবিতার (পৃ. ২৬৫) ত্রয়োদশ ছত্রের পাঠ প্রচলিত বিশ্বভারতী-রচনাবলীতে 'সংসারের কণ্ঠ হতে'। কিন্তু প্রথম স্বতন্ত্র সংস্করণ, বিশ্বভারতী-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণ এবং বর্তমানে প্রচলিত স্বতন্ত্র সংস্করণে আছে 'সাগরের কণ্ঠ হতে'। বর্তমান রচনাবলীতে এই পাঠই রক্ষিত হয়েছে।

'ক্ষণিকা' কাব্যের 'পরামর্শ' কবিতার (পৃ. ৮৮৪) তৃতীয় স্তবকের দশম ছত্রে প্রথম স্বতন্ত্র সংস্করণে আছে 'ঘটের ঘায়ে যেটুকু ঢেউ', কিন্তু পরবর্তীকালে পাঠ পাওয়া যায় 'ঘাটের ঘায়ে যেটুকু ঢেউ', এই পরিবর্তিত পাঠ বিশ্বভারতী-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণেও অনুসৃত হয়। কিন্তু বিশ্বভারতী-রচনাবলীর পরবর্তী সংস্করণে ও বর্তমানে প্রচলিত স্বতন্ত্র সংস্করণে প্রথম সংস্করণের পাঠ অর্থাৎ 'ঘাটের' স্থলে 'ঘটের' অনুসরণ করা হয়। বর্তমান রচনাবলীতে প্রথম সংস্করণের পাঠ রক্ষিত হয়েছে। আবার উক্ত 'ক্ষণিকা'র 'দুর্দিন' কবিতার চতুর্থ ছত্রে (পৃ. ৯২৫) প্রথম স্বতন্ত্র সংস্করণ এবং বিশ্বভারতী-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণে পাঠ আছে 'রজনীগন্ধার বনে'— যদিও বর্তমানে প্রচলিত বিশ্বভারতী-রচনাবলী এবং স্বতন্ত্র সংস্করণের পাঠ 'রজনীগন্ধা বনে'। বর্তমান সংস্করণে বিশ্বভারতী-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণের পাঠ, যা প্রথম স্বতন্ত্র সংস্করণেও আছে, তা রক্ষিত হয়েছে।

'ক্ষণিকা' কাব্যের অপর একটি কবিতা 'খেলা'র (পৃ. ৯৩২-৩৩) তৃতীয় স্তবকে তৃতীয় ও নবম ছত্রে প্রথম স্বতন্ত্র সংস্করণের পাঠ 'হত বিধির যত বিবাদ' কিন্তু পরবর্তীকালে প্রথম শব্দ দুটি যুক্ত হয়ে পাঠ দাঁড়ায় 'হতবিধির যত বিবাদ'। বর্তমান সংস্করণে প্রথম সংস্করণের পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ১৬-সংখ্যক কবিতায় (পৃ. ৯৬৮, ছত্র ১১) প্রচলিত রচনাবলী ও স্বতন্ত্র সংস্করণের পাঠ 'দাঁড়াও রে'-র স্থলে রচনাবলীর প্রথম সংস্করণ অনুসারে 'দাঁড়া ওরে' করা হয়েছে।

'চিত্রা' কাব্যের 'দিনশেষে' কবিতার (পৃ. ৬১৭) পঞ্চম স্তবকের তৃতীয় ছত্রে বিশ্বভারতী-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণে পাঠ আছে 'যদি কোথা খুঁজে পাই'। কিন্তু প্রথম স্বতন্ত্র সংস্করণের পাঠ 'যদি হোথা খুঁজে পাই', সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় -প্রকাশিত 'কাব্য গ্রন্থাবলী'-তে 'যদি হেথা খুঁজে পাই'। আমরা এ ক্ষেত্রে বিশ্বভারতী-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণের পাঠই অনুসরণ করেছি।

ছত্র ও স্তবক -বিন্যাস, চিহ্ন, বানান ও পাঠের অসামঞ্জস্যের এই জাতীয় তালিকা দীর্ঘতর করা যায়, তবে গ্রন্থপরিচয়ে এইরূপ পাঠপরিবর্তনজনিত এবং অন্যান্য তথ্য সবিস্তারে উল্লেখ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে, এখানে কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হল।

১৯ জুন ১৯৮০

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
সভাপতি
সম্পাদকমণ্ডলী

সংকলন ও সঞ্চয়ন-গ্রন্থের
রবীন্দ্রনাথ-কৃত ভূমিকা

কাব্য গ্রন্থাবলী। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রকাশিত

আমার সমস্ত কাব্যগ্রন্থ একত্র প্রকাশিত হইল। এজন্য আমার স্নেহভাজন প্রকাশকের নিকট আমি কৃতজ্ঞ আছি।

অনেক সময় কবিতা খণ্ড খণ্ড অবস্থায় পাঠকের নিকট অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়; কিন্তু পুঞ্জীভূত আকারে রচনাগুলি পরস্পরের সাহায্যে স্ফুটতর সম্পূর্ণতর হইয়া দেখা দেয়, লেখকের মর্মকথাটি পাঠকের নিকটে সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠে। একবার লেখকের সমস্ত রচনার সহিত সেইরূপ বৃহৎভাবে পরিচয় হইয়া গেলে, তখন, প্রত্যেক স্বতন্ত্র লেখা তাহার সমস্ত বক্তব্য বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে পারে।

এই গ্রন্থে কবিতাগুলি কালক্রমানুসারে সন্নিবেশিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথমাংশে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হওয়া যায় নাই। কৈশোরক আখ্যায় যে সকল কবিতা বাহির হইয়াছে তাহা লেখকের পনেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত। ভানুসিংহের অনেকগুলি কবিতা লেখকের ১৫।১৬ বৎসর বয়সের লেখা · আবার তাহার মধ্যে গুটিকতক পরবর্তীকালের লেখাও আছে—এগুলি বিষয় প্রসঙ্গে একত্রে ছাপা হইল। গ্রন্থশেষে যে সমস্ত গান প্রকাশিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

গান ও গীতিনাট্যগুলি পাঠযোগ্য কবিতা নহে কেবল গ্রন্থাবলীর অসম্পূর্ণতা নিবারণার্থে প্রকাশকের অনুরোধে এই গ্রন্থে স্থান পাইল।

"চৈতালি" শীর্ষক কবিতাগুলি লেখকের সর্বশেষের লেখা। তাহার অধিকাংশই চৈত্র মাসে লিখিত বলিয়া বৎসরের শেষ উৎপন্ন শস্যের নামে তাহার নামকরণ করিলাম।

গীতিগ্রন্থ ও গীতিনাট্য ব্যতীত এই গ্রন্থাবলীর অন্যান্য পুস্তকে যে সকল গান বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে সূচীপত্রে তাহাদিগকে তারা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া গেল। অনেকগুলি গানের সুর আমার পূজনীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত।

বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য লেখকের বাল্যরচনা। ৺বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের রচিত সারদামঙ্গল কাব্য হইতে ইহার কতক কতক ভাব এমন কি, ভাষা সংগ্রহ করিয়াছিলাম—সেজন্য কবির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

কলিকাতা। ১৫ আশ্বিন ১৩০৩

কাব্যগ্রন্থ। ইন্ডিয়ান প্রেস-প্রকাশিত

সন্ধ্যা-সংগীতের পূর্ববর্তী আমার সমস্ত কবিতা আমার কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে বাদ দিয়াছি। যদি সুযোগ পাইতাম তবে সন্ধ্যা-সংগীতকেও বাদ দিতাম। কিন্তু সকল জিনিসেরই একটা আরম্ভ তো আছেই। সে আরম্ভ কাঁচা এবং দুর্বল, কিন্তু সম্পূর্ণতার খাতিরে তাহাকেও স্থান দিতে হয়।

সন্ধ্যা-সংগীত হইতেই আমার কাব্যস্রোত ক্ষীণভাবে শুরু হইয়াছে। এইখান হইতেই আমার লেখা নিজের পথ ধরিয়াছে। পথ যে তৈরি ছিল তাহা নহে—গতিবেগে আপনি পথ তৈরি হইয়া উঠিয়াছে। তখন শক্তি অল্প, বাধা বিস্তর—নিজের কাব্যরূপকে তখনো স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই নাই. ভালো মন্দ বিচার করিবার কোনো

আদর্শ মনের মধ্যে ছিল না। তাহা ছাড়া, প্রথম রচনার সকলের চেয়ে মস্ত দোষ এই যে তাহার মধ্যে সত্যের অভাব থাকে। কেননা সত্যকে মানুষ ক্রমে ক্রমে পায়— অথচ সত্যকে পাইবার পূর্বেই তাহার কর্ম আরম্ভ হইয়া থাকে, সেই কর্মের মধ্যে আবর্জনার ভাগই বেশি থাকে।

মানুষের জীবন তাহার প্রতিদিনের আবর্জনা প্রতিদিন মোচন করিয়া তাহা মার্জনা করিয়া চলে। যুবা আপনার শৈশবের হামাগুড়িকে জমাইয়া রাখে না। দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্য-ভাণ্ডারে আবর্জনাগুলাকে একেবারে দূর করিয়া দেওয়া যায় না। যাহা একবার প্রকাশ হইয়াছে তাহাকে বিদায় করা কঠিন।

অতএব সন্ধ্যা-সংগীতকে দিয়া কাব্যগ্রন্থাবলী আরম্ভ করা গেল। ইহার কবিতা-গুলির মধ্যে কবির লজ্জার কারণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু যদি তাহার পরবর্তী রচনায় কোনো গৌরবের বিষয় থাকে তবে এই প্রথম প্রয়াসের নিকট সে জন্য ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে।

প্রভাত-সংগীতের কবিতাগুলি অস্পষ্ট কল্পনার কুহেলিকা হইতে বাহির হইবার পথে আসিয়াছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে অস্ফুটতা জড়িত হইয়া রহিল তাহা মোচন করিবার উপায় নাই। ত্যাগ করিতে হইলে অধিকাংশই ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু সেরূপ নির্বাসন দণ্ড দিবার মেয়াদ এখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই এই আমার কাব্যসংগ্রহে এমন অনেক রচনা স্থান পাইল যাহারা কেবলমাত্র পরিত্যক্ত নদী-পথের নুড়িগুলির মতো পথের ইতিহাস নির্দেশ করিবে কিন্তু রসধারাকে রক্ষা করিবে না।

আশ্বিন ১৩২১

সঞ্চয়িতা

সঞ্চয়িতার কবিতাগুলি সংকলনের ভার আমি নিজে নিয়েছি। অন্যের উপরেই দিলেম। কেননা, কবিতা যে লেখে কবিতাগুলির অন্তরের ইতিহাস তার কাছে সুস্পষ্ট। বাহিরের প্রকাশে কবিতাগুলি উজ্জ্বল হয়েছে কিনা হয়তো সেটা তার পক্ষে নিশ্চিত বোঝা কোনো কোনো স্থলে সহজ হয় না।

কিন্তু, এই সংকলন উপলক্ষে একটি কথা বলবার সুযোগ পাব প্রত্যাশা করে এ কাজে হাত দিয়েছি। যাঁরা আমার কবিতা প্রকাশ করেন অনেক দিন থেকে তাঁদের সম্বন্ধে এই অনুভব করছি যে, আমার অল্প বয়সের যে-সকল রচনা স্খলিত পদে চলতে আরম্ভ করেছে মাত্র, যারা ঠিক কবিতার সীমার মধ্যে এসে পৌঁছয় নি, আমার গ্রন্থাবলীতে তাদের স্থান দেওয়া আমার প্রতি অবিচার।

মনে আছে কোনো এক প্রবন্ধে আমার গানের সমালোচনায় এমন-সকল গানকে আমার কবিত্বের পঙ্গুতার দৃষ্টান্ত-স্বরূপে লেখক উদ্ধৃত করেছিলেন, যেগুলি ছাপার বইয়ে প্রশ্রয় পেয়ে আমাকে অনেক দিন থেকে লজ্জা দিয়ে এসেছে। সেগুলি অপরিণত মনের প্রকাশ অপরিণত ভাষায়। কেউ কেউ সেগুলিকে ভালোও বাসেন, সেই দুর্গতির জন্য আমি দায়ী। প্রবন্ধলেখককে দোষ দিতে পারি নে, কেননা লেখায় যে অপরাধ করেছি ছাপার অক্ষরে তাকে সমর্থন করা হয়েছে।

যে কবিতাগুলিকে আমি নিজে স্বীকার করি তার দ্বারা আমাকে দায়ী করলে আমার কোনো নালিশ থাকে না। বন্ধুরা বলেন, ইতিহাসের ধারা রক্ষা করা চাই। আমি বলি, লেখা যখন কবিতা হয়ে উঠেছে তখন থেকেই তার ইতিহাস। এ নিয়ে অনেক তর্ক হতে পারে, সে কথা বলবার স্থান এ নয়।

সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত ও ছবি ও গান এখনো যে বই-আকারে চলছে, একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ দোষ। বালক যদি প্রধানদের সভায় গিয়ে ছেলেমানুষি করে তবে সেটা সহ্য করা বালকদের পক্ষেও ভালো নয়, প্রধানদের পক্ষেও নয়। এও সেইরকম। ঐ তিনটি কবিতাগ্রন্থের আর কোনো অপরাধ নেই, কেবল একটি অপরাধ—

লেখাগুলি কবিতার রূপ পায় নি। ডিমের মধ্যে যে শাবক আছে সে যেমন পাখি হয়ে ওঠে নি— এটাতে কেউ দোষ দেবে না, কিন্তু তাকে পাখি বললে দোষ দিতেই হবে।

ইতিহাস-রক্ষার খাতিরে এই সংকলনে ঐ তিনটি বইয়ের যে-কয়টি লেখা সঞ্চয়িতায় প্রকাশ করা গেল তা ছাড়া ওদের থেকে আর-কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না। ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধেও সেই একই কথা। কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে, কিন্তু সেই পর্বে আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।

তার পর মানসী থেকে আরম্ভ করে বাকি বইগুলির কবিতায় ভালো মন্দ মাঝারির ভেদ আছে, কিন্তু আমার আদর্শ অনুসারে ওরা প্রবেশিকা অতিক্রম করে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এই গ্রন্থে যে কবিতাগুলি দিতে ইচ্ছা করেছি তার অনেকগুলিই দেওয়া হল না। স্থান নেই। ছাপা অগ্রসর হতে হতে আয়তনের স্ফীতি দেখে ভীতমনে আত্ম-সংবরণ করেছি।

এইরকম সংকলন কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। মনের অবস্থা-পরিবর্তন হয়, মনোযোগের তারতম্য ঘটে। অবিচার না হয়ে যায় না।

আমার লেখা যে-সকল কাব্যগ্রন্থ দীর্ঘকাল পাঠকদের পরিচিত, এই গ্রন্থে তাদেরই থেকে বিশেষ করে সংগ্রহ করা হয়েছে। যেগুলি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত সেগুলি যথাস্থানে পূর্ণতর পরিচয়ের অপেক্ষায় রইল।

শান্তিনিকেতন। পৌষ ১৩৩৮

অচলিত সংগ্রহ : **প্রথম খণ্ড**

আমার রচনার আবর্জিত অংশ অনেক দিন আমি প্রচ্ছন্ন রেখেছিলুম। তার অধিকাংশই অসম্পূর্ণ, অপরিপক্ক। একসময়ে বালক ছিলুম, তখনকার রচনার স্বাভাবিক অপরিণতি দোষের নয়, কিন্তু সাহিত্যসভায় তাকে প্রকাশ্যতা দিলে তাকে লজ্জা দেওয়া হয়। তার লজ্জার কারণ আর কিছু নয়, তার মধ্যে যে একটা বয়স্কের অভিমান দেখা দেয় সেটা হাস্যকর, কেননা সেটা কৃত্রিম। স্বাভাবিক হবার শক্তি পরিণত বয়সের, সে বয়সে ভুলচুক থাকতে পারে নানা রকমের, কিন্তু অক্ষম অনুকরণের দ্বারা নিজেকে পরের মুখোশে হাস্যকর করে তোলা তার ধর্ম নয়— অন্তত আমি তাই অনুভব করি। যে বয়স থেকে নিজের পরিচয় আমি নিজের স্বভাবেই প্রতিষ্ঠিত উপলব্ধি করেছি সেই বয়স থেকেই আমি সাহিত্যিক দায়িত্ব নিজের বলে স্বীকার করে নিয়ে সাধারণের বিচার-সভায় আত্মসমর্পণ করতে আজ পর্যন্ত প্রস্তুত ছিলাম।

প্রকৃতির সৃষ্টিতে যা ত্যাজ্য, প্রবল তার সম্মার্জনী। মানুষের রচনার জন্যেও আছে সম্মার্জনী, সেটা ঝেঁটিয়ে ফিরিয়েও আনে। তার প্রভাব মানতেই হবে। প্রকাশের পূর্ণতায় যা পৌঁছয় নি তারও মূল্য আছে হয়তো, ইতিহাসে, মনোবিজ্ঞানে; তাই সাহিত্যের অবজ্ঞা এড়িয়েও সে প্রকাশকের পাসপোর্ট পেয়ে থাকে।

[আশ্বিন ১৩৪৭]

ভূমিকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির অধ্যক্ষেরা আমার গদ্য পদ্য সমস্ত লেখা একসঙ্গে জড়ো করে বিশেষভাবে সাজিয়ে ছাপাবার সংকল্প করেছেন। কাজটি পরিমাণে বৃহৎ এবং সম্পাদনায় দুঃখসাধ্য; এ রকম অনুষ্ঠান আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর সাহিত্য-বিচারকদের সম্পূর্ণ মনের মতো করে তোলা কারো শক্তিতে নেই এ কথা নিশ্চিত জেনে নিজে এর দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি নিয়েছি। যাঁরা সাহস করে এর ভার বহন করতে প্রস্তুত তাঁদের জন্যে উদ্বিগ্ন রইলুম।

অতি অল্প বয়স থেকে স্বভাবতই আমার লেখার ধারা আমার জীবনের ধারার সঙ্গে সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে। চারি দিকের অবস্থা ও আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং অভিজ্ঞতার নূতন আমদানি ও বৈচিত্র্যে রচনার পরিণতি নানা বাঁক নিয়েছে ও রূপ নিয়েছে; একটা কোনো ঐক্যের স্বাক্ষর তাদের সকলের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে নিশ্চয়ই পরস্পরের আত্মীয়তার প্রমাণ দিতে থাকে। যাঁরা বাইরে থেকে সন্ধান ও চর্চা করেন তাঁদের বিচারবুদ্ধির কাছে সেটা ধরা পড়ে। কিন্তু লেখকের কাছে সেটা স্পষ্ট গোচর হয় না। মনের ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে যখন ফুল ফোটায় ফল ফলায় তখন সেইটের আবেগ ও বাস্তবতাই কবির কাছে হয় একান্ত প্রত্যক্ষ। তার মাঝে মাঝে সময় আসে যখন ফলন যায় কমে, যখন হাওয়ার মধ্যে প্রাণশক্তির প্রেরণা হয় ক্ষীণ। তখন ইতস্তত যে ফসলের চিহ্ন দেখা দেয় সে আগেকার কাটা শস্যের পোড়ো বীজের অঙ্কুর। এই অফলা সময়গুলো ভোলবার যোগ্য। এটা হল উঞ্ছবৃত্তির ক্ষেত্র তাঁদেরই কাছে যাঁরা ঐতিহাসিক সংগ্রহকর্তা। কিন্তু ইতিহাসের সম্বল আর কাব্যের সম্পত্তি এক জাতের নয়।

ইতিহাস সবই মনে রাখতে চায় কিন্তু সাহিত্য অনেক ভোলে। ছাপাখানা ঐতিহাসিকের সহায়। সাহিত্যের মধ্যে আছে বাছাই করার ধর্ম, ছাপাখানা তার প্রবল বাধা। কবির রচনাক্ষেত্রকে তুলনা করা যেতে পারে নীহারিকার সঙ্গে। তার বিস্তীর্ণ ঝাপসা আলোর মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে সংহত ও সমাপ্ত সৃষ্টি। সেই-গুলিই কাব্য। আমার রচনায় আমি তাদেরই স্বীকার করতে চাই। বাকি যত ক্ষীণ বাষ্পীয় ফাঁকগুলি যথার্থ সাহিত্যের শামিল নয়। ঐতিহাসিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী; বাষ্প, নক্ষত্র, ফাঁক, কোনোটাকেই সে বাদ দিতে চায় না।

আমার আয়ু এখন পরিণামের দিকে এসেছে। আমার মতে আমার শেষ কর্তব্য হচ্ছে, যে লেখাগুলিকে মনে করি সাহিত্যের লক্ষ্যে এসে পৌঁচেছে তাদের রক্ষা করে বাকিগুলোকে বর্জন করা। কেননা রসসৃষ্টির সত্য পরিচয়ের সেই একমাত্র উপায়। সব-কিছুকে নির্বিচারে রাশীকৃত করলে সমগ্রকে চেনা যায় না। সাহিত্যরচয়িতারূপে আমার চিত্তের যে একটি চেহারা আছে সেইটেকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা যেতে পারলেই আমার সার্থকতা। অরণ্যকে চেনাতে গেলেই জঙ্গলকে সাফ করা চাই, কুঠারের দরকার।

একেবারে শ্রেষ্ঠ লেখাগুলিকে নিয়েই আঁট করে তোড়া বাঁধতে হবে এ কথা আমি বলি নে। একটা আদর্শ আছে সেটা নিছক পয়লা শ্রেণীর আদর্শ নয়, সেটা সাধারণ চলতি শ্রেণীর আদর্শ। তার মধ্যে পরস্পরের মূল্যের কমিবেশি আছে। রেলগাড়িতে যেমন প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। তাদের রূপের ও ব্যবহারের আদর্শ ঠিক এক নয় কিন্তু চাকায় চাকায় মিল আছে। একটা সাধারণ সমাপ্তির আদর্শ তারা

সকলেই রক্ষা করেছে। যারা অসম্পূর্ণ, কারখানা-ঘরের বাইরে তাদের আনা উচিত হয় না। কিন্তু তারা যে অনেক এসে পড়েছে তা এই বইয়ের গোড়ার দিকের কবিতাগুলি দেখলে ধরা পড়বে। কুয়াশা যেমন বৃষ্টি নয় এরাও তেমনি কবিতা নয়। যাঁরা পড়বেন তাঁরা এই-সব কাঁচা বয়সের অকালজাত অঙ্গহীনতার নমুনা দেখে যদি হাসতে হয় তো হাসবেন, তবু একটুখানি দয়া রাখবেন মনে এই ভেবে যে, ভাগ্যক্রমে এই আরম্ভই শেষ নয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানিয়ে রাখি, এই বইয়ে যে গীতিনাট্য ছাপানো হয়েছে তার গানগুলিকে কেউ যেন কবিতা বলে সন্দেহ না করেন।

সাহিত্যরচনার মধ্যে জীবধর্ম আছে। নানা কারণে তারা সবাই একই পূর্ণতায় দেখা দেয় না। তাদের সবাইকে একত্রে এলোমেলো বাড়তে দিলে সবারই ক্ষতি হয়। মনে আছে এক সময়ে বিজয়া পত্রে বিপিনচন্দ্র পাল আমার রচিত গানের সমালোচনা করেছিলেন। সে সমালোচনা অনুকূল হয় নি। তিনি আমার যে-সব গানকে তলব দিয়ে বিচারকক্ষে দাঁড় করিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বিস্তর ছেলেমানুষি ছিল। তাদের সাক্ষ্য সংশয় এনেছিল সমস্ত রচনার 'পরে। তারা সেই পরিণতি পায় নি যার জোরে গীতসাহিত্যসভায় তারা আপনাদের লজ্জা নিবারণ করতে পারে। ইতিহাসের রসদ জোগাবার কাজে ছাপাখানার আড়কাঠির হাতে সাহিত্যমহলে তাদের চালান দেওয়া হয়েছে। তাদের সরিয়ে আনতে গেলে ইতিহাস আপন পুরাতন দাবির দোহাই পেড়ে আপত্তি পেশ করে।

আজ যদি আমার সমস্ত রচনার সমগ্র পরিচয় দেবার সময় উপস্থিত হয়ে থাকে তবে তাদের মধ্যে ভালো মন্দ মাঝারি আপন আপন স্থান পাবে এ কথা মানা যেতে পারে। তারা সবাই মিলেই সমষ্টির স্বাভাবিকতা রক্ষা করে। কেবল যাদের মধ্যে পরিণতি ঘটে নি তারা কোনো-এক সময়ে দেখা দিয়েছিল বলেই যে ইতিহাসের খাতিরে তাদের অধিকার স্বীকার করতে হবে এ কথা শ্রদ্ধেয় নয়। সেগুলোকে চোখের আড়াল করে রাখতে পারলেই সমস্তগুলোর সম্মান থাকে।

অতএব আমার সমস্ত লেখা সংগ্রহ করার মানে হচ্ছে এই যে, যে-সব লেখা অন্তত আমারই রচনার আদর্শ অনুসারে লেখায় প্রস্ফুট হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের একত্র করা। বিধাতার হাতের কাজে অসম্পূর্ণ সৃষ্টি মাঝে মাঝে দেখা দেয়, কিন্তু দেখা দিয়েছে বলেই যে টিকে যায় তা নয়, সম্পূর্ণ সৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য হয় না বলেই তাদের জবাব দেওয়া হয়। সেইরকম জবাব-দেওয়া লাঞ্ছনধারী রচনা অনেকগুলিই পাওয়া যাবে এই গ্রন্থের শুরু থেকেই, তাদের ভিড় ঠেলে পাঠকেরা আপন চেষ্টায় যদি পথ করে চলে যান তবে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হবে। প্রথম বুনোনির সময় যে মাটি বৃষ্টি পায় নি, তার তৃষার্ত পীড়িত বীজ থেকে কুণ্ঠিত হয়ে যে অঙ্কুর বেরোয় সে যেমন কিছু একটা প্রকাশ করতে চায় কিন্তু তার পূর্বেই ব্যর্থ হয়ে যায় মরে, সন্ধ্যাসংগীতের কবিতা সেই জাতের। একে সংগ্রহ করে রাখবার মূল্য নেই। এর কেবল একটা দাম আছে, সে হচ্ছে চিত্তচাঞ্চল্যের আবেগে বাঁধা ছন্দের শিকল ভাঙা।

অনেক দিনের রচনাগুলো যখন একত্র জমা করা যায় তখন এই ভাবনাটা মনে আসে। তারা নানা বয়সের ও মনের নানা অবস্থার সামগ্রী। শুধু নিজের মনের নয়, চারি দিকের মনের। ইতিহাসের এই অনিবার্য বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই সাহিত্যের তরী চলে আপন তীর্থে। সকলের চেয়ে ভেদ ঘটায় রচনাশক্তির কমিবেশিতে। এক সময়ে বিশেষ রসের আয়োজনে মনকে যা টেনেছিল, আর-এক সময়ে তা টানে না, কিংবা অন্য রকম করে টানে। তাতে কোনো ক্ষতি হয় না যদি তার তৎকালীন প্রকাশটা হয় সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে। অনেক সময়ে সেইটেই হয় না। আমরা যাকে বলি ছেলেমানুষি, কাব্যের বিষয় হিসাবে সেটা অতি উত্তম, রচনার রীতি হিসাবে সেটা

উপেক্ষার যোগ্য। বয়সের এক পর্বে যা লিখেছি অন্য পর্বে তা লিখি নে কিংবা হয়তো অন্য রকম করে লিখি। সেই তার রূপ ও রসের পরিবর্তন যদি যথাসময়ে আপন প্রকাশরীতির যোগ্য বাহন পেয়ে থাকে তা হলে কোনো নালিশ থাকে না। যুগপরিবর্তন ইতিহাসের অঙ্গ, কিন্তু সাহিত্যের একটা মূলনীতি সকল পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে মানুষের মনকে আনন্দের জোগান দিয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে আমাদের অলংকারশাস্ত্রে যাকে বলে রসতত্ত্ব। এই রস আধুনিকী বা সনাতনী কোনো বিশেষ মালমসলার ফরমাশে তৈরি হয় না। কখনো কখনো কোনো অর্থনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক গোঁড়ামি জেগে উঠে রসসৃষ্টিশালায় ডিক্টেটরি করতে আসে, বাইরে থেকে দণ্ড হাতে তাদের শাসন চালায়, মনে করে চিরকালের মতো অপ্রতিহত তাদের প্রভাব। তাদের তকমা চোখ ভোলায় যাদের তারা রসরাজ্যের বাইরের লোক, তারা রবাহূত; এক-একটা বিশেষ রব শুনে অভিভূত হয়, ভিড় করে। রসের প্রকৃতি হচ্ছে যাকে বলা যায় গুহাহিত, অভাবনীয়, সে কোনো বিশেষ উত্তেজিত সাময়িকতার আইনকানুনের অধীন নয়। তার প্রকাশ এবং তার লুপ্তি মানবপ্রকৃতির যে নিগূঢ় বিশেষত্বের সঙ্গে জড়িত তা কেউ স্পষ্ট নির্ণয় করতে পারে না। স্বভাবের গহন সৃষ্টিশালার গভীর প্রেরণায় মানুষ আপন খেলনা গড়ে আবার খেলনা ভাঙে। আমরা কারিগররা তার সেই ভাঙাগড়ার লীলায় উপকরণ জুগিয়ে আসছি। কিন্তু সেগুলো নিতান্ত খেলনা নয়, সেগুলো কীর্তি, প্রত্যেকবার মানুষ এই আশা করে, নইলে তার হাত চলে না। অথচ সেই সঙ্গেই একটা নিরাসক্ত বৈরাগ্যকে রক্ষা করতে পারলেই ভালো।

আমার আশি বছর বয়সের সাহিত্যিক প্রয়াসকে সম্পূর্ণ আকারে পুঞ্জিত করবার এই যে চেষ্টা আজ দেখছি, এর মধ্যে নিশ্চিত অনুমান করছি অনেক গাঁথুনি আছে, যার উপরে আগামী কালের বিস্মরণের দূত প্রত্যহ অদৃশ্য কালিতে আসন্ন লুপ্তির চিহ্ন অঙ্কিত করে চলেছে। এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো মোহ নেই, এবং ক্ষোভ করাও বৃথা বলে মনে করি।

এই যদি সত্য হয়, তবে যে সুহৃদ্‌রা আমার রচনাগুলি রক্ষণীয় বলে গণ্য করছেন তাঁদের ইচ্ছাকে কী বলে সম্মান করা যায়। এ উপলক্ষে পৃথিবীতে জীব-বংশধারার ইতিহাস স্মরণের যোগ্য। কালের পরিবর্তিত গতির সঙ্গে অনেক জীব তাল রেখে চলতে পারে নি, প্রাণরঙ্গশালা থেকে সেই বেতালদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সবাই তো সরে নি। অনেক আছে কালের সঙ্গে তাদের মিল ভাঙে নি। আজ নূতনও তাদের দাবি করে, পুরাতনও তাদের ত্যাগ করে নি। কী শিল্পকলায় কী সাহিত্যে, যদি তার যথেষ্ট প্রমাণ না থাকত তা হলে বলতে হত, সৃষ্টিকর্তা মানুষের মন আপন পিছনের রাস্তা ক্রমাগত পুড়িয়ে ফেলতে ফেলতেই চলেছে। কথাটা তো সত্য নয়। মানুষ সামনের দিকে যেমন অগ্রসরণ করে তেমনি অনুসরণ করে পিছনের, নইলে তার চলাই হয় না। পিছনহারা সাহিত্য বলে যদি কিছু থাকে সে কবন্ধ, সে অস্বাভাবিক।

তাই বলছি, আজ যাঁরা আমার রচনাকে স্থায়ী সম্মানের রূপ দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাঁরা আপন রুচি ও সংস্কৃতি অনুসারে তার স্থায়িত্ব উপলব্ধি করেছেন। মানুষ আপনার এই উপলব্ধিকে বিশ্বাস করেই পাকা ইমারতের কাজ ফাঁদে, ভুল হতে পারে, কিন্তু ভুল না হওয়ার সম্ভাবনাকে মানুষ যে আস্থা করে সেই আস্থারই মূল্য বেশি। বর্তমান অনুষ্ঠানকর্তাদের সম্বন্ধে এই হচ্ছে বলবার কথা। আর আমার কথা যদি বল, আমি মনুর উপদেশ মানব, নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতং। যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্। সেইসঙ্গে মিথ্যা বিনয়ের ভান করব না। বন্ধুরা আমার এতকালের অধ্যবসায়কে যে নিশ্চিত শ্রদ্ধার মূল্য দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন

আমিও তাকে শ্রদ্ধা করে সেই দানের মধ্যে আমার শেষ পুরস্কার গ্রহণ করব। কাল তাঁদের ফাঁকি দেবে না এবং বিড়ম্বনা করবে না কবিকেও, এই কথায় সংশয় করার চেয়ে বিশ্বাস করাতে উপস্থিত লাভ, কেননা কালের দরবারে এর শেষ মীমাংসার সম্ভাবনা দূরে আছে।

সবশেষে এই কথা জানিয়ে রাখছি, যাঁরা এই গ্রন্থপ্রকাশের ভার নিয়েছেন তাঁদের দুঃসাধ্য কাজে আমি যথাসাধ্য দৃষ্টি রাখব এবং তাঁরা আমার সমর্থনের অনুসরণ করবেন।

শ্রীনিকেতন
৩০।৬।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর জন্য লিখিত।

অবতরণিকা

যে সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম সে ছিল অতি নিভৃত। শহরের বাইরে শহরতলির মতো, চারি দিকে প্রতিবেশীর ঘরবাড়িতে কলরবে আকাশটাকে আঁট করে বাঁধে নি।

আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা-ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার-অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই বিরল।

আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেক কালের বাড়ি, তার ছিল গোটাকতক ভাঙা ঢাল বর্শা ও মরচে-পড়া তলোয়ার-খাটানো দেউড়ি, ঠাকুরদালান, তিন-চারটে উঠোন, সদর-অন্দরের বাগান, সম্বৎসরের গঙ্গাজল ধরে রাখবার মোটা মোটা জালা-সাজানো অন্ধকার ঘর। পূর্বযুগের নানা পালপার্বণের পর্যায় নানা কলরবে সাজে সজ্জায় তার মধ্য দিয়ে একদিন চলাচল করেছিল, আমি তার স্মৃতিরও বাইরে পড়ে গেছি। আমি এসেছি যখন, এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র তখনো এসে পৌঁছয় নি।

এ বাড়ি থেকে এ-দেশীয় সামাজিক জীবনের স্রোত যেমন সরে গেছে তেমনি পূর্বতন ধনের স্রোতেও পড়েছে ভাঁটা। পিতামহের ঐশ্বর্য-দীপাবলী নানা শিখায় একদা এখানে দীপ্যমান ছিল, সেদিন বাকি ছিল দহনশেষের কালো দাগগুলো, আর ছাই, আর একটিমাত্র কম্পমান ক্ষীণ শিখা। প্রচুর উপকরণসমাকীর্ণ পূর্বকালের আমোদ-প্রমোদ-বিলাস-সমারোহের সরঞ্জাম কোণে কোণে ধূলিমলিন জীর্ণ অবস্থায় কিছু কিছু বাকি যদি বা থাকে তাদের কোনো অর্থ নেই। আমি ধনের মধ্যে জন্মাই নি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।

নিরালায় এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক, মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মতো। তাই আমাদের ভাষায় একটা-কিছু ভঙ্গি ছিল কলকাতার লোক যাকে ইশারা করে বলত ঠাকুরবাড়ির ভাষা। পুরুষ ও মেয়েদের বেশভূষাতেও তাই, চালচলনেও।

বাংলা ভাষাটাকে তখন শিক্ষিতসমাজ অন্দরে মেয়েমহলে ঠেলে রেখেছিলেন; সদরে ব্যবহার হত ইংরেজি, চিঠিপত্রে, লেখাপড়ায়, এমন-কি মুখের কথায়। আমাদের বাড়িতে এই বিকৃতি ঘটতে পারে নি। সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই।

আমাদের বাড়িতে আর-একটি সমাবেশ হয়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণত বাংলাদেশে ধর্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়িতে তা প্রবেশ করে নি। পিতৃদেবের প্রবর্তিত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিত।

এই যেমন এক দিকে তেমনি অন্য দিকে আমার গুরুজনদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়। তখন বাড়ির হাওয়া শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যরস-সম্ভোগে আন্দোলিত, সার ওঅল্‌টার স্কটের প্রভাবও প্রবল। দেশপ্রীতির উন্মাদনা তখন দেশে কোথাও নেই। রঙ্গলালের "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" আর তার পরে হেমচন্দ্রের "বিংশতি কোটি মানবের বাস" কবিতায় দেশমুক্তি-কামনার সুর ভোরের পাখির কাকলির মতো শোনা যায়। হিন্দুমেলার পরামর্শ ও আয়োজনে

আমাদের বাড়ির সকলে তখন উৎসাহিত, তার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার গান ছিল মেজদাদার লেখা "জয় ভারতের জয়", গণদাদার লেখা "লজ্জায় ভারত-যশ গাইব কী করে", বড়দাদার "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি"। জ্যোতিদাদা এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন— একটি পোড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন; ঋগ্বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান; রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।

এই-সকল আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ উদ্‌যোগ এর কিছুই ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে নয়। শান্ত অবকাশের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এর প্রভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করেছিল। রাজসরকারের কোতোয়াল হয় তখন সতর্ক ছিল না, নয় উদাসীন ছিল, তারা সভার সভ্যদের মাথার খুলি ভঙ্গ বা রসভঙ্গ করতে আসে নি।

কলকাতা শহরের বক্ষ তখন পাথরে বাঁধানো হয় নি, অনেকখানি কাঁচা ছিল। তেল-কলের ধোঁওয়ায় আকাশের মুখে তখনো কালি পড়ে নি। ইমারত-অরণ্যের ফাঁকায় ফাঁকায় পুকুরের জলের উপর সূর্যের আলো ঝিকিয়ে যেত, বিকেলবেলায় অশথের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ত, হাওয়ায় দুলত নারকেল গাছের পত্র-ঝালর, বাঁধা নালা বেয়ে গঙ্গার জল ঝরনার মতো ঝরে পড়ত আমাদের দক্ষিণ-বাগানের পুকুরে, মাঝে মাঝে গলি থেকে পালকি-বেহারার হাঁইহুঁই শব্দ আসত কানে, আর বড়ো রাস্তা থেকে সহিসের হেইও হাঁক। সন্ধ্যাবেলায় জ্বলত তেলের প্রদীপ, তারই ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়ী দাসীর কাছে শুনতুম রূপকথা। এই নিস্তব্ধপ্রায় জগতের মধ্যে আমি ছিলুম এক কোণের মানুষ, লাজুক, নীরব, নিশ্চঞ্চল।

আরো একটা কারণে আমাকে খাপছাড়া করেছিল। আমি ইস্কুল-পালানো ছেলে, পরীক্ষা দিই নি, পাস করি নি, মাস্টার আমার ভাবী কালের সম্বন্ধে হতাশ্বাস। ইস্কুল-ঘরের বাইরে যে অবকাশটা বাধাহীন সেইখানে আমার মন হাঘরেদের মতো বেরিয়ে পড়েছিল।

ইতিপূর্বেই কোন্ একটা ভরসা পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলুম, লোক যাকে বলে কবিতা সেই ছন্দ-মেলানো মিল-করা ছড়াগুলো সাধারণ কলম দিয়েই সাধারণ লোকে লিখে থাকে। তখন দিনও এমন ছিল, ছড়া যারা বানাতে পারত তাদের দেখে লোক বিস্মিত হত। এখন যারা না পারে তারাই অসাধারণ বলে গণ্য। পয়ার ত্রিপদী মহলে আপন অবাধ অধিকারবোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাতলুম। আট অক্ষর দশ অক্ষরের চৌকো-চৌকো কত রকম শব্দভাগ নিয়ে চলল ঘরের কোণে আমার ছন্দ-ভাঙাগড়ার খেলা। ক্রমে প্রকাশ পেল দশজনের সামনে।

এই লেখাগুলি যেমনি হোক এর পিছনে একটি ভূমিকা আছে—সে হচ্ছে একটি বালক, সে কুনো, সে একলা, সে একঘরে, তার খেলা নিজের মনে। সে ছিল সমাজের শাসনের অতীত, ইস্কুলের শাসনের বাইরে। বাড়ির শাসনও তার হালকা। পিতৃদেব ছিলেন হিমালয়ে, বাড়িতে দাদারা ছিলেন কর্তৃপক্ষ। জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোনো বাঁধন পরান নি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার 'পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্য যদি দৌরাত্ম্য করতেন তা হলে ভেঙে-চুরে তেড়ে-বেঁকে যা-হয় একটা কিছু হতুম, সেটা হয়তো ভদ্রসমাজের সন্তোষজনকও হত, কিন্তু আমার মতো একেবারেই হত না।

শুরু হল আমার ভাঙাছন্দে টুকরো কাব্যের পালা, উল্কাবৃষ্টির মতো; বালকের যা-তা ভাবের এলোমেলো কাঁচা গাঁথুনি। এই রীতিভঙ্গের ঝোঁকটা ছিল সেই এক-

ঘরে ছেলের মজ্জাগত। এতে যথেষ্ট বিপদের শঙ্কা ছিল। কিন্তু এখানেও অপঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছি। তার কারণ, আমার ভাগ্যক্রমে সেকালে বাংলা সাহিত্যে খ্যাতির হাটে ভিড় ছিল অতি সামান্য— প্রতিযোগিতার উত্তেজনা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নি। বিচারকের দণ্ড থেকে অপ্রশংসার অপ্রিয় আঘাত নামত, কিন্তু কটূক্তি ও কুৎসার উত্তেজনা তখনো সাহিত্যে ঝাঁঝিয়ে ওঠে নি।

সেদিনকার অল্পসংখ্যক সাহিত্যিকের মধ্যে আমি ছিলেম বয়সে সব চেয়ে ছোটো, শিক্ষায় সব চেয়ে কাঁচা। আমার ছন্দগুলি লাগাম-ছেঁড়া, লেখবার বিষয় ছিল অস্ফুট উক্তিতে ঝাপসা, ভাষার ও ভাবের অপরিণতি পদে পদে। তখনকার সাহিত্যিকেরা মুখের কথায় বা লেখায় প্রায়ই আমাকে প্রশ্রয় দেন নি— আধো-আধো বাধো-বাধো কথা নিয়ে বেশ একটু হেসেছিলেন। সে হাসি বিদূষকের নয়, সেটা বিদূষণ-ব্যবসায়ের অঙ্গ ছিল না। তাঁদের লেখায় শাসন ছিল, অসৌজন্য ছিল না লেশমাত্র। বিমুখতা যেখানে প্রকাশ পেয়েছে সেখানেও বিদ্বেষ দেখা দেয় নি। তাই প্রশ্রয়ের অভাব সত্ত্বেও, বিরুদ্ধ রীতির মধ্য দিয়েও, আপন লেখা আপন মতে গড়ে তুলেছিলেম।

সেদিনকার খ্যাতিহীনতার স্নিগ্ধ প্রথম প্রহর কেটে গেল। প্রকৃতির শুশ্রূষা ও আত্মীয়দের স্নেহের ঘনচ্ছায়ায় ছিলেম বসে। কখনো কাটিয়েছি তেতালার ছাদের প্রান্তে কর্মহীন অবকাশে মনে মনে আকাশকুসুমের মালা গেঁথে, কখনো গাজিপুরের বৃদ্ধ নিমগাছের তলায় বসে ইঁদারার জলে বাগান সেঁচ দেবার করুণধ্বনি শুনতে শুনতে অদূর গঙ্গার স্রোতে কল্পনাকে অহৈতুক বেদনায় বোঝাই করে দূরে ভাসিয়ে দিয়ে। নিজের মনের আলো-আঁধারের মধ্যে থেকে হঠাৎ পরের মনের কনুইয়ের ধাক্কা খাবার জন্যে বড়ো রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হবে এমন কথা সেদিন ভাবিও নি। অবশেষে একদিন খ্যাতি এসে অনাবৃত মধ্যাহ্নরৌদ্রে টেনে বের করলে। তাপ ক্রমেই বেড়ে উঠল, আমার কোণের আশ্রয় একেবারে ভেঙে গেল। খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে গ্লানি এসে পড়ে আমার ভাগ্যে অন্যদের চেয়ে তা অনেক বেশি আবিল হয়ে উঠেছিল। এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর কোনো সাহিত্যিককেই সইতে হয় নি। এও আমার খ্যাতি-পরিমাপের বৃহৎ মাপকাঠি। এ কথা বলবার সুযোগ পেয়েছি যে, প্রতিকূল পরীক্ষায় ভাগ্য আমাকে লাঞ্ছিত করেছে, কিন্তু পরাভবের অগৌরবে লজ্জিত করে নি। এ ছাড়া আমার দুর্গ্রহ কালো বর্ণের এই যে পটটি ঝুলিয়েছেন এরই উপরে আমার বন্ধুদের সুপ্রসন্ন মুখ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁদের সংখ্যা অল্প নয়, সে কথা বুঝতে পারি আজকের এই অনুষ্ঠানেই। বন্ধুদের কাউকে জানি, অনেককেই জানি নে। তাঁরাই কেউ কাছে থেকে কেউ দূরে থেকে এই উৎসবে মিলিত হয়েছেন, সেই উৎসাহে আমার মন আনন্দিত। আজ আমার মনে হচ্ছে তাঁরা আমাকে জাহাজে তুলে দিতে ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছেন— আমার খেয়াতরী পাড়ি দেবে দিবালোকের পরপারে তাঁদের মঙ্গলধ্বনি কানে নিয়ে।

আমার কর্মপথের যাত্রা সত্তর বছরের গোধূলিবেলায় একটা উপসংহারে এসে পেঁছিল। আলো ম্লান হবার শেষ মুহূর্তে এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের দ্বারা দেশ আমার দীর্ঘজীবনের মূল্য স্বীকার করবেন।

ফসল যতদিন মাঠে ততদিন সংশয় থেকে যায়। বুদ্ধিমান মহাজন খেতের দিকে তাকিয়েই আগাম দাদন দিতে দ্বিধা করে, অনেকটা হাতে রেখে দেয়। যখন গোলায় উঠল তখনই ওজন বুঝে দামের কথা পাকা হতে পারে। আজ আমার বুঝি সেই ফলন-শেষের হিসাব চুকিয়ে দেবার দিন।

যে মানুষ অনেক কাল বেঁচে আছে সে অতীতেরই শামিল। বুঝতে পারছি,

আমার সাবেক বর্তমান এই হাল বর্তমান থেকে বেশ খানিকটা তফাতে। যে-সব কবি পালা শেষ করে লোকান্তরে তাঁদেরই আঙিনার কাছটায় আমি এসে দাঁড়িয়েছি, তিরোভাবের ঠিক পূর্ব-সীমানায়। বর্তমানের চলতি রথের বেগের মুখে কাউকে দেখে নেবার যে অস্পষ্টতা সেটা আমার বেলা এতদিনে কেটে যাবার কথা। যতখানি দূরে এলে কল্পনার ক্যামেরায় মানুষের জীবনটাকে সমগ্রলক্ষবদ্ধ করা যায় আধুনিকের পুরোভাগ থেকে আমি ততটা দূরেই এসেছি।

পঞ্চাশের পরে বানপ্রস্থের প্রস্তাব মনু করেছেন। তার কারণ মনুর হিসাবমত পঞ্চাশের পরে মানুষ বর্তমানের থেকে পিছিয়ে পড়ে। তখন কোমর বেঁধে ধাবমান কালের সঙ্গে সমান ঝোঁকে পা ফেলে চলার বেগে যতটা ক্লান্তি ততটা সফলতা থাকে না, যতটা ক্ষয় ততটা পূরণ হয় না। অতএব তখন থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে সেই সর্বকালের মোহানার দিকে যাত্রা করতে হবে যেখানে কাল স্তব্ধ। গতির সাধনা শেষ করে তখন স্থিতির সাধনা।

মনু যে মেয়াদ ঠিক করে দিয়েছেন এখন সেটাকে ঘড়ি ধরে খাটানো প্রায় অসাধ্য। মনুর যুগে নিশ্চয়ই জীবনে এত দায় ছিল না, তার গ্রন্থি ছিল কম। এখন শিক্ষা বল, কর্ম বল, এমন-কি আমোদপ্রমোদ খেলাধুলো, সমস্তই বহুব্যাপক। তখনকার সম্রাটেরও রথ যত বড়ো যত জমকালো হোক, এখনকার রেলগাড়ির মতো তাতে বহু গাড়ির এমন দ্বন্দ্বসমাস ছিল না। এই গাড়ির মাল খালাস করতে বেশ একটু সময় লাগে। পাঁচটায় আপিসে ছুটি শাস্ত্রনির্দিষ্ট বটে, কিন্তু খাতাপত্র বন্ধ করে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বাড়িমুখো হবার আগেই বাতি জ্বালতে হয়। আমাদের সেই দশা। তাই পঞ্চাশের মেয়াদ বাড়িয়ে না নিলে ছুটি মঞ্জুর অসম্ভব। কিন্তু সত্তরের কোঠায় পড়লে আর ওজর চলে না। বাইরের লক্ষণে বুঝতে পারছি, আমার সময় চলল আমাকে ছাড়িয়ে—কম করে ধরলেও অন্তত দশ বছর আগেকার তারিখে আমি বসে আছি। দূরের নক্ষত্রের আলোর মতো, অর্থাৎ সে যখনকার সে তখনকার নয়।

তবু একেবারে থামবার আগে চলার ঝোঁকে অতীত কালের খানিকটা ধাক্কা এসে পড়ে বর্তমানের উপরে। গান সমস্তটাই শমে এসে পৌঁছলে তার সমাপ্তি; তবু আরো কিছুক্ষণ ফরমাশ চলে পাল্টিয়ে গাবার জন্যে। সেটা অতীতেরই পুনরাবৃত্তি। এর পরে বড়োজোর দুটো-একটা তান লাগানো চলে, কিন্তু চুপ করে গেলেও লোকসান নেই। পুনরাবৃত্তিকে দীর্ঘকাল তাজা রাখবার চেষ্টাও যা আর কইমাছটাকে ডাঙায় তুলে মাসখানেক বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টাও তাই।

এই মাছটার সঙ্গে কবির তুলনা আরো একটু এগিয়ে নেওয়া যাক। মাছ যতক্ষণ জলে আছে ওকে কিছু কিছু খোরাক জোগানো সৎকর্ম, সেটা মাছের নিজের প্রয়োজনে। পরে যখন তাকে ডাঙায় তোলা হল তখন প্রয়োজনটা তার নয়, অপর কোনো জীবের। তেমনি কবি যতদিন না একটা স্পষ্ট পরিণতিতে পৌঁছয় ততদিন তাকে কিছু কিছু উৎসাহ দিতে পারলে ভালোই—সেটা কবির নিজেরই প্রয়োজনে। তার পরে তার পূর্ণতায় যখন একটা সমাপ্তির যতি আসে তখন তার সম্বন্ধে যদি কোনো প্রয়োজন থাকে সেটা তার নিজের নয়, প্রয়োজন তার দেশের।

দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটাব ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে। প্রশ্ন উঠবে প্রাকৃতিক দান তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হল। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারীবীজে, শস্যের জমি

যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্যকথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি।

তাই দেশ নিজের সত্তা প্রমাণেরই খাতিরে অহরহ তাকিয়ে আছে তাদেরই জন্যে যারা কোনো সাধনায় সার্থক। তারা না থাকলেও গাছপালা জীবজন্তু জন্মায়, বৃষ্টি পড়ে, নদী চলে, কিন্তু দেশ আচ্ছন্ন থাকে মরুবালুতলে ভূমির মতো।

এই কারণেই দেশ যার মধ্যে আপন ভাষাবান্ প্রকাশ অনুভব করে তাকে সর্বজন-সমক্ষে নিজের ব'লে চিহ্নিত করবার উপলক্ষ রচনা করতে চায়। যেদিন তাই করে, যেদিন কোনো মানুষকে আনন্দের সঙ্গে সে অঙ্গীকার করে, সেদিনই মাটির কোল থেকে দেশের কোলে সেই মানুষের জন্ম।

আমার জীবনের সমাপ্তিদশায় এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের যদি কোনো সত্য থাকে তবে তা এই তাৎপর্য নিয়ে। আমাকে গ্রহণ করার দ্বারা দেশ যদি কোনো ভাবে নিজেকে লাভ না করে থাকে তবে আজকের এই উৎসব অর্থহীন। যদি কেউ এ কথায় অহংকারের আশঙ্কা ক'রে আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হন তবে তাঁদের উদ্বেগ অনাবশ্যক। যে খ্যাতির সম্বল অল্প তার সমারোহ যতই বেশি হয়, ততই তার দেউলে হওয়া দ্রুত ঘটে। ভুল মস্ত হয়েই দেখা দেয়, চুকে যায় অতি ক্ষুদ্র হয়ে। আতশ-বাজির অভ্রভেদী আলোটাই তার নির্বাণের উজ্জ্বল তর্জনীসংকেত।

এ কথায় সন্দেহ নেই যে, পুরস্কারের পাত্র-নির্বাচনে দেশ ভুল করতে পারে। সাহিত্যের ইতিহাসে ক্ষণমুখরা খ্যাতির মৌনসাধন বার বার দেখা গেছে। তাই আজকের দিনের আয়োজনে আজই অতিশয় উল্লাস যেন না করি, এই উপদেশের বিরুদ্ধে যুক্তি চলে না। তেমনি তা নিয়ে এখনই তাড়াতাড়ি বিমর্ষ হবারও আশু কারণ দেখি না। কালে কালে সাহিত্যবিচারের রায় একবার উলটিয়ে আবার পালটিয়েও থাকে। অব্যবস্থিতচিত্ত মন্দগতি কালের সবশেষ বিচারে আমার ভাগ্যে যদি নিঃশেষে ফাঁকিই থাকে তবে এখনই আগাম শোচনা করতে বসা কিছু নয়। এখনকার মতো এই উপস্থিত অনুষ্ঠানটাই নগদ লাভ। তার পরে চরম জবাবদিহির জন্যে প্রপৌত্রেরা রইলেন। আপাতত বন্ধুদের নিয়ে আশ্বস্তচিত্তে আনন্দ করা যাক, অপর পক্ষে যাঁদের অভিরুচি হয় তাঁরা ফুৎকারে বুদ্বুদ বিদীর্ণ করার উৎসাহে আনন্দ করতে পারেন। এই দুই বিপরীত ভাবের কালোয় সাদায় সংসারের আনন্দধারায় যমের ভগ্নী যমুনা ও শিব-জটানিঃসৃতা গঙ্গা মিলে থাকে। ময়ূর আপন পুচ্ছগর্বে নৃত্য করে খুশি, আবার শিকারি আপন লক্ষ্যবেধগর্বে তাকে গুলি করে মহা আনন্দিত।

আধুনিক কালে পাশ্চাত্ত্য দেশে সাহিত্যে কলাসৃষ্টিতে লোকচিত্তের সম্মতি অতি ঘন ঘন বদল হয়, এটা দেখা যাচ্ছে। বেগ বেড়ে চলেছে মানুষের যানে-বাহনে, বেগ অবিশ্রাম ঠেলা দিচ্ছে মানুষের মনপ্রাণকে।

যেখানে বৈষয়িক প্রতিযোগিতা উগ্র সেখানে এই বেগের মূল্য বেশি। ভাগ্যের হরির লুট নিয়ে হাটের ভিড়ে ধুলার 'পরে যেখানে সকলে মিলে কাড়াকাড়ি, সেখানে যে মানুষ বেগে জেতে মালেও তার জিত। তৃপ্তিহীন লোভের বাহন বিরামহীন বেগ। সমস্ত পশ্চিম মাতালের মতো টলমল করছে সেই লোভে। সেখানে বেগবৃদ্ধি ক্রমে লাভের উপলক্ষ না হয়ে স্বয়ং লক্ষ্য হয়ে উঠছে। বেগেরই লোভ আজ জলে স্থলে আকাশে হিস্টিরিয়ায় চীৎকার করতে করতে ছুটে বেরোল।

কিন্তু প্রাণপদার্থ তো বাষ্পবিদ্যুতের-ভূতে-তাড়া-করা লোহার এঞ্জিন নয়। তার একটি আপন ছন্দ আছে। সেই ছন্দে দুই-এক মাত্রা টান সয়, তার বেশি নয়। মিনিট কয়েক ডিগবাজি খেয়ে চলা সাধ্য হতে পারে, কিন্তু দশ মিনিট যেতে-না-যেতে প্রমাণ হবে যে মানুষ বাইসিকেলের চাকা নয়, তার পদাতিকের চাল পদাবলীর ছন্দে। গানের

লয় মিষ্টি লাগে যখন সে কানের সজীব ছন্দ মেনে চলে। তাকে দুন থেকে চৌদুনে চড়ালে সে কলাদেহ ছেড়ে কৌশলদেহ নেবার জন্যই হাঁসফাঁস করতে থাকে। তাগিদ যদি আরো বাড়াও তা হলে রাগিণীটা পাগলা-গারদের সদর গেটের উপর মাথা ঠুকে মারা যাবে। সজীব চোখ তো ক্যামেরা নয়, ভালো করে দেখে নিতে সে সময় নেয়। ঘণ্টায় বিশ-পঁচিশ মাইল দৌড়ের দেখা তার পক্ষে কুয়াশা দেখা। একদা তীর্থযাত্রা বলে একটা সজীব পদার্থ আমাদের দেশে ছিল, ভ্রমণের পূর্ণস্বাদ নিয়ে সেটা সম্পন্ন হত। কলের গাড়ির আমলে তীর্থ রইল, যাত্রা রইল না; ভ্রমণ নেই, পৌঁছনো আছে— শিক্ষাটা বাদ দিয়ে পরীক্ষাটা পাস করা যাকে বলে। রেল-কোম্পানির কারখানায় কলে-ঠাসা তীর্থযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন দামের বটিকা সাজানো, গিলে ফেললেই হল— কিন্তু হলই না যে, সে কথা বোঝবারও ফুরসত নেই। কালিদাসের যক্ষ যদি মেঘদূতকে বরখাস্ত করে দিয়ে এরোপ্লেন-দূতকে অলকায় পাঠাতেন তা হলে অমন দুই-সর্গ-ভরা মন্দাক্রান্তা ছন্দ দু-চারটে শ্লোক পার না হতেই অপঘাতে মরত। কলে-ঠাসা বিরহ তো আজ পর্যন্ত বাজারে নামে নি।

মেঘদূতের শোকাবহ পরিণামে শোক করবে না এমনতরো বলবান পুরুষ আজকাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন, এখন কবিতার যে আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে সে নাভিশ্বাসের আওয়াজ। ওর সময় হয়ে এল। যদি তা সত্য হয় তবে সেটা কবিতার দোষে নয়, সময়ের দোষে। মানুষের প্রাণটা চিরদিনই ছন্দে-বাঁধা, কিন্তু তার কালটা কলের তাড়ায় সম্প্রতি ছন্দ-ভাঙা।

আঙুরের খেতে চাষি কাঠি পুঁতে দেয়; তারই উপর আঙুর লতিয়ে উঠে আশ্রয় পায়, ফল ধরায়। তেমনি জীবনযাত্রাকে সবল ও সফল করবার জন্যে কতকগুলি রীতি-নীতি বেঁধে দিতে হয়। এই রীতিনীতির অনেকগুলিই নির্জীব নীরস, উপদেশ অনুশাসনের খুঁটি। কিন্তু বেড়ায় লাগানো জিয়লকাঠের খুঁটি যেমন রস পেলেই বেঁচে ওঠে, তেমনি জীবনযাত্রা যখন প্রাণের ছন্দে শান্তগমনে চলে তখন শুকনো খুঁটিগুলো অন্তরের গভীরে পৌঁছবার অবকাশ পেয়ে ক্রমেই প্রাণ পেতে থাকে। সেই গভীরেই সঞ্জীবনরস। সেই রসে তত্ত্ব ও নীতির মতো পদার্থও হৃদয়ের আপন সামগ্রীরূপে সজীব ও সজ্জিত হয়ে ওঠে, মানুষের আনন্দের রঙ তাতে লাগে। এই আনন্দের প্রকাশের মধ্যেই চিরন্তনতা। একদিনের নীতিকে আর-একদিন আমরা গ্রহণ নাও করতে পারি, কিন্তু সেই নীতি যে প্রীতিকে, যে সৌন্দর্যকে, আনন্দের সত্য ভাষায় প্রকাশ করেছে সে আমাদের কাছে নূতন থাকবে। আজও নূতন আছে মোগল সাম্রাজ্যের শিল্প—সেই সাম্রাজ্যকে, তার সাম্রাজ্যনীতিকে আমরা পছন্দ করি আর না করি।

কিন্তু যে যুগে দলে দলে গরজের তাড়ায় অবকাশ ঠাসা হয়ে নিরেট হয়ে যায় সে যুগ প্রয়োজনের, সে যুগ প্রীতির নয়। প্রীতি সময় নেয় গভীর হতে। আধুনিক এই ত্বরা-তাড়িত যুগে প্রয়োজনের তাগিদ কচুরিপানার মতোই সাহিত্যধারার মধ্যেও ভূরি ভূরি ঢুকে পড়েছে। তারা বাস করতে আসে না, সমস্যাসমাধানের দরখাস্ত হাতে ধন্না দিয়ে পড়ে। সে দরখাস্ত যতই অলংকৃত হোক তবু সে খাঁটি সাহিত্য নয়, সে দরখাস্তই। দাবি মিটলেই তার অন্তর্ধান।

এমন অবস্থায় সাহিত্যের হাওয়াবদল হয় এ-বেলা ও-বেলা। কোথাও আপন দরদ রেখে যায় না। পিছনটাকে লাথি মেরেই চলে, যাকে উঁচু করে গড়েছিল তাকে ধূলিসাৎ করে তার 'পরে অট্টহাসি। আমাদের মেয়েদের পাড়ওআলা শাড়ি, তাদের নীলাম্বরী, তাদের বেনারসি চেলি মোটের উপর দীর্ঘকাল বদল হয় নি; কেননা ওরা আমাদের অন্তরের অনুরাগকে আঁকড়ে আছে। দেখে আমাদের চোখের ক্লান্তি হয় না। হত ক্লান্তি, মনটা যদি রসিয়ে দেখবার উপযুক্ত সময় না পেয়ে বেদরদি ও অশ্রদ্ধাপরায়ণ

হয়ে উঠত। হৃদয়হীন অগভীর বিলাসের আয়োজনে অকারণে অনায়াসে ঘন ঘন ফ্যাশনের বদল। এখনকার সাহিত্যে তেমনি রীতির বদল। হৃদয়টা দৌড়তে দৌড়তে প্রীতিসম্বন্ধের রাখী গাঁথতে ও পরাতে পারে না। যদি সময় পেত সুন্দর করে বিনিয়ে বিনিয়ে গাঁথত। এখন ওকে ব্যস্ত লোকেরা ধমক দিয়ে বলে, রেখে দাও তোমার সুন্দর। সুন্দর পুরোনো, সুন্দর সেকেলে। আনো একটা যেমন-তেমন করে পাক-দেওয়া শণের দড়ি—সেটাকে বলব রিয়ালিজ্‌ম্‌। এখনকার দুদ্দাড়-দৌড়-ওআলা লোকের ওইটেই পছন্দ। স্বল্পায়ু ফ্যাশন হঠাৎ-নবাবের মতো উদ্ধত—তার প্রধান অহংকার এই যে, সে অধুনাতন; অর্থাৎ, তার বড়াই গুণ নিয়ে নয়, কাল নিয়ে।

বেগের এই মোটর-কলটা পশ্চিমদেশের মর্মস্থানে। ওটা এখনো পাকা দলিলে আমাদের নিজস্ব হয় নি। তবু আমাদেরও দৌড় আরম্ভ হল। ওদেরই হাওয়া-গাড়ির পায়দানের উপর লাফ দিয়ে আমরা উঠে পড়েছি। আমরাও খর্বকৌশিনী খর্ববেশিনী সাহিত্যকীর্তির টেক্‌নিকের হাল ফ্যাশন নিয়ে গম্ভীরভাবে আলোচনা করি, আমরাও অধুনাতনের স্পর্ধা নিয়ে পুরাতনের মানহানি করতে অত্যন্ত খুশি হই।

এই-সব চিন্তা করেই বলেছিলুম, আমার এ বয়সে খ্যাতিকে আমি বিশ্বাস করি নে। এই মায়ামৃগীর শিকারে বনে-বাদাড়ে ছুটে বেড়ানো যৌবনেই সাজে। কেননা, সে বয়সে মৃগ যদি বা না'ও মেলে, মৃগয়াটাই যথেষ্ট। ফুল থেকে ফল হতেও পারে, না হতেও পারে, তবু আপন স্বভাবকেই চাঞ্চল্যে সার্থক করতে হয় ফুলকে। সে অশান্ত, বাইরের দিকেই তার বর্ণগন্ধের নিত্য উদ্যম। ফলের কাজ অন্তরে, তার স্বভাবের প্রয়োজন অপ্রগল্‌ভ শান্তি। শাখা থেকে মুক্তির জন্যেই তার সাধনা—সেই মুক্তি নিজেরই আন্তরিক পরিণতির যোগে।

আমার জীবনে আজ সেই ফলেরই ঋতু এসেছে, যে ফল আশু বৃন্তচ্যুতির অপেক্ষা করে। এই ঋতুটির সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে হলে বাহিরের সঙ্গে অন্তরের শান্তি-স্থাপন চাই। সেই শান্তি খ্যাতি-অখ্যাতির দ্বন্দ্বের মধ্যে বিধ্বস্ত হয়।

খ্যাতির কথা থাক্‌। ওটার অনেকখানিই অবাস্তবের বাষ্পে পরিস্ফীত। তার সংকোচন-প্রসারণ নিয়ে যে মানুষ অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হতে থাকে সে অভিশপ্ত। ভাগ্যের পরম দান প্রীতি, কবির পক্ষে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাই। যে মানুষ কাজ দিয়ে থাকে খ্যাতি দিয়ে তার বেতন শোধ চলে, আনন্দ দেওয়াই যার কাজ প্রীতি না হলে তার প্রাপ্য শোধ হয় না।

অনেক কীর্তি আছে যা মানুষকেই উপকরণ করে গড়ে তোলা, যেমন রাষ্ট্র। কর্মের বল সেখানে জনসংখ্যায়, তাই সেখানে মানুষকে দলে টানা নিয়ে কেবলই দ্বন্দ্ব চলে। বিস্তারিত খ্যাতির বেড়াজাল ফেলে মানুষ ধরা নিয়ে ব্যাপার। মনে করো, লয়েড জর্জ্‌। তাঁর বুদ্ধিকে তাঁর শক্তিকে অনেক লোকে যখন মানে তখনই তাঁর কাজ চলে। বিশ্বাস আলগা হলে বেড়াজাল গেল ছিঁড়ে, মানুষ-উপকরণ পুরোপুরি জোটে না।

অপর পক্ষে, কবির সৃষ্টি যদি সত্য হয়ে থাকে সেই সত্যের গৌরব সেই সৃষ্টির নিজেরই মধ্যে, দশজনের সম্মতির মধ্যে নয়। দশজনে তাকে স্বীকার করে নি এমন প্রায়ই ঘটে থাকে। তাতে বাজারদরের ক্ষতি হয়, কিন্তু সত্য মূল্যের কমতি হয় না।

ফুল ফুটেছে, এইটেই ফুলের চরম কথা। যার ভালো লাগল সেই জিতল, ফুলের জিত তার আপন আবির্ভাবেই। সুন্দরের অন্তরে আছে একটি রসময় রহস্যময় আত্মন্তের অতীত সত্য, আমাদের অন্তরেরই সঙ্গে তার অনির্বচনীয় সম্বন্ধ। তার সম্পর্কে আমাদের আত্মচেতনা হয় মধুর, গভীর, উজ্জ্বল। আমাদের ভিতরের

মানুষ বেড়ে ওঠে, রঙিয়ে ওঠে, রসিয়ে ওঠে। আমাদের সত্তা যেন তার সঙ্গে রঙে রসে মিলে যায়—একেই বলে অনুরাগ।

কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্‌বোধিত করা। সেই কবিকেই মানুষ বড়ো বলে, যে এমন-সকল বিষয়ে মানুষের চিত্তকে আশ্লিষ্ট করেছে যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর। কলা ও সাহিত্যের ভান্ডারে দেশে দেশে কালে কালে মানুষের অনুরাগের সম্পদ রচিত ও সঞ্চিত হয়ে উঠছে। এই বিশাল ভুবনে বিশেষ দেশের মানুষ বিশেষ কাকে ভালোবেসেছে সে তার সাহিত্য দেখলেই বুঝতে পারি। এই ভালোবাসার দ্বারাই তো মানুষকে বিচার করা।

বীণাপাণির বীণায় তার অনেক। কোনোটা সোনার, কোনোটা তামার, কোনোটা ইস্পাতের। সংসারের কণ্ঠে হালকা ও ভারী, আনন্দের ও প্রমোদের যত রকমের সুর আছে সবই তাঁর বীণায় বাজে। কবির কাব্যেও সুরের অসংখ্য বৈচিত্র্য। সবই যে উদাত্ত ধ্বনির হওয়া চাই এমন কথা বলি নে। কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকা চাই যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে যা অনুরাগকেই বীর্যবান ও বিশুদ্ধ করে। ভর্তৃহরির কাব্যে দেখি ভোগের মানুষ আপন সুর পেয়েছে, কিন্তু সেইসঙ্গেই কাব্যের গভীরের মধ্যে বসে আছে ত্যাগের মানুষ আপন একতারা নিয়ে—এই দুই সুরের সমবায়েই রসের ওজন ঠিক থাকে, কাব্যেও, মানব-জীবনেও। দূরকাল ও বহুজনকে যে সম্পদ দান করার দ্বারা সাহিত্য স্থায়ীভাবে সার্থক হয়, কাগজের নৌকোয় বা মাটির গামলায় তো তার বোঝাই সইবে না। আধুনিক-কাল-বিলাসীরা অবজ্ঞার সঙ্গে বলতে পারেন এ-সব কথা আধুনিক কালের বুলির সঙ্গে মিলছে না—তা যদি হয় তা হলে সেই আধুনিক কালটারই জন্যে পরিতাপ করতে হবে। আশ্বাসের কথা এই যে, সে চিরকালই আধুনিক থাকবে এত আয়ু তার নয়।

কবি যদি ক্লান্ত মনে এমন কথা মনে করে যে, কবিত্বের চিরকালের বিষয়গুলি আধুনিক কালে পুরোনো হয়ে গেছে তা হলে বুঝব আধুনিক কালটাই হয়েছে বৃদ্ধ ও রসহীন। চিরপরিচিত জগতে তার সহজ অনুরাগের রস পৌঁচচ্ছে না, তাই জগৎটাকে আপনার মধ্যে নিতে পারল না। যে কল্পনা নিজের চারি দিকে আর রস পায় না, সে যে কোনো চেষ্টাকৃত রচনাকেই দীর্ঘকাল সরস রাখতে পারবে এমন আশা করা বিড়ম্বনা। রসনায় যার রুচি মরেছে চিরদিনের অন্নে সে তৃপ্তি পায় না, সেই একই কারণে কোনো একটা আজগবি অন্নেও সে চিরদিন রস পাবে এমন সম্ভাবনা নেই।

আজ সত্তর বছর বয়সে সাধারণের কাছে আমার পরিচয় একটা পরিণামে এসেছে। তাই আশা করি, যাঁরা আমাকে জানবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেছেন এতদিনে অন্তত তাঁরা এ কথা জেনেছেন যে, আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করি নি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না। বিস্ময়ের অন্ত পাই নি। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদিকালের যে অনাহত বাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত তাতে আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েছে, মনে হয়েছে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম। সৌরমন্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের ছোটো শ্যামলা পৃথিবীকে ঋতুর আকাশ-দূতগুলি বিচিত্র রসের বর্ণসজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে যায়, এই আদরের অনুষ্ঠানে আমার হৃদয়ের অভিষেকবারি নিয়ে যোগ দিতে কোনোদিন আলস্য করি নি। প্রতিদিন উষা-কালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্যে যে, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। আমি সেই বিরাট সত্তাকে আমার অনুভবে

স্পর্শ করতে চেয়েছি যিনি সকল সত্তার আত্মীয়সম্বন্ধের ঐক্যতত্ত্ব; যাঁর খুশিতেই নিরন্তর অসংখ্যরূপের প্রকাশে বিচিত্রভাবে আমার প্রাণ খুশি হয়ে উঠছে—বলে উঠছে—ক্যোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ; যাতে কোনো প্রয়োজন নেই তাও আনন্দের টানে টানবে, এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারের চরম অর্থ যাঁর মধ্যে; যিনি অন্তরে অন্তরে মানুষকে পরিপূর্ণ করে বিদ্যমান ব'লেই প্রাণপণ কঠোর আত্মত্যাগকে আমরা আত্মঘাতী পাগলের পাগলামি বলে হেসে উঠলুম না।

ঈশোপনিষদের প্রথম যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন সেই মন্ত্রটি বার বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বার বার নিজেকে বলেছি—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ। আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে—যা রয়েছে তোমার চার দিকে তারই মধ্যে চিরন্তন—লোভ কোরো না। কাব্যসাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য। আসক্তি যাকে মাকড়সার মতো জালে জড়ায় তাকে জীর্ণ করে দেয়; তাতে গ্লানি আসে, ক্লান্তি আনে। কেননা, আসক্তি তাকে সমগ্র থেকে উৎপাটন করে নিজের সীমার মধ্যে বাঁধে—তার পরে তোলা ফুলের মতো অল্পক্ষণেই সে ম্লান হয়। মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, সৌন্দর্যকে আসক্তি থেকে, চিত্তকে উপস্থিত গরজের দণ্ডধারীদের কাছ থেকে। রাবণের ঘরে সীতা লোভের দ্বারা বন্দী; রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত, সেখানেই তাঁর সত্য প্রকাশ। প্রেমের কাছে দেহের অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়, লোভের কাছে তার স্থূল মাংস।

অনেক দিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নানা পর্বে নানা অবস্থায়। শুরু করেছি কাঁচা বয়সে—তখনো নিজেকে বুঝি নি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য সেই মহা-মানবের মধ্যে যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। আমি আবাল্য-অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্যসাধনার গণ্ডিকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি—তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।

আমার যা-কিছু অকিঞ্চিৎকর তাকে অতিক্রম করেও যদি আমার চরিত্রের অন্তরতম প্রকৃতি ও সাধনা লেখায় প্রকাশ পেয়ে থাকে, আনন্দ দিয়ে থাকে, তবে তার পরিবর্তে আমি প্রীতি কামনা করি, আর কিছু নয়। এ কথা যেন জেনে যাই, অকৃত্রিম সৌহার্দ্য পেয়েছি সেই তাঁদের কাছে যাঁরা আমার সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও জেনেছেন সমস্ত জীবন আমি কী চেয়েছি, কী পেয়েছি, কী দিয়েছি, আমার অপূর্ণ জীবনে অসমাপ্ত সাধনায় কী ইঙ্গিত আছে।

সাহিত্যে মানুষের অনুরাগসম্পদ সৃষ্টি করাই যদি কবির যথার্থ কাজ হয়, তবে এই দান গ্রহণ করতে গেলে প্রীতিরই প্রয়োজন। কেননা, প্রীতিই সমগ্র করে দেখে। আজ পর্যন্ত সাহিত্যে যাঁরা সম্মান পেয়েছেন তাঁদের রচনাকে আমরা সমগ্রভাবে দেখেই শ্রদ্ধা অনুভব করি। তাকে টুকরো টুকরো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছিদ্রসন্ধান বা ছিদ্রখনন করতে স্বভাবত প্রবৃত্তি হয় না। জগতে আজ পর্যন্ত অতিবড়ো সাহিত্যিক এমন

কেউ জন্মান নি, অনুরাগবঞ্চিত পরুষ চিত্ত নিয়ে যাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাকেও বিদ্রূপ করা, তার কদর্থ করা, তার প্রতি অশোভন মুখবিকৃতি করা, যে-কোনো মানুষ না পারে। প্রীতির প্রসন্নতাই সেই সহজ ভূমিকা, যার উপরে কবির সৃষ্টি সমগ্র হয়ে সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশমান হয়।

মর্ত্যলোকের শ্রেষ্ঠ দান এই প্রীতি আমি পেয়েছি এ কথা প্রণামের সঙ্গে বলি। পেয়েছি পৃথিবীর অনেক বরণীয়দের হাত থেকে— তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা নয়, আমার হৃদয় নিবেদন করে দিয়ে গেলেম। তাঁদের দক্ষিণ হাতের স্পর্শে বিরাট মানবেরই স্পর্শ লেগেছে আমার ললাটে; আমার যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা তাঁদের গ্রহণের যোগ্য হোক।

আর আমার স্বদেশের লোক যাঁরা অতিনিকটের অতিপরিচয়ের অস্পষ্টতা ভেদ করেও আমাকে ভালোবাসতে পেরেছেন আজ এই অনুষ্ঠানে তাঁদেরই বহুযত্নরচিত অর্ঘ্য সজ্জিত। তাঁদের সেই ভালোবাসা হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করি।

পৌষ ১৩৩৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-জয়ন্তী (১১ পৌষ ১৩৩৮) অনুষ্ঠানের জন্য লিখিত এবং পুস্তিকাকারে 'প্রতিভাষণ' নামে মুদ্রিত। এই সংক্ষেপীকৃত রূপ বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রচনাবলীতে ব্যবহৃত।

সন্ধ্যাসংগীত

সূচনা

এই গ্রন্থাবলীতে আমার কাব্যরচনার প্রথম পরিচয় নিয়ে দেখা দিয়েছে সন্ধ্যাসংগীত। তার পূর্বেও অনেক লিখেছি, কিন্তু সেগুলিকে লুপ্ত করবার চেষ্টা করেছি অনাদরে। হাতের অক্ষর পাকাবার যে খাতা ছিল বাল্যকালে সেগুলিকে যেমন অনাদরে রাখি নি, এও তেমনি। সেগুলি ছিল যাকে বলে কপিবুক, বাইরে থেকে মডেল লেখা নকল করবার সাধনায়। কাঁচা বয়সে পরের লেখা মক্‌শ করে আমরা অক্ষর ফেঁদে থাকি বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার মধ্যেও নিজের স্বাভাবিক ছাঁদ একটা প্রকাশ হতে থাকে। অবশেষে পরিণতিক্রমে সেইটেই বাইরের নকল খোলসটাকে বিদীর্ণ করে স্বরূপকে প্রকাশ করে দেয়। প্রথম বয়সের কবিতাগুলি সেইরকম কপিবুকের কবিতা।

সেই কপিবুক-যুগের চৌকাঠ পেরিয়েই প্রথম দেখা দিল সন্ধ্যাসংগীত। তাকে আমের বোলের সঙ্গে তুলনা করব না, করব কচি আমের গুটির সঙ্গে, অর্থাৎ তাতে তার আপন চেহারাটা সবে দেখা দিয়েছে শ্যামল রঙে। রস ধরে নি, তাই তার দাম কম। কিন্তু সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। অতএব সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে। সে সময়কার অন্য সমস্ত কবিতা থেকে আপন ছন্দের বিশেষ সাজ প'রে এসেছিল। সে সাজ বাজারে চলিত ছিল না।

সন্ধ্যা

অয়ি সন্ধ্যে,
অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী,
কেশ এলাইয়া
মৃদু মৃদু ও কী কথা   কহিস আপন মনে
গান গেয়ে গেয়ে,
নিখিলের মুখপানে চেয়ে।
প্রতিদিন শুনিয়াছি,   আজও তোর কথা
নারিনু বুঝিতে।
প্রতিদিন শুনিয়াছি,   আজও তোর গান
নারিনু শিখিতে।
চোখে লাগে ঘুমঘোর,
প্রাণ শুধু ভাবে হয় ভোর।
হৃদয়ের অতিদূর দূর দূরান্তরে
মিলাইয়া কণ্ঠস্বর তোর কণ্ঠস্বরে
উদাসী প্রবাসী যেন
তোর সাথে তোরি গান করে।

অয়ি সন্ধ্যা, তোরি যেন স্বদেশের প্রতিবেশী
তোরি যেন আপনার ভাই
প্রাণের প্রবাসে মোর দিশা হারাইয়া
বেড়ায় সদাই।
শোনে যেন স্বদেশের গান,
দূর হতে কার পায় সাড়া
খুলে দেয় প্রাণ।
যেন কী পুরানো স্মৃতি
জাগিয়া উঠে রে ওই গানে।
ওই তারকার মাঝে   যেন তার গৃহ ছিল,
হাসিত কাঁদিত ওইখানে।
আর বার ফিরে যেতে চায়
পথ তবু খুঁজিয়া না পায়।
কত না পুরানো কথা,   কত না হারানো গান,
কত না প্রাণের দীর্ঘশ্বাস,
শরমের আধো হাসি,   সোহাগের আধো বাণী,
প্রণয়ের আধো মৃদু ভাষ,
সন্ধ্যা, তোর ওই অন্ধকারে
হারাইয়া গেছে একেবারে।
পূর্ণ করি অন্ধকার তোর
তারা সবে ভাসিয়া বেড়ায়

যুগান্তের প্রশান্ত হৃদয়ে
ভাঙাচোরা জগতের প্রায়।
যবে এই নদীতীরে বসি তোর পদতলে
তারা সবে দলে দলে আসে,
প্রাণেরে ঘেরিয়া চারি পাশে;
হয়তো একটি হাসি একটি আধেক হাসি
সমুখেতে ভাসিয়া বেড়ায়,
কভু ফোটে কভু বা মিলায়।

আজি আসিয়াছি সন্ধ্যা, বসি তোর অন্ধকারে
মুদিয়া নয়ান
সাধ গেছে গাহিবারে—মৃদু স্বরে শুনাবারে
দু-চারিটি গান।
যেথায় পুরানো গান যেথায় হারানো হাসি
যেথা আছে বিস্মৃত স্বপন
সেইখানে সযতনে রেখে দিস গানগুলি,
রচে দিস সমাধিশয়ন।
জানি সন্ধ্যা, জানি তোর স্নেহ,
গোপনে ঢাকিবি তার দেহ—
বসিয়া সমাধি-'পরে নিষ্ঠুরকৌতুকভরে
দেখিস হাসে না যেন কেহ।
ধীরে শুধু ঝরিবে শিশির,
মৃদু শ্বাস ফেলিবে সমীর।
স্তব্ধতা কপোলে হাত দিয়ে
একা সেথা রহিবে বসিয়া,
মাঝে মাঝে দু-একটি তারা
সেথা আসি পড়িবে খসিয়া।

গান আরম্ভ

চারি দিকে খেলিতেছে মেঘ,
বায়ু আসি করিছে চুম্বন—
সীমাহারা নভস্তল দুই বাহু পসারিয়া
হৃদয়ে করিছে আলিঙ্গন।

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার!
যবে আমি আসিব হেথায়
মন্ত্র পড়ি ডাকিব তোমায়।
বাতাসে উড়িবে তোর বাস,
ছড়ায়ে পড়িবে কেশপাশ,
ঈষৎ মেলিয়া আঁখি-পাতা
মৃদু হাসি পড়িবে ফুটিয়া—
হৃদয়ের মৃদুল কিরণ
অধরেতে পড়িবে লুটিয়া।
এলোথেলো কেশপাশ লয়ে
বসে বসে খেলিবি হেথায়,
উষার অলক দুলাইয়া
সমীরণ যেমন খেলায়।
চুমিয়া চুমিয়া ফুটাইব
আধফোটা হাসির কুসুম,
মুখ লয়ে বুকের মাঝারে
গান গেয়ে পাড়াইব ঘুম।
কৌতুকে করিয়া কোলাকুলি
আসিবে মেঘের শিশুগুলি,
ঘিরিয়া দাঁড়াবে তারা সবে
অবাক হইয়া চেয়ে রবে।

মেঘ হতে নেমে ধীরে ধীরে
আয় লো কবিতা, মোর বামে—
চম্পক-অঙ্গুলি দুটি দিয়ে
অন্ধকার ধীরে সরাইয়ে
যেমন করিয়া উষা নামে।

বায়ু হতে আয় লো কবিতা,
আসিয়া বসিবি মোর পাশে—

কে জানে বনের কোথা হতে
ভেসে ভেসে সমীরণস্রোতে
সৌরভ যেমন করে আসে।
হৃদয়ের অন্তঃপুর হতে
বধু মোর, ধীরে ধীরে আয়—
ভীরু প্রেম যেমন করিয়া
ধীরে উঠে হৃদয় ধরিয়া,
বঁধুর পায়ের কাছে গিয়ে
অমনি মুরছি পড়ে যায়।

অথবা শিথিল কলেবরে
এসো তুমি, বসো মোর পাশে—
মরণ যেমন করে আসে,
শিশির যেমন করে ঝরে,
পশ্চিমের আঁধারসাগরে
তারাটি যেমন করে যায়,
অতি ধীরে মৃদু হেসে সিঁদুর সীমন্তদেশে
দিবা সে যেমন করে আসে
মরিবারে স্বামীর চিতায়
পশ্চিমের জ্বলন্ত শিখায়।
পরবাসী ক্ষীণ-আয়ু একটি মুমূর্ষু বায়ু
শেষ কথা বলিতে বলিতে
তখনি যেমন মরে যায়
তেমনি, তেমনি করে এসো—
কবিতা রে, বধুটি আমার,
দুটি শুধু পড়িবে নিশ্বাস,
দুটি শুধু বাহিরিবে বাণী,
বাহু দুটি হৃদয়ে জড়ায়ে
মরমে রাখিবি মুখখানি।

তারকার আত্মহত্যা

জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে
ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা,
একেবারে উন্মাদের পারা।
চৌদিকে অসংখ্য তারা রহিল চাহিয়া
অবাক হইয়া—
এই-যে জ্যোতির বিন্দু আছিল তাদের মাঝে
মুহূর্তে সে গেল মিশাইয়া।
যে সমুদ্রতলে

মনোদুঃখে আত্মঘাতী
চির-নির্বাপিত-ভাতি
শত মৃত তারকার
মৃতদেহ রয়েছে শয়ান
সেথায় সে করেছে পয়ান।

কেন গো, কী হয়েছিল তার।
একবার শুধালে না কেহ—
কী লাগি সে তেয়াগিল দেহ।
যদি কেহ শুধাইত
আমি জানি কী যে সে কহিত।
যতদিন বেঁচে ছিল
আমি জানি কী তারে দহিত।
সে কেবল হাসির যন্ত্রণা,
আর কিছু না!
জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড ঢাকিতে আঁধার হৃদি
অনিবার হাসিতেই রহে,
যত হাসে ততই সে দহে।
তেমনি, তেমনি তারে হাসির অনল
দারুণ উজ্জ্বল—
দহিত, দহিত তারে, দহিত কেবল।
জ্যোতির্ময় তারাপূর্ণ বিজন তেয়াগি
তাই আজ ছুটেছে সে নিতান্ত মনের ক্লেশে
আঁধারের তারাহীন বিজনের লাগি।

কেন গো, তোমরা যত তারা
উপহাস করি তারে হাসিছ অমন ধারা।
তোমাদের হয় নি তো ক্ষতি,
যেমন আছিল আগে তেমনি রয়েছে জ্যোতি।
সে কি কভু ভেবেছিল মনে—
(এত গর্ব আছিল কি তার?)
আপনারে নিবাইয়া তোমাদের করিবে আঁধার।

গেল, গেল, ডুবে গেল, তারা এক ডুবে গেল,
আঁধার সাগরে—
গভীর নিশীথে
অতল আকাশে।
হৃদয়, হৃদয় মোর, সাধ কি রে যায় তোর
ঘুমাইতে ওই মৃত তারাটির পাশে
ওই আঁধার সাগরে
এই গভীর নিশীথে
ওই অতল আকাশে।

আশার নৈরাশ্য

ওরে আশা, কেন তোর হেন দীন বেশ!
নিরাশারই মতো যেন বিষণ্ণ বদন কেন—
যেন অতি সংগোপনে
যেন অতি সন্তর্পণে
অতি ভয়ে ভয়ে প্রাণে করিস প্রবেশ।
ফিরিবি কি প্রবেশিবি ভাবিয়া না পাস,
কেন, আশা, কেন তোর কিসের তরাস।
আজ আসিয়াছ দিতে যে সুখ-আশ্বাস,
নিজে তাহা কর না বিশ্বাস,
তাই হেন মৃদু গতি,
তাই উঠিতেছে ধীরে দুখের নিশ্বাস।
বসিয়া মরমস্থলে কহিছ চোখের জলে—
"বুঝি হেন দিন রহিবে না,
আজ যাবে, আসিবে তো কাল,
দুঃখ যাবে, ঘুচিবে যাতনা।"
কেন, আশা, মোরে কেন হেন প্রতারণা।
দুঃখক্লেশে আমি কি ডরাই,
আমি কি তাদের চিনি নাই।
তারা সবে আমারি কি নয়।
তবে, আশা, কেন এত ভয়।
তবে কেন বসি মোর পাশ
মোরে, আশা, দিতেছ আশ্বাস।

বলো, আশা, বসি মোর চিতে,
"আরো দুঃখ হইবে বহিতে,
হৃদয়ের যে প্রদেশ হয়েছিল ভস্মশেষ
আর যারে হত না সহিতে,
আবার নূতন প্রাণ পেয়ে
সেও পুন থাকিবে দহিতে।"

করিয়ো না ভয়,
দুঃখ-জ্বালা আমারি কি নয়?
তবে কেন হেন ম্লান মুখ,
তবে কেন হেন দীন বেশ?
তবে কেন এত ভয়ে ভয়ে
এ হৃদয়ে করিস প্রবেশ?

পরিত্যক্ত

চলে গেল, আর কিছু নাই কহিবার।
চলে গেল, আর কিছু নাই গাহিবার।
শুধু গাহিতেছে আর শুধু কাঁদিতেছে
  দীনহীন হৃদয় আমার, শুধু বলিতেছে,
"চলে গেল সকলেই চলে গেল গো,
বুক শুধু ভেঙে গেল, দ'লে গেল গো।"

বসন্ত চলিয়া গেলে বর্ষা কেঁদে কেঁদে বলে,
    "ফুল গেল, পাখি গেল—
আমি শুধু রহিলাম, সবই গেল গো।"
দিবস ফুরালে রাতি স্তব্ধ হয়ে রহে,
    শুধু কেঁদে কহে,
"দিন গেল, আলো গেল, রবি গেল গো—
কেবল একেলা আমি, সবই গেল গো।"

উত্তরবায়ুর সম   প্রাণের বিজনে মম
    কে যেন কাঁদিছে শুধু,
    "চলে গেল, চলে গেল,
    সকলেই চলে গেল গো।"

উৎসব ফুরায়ে গেলে   ছিন্ন শুষ্ক মালা
    পড়ে থাকে হেথায় হোথায়—
তৈলহীন শিখাহীন ভগ্ন দীপগুলি
    ধুলায় লুটায়—
একবার ফিরে কেহ দেখে নাকো ভুলি,
    সবে চলে যায়।

পুরানো মলিন ছিন্ন বসনের মতো
    মোরে ফেলে গেল,
কাতর নয়নে চেয়ে রহিলাম কত—
    সাথে না লইল।

তাই প্রাণ গাহে শুধু, কাঁদে শুধু, কহে শুধু,
    "মোরে ফেলে গেল,
সকলেই মোরে ফেলে গেল
    সকলেই চলে গেল গো।"

একবার ফিরে তারা চেয়েছিল কি?
    বুঝি চেয়েছিল।
একবার ভুলে তারা কেঁদেছিল কি?
    বুঝি কেঁদেছিল।

বুঝি ভেবেছিল—
লয়ে যাই—নিতান্ত কি একেলা কাঁদিবে?
তাই বুঝি ভেবেছিল।
তাই চেয়েছিল।
তার পরে? তার পরে!
তার পরে বুঝি হেসেছিল।
একফোঁটা অশ্রুবারি মুহূর্তেই শুকাইল।
তার পরে? তার পরে!
চলে গেল।
তার পরে? তার পরে!
ফুল গেল, পাখি গেল, আলো গেল, রবি গেল,
সবই গেল, সবই গেল গো—
হৃদয় নিশ্বাস ছাড়ি কাঁদিয়া কহিল,
"সকলেই চলে গেল গো,
আমারেই ফেলে গেল গো।"

সুখের বিলাপ

অবশ নয়ন নিমীলিয়া
সুখ কহে নিশ্বাস ফেলিয়া,
"এমন জোছনা সুমধুর,
বাঁশরি বাজিছে দূর দূর,
যামিনীর হসিত নয়নে
লেগেছে মৃদুল ঘুমঘোর।
নদীতে উঠেছে মৃদু ঢেউ,
গাছেতে নড়িছে মৃদু পাতা;
লতায় ফুটিয়া ফুল দুটি
পাতায় লুকায় তার মাথা;
মলয় সুদূর বনভূমে
কাঁপায়ে গাছের ছায়াগুলি
লাজুক ফুলের মুখ হতে
ঘোমটা দিতেছে খুলি খুলি।
এমন মধুর রজনীতে
একেলা রয়েছি বসিয়া,
যামিনীর হৃদয় হইতে
জোছনা পড়িছে খসিয়া।"

হৃদয়ে একেলা শুয়ে শুয়ে
সুখ শুধু এই গান গায়,
"নিতান্ত একেলা আমি যে
কেহ, কেহ, কেহ নাই হায়।"

আমি তারে শুধাইনু গিয়া,
"কেন, সুখ, কার কর আশা?"
সুখ শুধু কাঁদিয়া কহিল,
"ভালোবাসা, ভালোবাসা গো।
সকলি, সকলি হেথা আছে—
কুসুম ফুটেছে গাছে গাছে,
আকাশে তারকা রাশি রাশি,
জোছনা ঘুমায় হাসি হাসি।
সকলি, সকলি হেথা আছে—
সেই শুধু, সেই শুধু নাই,
ভালোবাসা নাই শুধু কাছে।"
অবশ নয়ন নিমীলিয়া
সুখ কহে নিশ্বাস ফেলিয়া,
"এই তটিনীর ধারে, এই শুভ্র জোছনায়,
এই কুসুমিত বনে, এই বসন্তের বায়,
কেহ মোর নাই একেবারে,
তাই সাধ গেছে কাঁদিবারে।
তাই সাধ যায় মনে মনে—
মিশাব এ যামিনীর সনে,
কিছুই রবে না আর প্রাতে,
শিশির রহিবে পাতে পাতে।
সাধ যায় মেঘটির মতো
কাঁদিয়া মরিয়া গিয়া আজি
অশ্রুজলে হই পরিণত।"

সুখ বলে, "এ জন্ম ঘুচায়ে
সাধ যায় হইতে বিষাদ।"
"কেন সুখ, কেন হেন সাধ?"
"নিতান্ত একা যে আমি গো
কেহ যে, কেহ যে নাই মোর।"
"সুখ, কারে চায় প্রাণ তোর?
সুখ, কার করিস রে আশা?"
সুখ শুধু কেঁদে কেঁদে বলে,
"ভালোবাসা, ভালোবাসা গো।"

হৃদয়ের গীতিধ্বনি

ও কী সুরে গান গাস, হৃদয় আমার?
শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বসন্ত শরৎ নাই,
দিন নাই, রাত্রি নাই—অবিরাম অনিবার
ও কী সুরে গান গাস, হৃদয় আমার?

বিরলে বিজন বনে বসিয়া আপন মনে
ভূমি-পানে চেয়ে চেয়ে, একই গান গেয়ে গেয়ে—
দিন যায়, রাত যায়, শীত যায়, গ্রীষ্ম যায়,
তবু গান ফুরায় না আর?
মাথায় পড়িছে পাতা, পড়িছে শুকানো ফুল,
পড়িছে শিশিরকণা, পড়িছে রবির কর,
পড়িছে বরষা-জল ঝরঝর ঝরঝর,
কেবলি মাথার 'পরে করিতেছে সমস্বরে
বাতাসে শুকানো পাতা মরমর মরমর—
বসিয়া বসিয়া সেথা, বিশীর্ণ মলিন প্রাণ
গাহিতেছে একই গান একই গান একই গান।

পারি নে শুনিতে আর, একই গান একই গান।
কখন থামিবি তুই, বল্ মোরে বল্ প্রাণ!
একেলা ঘুমায়ে আছি—
সহসা স্বপন টুটি
সহসা জাগিয়া উঠি
সহসা শুনিতে পাই
হৃদয়ের এক ধারে
সেই স্বর ফুটিতেছে,
সেই গান উঠিতেছে—
কেহ শুনিছে না যবে
চারি দিকে স্তব্ধ সবে
সেই স্বর সেই গান অবিরাম অবিশ্রাম
অচেতন আঁধারের শিরে শিরে চেতনা সঞ্চারে।

দিবসে মগন কাজে, চারি দিকে দলবল,
চারি দিকে কোলাহল।
সহসা পাতিলে কান শুনিতে পাই সে গান,
নানা শব্দময় সেই জনকোলাহল
তাহারি প্রাণের মাঝে একমাত্র শব্দ বাজে—
এক সুর, এক ধ্বনি, অবিরাম অবিরল—
যেন সে কোলাহলের হৃদয়স্পন্দন-ধ্বনি—
সমস্ত ভুলিয়া যাই, বসে বসে তাই গনি।

ঘুমাই বা জেগে থাকি, মনের দ্বারের কাছে
কে যেন বিষণ্ণ প্রাণী দিনরাত বসে আছে—
চিরদিন করিতেছে বাস,
তারি শুনিতেছি যেন নিশ্বাস-প্রশ্বাস।
এ প্রাণের ভাঙা ভিতে স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে
ঘুঘু এক বসে বসে গায় একস্বরে,
কে জানে কেন সে গান গায়।

গলি সে কাতর স্বরে স্তব্ধতা কাঁদিয়া মরে,
প্রতিধ্বনি করে হায়-হায়।

হৃদয় রে, আর কিছু শিখিলি নে তুই,
শুধু ওই গান!
প্রকৃতির শত শত রাগিণীর মাঝে
শুধু ওই তান!

তবে থাম্ থাম্ ওরে প্রাণ,
পারি নে শুনিতে আর একই গান, একই গান।

দুঃখ-আবাহন

আয় দুঃখ, আয় তুই,
তোর তরে পেতেছি আসন,
হৃদয়ের প্রতি শিরা টানি টানি উপাড়িয়া
বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে তৃষিত অধর দিয়া
বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই করিস শোষণ;
জননীর স্নেহে তোরে করিব পোষণ।
হৃদয়ে আয় রে তুই হৃদয়ের ধন।

নিভৃতে ঘুমাবি তুই হৃদয়ের নীড়ে;
অতি গুরু তোর ভার—
দু-একটি শিরা তাহে যাবে বুঝি ছিঁড়ে,
যাক ছিঁড়ে।
জননীর স্নেহে তোরে করিব বহন
দুর্বল বুকের 'পরে করিব ধারণ,
একেলা বসিয়া ঘরে অবিরল একস্বরে
গাব তোর কানে কানে ঘুম পাড়াবার গান,
মুদিয়া আসিবে তোর শ্রান্ত দু-নয়ান।
প্রাণের ভিতর হতে উঠিয়া নিশ্বাস
শ্রান্ত কপালেতে তোর করিবে বাতাস,
তুই নীরবে ঘুমাস।

আয়, দুঃখ, আয় তুই, ব্যাকুল এ হিয়া।
দুই হাতে মুখ চাপি হৃদয়ের ভূমি-'পরে
পড়্ আছাড়িয়া।
সমস্ত হৃদয় ব্যাপি একবার উচ্চস্বরে
অনাথ শিশুর মতো ওঠ্ রে কাঁদিয়া।
প্রাণের মর্মের কাছে
একটি যে ভাঙা বাদ্য আছে

দুই হাতে তুলে নে রে, সবলে বাজায়ে দে রে
নিতান্ত উন্মাদ-সম ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্।
ভাঙে তো ভাঙিবে বাদ্য, ছেঁড়ে তো ছিঁড়িবে তন্ত্রী-
নে রে তবে তুলে নে রে, সবলে বাজায়ে দে রে
নিতান্ত উন্মাদ-সম ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্।
দারুণ আহত হয়ে দারুণ শব্দের ঘায়
যত আছে প্রতিধ্বনি বিষম প্রমাদ গনি
একেবারে সমস্বরে
কাঁদিয়া উঠিবে যন্ত্রণায়—
দুঃখ, তুই আয় তুই আয়।

নিতান্ত একেলা এ হৃদয়।
আর কিছু নয়,
কাছে আয় একবার, তুলে ধর্ মুখ তার,
মুখে তার আঁখি দুটি রাখ্,
একদৃষ্টে চেয়ে শুধু থাক্।
আর কিছু নয়,
নিরালয় এ হৃদয়
শুধু এক সহচর চায়।
তুই দুঃখ, তুই কাছে আয়।
কথা না কহিস যদি বসে থাক্ নিরবধি
হৃদয়ের পাশে দিনরাতি।
যখনি খেলাতে চাস হৃদয়ের কাছে যাস,
হৃদয় আমার চায় খেলাবার সাথী।

আয় দুঃখ হৃদয়ের ধন,
এই হেথা পেতেছি আসন,
প্রাণের মর্মের কাছে
এখনো যা রক্ত আছে
তাই তুই করিস শোষণ।

শান্তিগীত

ঘুমা দুঃখ হৃদয়ের ধন,
ঘুমা তুই, ঘুমা রে এখন।
সুখে সারা দিনমান শোণিত করিয়া পান
এখন তো মিটেছে তিয়াষ?
দুঃখ, তুই সুখেতে ঘুমাস।

আজ জোছনার রাত্রে বসন্তপবনে,
অতীতের পরলোক ত্যজি শূন্যমনে,

বিগত দিবসগুলি শুধু একবার
পুরানো খেলার ঠাঁই দেখিতে এসেছে
এই হৃদয়ে আমার—
যবে বেঁচেছিল তারা এই এ শ্মশানে
দিন গেলে প্রতিদিন পুড়াত যেখানে
একেকটি আশা আর একেকটি সুখ,
সেইখানে আসি তারা বসিয়া রয়েছে
অতি ম্লান মুখ।

সেখানে বসিয়া তারা সকলে মিলিয়া
অতি মৃদু স্বরে
পুরানো কালের গীতি নয়ন মুদিয়া
ধীরে গান করে।

দুঃখ, তুই ঘুমা।
ধীরে উঠিতেছে গান,
ক্রমে ছাইতেছে প্রাণ,
নীরবতা ছায় যথা সন্ধ্যার গগন।
গানের প্রাণের মাঝে তোর তীব্র কণ্ঠস্বর
ছুরির মতন।
তুই থাম্ দুঃখ, থাম্।
তুই ঘুমা দুঃখ, ঘুমা।

কাল উঠিস আবার,
খেলিস দুরন্ত খেলা হৃদয়ে আমার;
হৃদয়ের শিরাগুলি ছিঁড়ি ছিঁড়ি মোর
তাইতে রচিস তন্ত্রী বীণাটির তোর,
সারাদিন বাজাস বসিয়া
ধ্বনিয়া হৃদয়।
আজ রাত্রে রব শুধু চাহিয়া চাঁদের পানে,
আর কিছু নয়।

অসহ্য ভালোবাসা

বুঝেছি গো বুঝেছি সজনি,
কী ভাব তোমার মনে জাগে—
বুক-ফাটা প্রাণ-ফাটা মোর ভালোবাসা
এত বুঝি ভালো নাহি লাগে।
এত ভালোবাসা বুঝি পার না সহিতে,
এত বুঝি পার না বহিতে।

যখনি গো নেহারি তোমায়—
মুখ দিয়া আঁখি দিয়া বাহিরিতে চায় হিয়া,
শিরার শৃঙ্খলগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়,
ওই মুখ বুকে ঢাকে, ওই হাতে হাত রাখে,
কী করিবে ভাবিয়া না পায়,
যেন তুমি কোথা আছ খুঁজিয়া না পায়।
মন মোর পাগলের হেন প্রাণপণে শুধায় সে যেন,
"প্রাণের প্রাণের মাঝে কী করিলে তোমারে গো পাই,
যে ঠাঁই রয়েছে শূন্য কী করিলে সে শূন্য পুরাই!"
এইরূপে দেহের দুয়ারে
মন যবে থাকে যুঝিবারে,
তুমি চেয়ে দেখ মুখ-বাগে—
এত বুঝি ভালো নাহি লাগে।
তুমি চাও যবে মাঝে মাঝে
অবসর পাবে তুমি কাজে
আমারে ডাকিবে একবার—
কাছে গিয়া বসিব তোমার,
মৃদু মৃদু সুমধুর বাণী
কব তব কানে কানে রানী।
তুমিও কহিবে মৃদু ভায়,
তুমিও হাসিবে মৃদু হাস,
হৃদয়ের মৃদু খেলাখেলি—
ফুলেতে ফুলেতে হেলাহেলি।

চাও তুমি দুখহীন প্রেম
ছুটে যেথা ফুলের সুবাস,
উঠে যেথা জোছনালহরী,
বহে যেথা বসন্তবাতাস।
নাহি চাও আত্মহারা প্রেম
আছে যেথা অনন্ত পিয়াস,
বহে যেথা চোখের সলিল,
উঠে যেথা দুখের নিশ্বাস।
প্রাণ যেথা কথা ভুলে যায়,
আপনারে ভুলে যায় হিয়া,
অচেতন চেতনা যেথায়
চরাচর ফেলে হারাইয়া।

এমন কি কেহ নাই, বল্‌ মোরে বল্‌ আশা,
মার্জনা করিবে মোর অতি—অতি ভালোবাসা!

হলাহল

এমন ক'দিন কাটে আর!
ললিত গলিত হাস, জাগরণ, দীর্ঘশ্বাস,
সোহাগ, কটাক্ষ, মান, নয়নসলিলধার,
মৃদু হাসি—মৃদু কথা—আদরের, উপেক্ষার—
এই শুধু, এই শুধু, দিনরাত এই শুধু—
এমন ক'দিন কাটে আর!

কটাক্ষে মরিয়া যায়, কটাক্ষে বাঁচিয়া উঠে,
হাসিতে হৃদয় জুড়ে, হাসিতে হৃদয় টুটে,
ভীরুর মতন আসে দাঁড়ায়ে রহে গো পাশে,
ভয়ে ভয়ে মৃদু হাসে, ভয়ে ভয়ে মুখ ফুটে,
একটু আদর পেলে অমনি চরণে লুটে,
অমনি হাসিটি জাগে মলিন অধরপুটে,
একটু কটাক্ষ হেরি অমনি সরিয়া যায়—
অমনি জগৎ যেন শূন্য মরুভূমি-হেন,
অমনি মরণ যেন প্রাণের অধিক ভায়।

প্রণয় অমৃত এ কি? এ যে ঘোর হলাহল—
হৃদয়ের শিরে শিরে প্রবেশিয়া ধীরে ধীরে
অবশ করেছে দেহ, শোণিত করেছে জল।
কাজ নাই, কর্ম নাই, বসে আছে এক ঠাঁই,
হাসি ও কটাক্ষ লয়ে খেলেনা গড়িছে যত,
কভু ঢুলে-পড়া আঁখি কভু অশ্রুভারে নত।

দূর করো, দূর করো, বিকৃত এ ভালোবাসা,
জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়নাশা।
কোথায় প্রণয়ে মন যৌবনে ভরিয়া উঠে,
জগতের অধরেতে হাসির জোছনা ফুটে,
চোখেতে সকলি ঠেকে বসন্তহিল্লোলময়,
হৃদয়ের শিরে শিরে শোণিত সতেজে বয়—
তা নয়, একি এ হল, একি এ জর্জর মন!
হাসিহীন দু অধর, জ্যোতিহীন দু নয়ন!
দূরে যাও, দূরে যাও, হৃদয় রে দূরে যাও—
ভুলে যাও, ভুলে যাও, ছেলেখেলা ভুলে যাও।
দূর করো, দূর করো, বিকৃত এ ভালোবাসা—
জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়নাশা।

অনুগ্রহ

এই-যে জগৎ হেরি আমি,
মহাশক্তি জগতের স্বামী,
এ কি হে তোমার অনুগ্রহ?
হে বিধাতা কহ মোরে কহ।
ওই-যে সমুখে সিন্ধু, এ কি অনুগ্রহবিন্দু?
ওই-যে আকাশে শোভে চন্দ্র সূর্য গ্রহ,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তব অনুগ্রহ?
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র একজন
আমারে যে করেছ সৃজন,
এ কি শুধু অনুগ্রহ করে
ঋণপাশে বাঁধিবারে মোরে?
করিতে করিতে যেন খেলা
কটাক্ষে করিয়া অবহেলা,
হেসে ক্ষমতার হাসি অসীম ক্ষমতা হতে
ব্যয় করিয়াছ এক রতি
অনুগ্রহ ক'রে মোর প্রতি?
শুভ্র শুভ্র জুঁই দুটি ওই-যে রয়েছে ফুটি
ও কি তব অতি শুভ্র ভালোবাসা নয়?
বলো মোরে, মহাশক্তিময়,
ওই-যে জোছনা-হাসি ওই-যে তারকারাশি,
আকাশে হাসিয়া ফুটে রয়,
ও কি তব ভালোবাসা নয়?
ও কি তব অনুগ্রহ-হাসি
কঠোর পাষাণ লৌহময়?
তবে হে হৃদয়হীন দেব,
জগতের রাজ-অধিরাজ,
হানো তব হাসিময় বাজ,
মহা অনুগ্রহ হতে তব
মুছে তুমি ফেলহ আমারে—
চাহি না থাকিতে এ সংসারে।

ভালোবাসি আপনা ভুলিয়া,
গান গাহি হৃদয় খুলিয়া,
ভক্তি করি পৃথিবীর মতো,
স্নেহ করি আকাশের প্রায়।
আপনারে দিয়েছি ফেলিয়া,
আপনারে গিয়েছি ভুলিয়া,
যারে ভালোবাসি তার কাছে
প্রাণ শুধু ভালোবাসা চায়।

সাক্ষী আছ তুমি অন্তর্যামী
কতখানি ভালোবাসি আমি,
দেখি যবে তার মুখ হৃদয়ে দারুণ সুখ
ভেঙে ফেলে হৃদয়ের দ্বার,
বলে, "এ কী ঘোর কারাগার!"

প্রাণ বলে, "পারি নে সহিতে,
এ দুরন্ত সুখেরে বহিতে।"
আকাশে হেরিলে শশী আনন্দে উথলি উঠি
দেয় যথা মহাপারাবার
অসীম আনন্দ উপহার,
তেমনি সমুদ্র-ভরা আনন্দ তাহারে দিই
হৃদয় যাহারে ভালোবাসে,
হৃদয়ের প্রতি ঢেউ উথলি গাহিয়া উঠে
আকাশ পুরিয়া গীতোচ্ছ্বাসে।
ভেঙে ফেলি উপকূল পৃথিবী ডুবাতে চাহে,
আকাশে উঠিতে চায় প্রাণ—
আপনারে ভুলে গিয়ে হৃদয় হইতে চাহে
একটি জগতব্যাপী গান।
তাহারে কবির অশ্রু হাসি
দিয়েছি কত-না রাশি রাশি,
তাহারি কিরণে ফুটিতেছে
হৃদয়ের আশা ও ভরসা,
তাহারি হাসি ও অশ্রুজল
এ প্রাণের বসন্ত বরষা।

ভালোবাসি, আর গান গাই—
কবি হয়ে জন্মেছি ধরায়—
রাত্রি এত ভালো নাহি বাসে,
উষা এত গান নাহি গায়।

ভালোবাসা স্বাধীন মহান,
ভালোবাসা পর্বত-সমান।
ভিক্ষাবৃত্তি করে না তপন
পৃথিবীরে চাহে সে যখন—
সে চাহে উজ্জ্বল করিবারে,
সে চাহে উর্বর করিবারে,
জীবন করিতে প্রবাহিত,
কুসুম করিতে বিকশিত।
চাহে সে বাসিতে শুধু ভালো,
চাহে সে করিতে শুধু আলো,
স্বপ্নেও কি ভাবে কভু ধরা,

তপনেরে অনুগ্রহ করা?
যবে আমি যাই তার কাছে
সে কি মনে ভাবে গো তখন
অনুগ্রহ ভিক্ষা মাগিবারে
এসেছে ভিক্ষুক একজন?
অনুগ্রহ পাষাণমমতা,
করুণার কঙ্কাল কেবল,
ভাবহীন বজ্রে গড়া হাসি—
স্ফটিককঠিন অশ্রুজল।
অনুগ্রহ বিলাসী গর্বিত,
অনুগ্রহ দয়ালু-কৃপণ—
বহু কষ্টে অশ্রুবিন্দু দেয়
শুষ্ক আঁখি করিয়া মন্থন।
নীচ হীন দীন অনুগ্রহ
কাছে যবে আসিবারে চায়,
প্রণয় বিলাপ করি উঠে—
গীতগান ঘৃণায় পলায়।

হে দেবতা, অনুগ্রহ হতে
রক্ষা করো অভাগা কবিরে,
অপযশ অপমান দাও—
দুঃখ জ্বালা বহিব এ শিরে।
সম্পদের স্বর্ণকারাগারে,
গরবের অন্ধকার-মাঝ,
অনুগ্রহ রাজার মতন
চিরকাল করুক বিরাজ।
সোনার শৃঙ্খল ঝংকারিয়া
গরবের স্ফীত দেহ লয়ে
অনুগ্রহ আসে নাকো যেন
আমাদের স্বাধীন আলয়ে।

গান আসে ব'লে গান গাই,
ভালোবাসি ব'লে ভালোবাসি,
কেহ যেন মনে নাহি করে
মোরা কারো কৃপার প্রয়াসী।
নাহয় শুনো না মোর গান,
ভালোবাসা ঢাকা রবে মনে।
অনুগ্রহ ক'রে এই কোরো—
অনুগ্রহ কোরো না এ জনে।

আবার

তুমি কেন আসিলে হেথায়
এ আমার সাধের আবাসে?
এ আলয়ে যে নিবাসী থাকে,
এ আলয়ে যে অতিথি আসে,
সবাই আমার সখা, সবাই আমার বঁধু,
সবারেই আমি ভালোবাসি,
তারাও আমারে ভালোবাসে—
তুমি তবে কেন এলে হেথা
এ আমার সাধের আবাসে?

এ আমার প্রেমের আলয়,
এ মোর স্নেহের নিকেতন;
বেছে বেছে কুসুম তুলিয়া
রচিয়াছি কোমল আসন।
কেহ হেথা নাইকো নিষ্ঠুর,
কিছু হেথা নাইকো কঠিন,
কবিতা আমার প্রণয়িনী
এইখানে আসে প্রতিদিন।
সমীর কোমলমন আসে হেথা অনুক্ষণ
যখনি সে পায় অবকাশ,
যখনি প্রভাত ফুটে, যখনি সে জেগে উঠে
ছুটিয়া সে আসে মোর পাশ।
দুই বাহু প্রসারিয়া আমারে বুকেতে নিয়া
কত শত বারতা শুধায়,
সখা মোর প্রভাতের বায়।
আকাশেতে তুলে আঁখি বাতায়নে বসে থাকি
নিশি যবে পোহায়-পোহায়,
উষার আলোকে হারা সখী মোর শুকতারা
আমার এ মুখপানে চায়।
নীরবে চাহিয়া রহে, নীরব নয়নে কহে,
"সখা, আজ বিদায়, বিদায়!"

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস
প্রতিদিন আসে মোর পাশ।
দেখে, আমি বাতায়নে, অশ্রু ঝরে দুনয়নে,
ফেলিতেছি দুখের নিশ্বাস।
অতি ধীরে আলিঙ্গন করে,
কথা কহে সকরুণ স্বরে,
কানে কানে বলে, "হায় হায়!"

কোমল কপোল দিয়া কপোল চুম্বন করি
অশ্রুবিন্দু সুধীরে শুকায়।
সবাই আমার মন বুঝে,
সবাই আমার দুঃখ জানে,
সবাই করুণ আঁখি মেলি
চেয়ে থাকে এই মুখপানে।
যে কেহ আমার ঘরে আসে
সবাই আমারে ভালোবাসে—
তবে কেন তুমি এলে হেথা
এ আমার সাধের আবাসে?

ফেরো ফেরো, ও নয়ন রসহীন ও বয়ন
আনিয়ো না এ মোর আলয়ে--
আমরা সখারা মিলি আছি হেথা নিরিবিলি
আপনার মনোদুঃখ লয়ে।
এমনি হয়েছে শান্ত মন,
ঘুচেছে দুঃখের কঠোরতা;
ভালো লাগে বিহঙ্গের গান,
ভালো লাগে তটিনীর কথা।
ভালো লাগে কাননে দেখিতে
বসন্তের কুসুমের মেলা,
ভালো লাগে সারাদিন বসে
দেখিতে মেঘের ছেলেখেলা।
এইরূপে সায়াহ্নের কোলে
রচেছি গোধূলি-নিকেতন,
দিবসের অবসান-কালে
পশে হেথা রবির কিরণ।
আসে হেথা অতি দূর হতে
পাখিদের বিরামের তান,
ম্রিয়মাণ সন্ধ্যা-বাতাসের
থেকে থেকে মরণের গান।
পরিশ্রান্ত অবশ পরানে
বসিয়া রয়েছি এইখানে।

যাও মোরে যাও ছেড়ে, নিয়ো না নিয়ো না কেড়ে,
নিয়ো না নিয়ো না মন মোর।
সখাদের কাছ হতে ছিনিয়া নিয়ো না মোরে,
ছিঁড়ো না এ প্রণয়ের ডোর।
আবার হারাই যদি এই গিরি এই নদী
মেঘ বায়ু কানন নির্ঝর,
আবার স্বপন ছুটে একেবারে যায় টুটে
এ আমার গোধূলির ঘর,

আবার আশ্রয়হারা ঘুরে ঘুরে হই সারা
ঝটিকার মেঘখণ্ড-সম
দুঃখের বিদ্যুৎ-ফণা ভীষণ ভুজঙ্গ এক
পোষণ করিয়া বক্ষে মম—
তাহা হলে এ জনমে নিরাশ্রয় এ জীবনে
ভাঙা ঘর আর গড়িবে না,
ভাঙা হৃদি আর জুড়িবে না!
কাল সবে গড়েছি আলয়,
কাল সবে জুড়েছি হৃদয়—
আজি তা দিয়ো না যেন ভেঙে,
রাখো তুমি রাখো এ বিনয়।

পাষাণী

জগতের বাতাস করুণা,
করুণা সে রবিশশীতারা,
জগতের শিশির করুণা—
জগতের বৃষ্টিবারিধারা।
জননীর স্নেহধারা-সম
এই-যে জাহ্নবী বহিতেছে,
মধুরে তটের কানে কানে
আশ্বাস-বচন কহিতেছে—
এও সেই বিমল করুণা
হৃদয় ঢালিয়া বহে যায়,
জগতের তৃষা নিবারিয়া
গান গাহে করুণ ভাষায়।
কাননের ছায়া সে করুণা,
করুণা সে উষার কিরণ,
করুণা সে জননীর আঁখি,
করুণা সে প্রেমিকের মন।
এমন যে মধুর করুণা,
এমন যে কোমল করুণা,
জগতের হৃদয়-জুড়ানো
এমন যে বিমল করুণা—
দিন দিন বুক ফেটে যায়,
দিন দিন দেখিবারে পাই,
যারে ভালোবাসি প্রাণপণে
সে করুণা তার মনে নাই।
পরের নয়নজলে তার না হৃদয় গলে,
দুখেরে সে করে উপহাস,
দুখেরে সে করে অবিশ্বাস।

দেখিয়া হৃদয় মোর তরাসে শিহরি উঠে,
প্রেমের কোমল প্রাণে শত শত শেল ফুটে,
হৃদয় কাতর হয়ে নয়ন মুদিতে চায়,
কাঁদিয়া সে বলে, "হায় হায়,
এ তো নহে আমার দেবতা,
তবে কেন রয়েছে হেথায়?"

তুমি নও, সে জন তো নও,
তবে তুমি কোথা হতে এলে?
এলে যদি এসো তবে কাছে,
এ হৃদয়ে যত অশ্রু আছে
একবার সব দিই ঢেলে,
তোমার সে কঠিন পরান
যদি তাহে একতিল গলে,
কোমল হইয়া আসে মন
সিক্ত হয়ে অশ্রুজলে-জলে।
কাঁদিবারে শিখাই তোমায়—
পরদুঃখে ফেলিতে নিশ্বাস,
করুণার সৌন্দর্য অতুল
ও নয়নে করে যেন বাস।
প্রতিদিন দেখিয়াছি আমি
করুণারে করেছ পীড়ন,
প্রতিদিন ওই মুখ হতে
ভেঙে গেছে রূপের মোহন।
কুবলয়-আঁখির মাঝারে
সৌন্দর্য পাই না দেখিবারে,
হাসি তব আলোকের প্রায়
কোমলতা নাহি যেন তায়,
তাই মন প্রতিদিন কহে,
"নহে নহে, এ জন সে নহে।"

শোনো বন্ধু, শোনো, আমি করুণারে ভালোবাসি।
সে যদি না থাকে তবে ধূলিময় রূপরাশি।
তোমারে যে পূজা করি, তোমারে যে দিই ফুল,
ভালোবাসি বলে যেন কখনো কোরো না ভুল।
যে জন দেবতা মোর কোথা সে আছে না জানি,
তুমি তো কেবল তার পাষাণপ্রতিমাখানি।
তোমার হৃদয় নাই, চোখে নাই অশ্রুধার,
কেবল রয়েছে তব পাষাণ-আকার তার।

দুদিন

আরম্ভিছে শীতকাল, পড়িছে নীহারজাল,
শীর্ণ বৃক্ষশাখা যত ফুলপত্রহীন;
মৃতপ্রায় পৃথিবীর মুখের উপরে
বিষাদে প্রকৃতিমাতা শুভ্র বাষ্পজালে-গাঁথা
কুজ্ঝটি-বসনখানি দেছেন টানিয়া।
পশ্চিমে গিয়েছে রবি, স্তব্ধ সন্ধ্যাবেলা,
বিদেশে আসিনু শ্রান্ত পথিক একেলা।

রহিনু দুদিন।
এখনো রয়েছে শীত, বিহঙ্গ গাহে না গীত,
এখনো ঝরিছে পাতা, পড়িছে তুহিন।
বসন্তের প্রাণভরা চুম্বন-পরশে
সর্ব অঙ্গ শিহরিয়া পুলকে-আকুল-হিয়া
মৃত্যু-শয্যা হতে ধরা জাগে নি হরষে।
এক দিন দুই দিন ফুরাইল শেষে,
আবার উঠিতে হল, চলিনু বিদেশে।

এই-যে ফিরানু মুখ, চলিনু পুরবে,
আর কি রে এ জীবনে ফিরে আসা হবে!
কত মুখ দেখিয়াছি দেখিব না আর।
ঘটনা ঘটিবে কত, বরষ বরষ শত
জীবনের 'পর দিয়া হয়ে যাবে পার—
হয়তো-বা একদিন অতি দূর দেশে,
আসিয়াছে সন্ধ্যা হয়ে, বাতাস যেতেছে বয়ে,
একেলা নদীর ধারে রহিয়াছি বসে—
হু হু করে উঠিবেক সহসা এ হিয়া,
সহসা এ মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতি উজলিয়া
একটি অস্ফুট রেখা সহসা দিবে যে দেখা,
একটি মুখের ছবি উঠিবে জাগিয়া,
একটি গানের ছত্র পড়িবেক মনে,
দু-একটি সুর তার উদিবে স্মরণে,
অবশেষে একেবারে সহসা সবলে
বিস্মৃতির বাঁধগুলি ভাঙিয়া চূর্ণিয়া ফেলি
সেদিনের কথাগুলি বন্যার মতন
একেবারে বিপ্লাবিয়া ফেলিবে এ মন।

শত ফুলদলে গড়া সেই মুখ তার
স্বপনেতে প্রতিনিশি হৃদয়ে উদিবে আসি
এলানো আকুল কেশে, আকুল নয়নে।
সেই মুখ সঙ্গী মোর হইবে বিজনে,

নিশীথের অন্ধকার আকাশের পটে
নক্ষত্র-গ্রহের মতো উঠিবেক ফুটে
ধীরে ধীরে রেখা রেখা সেই মুখ তার
নিঃশব্দে মুখের পানে চাহিয়া আমার।
চমকি উঠিব জাগি শুনি ঘুমঘোরে
"যাবে তবে? যাবে?" সেই ভাঙা-ভাঙা স্বরে।

ফুরাল দুদিন—
শরতে যে শাখা হয়েছিল পত্রহীন
এ দুদিনে সে শাখা উঠে নি মুকুলিয়া,
অচল শিখর-'পরি যে তুষার ছিল পড়ি
এ দুদিনে কণা তার যায় নি গলিয়া,
কিন্তু এ দুদিন তার শত বাহু দিয়া
চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া।
দুদিনের পদচিহ্ন চিরদিন তরে
অঙ্কিত রহিবে শত বরষের শিরে।

পরাজয়-সংগীত

ভালো করে যুঝিলি নে, হল তোরি পরাজয়—
কী আর ভাবিতেছিস, ম্রিয়মাণ, হা হৃদয়!
কাঁদ্ তুই, কাঁদ্, হেথা আয়,
একা বসে বিজনে বিদেশে।
জানিতাম জানিতাম হা রে
এমনি ঘটিবে অবশেষে।

সংসারে যাহারা ছিল সকলেই জয়ী হল,
তোরি শুধু হল পরাজয়—
প্রতি রণে প্রতি পদে একে একে ছেড়ে দিলি
জীবনের রাজ্য সমুদয়।
যতবার প্রতিজ্ঞা করিলি
ততবার পড়িল টুটিয়া,
ছিন্ন আশা বাঁধিয়া তুলিলি
বার বার পড়িল লুটিয়া।
"সান্ত্বনা সান্ত্বনা" করি ফিরি
সান্ত্বনা কি মিলিল রে মন?
জুড়াইতে ক্ষত বক্ষঃস্থল
ছুরিরে করিলি আলিঙ্গন।
ইচ্ছা, সাধ, আশা যাহা ছিল
অদৃষ্ট সকলি লুটে নিল।

মনে হইতেছে আজি জীবন হারায়ে গেছে,
 মরণ হারায়ে গেছে হায়!
কে জানে এ কী এ ভাব? শূন্যপানে চেয়ে আছি
 মৃত্যুহীন মরণের প্রায়।
পরাজিত এ হৃদয় জীবনের দুর্গ মম
 মরণে করিল সমর্পণ,
 তাই আজ জীবনে মরণ।

জাগ্ জাগ্ জাগ্ ওরে, গ্রাসিতে এসেছে তোরে
 নিদারুণ শূন্যতার ছায়া,
 আকাশ-গরাসী তার কায়া।
গেল তোর চন্দ্র সূর্য, গেল তোর গ্রহ তারা,
 গেল তোর আত্ম আর পর।
 এইবেলা প্রাণপণ কর্।
 এইবেলা ফিরে দাঁড়া তুই,
 স্রোতোমুখে ভাসিস্ নে আর।
 যাহা পাস আঁকড়িয়া ধর্—
 সম্মুখে অসীম পারাবার,
 সম্মুখেতে চির অমানিশি,
 সম্মুখেতে মরণ বিনাশ!
 গেল, গেল, বুঝি নিয়ে গেল
 আবর্ত করিল বুঝি গ্রাস!

শিশির

শিশির কাঁদিয়া শুধু বলে,
"কেন মোর হেন ক্ষুদ্র প্রাণ—
শিশুটির কল্পনার মতো
জনমি অমনি অবসান?
ঘুম-ভাঙা উষা-মেয়েটির
একটি সুখের অশ্রু হায়,
হাসি তার ফুরাতে ফুরাতে
এ অশ্রুটি শুকাইয়া যায়।

টুকটুকে মুখখানি নিয়ে
গোলাপ হাসিছে মুচকিয়ে,
বকুল প্রাণের সুধা দিয়ে,
বায়ুরে মাতাল করি তুলে—
প্রজাপতি ভাবিয়া না পায়
কাহারে তাহার প্রাণ চায়,

তুলিয়া অলস পাখা দুটি
ভ্রমিতেছে ফুল হতে ফুলে—
সেই হাসি-রাশির মাঝারে
আমি কেন থাকিতে না পাই!
যেমনি নয়ন মেলি, হায়,
সুখের নিমেষটির প্রায়,
অতৃপ্ত হাসিটি মুখে লয়ে
অমনি কেন গো মরে যাই!”
শুয়ে শুয়ে অশোক-পাতায়
মুমূর্ষু শিশির বলে, “হায়,
কোনো সুখ ফুরায় নি যার
তার কেন জীবন ফুরায়?”

“আমি কেন হই নি শিশির?”
কহে কবি নিশ্বাস ফেলিয়া।
“প্রভাতেই যেতেম শুকায়ে
প্রভাতেই নয়ন মেলিয়া।
হে বিধাতা, শিশিরের মতো
গড়েছ আমার এই প্রাণ,
শিশিরের মরণটি কেন
আমারে কর নি তবে দান?”

সংগ্রাম-সংগীত

হৃদয়ের সাথে আজি
করিব রে করিব সংগ্রাম।
এতদিন কিছু না করিনু,
এতদিন বসে রহিলাম,
আজি এই হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম।

বিদ্রোহী এ হৃদয় আমার
জগৎ করিছে ছারখার।
গ্রাসিছে চাঁদের কায়া ফেলিয়া আঁধার ছায়া
সুবিশাল রাহুর আকার।
মেলিয়া আঁধার গ্রাস দিনেরে দিতেছে ত্রাস,
মলিন করিছে মুখ তার।
উষার মুখের হাসি লয়েছে কাড়িয়া,
গভীর বিরামময় সন্ধ্যার প্রাণের মাঝে
দুরন্ত অশান্তি এক দিয়াছে ছাড়িয়া।

প্রাণ হতে মুছিতেছে অরুণের রাগ,
দিতেছে প্রাণের মাঝে কলঙ্কের দাগ।
প্রাণের পাখির গান দিয়াছে থামায়ে,
বেড়াত যে সাধগুলি মেঘের দোলায় দুলি
তাদের দিয়াছে হায় ভূতলে নামায়ে।
ক্রমশই বিছাইছে অন্ধকার পাখা,
আঁখি হতে সব কিছু পড়িতেছে ঢাকা।
ফুল ফুটে, আমি আর দেখিতে না পাই;
পাখি গাহে, মোর কাছে গাহে না সে আর;
দিন হল, আলো হল, তবু দিন নাই,
আমি শুধু নেহারি পাখার অন্ধকার।
মিছা বসে রহিব না আর,
চরাচর হারায় আমার।
রাজ্যহারা ভিখারির সাজে
দগ্ধ ধ্বংস-ভস্ম-'পরি ভ্রমিব কি হাহা করি
জগতের মরুভূমি-মাঝে?

আজ তবে হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম।
ফিরে নেব, কেড়ে নেব আমি
জগতের একেকটি গ্রাম।
ফিরে নেব রবিশশীতারা,
ফিরে নেব সন্ধ্যা আর উষা,
পৃথিবীর শ্যামল যৌবন,
কাননের ফুলময় ভূষা।
ফিরে নেব হারানো সংগীত,
ফিরে নেব মৃতের জীবন,
জগতের ললাট হইতে
আঁধার করিব প্রক্ষালন।
আমি হব সংগ্রামে বিজয়ী,
হৃদয়ের হবে পরাজয়,
জগতের দূর হবে ভয়।

হৃদয়েরে রেখে দেব বেঁধে,
বিরলে মরিবে কেঁদে কেঁদে।
দুঃখে বিঁধি কণ্টে বিঁধি জর্জর করিব হৃদি
বন্দী হয়ে কাটাবে দিবস,
অবশেষে হইবে সে বশ,
জগতে রটিবে মোর যশ।
বিশ্বচরাচরময় উচ্ছ্বসিবে জয় জয়,
উল্লাসে পুরিবে চারি ধার,
গাবে রবি, গাবে শশী, গাবে তারা শূন্যে বসি,

গাবে বায়ু শত শত বার।
চারি দিকে দিবে হুলুধ্বনি,
বরষিবে কুসুম-আসার,
বেঁধে দেব বিজয়ের মালা
শান্তিময় ললাটে আমার।

আমি-হারা

হায় হায়,
জীবনের তরুণ বেলায়,
কে ছিল রে হৃদয়-মাঝারে,
দুলিত রে অরুণ-দোলায়!
হাসি তার ললাটে ফুটিত,
হাসি তার ভাসিত নয়নে,
হাসি তার ঘুমায়ে পড়িত
সুকোমল অধরশয়নে।
ঘুমাইলে, নন্দনবালিকা
গেঁথে দিত স্বপনমালিকা;
জাগরণে, নয়নে তাহার
ছায়াময় স্বপন জাগিত;
আশা তার পাখা প্রসারিয়া
উড়ে যেত উধাও হইয়া,
চাঁদের পায়ের কাছে গিয়ে
জ্যোৎস্নাময় অমৃত মাগিত।
বনে সে তুলিত শুধু ফুল,
শিশির করিত শুধু পান,
প্রভাতের পাখিটির মতো
হরষে করিত শুধু গান।
কে গো সেই, কে গো হায় হায়,
জীবনের তরুণ বেলায়
খেলাইত হৃদয়-মাঝারে
দুলিত রে অরুণ-দোলায়?
সচেতন অরুণ কিরণ
কে সে প্রাণে এসেছিল নামি?
সে আমার শৈশবের কুঁড়ি,
সে আমার সুকুমার আমি।

প্রতিদিন বাড়িল আঁধার,
পথমাঝে উড়িল রে ধূলি,
হৃদয়ের অরণ্য-আঁধারে
দুজনে আইনু পথ ভুলি।

নয়নে পড়িছে তার রেণু,
শাখা বাজে সুকুমার কায়,
ঘন ঘন বহিছে নিশ্বাস
কাঁটা বিঁধে সুকোমল পায়।
ধুলায় মলিন হল দেহ,
সভয়ে মলিন হল মুখ,
কেঁদে সে চাহিল মুখপানে
দেখে মোর ফেটে গেল বুক।

কেঁদে সে কহিল মুখ চাহি,
"ওগো মোরে আনিলে কোথায়?
পায় পায় বাজিতেছে বাধা,
তরুশাখা লাগিছে মাথায়।
চারি দিকে মলিন আঁধার,
কিছু হেথা নাহি যে সুন্দর,
কোথা গো শিশির-মাখা ফুল,
কোথা গো প্রভাতরবিকর?"
কেঁদে কেঁদে সাথে সে চলিল,
কহিল সে সকরুণ স্বর,
"কোথা গো শিশির-মাখা ফুল,
কোথা গো প্রভাতরবিকর।"
প্রতিদিন বাড়িল আঁধার,
পথ হল পঙ্কিল মলিন—
মুখে তার কথাটিও নাই,
দেহ তার হল বলহীন।
অবশেষে একদিন, কেমনে, কোথায়, কবে
কিছুই যে জানি নে গো হায়,
হারাইয়া গেল সে কোথায়।

রাখো দেব, রাখো, মোরে রাখো,
তোমার স্নেহেতে মোরে ঢাকো,
আজি চারি দিকে মোর এ কী অন্ধকার ঘোর,
একবার নাম ধরে ডাকো।
পারি না যে সামালিতে, কাঁদি গো আকুল চিতে,
কত রব মৃত্তিকা বহিয়া।
ধূলিময় দেহখানি ধুলায় আনিছে টানি,
ধুলায় দিতেছে ঢাকি হিয়া।

হারায়েছি আমার আমারে,
আজি আমি ভ্রমি অন্ধকারে।
কখনো বা সন্ধ্যাবেলা আমার পুরানো সাথী
মুহূর্তের তরে আসে প্রাণে,

চারি দিক নিরখে নয়ানে।
প্রণয়ীর শ্মশানেতে একেলা বিরলে আসি
প্রণয়ী যেমন কেঁদে যায়,
নিজের সমাধি-'পরে নিজে বসি উপছায়া
যেমন নিশ্বাস ফেলে হায়,
কুসুম শুকায়ে গেলে যেমন সৌরভ তার
কাছে কাছে কাঁদিয়া বেড়ায়,
সুখ ফুরাইয়া গেলে একটি মলিন হাসি
অধরে বসিয়া কেঁদে চায়,
তেমনি সে আসে প্রাণে— চায় চারি দিক-পানে,
কাঁদে, আর কেঁদে চলে যায়।
বলে শুধু, "কী ছিল, কী হল,
সে সব কোথায় চলে গেল!"

বহুদিন দেখি নাই তারে,
আসে নি এ হৃদয়-মাঝারে।
মনে করি মনে আনি তার সেই মুখখানি,
ভালো করে মনে পড়িছে না।
হৃদয়ে যে ছবি ছিল ধুলায় মলিন হল
আর তাহা নাহি যায় চেনা।
ভুলে গেছি কী খেলা খেলিত,
ভুলে গেছি কী কথা বলিত।
যে গান গাহিত সদা সুর তার মনে আছে,
কথা তার নাহি পড়ে মনে;
যে আশা হৃদয়ে লয়ে উড়িত সে মেঘ-চেয়ে
আর তাহা পড়ে না স্মরণে।
শুধু যবে হৃদি-মাঝে চাই।
মনে পড়ে— কী ছিল, কী নাই!

গান-সমাপন

জনমিয়া এ সংসারে কিছুই শিখি নি আর,
শুধু গাই গান।
স্নেহময়ী মার কাছে শৈশবে শিখিয়াছিনু
দুয়েকটি তান।
শুধু জানি তাই,
দিবানিশি তাই শুধু গাই।
শতছিদ্রময় এই হৃদয়-বাঁশিটি লয়ে
বাজাই সতত,
দুঃখের কঠোর স্বর রাগিণী হইয়া যায়,
মৃদুল নিশ্বাসে পরিণত।

আঁধার জলদ যেন ইন্দ্রধনু হয়ে যায়,
ভুলে যাই সকল যাতনা।
ভালো যদি না লাগে সে গান
ভালো সখা, তাও গাহিব না।

এমন পণ্ডিত কত রয়েছেন শত শত
এ সংসারতলে,
আকাশের দৈত্যবালা উন্মাদিনী চপলারে
বেঁধে রাখে দাসত্বের লোহার শিকলে।
আকাশ ধরিয়া হাতে নক্ষত্র-অক্ষর দেখি
গ্রন্থ পাঠ করিছেন তাঁরা,
জ্ঞানের বন্ধন যত ছিন্ন করে দিতেছেন
ভাঙি ফেলি অতীতের কারা।
আমি তার কিছুই করি না,
আমি তার কিছুই জানি না।
এমন মহান্ এ সংসারে
জ্ঞানরত্নরাশির মাঝারে
আমি দীন শুধু গান গাই,
তোমাদের মুখপানে চাই।
ভালো যদি না লাগে সে গান,
ভালো সখা, তাও গাহিব না।

বড়ো ভয় হয়, পাছে কেহই না দেখে তারে
যে জন কিছুই শেখে নাই।
ওগো সখা, ভয়ে ভয়ে তাই
যাহা জানি সেই গান গাই,
তোমাদের মুখপানে চাই।
শ্রান্ত দেহ হীনবল, নয়নে পড়িছে জল,
রক্ত ঝরে চরণে আমার,
নিশ্বাস বহিছে বেগে, হৃদয়-বাঁশিটি মম
বাজে না বাজে না বুঝি আর।
দিন গেল, সন্ধ্যা গেল, কেহ দেখিলে না চেয়ে
যত গান গাই।
বুঝি কারো অবসর নাই।
বুঝি কারো ভালো নাহি লাগে--
ভালো সখা, আর গাহিব না।

উপহার

ভুলে গেছি কবে তুমি ছেলেবেলা একদিন
মরমের কাছে এসেছিলে,
স্নেহময় ছায়াময় সন্ধ্যাসম আঁখি মেলি
একবার বুঝি হেসেছিলে।

বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি—
চাহিলে হৃদয়পানে মরমেতে পড়ে ছায়া,
তারা উঠে ফুটি।

আগে কে জানিত বলো কত কী লুকানো ছিল
হৃদয়নিভৃতে,
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।

কখনো গাও নি তুমি, কেবল নীরবে রহি
শিখায়েছ গান,
স্বপ্নময় শান্তিময় পূরবীরাগিণী-তানে
বাঁধিয়াছ প্রাণ।

আকাশের পানে চাই, সেই সুরে গান গাই
একেলা বসিয়া।
একে একে সুরগুলি, অনন্তে হারায়ে যায়
আঁধারে পশিয়া।

বলো দেখি কতদিন
আস নি এ শূন্য প্রাণে,
বলো দেখি কতদিন
চাও নি হৃদয়পানে,
বলো দেখি কতদিন
শোন নি এ মোর গান—
তবে সখী গান-গাওয়া
হল বুঝি অবসান।

যে রাগ শিখায়েছিলে সে কি আমি গেছি ভুলে?
তার সাথে মিলিছে না সুর?
তাই কি আস না প্রাণে, তাই কি শোন না গান—
তাই সখী, রয়েছ কি দূর?

ভালো সখী, আবার শিখাও,
আরবার মুখপানে চাও.
একবার ফেলো অশ্রুজল
আঁখিপানে দুটি আঁখি তুলি।
তা হলে পুরানো সুর আবার পড়িবে মনে,
আর কভু যাইব না ভুলি।

সেই পুরাতন চোখে মাঝে মাঝে চেয়ো সখী,
উজলিয়া স্মৃতির মন্দির।
এই পুরাতন প্রাণে মাঝে মাঝে এসো সখী,
শূন্য আছে প্রাণের কুটীর।
নহিলে আঁধার মেঘরাশি
হৃদয়ের আলোক নিবাবে,
একে একে ভুলে যাব সুর,
গান গাওয়া সাঙ্গ হয়ে যাবে।

সংযোজন

'বিষ ও সুধা' কবিতার এক পৃষ্ঠা। মালতী পুঁথি

পরবাসী ক্ষীণ আয়ু একটি মুমূর্ষু বায়ু
স্বদেশ কানন পানে ধায়
আর [illegible]তে না চায় ;
~~যেমনি [illegible], মৃত্যুশয্যার পাশে,~~
শেষ কথা বলিতে বলিতে
তখনি অমনি ম'রে যায় ।
তেমনি, তেমনি ম'রে এসো,
কবিতা রে, বধূটি আমার,
ম্লান মুখে করুণা বসিয়া
চোখে ধীরে ঝরে অশ্রু ধার ।
দুটি শুধু পড়িবে নিশ্বাস,
দুটি শুধু বাহিরিবে বাণী,
বাহু দুটি হৃদয়ে জড়ায়ে
হৃদয়ে রাখিবি মুখখানি ।

ত
যেমন।/
ত

সন্ধ্যা

~~[illegible]~~
সন্ধ্যা তুই ধীরে ধীরে আয় /
কাছে আয়—আরো কাছে আয়—
সখীহারা হৃদয় আমার
তোর বুকে লুকাইতে চায় ।

~~[illegible]~~
তোর কাছে কহি মনকথা,
তোর কাছে করি প্রসারিত
প্রাণের নিভৃত নীরবতা ।
তোর গান শুনিতে শুনিতে
তোর তারা গণিতে গণিতে,
নয়ন মুদিয়া আসে মোর,
হৃদয় হইয়া আসে ভোর—
স্বপন-গোধূলিময় প্রাণ
হারায় প্রাণের মাঝে তোর ।
একটি কথাও নাই মুখে,
চেয়ে শুধু রোস মুখ পানে
অনিমেষ আকুল নয়ানে ।
ধীরে শুধু ফেলিস নিশ্বাস,
ধীরে শুধু কানে কানে গা'স
ঘুম-পাড়াবার মৃদু গান,

ত এ কবিতাটি
৭/ অসহ্য পুনরাবৃত্তি
সংশোধনের অতীত
ত এটা পরিত্যাজ্য

কবি-কর্তৃক সংশোধিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর (১৯০১) প্রুফ

সন্ধ্যা

ব্যথা বড়ো বাজিয়াছে প্রাণে,
সন্ধ্যা তুই ধীরে ধীরে আয়!
কাছে আয়—আরো কাছে আয়—
সঙ্গীহারা হৃদয় আমার
তোর বুকে লুকাইতে চায়।
আমার ব্যথার তুই ব্যথী,
তুই মোর একমাত্র সাথী,
সন্ধ্যা তুই আমার আলয়,
তোরে আমি বড়ো ভালোবাসি—
সারাদিন ঘুরে ঘুরে ঘুরে
তোর কোলে ঘুমাইতে আসি,
তোর কাছে ফেলি রে নিশ্বাস,
তোর কাছে কহি মনোকথা,
তোর কাছে করি প্রসারিত
প্রাণের নিভৃত নীরবতা।
তোর গান শুনিতে শুনিতে
তোর তারা গুনিতে গুনিতে,
নয়ন মুদিয়া আসে মোর,
হৃদয় হইয়া আসে ভোর—
স্বপন-গোধূলিময় প্রাণ
হারায় প্রাণের মাঝে তোর!
একটি কথাও নাই মুখে,
চেয়ে শুধু রোস মুখপানে
অনিমেষ আনত নয়ানে।
ধীরে শুধু ফেলিস নিশ্বাস,
ধীরে শুধু কানে কানে গাস
ঘুম-পাড়াবার মৃদু গান,
কোমল কমল কর দিয়ে
ঢেকে শুধু দিস দুনয়ান,
ভুলে যাই সকল যাতনা
জুড়াইয়া আসে মোর প্রাণ!
তাই তোরে ডাকি একবার
সঙ্গীহারা হৃদয় আমার,
তোর বুকে লুকাইয়া মাথা
তোর কোলে ঘুমাইতে চায়,
সন্ধ্যা তুই ধীরে ধীরে আয়।
আঁধার আঁচল দিয়ে তোর
আমার দুখেরে ঢেকে রাখ,

বল তারে ঘুমাইতে বল
কপালেতে হাতখানি রাখ,
জগতেরে ক'রে দে আড়াল.
কোলাহল করিয়া দে দূর—
দুখেরে কোলেতে করে নিয়ে
র'চে দে নিভৃত অন্তঃপুর।
তা হলে সে কাঁদিবে বসিয়া,
কল্পনার খেলেনা গড়িবে,
খেলিয়া আপন মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, শেষে
আপনি সে ঘুমায়ে পড়িবে।

আয় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আয়,
হাতে লয়ে স্বপনের ডালা,
গুন্ গুন্ মন্ত্র পড়ি পড়ি
গাঁথিয়া দে স্বপনের মালা,
জড়ায়ে দে আমার মাথায়,
স্নেহ-হস্ত বুলায়ে দে গায়!
স্রোতস্বিনী ঘুমঘোরে, গাবে কুলু কুলু করে
ঘুমেতে জড়িত আধো গান,
ঝিল্লিরা ধরিবে একতান,
দিনশ্রমে শ্রান্ত বায়ু গৃহমুখে যেতে যেতে
গান গাবে অতি মৃদু স্বরে,
পদশব্দ শুনি তার তন্দ্রা ভাঙি লতা পাতা
ভর্ৎসনা করিবে মর মরে।
ভাঙা ভাঙা গানগুলি মিলিয়া হৃদয়-মাঝে
মিশে যাবে স্বপনের সাথে,
নানাবিধ রূপ ধরি ভ্রমিয়া বেড়াবে তারা,
হৃদয়ের গুহাতে গুহাতে!

আয় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আয়,
আন তোর স্বর্ণ মেঘজাল,
পশ্চিমের সুবর্ণ প্রাঙ্গণে
খেলিবি মেঘের ইন্দ্রজাল!
ওই তোর ভাঙা মেঘগুলি,
হৃদয়ের খেলেনা আমার,
ওইগুলি কোলে করে নিয়ে
সাধ যায় খেলি অনিবার।
ওই তোর জলদের 'পর
বাঁধি আমি কত শত ঘর!
সাধ যায় হোথায় লুটাই,
অস্তগামী রবির মতন,
লুটায়ে লুটায়ে পড়ি শেষে

সাগরের ওই প্রান্তদেশে
তরল কনক নিকেতন!
ছোটো ছোটো ওই তারাগুলি,
ডাকে মোরে আঁখি-পাতা খুলি।
স্নেহময় আঁখিগুলি যেন
আছে শুধু মোর পথ চেয়ে,
সন্ধ্যার আঁধারে বসি বসি
কহে যেন গান গেয়ে গেয়ে,
"কবে তুমি আসিবে হেথায়
অন্ধকার নিভৃত-নিলয়ে,
জগতের অতি প্রান্তদেশে
প্রদীপটি রেখেছি জ্বালায়ে!
বিজনেতে রয়েছি বসিয়া
কবে তুমি আসিবে হেথায়!"
সন্ধ্যা হলে মোর মুখ চেয়ে
তারাগুলি এই গান গায়!
আয় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আয়,
জগতের নয়ন ঢেকে দে—
আঁধার আঁচল পেতে দিয়ে
কোলেতে মাথাটি রেখে দে!

কেন গান গাই

গুরুভার মন লয়ে, কত বা বেড়াবি ব'য়ে?
এমন কি কেহ তোর নাই,
যাহার হৃদয়-'পরে মিলিবে মুহূর্ত তরে
হৃদয়টি রাখিবার ঠাঁই?
"কেহ না, কেহ না!"

সংসারে যে দিকে ফিরে চাই
এমন কি কেহ তোর নাই—
তোর দিন শেষ হলে, স্মৃতিখানি লয়ে কোলে,
শোয়াইয়া বিষাদের কোমল শয়নে,
বিমল শিশির-মাখা প্রেম-ফুলে দিয়ে ঢাকা
চেয়ে রবে আনত নয়নে?
হৃদয়েতে রেখে দিবে তুলে,
প্রতিদিন ঢেকে দিবে ফুলে,
মনোমাঝে প্রবেশিয়ে বিন্দু বিন্দু অশ্রু দিয়ে
বৃন্ত-ছিন্ন প্রেম-ফুলগুলি
রাখিবেক জিয়াইয়া তুলি?

এমন কি কেহ তোর নাই?
"কেহ না, কেহ না!"

প্রাণ তুই খুলে দিলি, ভালোবাসা বিলাইলি,
কেহ তাহা তুলে না লইল,
ভূমিতলে পড়িয়া রহিল;
ভালোবাসা কেন দিলি তবে
কেহ যদি কুড়ায়ে না লবে?
কেন সখা কেন?
"জানি না, জানি না!"

বিজনে বনের মাঝে ফুল এক আছে ফুটে
শুধাইতে গেনু তার কাছে,
"ফুল, তুই এ আঁধারে পরিমল দিস কারে,
এ কাননে কে বা তোর আছে?
যখন পড়িবি তুই ঝরে,
শুকাইয়া দলগুলি ধূলিতে হইবে ধূলি,
মনে কি করিবে কেহ তোরে!
তবে কেন পরিমল ঢেলে দিস অবিরল
ছোটো মনখানি ভ'রে ভ'রে?
কেন, ফুল, কেন?
সেও বলে, "জানি না, জানি না!"

সখা, তুমি গান গাও কেন,
কেহ যদি শুনিতে না চায়?
ওই দেখো পথমাঝে যে যাহার নিজ কাজে
আপনার মনে চলে যায়।
কেহ যদি শুনিতে না চায়
কেন তবে, কেন গাও গান,
আকাশে ঢালিয়া দাও প্রাণ?
গান তব ফুরাইবে যবে,
রাগিণী কারো কি মনে রবে?
বাতাসেতে স্বরধার খেলিয়াছে অনিবার,
বাতাসে সমাধি তার হবে।
কাহারো মনেও নাহি রবে,
কেন সখা গান গাও তবে?
কেন, সখা, কেন?
"জানি না, জানি না!"

বিজন তরুর শাখে একাকী পাখিটি ডাকে,
শুধাইতে গেনু তার কাছে,
"পাখি তুই এ আঁধারে গান শুনাইবি কারে?

এ কাননে কে বা তোর আছে!
যখনি ফুরাবে তোর প্রাণ,
যখনি থামিবে তোর গান,
বন ছিল যেমন নীরবে,
তেমনি নীরব পুন হবে।
যেমনি থামিবে গীত, অমনি সে সচকিত
প্রতিধ্বনি আকাশে মিলাবে,
তোর গান তোরি সাথে যাবে!
আকাশে ঢালিয়া দিয়া প্রাণ,
তবে, পাখি, কেন গাস গান?
কেন, পাখি, কেন?
সেও বলে, "জানি না, জানি না!"

কেন গান শুনাই

এসো সখি, এসো মোর কাছে,
কথা এক শুধাবার আছে!

চেয়ে তব মুখপানে ব'সে এই ঠাঁই—
প্রতিদিন যত গান তোমারে শুনাই,
বুঝিতে কি পার সখি কেন যে তা গাই?
শুধু কি তা পশে কানে? কথাগুলি তার
কোথা হতে উঠিতেছে ভাবো একবার?
বুঝ না কি হৃদয়ের
কোন্‌খানে শেল ফুটে
তবে প্রতি কথাগুলি
আর্তনাদ করি উঠে!
যখন নয়নে উঠে বিন্দু অশ্রুজল,
তখন কি তাই তুই দেখিস কেবল?
দেখ না কি কী সমুদ্র হৃদয়েতে উথলিছে,
শুধু কণামাত্র তার আঁখি-প্রান্তে বিগলিছে!
যখন একটি শুধু উঠে রে নিশ্বাস,
তখন কি তাই শুধু শুনিবারে পাস?
শুনিস না কী ঝটিকা হৃদয়ে বেড়ায় ছুটে,
একটি উচ্ছ্বাস শুধু বাহিরেতে ফুটে!
যে কথাটি বলি আমি শোনো শুধু তাই?
শোনো না কি যত কথা বলা হইল না?
যত কথা বলিবারে চাই?

আমি কি শুনাই গান
ভালো মন্দ করিতে বিচার?

যবে এ নয়ন হতে বহে অশ্রুধার—
শুধু কি রে দেখিবি তখন
সে অশ্রু উজ্জ্বল কি না হীরার মতন?
আমার এ গান তোরে যখন শুনাই
নিন্দা বা প্রশংসা আমি কিছু নাহি চাই-
যে হৃদি দিয়েছি তোরে
তাই তোরে দেখাবারে চাই,
তারি ভাষা বুঝাবারে চাই,
তারি ব্যথা জানাবারে চাই,
আর কিবা চাই?
সেই হৃদি দেখিলি যখন,
তারি ভাষা বুঝিলি যখন,
তারি ব্যথা জানিলি যখন
তখন একটি বিন্দু অশ্রুবারি চাই!
(আর কিবা চাই!)

আয় সখি কাছে মোর আয়,
কথা এক শুধাব তোমায়—
এত গান শুনালেম এত অনুরাগে
কথা তার বুকে কি লো লাগে?
একটি নিশ্বাস কি লো জাগে?
কথা শুধু শুনিয়া কি যাস?
ভালো মন্দ বুঝিস কেবল?
প্রাণের ভিতর হতে
উঠে না একটি অশ্রুজল?

বিষ ও সুধা

অস্ত গেল দিনমণি। সন্ধ্যা আসি ধীরে
দিবসের অন্ধকার সমাধির 'পরে
তারকার ফুলরাশি দিল ছড়াইয়া।
সাবধানে অতি ধীরে নায়ক যেমন
ঘুমন্ত প্রিয়ার মুখ করয়ে চুম্বন,
দিন-পরিশ্রমে ক্লান্ত পৃথিবীর দেহ
অতি ধীরে পরশিল সায়াহ্নের বায়ু।
দুরন্ত তরঙ্গগুলি যমুনার কোলে
সারাদিন খেলা করি পড়েছে ঘুমায়ে।
ভগ্ন দেবালয়খানি যমুনার ধারে,
শিকড়ে শিকড়ে তার ছায়ি জীর্ণ দেহ
বট অশথের গাছ জড়াজড়ি করি

আঁধারিয়া রাখিয়াছে ভগন হৃদয়,
দুয়েকটি বায়ুচ্ছ্বাস পথ ভুলি গিয়া
আঁধার আলয়ে তার হয়েছে আটক,
অধীর হইয়া তারা হেথায় হোথায়
হু হু করি বেড়াইছে পথ খুঁজি খুঁজি!
শুন সন্ধ্যে! আবার এসেছি আমি হেথা,
নীরব আঁধারে তব বসিয়া বসিয়া
তটিনীর কলধ্বনি শুনিতে এয়েছি।
হে তটিনী, ও কি গান গাইতেছ তুমি!
দিন নাই, রাত্রি নাই, এক তানে শুধু
এক সুরে এক গান গাইছ সতত—
এত মৃদুস্বরে ধীরে, যেন ভয় করি
সন্ধ্যার প্রশান্ত স্বপ্ন ভেঙে যায় পাছে!
এ নীরব সন্ধ্যাকালে তব মৃদু গান
একতান ধ্বনি তব শুনে মনে হয়
এ হৃদি-গানেরি যেন শুনি প্রতিধ্বনি!
মনে হয় যেন তুমি আমারি মতন
কী এক প্রাণের ধন ফেলেছ হারায়ে।
এসো স্মৃতি, এসো তুমি এ ভগ্ন হৃদয়ে—
সায়াহ্ন-রবির মৃদু শেষ রশ্মিরেখা
যেমন পড়েছে ওই অন্ধকার মেঘে
তেমনি ঢালো এ হৃদে অতীত-স্বপন!
কাঁদিতে হয়েছে সাধ বিরলে বসিয়া,
কাঁদি একবার, দাও সে ক্ষমতা মোরে!

যাহা কিছু মনে পড়ে ছেলেবেলাকার
সমস্ত মালতীময়—মালতী কেবল
শৈশবকালের মোর স্মৃতির প্রতিমা!
দুই ভাই বোনে মোরা আছিনু কেমন!
আমি ছিনু ধীর শান্ত গম্ভীর-প্রকৃতি,
মালতী প্রফুল্ল অতি সদা হাসি হাসি!
ছিল না সে উচ্ছ্বসিনী নির্ঝরিণী সম
শৈশব-তরঙ্গবেগে চঞ্চলা সুন্দরী,
ছিল না সে লজ্জাবতী লতাটির মতো
শরম-সৌন্দর্যভরে ম্রিয়মাণ-পারা।
আছিল সে প্রভাতের ফুলের মতন,
প্রশান্ত হরষে সদা মাখানো মুখখানি;
সে হাসি গাহিত শুধু উষার সংগীত—
সকলি নবীন আর সকলি বিমল!
মালতীর শান্ত সেই হাসিটির সাথে
হৃদয়ে জাগিত যেন প্রভাত পবন,
নূতন জীবন যেন সঞ্চারিত মনে!

ছেলেবেলাকার যত কবিতা আমার
সে হাসির কিরণেতে উঠেছিল ফুটি!
মালতী ছুঁইত মোর হৃদয়ের তার,
তাইতে শৈশব-গান উঠিত বাজিয়া!
এমনি আসিত সন্ধ্যা, শ্রান্ত জগতেরে
স্নেহময় কোলে তার ঘুম পাড়াইতে।
সুবর্ণ-সলিল-সিক্ত সায়াহ্ন-অম্বরে
গোধূলির অন্ধকার নিঃশব্দ চরণে
ছোটো ছোটো তারাগুলি দিত ফুটাইয়া,
নন্দনবনের যেন চাঁপা ফুল দিয়ে
ফুলশয্যা সাজাইত সুরবালাদের!
মালতীরে লয়ে পাশে আসিতাম হেথা:
সন্ধ্যার সংগীতস্বরে মিলাইয়া স্বর
মৃদুস্বরে শুনাতেম শৈশব-কবিতা!
হর্ষময় গর্বে তার আঁখি উজলিত—
অবাক ভক্তির ভাবে ধরি মোর হাত
একদৃষ্টে মুখপানে রহিত চাহিয়া।
তার সে হরষ হেরি আমারো হৃদয়
কেমন মধুর গর্ব উঠিত উথলি!
ক্ষুদ্র এক কুটীর আছিল আমাদের,
নিস্তব্ধ-মধ্যাহ্নে আর নীরব সন্ধ্যায়
দূর হতে তটিনীর কলস্বর আসি
শান্ত কুটীরের প্রাণে প্রবেশিয়া ধীরে
করিত সে কুটীরের স্বপন রচনা।
দুই জনে ছিনু মোরা কল্পনার শিশু—
বনে ভ্রমিতাম যবে, সুদূরে নির্ঝরে
বনশ্রীর পদধ্বনি পেতাম শুনিতে!
যাহা কিছু দেখিতাম সকলের মাঝে
জীবন্ত প্রতিমা যেন পেতেম দেখিতে!
কত জোছনার রাত্রে মিলি দুই জনে
ভ্রমিতাম যমুনার পুলিনে পুলিনে,
মনে হত এ রজনী পোহাতে চাবে না,
সহসা কোকিল রব শুনিয়া উষায়,
সহসা যখনি শ্যামা গাহিয়া উঠিত,
চমকিয়া উঠিতাম, কহিতাম মোরা,
"এ কী হল! এরি মধ্যে পোহাল রজনী!"
দেখিতাম পূর্ব দিকে উঠেছে ফুটিয়া
শুকতারা, রজনীর বিদায়ের পথে,
প্রভাতের বায়ু ধীরে উঠিছে জাগিয়া,
আসিছে মলিন হয়ে আঁধারের মুখ।
তখন আলয়ে দোঁহে আসিতাম ফিরি,
আসিতে আসিতে পথে শুনিতাম মোরা

গাইছে বিজন-কুঞ্জে বউ-কথা-কও।
ক্রমশঃ বালক-কাল হল অবসান,
নীরদের প্রেম-দৃষ্টে পড়িল মালতী,
নীরদের সাথে তার হইল বিবাহ!
মাঝে মাঝে যাইতাম তাদের আলয়ে;
দেখিতাম, মালতীর শান্ত সে হাসিতে
কুটীরেতে রাখিয়াছে প্রভাত ফুটায়ে!

সঙ্গীহারা হয়ে আমি ভ্রমিতাম একা,
নিরাশ্রয় এ হৃদয় অশান্ত হইয়া
কাঁদিয়া উঠিত যেন অধীর উচ্ছ্বাসে!
কোথাও পেত না যেন আরাম বিশ্রাম!
অন্যমনে আছি যবে, হৃদয় আমার
সহসা স্বপন ভাঙি উঠিত চমকি!
সহসা পেত না ভেবে, পেত না খুঁজিয়া
আগে কী ছিল রে যেন এখন তা নাই!
প্রকৃতির কি-যেন কী গিয়াছে হারায়ে
মনে তাহা পড়িছে না! ছেলেবেলা হতে
প্রকৃতির যেই ছন্দ এসেছি শুনিয়া
সেই ছন্দোভঙ্গ যেন হয়েছে তাহার,
সেই ছন্দে কী কথার পড়েছে অভাব—
কানেতে সহসা তাই উঠিত বাজিয়া,
হৃদয় সহসা তাই উঠিত চমকি!
জানি না কিসের তরে, কী মনের দুখে
দুয়েকটি দীর্ঘশ্বাস উঠিত উচ্ছ্বসি!
শিখর হতে শিখরে, বন হতে বনে,
অন্যমনে একেলাই বেড়াতাম ভ্রমি--
সহসা চেতন পেয়ে উঠিয়া চমকি
সবিস্ময়ে ভাবিতাম, কেন ভ্রমিতেছি,
কেন ভ্রমিতেছি তাহা পেতেম না ভাবি!

একদিন নবীন বসন্ত-সমীরণে
বউ-কথা-কও যবে খুলেছে হৃদয়,
বিষাদে সুখেতে মাখা প্রশান্ত কী ভাব
প্রাণের ভিতরে যবে রয়েছে ঘুমায়ে,
দেখিনু বালিকা এক, নির্ঝরের ধারে
বন-ফুল তুলিতেছে আঁচল ভরিয়া!
দুপাশে কুন্তল-জাল পড়েছে এলায়ে,
মুখেতে পড়েছে তার উষার কিরণ।
কাছেতে গেলাম তার, কাঁটা বাছি ফেলি
কানন-গোলাপ তারে দিলাম তুলিয়া।
প্রতিদিন সেইখানে আসিত দামিনী,

তুলিয়া দিতাম ফুল, শুনাতেম গান,
কহিতাম বালিকারে কত কী কাহিনী,
শুনি সে হাসিত কভু, শুনিত না কভু,
আমি ফুল তুলে দিলে ফেলিত ছিঁড়িয়া।
ভর্ৎসনার অভিনয়ে কহিত কত কী!
কভু বা ভ্রূকুটি করি রহিত বসিয়া,
হাসিতে হাসিতে কভু যাইত পলায়ে,
অলীক শরমে কভু হইত অধীর।
কিন্তু তার ভ্রূকুটিতে, শরমে, সংকোচে,
লুকানো প্রেমেরি কথা করিত প্রকাশ!
এইরূপে প্রতি উষা যাইত কাটিয়া।
একদিন সে বালিকা না আসিত যদি
হৃদয় কেমন যেন হইত বিকল—
প্রভাত কেমন যেন যেত না কাটিয়া—
দিন যেত অতি ধীরে নিরাশ-চরণে!
বর্ষচক্র আর বার আসিল ফিরিয়া,
নূতন বসন্তে পুনঃ হাসিল ধরণী,
প্রভাতে অলস ভাবে, বসি তরুতলে,
দামিনীরে শুধালেম কথায় কথায়,
"দামিনী, তুমি কি মোরে ভালোবাস বালা?"
অলীক-শরম-রোষে ভ্রূকুটি করিয়া
ছুটে সে পলায়ে গেল দূর বনান্তরে—
জানি না কী ভাবি পুনঃ ছুটিয়া আসিয়া
"ভালোবাসি—ভালোবাসি—" কহিয়া অমনি
শরমে-মাখানো মুখ লুকালো এ বুকে।
এইরূপে দিন যেত স্বপ্ন-খেলা খেলি।
কত ক্ষুদ্র অভিমানে কাঁদিত বালিকা,
কত ক্ষুদ্র কথা লয়ে হাসিত হরষে—
কিন্তু জানিতাম কি রে এই ভালোবাসা
দুদিনের ছেলেখেলা, আর কিছু নয়?
কে জানিত প্রভাতের নবীন কিরণে
এমন শতেক ফুল উঠে রে ফুটিয়া,
প্রভাতের বায়ু সনে খেলা সাঙ্গ হলে
আপনি শুকায়ে শেষে ঝরে পড়ে যায়—
ওই ফুলে থুয়েছিনু হৃদয়ের আশা,
ওই কুসুমের সাথে খসে পড়ে গেল!
আর কিছু কাল পরে এই দামিনীরে
যে কথা বলিয়াছিনু আজো মনে আছে।
"দামিনী, মনে কি পড়ে সে দিনের কথা?
বলো দেখি কত দিন ওই মুখখানি
দেখি নি তোমার? তাই দেখিতে এয়েছি!
জোছনার রাত্রে যবে বসেছি কাননে,

দুয়েকটি তারা কভু পড়িছে খসিয়া,
হতবুদ্ধি দুয়েকটি পথহারা মেঘ
অনন্ত আকাশ-রাজ্যে ভ্রমিছে কেবল,
সে নিস্তব্ধ রজনীতে হৃদয়ে যেমন
একে একে সব কথা উঠে গো জাগিয়া,
তেমনি দেখিনু যেই ওই মুখখানি
স্মৃতি-জাগরণকারী রাগিণীর মতো
ওই মুখখানি তব দেখিনু যেমনি
একে একে পুরাতন সব স্মৃতিগুলি
জীবন্ত হইয়া যেন জাগিল হৃদয়ে।
মনে আছে সেই সখি আর-এক দিন
এমনি গম্ভীর সন্ধ্যা, এই নদীতীর,
এইখানে এই হাত ধরিয়া তোমার
কাতরে কহেছি আমি নয়নের জলে,
"বিদায় দাও গো এবে চলিনু বিদেশে,
দেখো সখি এত দিন বাসিয়াছ ভালো,
দুদিন না দেখে যেন যেয়ো না ভুলিয়া!
সংসারের কর্ম হতে অবসর লয়ে
আবার ফিরিয়া যবে আসিব দামিনী,
নব-অতিথির মতো ভেবো না আমারে
সম্ভ্রমের অভিনয় কোরো না বালিকা!"
কিছুই উত্তর তার দিলে না তখন,
শুধু মুখপানে চেয়ে কাতর নয়নে
ভর্ৎসনার অশ্রুজল করিলে বর্ষণ!
যেন এই নিদারুণ সন্দেহের মোর
অশ্রুজল ছাড়া আর নাইকো উত্তর!
আবার কহিনু আমি ওই মুখ চেয়ে,
"কে জানে মনের মধ্যে কী হয়েছে মোর
আশঙ্কা হতেছে যেন হৃদয়ে আমার
ওই স্নেহ-সুধা-মাখা মুখখানি তোর
এ জনমে আর বুঝি পাব না দেখিতে।"
নীরব গম্ভীর সেই সন্ধ্যার আঁধারে
সমস্ত জগৎ যেন দিল প্রতিধ্বনি
"এ জনমে আর বুঝি পাব না দেখিতে।"
গভীর নিশীথে যথা আধো ঘুমঘোরে
সুদূরে শ্মশান হতে মরণের রব
শুনিলে হৃদয় উঠে কাঁপিয়া কেমন,
তেমনি বিজন সেই তটিনীর তীরে
একাকী আঁধারে যেন শুনিনু কী কথা,
সমস্ত হৃদয় যেন উঠিল শিহরি!
আর বার কহিলাম, "বিদায়—ভুলো না।"
তখন কি জানিতাম এই নদীতীরে

এই সন্ধ্যাকালে আর তোমারি সম্মুখে
এমনি মনের দুখে হইবে কাঁদিতে?
তখনো আমার এই বাল্যজীবনের
প্রভাত-নীরদ হতে নব-রক্ত-রাগ
যায় নি মিলায়ে সখি, তখনো হৃদয়
মরীচিকা দেখিতেছিল দূর শূন্য-পটে!
নামিনু সংসার-ক্ষেত্রে যুঝিনু একাকী,
যাহা কিছু চাহিলাম পাইনু সকলি!
তখন ভাবিনু যাই প্রেমের ছায়ায়
এতদিনকার শ্রান্তি যাবে দূর হয়ে।
সন্ধ্যাকালে মরুভূমে পথিক যেমন
নিরখিয়া দেখে যবে সম্মুখে পশ্চাতে
সুদূরে দেখিতে পায় প্রান্ত দিগন্তের
সুবর্ণ জলদজালে মণ্ডিত কেমন,
সে দিকে তারকাগুলি চুম্বিছে প্রান্তর,
সায়াহ্ন-বালার সেথা পূর্ণতম শোভা,
কিন্তু পদতলে তার অসীম বালুকা
সারাদিন জ্বলি জ্বলি তপন-কিরণে
ফেলিছে সায়াহ্নকালে জ্বলন্ত নিশ্বাস।
তেমনি এ সংসারের পথিক যাহারা
ভবিষ্যৎ অতীতের দিগন্তের পানে
চাহি দেখে স্বর্গ সেথা হাসিছে কেবল
পদতলে বর্তমান মরুভূমি সম!
স্মৃতি আর আশা ছাড়া সত্যকার সুখ
মানুষের ভাগ্যে সখি ঘটে নাকো বুঝি!
বিদেশ হইতে যবে আইসে ফিরিয়া
অতি হতভাগা যেও সেও ভাবে মনে
যারে যারে ভালোবাসে সকলেই বুঝি
রহিয়াছে তার তরে আকুল-হৃদয়ে!
তেমনি কতই সখি করেছিনু আশা,
মনে মনে ভেবেছিনু কত-না হরষে
দামিনী আমার বুঝি তৃষিত-নয়নে
পথপানে চেয়ে আছে আমারি আশায়!
আমি গিয়ে কব তারে হরষে কাঁদিয়া,
"মুছ অশ্রুজল সখি, বহু দিন পরে
এসেছে বিদেশ হতে ললিত তোমার"
অমনি দামিনী বুঝি আহ্লাদে উথলি
নীরব অশ্রুর জলে কবে কত কথা!
ফিরিয়া আসিনু যবে—এ কী হল জ্বালা!
কিছুতে নয়নজল নারি সামালিতে!
ফেরো ফেরো চাহিয়ো না এ আঁখির পানে,
প্রাণে বাজে অশ্রুজল দেখাতে তোমায়!

জেনো গো রমণি, জেনো, এত দিন পরে
কাঁদিয়া প্রণয় ভিক্ষা করিতে আসি নি,
এ অশ্রু দুঃখের অশ্রু—এ নহে ভিক্ষার!
কখনো কখনো সখি অন্য মনে যবে
সুবিজন বাতায়নে রয়েছ বসিয়া
সম্মুখে যেতেছে দেখা বিজন প্রান্তর
হেথা হোথা দুয়েকটি বিচ্ছিন্ন কুটীর—
হু হু করি বহিতেছে যমুনার বায়ু—
তখন কি সে দিনের দুয়েকটি কথা
সহসা মনের মধ্যে উঠে না জাগিয়া?
কখন যে জাগি উঠে পার না জানিতে!
দূরতম রাখালের বাঁশিস্বর সম
কভু কভু দুয়েকটি ভাঙা ভাঙা সুর
অতি মৃদু পশিতেছে শ্রবণবিবরে:
আধো জেগে আধো ঘুমে স্বপন আধো-ভোলা—
তেমনি কি সে দিনের দুয়েকটি কথা
সহসা মনের মধ্যে উঠে না জাগিয়া?
স্মৃতির নির্ঝর হতে অলক্ষ্যে গোপনে,
পথহারা দুয়েকটি অশ্রুবারিধারা
সহসা পড়ে না ঝরি নেত্রপ্রান্ত হতে,
পড়িছে কি না পড়িছে পার না জানিতে!
একাকী বিজনে কভু অন্য মনে যবে
বসে থাক, কত কী যে আইসে ভাবনা,
সহসা মুহূর্ত পরে লভিয়া চেতন
কী কথা ভাবিতেছিনু নাহি পড়ে মনে
অথচ মনের মধ্যে বিষণ্ণ কী ভাব
কেমন আঁধার করি রহে যেন চাপি,
হৃদয়ের সেই ভাবে কখনো কি সখি
সে দিনের কোনো ছায়া পড়ে না স্মরণে?
ছেলেবেলাকার কোনো বন্ধুর মরণ
স্মরিলে যেমন লাগে হৃদয়ে আঘাত,
তেমনি কি সখি কভু মনে নাহি হয়
সে সকল দিন কেন গেল গো চলিয়া
যে দিন এ জন্মে আর আসিবে না ফিরি!
পুরাতন বন্ধু তারা, কত কাল আহা
খেলা করিয়াছি মোরা তাহাদের সাথে,
কত সুখে হাসিয়াছি দুঃখে কাঁদিয়াছি,
সে সকল সুখ দুঃখ হাসি কান্না লয়ে
মিশাইয়া গেল তারা আঁধার অতীতে!

চলিনু দামিনী পুনঃ চলিনু বিদেশে-

ভাবিলাম একবার দেখিব মুখানি,
একবার শুনাইব মরমের ব্যথা,
তাই আসিয়াছি সখি, এ জনমে আর
আসিব না দিতে তব শান্তিতে ব্যাঘাত,
এ জন্মের তরে সখি কহো একবার
একটি স্নেহের বাণী অভাগার 'পরে,
ভ্রমিয়া বেড়াব যবে সুদূর বিদেশে
সে কথার প্রতিধ্বনি বাজিবে হৃদয়ে!"

থামো স্মৃতি— থামো তুমি, থামো এইখানে,
সম্মুখে তোমার ও কি দৃশ্য মর্মভেদী?
মালতী আমার সেই প্রাণের ভগিনী,
শৈশবকালের মোর খেলাবার সাথী,
যৌবনকালের মোর আশ্রয়ের ছায়া,
প্রতি দুঃখ প্রতি সুখ প্রতি মনোভাব
যার কাছে না বলিলে বুক যেত ফেটে,
সেই সে মালতী মোর হয়েছে বিধবা!
আপনার দুঃখে মগ্ন স্বার্থপর আমি
ভালো করে পারিনু না করিতে সান্ত্বনা!
নিজের চোখের জলে অন্ধ এ নয়নে
পরের চোখের জল পেনু না দেখিতে!
ছেলেবেলাকার সেই পুরানো কুটীরে
হাসিতে হাসিতে এল মালতী আমার,
সে হাসির চেয়ে ভালো তীব্র অশ্রুজল!
কে জানিত সে হাসির অন্তরে অন্তরে
কাল-রাত্রি অন্ধকার রয়েছে লুকায়ে!
একদিনো বলে নি সে কোনো দুঃখ কথা,
একদিনো কাঁদে নি সে সমুখে আমার!
জানি জানি মালতী সে স্বর্গের দেবতা!
নিজের প্রাণের বহ্নি করিয়া গোপন,
পরের চোখের জল দিত সে মুছায়ে।
ছেলেবেলাকার সেই হাসিটি তাহার
সমস্ত আনন তার রাখিত উজ্জ্বলি,
কত-না করিত যত্ন করিত সান্ত্বনা।
হাসিতে হাসিতে কত করিত আদর!
কিন্তু হা শ্মশানে যথা চাঁদের জোছনা
শ্মশানের ভীষণতা বাড়ায় দ্বিগুণ—
মালতীর সেই হাসি দেখিয়া তেমনি
নিজের এ হৃদয়ের ভগ্ন-অবশেষ
দ্বিগুণ পড়িত যেন নয়নে আমার!
তাহার আদর পেয়ে ভুলিনু যাতনা,
কিন্তু হায় দেখি নাই, বিজন-শয্যায়

কত দিন কাঁদিয়াছে মালতী গোপনে!
সে যখন দেখিত, তাহার বাল্যসখা
দিনে দিনে অবসাদে হইছে মলিন,
দিনে দিনে মন তার যেতেছে ভাঙিয়া,
তখন আকুলা বালা রাত্রে একাকিনী
কাঁদিয়া দেবতা কাছে করেছে প্রার্থনা—
বালিকার অশ্রুময় সে প্রার্থনাগুলি
আর কেহ শুনে নাই অন্তর্যামী ছাড়া!
দেখি নাই কত রাত্রি একাকিনী গিয়া
যমুনার তীরে বসি কাঁদিত বিরলে!
একাকিনী কেঁদে কেঁদে হইত প্রভাত,
এলোথেলো কেশপাশে পড়িত শিশির,
চাহিয়া রহিত উষা ম্লান মুখপানে!

বিষময়, বহ্নিময়, বজ্রময় প্রেম,
এ স্নেহের কাছে তুই ঢাক মুখ ঢাক!
তুই মরণের কীট, জীবনের রাহু,
সৌন্দর্য-কুসুম-বনে তুই দাবানল,
হৃদয়ের রোগ তুই, প্রাণের মাঝারে
সতত রাখিস তুই পিপাসা পুষিয়া,
ভুজঙ্গ বাহুর পাকে মর্ম জড়াইয়া
কেবলি ফেলিস তুই বিষাক্ত নিশ্বাস,
আগ্নেয় নিশ্বাসে তোর জ্বলিয়া জ্বলিয়া
হৃদয়ে ফুটিতে থাকে তপ্ত রক্তস্রোত!
জরজর কলেবর, আবেশে অসাড়,
শিথিল শিরার গ্রন্থি, অচেতন প্রাণ,
স্খলিত জড়িত বাণী, অবশ নয়ন,
আশা ও নিরাশা-পাকে ঘুরিছে হৃদয়,
ঘুরিছে চোখের 'পরে জগৎসংসার!
এই প্রেম, এই বিষ, বজ্র-হুতাশন
কবে রে পৃথিবী হতে যাবে দূর হয়ে!
আয় স্নেহ, আয় তোর স্নিগ্ধ-সুধা ঢালি
এ জ্বলন্ত বহ্নিরাশি দে রে নিবাইয়া!
অগ্নিময় বৃশ্চিকের আলিঙ্গন হতে,
সুধাসিক্ত কোলে তোর তুলে নে তুলে নে!
প্রেম-ধূমকেতু ওই উঠেছে আকাশে,
ঝলসি দিতেছে হায় যৌবনের আঁখি,
কোথা তুমি ধ্রুবতারা ওঠো একবার,
ঢালো এ জ্বলন্ত নেত্রে স্নিগ্ধ-মৃদু-জ্যোতি!
তুমি সুধা, তুমি ছায়া, তুমি জ্যোৎস্নাধারা,
তুমি স্রোতস্বিনী, তুমি উষার বাতাস,
তুমি হাসি, তুমি আশা, মৃদু অশ্রুজল,

এসো তুমি এ প্রেমেরে দাও নিভাইয়া!
একটি মালতী যার আছে এ সংসারে
সহস্র দামিনী তার ধূলিমুষ্টি নয়!

ক্রমশঃ হৃদয় মোর এল শান্ত হয়ে
যন্ত্রণা বিষাদে আসি হল পরিণত।
নিস্তরঙ্গ সরসীর প্রশান্ত হৃদয়ে
নিশীথের শান্ত বায়ু ভ্রমে গো যখন,
এত শান্ত এত মৃদু পদক্ষেপ তার
একটি চরণচিহ্ন পড়ে না সরসে,
তেমনি প্রশান্ত হৃদে প্রশান্ত বিষাদ
ফেলিতে লাগিল ধীরে মৃদুল নিশ্বাস!
নিরখিয়া নিদারুণ ঝটিকার মাঝে
হাসিময় শান্ত সেই মালতী কুসুমে
ক্রমশঃ হৃদয় মোর এল শান্ত হয়ে।
কিন্তু হায় কে জানিত সেই হাসিময়
সুকুমার ফুলটির মর্মের মাঝারে
মরণের কীট পশি করিতেছে ক্ষয়!
হইল প্রফুল্লতর মুখখানি তার,
হইল প্রশান্ততর হাসিটি তাহার;
দিবা যবে যায় যায়, হাসিময় মেঘে
দূর আঁধারের মুখ করয়ে উজ্জ্বল—
এ হাসি তেমনি হাসি কে জানিত তাহা!
একদা পূর্ণিমারাত্রে নিস্তব্ধ গভীর
মুখপানে চেয়ে বালা, হাত ধরি মোর
কহিল মৃদুলস্বরে—যাই তবে ভাই!—
কোথা গেলি—কোথা গেলি মালতী আমার
অভাগা ভ্রাতারে তোর রাখিয়া হেথায়!
দুঃখের কণ্টকময় সংসারের পথে
মালতী, কে লয়ে যাবে হাত ধরি মোর?
সংসারের ধ্রুবতারা ডুবিল আমার।
তেমন পূর্ণিমা রাত্রি দেখি নি কখনো,
পৃথিবী ঘুমাইতেছে শান্ত জোছনায়;
কহিনু পাগল হয়ে—রাক্ষসী-পৃথিবী
এত রূপ তোরে কভু সাজে না সাজে না!

মালতী শুকায়ে গেল, সুবাস তাহার
এখনো রয়েছে কিন্তু ভরিয়া কুটীর।
তাহার মনের ছায়া এখনো যেন রে
সে কুটীরে শান্তিরসে রেখেছে ডুবায়ে!
সে শান্ত প্রতিমা মম মনের মন্দির
রেখেছে পবিত্র করি রেখেছে উজ্জ্বলি!

প্রভাতসংগীত

শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী

প্রাণাধিকাসু,

রবিকাকা

সূচনা

'কড়ি ও কোমল' রচনার পূর্বে কাব্যের ভাষা আমার কাছে ধরা দেয় নি। কাঁচা বয়সে মনের ভাবগুলো নূতনত্বের আবেগ নিয়ে রূপ ধরতে চাচ্ছে কিন্তু যে উপাদানে তাদেরকে শরীরের বাঁধন দিতে পারত তারই অবস্থা তখন তরল; এইজন্যে ওগুলো হয়েছে ঢেউওয়ালা জলের উপরকার প্রতিবিম্বের মতো আঁকাবাঁকা, ওরা মূর্ত হয়ে ওঠে নি, সুতরাং কাব্যের পদবীতে পৌঁছতে পারে নি। সেইজন্যে আমার মত এই যে, কড়ি ও কোমলের পর থেকেই আমার কাব্যরচনা ভালো মন্দ সব-কিছু নিয়ে একটা স্পষ্ট সৃষ্টির ধারা অবলম্বন করেছে।

প্রভাতসংগীতে যে অবস্থায় আমার প্রথম বিকাশোন্মুখ মন অপরিণত ভাবনা নিয়ে অপরিস্ফুট রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, তার কথা আজও আমার মনে আছে। তার পূর্বে সন্ধ্যাসংগীতের পর্বে আমার মনে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের গদ্‌গদভাষী আন্দোলন চলছিল। প্রভাতসংগীতের ঋতুতে আপনা-আপনি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে একটা-আধটা মননের রূপ, অর্থাৎ ফুল নয় সে, ফসলের পালা, সেও অশিক্ষিত বিনা-চাষের জমিতে।

সেই সময়কার কথা মনে পড়ছে যখন কোথা থেকে কতকগুলো মত মনের অন্দর-মহলে জেগে উঠে সদরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। ওইগুলোর নাম— অনন্ত জীবন, অনন্ত মরণ, প্রতিধ্বনি। 'অনন্ত জীবন' বলতে আমার মনে এই একটা ভাব এসে-ছিল বিশ্বজগতে আসা এবং যাওয়া দুটোই থাকারই অন্তর্গত, ঢেউয়ের মতো আলোতে ওঠা এবং অন্ধকারে নামা। ক্ষণে ক্ষণে হাঁ এবং ক্ষণে ক্ষণে না নিয়ে এই জগৎ নয়, বিশ্বচরাচর গোচর-অগোচরের নিরবচ্ছিন্ন মালা গাঁথা। এই ভাবনাটা ভিতরে ভিতরে মনকে খুব দোলা দিয়েছিল। নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে একটা ধারণা আমার মধ্যে জেগে উঠেছিল যে, আমার প্রতি মুহূর্তের সমস্ত ভালোমন্দ, আমার প্রতি দিনের সুখদুঃখের সমস্ত অভিজ্ঞতা চিরকালের মতো অনবরত একটা সৃষ্টি-রূপ ধরছে, প্রকাশ-অপ্রকাশের নিত্য ওঠাপড়া নিয়ে যে সৃষ্টির স্বরূপ। এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই মনে হল, মৃত্যু তা হলে কী। এক রকম করে তার উত্তর এসেছিল এই যে, জীবন সব-কিছুকে রাখে, আর মৃত্যু সব-কিছুকে চালায়। প্রতি মুহূর্তেই মরছি, আমি, আর সেই মরার ভিতর দিয়েই আমি বাঁচার রাস্তায় এগোচ্ছি, যেন আমার মধ্যে সেলাইয়ের কাজ চলছে— গাঁথা পড়ছে অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান। মুহূর্তকালীন মৃত্যুপরম্পরা দিয়ে মর্ত্যজীবন এই যেমন বেড়ে চলেছে প্রবাল দ্বীপের মতো, তেমনি মৃত্যুর পর মৃত্যু আমাকে দিয়ে লোক-লোকান্তরের অভিজ্ঞতার জাল বিস্তার করে চলবে আমার চেতনার সূত্রটিকে নিয়ে মৃত্যু এক-এক ফোঁড়ে এক-এক লোককে সম্বন্ধসূত্রে গাঁথবে। মনে আছে, এই চিন্তায় আমার মনকে খুব আনন্দ দিয়েছিল! 'প্রতিধ্বনি' কবিতা লিখেছিলুম যখন প্রথম গিয়েছিলুম দার্জিলিঙে। যে ভাবে তখন আমাকে আবিষ্ট করেছিল সেটা এই যে— বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে একটা ধ্বনি, আর সে প্রতিধ্বনিরূপে আমাকে মুগ্ধ করছে, ক্ষুব্ধ করছে, আমাকে জাগিয়ে রাখছে, সেই সুন্দর, সেই ভীষণ। সৃষ্টির সমস্ত গতিপ্রবাহ নিত্যই একটা কোন্ কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পড়ছে আর সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নির্ঝরিত হচ্ছে আলো হয়ে, রূপ হয়ে, ধ্বনি হয়ে। এই ভাবগুলো যদিও অস্পষ্ট তবু আমার মনের মধ্যে খুব প্রবল হয়ে আন্দোলিত হচ্ছিল, মুখে মুখে কোনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে আলোচনাও করেছি।

কিন্তু এ-সকল ভাবনা তখন কী গদ্যে কী পদ্যে আলোচনা করবার সময় হয় নি, তখনো পাই নি ভাষাভারতীর প্রসাদ। তাই বলে রাখছি, প্রভাতসংগীতে এ-সমস্ত লেখার আর-কোনো মূল্য যদি থাকে, সে ষোলো-আনা সাহিত্যিক মূল্য নয়।

১৬।৭।৩৯
শ্রীনিকেতন

আহ্বানসংগীত

ওরে তুই জগৎ-ফুলের কীট,
জগৎ যে তোর শুকায়ে আসিল,
মাটিতে পড়িল খসে—
সারা দিন রাত গুমরি গুমরি
কেবলি আছিস বসে।
মড়কের কণা, নিজ হাতে তুই
রচিলি নিজের কারা,
আপনার জালে জড়ায়ে পড়িয়া
আপনি হইলি হারা।
অবশেষে কারে অভিশাপ দিস
হাহুতাশ করে সারা,
কোণে বসে শুধু ফেলিস নিশাস,
ঢালিস বিষের ধারা।

জগৎ যে তোর মুদিয়া আসিল
ফুটিতে নারিল আর,
প্রভাত হইলে প্রাণের মাঝারে
ঝরে না শিশিরধার।
ফেলিস নিশাস, মরুর বাতাস,
জ্বলিস জ্বালাস কত,
আপন জগতে আপনি আছিস
একটি রোগের মতো।
হৃদয়ের ভার বহিতে পার না,
আছ মাথা নত করে—
ফুটিবে না ফুল, ফলিবে না ফল,
শুকায়ে পড়িবে মরে।

রোদন, রোদন, কেবলি রোদন,
কেবলি বিষাদশ্বাস—
লুকায়ে, শুকায়ে, শরীর গুটায়ে
কেবলি কোটরে বাস।
নাই কোনো কাজ—মাঝে মাঝে চাস
মলিন আপনা-পানে,
আপনার স্নেহে কাতর বচন
কহিস আপন কানে।
দিবস রজনী মরীচিকাসুরা
কেবলি করিস পান।
বাড়িতেছে তৃষা, বিকারের তৃষা—

ছট্‌ফট্‌ করে প্রাণ।
'দাও দাও' বলে সকলি যে চাস,
জঠর জ্বলিছে ভুখে—
মুঠি মুঠি ধুলা তুলিয়া লইয়া
কেবলি পুরিস মুখে।
নিজের নিশাসে কুয়াশা ঘনায়ে
ঢেকেছে নিজের কায়া,
পথ আঁধারিয়া পড়েছে সমুখে
নিজের দেহের ছায়া।
ছায়ার মাঝারে দেখিতে না পাও,
শবদ শুনিলে ডর'—
বাহু প্রসারিয়া চলিতে চলিতে
নিজেরে আঁকড়ি ধর'।
চারি দিকে শুধু ক্ষুধা ছড়াইছে
যে দিকে পড়িছে দিঠ,
বিষেতে ভরিলি জগৎ রে তুই
কীটের অধম কীট।

আজিকে বারেক ভ্রমরের মতো
বাহির হইয়া আয়,
এমন প্রভাতে এমন কুসুম
কেন রে শুকায়ে যায়।
বাহিরে আসিয়া উপরে বসিয়া
কেবলি গাহিবি গান,
তবে সে কুসুম কহিবে রে কথা,
তবে সে খুলিবে প্রাণ।
আকাশে হাসিবে তরুণ তপন,
কাননে ছুটিবে বায়,
চারি দিকে তোর প্রাণের লহরী
উথলি উথলি যায়।
বায়ুর হিল্লোলে ধরিবে পল্লব
মরমর মৃদু তান,
চারি দিক হতে কিসের উল্লাসে
পাখিতে গাহিবে গান।
নদীতে উঠিবে শত শত ঢেউ,
গাবে তারা কল কল,
আকাশে আকাশে উথলিবে শুধু
হরষের কোলাহল।
কোথাও বা হাসি, কোথাও বা খেলা,
কোথাও বা সুখগান—
মাঝে বসে তুই বিভোর হইয়া,
আকুল পরানে নয়ান মুদিয়া

অচেতন সুখে চেতনা হারায়ে
করিবি রে মধু পান।
ভুলে যাবি ওরে আপনারে তুই
ভুলে যাবি তোর গান।
মোহ ছুটিবে রে নয়নেতে তোর,
যে দিকে চাহিবি হয়ে যাবি ভোর,
যাহারে হেরিবি তাহারে হেরিয়া
মজিয়া রহিবে প্রাণ।
ঘুমের ঘোরেতে গাহিবে পাখি
এখনো যে পাখি জাগে নি,
ভোরের আকাশ ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া
উঠিবে বিভাসরাগিণী।
জগত-অতীত আকাশ হইতে
বাজিয়া উঠিবে বাঁশি,
প্রাণের বাসনা আকুল হইয়া
কোথায় যাইবে ভাসি।
উদাসিনী আশা গৃহ তেয়াগিয়া
অসীম পথের পথিক হইয়া
সুদূর হইতে সুদূরে উঠিয়া
আকুল হইয়া চায়,
যেমন বিভোর চকোরের গান
ভেদিয়া ভেদিয়া সুদূর বিমান
চাঁদের চরণে মরিতে গিয়া
মেঘেতে হারায়ে যায়।
মুদিত নয়ান, পরান বিভল,
স্তবধ হইয়া শুনিবি কেবল,
জগতেরে সদা ডুবায়ে দিতেছে
জগত-অতীত গান—
তাই শুনি যেন জাগিতে চাহিছে
ঘুমেতে-মগন প্রাণ।
জগৎ বাহিরে যমুনাপুলিনে
কে যেন বাজায় বাঁশি,
স্বপন-সমান পশিতেছে কানে
ভেদিয়া নিশীথরাশি—
এ গান শুনি নি, এ আলো দেখি নি,
এ মধু করি নি পান,
এমন বাতাস পরান পুরিয়া
করে নি রে সুধা দান,
এমন প্রভাত-কিরণ-মাঝারে
কখনো করি নি স্নান,
বিফলে জগতে লভিনু জনম,
বিফলে কাটিল প্রাণ।

দেখ্ রে সবাই চলেছে বাহিরে
সবাই চলিয়া যায়,
পথিকেরা সবে হাতে হাতে ধরি
শোন্ রে কী গান গায়।
জগৎ ব্যাপিয়া শোন্ রে সবাই
ডাকিতেছে, আয়, আয়—
কেহ বা আগেতে কেহ বা পিছায়ে,
কেহ ডাক শুনে ধায়।
অসীম আকাশে স্বাধীন পরানে
প্রাণের আবেগে ছোটে,
এ শোভা দেখিলে জড়ের শরীরে
পরান নাচিয়া ওঠে।
তুই শুধু ওরে ভিতরে বসিয়া
গুমরি মরিতে চাস!
তুই শুধু ওরে করিস রোদন,
ফেলিস দুখের শ্বাস!
ভূমিতে পড়িয়া আঁধারে বসিয়া
আপনা লইয়া রত,
আপনারে সদা কোলেতে তুলিয়া
সোহাগ করিস কত!
আর কতদিন কাটিবে এমন,
সময় যে চলে যায়।
ওই শোন্ ওই ডাকিছে সবাই,
বাহির হইয়া আয়!

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

আজি এ প্রভাতে প্রভাত-বিহগ
কী গান গাইল রে!
অতি দূর দূরে আকাশ হইতে
ভাসিয়া আইল রে!
না জানি কেমনে পশিল হেথায়
পথহারা তার একটি তান,
আঁধার গুহায় ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
গভীর গুহায় নামিয়া নামিয়া
আকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ছুঁয়েছে আমার প্রাণ।
আজি এ প্রভাতে সহসা কেন রে
পথহারা রবিকর
আলয় না পেয়ে পড়েছে আসিয়ে
আমার প্রাণের 'পর!
বহুদিন পরে একটি কিরণ
গুহায় দিয়েছে দেখা,
পড়েছে আমার আঁধার সলিলে
একটি কনকরেখা।
প্রাণের আবেগ রাখিতে নারি
থর থর করি কাঁপিছে বারি,
টলমল জল করে থল থল,
কল কল করি ধরেছে তান।
আজি এ প্রভাতে কী জানি কেন রে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ!
জাগিয়া দেখিনু চারি দিকে মোর
পাষাণে রচিত কারাগার ঘোর,
বুকের উপরে আঁধার বসিয়া
করিছে নিজের ধ্যান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ!

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা।
রয়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ-'পরে।
দূর দূর দূর হতে ভেদিয়া আঁধার কারা
মাঝে মাঝে দেখা দেয় একটি সন্ধ্যার তারা।

তারি মুখ দেখে দেখে আঁধার হাসিতে শেখে,
তারি মুখ চেয়ে চেয়ে করে নিশি অবসান।
শিহরি উঠে রে বারি, দোলে রে দোলে রে প্রাণ,
প্রাণের মাঝারে ভাসি দোলে রে দোলে রে হাসি,
দোলে রে প্রাণের 'পরে আশার স্বপন মম,
দোলে রে তারার ছায়া সুখের আভাস-সম।

মাঝে মাঝে একদিন আকাশেতে নাই আলো,
পড়িয়া মেঘের ছায়া কালো জল হয় কালো।
আঁধার সলিল-'পরে ঝর ঝর বারি ঝরে
ঝর ঝর ঝর ঝর, দিবানিশি অবিরল—
বরষার দুখ-কথা, বরষার আঁখিজল।
শুয়ে শুয়ে আনমনে দিবানিশি তাই শুনি,
একটি একটি ক'রে দিবানিশি তাই গুনি,
তারি সাথে মিলাইয়া কল কল গান গাই—
ঝর ঝর কল কল— দিন নাই, রাত নাই।
এমনি নিজেরে লয়ে রয়েছি নিজের কাছে,
আঁধার সলিল-'পরে আঁধার জাগিয়া আছে।
এমনি নিজের কাছে খুলেছি নিজের প্রাণ,
এমনি পরের কাছে শুনেছি নিজের গান।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত-পাখির গান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়,
বাহিরিতে চায় দেখিতে না পায়
কোথায় কারার দ্বার।
প্রভাতেরে যেন লইতে কাড়িয়া
আকাশেরে যেন ফেলিতে ছিঁড়িয়া
উঠে শূন্যপানে— পড়ে আছাড়িয়া,
করে শেষে হাহাকার।

প্রাণের উল্লাসে ছুটিতে চায়,
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়,
আলিঙ্গন তরে ঊর্ধ্বে বাহু তুলি
আকাশের পানে উঠিতে চায়।
প্রভাতকিরণে পাগল হইয়া
জগৎ-মাঝারে লুটিতে চায়।
কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন?
ভাঙ্ রে হৃদয় ভাঙ্ রে বাঁধন,
সাধ্ রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর্!
মাতিয়া যখন উঠিছে পরান
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ!
উথলি যখন উঠিছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর!

সহসা আজি এ জগতের মুখ
নূতন করিয়া দেখিনু কেন?
একটি পাখির আধখানি তান
জগতের গান গাহিল যেন!
জগৎ দেখিতে হইব বাহির
আজিকে করেছি মনে,
দেখিব না আর নিজেরি স্বপন
বসিয়া গুহার কোণে।
আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা;
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
দিব রে পরান ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল
তালে তালে দিব তালি।
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া—
যাইব বহিয়া—যাইব বহিয়া—
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান,

যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ
ফুরাবে না আর প্রাণ।
এত কথা আছে এত গান আছে
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে এত সাধ আছে
প্রাণ হয়ে আছে ভোর।

এত সুখ কোথা এত রূপ কোথা
এত খেলা কোথা আছে!
যৌবনের বেগে বহিয়া যাইব
কে জানে কাহার কাছে!
অগাধ বাসনা অসীম আশা,
জগৎ দেখিতে চাই!
জাগিয়াছে সাধ চরাচরময়
প্লাবিয়া বহিয়া যাই।
যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি,
যত কাল আছে বহিতে পারি,
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি,
তবে আর কী বা চাই!
পরানের সাধ তাই।

কী জানি কী হল আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান—
'পাষাণ-বাঁধন টুটি, ভিজায়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,
সারাপ্রাণ ঢালি দিয়া,
জুড়ায়ে জগৎ-হিয়া—
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা!'

আমি যাব, আমি যাব, কোথায় সে, কোন্ দেশ—
জগতে ঢালিব প্রাণ,
গাহিব করুণাগান,
উদ্‌বেগ-অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব আর সে গান করিব শেষ।

ওরে, চারি দিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর!
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্!
ওরে, আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এয়েছে রবির কর!

প্রভাত-উৎসব

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি!
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।
এসেছে সখা সখী বসিয়া চোখোচোখি,
দাঁড়ায়ে মুখোমুখি হাসিছে শিশুগুলি।
এসেছে ভাই বোন পুলকে ভরা মন,
ডাকিছে 'ভাই ভাই' আঁখিতে আঁখি তুলি।
সখারা এল ছুটে, নয়নে তারা ফুটে,
পরানে কথা উঠে— বচন গেল ভুলি।
সখীরা হাতে হাতে ভ্রমিছে সাথে সাথে,
দোলায় চড়ি তারা করিছে দোলাদুলি।
শিশুরে লয়ে কোলে জননী এল চলে,
বুকেতে চেপে ধরে বলিছে 'ঘুমো ঘুমো'।
আনত দুনয়ানে চাহিয়া মুখপানে
বাছার চাঁদমুখে খেতেছে শত চুমো।
পুলকে পুরে প্রাণ, শিহরে কলেবর,
প্রেমের ডাক শুনি এসেছে চরাচর—
এসেছে রবি শশী, এসেছে কোটি তারা,
ঘুমের শিয়রেতে জাগিয়া থাকে যারা।
পরান পুরে গেল হরষে হল ভোর
জগতে যারা আছে সবাই প্রাণে মোর।

প্রভাত হল যেই কী জানি হল এ কী!
আকাশপানে চাই কী জানি কারে দেখি!
প্রভাতবায়ু বহে কী জানি কী যে কহে,
মরমমাঝে মোর কী জানি কী যে হয়!
এসো হে এসো কাছে সখা হে এসো কাছে—
এসো হে ভাই এসো, বোসো হে প্রাণময়।
পুরব-মেঘমুখে পড়েছে রবিরেখা,
অরুণরথচূড়া আধেক যায় দেখা।
তরুণ আলো দেখে পাখির কলরব—
মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব!
মধুর মধু আলো, মধুর মধু বায়,
মধুর মধু গানে তটিনী বয়ে যায়!
যে দিকে আঁখি চায় সে দিকে চেয়ে থাকে,
যাহারি দেখা পায় তারেই কাছে ডাকে,
নয়ন ডুবে যায় শিশির-আঁখি-ধারে,
হৃদয় ডুবে যায় হরষ-পারাবারে।

আয় রে আয় বায়ু, যা রে যা প্রাণ নিয়ে,
জগত-মাঝারেতে দে রে তা প্রসারিয়ে।
ভ্রমিবি বনে বনে, যাইবি দিশে দিশে,
সাগরপারে গিয়ে পূরবে যাবি মিশে।
লইবি পথ হতে পাখির কলতান,
যূথীর মৃদু শ্বাস, মালতীমৃদুবাস—
অমনি তারি সাথে যা রে যা নিয়ে প্রাণ।
পাখির গীতধার ফুলের বাসভার
ছড়াবি পথে পথে হরষে হয়ে ভোর,
অমনি তারি সাথে ছড়াবি প্রাণ মোর।
ধরারে ঘিরি ঘিরি কেবলি যাবি বয়ে
ধরার চারি দিকে প্রাণেরে ছড়াইয়ে।

পেয়েছি এত প্রাণ যতই করি দান
কিছুতে যেন আর ফুরাতে নারি তারে।
আয় রে মেঘ, আয় বারেক নেমে আয়,
কোমল কোলে তুলে আমারে নিয়ে যা রে!
কনক-পাল তুলে বাতাসে দুলে দুলে
ভাসিতে গেছে সাধ আকাশ-পারাবারে।

আকাশ, এসো এসো, ডাকিছ বুঝি ভাই—
গেছি তো তোরি বুকে, আমি তো হেথা নাই।
প্রভাত-আলো-সাথে ছড়ায় প্রাণ মোর,
আমার প্রাণ দিয়ে ভরিব প্রাণ তোর।

ওঠো হে ওঠো রবি, আমারে তুলে লও,
অরুণতরী তব পূরবে ছেড়ে দাও,
আকাশ-পারাবার বুঝি হে পার হবে—
আমারে লও তবে, আমারে লও তবে।

জগৎ আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে একি গান!
কে তুমি মহাজ্ঞানী, কে তুমি মহারাজ,
গরবে হেলা করি হেসো না তুমি আজ।
বারেক চেয়ে দেখো আমার মুখপানে—
উঠেছে মাথা মোর মেঘের মাঝখানে,
আপনি আসি উষা শিয়রে বসি ধীরে
অরুণকর দিয়ে মুকুট দেন শিরে,
নিজের গলা হতে কিরণমালা খুলি
দিতেছে রবি-দেব আমার গলে তুলি!
ধূলির ধূলি আমি রয়েছি ধূলি-'পরে,
জেনেছি ভাই বলে জগৎ চরাচরে।

অনন্ত জীবন

অধিক করি না আশা, কিসের বিষাদ,
জনমেছি দু'দিনের তরে—
যাহা মনে আসে তাই আপনার মনে
গান গাই আনন্দের ভরে।
এ আমার গানগুলি দু'দণ্ডের গান
রবে না রবে না চিরদিন—
পুরব-আকাশ হতে উঠিবে উচ্ছ্বাস,
পশ্চিমেতে হইবে বিলীন।

তোরা ফুল, তোরা পাখি, তোরা খোলা প্রাণ,
জগতের আনন্দ যে তোরা,
জগতের বিষাদ-পাসরা।
পৃথিবীতে উঠিয়াছে আনন্দলহরী
তোরা তার একেকটি ঢেউ,
কখন উঠিলি আর কখন মিলালি
জানিতেও পারিল না কেউ।

নাই তোর নাই রে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না।
নদীস্রোতে কোটি কোটি মৃত্তিকার কণা
ভেসে আসে, সাগরে মিশায়—
জান না কোথায় তারা যায়!
একেকটি কণা লয়ে গোপনে সাগর
রচিছে বিশাল মহাদেশ,
না জানি কবে তা হবে শেষ।
মুহূর্তেই ভেসে যায় আমাদের গান,
জান না তো কোথায় তা যায়!
আকাশের সাগরসীমায়!
আকাশ-সমুদ্র-তলে গোপনে গোপনে
গীতরাজ্য হতেছে সৃজন,
যত গান উঠিতেছে ধরার আকাশে
সেইখানে করিছে গমন।
আকাশ পুরিয়া যাবে শেষ,
উঠিবে গানের মহাদেশ।

নাই তোর নাই রে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না।
কাল দেখেছিনু পথে হরষে খেলিতেছিল
দুটি ভাই গলাগলি করি,
দেখেছিনু জানালায় নীরবে দাঁড়ায়েছিল

দুটি সখা হাতে হাতে ধরি,
দেখেছিনু কচি মেয়ে মায়ের বাহুতে শুয়ে
ঘুমায়ে করিছে স্তনপান,
ঘুমন্ত মুখের 'পরে বরষিছে স্নেহধারা
স্নেহমাখা নত দুনয়ান,
দেখেছিনু রাজপথে চলেছে বালক এক
বৃদ্ধ জনকের হাত ধরি—
কত কী যে দেখেছিনু, হয়তো সে-সব ছবি
আজ আমি গিয়েছি পাসরি।
তা বলে নাহি কি তাহা মনে?
ছবিগুলি মেশে নি জীবনে?
স্মৃতির কণিকা তারা স্মরণের তলে পশি
রচিতেছে জীবন আমার—
কোথা যে কে মিশাইল, কে বা গেল কার পাশে
চিনিতে পারি নে তাহা আর।
হয়তো অনেকদিন দেখেছিনু ছবি এক
দুটি প্রাণী বাহুর বাঁধনে—
তাই আজ ছুটাছুটি এসেছি প্রভাতে উঠি
সখারে বাঁধিতে আলিঙ্গনে।
হয়তো অনেকদিন শুনেছিনু পাখি এক
আনন্দে গাহিছে প্রাণ খুলি,
সহসা রে তাই আজ প্রভাতের মুখ দেখি
প্রাণ মন উঠিছে উথুলি।
সকলি মিশেছে আসি হেথা,
জীবনে কিছু না যায় ফেলা—
এই-যে যা-কিছু চেয়ে দেখি
এ নহে কেবলি ছেলেখেলা।

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি,
চারি দিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি।
সূর্য হতে ঝরে ধারা, চন্দ্র হতে ঝরে ধারা,
কোটি কোটি তারা হতে ঝরে,
জগতের যত হাসি যত গান যত প্রাণ
ভেসে আসে সেই স্রোতোভরে—
মেশে আসি সেই সিন্ধু-'পরে।
পৃথ্বী হতে মহাস্রোত ছুটিতেছে অবিরাম
সেই মহাসাগর-উদ্দেশে,
আমরা মাটির কণা জলস্রোত ঘোলা করি
অবিশ্রাম চলিয়াছি ভেসে—
সাগরে পড়িব অবশেষে।

জগতের মাঝখানে সেই সাগরের তলে
রচিত হতেছে পলে পলে
অনন্ত-জীবন মহাদেশ,
কে জানে হবে কি তাহা শেষ!

তাই বলি, প্রাণ ওরে, গান গা পাখির মতো,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ শোক ভুলি—
তুই যাবি, গান যাবে, একসাথে ভেসে যাবে
তুই আর তোর গানগুলি।
মিশিবি সে সিন্ধুজলে অনন্ত সাগরতলে,
একসাথে শুয়ে রবি প্রাণ,
তুই আর তোর এই গান।

অনন্ত মরণ

কোটি কোটি ছোটো ছোটো মরণেরে লয়ে
বসুন্ধরা ছুটিছে আকাশে,
হাসে খেলে মৃত্যু চারি পাশে।
এ ধরণী মরণের পথ,
এ জগৎ মৃত্যুর জগৎ।

যতটুকু বর্তমান, তারেই কি বলো প্রাণ?
সে তো শুধু পলক, নিমেষ।
অতীতের মৃত ভার পৃষ্ঠেতে রয়েছে তার,
না জানি কোথায় তার শেষ।
যত বর্ষ বেঁচে আছি তত বর্ষ মরে গেছি,
মরিতেছি প্রতি পলে পলে,
জীবন্ত মরণ মোরা মরণের ঘরে থাকি
জানি নে মরণ কারে বলে।

একমুঠা মরণেরে জীবন বলে কি ভবে,
মরণের সমষ্টি কেবল?
একটি নিমেষ তুচ্ছ শত মরণের গুচ্ছ,
নাম নিয়ে এত কোলাহল।
মরণ বাড়িবে যত জীবন বাড়িবে তত,
পলে পলে উঠিব আকাশে
নক্ষত্রের কিরণনিবাসে।

মরণ বাড়িবে যত কোথায়, কোথায় যাব
বাড়িবে প্রাণের অধিকার—

বিশাল প্রাণের মাঝে কত গ্রহ কত তারা
হেথা হোথা করিবে বিহার।
উঠিবে জীবন মোর কত-না আকাশ ছেয়ে,
ঢাকিয়া ফেলিবে রবি শশী—
যুগ-যুগান্তর যাবে, নব নব রাজ্য পাবে
নব নব তারায় প্রবেশি।
কবে রে আসিবে সেই দিন
উঠিব সে আকাশের পথে,
আমার মরণ-ডোর দিয়ে
বেঁধে দেব জগতে জগতে।
আমাদের মরণের জালে
জগৎ ফেলিব আবরিয়া,
এ অনন্ত আকাশসাগরে
দশ দিক রহিব ঘেরিয়া।

জয় হোক জয় হোক মরণের জয় হোক—
আমাদের অনন্ত মরণ,
মরণের হবে না মরণ।
এ ধরায় মোরা সবে শতাব্দীর ক্ষুদ্র শিশু
লইলাম তোমার শরণ।
এসো তুমি এসো কাছে, স্নেহ-কোলে লও তুমি,
পিয়াও তোমার মাতৃস্তন,
আমাদের করো হে পালন।
আনন্দে পুরেছে প্রাণ, হেরিতেছি এ জগতে
মরণের অনন্ত উৎসব।
কার নিমন্ত্রণে মোরা মহাযজ্ঞে এসেছি রে,
উঠেছে বিপুল কলরব।

যে ডাকিছে ভালোবেসে, তারে চিনিস নে শিশু?
তার কাছে কেন তোর ডর?
জীবন যাহারে বলে মরণ তাহারি নাম,
মরণ তো নহে তোর পর।
আয়, তারে আলিঙ্গন কর—
আয়, তার হাতখানি ধর।

পুনর্মিলন

কিসের হরষ কোলাহল
শুধাই তোদের, তোরা বল।
আনন্দ-মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে
আনন্দে হতেছে কভু লীন—

চাহিয়া ধরণী-পানে নব আনন্দের গানে
মনে পড়ে আর-এক দিন।
সে তখন ছেলেবেলা—রজনী প্রভাত হলে,
তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়ি ছুটিয়া যেতেম চলে;
সারি সারি নারিকেল বাগানের এক পাশে,
বাতাস আকুল করে আম্রমুকুলের বাসে।
পথপাশে দুই ধারে
বেলফুল ভারে ভারে
ফুটে আছে, শিশুমুখে প্রথম হাসির প্রায়—
বাগানে পা দিতে দিতে
গন্ধ আসে আচম্বিতে,
নর্‌গেস্‌ কোথা ফুটে খুঁজে তারে পাওয়া দায়।
মাঝেতে বাঁধানো বেদী, জুঁইগাছ চারি ধারে—
সূর্যোদয় দেখা দিত প্রাচীরের পরপারে।
নবীন রবির আলো
সে যে কী লাগিত ভালো,
সর্বাঙ্গে সুবর্ণ সুধা অজস্র পড়িত ঝরে—
প্রভাত ফুলের মতো ফুটায়ে তুলিত মোরে।

এখনো সে মনে আছে
সেই জানালার কাছে
বসে থাকিতাম একা জনহীন দ্বিপ্রহরে।
অনন্ত আকাশ নীল,
ডেকে চলে যেত চিল
জানায়ে সুতীব্র তৃষা সুতীক্ষ্ম করুণ স্বরে।
পুকুর গলির ধারে,
বাঁধা ঘাট এক পারে—
কত লোক যায় আসে, স্নান করে, তোলে জল—
রাজহাঁস তীরে তীরে
সারাদিন ভেসে ফিরে,
ডানা দুটি ধুয়ে ধুয়ে করিতেছে নিরমল।
পূর্ব ধারে বৃদ্ধ বট
মাথায় নিবিড় জট,
ফেলিয়া প্রকাণ্ড ছায়া দাঁড়ায়ে রহস্যময়।
আঁকড়ি শিকড়-মুঠে
প্রাচীর ফেলেছে টুটে,
খোপেখাপে ঝোপেঝাপে কত-না বিস্ময় ভয়।
বসি শাখে পাখি ডাকে সারাদিন একতান—
চারি দিক স্তব্ধ হেরি কী যেন করিত প্রাণ।
মৃদু তপ্ত সমীরণ গায়েতে লাগিত এসে,
সেই সমীরণস্রোতে কত কী আসিত ভেসে।

কোন্ সমুদ্রের কাছে
মায়াময় রাজ্য আছে,
সেথা হতে উড়ে আসে পাখির ঝাঁকের মতো
কত মায়া, কত পরী, রূপকথা কত শত।

আরেকটি ছোটো ঘর মনে পড়ে নদীকূলে,
সম্মুখে পেয়ারা গাছ ভরে আছে ফলে ফুলে।
বসিয়া ছায়াতে তারি ভুলিয়া শৈশবখেলা,
জাহ্নবীপ্রবাহ-পানে চেয়ে আছি সারাবেলা।
ছায়া কাঁপে, আলো কাঁপে, ঝুরু ঝুরু বহে বায়-
ঝর ঝর মর মর পাতা ঝরে পড়ে যায়।
সাধ যেত যাই ভেসে
কত রাজ্যে কত দেশে,
দুলায়ে দুলায়ে ঢেউ নিয়ে যাবে কত দূর—
কত ছোটো ছোটো গ্রাম
নূতন নূতন নাম,
অভ্রভেদী শুভ্র সৌধ, কত নব রাজপুর।
কত গাছ, কত ছায়া জটিল বটের মূল—
তীরে বালুকার 'পরে,
ছেলেমেয়ে খেলা করে,
সন্ধ্যায় ভাসায় দীপ, প্রভাতে ভাসায় ফুল।
ভাসিতে ভাসিতে শুধু দেখিতে দেখিতে যাব
কত দেশ, কত মুখ, কত-কী দেখিতে পাব।
কোথা বালকের হাসি,
কোথা রাখালের বাঁশি,
সহসা সুদূর হতে অচেনা পাখির গান।
কোথাও বা দাঁড় বেয়ে
মাঝি গেল গান গেয়ে,
কোথাও বা তীরে বসে পথিক ধরিল তান।
শুনিতে শুনিতে যাই আকাশেতে তুলে আঁখি—
আকাশেতে ভাসে মেঘ, আকাশেতে ওড়ে পাখি।
হয়তো বরষা কাল—ঝর ঝর বারি ঝরে,
পুলকরোমাঞ্চ ফুটে জাহ্নবীর কলেবরে—
থেকে থেকে ঝন্ ঝন্
ঘন বাজ-বরিষন,
থেকে থেকে বিজলীর চমকিত চকমকি।
বহিছে পূরব বায়,
শীতে শিহরিছে কায়,
গহন জলদে দিবা হয়েছে আঁধারমুখী।

সেই, সেই ছেলেবেলা
আনন্দে করেছি খেলা

প্রকৃতি গো, জননী গো, কেবলি তোমারি কোলে।
তার পরে কী যে হল—কোথা যে গেলেম চলে।
হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাহিকো কিনারা,
তারি মাঝে হনু পথহারা।
সে বন আঁধারে ঢাকা
গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।
নাহি রবি, নাহি শশী, নাহি গ্রহ, নাহি তারা,
কে জানে কোথায় দিগ্বিদিক।
আমি শুধু একেলা পথিক।
তোমারে গেলেম ফেলে,
অরণ্যে গেলেম চলে,
কাটালেম কত শত দিন
ম্রিয়মাণ সুখশান্তিহীন।

আজিকে একটি পাখি পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য-বাহিরে
আনন্দের সমুদ্রের তীরে।
সহসা দেখিনু রবিকর,
সহসা শুনিনু কত গান।
সহসা পাইনু পরিমল,
সহসা খুলিয়া গেল প্রাণ।
দেখিনু ফুটিছে ফুল, দেখিনু উড়িছে পাখি,
আকাশ পুরেছে কলস্বরে।
জীবনের ঢেউগুলি ওঠে পড়ে চারি দিকে,
রবিকর নাচে তার 'পরে।
চারি দিকে বহে বায়ু, চারি দিকে ফুটে আলো,
চারি দিকে অনন্ত আকাশ,
চারি দিক-পানে চাই—চারি দিকে প্রাণ ধায়,
জগতের অসীম বিকাশ।
কেহ এসে বসে কোলে, কেহ ডাকে সখা ব'লে,
কাছে এসে কেহ করে খেলা।
কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ আসে, কেহ যায়—
এ কী হেরি আনন্দের মেলা!
যুবক যুবতী হাসে, বালক বালিকা নাচে,
দেখে যে রে জুড়ায় নয়ন।
ও কে হোথা গান গায়, প্রাণ কেড়ে নিয়ে যায়,
ও কী শুনি অমিয়-বচন।

তাই আজি শুধাই তোমারে,
কেন এ আনন্দ চারি ধারে।
বুঝেছি গো বুঝেছি গো, এতদিন পরে বুঝি
ফিরে পেলে হারানো সন্তান।
তাই বুঝি দুই হাতে জড়ায়ে লয়েছ বুকে,
তাই বুঝি গাহিতেছ গান।
ভালোবাসা খুঁজিবারে গেছিনু অরণ্য-মাঝে,
হৃদয়ে হইনু পথহারা,
বরষিনু অশ্রুবারিধারা।
ভ্রমিলাম দূরে দূরে— কে জানিত বল্ দেখি
হেথা এত ভালোবাসা আছে।
যে দিকেই চেয়ে দেখি সেই দিকে ভালোবাসা
ভাসিতেছে নয়নের কাছে।
মা আমার, আজ আমি কত শত দিন পরে
যখনি রে দাঁড়ানু সম্মুখে,
অমনি চুমিলি মুখ, কিছু নাই অভিমান,
অমনি লইলি তুলে বুকে।
ছাড়িব না তোর কোল, রব হেথা অবিরাম,
তোর কাছে শিখিব রে স্নেহ,
সবারে বাসিব ভালো— কেহ না নিরাশ হবে
মোরে ভালো বাসিবে যে কেহ।

প্রতিধ্বনি

অয়ি প্রতিধ্বনি,
বুঝি আমি তোরে ভালোবাসি,
বুঝি আর কারেও বাসি না।
আমারে করিলি তুই আকুল ব্যাকুল,
তোর লাগি কাঁদে মোর বীণা।
তোর মুখে পাখিদের শুনিয়া সংগীত,
নির্ঝরের শুনিয়া ঝর্ঝর,
গভীর রহস্যময় অরণ্যের গান,
বালকের মধুমাখা স্বর,
তোর মুখে জগতের সংগীত শুনিয়া
তোরে আমি ভালোবাসিয়াছি;
তবু কেন তোরে আমি দেখিতে না পাই,
বিশ্বময় তোরে খুঁজিয়াছি।

চিরকাল— চিরকাল— তুই কি রে চিরকাল
সেই দূরে রবি,

আধো সুরে গাবি শুধু গীতের আভাস,
তুই চিরকবি।
দেখা তুই দিবি না কি? না হয় না দিলি,
একটি কি পুরাবি না আশ?
কাছে হতে একবার শুনিবারে চাই
তোর গীতোচ্ছ্বাস।
অরণ্যের পর্বতের সমুদ্রের গান,
ঝটিকার বজ্রগীতস্বর,
দিবসের প্রদোষের রজনীর গীত,
চেতনার নিদ্রার মর্মর,
বসন্তের বরষার শরতের গান,
জীবনের মরণের স্বর,
আলোকের পদধ্বনি মহা অন্ধকারে
ব্যাপ্ত করি বিশ্বচরাচর,
পৃথিবীর চন্দ্রমার গ্রহ-তপনের,
কোটি কোটি তারার সংগীত,
তোর কাছে জগতের কোন্ মাঝখানে
না জানি রে হতেছে মিলিত।
সেইখানে একবার বসাইবি মোরে
সেই মহা-আঁধার নিশায়,
শুনিব রে আঁখি মুদি বিশ্বের সংগীত
তোর মুখে কেমন শুনায়।

জোছনায় ফুলবনে একাকী বসিয়া থাকি,
আঁখি দিয়া অশ্রুবারি ঝরে—
বল্ মোরে বল্ অয়ি মোহিনী ছলনা,
সে কি তোরি তরে?
বিরামের গান গেয়ে সায়াহ্নের বায়
কোথা বহে যায়—
তারি সাথে কেন মোর প্রাণ হু হু করে,
সে কি তোরি তরে?
বাতাসে সৌরভ ভাসে, আঁধারে কত-না তারা,
আকাশে অসীম নীরবতা—
তখন প্রাণের মাঝে কত কথা ভেসে যায়,
সে কি তোরি কথা?
ফুলের সৌরভগুলি আকাশে খেলাতে এসে
বাতাসেতে হয় পথহারা,
চারি দিকে ঘুরে হয় সারা,
মার কোলে ফিরে যেতে চায়,
ফুলে ফুলে খুঁজিয়া বেড়ায়,
তেমনি প্রাণের মাঝে অশরীরী আশাগুলি

ভ্রমে কেন হেথায় হোথায়,
সে কি তোরে চায়?
আঁখি যেন কার তরে পথ-পানে চেয়ে আছে
দিন গণি গণি.
মাঝে মাঝে কারো মুখে সহসা দেখে সে যেন
অতুল রূপের প্রতিধ্বনি.
কাছে গেলে মিলাইয়া যায়
নিরাশের হাসিটির প্রায়--
সৌন্দর্যের মরীচিকা এ কাহার মায়া,
এ কি তোরি ছায়া!

জগতের গানগুলি দূর-দূরান্তর হতে
দলে দলে তোর কাছে যায়,
যেন তারা বহ্নি হেরি পতঙ্গের মতো
পদতলে মরিবারে চায়।
জগতের মৃত গানগুলি
তোর কাছে পেয়ে নব প্রাণ
সংগীতের পরলোক হতে
গায় যেন দেহমুক্ত গান।
তাই তার নব কণ্ঠধ্বনি
প্রভাতের স্বপনের প্রায়,
কুসুমের সৌরভের সাথে
এমন সহজে মিশে যায়।
আমি ভাবিতেছি বসে গানগুলি তোরে
না জানি কেমনে খুঁজে পায়--
না জানি কোথায় খুঁজে পায়।
না জানি কী গুহার মাঝারে
অস্ফুট মেঘের উপবনে,
স্মৃতি ও আশায় বিজড়িত
আলোক-ছায়ার সিংহাসনে,
ছায়াময়ী মূর্তিখানি আপনে আপনি মিশি
আপনি বিস্মিত আপনায়,
কার পানে শূন্যপানে চায়!
সায়াহ্নে প্রশান্ত রবি স্বর্ণময় মেঘ-মাঝে
পশ্চিমের সমুদ্রসীমায়
প্রভাতের জন্মভূমি শৈশব পূরব-পানে
যেমন আকুল নেত্রে চায়,
পূরবের শূন্য পটে প্রভাতের স্মৃতিগুলি
এখনো দেখিতে যেন পায়,
তেমনি সে ছায়াময়ী কোথা যেন চেয়ে আছে
কোথা হতে আসিতেছে গান—

এলানো কুন্তলজালে সন্ধ্যার তারকাগুলি
গান শুনে মুদিছে নয়ান।
বিচিত্র সৌন্দর্য জগতের
হেথা আসি হইতেছে লয়।
সংগীত, সৌরভ, শোভা জগতে যা-কিছু আছে
সবি হেথা প্রতিধ্বনিময়।
প্রতিধ্বনি, তব নিকেতন,
তোমার সে সৌন্দর্য অতুল,
প্রাণে জাগে ছায়ার মতন—
ভাষা হয় আকুল ব্যাকুল।

আমরণ চির দিন কেবলি খুঁজিব তোরে
কখনো কি পাব না সন্ধান?
কেবলি কি রবি দূরে, অতি দূর হতে
শুনিব রে ওই আধো গান?
এই বিশ্বজগতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া
বাজাইবি সৌন্দর্যের বাঁশি,
অনন্ত জীবনপথে খুঁজিয়া চলিব তোরে,
প্রাণমন হইবে উদাসী।
তপনেরে ঘিরি ঘিরি যেমন ঘুরিছে ধরা,
ঘুরিব কি তোর চারি দিকে?
অনন্ত প্রাণের পথে বরষিবি গীতধারা,
চেয়ে আমি রব অনিমিখে।
তোরি মোহময় গান শুনিতেছি অবিরত,
তোরি রূপ কল্পনায় লিখা—
করিস নে প্রবঞ্চনা সত্য করে বল্ দেখি
তুই তো নহিস মরীচিকা?
কত বার আর্ত স্বরে শুধায়েছি প্রাণপণে,
অয়ি তুমি কোথায়—কোথায়—
অমনি সুদূর হতে কেন তুমি বলিয়াছ
'কে জানে কোথায়'?
আশাময়ী, ও কী কথা, তুমি কি আপনহারা—
আপনি জান না আপনায়?

মহাস্বপ্ন

পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন,
নিদ্রামগ্ন মহাদেব দেখিছেন মহান্ স্বপন।
বিশাল জগৎ এই প্রকাণ্ড স্বপন সেই,
হৃদয়সমুদ্রে তাঁর উঠিতেছে বিম্বের মতন।

উঠিতেছে চন্দ্র সূর্য, উঠিতেছে আলোক আঁধার,
উঠিতেছে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের জ্যোতি-পরিবার।
উঠিতেছে, ছুটিতেছে গ্রহ উপগ্রহ দলে দলে,
উঠিতেছে ডুবিতেছে রাত্রি দিন আকাশের তলে।
একা বসি মহাসিন্ধু চির দিন গাইতেছে গান,
ছুটিয়া সহস্র নদী পদতলে মিলাইছে প্রাণ।
তটিনীর কলরব, লক্ষ নির্ঝরের ঝর ঝর,
সিন্ধুর গম্ভীর গীত, মেঘের গম্ভীর কণ্ঠস্বর,
ঝটিকা করিছে হা হা আশ্রয়-আলয় তার ছাড়ি
বাজায়ে অরণ্য-বীণা ভীমবল শত বাহু নাড়ি,
রুদ্র রাগ আলাপিয়া গড়ায়ে পড়িছে হিমরাশ
পর্বতদৈত্যের যেন ঘনীভূত ঘোর অট্টহাস,
ধীরে ধীরে মহারণ্য নাড়িতেছে জটাময় মাথা -
ঝর ঝর মর মর উঠিতেছে সুগম্ভীর গাথা।
চেতনার কোলাহলে দিবস পূরিছে দশ দিশি,
ঝিল্লিরবে একমন্ত্র জপিতেছে তাপসিনী নিশি,
সমস্ত একত্রে মিলি ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া চারি ভিত
উঠাইছে মহা-হৃদে মহা এক স্বপনসংগীত।
স্বপনের রাজ্য এই স্বপন-রাজ্যের জীবগণ
দেহ ধরিতেছে কত মুহুর্মুহু নূতন নূতন।
ফুল হয়ে যায় ফল, ফুল ফল বীজ হয় শেষে,
নব নব বৃক্ষ হয়ে বেঁচে থাকে কাননপ্রদেশে।
বাষ্প হয়, মেঘ হয়, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিবারিধারা,
নির্ঝর তটিনী হয়, ভাঙি ফেলে শিলাময় কারা।
নিদাঘ মরিয়া যায়, বরষা শ্মশানে আসি তার
নিবায় জ্বলন্ত চিতা বরষিয়া অশ্রুবারিধার।
বরষা হইয়া বৃদ্ধ শ্বেতকেশ শীত হয়ে যায়,
যযাতির মতো পুন বসন্তযৌবন ফিরে পায়।
এক শুধু পুরাতন, আর সব নূতন নূতন,
এক পুরাতন হৃদে উঠিতেছে নূতন স্বপন।
অপূর্ণ স্বপন-সৃষ্ট মানুষেরা অভাবের দাস,
জাগ্রত পূর্ণতা-তরে পাইতেছে কত-না প্রয়াস!
চেতনা ছিঁড়িতে চাহে আধো-অচেতন আবরণ—
দিনরাত্রি এই আশা, এই তার একমাত্র পণ।
পূর্ণ আত্মা জাগিবেন, কভু কি আসিবে হেন দিন?
অপূর্ণ জগৎ-স্বপ্ন ধীরে ধীরে হইবে বিলীন?
চন্দ্র-সূর্য-তারকার অন্ধকার স্বপ্নময়ী ছায়া
জ্যোতির্ময় সে হৃদয়ে ধীরে ধীরে মিলাইবে কায়া।
পৃথিবী ভাঙিয়া যাবে, একে একে গ্রহতারাগণ
ভেঙে ভেঙে মিলে যাবে একেকটি বিম্বের মতন।
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ চেয়ে জ্যোতির্ময় মহান্ বৃহৎ
জীব-আত্মা মিলাইবে একেকটি জলবিম্ববৎ।

কভু কি আসিবে, দেব, সেই মহাস্বপ্ন-ভাঙা দিন—
সত্যের সমুদ্র-মাঝে আধো-সত্য হয়ে যাবে লীন?
আধেক প্রলয়জলে ডুবে আছে তোমার হৃদয়—
বলো, দেব, কবে হেন প্রলয়ের হইবে প্রলয়।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়

দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য, মহাশূন্য-'পরি
চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান,
মহা অন্ধ অন্ধকার সভয়ে রয়েছে দাঁড়াইয়া—
কবে দেব খুলিবে নয়ান।
অনন্ত হৃদয়-মাঝে আসন্ন জগৎ চরাচর
দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত নিশ্চল,
অনন্ত হৃদয়ে তাঁর ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান
ধীরে ধীরে বিকাশিছে দল।
লেগেছে ভাবের ঘোর, মহানন্দে পূর্ণ তাঁর প্রাণ
নিজের হৃদয়পানে চাহি,
নিস্তরঙ্গ রহিয়াছে অনন্ত আনন্দ-পারাবার—
কূল নাহি, দিগ্বিদিক নাহি।
পুলকে পূর্ণিত তাঁর প্রাণ,
সহসা আনন্দ-সিন্ধু হৃদয়ে উঠিল উথলিয়া,
আদিদেব খুলিলা নয়ান;
জনশূন্য জ্যোতিঃশূন্য অন্ধতম অন্ধকার-মাঝে
উচ্ছ্বসি উঠিল বেদগান।
চারি মুখে বাহিরিল বাণী
চারি দিকে করিল প্রয়াণ।
সীমাহারা মহা অন্ধকারে
সীমাশূন্য ব্যোম-পারাবারে
প্রাণপূর্ণ ঝটিকার মতো,
ভাবপূর্ণ ব্যাকুলতা-সম,
আশাপূর্ণ অতৃপ্তির প্রায়,
সঞ্চরিতে লাগিল সে ভাষা।
দূর দূর যত দূর যায়
কিছুতেই অন্ত নাহি পায়—
যুগ যুগ যুগ যুগান্তর
ভ্রমিতেছে আজিও সে বাণী,
আজিও সে অন্ত নাহি পায়।

ভাবের আনন্দে ভোর, গীতিকবি চারি মুখে
করিতে লাগিলা বেদগান।

আনন্দের আন্দোলনে ঘন ঘন বহে শ্বাস,
অষ্ট নেত্রে বিস্ফুরিল জ্যোতি।
জ্যোতির্ময় জটাজাল কোটি সূর্যপ্রভা-সম
দিগ্বিদিকে পড়িল ছড়ায়ে,
মহান্ ললাটে তাঁর অযুত তড়িৎ-স্ফূর্তি
অবিরাম লাগিল খেলিতে।
অনন্ত ভাবের দল, হৃদয়-মাঝারে তাঁর
হতেছিল আকুল ব্যাকুল—
মুক্ত হয়ে ছুটিল তাহারা,
জগতের গঙ্গোত্রীশিখর হতে
শত শত স্রোতে
উচ্ছ্বসিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর,
বাহিরিল অগ্নিময়ী বাণী,
উচ্ছ্বসিল বাষ্পময় ভাব।
উত্তরে দক্ষিণে গেল,
পূরবে পশ্চিমে গেল,
চারি দিকে ছুটিল তাহারা,
আকাশের মহাক্ষেত্রে শৈশব-উচ্ছ্বাস-বেগে
নাচিতে লাগিল মহোল্লাসে।
শব্দশূন্য শূন্য-মাঝে সহসা সহস্র স্বরে
জয়ধ্বনি উঠিল উথলি,
হর্ষধ্বনি উঠিল ফুটিয়া,
স্তব্ধতার পাষাণ-হৃদয়
শত ভাগে গেল রে ফাটিয়া।
শব্দস্রোত ঝরিল চৌদিকে
এককালে সমস্বরে—
পূরবে উঠিল ধ্বনি, পশ্চিমে উঠিল ধ্বনি,
ব্যাপ্ত হল উত্তরে দক্ষিণে।
অসংখ্য ভাবের দল খেলিতে লাগিল যত
উঠিল খেলার কোলাহল।
শূন্যে শূন্যে মাতিয়া বেড়ায়—
হেথা ছোটে, হোথা ছুটে যায়।
কী করিবে আপনা লইয়া
যেন তাহা ভাবিয়া না পায়,
আনন্দে ভাঙিয়া যেতে চায়।
যে প্রাণ অনন্ত যুগ রবে
সেই প্রাণ পেয়েছে নূতন,
আনন্দে অনন্ত প্রাণ যেন
মুহূর্তে করিতে চায় ব্যয়।
অবশেষে আকাশ ব্যাপিয়া
পড়িল প্রেমের আকর্ষণ।

এ ধায় উহার পানে,
এ চায় উহার মুখে,
আগ্রহে ছুটিয়া কাছে আসে।
বাষ্পে বাষ্পে করে ছুটাছুটি,
বাষ্পে বাষ্পে করে আলিঙ্গন।
অগ্নিময় কাতর হৃদয়
অগ্নিময় হৃদয়ে মিশিছে।
জ্বলিছে দ্বিগুণ অগ্নিরাশি
আঁধার হতেছে চুর চুর।
অগ্নিময় মিলন হইতে
জন্মিতেছে আগ্নেয় সন্তান,
অন্ধকার শূন্য মরু-মাঝে
শত শত অগ্নি-পরিবার
দিশে দিশে করিছে ভ্রমণ।

. . .

নূতন সে প্রাণের উল্লাসে
নূতন সে প্রাণের উচ্ছ্বাসে
বিশ্ব যবে হয়েছে উন্মাদ,
চারি দিকে উঠিছে নিনাদ,
অনন্ত আকাশে দাঁড়াইয়া
চারি দিকে চারি হাত দিয়া
বিষ্ণু আসি মন্ত্র পড়ি দিলা,
বিষ্ণু আসি কৈলা আশীর্বাদ।
লইয়া মঙ্গলশঙ্খ করে,
কাঁপায়ে জগৎ চরাচরে
বিষ্ণু আসি কৈলা শঙ্খনাদ।
থেমে এল প্রচণ্ড কল্লোল,
নিবে এল জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস,
গ্রহগণ নিজ অশ্রুজলে
নিবাইল নিজের হুতাশ।
জগতের বাঁধিল সমাজ,
জগতের বাঁধিল সংসার,
বিবাহে বাহুতে বাহু বাঁধি
জগৎ হইল পরিবার।
বিষ্ণু আসি মহাকাশে লেখনী ধরিয়া করে
মহান্ কালের পত্র খুলি
ধরিয়া ব্রহ্মার ধ্যানগুলি,
একমনে পরম যতনে,
লিখি লিখি যুগ-যুগান্তর
বাঁধি দিলা ছন্দের বাঁধনে।
জগতের মহা-বেদব্যাস
গঠিলা নিখিল উপন্যাস,

বিশৃঙ্খল বিশ্বগীতি লয়ে
মহাকাব্য করিলা রচন।
জগতের ফুলরাশি লয়ে
গাঁথি মালা মনের মতন
নিজ গলে কৈলা আরোপণ।
জগতের মালাখানি জগৎ-পতির গলে
মরি কিবা সেজেছে অতুল,
দেখিবারে হৃদয় আকুল।
বিশ্বমালা অসীম অক্ষয়,
কত চন্দ্র কত সূর্য কত গ্রহ কত তারা
কত বর্ণ কত গীত-ময়।

নিজ নিজ পরিবার লয়ে
ভ্রমে সবে নিজ নিজ পথে,
বিষ্ণুদেব চক্র হাতে লয়ে,
চক্রে চক্রে বাঁধিলা জগতে।
চক্রপথে ভ্রমে গ্রহ তারা,
চক্রপথে রবি শশী ভ্রমে,
শাসনের গদা হস্তে লয়ে
চরাচর রাখিলা নিয়মে।
দুরন্ত প্রেমেরে মন্ত্র পড়ি
বাঁধি দিলা বিবাহবন্ধনে।
মহাকায় শনিরে ঘেরিয়া
হাতে হাতে ধরিয়া ধরিয়া
নাচিতে লাগিল এক তালে
সুধামুখ চাঁদ শত শত।
পৃথিবীর সমুদ্র-হৃদয়
চন্দ্রে হেরি উঠে উথলিয়া।
পৃথিবীর মুখপানে চেয়ে
চন্দ্র হাসে আনন্দে গলিয়া।
মিলি যত গ্রহ ভাইবোন
এক অন্নে হইল পালিত,
তারা-সহোদর যত ছিল
এক সাথে হইল মিলিত।
কত কত শত বর্ষ ধরি
দূর পথ অতিক্রম করি
পাঠাইছে বিদেশ হইতে
তারাগুলি, আলোকের দূত
ক্ষুদ্র ওই দূরদেশবাসী
পৃথিবীর বারতা লইতে।
রবি ধায় রবির চৌদিকে,
গ্রহ ধায় রবিরে ঘেরিয়া,

চাঁদ হাসে গ্রহমুখ চেয়ে,
তারা হাসে তারায় হেরিয়া।
মহাছন্দ মহা অনুপ্রাস
চরাচরে বিস্তারিল পাশ।

পশিয়া মানস সরোবরে
স্বর্ণপদ্ম করিলা চয়ন,
বিষ্ণুদেব প্রসন্ন আননে
পদ্মপানে মেলিল নয়ন।
ফুটিয়া উঠিল শতদল,
বাহিরিল কিরণ বিমল,
মাতিল রে দ্যুলোক ভূলোক—
আকাশে পূরিল পরিমল।
চরাচরে উঠাইয়া গান
চরাচরে জাগাইয়া হাসি
কোমল কমলদল হতে
উঠিল অতুল রূপরাশি।
মেলি দুটি নয়ন বিহ্বল
ত্যজিয়া সে শতদলদল
ধীরে ধীরে জগৎ-মাঝারে
লক্ষ্মী আসি ফেলিলা চরণ—
গ্রহে গ্রহে তারায় তারায়
ফুটিল রে বিচিত্র বরন।
জগৎ মুখের পানে চায়,
জগৎ পাগল হয়ে যায়,
নাচিতে লাগিল চারি দিকে—
আনন্দের অন্ত নাহি পায়।
জগতের মুখপানে চেয়ে
লক্ষ্মী যবে হাসিলেন হাসি
মেঘেতে ফুটিল ইন্দ্রধনু,
কাননে ফুটিল ফুলরাশি—
হাসি লয়ে করে কাড়াকাড়ি
চন্দ্র সূর্য গ্রহ চারি ভিতে,
চাহে তাঁর চরণছায়ায়
যৌবনকুসুম ফুটাইতে।
জগতের হৃদয়ের আশা
দশ দিকে আকুল হইয়া
ফুল হয়ে পরিমল হয়ে
গান হয়ে উঠিল ফুটিয়া।
এ কি হেরি যৌবন-উচ্ছ্বাস,
এ কি রে মোহন ইন্দ্রজাল—
সৌন্দর্যকুসুমে গেল ঢেকে

জগতের কঠিন কঙ্কাল।
হাসি হয়ে ভাতিল আকাশে
তারকার রক্তিম নয়ান,
জগতের হর্ষ-কোলাহল
রাগিণীতে হল অবসান।
কোমলে কঠিন লুকাইল,
শক্তিরে ঢাকিল রূপরাশি,
প্রেমের হৃদয়ে মহা বল
অশনির মুখে দিল হাসি।
সকলি হইল মনোহর
সাজিল জগৎ চরাচর।

...

মহাছন্দে বাঁধা হয়ে যুগ যুগ যুগ যুগান্তরে
পড়িল নিয়ম-পাঠশালে
অসীম জগৎ চরাচর।
শ্রান্ত হয়ে এল কলেবর,
নিদ্রা আসে নয়নে তাহার,
আকর্ষণ হতেছে শিথিল,
উত্তাপ হতেছে একাকার।
জগতের প্রাণ হতে
উঠিল রে বিলাপসংগীত,
কাঁদিয়া উঠিল চারি ভিত।
পূরবে বিলাপ উঠে, পশ্চিমে বিলাপ উঠে,
কাঁদিল রে উত্তর দক্ষিণ,
কাঁদে গ্রহ, কাঁদে তারা, শ্রান্তদেহে কাঁদে রবি—
জগৎ হইল শান্তিহীন।
চারি দিক হতে উঠিতেছে
আকুল বিশ্বের কণ্ঠস্বর,
"জাগো জাগো জাগো মহাদেব,
কবে মোরা পাব অবসর?
অলঙ্ঘ্য নিয়মপথে ভ্রমি
হয়েছে হে শ্রান্ত কলেবর।
নিয়মের পাঠ সমাপিয়া
সাধ গেছে খেলা করিবারে,
একবার ছেড়ে দাও, দেব,
অনন্ত এ আকাশ-মাঝারে।"
জগতের আত্মা কহে কাঁদি,
"আমারে নূতন দেহ দাও—
প্রতিদিন বাড়িছে হৃদয়,
প্রতিদিন বাড়িতেছে আশা,
প্রতিদিন টুটিতেছে দেহ,
প্রতিদিন ভাঙিতেছে বল।

গাও দেব মরণসংগীত
পাব মোরা নূতন জীবন।”
জগৎ কাঁদিল উচ্চরবে
জাগিয়া উঠিলা মহেশ্বর,
তিন কাল ত্রিনয়ন মেলি,
হেরিলেন দিক্‌ দিগন্তর।
প্রলয়বিষাণ তুলি করে ধরিলেন শূলী
পদতলে জগৎ চাপিয়া—
জগতের আদি অন্ত থরথর থরথর
একবার উঠিল কাঁপিয়া।
বিষাণেতে পূরিলা নিশ্বাস,
ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল
জগতের সমস্ত বাঁধন।
উঠিল রে মহাশূন্যে গরজিয়া তরঙ্গিয়া
ছন্দোমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দ কোলাহল।
ছিঁড়ে গেল রবি শশী গ্রহ তারা ধূমকেতু,
কে কোথায় ছুটে গেল,
ভেঙে গেল, টুটে গেল,
চন্দ্রে সূর্যে গুঁড়াইয়া
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল।
মহা অগ্নি জ্বলিল রে,
আকাশের অনন্ত হৃদয়—
অগ্নি, অগ্নি, শুধু অগ্নিময়।
মহা অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া
জগতের মহা চিতানল।
খণ্ড খণ্ড রবি শশী, চূর্ণ চূর্ণ গ্রহ তারা
বিন্দু বিন্দু আঁধারের মতো
বরষিছে চারি দিক হতে,
অনলের তেজোময় গ্রাসে
নিমেষেতে যেতেছে মিশায়ে।
সৃজনের আরম্ভসময়ে
আছিল অনাদি অন্ধকার,
সৃজনের ধ্বংসযুগান্তরে
রহিল অসীম হুতাশন।
অনন্ত আকাশগ্রাসী অনল সমুদ্র-মাঝে
মহাদেব মুদি ত্রিনয়ান
করিতে লাগিলা মহাধ্যান।

অনুবাদিত

কবি

ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া,
কভু বা অবাক, কভু ভকতি-বিহ্বল হিয়া,
নিজের প্রাণের মাঝে
একটি যে বীণা বাজে,
সে বীণা শুনিতেছেন হৃদয়-মাঝারে গিয়া!
বনে যতগুলি ফুল আলো করি ছিল শাখা,
কারো কচি তনুখানি নীল বসনেতে ঢাকা,
কারো বা সোনার মুখ,
কেহ রাঙা টুক টুক,
কারো বা শতেক রঙ যেন ময়ূরের পাখা,
কবিরে আসিতে দেখি হরষেতে হেলি দুলি
হাবভাব করে কত রূপসী সে মেয়েগুলি,
বলাবলি করে, আর ফিরিয়া ফিরিয়া চায়,
"প্রণয়ী মোদের ওই দেখ লো চলিয়া যায়।"

সে অরণ্যে বনস্পতি মহান, বিশাল-কায়া,
হেথায় জাগিছে আলো, হোথায় ঘুমায় ছায়া।
কোথাও বা বৃদ্ধ বট—
মাথায় নিবিড় জট;
ত্রিবলী অঙ্কিত দেহ প্রকাণ্ড তমাল শাল;
কোথা বা ঋষির মতো
অশথের গাছ যত
দাঁড়ায়ে রয়েছে মৌন ছড়ায়ে আঁধার ডাল।
মহর্ষি গুরুরে হেরি অমনি ভকতি-ভরে
সসম্ভ্রমে শিষ্যগণ যেমন প্রণাম করে,
তেমনি কবিরে দেখি গাছেরা দাঁড়াল নুয়ে,
লতা-শ্মশ্রুময় মাথা ঝুলিয়া পড়িল ভুঁয়ে।
একদৃষ্টে চেয়ে দেখি প্রশান্ত সে মুখচ্ছবি,
চুপি চুপি কহে তারা "ওই সেই! ওই কবি।"

—Victor Hugo

বিসর্জন

যে তোরে বাসে রে ভালো, তারে ভালো বেসে বাছা,
চিরকাল সুখে তুই রোস।
বিদায়! মোদের ঘরে রতন আছিলি তুই,
এখন তাহারি তুই হোস।

আমাদের আশীর্বাদ নিয়ে তুই যা রে
এক পরিবার হতে অন্য পরিবারে।
সুখ শান্তি নিয়ে যাস তোর পাছে পাছে,
দুঃখ জ্বালা রেখে যাস আমাদের কাছে।

হেথা রাখিতেছি ধরে সেথা চাহিতেছে তোরে,
দেরি হল, যা তাদের কাছে।
প্রাণের বাছাটি মোর, লক্ষ্মীর প্রতিমা তুই,
দুইটি কর্তব্য তোর আছে।
একটু বিলাপ যাস আমাদের দিয়ে,
তাহাদের তরে আশা যাস সাথে নিয়ে;
এক বিন্দু অশ্রু দিস আমাদের তরে,
হাসিটি লইয়া যাস তাহাদের ঘরে!

—Victor Hugo

তারা ও আঁখি

কাল সন্ধ্যাকালে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস
বহিয়া আনিতেছিল ফুলের সুবাস।
রাত্রি হল, আঁধারে ঘনীভূত ছায়ে
পাখিগুলি একে একে পড়িল ঘুমায়ে।
প্রফুল্ল বসন্ত ছিল ঘেরি চারি ধার
আছিল প্রফুল্লতর যৌবন তোমার,
তারকা হাসিতেছিল আকাশের মেয়ে,
ও আঁখি হাসিতেছিল তাহাদের চেয়ে।
দুজনে কহিতেছিনু কথা কানে কানে,
হৃদয় গাহিতেছিল মিষ্টতম তানে।
রজনী দেখিনু অতি পবিত্র বিমল,
ও মুখ দেখিনু অতি সুন্দর উজ্জ্বল,
সোনার তারকাদের ডেকে ধীরে ধীরে,
কহিনু "সমস্ত স্বর্গ ঢাল এর শিরে!"
বলিনু আঁখিরে তব "ওগো আঁখি-তারা,
ঢালো গো আমার 'পরে প্রণয়ের ধারা।"

—Victor Hugo

সূর্য ও ফুল

মহীয়সী মহিমার আগ্নেয় কুসুম
সূর্য, ধায় লভিবারে বিশ্রামের ঘুম।

ভাঙা এক ভিত্তি-'পরে ফুল শুভ্রবাস,
চারি দিকে শুভ্রদল করিয়া বিকাশ
মাথা তুলে চেয়ে দেখে সুনীল বিমানে
অমর আলোকময় তপনের পানে,
ছোটো মাথা দুলাইয়া কহে ফুল গাছে—
"লাবণ্য-কিরণ ছটা আমারো তো আছে।"

—Victor Hugo

সম্মিলন

সেথায় কপোত-বধু লতার আড়ালে
দিবানিশি গাহে শুধু প্রেমের বিলাপ।
নবীন চাঁদের করে একটি হরিণী
আমাদের গৃহদ্বারে আরামে ঘুমায়।
তার শান্ত নিদ্রাকালে নিশ্বাস পতনে
প্রহর গণিতে পারি স্তব্ধ রজনীর।
সুখের আবাসে সেই কাটাব জীবন,
দুজনে উঠিব মোরা, দুজনে বসিব,
নীল আকাশের নীচে ভ্রমিব দুজনে,
বেড়াইব মাঠে মাঠে উঠিব পর্বতে
সুনীল আকাশ যেথা পড়েছে নামিয়া।
অথবা দাঁড়াব মোরা সমুদ্রের তটে,
উপল-মণ্ডিত সেই স্নিগ্ধ উপকূলে
তরঙ্গের চুম্বনেতে উচ্ছ্বাসে মাতিয়া
থর থর কাঁপে আর জ্বল জ্বল জ্বলে!
যত সুখ আছে সেথা আমাদের হবে,
আমরা দুজনে সেথা হব দুজনের,
অবশেষে বিজন সে দ্বীপের মাঝারে
ভালোবাসা, বেঁচে থাকা, এক হয়ে যাবে।
মধ্যাহ্নে যাইব মোরা পর্বতগুহায়,
সে প্রাচীন শৈল-গুহা স্নেহের আদরে
অবসান রজনীর মৃদু জোছনারে
রেখেছে পাষাণ কোলে ঘুম পাড়াইয়া।
প্রচ্ছন্ন আঁধারে সেথা ঘুম আসি ধীরে
হয়তো হরিবে তোর নয়নের আভা।
সে ঘুম অলস প্রেমে শিশিরের মতো,
সে ঘুম নিভায়ে রাখে চুম্বন-অনল
আবার নূতন করি জ্বালাবার তরে।
অথবা বিরলে সেথা কথা কব মোরা,
কহিতে কহিতে কথা, হৃদয়ের ভাব
এমন মধুর স্বরে গাহিয়া উঠিবে
আর আমাদের মুখে কথা ফুটিবে না।

মনের সে ভাবগুলি কথায় মরিয়া
আমাদের চোখে চোখে বাঁচিয়া উঠিবে!
চোখের সে কথাগুলি বাক্যহীন মনে
ঢালিবে অজস্র স্রোতে নীরব সংগীত
মিলিবেক চৌদিকে নীরবতা সনে।
মিশিবেক আমাদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
আমাদের দুই হৃদি নাচিতে থাকিবে,
শোণিত বহিবে বেগে দোঁহার শিরায়।
মোদের অধর দুটি কথা ভুলি গিয়া
কবে শুধু উচ্ছ্বসিত চুম্বনের ভাষা!
দুজনে দুজন আর রব না আমরা,
এক হয়ে যাব মোরা দুইটি শরীরে।
দুইটি শরীর? আহা তাও কেন হল?
যেমন দুইটি উল্কা জ্বলন্ত শরীর,
ক্রমশ দেহের শিখা করিয়া বিস্তার
স্পর্শ করে, মিশে যায়, এক দেহ ধরে,
চিরকাল জ্বলে তবু ভস্ম নাহি হয়,
দুজনেরে গ্রাস করি দোঁহে বেচে থাকে;
মোদের যমক-হৃদে একই বাসনা,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে বাড়িয়া বাড়িয়া,
তেমনি মিলিয়া যাবে অনন্ত মিলনে।
এক আশা রবে শুধু দুইটি ইচ্ছার
এক ইচ্ছা রবে শুধু দুইটি হৃদয়ে,
একই জীবন আর একই মরণ,
একই স্বরগ আর একই নরক,
এক অমরতা কিম্বা একই নির্বাণ!
হায় হায় এ কী হল এ কী হল মোর!
আমার হৃদয় চায় উধাও উড়িয়া
প্রেমের সুদূর রাজ্যে করিতে ভ্রমণ,
কিন্তু গুরুভার এই মরতের ভাষা
চরণে বেঁধেছে তার লোহার শৃঙ্খল।
নামি বুঝি, পড়ি বুঝি, মরি বুঝি মরি।

—Shelley

স্রোত

জগৎ-স্রোতে ভেসে চলো, যে যেথা আছ ভাই!
চলেছে যেথা রবি শশী চলো রে সেথা যাই।
কোথায় চলে কে জানে তা, কোথায় যাবে শেষে,
জগৎ-স্রোত ব'হে গিয়ে কোন্ সাগরে মেশে।
অনাদি কাল চলে স্রোত অসীম আকাশেতে,
উঠেছে মহা কলরব অসীমে যেতে যেতে।
উঠিছে ঢেউ, পড়ে ঢেউ, গণিবে কেবা কত!
ভাসিছে শত গ্রহ তারা, ডুবিছে শত শত।
ঢেউয়ের 'পরে খেলা করে আলোকে আঁধারেতে,
জলের কোলে লুকাচুরি জীবনে মরণেতে।
শতেক কোটি গ্রহ তারা যে স্রোতে তৃণপ্রায়
সে স্রোত-মাঝে অবহেলে ঢালিয়া দিব কায়,
অসীম কাল ভেসে যাব অসীম আকাশেতে,
জগৎ-কলকলরব শুনিব কান পেতে।
দেখিব ঢেউ— উঠে ঢেউ, দেখিব মিশে যায়,
জীবন-মাঝে উঠে ঢেউ মরণ-গান গায়।
দেখিব চেয়ে চারি দিকে, দেখিব তুলে মুখ—
কত-না আশা, কত হাসি, কত-না সুখ দুখ,
বিরাগ দ্বেষ ভালোবাসা, কত-না হায়-হায়—
তপন ভাসে, তারা ভাসে, তা'রাও ভেসে যায়।
কত-না যায়, কত চায়, কত-না কাঁদে হাসে—
আমি তো শুধু ভেসে যাব, দেখিব চারি পাশে।

অবোধ ওরে, কেন মিছে করিস 'আমি আমি'।
উজানে যেতে পারিবি কি সাগরপথগামী?
জগৎ-পানে যাবি নে রে, আপনা-পানে যাবি—
সে যে রে মহা মরুভূমি, কী জানি কী যে পাবি।
মাথায় করে আপনারে, সুখ-দুখের বোঝা,
ভাসিতে চাস প্রতিকূলে— সে তো রে নহে সোজা।
অবশ দেহ, ক্ষীণ বল, সঘনে বহে শ্বাস,
লইয়া তোর সুখ দুখ এখনি পাবি নাশ।

জগৎ হয়ে রব আমি, একেলা রহিব না।
মরিয়া যাব একা হলে একটি জলকণা।
আমার নাহি সুখ দুখ, পরের পানে চাই—
যাহার পানে চেয়ে দেখি তাহাই হয়ে যাই।
তপন ভাসে, তারা ভাসে, আমিও যাই ভেসে—
তাদের গানে আমার গান, যেতেছি এক দেশে।
প্রভাত সাথে গাহি গান, সাঁঝের সাথে গাই,
তারার সাথে উঠি আমি, তারার সাথে যাই।

ফুলের সাথে ফুটি আমি, লতার সাথে নাচি,
বায়ুর সাথে ঘুরি শুধু ফুলের কাছাকাছি।
মায়ের প্রাণে স্নেহ হয়ে শিশুর পানে ধাই,
দুখীর সাথে কাঁদি আমি, সুখীর সাথে গাই।
সবার সাথে আছি আমি, আমার সাথে নাই,
জগৎ-স্রোতে দিবানিশি ভাসিয়া চলে যাই।

চেয়ে থাকা

মনেতে সাধ যে দিকে চাই
কেবলি চেয়ে রব।
দেখিব শুধু, দেখিব শুধু,
কথাটি নাহি কব।
পরানে শুধু জাগিবে প্রেম,
নয়নে লাগে ঘোর,
জগতে যেন ডুবিয়া রব
হইয়া রব ভোর।

তটিনী যায়, বহিয়া যায়,
কে জানে কোথা যায়;
তীরেতে বসে রহিব চেয়ে,
সারাটি দিন যায়।
সুদূর জলে ডুবিছে রবি
সোনার লেখা লিখি,
সাঁঝের আলো জলেতে শুয়ে
করিছে ঝিকিমিকি।
সুধীর স্রোতে তরণীগুলি
যেতেছে সারি সারি,
বহিয়া যায়, ভাসিয়া যায়
কত-না নরনারী।
না জানি তারা কোথায় থাকে,
যেতেছে কোন্ দেশে,
সুদূর তীরে কোথায় গিয়ে
থামিবে অবশেষে।
কত কী আশা গড়িছে বসে
তাদের মনখানি,
কত কী সুখ কত কী দুখ
কিছুই নাহি জানি।

দেখিব পাখি আকাশে ওড়ে,
সুদূরে উড়ে যায়,
মিশায়ে যায় কিরণ-মাঝে,
আঁধাররেখাপ্রায়!
তাহারি সাথে সারাটি দিন
উড়িবে মোর প্রাণ,
নীরবে বসি তাহারি সাথে
গাহিব তারি গান।
তাহারি মতো মেঘের মাঝে
বাঁধিতে চাহি বাসা,
তাহারি মতো চাঁদের কোলে
গড়িতে চাহি আশা।
তাহারি মতো আকাশে উঠে,
ধরার পানে চেয়ে,
ধরায় যারে এসেছি ফেলে
ডাকিব গান গেয়ে।
তাহারি মতো, তাহারি সাথে
উষার দ্বারে গিয়ে,
ঘুমের ঘোর ভাঙায়ে দিব
উষারে জাগাইয়ে।

পথের ধারে বসিয়া রব
বিজন তরুছায়,
সমুখ দিয়ে পথিক যত
কত-না আসে যায়।
ধূলায় বসে আপন মনে
ছেলেরা খেলা করে,
মুখেতে হাসি সখারা মিলে
যেতেছে ফিরে ঘরে।

পথের ধারে ঘরের দ্বারে
বালিকা এক মেয়ে,
ছোটো ভায়েরে পাড়ায় ঘুম
কত কী গান গেয়ে।
তাহার পানে চাহিয়া থাকি
দিবস যায় চলে,
স্নেহেতে ভরা করুণ আঁখি—
হৃদয় যায় গলে।
এতটুকু সে পরানটিতে
এতটা সুধারাশি!
কাছেতে তাই দাঁড়ায়ে তারে
দেখিতে ভালোবাসি।

কোথা বা শিশু কাঁদিছে পথে
মায়েরে ডাকি ডাকি,
আকুল হয়ে পথিক-মুখে
চাহিছে থাকি থাকি।
কাতর স্বর শুনিতে পেয়ে
জননী ছুটে আসে,
মায়ের বুক জড়ায়ে শিশু
কাঁদিতে গিয়ে হাসে।
অবাক হয়ে তাহাই দেখি
নিমেষ ভুলে গিয়ে,
দুইটি ফোঁটা বাহিরে জল
দুইটি আঁখি দিয়ে।

যায় রে সাধ জগৎ-পানে
কেবলি চেয়ে রই
অবাক হয়ে, আপনা ভুলে,
কথাটি নাহি কই।

সাধ

অরুণময়ী তরুণী উষা
জাগায়ে দিল গান।
পুরব মেঘে কনকমুখী
বারেক শুধু মারিল উঁকি,
অমনি যেন জগৎ ছেয়ে
বিকশি উঠে প্রাণ।
কাহার হাসি বহিয়া এনে
করিলি সুধা দান।
ফুলেরা সব চাহিয়া আছে
আকাশ-পানে মগন-মনা,
মুখেতে মৃদু বিমল হাসি
নয়নে দুটি শিশিরকণা।
আকাশ-পারে কে যেন ব'সে,
তাহারে যেন দেখিতে পায়,
বাতাসে দুলে বাহুটি তুলে
মায়ের কোলে ঝাঁপিতে যায়।
কী যেন দেখে, কী যেন শোনে,
কে যেন ডাকে, কে যেন গায়—
ফুলের সুখ, ফুলের হাসি
দেখিবি তোরা আয় রে আয়।

আ মরি মরি অমনি যদি
ফুলের মতো চাহিতে পারি।
বিমল প্রাণে বিমল সুখে
বিমল প্রাতে বিমল মুখে
ফুলের মতো অমনি যদি
বিমল হাসি হাসিতে পারি।
দুলিছে, মরি, হরষ-স্রোতে,
অসীম স্নেহে আকাশ হতে
কে যেন তারে খেতেছে চুমো,
কোলেতে তারি পড়িছে লুটে।
কে যেন তারি নামটি ধ'রে
ডাকিছে তারে সোহাগ ক'রে,
শুনিতে পেয়ে ঘুমের ঘোরে
মুখটি ফুটে হাসিটি ফোটে,
শিশুর প্রাণে সুখের মতো
সুবাসটুকু জাগিয়া ওঠে।
আকাশ-পানে চাহিয়া থাকে,
না জানি তাহে কী সুখ পায়।
বলিতে যেন শেখে নি কিছু,
কী যেন তবু বলিতে চায়।

আঁধার কোণে থাকিস তোরা,
জানিস কি রে কত সে সুখ,
আকাশ-পানে চাহিলে পরে
আকাশ-পানে তুলিলে মুখ।
সুদূর দূর, সুনীল নীল,
সুদূরে পাখি উড়িয়া যায়।
সুনীল দূরে ফুটিছে তারা,
সুদূর হতে আসিছে বায়।
প্রভাত-করে করি রে স্নান,
ঘুমাই ফুলবাসে,
পাখির গান লাগে রে যেন
দেহের চারি পাশে।
বাতাস যেন প্রাণের সখা,
প্রবাসে ছিল, নতুন দেখা,
ছুটিয়া আসে বুকের কাছে
বারতা শুধাইতে।
চাহিয়া আছে আমার মুখে,
কিরণময় আমারি সুখে
আকাশ যেন আমারি তরে
রয়েছে বুক পেতে।

মনেতে করি আমারি যেন
আকাশ-ভরা প্রাণ,
আমারি প্রাণ হাসিতে ছেয়ে
জাগিছে উষা তরুণ মেয়ে,
করুণ আঁখি করিছে প্রাণে
অরুণ-সুধা দান।
আমারি বুকে প্রভাতবেলা
ফুলেরা মিলি করিছে খেলা,
হেলিছে কত, দুলিছে কত,
পুলকে ভরা মন,
আমারি তোরা বালিকা মেয়ে
আমারি স্নেহধন।
আমারি মুখে চাহিয়া তোর
আঁখিটি ফুটিফুটি।
আমারি বুকে আলয় পেয়ে
হাসিয়া কুটিকুটি।
কেন রে বাছা, কেন রে হেন
আকুল কিলিবিলি,
কী কথা যেন জানাতে চাস
সবাই মিলি মিলি।
হেথায় আমি রহিব বসে
আজি সকালবেলা,
নীরব হয়ে দেখিব চেয়ে
ভাইবোনের খেলা।
বুকের কাছে পড়িবি ঢলে
চাহিবি ফিরে ফিরে,
পরশি দেহে কোমল দল
স্নেহেতে চোখে আসিবে জল,
শিশির-সম তোদের 'পরে
ঝরিবে ধীরে ধীরে।

হৃদয় মোর আকাশ-মাঝে
তারার মতো উঠিতে চায়,
আপন সুখে ফুলের মতো
আকাশ-পানে ফুটিতে চায়।
নিবিড় রাতে আকাশে উঠে
চারি দিকে সে চাহিতে চায়,
তারার মাঝে হারায়ে গিয়ে
আপন মনে গাহিতে চায়।
মেঘের মতো হারায়ে দিশা
আকাশ-মাঝে ভাসিতে চায়—
কোথায় যাবে কিনারা নাই,

দিবসনিশি চলেছে তাই,
বাতাস এসে লাগিছে গায়ে,
জোছনা এসে পড়িছে পায়ে,
উড়িয়া কাছে গাহিছে পাখি,
মুদিয়া যেন এসেছে আঁখি,
আকাশ-মাঝে মাথাটি থুয়ে
আরামে যেন ভাসিয়া যায়,
হৃদয় মোর মেঘের মতো
আকাশ-মাঝে ভাসিতে চায়।
ধরার পানে মেলিয়া আঁখি
উষার মতো হাসিতে চায়।
জগৎ-মাঝে ফেলিতে পা
চরণ যেন উঠিছে না,
শরমে যেন হাসিছে মৃদু হাস,
হাসিটি যেন নামিল ভুঁয়ে,
জাগায়ে দিল ফুলেরে ছুঁয়ে,
মালতীবধূ হাসিয়া তারে
করিল পরিহাস।
মেঘেতে হাসি জড়ায়ে যায়,
বাতাসে হাসি গড়ায়ে যায়,
উষার হাসি, ফুলের হাসি
কানন-মাঝে ছড়ায়ে যায়।
হৃদয় মোর আকাশে উঠে
উষার মতো হাসিতে চায়।

সমাপন

আজ আমি কথা কহিব না।
আর আমি গান গাহিব না।
হেরো আজি ভোরবেলা এসেছে রে মেলা লোক,
ঘিরে আছে চারি দিকে
চেয়ে আছে অনিমিখে,
হেরে মোর হাসিমুখ ভুলে গেছে দুখশোক।
আজ আমি গান গাহিব না।

সকাতরে গান গেয়ে পথ-পানে চেয়ে চেয়ে
এদের ডেকেছি দিবানিশি।
ভেবেছিনু মিছে আশা, বোঝে না আমার ভাষা,
বিলাপ মিলায় দিশি দিশি।

কাছে এরা আসিত না, কোলে বসে হাসিত না,
ধরিতে চকিতে হত লীন।
মরমে বাজিত ব্যথা, সাধিলে না কহে কথা,
সাধিতে শিখি নি এত দিন।
দিত দেখা মাঝে মাঝে, দূরে যেন বাঁশি বাজে,
আভাস শুনিনু যেন হায়।
মেঘে কভু পড়ে রেখা, ফুলে কভু দেয় দেখা,
প্রাণে কভু বহে চলে যায়।

আজ তারা এসেছে রে কাছে,
এর চেয়ে শোভা কি বা আছে।
কেহ নাহি করে ডর, কেহ নাহি ভাবে পর,
সবাই আমাকে ভালোবাসে,
আগ্রহে ঘিরিছে চারি পাশে।

এসেছিস তোরা যত জনা,
তোদের কাহিনী আজি শোনা।
যার যত কথা আছে খুলে বল্ মোর কাছে,
আজ আমি কথা কহিব না।
আয় তুই কাছে আয়, তোরে মোর প্রাণ চায়,
তোর কাছে শুধু বসে রই।
দেখি শুধু, কথা নাহি কই।
ললিত পরশে তোর পরানে লাগিছে ঘোর,
চোখে তোর বাজে বেণুবীণা!
তুই মোরে গান শুনাবি না?
জেগেছে নূতন প্রাণ, বেজেছে নূতন গান,
ওই দেখ পোহায়েছে রাতি।
আমারে বুকেতে নে রে, কাছে আয়, আমি যে রে
নিখিলের খেলাবার সাথী।

চারি দিকে সৌরভ, চারি দিকে গীতরব,
চারি দিকে সুখ আর হাসি,
চারি দিকে শিশুগুলি মুখে আধো আধো বুলি,
চারি দিকে স্নেহপ্রেমরাশি।
আমারে ঘিরেছে কারা, সুখেতে করেছে সারা,
জগতে হয়েছে হারা প্রাণের বাসনা।
আর আমি কথা কহিব না।
আর আমি গান গাহিব না।

সংযোজন

স্নেহ উপহার

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু।

বাব্‌লা।

আয় রে বাছা কোলে বসে চা' মোর মুখ-পানে,
হাসিখুশি প্রাণখানি তোর প্রভাত ডেকে আনে।
আমায় দেখে আসিস ছুটে, আমায় বাসিস ভালো,
কোথা হতে পড়লি প্রাণে তুই রে উষার আলো!

দেখ্‌ রে প্রাণে স্নেহের মতো সাদা সাদা জুঁই ফুটেছে।
দেখ্‌ রে, আমার গানের সাথে ফুলের গন্ধ জড়িয়ে গেছে।
গেঁথেছি রে গানের মালা, ভোরের বেলা বনে এসে
মনে বড়ো সাধ হয়েছে পরাব তোর এলোকেশে!
গানের সাথে ফুলের সাথে মুখখানি মানাবে ভালো,
আয় রে তবে আয় রে মেয়ে দেখ্‌ রে চেয়ে রাত পোহালো!
কচিমুখটি ঘিরে দেব ললিতরাগিণী দিয়ে,
বাপের কাছে মায়ের কাছে দেখিয়ে আসবি ছুটে গিয়ে!

চাঁদনি রাতে বেড়াই ছাতে মুখখানি তোর মনে পড়ে,
তোর কথাটাই কিলিবিলি মনের মধ্যে নড়েচড়ে!
হাসি হাসি মুখখানি তোর ভেসে ভেসে বেড়ায় কাছে,
হাসি যেন এগিয়ে এল, মুখটি যেন পিছিয়ে আছে!
কচি প্রাণের আনন্দ তোর ভাঙা বুকে দে ছড়িয়ে,
ছোটো দুটি হাত দিয়ে তোর গলাটি মোর ধর জড়িয়ে!
বিজন প্রাণের দ্বারে বসে করবি রে তুই ছেলেখেলা,
চুপ করে তাই বসে বসে দেখব আমি সন্ধেবেলা।
কোথায় আছিস, সাড়া দে রে, বুকের কাছে আয় রে তবে,
তোর মুখেতে গানগুলি মোর কেমন শোনায় শুনতে হবে!

আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি একটা বাবলা গাছের মতো,
বড়ো বড়ো কাঁটার ভয়ে তফাত থাকে লতা যত।
সকাল হলে মনের সুখে ডালে ডালে ডাকে পাখি,
আমার কাঁটা ডালে কেউ ডাকে না চুপ করে তাই দাঁড়িয়ে থাকি!
নেই বা লতা এল কাছে, নেই বা পাখি বসল শাখে,
যদি আমার বুকের কাছে বাবলা ফুলটি ফুটে থাকে!
বাতাসেতে দুলে দুলে ছড়িয়ে দেয় রে মিষ্টি হাসি,
কাঁটা-জন্ম ভুলে গিয়ে তাই দেখে হরষে ভাসি!
দূর কর ছাই, ঝোঁকের মাথায় বলে ফেললেম কত কী যে?
কথাগুলো ঠেকছে যেন চোখের জলে ভিজে ভিজে!

রবি কাকা।

শরতে প্রকৃতি

কই গো প্রকৃতি রানী, দেখি দেখি মুখখানি,
কেন গো বিষাদছায়া রয়েছে অধর ছুঁয়ে
মুখানি মলিন কেন গো?
এই যে মুহূর্ত আগে হাসিতে ছিলে গো দেখি
পলক না পালটিতে সহসা নেহারি এ কি—
মরমে বিলীন যেন গো!
কেন তনুখানি ঢাকা শুভ্র কুহেলিকা বাসে
মৃদু বিষাদের ভারে সুধীরে মুদিয়া আসে
নয়ন-নলিন হেন গো?

ওই দেখো চেয়ে দেখো—একবার চেয়ে দেখো—
চাঁদের অধর দুটি হাসিতে ভাসিয়া যায়!
নিশীথের প্রাণে গিয়া সে হাসি মিশিয়া যায়।
সে হাসির কোলে বসি কানন-গোলাপগুলি
আধো আধো কথা কহে সোহাগেতে দুলি দুলি!
সে হাসির পায়ে পড়ি নদীর লহরীগণ
যার যত কথা আছে বলিতে আকুল মন।
সে হাসির শিশু দুটি লতিকামণ্ডপে গিয়া
আঁধারে ভাবিয়া সারা বাহিরিবে কোথা দিয়া!
সে হাসি অলসে ঢলি দিগন্তে পড়িয়া নুয়ে,
মেঘের অধরপ্রান্ত একটু রয়েছে ছুঁয়ে।
বলো তুমি কেন তবে
এমন মলিন রবে?
বিষাদ-স্বপন দেখে হাসির কোলেতে শুয়ে।

ঘোমটাটি খোলো খোলো
মুখখানি তোলো তোলো
চাঁদের মুখের পানে চাও একবার!
বলো দেখি কারে হেরি এত হাসি তার!
নিলাজ বসন্ত যবে কুসুমে কুসুমময়—
মাতিয়া নিজের রূপে হাসিয়া আকুল হয়,
মলয় মরমে মরি,
ফিরে হাহাকার করি—
বনের হৃদয় হতে সৌরভ-উচ্ছ্বাস বয়!
তারে হেরি হয় না সে এমন হরষে ভোর;
কী চোখে দেখেছে চাঁদ ওই মুখখানি তোর!
তুই তবু কেন কেন
দারুণ বিরাগে যেন
চাস নে চাঁদের হাসি চাঁদের আদর!

নাই তোর ফুলবাস,
নাইক প্রেমের হাস,
পাপিয়া আড়ালে বসি শুনায় না প্রেমগান!
কী দুখেতে উদাসিনী
যৌবনেতে সন্ন্যাসিনী!
কাহার ধেয়ানে মগ্ন শুভ্র বস্ত্র পরিধান?

এক কালে ছিল তোর কুসুমিত মধুমাস—
হৃদয়ে ফুটিত তোর অজস্র ফুলের রাশ;
যৌবন-উচ্ছ্বাসে ভোর
প্রাণের সুরভি তোর
পথিক সমীরে সব দিলি তুই বিলাইয়া!
শেষে গ্রীষ্মতাপে জ্বলি
শুকাইল ফুল-কলি,
সর্বস্ব যাহারে দিলি সেও গেল পলাইয়া!
চেতনা পাইয়া শেষে হইয়া সর্বস্ব-হারা
সারাটি বরষা তুই কাঁদিয়া হইলি সারা!
এত দিন পরে বুঝি শুকাইল অশ্রুধারা!
আজ বুঝি মনে মনে করিলি দারুণ পণ
যোগিনী হইবি তুই পাষাণে বাঁধিবি মন!
বসন্তের ছেলেখেলা ভালো নাহি লাগে আর—
চপল চঞ্চল হাসি ফুলময় অলংকার!
এখন যে হাসি হাসো আজি বিরাগের দিন,
শুভ্র শান্ত সুবিমল বাসনা-লালসাহীন।
এত যে করিলি পণ
তবুও তো ক্ষণে ক্ষণ
সে দিনের স্মৃতিছায়া হৃদয়ে বেড়ায় ভাসি।
প্রশান্ত মুখের 'পরে
কুহেলিকা ছায়া পড়ে—
ভাবনার মেঘ উঠে সহসা আলোক নাশি—
মুহূর্তে কিসের লাগি
আবার উঠিস জাগি
আবার অধরে ফুটে সেই সে পুরানো হাসি!

ঘুমায়ে পড়িস যবে বিহ্বল রজনীশেষে,
অতি মৃদু পা টিপিয়া উষা আসে হেসে হেসে,
অতিশয় সাবধানে দুইটি আঙুল দিয়া
কুয়াশা ঘোমটা তোর দেয় ধীরে সরাইয়া!
অমনি তরুণ রবি পাশে আসি মৃদুগতি
মুদিত নয়ন তোর চুমে ধীরে ধীরে অতি!
শিহরিয়া কাঁপি উঠি
মেলিস নয়ন দুটি,

রাঙা হয়ে ওঠে তোর কপোল-কুসুম-দল,
শরমে আকুল ঝরে শিশির-নয়ন-জল!

সুদূর আলয় হতে তাড়াতাড়ি খেলা ভুলি
মাঝে মাঝে ছুটে আসে দুদণ্ডের মেঘগুলি।
চমকি দাঁড়ায়ে থাকে, ওই মুখপানে চায়,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে কাঁদিয়া মরিয়া যায়!
কিসের বিরাগ এত, কী তপে আছিস ভোর!
এত করে সেধে সেধে
এত করে কেঁদে কেঁদে
যোগিনী, কিছুতে তবু ভাঙিবে না পণ তোর?
যোগিনী, কিছুতে কি রে ফিরিবে না মন তোর?

শীত

পাখি বলে, আমি চলিলাম;
ফুল বলে, আমি ফুটিব না;
মলয় কহিয়া গেল শুধু,
বনে বনে আমি ছুটিব না!
কিশলয় মাথাটি না তুলে
মরিয়া পড়িয়া গেল ঝরি,
সায়াহ্ন, ধূমল-ঘন বাস
টানি দিল মুখের উপরি।
নিশীথিনী বাষ্পময় আঁখি
চোখেতে দেখিতে নাহি পায়;
হিমানীর মৃত কোলে শুয়ে
জোছনা সে আড়ষ্টের প্রায়।

পাখি কেন গেল গো চলিয়া?
কেন ফুল কেন সে ফুটে না?
চপল মলয় সমীরণ
বনে বনে কেন সে ছুটে না?
শীতের হৃদয় গেছে চলে,
অসাড় হয়েছে তার মন,
ত্রিবলী-বলিত তার ভাল
কঠোর জ্ঞানের নিকেতন।
প্রেম নাই, দয়া নাই তার,
নীরস বৈরাগ্য শুধু আছে,
ফুল তার ভালো নাহি লাগে,
কবিতা নিরর্থ তার কাছে!

সে চায় বালক সমীরণ
সম্ভ্রমে দাঁড়ায়ে রবে দীন,
জোছনার হাসি-মুখ হতে
হাসিরাশি হইবে বিলীন।
সে কাহারো সঙ্গ নাহি চায়,
একেলা করিতে চায় বাস।
চায় সে একেলা বসি বসি
ফেলিবেক শীতল নিশ্বাস।
জোছনার যৌবনের হাসি,
ফুলের যৌবন-পরিমল,
মলয়ের বাল্যখেলা যত,
পল্লবের বাল্য-কোলাহল,
সকলি সে মনে করে পাপ,
মনে করে প্রকৃতির ভ্রম,
ছবির মতন বসে থাকা
সেই জানে জ্ঞানীর ধরম।
তাই পাখি বলে, চলিলাম;
ফুল বলে, আমি ফুটিব না;
মলয় কহিয়া গেল শুধু,
বনে বনে আমি ছুটিব না;
আশা বলে, বসন্ত আসিবে,
ফুল বলে, আমিও আসিব,
পাখি বলে, আমিও গাহিব,
চাঁদ বলে, আমিও হাসিব।

বসন্তের নবীন হৃদয়
নূতন উঠেছে আঁখি মেলে,
যাহা দেখে তাই দেখে হাসে,
যাহা পায় তাই নিয়ে খেলে।
মনে তার শত আশা জাগে,
কী যে চায় আপনি না বুঝে,
প্রাণ তার দশ দিকে ধায়
প্রাণের মানুষ খুঁজে খুঁজে।
ফুল-শিশু দেখিলে পাতায়
বসিয়া দুলায় তারে কোলে,
যখনি চাঁদের মুখ দেখে
তখনি হরষে যায় গলে।
দখিনা-বাতাস বহিলেই
অমনি সে খুলে দেয় বুক,
খোলা-মন ভোলা-মন তার
মুখ দেখে দূরে যায় দুখ।
ফুল ফুটে তারো মুখ ফুটে;

পাখি গায় সেও গান গায়;
বাতাস বুকের কাছে এলে
গলা ধরে দুজনে খেলায়।
প্রণয়ে হৃদয় তার ভরা,
বড়োই করুণ তার মন,
কেমন সুধীরে চুমো খায়
ফুলগুলি ঘুমায় যখন!
অতি মৃদু কথাগুলি কয়,
ফুলের মাথাটি লয়ে কোলে,
চুপি চুপি কী কহে কে জানে
কানেতে স্বপন দিবে বলে?
তাই শুনি, বসন্ত আসিবে,
ফুল বলে, আমিও আসিব,
পাখি বলে, আমিও গাহিব,
চাঁদ বলে, আমিও হাসিব।

শীত, তুমি হেথা কেন এলে?
উত্তরে তোমার দেশ আছে,
পাখি সেথা নাহি গাহে গান,
ফুল সেথা নাহি ফুটে গাছে।
সকলি তুষার-মরুময়,
সকলি আঁধার জনহীন,
সেথায় একেলা বসি বসি
জ্ঞানী গো কাটায়ো তব দিন।
এ যে হেথা কবিতার দেশ,
হেথা কেন তব আগমন,
হেথায় যে ফুল ফুটে গাছে,
হেথায় যে বহে সমীরণ,
হেথায় সকলি অনুরাগ—
হেথায় বৈরাগ্য কিছু নাই,
তুমি গো দারুণ জ্ঞানবান—
হেথায় তোমারে নাহি চাই!

রবীন্দ্রনাথ · ১৮৭৭

ছবি ও গান

উৎসর্গ

গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার
বসন্তে মালা গাঁথিলাম।
যাঁহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি
একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত.
তাঁহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।

সূচনা

ছবি ও গান নিয়ে আমার বলবার কথাটা বলে নিই। এটা বয়ঃসন্ধিকালের লেখা, শৈশব যৌবন যখন সবে মিলেছে। ভাষায় আছে ছেলেমানুষি, ভাবে এসেছে কৈশোর। তার পূর্বেকার অবস্থায় একটা বেদনা ছিল অনুদ্দিষ্ট, সে যেন প্রলাপ ব'কে আপনাকে শান্ত করতে চেয়েছে। এখন সেই বয়স যখন কামনা কেবল সুর খুঁজছে না, রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু আলো-আঁধারে রূপের আভাস পায়, স্পষ্ট করে কিছু পায় না। ছবি এঁকে তখন প্রত্যক্ষতার স্বাদ পাবার ইচ্ছা জেগেছে মনে কিন্তু ছবি আঁকবার হাত তৈরি হয় নি তো।

কবি সংসারের ভিতরে তখনো প্রবেশ করে নি, তখনো সে বাতায়নবাসী। দূর থেকে যার আভাস দেখে তার সঙ্গে নিজের মনের নেশা মিলিয়ে দেয়। এর কোনো-কোনোটা চোখে দেখা একটুকরো ছবি পেন্‌সিলে আঁকা, রবারে ঘষে দেওয়া, আর কোনো-কোনোটা সম্পূর্ণ বানানো। মোটের উপরে অক্ষম ভাষার ব্যাকুলতায় সবগুলিতেই বানানো ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সহজ হয় নি। কিন্তু সহজ হবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। সেইজন্যে চলতি ভাষা আপন এলোমেলো পদক্ষেপে এর যেখানে-সেখানে প্রবেশ করেছে। আমার ভাষায় ও ছন্দে এই একটা মেলামেশা আরম্ভ হল। 'ছবি ও গান' কড়ি ও কোমলের ভূমিকা করে দিলে।

কে?

আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো!
সে যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে,
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত।

সে চলে গেল, বলে গেল না,
সে কোথায় গেল ফিরে এল না,
সে যেতে যেতে চেয়ে গেল,
কী যেন গেয়ে গেল—
তাই আপন মনে বসে আছি
কুসুম-বনেতে।

সে ঢেউয়ের মতো ভেসে গেছে,
চাঁদের আলোর দেশে গেছে,
যেখান দিয়ে হেসে গেছে
হাসি তার রেখে গেছে রে।
মনে হল আঁখির কোণে
আমায় যেন ডেকে গেছে সে।
আমি কোথায় যাব কোথায় যাব,
ভাবতেছি তাই একলা বসে।

সে চাঁদের চোখে বুলিয়ে গেল
ঘুমের ঘোর।
সে প্রাণের কোথা দুলিয়ে গেল
ফুলের ডোর।
সে কুসুম-বনের উপর দিয়ে
কী কথা যে বলে গেল,
ফুলের গন্ধ পাগল হয়ে
সঙ্গে তারি চলে গেল।
হৃদয় আমার আকুল হল,
নয়ন আমার মুদে এল,
কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে!

সুখস্বপ্ন

ওই জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি মাথা।
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে,
সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।
শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায়,
তার কানে কানে কী যে কহে যায়,
তাই আধো শুয়ে আধো বসিয়ে
কত ভাবিতেছে আনমনে।
উড়ে উড়ে যায় চুল,
কোথা উড়ে উড়ে পড়ে ফুল,
ঝুরু ঝুরু কাঁপে গাছপালা
সমুখের উপবনে।
অধরের কোণে হাসিটি
আধখানি মুখ ঢাকিয়া,
কাননের পানে চেয়ে আছে
আধমুকুলিত আঁখিয়া।
সুদূর স্বপন ভেসে ভেসে
চোখে এসে যেন লাগিছে,
ঘুমঘোরময় সুখের আবেশ
প্রাণের কোথায় জাগিছে।
চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়,
উড়ে উড়ে যায় পাখি,
সারাদিন ধরে বকুলের ফুল
ঝরে পড়ে থাকি থাকি।
মধুর আলস, মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি,
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশিটি।

জাগ্রত স্বপ্ন

আজ একেলা বসিয়া, আকাশে চাহিয়া,
কী সাধ যেতেছে, মন!
বেলা চলে যায়— আছিস কোথায়?
কোন্ স্বপনেতে নিমগন?
বসন্তবাতাসে আঁখি মুদে আসে,
মৃদু মৃদু বহে শ্বাস,
গায়ে এসে যেন এলায়ে পড়িছে
কুসুমের মৃদু বাস।

যেন সুদূরে নন্দনকাননবাসিনী
সুখঘুমঘোরে মধুরহাসিনী
অজানা প্রিয়ার ললিত পরশ
ভেসে ভেসে বহে যায়,
অতি মৃদু মৃদু লাগে গায়।
বিস্মরণমোহে আঁধারে আলোকে
মনে পড়ে যেন তায়,
স্মৃতি-আশা-মাখা মৃদু সুখে দুখে
পুলকিয়া উঠে কায়।
ভ্রমি আমি যেন সুদূর কাননে,
সুদূর আকাশতলে,
আনমনে যেন গাহিয়া বেড়াই
সরযূর কলকলে।
গহন বনের কোথা হতে শুনি
বাঁশির স্বর-আভাস,
বনের হৃদয় বাজাইছে যেন
মরমের অভিলাষ।
বিভোর হৃদয়ে বুঝিতে পারি নে
কে গায় কিসের গান,
অজানা ফুলের সুরভি মাখানো
স্বরসুধা করি পান।

যেন রে কোথায় তরুর ছায়ায়
বসিয়া রূপসী বালা,
কুসুমশয়নে আধেক মগনা,
বাকলবসনে আধেক নগনা,
সুখদুখগান গাইছে শুইয়া
গাঁথিতে গাঁথিতে মালা।
ছায়ায় আলোকে, নিঝরের ধারে,
কোথা কোন্ গুপ্ত গুহার মাঝারে,
যেন হেথা হোথা কে কোথায় আছে
এখনি দেখিতে পাব—
যেন রে তাদের চরণের কাছে
বীণা লয়ে গান গাব।
শুনে শুনে তারা আনত নয়নে
হাসিবে মুচুকি হাসি,
শরমের আভা অধরে কপোলে
বেড়াইবে ভাসি ভাসি।
মাথায় বাঁধিয়া ফুলের মালা
বেড়াইব বনে বনে।
উড়িতেছে কেশ, উড়িতেছে বেশ,
উদাস পরান কোথা নিরুদ্দেশ,

হাতে লয়ে বাঁশি মুখে লয়ে হাসি
ভ্রমিতেছি আনমনে।
চারি দিকে মোর বসন্ত হাসিত,
যৌবনকুসুম প্রাণে বিকশিত,
কুসুমের 'পরে ফেলিব চরণ
যৌবনমাধুরীভরে।
চারি দিকে মোর মাধবী মালতী
সৌরভে আকুল করে।

কেহ কি আমারে চাহিবে না?
কাছে এসে গান গাহিবে না?
পিপাসিত প্রাণে চাহি মুখপানে
কবে না প্রাণের আশা?
চাঁদের আলোতে দখিন বাতাসে
কুসুমকাননে বাঁধি বাহুপাশে
শরমে সোহাগে মৃদুমধুহাসে
জানাবে না ভালোবাসা?
আমার যৌবনকুসুমকাননে
ললিত চরণে বেড়াবে না?
আমার প্রাণের লতিকা-বাঁধন
চরণে তাহার জড়াবে না?
আমার প্রাণের কুসুম গাঁথিয়া
কেহ পরিবে না গলে?
তাই ভাবিতেছি আপনার মনে
বসিয়া তরুর তলে।

দোলা

ঝিকিমিকি বেলা;
গাছের ছায়া কাঁপে জলে,
সোনার কিরণ করে খেলা।
দুটিতে দোলার 'পরে দোলে রে,
দেখে রবির আঁখি ভোলে রে।

গাছের ছায়া চারি দিকে আঁধার করে রেখেছে,
লতাগুলি আঁচল দিয়ে ঢেকেছে।
ফুল ধীরে ধীরে মাথায় পড়ে,
পায়ে পড়ে, গায়ে পড়ে,
থেকে থেকে বাতাসেতে ঝুরু ঝুরু পাতা নড়ে
নিরালা সকল ঠাঁই,
কোথাও সাড়া নাই,

শুধু নদীটি বহে যায় বনের ছায়া দিয়ে,
বাতাস ছুঁয়ে যায় লতারে শিহরিয়ে
দুটিতে বসে বসে দোলে,
বেলা কোথায় গেল চলে।
হেরো, সুধামুখী মেয়ে
কী চাওয়া আছে চেয়ে
মুখানি থুয়ে তার বুকে।
কী মায়া মাখা চাঁদমুখে।
হাতে তার কাঁকন দুগাছি,
কানেতে দুলিছে তার দুল,
হাসি-হাসি মুখখানি তার
ফুটেছে সাঁঝের জুঁই ফুল।
গলেতে বাহু বেঁধে
দুজনে কাছাকাছি—
দুলিছে এলো চুল,
দুলিছে মালাগাছি।
আঁধার ঘনাইল,
পাখিরা ঘুমাইল,
সোনার রবি-আলো আকাশে মিলাইল
মেঘেরা কোথা গেল চলে,
দুজনে বসে বসে দোলে।
ঘেঁষে আসে বুকে বুকে,
মিলায়ে মুখে মুখে
বাহুতে বাঁধি বাহুপাশ,
সুধীরে বহিতেছে শ্বাস।
মাঝে মাঝে থেকে থেকে
আকাশেতে চেয়ে দেখে,
গাছের আড়ালে দুটি তারা।
প্রাণ কোথা উড়ে যায়,
সেই তারা-পানে ধায়,
আকাশের মাঝে হয় হারা।
পৃথিবী ছাড়িয়া যেন তারা
দুটিতে হয়েছে দুটি তারা।

একাকিনী

একটি মেয়ে একেলা,
সাঁঝের বেলা,
মাঠ দিয়ে চলেছে।
চারি দিকে সোনার ধান ফলেছে।

ওর মুখেতে পড়েছে সাঁঝের আভা,
চুলেতে করিছে ঝিকিমিকি।
কে জানে কী ভাবে মনে মনে
আনমনে চলে ধিকিধিকি।
পশ্চিমে সোনায় সোনাময়,
এত সোনা কে কোথা দেখেছে।
তারি মাঝে মলিন মেয়েটি
কে যেন রে এঁকে রেখেছে।
মুখখানি কেন গো অমনধারা,
কোন্‌খানে হয়েছে পথহারা,
কারে যেন কী কথা শুধাবে,
শুধাইতে ভয়ে হয় সারা।
চরণ চলিতে বাধে বাধে,
শুধালে কথাটি নাহি কয়।
বড়ো বড়ো আকুল নয়নে
শুধু মুখপানে চেয়ে রয়।
নয়ন করিছে ছলছল,
এখনি পড়িবে যেন জল।

সাঁঝেতে নিরালা সব ঠাঁই,
মাঠে কোথাও জনপ্রাণী নাই—
দূরে অতি দূরে দেখা যায়,
মলিন সে সাঁঝের আলোতে
ছায়া ছায়া গাছপালাগুলি
মেশে মেশে মেঘের কোলেতে।
বড়ো তোর বাজিতেছে পায়,
আয় রে আমার কোলে আয়।
আ মরি জননী তোর কে,
বল্‌ রে কোথায় তোর ঘর।
তরাসে চাহিস কেন রে,
আমারে বাসিস কেন পর?

গ্রামে

নবীন প্রভাত কনক-কিরণে
নীরবে দাঁড়ায়ে গাছপালা—
কাঁপে মৃদু মৃদু কী যেন আরামে,
বায়ু বহে যায় সুধা-ঢালা।
নীল আকাশেতে নারিকেল-তরু,
ধীরে ধীরে তার পাতা নড়ে—
প্রভাত আলোতে কুঁড়েঘরগুলি,
জলে ঢেউগুলি ওঠে পড়ে।

দুয়ারে বসিয়া তপনকিরণে
ছেলেরা মিলিয়া করে খেলা,
মনে হয় সবি কী যেন কাহিনী
শুনেছিনু কোন্ ছেলেবেলা।
প্রভাতে যেন রে ঘরের বাহিরে
সে কালের পানে চেয়ে আছি,
পুরাতন দিন হোথা হতে এসে
উড়িয়ে বেড়ায় কাছাকাছি।
ঘর-দ্বার সব মায়া-ছায়া-সম,
কাহিনীতে গাঁথা খেলা-ধূলি—
মধুর তপন, মধুর পবন,
ছবির মতন কুঁড়েগুলি।
কেহ বা দোলায় কেহ বা দোলে,
গাছতলে মিলে করে মেলা,
বাঁশি হাতে নিয়ে রাখাল বালক
কেহ নাচে-গায় করে খেলা।
এমনি যেন রে কেটে যায় দিন,
কারো যেন কোনো কাজ নাই,
অসম্ভব যেন সকলি সম্ভব—
পেতেছে যেন রে যাহা চাই।
কেবলি যেন রে প্রভাততপনে
প্রভাতপবনে প্রভাতস্বপনে
বিরামে কাটায়, আরামে ঘুমায়
গাছপালা বন কুঁড়েগুলি।
কাহিনীতে ঘেরা ছোটো গ্রামখানি,
মায়াদেবীদের মায়া-রাজধানী,
পৃথিবী-বাহিরে কলপনা-তীরে
করিছে যেন রে খেলা-ধূলি।

আদরিণী

একটুখানি সোনার বিন্দু, একটুখানি মুখ,
একা একটি বনফুল ফোটে-ফোটে হয়েছে,
কচি কচি পাতার মাঝে মাথা থুয়ে রয়েছে।
চার দিকে তার গাছের ছায়া, চার দিকে তার নিষুতি,
চার দিকে তার ঝোপেঝাপে আঁধার দিয়ে ঢেকেছে—
বনের সে যে স্নেহের ধন আদরিণী মেয়ে,
তারে বুকের কাছে লুকিয়ে যেন রেখেছে।

একটুখানি রূপের হাসি আঁধারেতে ঘুমিয়ে আলা,
বনের স্নেহ শিয়রেতে জেগে আছে।
সুকুমার প্রাণটুকু তার কিছু যেন জানে না,

চোখে শুধু সুখের স্বপন লেগে আছে।
একটি যেন রবির কিরণ ভোরের বেলা বনের মাঝে
খেলাতেছিল নেচে নেচে,
নিরালাতে গাছের ছায়ে, আঁধারেতে শ্রান্তকায়ে
সে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।
বনদেবী করুণ-হিয়ে তারে যেন কুড়িয়ে নিয়ে
যতন করে আপন ঘরেতে।
থুয়ে কোমল পাতার 'পরে মায়ের মতো স্নেহভরে
ছোঁয় তারে কোমল করেতে।
ধীরি ধীরি বাতাস গিয়ে আসে তারে দোলা দিয়ে,
চোখেতে চুমো খেয়ে যায়।
ঘুরে ফিরে আশেপাশে বার বার ফিরে আসে,
হাতটি বুলিয়ে দেয় গায়।

একলা পাখি গাছের শাখে কাছে তোর বসে থাকে,
সারা দুপুরবেলা শুধু ডাকে,
যেন তার আর কেহ নাই, সারা দিন একলাটি তাই
স্নেহভরে তোরে নিয়েই থাকে।
ও পাখির নাম জানি নে, কোথায় ছিল কে তা জানে,
রাতের বেলায় কোথায় চলে যায়,
দুপুরবেলা কাছে আসে— সারা দিন বসে পাশে
একটি শুধু আদরের গান গায়।
রাতে কত তারা ওঠে, ভোরের বেলা চলে যায়—
তোরে তো কেউ দেখে না, জানে না।
এক কালে তুই ছিলি যেন ওদেরই ঘরের মেয়ে,
আজকে রে তুই অজানা অচেনা।
নিত্য দেখি রাতের বেলা একটি শুধু জোনাই আসে,
আলো দিয়ে মুখপানে তোর চায়।
কে জানে সে কী যে করে! তারা-জন্মের কাহিনী তোর
কানে বুঝি স্বপন দিয়ে যায়।
ভোরের বেলা আলো এল, ডাকছে রে তোর নামটি ধরে,
আজকে তবে মুখখানি তোর তোল্,
আজকে তবে আঁখিটি তোর খোল্,
লতা জাগে, পাখি জাগে, গায়ের কাছে বাতাস লাগে,
দেখি রে— ধীরে ধীরে দোল্ দোল্ দোল্।

খেলা

ছেলেতে মেয়েতে করে খেলা
ঘাসের 'পরে সাঁঝের বেলা।
ঘোর ঘোর গাছের তলে তলে,
ফাঁকায় পড়েছে মলিন আলো,

কোথাও যেন সোনার ছায়া ছায়া
কোথাও যেন আঁধার কালো কালো।
আকাশের ধারে ধারে ঘিরে
বসেছে রাঙা মেঘের মেলা—
শ্যামল ঘাসের 'পরে, সাঁঝে
আলো-আঁধারের মাঝে মাঝে,
ছেলেতে মেয়েতে করে খেলা।
ওরা যে কেন হেসে সারা,
কেন যে করে অমনধারা,
কেন যে লুটোপুটি,
কেন যে ছুটোছুটি,
কেন যে আহ্লাদে কুটিকুটি!
কেহ বা ঘাসে গড়ায়,
কেহ বা নেচে বেড়ায়,
সাঁঝের সোনা-আকাশে
হাসির সোনা ছড়ায়।
আঁখি দুটি নৃত্য করে,
নাচে চুল পিঠের 'পরে,
হাসিগুলি চোখে মুখে লুকোচুরি খেলা করে।
যেন মেঘের কাছে ছুটি পেয়ে
বিদ্যুতেরা এল ধেয়ে,
আনন্দে হল রে আপন-হারা।
ওদের হাসি দেখে খেলা দেখে
আকাশের এক ধারে থেকে
মৃদু মৃদু হাসছে একটি তারা।

ঝাউগাছে পাতাটি নড়ে না,
কামিনীর পাপড়িটি পড়ে না।
আঁধার কাকের দল
সাঙ্গ করি কোলাহল
কালো কালো গাছের ছায়,
কে কোথায় মিশায়ে যায়—
আকাশেতে পাখিটি ওড়ে না।
সাড়াশব্দ কোথায় গেল,
নিঝুম হয়ে এল এল
গাছপালা বন গ্রামের আশেপাশে।
শুধু খেলার কোলাহল,
শিশুকণ্ঠের কলকল,
হাসির ধ্বনি উঠেছে আকাশে।

কত আর খেলবি ও রে,
নেচে নেচে হাতে ধ'রে

যে যার ঘরে চলে আয় ঝাট্,
আঁধার হয়ে এল পথঘাট।
সন্ধ্যাদীপ জ্বলল ঘরে,
চেয়ে আছে তোদের তরে—
তোদের না হেরিলে মার কোলে
ঘরের প্রাণ কাঁদে সন্ধে হলে।

ঘুম

ঘুমিয়ে পড়েছে শিশুগুলি,
খেলাধুলা সব গেছে ভুলি।

ধীরে নিশীথের বায় আসে খোলা জানালায়,
ঘুম এনে দেয় আঁখিপাতে,
শয্যায় পায়ের কাছে খেলেনা ছড়ানো আছে,
ঘুমিয়েছে খেলাতে-খেলাতে।
এলিয়ে গিয়েছে দেহ, মুখে দেবতার স্নেহ
পড়েছে রে ছায়ার মতন,
কালো কালো চুল তার বাতাসেতে বার বার
উড়ে উড়ে ঢাকিছে বদন।
তারার আলোর মতো হাসিগুলি আসে কত,
আধো-খোলা অধরেতে তার
চুমো খেয়ে যায় কত বার।
সারা রাত স্নেহসুখে তারাগুলি চায় মুখে,
যেন তারা করে গলাগলি,
কত কী যে করে বলাবলি।
যেন তারা আঁচলেতে আঁধারে আলোতে গেঁথে
হাসিমাখা সুখের স্বপন
ধীরে ধীরে স্নেহভরে শিশুর প্রাণের 'পরে
একে একে করে বরিষন।
কাল যবে রবিকরে কাননেতে থরে থরে
ফুটে ফুটে উঠিবে কুসুম,
ওদেরো নয়নগুলি ফুটিয়া উঠিবে খুলি,
কোথায় মিলায়ে যাবে ঘুম।
প্রভাতের আলো জাগি যেন খেলাবার লাগি
ওদের জাগায়ে দিতে চায়,
আলোতে ছেলেতে ফুলে এক সাথে আঁখি খুলে
প্রভাতে পাখিতে গান গায়।

বিদায়

সে যখন বিদায় নিয়ে গেল,
তখন নবমীর চাঁদ অস্তাচলে যায়।
গভীর রাতি নিঝুম চারি দিক,
আকাশেতে তারা অনিমিখ,
ধরণী নীরবে ঘুমায়।

হাত দুটি তার ধরে দুই হাতে
মুখের পানে চেয়ে সে রহিল,
কাননে বকুল তরুতলে
একটিও সে কথা না কহিল।
অধরে প্রাণের মলিন ছায়া,
চোখের জলে মলিন চাঁদের আলো,
যাবার বেলা দুটি কথা ব'লে
বনপথ দিয়ে সে চলে গেল।
ঘন গাছের পাতার মাঝে আঁধার পাখি গুটিয়ে পাখা,
তারি উপর চাঁদের আলো শুয়েছে,
ছায়াগুলি এলিয়ে দেহ আঁচলখানি পেতে যেন
গাছের তলায় ঘুমিয়ে রয়েছে।
গভীর রাতে বাতাসটি নেই— নিশীথে সরসীর জলে
কাঁপে না বনের কালো ছায়া,
ঘুম যেন ঘোমটা-পরা বসে আছে ঝোপেঝাপে,
পড়ছে বসে কী যেন এক মায়া।

চুপ ক'রে হেলে সে বকুল গাছে,
রমণী একেলা দাঁড়ায়ে আছে।
এলোথেলো চুলের মাঝে বিষাদমাখা সে মুখখানি,
চাঁদের আলো পড়েছে তার 'পরে।
পথের পানে চেয়ে ছিল, পথের পানেই চেয়ে আছে,
পলক নাহি তিলেক কালের তরে।
গেল রে কে চলে গেল, ধীরে ধীরে চলে গেল,
কী কথা সে বলে গেল হায়,
অতি দূর অশথের ছায়ে মিশায়ে কে গেল রে,
রমণী দাঁড়ায়ে জোছনায়।
সীমাহীন জগতের মাঝে আশা তার হারায়ে গেল,
আজি এই গভীর নিশীথে,
শূন্য অন্ধকারখানি মলিন মুখশ্রী নিয়ে
দাঁড়িয়ে রহিল এক ভিতে।

পশ্চিমের আকাশসীমায়
চাঁদখানি অস্তে যায় যায়।

ছোটো ছোটো মেঘগুলি সাদা সাদা পাখা তুলি
চলে যায় চাঁদের চুমো নিয়ে,
আঁধার গাছের ছায় ডুবু ডুবু জোছনায়
ম্লানমুখী রমণী দাঁড়িয়ে।

বিরহ

ধীরে ধীরে প্রভাত হল, আঁধার মিলায়ে গেল
উষা হাসে কনকবরনী,
বকুল গাছের তলে, কুসুমরাশির পরে,
বসিয়া পড়িল সে রমণী।
আঁখি দিয়ে ঝরঝরে অশ্রুবারি ঝরে পড়ে
ভেঙে যেতে চায় যেন বুক,
রাঙা রাঙা অধর দুটি কেঁপে কেঁপে ওঠে কত,
করতলে সকরুণ মুখ।
অরুণ আঁখির 'পরে, অরুণের আভা পড়ে,
কেশপাশে অরুণ লুকায়,
দুই হাতে মুখ ঢাকে কার নাম ধরে ডাকে,
কেন তার সাড়া নাহি পায়।
বহিছে প্রভাত-বায় আঁচল লুটিয়ে যায়,
মাথায় ঝরিয়ে পড়ে ফুল,
ডালপালা দোলে ধীরে, কাননে সরসীতীরে
ফুটে ওঠে মল্লিকা মুকুল।
পা দুখানি ছড়াইয়া পূরবের পানে চেয়ে
ললিতে প্রাণের গান গায়,
গাহিতে গাহিতে গান, সব যেন অবসান,
যেন সব-কিছু ভুলে যায়।
প্রাণ যেন গানে মিশে, অনন্ত আকাশ-মাঝে
উদাসী হইয়ে চলে যায়,
বসে বসে শুধু গান গায়।

সুখের স্মৃতি

চেয়ে আছে আকাশের পানে
জোছনায় আঁচলটি পেতে,
যত আলো ছিল সে চাঁদের
সব যেন পড়েছে মুখেতে।
মুখে যেন গলে পড়ে চাঁদ,
চোখে যেন পড়িছে ঘুমিয়ে,

সুকোমল শিথিল আঁচলে
　　পড়ে আছে আরামে ঘুমিয়ে।
একটি মৃণাল-করে মাথা,
　　আরেকটি পড়ে আছে বুকে,
বাতাসটি বহে গিয়ে গায়
　　শিহরি উঠিছে অতি সুখে।
হেলে হেলে নুয়ে নুয়ে লতা
　　বাতাসেতে পায়ে এসে পড়ে,
বিস্ময়ে মুখের পানে চেয়ে
　　ফুলগুলি দুলে দুলে নড়ে।
অতি দূরে বাজে ধীরে বাঁশি,
অতি সুখে পরান উদাসী,
অধরেতে স্খলিতচরণা
　　মদিরাহিল্লোলময়ী হাসি।
কে যেন রে চুমো খেয়ে তারে
　　চলে গেছে এই কিছু আগে;
চুমোটিরে বাঁধি ফুলহারে
অধরেতে হাসির মাঝারে,
চুমোতে চাঁদের চুমো দিয়ে
　　রেখেছে রে যতনে সোহাগে।
তাই সেই চুমোটিরে ঘিরে
　　হাসিগুলি সারা রাত জাগে।
কে যেন রে বসে তার কাছে
গুন্ গুন্ করে বলে গেছে
　　মধুমাখা বাণী কানে কানে।
পরানের কুসুমকারায়
কথাগুলি উড়িয়ে বেড়ায়,
　　বাহিরিতে পথ নাহি জানে।
অতি দূরে বাঁশরির গানে
　　সে বাণী জড়িয়ে যেন গেছে,
অবিরত স্বপনের মতো
　　ঘুরিয়ে বেড়ায় কাছে কাছে।
মুখে নিয়ে সেই কথা ক'টি
খেলা করে উলটিপালটি,
আপনি আপন বাণী শুনে
　　শরমে সুখেতে হয় সারা।
কার মুখ পড়ে তার মনে,
কার হাসি লাগিছে নয়নে,
স্মৃতির মধুর ফুলবনে
　　কোথায় হয়েছে পথহারা!
চেয়ে তাই সুনীল আকাশে
মুখেতে চাঁদের আলো ভাসে,

অবসান-গান আশেপাশে
ভ্রমে যেন ভ্রমরের পারা।

যোগী

পশ্চিমে ডুবেছে ইন্দু, সম্মুখে উদার সিন্ধু,
শিরোপরি অনন্ত আকাশ,
লম্বমান জটাজুটে যোগিবর করপুটে
দেখিছেন সূর্যের প্রকাশ।
উলঙ্গ সুদীর্ঘকায়, বিশাল ললাট ভায়,
মুখে তাঁর শান্তির বিকাশ।
শূন্যে আঁখি চেয়ে আছে, উদার বুকের কাছে
খেলা করে সমুদ্রবাতাস।
চৌদিকে দিগন্ত মুক্ত, বিশ্বচরাচর সুপ্ত,
তারি মাঝে যোগী মহাকায়।
ভয়ে ভয়ে ঢেউগুলি নিয়ে যায় পদধূলি,
ধীরে আসে, ধীরে চলে যায়।
মহা স্তব্ধ সব ঠাঁই, বিশ্বে আর শব্দ নাই
কেবল সিন্ধুর মহা তান—
যেন সিন্ধু ভক্তিভরে জলদগম্ভীর স্বরে
তপনের করে স্তবগান।
আজি সমুদ্রের কূলে, নীরবে সমুদ্র দুলে
হৃদয়ের অতল গভীরে।
অনন্ত সে পারাবার ডুবাইছে চারি ধার
ঢেউ লাগে জগতের তীরে।
যোগী যেন চিত্রে লিখা, উঠিছে রবির শিখা
মুখে তারি পড়িছে কিরণ,
পশ্চাতে ব্যাপিয়া দিশি তামসী তাপসী নিশি
ধ্যান করে মুদিয়া নয়ন।
শিবের জটার 'পরে যথা সুরধুনী ঝরে
তারাচূর্ণ রজতের স্রোতে,
তেমনি কিরণ লুটে সন্ন্যাসীর জটাজুটে
পূরব-আকাশ-সীমা হতে।
বিমল আলোক হেন ব্রহ্মলোক হতে যেন
ঝরে তাঁর ললাটের কাছে,
মর্ত্যের তামসী নিশি পশ্চাতে যেতেছে মিশি
নীরবে নিস্তব্ধ চেয়ে আছে।
সুদূর সমুদ্রনীরে অসীম আঁধার-তীরে
একটুকু কনকের রেখা,
কী মহা রহস্যময়, সমুদ্রে অরুণোদয়
আভাসের মতো যায় দেখা।

চরাচর ব্যগ্র প্রাণে পূরবের পথ-পানে
নেহারিছে সমুদ্র অতল—
দেখো চেয়ে মরি মরি, কিরণমৃণাল-'পরি
জ্যোতির্ময় কনককমল।
দেখো চেয়ে দেখো পূবে কিরণে গিয়েছে ডুবে
গগনের উদার ললাট—
সহসা সে ঋষিবর আকাশে তুলিয়া কর
গাহিয়া উঠিল বেদ-পাঠ।

পাগল

আপন মনে বেড়ায় গান গেয়ে,
গান কেউ শোনে কেউ শোনে না।
ঘুরে বেড়ায় জগৎ-পানে চেয়ে,
তারে কেউ দেখে কেউ দেখে না।
সে যেন গানের মতো প্রাণের মতো শুধু
সৌরভের মতো উড়ছে বাতাসেতে,
আপনারে আপনি সে জানে না,
তবু আপনাতে আপনি আছে মেতে।

হরষে তার পুলকিত গা,
ভাবের ভরে টলমল পা,
কে জানে কোথায় যে সে যায়
আঁখি তার দেখে কি দেখে না।
লতা তার গায়ে পড়ে,
ফুল তার পায়ে পড়ে,
নদীর মুখে কুলু কুলু রা'।
গায়ের কাছে বাতাস করে বা'।
সে শুধু চলে যায়,
মুখে কী বলে যায়,
বাতাস গলে যায় তা শুনে।
সুমুখে আঁখি রেখে
চলেছে কোথা যে কে
কিছু সে নাহি দেখে শোনে।

যেখান দিয়ে যায় সে চলে সেথায় যেন ঢেউ খেলে যায়,
বাতাস যেন আকুল হয়ে ওঠে,
ধরা যেন চরণ ছুঁয়ে শিউরে ওঠে শ্যামল দেহে
লতায় যেন কুসুম ফোটে ফোটে।
বসন্ত তার সাড়া পেয়ে সখা ব'লে আসে ধেয়ে,
বনে যেন দুইটি বসন্ত।

দুই সখাতে ভেসে চলে যৌবনসাগরের জলে,
কোথাও যেন নাহি রে তার অন্ত।
আকাশ বলে 'এসো এসো', কানন বলে 'বোসো বোসো',
সবাই যেন নাম ধরে তার ডাকে।
হেসে যখন কয় সে কথা মূর্ছা যায় রে বনের লতা,
লুটিয়ে ভুঁয়ে চুপ করে সে থাকে।
বনের হরিণ কাছে আসে—সাথে সাথে ফিরে পাশে
স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় দেহছায়।
পায়ের কাছে পড়ে লুটি, বড়ো বড়ো নয়ন দুটি
তুলে তুলে মুখের পানে চায়।
আপনা-ভোলা সরল হাসি ঝরে পড়ছে রাশি রাশি,
আপনি যেন জানতে নাহি পায়।
লতা তারে আটকে রেখে তারি কাছে হাসতে শেখে,
হাসি যেন কুসুম হয়ে যায়।
গান গায় সে সাঁঝের বেলা, মেঘগুলি তাই ভুলে খেলা
নেমে আসতে চায় রে ধরা-পানে,
একে একে সাঁঝের তারা গান শুনে তার অবাক-পারা
আর সবারে ডেকে ডেকে আনে।
আপনি মাতে আপন স্বরে, আর সবারে পাগল করে,
সাথে সাথে সবাই গাহে গান—
জগতের যা-কিছু আছে সব ফেলে দেয় পায়ের কাছে,
প্রাণের কাছে খুলে দেয় সে প্রাণ।

তোরাই শুধু শুনলি নে রে, কোথায় বসে রইলি যে রে,
দ্বারের কাছে গেল গেয়ে গেয়ে,
কেউ তাহারে দেখলি নে তো চেয়ে।
গাইতে গাইতে চলে গেল, কত দূর সে চলে গেল,
গানগুলি তার হারিয়ে গেল বনে,
দুয়ার দেওয়া তোদের পাষাণ-মনে।

মাতাল

বুঝি রে,
চাঁদের কিরণ পান ক'রে ওর ঢুলুঢুলু দুটি আঁখি,
কাছে ওর যেয়ো না,
কথাটি শুধায়ো না,
ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে বসে আছে একাকী।

ঘুমের মতো মেয়েগুলি
চোখের কাছে দুলি দুলি
বেড়ায় শুধু নূপুর রনরনি।

আধেক মুদি আঁখির পাতা,
কার সাথে যে কচ্ছে কথা,
শুনছে কাহার মৃদু মধুর ধ্বনি।
অতি সুদূর পরীর দেশে—
সেখান থেকে বাতাস এসে
কানের কাছে কাহিনী শুনায়।
কত কী যে মোহের মায়া,
কত কী যে আলোক ছায়া,
প্রাণের কাছে স্বপন ঘনায়।
কাছে ওর যেয়ো না,
কথাটি শুধায়ো না,
ঘুমের মেয়ে তরাস পেয়ে যাবে,
মৃদু প্রাণে প্রমাদ গণি
নূপুরগুলি রনরনি
চাঁদের আলোয় কোথায় কে লুকাবে।

চলো দূরে নদীর তীরে,
বসে সেথায় ধীরে ধীরে
একটি শুধু বাঁশরি বাজাও।
আকাশেতে হাসবে বিধু,
মধুকণ্ঠে মৃদু মৃদু
একটি শুধু সুখেরই গান গাও।
দূর হতে আসিয়া কানে
পশিবে সে প্রাণের প্রাণে
স্বপনেতে স্বপন ঢালিয়ে।
ছায়াময়ী মেয়েগুলি
গানের স্রোতে দুলি দুলি,
বসে রবে গালে হাত দিয়ে।

গাহিতে গাহিতে তুমি বালা
গেঁথে রাখো মালতীর মালা।
ও যখন ঘুমাইবে, গলায় পরায়ে দিবে
স্বপনে মিশিবে ফুলবাস।
ঘুমন্ত মুখের 'পরে চেয়ে থেকো প্রেমভরে
মুখেতে ফুটিবে মৃদু হাস।

বাদল

একলা ঘরে বসে আছি, কেউ নেই কাছে
সারাটা দিন মেঘ করে আছে।
সারাদিন বাদল হল,

সারাদিন বৃষ্টি পড়ে,
সারাদিন বইছে বাদল-বায়!
মেঘের ঘটা আকাশভরা,
চারি দিকে আঁধার-করা,
তড়িৎ-রেখা ঝলক মেরে যায়।
শ্যামল বনের শ্যামল শিরে
মেঘের ছায়া নেমেছে রে,
মেঘের ছায়া কুঁড়েঘরের 'পরে,
ভাঙাচোরা পথের ধারে
ঘন বাঁশের বনের ধারে
মেঘের ছায়া ঘনিয়ে যেন ধরে।

বিজন ঘরে বাতায়নে
সারাটা দিন আপন মনে
বসে বসে বাইরে চেয়ে দেখি,
টুপ্‌টুপ্‌ বৃষ্টি পড়ে,
পাতা হতে পাতায় ঝরে,
ডালে বসে ভেজে একটি পাখি।
তালপুকুরে জলের 'পরে
বৃষ্টিবারি নেচে বেড়ায়,
ছেলেরা মেতে বেড়ায় জলে,
মেয়েগুলি কলসী নিয়ে
চলে আসে পথ দিয়ে,
আঁধারভরা গাছের তলে তলে!

কে জানে কী মনেতে আশ,
উঠছে ধীরে দীর্ঘনিশাস,
বায়ু উঠে শ্বসিয়া শ্বসিয়া।
ডালপালা হা হা করে,
বৃষ্টিবিন্দু ঝরে পড়ে,
পাতা পড়ে খসিয়া খসিয়া।

আতস্বর

শ্রাবণে গভীর নিশি দিগ্বিদিক আছে মিশি
মেঘেতে মেঘেতে ঘন বাঁধা,
কোথা শশী কোথা তারা মেঘারণ্যে পথহারা
আঁধারে আঁধারে সব আঁধা।
জ্বলন্ত বিদ্যুৎ-অহি ক্ষণে ক্ষণে রহি রহি
অন্ধকারে করিছে দংশন।

কুম্ভকর্ণ অন্ধকার নিদ্রা টুটি বার বার
উঠিতেছে করিয়া গর্জন।
শূন্যে যেন স্থান নাই, পরিপূর্ণ সব ঠাঁই,
সুকঠিন আঁধার চাপিয়া।
ঝড় বহে, মনে হয়, ও যেন রে ঝড় নয়,
অন্ধকার দুলিছে কাঁপিয়া।
মাঝে মাঝে থরহর কোথা হতে মরমর
কেঁদে কেঁদে উঠিছে অরণ্য।
নিশীথসমুদ্র-মাঝে জলজন্তু-সম রাজে
নিশাচর যেন রে অগণ্য।
কে যেন রে মুহুর্মুহু নিশ্বাস ফেলিছে হু হু,
হু হু করে কেঁদে কেঁদে ওঠে,
সুদূর অরণ্যতলে ডালপালা পায়ে দ'লে
আর্তনাদ করে যেন ছোটে।
এ অনন্ত অন্ধকারে কে রে সে, খুঁজিছে কারে,
তন্ন তন্ন আকাশগহ্বর।
তারে নাহি দেখে কেহ, শুধু শিহরায় দেহ
শুনি তার তীব্র কণ্ঠস্বর।
তুই কি রে নিশীথিনী অন্ধকারে অনাথিনী
হারাইলি জগতেরে তোর?
অনন্ত আকাশ-'পরি ছুটিস রে হা হা করি,
আলোড়িয়া অন্ধকার ঘোর।
তাই কি রে থেকে থেকে নাম ধরে ডেকে ডেকে
জগতেরে করিস আহ্বান।
শুনি আজি তোর স্বর শিহরিত কলেবর,
কাঁদিয়া উঠিছে কার প্রাণ।
কে আজি রে তোর সাথে ধরি তোর হাতে হাতে
খুঁজিতে চাহিছে যেন কারে।
মহাশূন্যে দাঁড়াইয়ে প্রান্ত হতে প্রান্তে গিয়ে
কে চাহে কাঁদিতে অন্ধকারে!
আঁধারেতে আঁখি ফুটে ঝটিকার 'পরে ছুটে
তীক্ষ্মশিখা বিদ্যুৎ মাড়ায়ে
হু হু করি নিশ্বাসিয়া চলে যাবে উদাসিয়া
কেশপাশ আকাশে ছড়ায়ে।
উলঙ্গিনী উন্মাদিনী ঝটিকার কণ্ঠ জিনি
তীব্র কণ্ঠে ডাকিবে তাহারে,
সে বিলাপ কেঁপে কেঁপে বেড়াবে আকাশ ব্যেপে
ধ্বনিয়া অনন্ত অন্ধকারে।
ছিঁড়ি ছিঁড়ি কেশপাশ কভু কান্না কভু হাস
প্রাণ ভ'রে করিবে চীৎকার,
বজ্র-আলিঙ্গন দিয়ে বুকে তোরে জড়াইয়ে
ছুটিতে গিয়েছে সাধ তার।

স্মৃতি-প্রতিমা

আজ কিছু করিব না আর,
সমুখেতে চেয়ে চেয়ে গুন্ গুন্ গেয়ে গেয়ে
বসে বসে ভাবি এক বার।
আজি বহু দিন পরে যেন সেই দ্বিপ্রহরে
সেদিনের বায়ু বহে যায়,
হা রে হা শৈশবমায়া, অতীত প্রাণের ছায়া,
এখনো কি আছিস হেথায়?
এখনো কি থেকে থেকে উঠিস রে ডেকে ডেকে,
সাড়া দিবে সে কি আর আছে?
যা ছিল তা আছে সেই, আমি যে সে আমি নেই,
কেন রে আসিস মোর কাছে?
কেন রে পুরানো স্নেহে পরানের শূন্য গেহে
দাঁড়ায়ে মুখের পানে চাস?
অভিমানে ছলছল নয়নে কী কথা বল,
কেঁদে ওঠে হৃদয় উদাস।
আছিল যে আপনার সে বুঝি রে নাই আর,
সে বুঝি রে হয়ে গেছে পর,
তবু সে কেমন আছে শুধাতে আসিস কাছে,
দাঁড়ায়ে কাঁপিস থর্ থর্।
আয় রে আয় রে অয়ি, শৈশবের স্মৃতিময়ী,
আয় তোর আপনার দেশে,
যে প্রাণ আছিল তোরি তাহারি দুয়ার ধরি
কেন আজ ভিখারিনী-বেশে!
আগুসরি ধীরি ধীরি বার বার চাস ফিরি,
সংশয়েতে চলে না চরণ,
ভয়ে ভয়ে মুখপানে চাহিস আকুল প্রাণে,
ম্লান মুখে না সরে বচন।
দেহে যেন নাহি বল, চোখে পড়ে-পড়ে জল,
এলো চুলে, মলিন বসনে—
কথা কেহ বলে পাছে ভয়ে না আসিস কাছে,
চেয়ে রোস আকুল নয়নে।
সেই ঘর সেই দ্বার মনে পড়ে বার বার
কত যে করিলি খেলাধুলি,
খেলা ফেলে গেলি চলে, কথাটি না গেলি বলে,
অভিমানে নয়ন আকুলি।
যেথা যা গেছিলি রেখে ধুলায় গিয়েছে ঢেকে,
দেখ্ রে তেমনি আছে পড়ি—
সেই অশ্রু সেই গান সেই হাসি অভিমান
ধুলায় যেতেছে গড়াগড়ি।
তবে রে বারেক আয় বোস হেথা পুনরায়

ধূলিমাখা অতীতের মাঝে—
শূন্য গৃহ জনহীন পড়ে আছে কত দিন,
আর হেথা বাঁশি নাহি বাজে।
কেন তবে আসিবি নে কেন কাছে বসিবি নে
এখনো বাসিস যদি ভালো!
আয় রে ব্যাকুল প্রাণে চাই দুঁহু মুখপানে,
গোধূলিতে নিব-নিব আলো।
নিবিছে সাঁঝের ভাতি, আসিছে আঁধার রাতি,
এখনি ছাইবে চারি ভিতে—
রজনীর অন্ধকারে মরণসাগর-পারে
কেহ কারে নারিব দেখিতে।
আকাশের পানে চাই— চন্দ্র নাই, তারা নাই,
একটু না বহিছে বাতাস,
শুধু দীর্ঘ দীর্ঘ নিশি দুজনে আঁধারে মিশি
শুনিব দোঁহার দীর্ঘশ্বাস।
এক বার চেয়ে দেখি কোন্‌খানে আছে যে কী,
কোন্‌খানে করেছিনু খেলা—
শুকানো এ মালাগুলি রাখি রে কণ্ঠেতে তুলি,
কখন চলিয়া যাবে বেলা।
আয় তবে আয় হেথা, কোলে তোর রাখি মাথা,
কেশপাশে মুখ দে রে ঢেকে।
বিন্দু বিন্দু ধীরে ধীরে অশ্রু পড়ে অশ্রুনীরে,
নিশ্বাস উঠিছে থেকে থেকে।
সেই পুরাতন স্নেহে হাতটি বুলাও দেহে,
মাথাটি বুকেতে তুলে রাখি—
কথা কও নাহি কও, চোখে চোখে চেয়ে রও,
আঁখিতে ডুবিয়া যাক আঁখি।

আবছায়া

তারা সেই ধীরে ধীরে আসিত,
মৃদু মৃদু হাসিত,
তাদের পড়েছে আজ মনে।
তারা কথাটি কহিত না,
কাছেতে রহিত না,
চেয়ে রইত নয়নে নয়নে।
তারা চলে যেত আনমনে,
বেড়াইত বনে বনে,
আনমনে গাহিত রে গান।

চুল থেকে ঝরে ঝরে
ফুলগুলি যেত পড়ে,
কেশপাশে ঢাকিত বয়ান।
কাছে আমি যাইতাম,
গানগুলি গাইতাম,
সাথে সাথে যাইতাম পিছু—
তারা যেন আনমনা,
শুনিত কি শুনিত না
বুঝিবারে নারিতাম কিছু।
কভু তারা থাকি থাকি
আনমনে শূন্য আঁখি
চাহিয়া রহিত মুখপানে,
ভালো তারা বাসিত কি,
মৃদু হাসি হাসিত কি,
প্রাণে প্রাণ দিত কি, কে জানে!
গাঁথি ফুলে মালাগুলি
যেন তারা যেত ভুলি
পরাইতে আমার গলায়।
যেন যেতে যেতে ধীরে
চায় তারা ফিরে ফিরে
বকুলের গাছের তলায়।
যেন তারা ভালোবেসে
ডেকে যেত কাছে এসে,
চলে যেতে করিত রে মানা—
আমার তরুণ প্রাণে
তাদের হৃদয়খানি
আধো জানা আধেক অজানা।

কোথা চলে গেল তারা,
কোথা যেন পথহারা,
তাদের দেখি নে কেন আর!
কোথা সেই ছায়া-ছায়া
কিশোর-কল্পনা-মায়া,
মেঘমুখে হাসিটি উষার!
আলোতে ছায়াতে ঘেরা
জাগরণ স্বপনেরা
আশেপাশে করিত রে খেলা—
একে একে পলাইল,
শূন্যে যেন মিলাইল,
বাড়িতে লাগিল যত বেলা।

আচ্ছন্ন

লতার লাবণ্য যেন কচি কিশলয়ে ঘেরা,
সুকুমার প্রাণ তার মাধুরীতে ঢেকেছে—
কোমল মুকুলগুলি চারি দিকে আকুলিত
তারি মাঝে প্রাণ যেন লুকিয়ে রেখেছে।
ওরে যেন ভালো করে দেখা যায় না,
আঁখি যেন ডুবে গিয়ে কূল পায় না।
সাঁঝের আভা নেমে এল, জ্যোৎস্না পাশে ঘুমিয়ে প'ল,
ফুলের গন্ধ দেখতে এসেছে,
তারাগুলি ঘিরে বসেছে।
পূরবীরাগিণীগুলি দূর হতে চলে আসে
ছুঁতে তারে হয় নাকো ভরসা—
কাছে কাছে ফিরে ফিরে মুখপানে চায় তারা,
যেন তারা মধুময়ী দুরাশা।
ঘুমন্ত প্রাণেরে ঘিরে স্বপনগুলি ঘুরে ফিরে
গাঁথে যেন আলোকের কুয়াশা,
ঢেকে তারে আছে কত, চারি দিকে শত শত
অনিমিষ নয়নের পিয়াসা।
ওদের আড়াল থেকে আবছায়া দেখা যায়
অতুলন প্রাণের বিকাশ,
সোনার মেঘের মাঝে কচি উষা ফোটে ফোটে
পূরবেতে তাহারি আভাস।

আলোকবসনা যেন আপনি সে ঢাকা আছে
আপনার রূপের মাঝার,
রেখা রেখা হাসিগুলি আশেপাশে চমকিয়ে
রূপেতেই লুকায় আবার।
আঁখির আলোক ছায়া আঁখিরে রয়েছে ঘিরে,
তারি মাঝে দৃষ্টি পথহারা,
যেথা চলে স্বর্গ হতে অবিরাম পড়ে যেন
লাবণ্যের পুষ্পবারিধারা।
ধরণীরে ছুঁয়ে যেন পা দুখানি ভেসে যায়,
কুসুমের স্রোত বহে যায়,
কুসুমেরে ফেলে রেখে খেলাধুলা ভুলে গিয়ে
মায়ামুগ্ধ বসন্তের বায়।

ওরে কিছু শুধাইলে বুঝি রে নয়ন মেলি
দুদণ্ড নীরবে চেয়ে রবে,
অতুল অধর দুটি ঈষৎ টুটিয়ে বুঝি
অতি ধীরে দুটি কথা কবে।
আমি কি বুঝি সে ভাষা, শুনিতে কি পাব বাণী

সে যেন কিসের প্রতিধ্বনি—
মধুর মোহের মতো যেমনি ছুঁইবে প্রাণ
ঘুমায়ে সে পড়িবে অমনি।
হৃদয়ের দূর হতে সে যেন রে কথা কয়
তাই তার অতি মৃদুস্বর,
বায়ুর হিল্লোলে তাই আকুল কুমুদ-সম
কথাগুলি কাঁপে থর থর।

কে তুমি গো উষাময়ী, আপন কিরণ দিয়ে
আপনারে করেছ গোপন,
রূপের সাগর-মাঝে কোথা তুমি ডুবে আছ
একাকিনী লক্ষ্মীর মতন!
ধীরে ধীরে ওঠো দেখি, একবার চেয়ে দেখি
স্বর্ণজ্যোতি কমল-আসন,
সুনীল সলিল হতে ধীরে ধীরে উঠে যথা
প্রভাতের বিমল কিরণ।
সৌন্দর্যকোরক টুটে এসো গো বাহির হয়ে
অনুপম সৌরভের প্রায়,
আমি তাহে ডুবে যাব সাথে সাথে বহে যাব
উদাসীন বসন্তের বায়।

স্নেহময়ী

হাসিতে ভরিয়ে গেছে হাসিমুখখানি—
প্রভাতে ফুলের বনে দাঁড়ায়ে আপন মনে,
মরি মরি, মুখে নাই বাণী।
প্রভাতকিরণগুলি চৌদিকে যেতেছে খুলি
যেন শুভ্র কমলের দল,
আপন মহিমা লয়ে তারি মাঝে দাঁড়াইয়ে
কে তুই করুণাময়ী বল্‌।
স্নিগ্ধ ওই দুনয়ানে চাহিলে মুখের পানে
সুধাময়ী শান্তি প্রাণে জাগে—
শুনি যেন স্নেহবাণী, কোমল ও হাতখানি
প্রাণের গায়েতে যেন লাগে।
তোরে যেন চিনিতাম, তোর কাছে শুনিতাম
কত কী কাহিনী সন্ধেবেলা।
যেন মনে নাই কবে কাছে বসি মোরা সবে
তোর কাছে করিতাম খেলা।
অতি ধীরে তোর পাশে প্রভাতের বায়ু আসে,
যেন ছোটো ভাইটির প্রায়,

যেন তোর স্নেহ পেয়ে তোর মুখপানে চেয়ে
আবার সে খেলাইতে যায়।
অমিয়-মাধুরী মাখি চেয়ে আছে দুটি আঁখি,
জগতের প্রাণ জুড়াইছে,
ফুলেরা আমোদে মেতে হেলে দুলে বাতাসেতে
আঁখি হতে স্নেহ কুড়াইছে।
কী যেন জান গো ভাষা, কী যেন দিতেছ আশা,
আঁখি দিয়ে পরান উথলে—
চারি দিকে ফুলগুলি কাঁচ কাঁচ বাহু তুলি
'কোলে নাও' 'কোলে নাও' বলে।
কারে যেন কাছে ডাক, যেথা তুমি বসে থাক
তার চারি দিকে থাক তুমি—
তোমার আপনা দিয়ে হাসিময়ী শান্তি দিয়ে
পূর্ণ কর চরাচরভূমি।
তোমাতে পুরেছে বন, পূর্ণ হল সমীরণ,
তোমাতে পুরেছে লতাপাতা।
ফুল দূরে থেকে চায়— তোমার পরশ পায়,
লুটায় তোমার কোলে মাথা।
তোমার প্রাণের বিভা চৌদিকে দুলিছে কি বা
প্রভাতের আলোকহিল্লোলে,
আজিকে প্রভাতে এ কি স্নেহের প্রতিমা দেখি,
বসে আছ জগতের কোলে!
কেহ মুখে চেয়ে থাকে, কেহ তোরে কাছে ডাকে
কেহ তোর কোলে খেলা করে।
তুমি শুধু স্তব্ধ হয়ে একটি কথা না কয়ে
চেয়ে আছ আনন্দের ভরে।
ওই যে তোমার কাছে সকলে দাঁড়ায়ে আছে
ওরা মোর আপনার লোক,
ওরাও আমার মতো তোর স্নেহে আছে রত
জুঁই বেলা বকুল অশোক।
বড়ো সাধ যায় তোরে ফুল হয়ে থাকি ঘিরে
কাননে ফুলের সাথে মিশে—
নয়ন-কিরণে তোর দুলিবে পরান মোর,
সুবাস ছুটিবে দিশে দিশে।
তোমার হাসিটি লয়ে হরষে আকুল হয়ে
খেলা করে প্রভাতের আলো—
হাসিতে আলোটি পড়ে, আলোতে হাসিটি পড়ে,
প্রভাত মধুর হয়ে গেল।
পরশি তোমার কায় মধুর প্রভাত-বায়,
মধুময় কুসুমের বাস—
ওই দৃষ্টিসুধা দাও, এই দিক-পানে চাও,
প্রাণে হোক প্রভাত বিকাশ।

রাহুর প্রেম

শুনেছি আমারে ভালো লাগে না,
নাই-বা লাগিল তোর,
কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া
লোহশৃঙ্খলের ডোর।
তুই তো আমার বন্দী অভাগিনী
বাঁধিয়াছি কারাগারে,
প্রাণের শৃঙ্খল দিয়েছি প্রাণেতে
দেখি কে খুলিতে পারে।

জগৎ-মাঝারে যেথায় বেড়াবি,
যেথায় বসিবি, যেথায় দাঁড়াবি,
কি বসন্ত শীতে দিবসে নিশীথে
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে
এ পাষাণ প্রাণ অনন্ত শৃঙ্খল
চরণ জড়ায়ে ধ'রে।
এক বার তোরে দেখেছি যখন
কেমনে এড়াবি মোরে।
চাও নাই চাও, ডাক নাই ডাক,
কাছেতে আমার থাক নাই থাক,
যাব সাথে সাথে, রব পায় পায়,
রব গায় গায় মিশি—
এ বিষাদ ঘোর, এ আঁধার মুখ,
হতাশ নিশ্বাস, এই ভাঙা বুক,
ভাঙা বাদ্য-সম বাজিবে কেবল
সাথে সাথে দিবানিশি।

অনন্ত কালের সঙ্গী আমি তোর
আমি যে রে তোর ছায়া—
কিবা সে রোদনে কিবা সে হাসিতে
দেখিতে পাইবি কখনো পাশেতে,
কখনো সমুখে কখনো পশ্চাতে,
আমার আঁধার কায়া।
গভীর নিশীথে একাকী যখন
বসিয়া মলিন প্রাণে,
চমকি উঠিয়া দেখিবি তরাসে
আমিও রয়েছি বসে তোর পাশে
চেয়ে তোর মুখপানে।
যে দিকেই তুই ফিরাবি বয়ান
সেই দিকে আমি ফিরাব নয়ান,

যে দিকে চাহিবি আকাশে আমার
আঁধার মূরতি আঁকা।
সকলি পড়িবে আমার আড়ালে,
জগৎ পড়িবে ঢাকা।
দুঃস্বপ্নের মতো, দুর্ভাবনা-সম,
তোমারে রহিব ঘিরে—
দিবস রজনী এ মুখ দেখিব
তোমার নয়ননীরে।
বিশীর্ণ-কঙ্কাল চিরভিক্ষা-সম
দাঁড়ায়ে সম্মুখে তোর
'দাও দাও' বলে কেবলি ডাকিব
ফেলিব নয়নলোর।
কেবলি সাধিব, কেবলি কাঁদিব,
কেবলি ফেলিব শ্বাস—
কানের কাছেতে প্রাণের কাছেতে
করিব রে হা-হুতাশ।
মোর এক নাম কেবলি বসিয়া
জপিব কানেতে তব,
কাঁটার মতন দিবস রজনী
পায়েতে বিঁধিয়ে রব।
পূর্বজনমের অভিশাপ-সম
রব আমি কাছে কাছে,
ভাবী জনমের অদৃষ্টের মতো
বেড়াইব পাছে পাছে।
ঢালিয়া আমার প্রাণের আঁধার
বেড়িয়া রাখিব তোর চারি ধার
নিশীথ রচনা করি।
কাছেতে দাঁড়ায়ে প্রেতের মতন
শুধু দুটি প্রাণী করিব যাপন
অনন্ত সে বিভাবরী।
যেন রে অকূল সাগর-মাঝারে
ডুবেছে জগৎ-তরী—
তারি মাঝে শুধু মোরা দুটি প্রাণী
রয়েছি জড়ায়ে তোর বাহুখানি,
যুঝিস ছাড়াতে, ছাড়িব না তবু
সে মহাসমুদ্র-'পরি।
পলে পলে তোর দেহ হয় ক্ষীণ,
পলে পলে তোর বাহু বলহীন,
দুজনে অনন্তে ডুবি নিশিদিন—
তবু আছি তোরে ধরি।
রোগের মতন বাঁধিব তোমারে
নিদারুণ আলিঙ্গনে—

মোর যাতনায় হইবি অধীর,
আমারি অনলে দহিবে শরীর,
অবিরাম শুধু আমি ছাড়া আর
কিছু না রহিবে মনে।
গভীর নিশীথে জাগিয়া উঠিয়া
সহসা দেখিবি কাছে,
আড়ষ্ট কঠিন মৃত দেহ মোর
তোর পাশে শুয়ে আছে।
ঘুমাবি যখন স্বপন দেখিবি,
কেবল দেখিবি মোরে,
এই অনিমেষ তৃষাতুর আঁখি
চাহিয়া দেখিছে তোরে।
নিশীথে বসিয়া থেকে থেকে তুই
শুনিবি আঁধারঘোরে,
কোথা হতে এক কাতর উন্মাদ
ডাকে তোর নাম ধরে।
সুবিজন পথে চলিতে চলিতে
সহসা সভয় গণি
সাঁঝের আঁধারে শুনিতে পাইবি
আমার হাসির ধ্বনি।

হেরো অন্ধকার মরুময়ী নিশা—
আমার পরান হারায়েছে দিশা,
অনন্ত এ ক্ষুধা অনন্ত এ তৃষা
করিতেছে হাহাকার।
আজিকে যখন পেয়েছি রে তোরে
এ চিরযামিনী ছাড়িব কী করে!
এ ঘোর পিপাসা যুগ-যুগান্তরে
মিটিবে কি কভু আর!
বুকের ভিতরে ছুরির মতন,
মনের মাঝারে বিষের মতন,
রোগের মতন, শোকের মতন
রব আমি অনিবার।
জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে,
আশার পশ্চাতে ভয়—
ডাকিনীর মতো রজনী ভ্রমিছে
চিরদিন ধরে দিবসের পিছে
সমস্ত ধরণীময়।
যেথায় আলোক সেইখানে ছায়া
এই তো নিয়ম ভবে,
ও রূপের কাছে চিরদিন তাই
এ ক্ষুধা জাগিয়া রবে!

মধ্যাহ্নে

হেরো ওই বাড়িতেছে বেলা,
বসে আমি রয়েছি একেলা।

ওই হোথা যায় দেখা, সুদূরে বনের রেখা
মিশেছে আকাশনীলিমায়।
দিক হতে দিগন্তরে মাঠ শুধু ধু ধু করে,
বায়ু কোথা বহে চলে যায়।
সুদূর মাঠের পারে গ্রামখানি এক ধারে
গাছ দিয়ে ছায়া দিয়ে ঘেরা।
কাননের গায়ে যেন ছায়াখানি বুলাইয়া
ভেসে চলে কোথায় মেঘেরা।
মধুর উদাস প্রাণে চাই চারি দিক পানে,
স্তব্ধ সব ছবির মতন।
সব যেন চারি ধারে অবশ আলসভারে
স্বর্ণময় মায়ায় মগন।
গ্রামখানি, মাঠখানি, উঁচুনিচু পথখানি,
দু-একটি গাছ মাঝে মাঝে,
আকাশ-সমুদ্রে-ঘেরা সুবর্ণ দ্বীপের পারা
কোথা যেন সুদূরে বিরাজে।
কনকলাবণ্য লয়ে যেন অভিভূত হয়ে
আপনাতে আপনি ঘুমায়,
নিঝুম পাদপ-লতা, শ্রান্তকায় নীরবতা
শুয়ে আছে গাছের ছায়ায়।
শুধু অতি মৃদু স্বরে গুন্ গুন্ গান করে
যেন সব ঘুমন্ত ভ্রমর,
যেন মধু খেতে খেতে ঘুমিয়েছে কুসুমেতে
মরিয়া এসেছে কণ্ঠস্বর।
নীল শূন্যে ছবি আঁকা রবির কিরণ মাখা,
সেথা যেন বাস করিতেছি।
জীবনের আধখানি যেন ভুলে গেছি আমি,
কোথা যেন ফেলিয়ে এসেছি।
আনমনে ধীরি ধীরি বেড়াতেছি ফিরি ফিরি
ঘুমঘোর ছায়ায় ছায়ায়—
কোথা যাব কোথা যাই সে কথা যে মনে নাই,
ভুলে আছি মধুর মায়ায়।
মধুর বাতাসে আজি যেন রে উঠিছে বাজি
পরানের ঘুমন্ত বীণাটি,
ভালোবাসা আজি কেন সঙ্গীহারা পাখি যেন
বসিয়া গাহিছে একেলাটি।
কে জানে কাহারে চায়, প্রাণ যেন উভরায়

ডাকে কারে 'এসো এসো' ব'লে,
কাছে কারে পেতে চায়, সব তারে দিতে চায়,
মাথাটি রাখিতে চায় কোলে।
স্তব্ধ তরুতলে গিয়া পা দুখানি ছড়াইয়া
নিমগন মধুময় মোহে,
আনমনে গান গেয়ে দূর শূন্যপানে চেয়ে
ঘুমায়ে পড়িতে চায় দোঁহে।
দূর মরীচিকা-সম ওই বন-উপবন,
ওরি মাঝে পরান উদাসী—
বিজন বকুলতলে পল্লবের মরমরে
নাম ধরে বাজাইছে বাঁশি।
সে যেন কোথায় আছে সুদূর বনের পাছে
কত নদী-সমুদ্রের পারে,
নিভৃত নির্ঝরতীরে লতায় পাতায় ঘিরে
বসে আছে নিকুঞ্জ-আঁধারে।
সাধ যায় বাঁশি করে বন হতে বনান্তরে
চলে যাই আপনার মনে,
কুসুমিত নদীতীরে বেড়াইব ফিরে ফিরে
কে জানে কাহার অন্বেষণে।
সহসা দেখিব তারে, নিমেষেই একেবারে
প্রাণে প্রাণে হইবে মিলন,
এই মরীচিকা-দেশে দুজনে বাসরবেশে
ছায়ারাজ্যে করিব ভ্রমণ।
বাঁধিবে সে বাহুপাশে, চোখে তার স্বপ্ন ভাসে,
মুখে তার হাসির মুকুল—
কে জানে বুকের কাছে আঁচল আছে না আছে,
পিঠেতে পড়েছে এলো চুল।
মুখে আধখানি কথা, চোখে আধখানি কথা,
আধখানি হাসিতে জড়ানো—
দুজনেতে চলে যাই, কে জানে কোথায় যাই,
পদতলে কুসুম ছড়ানো।

বুঝি রে এমনি বেলা ছায়ায় করিত খেলা
তপোবনে ঋষিবালিকারা—
পরিয়া বাকলবাস, মুখেতে বিমল হাস,
বনে বনে বেড়াইত তারা।
হরিণশিশুরা এসে কাছেতে বসিত ঘেঁষে,
মালিনী বহিত পদতলে—
দু-চারি সখীতে মেলি কথা কয় হাসি খেলি
তরুতলে বসি কুতূহলে।
কারো কোলে কারো মাথা, সরল প্রাণের কথা
নিরালায় কহে প্রাণ খুলি—

লুকিয়ে গাছের আড়ে সাধ যায় শুনিবারে
কী কথা কহিছে মেয়েগুলি।
লতার পাতার মাঝে ঘাসের ফুলের মাঝে
হরিণশিশুর সাথে মিলি—
অঙ্গে আভরণ নাই, বাকলবসন পরি
রূপগুলি বেড়াইছে খেলি।

ওই দূর বনছায়া ও যে কী জানে রে মায়া,
ও যেন রে রেখেছে লুকায়ে—
সেই স্নিগ্ধ তপোবন, চিরফুল্ল তরুগণ,
হরিণশাবক তরুছায়ে।
হোথায় মালিনী নদী বহে যেন নিরবধি,
ঋষিকন্যা কুটীরের মাঝে—
কভু বসি তরুতলে স্নেহে তারে ভাই বলে,
ফুলটি ঝরিলে ব্যথা বাজে।
কত ছবি মনে আসে, পরানের আশেপাশে
কল্পনা কত যে করে খেলা—
বাতাস লাগায়ে গায়ে বসিয়া তরুর ছায়ে
কেমনে কাটিয়া যায় বেলা।

পূর্ণিমায়

যাই যাই ডুবে যাই--
আরো আরো ডুবে যাই,
বিহ্বল অবশ অচেতন।
কোন্ খানে, কোন্ দূরে,
নিশীথের কোন্ মাঝে
কোথা হয়ে যাই নিমগন।
হে ধরণী, পদতলে
দিয়ো না দিয়ো না বাধা,
দাও মোরে দাও ছেড়ে দাও—
অনন্ত দিবস-নিশি
এমনি ডুবিতে থাকি,
তোমরা সুদূরে চলে যাও।
এ কী রে উদার জ্যোৎস্না
এ কী রে গভীর নিশি
দিশে দিশে স্তব্ধতা বিস্তারি!
আঁখি দুটি মুদে আমি
কোথা আছি কোথা গেছি
কিছু যেন বুঝিতে না পারি।

দেখি দেখি আরো দেখি,
অসীম উদার শূন্যে
আরো দূরে আরো দূরে যাই—
দেখি আজি এ অনন্তে
আপনা হারায়ে ফেলে
আর যেন খুঁজিয়া না পাই।
তোমরা চাহিয়া থাকো
জোছনা অমৃত-পানে
বিহ্বল বিলীন তারাগুলি।
অপার দিগন্ত ওগো,
থাকো এ মাথার 'পরে
দুই দিকে দুই পাখা তুলি।
গান নাই, কথা নাই,
শব্দ নাই, স্পর্শ নাই,
নাই ঘুম, নাই জাগরণ—
কোথা কিছু নাহি জাগে,
সর্বাঙ্গে জোছনা লাগে,
সর্বাঙ্গ পুলকে অচেতন।
অসীমে সুনীলে শূন্যে
বিশ্ব কোথা ভেসে গেছে
তারে যেন দেখা নাহি যায়—
নিশীথের মাঝে শুধু
মহান্ একাকী আমি
অতলেতে ডুবি রে কোথায়।
গাও বিশ্ব গাও তুমি
সুদূর অদৃশ্য হতে
গাও তব নাবিকের গান -
শত লক্ষ যাত্রী লয়ে
কোথায় যেতেছ তুমি
তাই ভাবি মুদিয়া নয়ান।
অনন্ত রজনী শুধু
ডুবে যাই নিভে যাই
মরে যাই অসীম মধুরে—
বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে
মিশায়ে মিলায়ে যাই
অনন্তের সুদূর সুদূরে।

পোড়ো বাড়ি

চারি দিকে কেহ নাই, একা ভাঙা বাড়ি,
  সন্ধেবেলা ছাদে বসে ডাকিতেছে কাক।
নিবিড় আঁধার, মুখ বাড়ায়ে রয়েছে
  যেথা আছে ভাঙা ভাঙা প্রাচীরের ফাঁক।
পড়েছে সন্ধ্যার ছায়া অশথের গাছে,
  থেকে থেকে শাখা তার উঠিছে নড়িয়া।
ভগ্ন শুষ্ক দীর্ঘ এক দেবদারু তরু
  হেলিয়া ভিত্তির 'পরে রয়েছে পড়িয়া।
আকাশেতে উঠিয়াছে আধখানি চাঁদ,
  তাকায় চাঁদের পানে গৃহের আঁধার।
প্রাঙ্গণে করিয়া মেলা ঊর্ধ্বমুখ হয়ে
  চন্দ্রালোকে শৃগালেরা করিছে চীৎকার।

শুধাই রে, ওই তোর ঘোর স্তব্ধ ঘরে
  কখনো কি হয়েছিল বিবাহ-উৎসব?
কোনো রজনীতে কি রে ফুল্ল দীপালোকে
  উঠেছিল প্রমোদের নৃত্যগীত রব?
হোথায় কি প্রতি দিন সন্ধ্যা হয়ে এলে
  তরুণীরা সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়া দিত?
মায়ের কোলেতে শুয়ে চাঁদেরে দেখিয়া
  শিশুটি তুলিয়া হাত ধরিতে চাহিত?
বালকেরা বেড়াত কি কোলাহল করি?
  আঙিনায় খেলিত কি কোনো ভাইবোন?
মিলে মিশে স্নেহে প্রেমে আনন্দে উল্লাসে
  প্রতিদিবসের কাজ হত সমাপন?
কোন্ ঘরে কে ছিল রে! সে কি মনে আছে?
  কোথায় হাসিত বধূ শরমের হাস--
বিরহিণী কোন ঘরে কোন্ বাতায়নে
  রজনীতে একা বসে ফেলিত নিশ্বাস?
যেদিন শিয়রে তোর অশথের গাছ
  নিশীথের বাতাসেতে করে মর্ মর্,
ভাঙা জানালার কাছে পশে অতি ধীরে
  জাহ্নবীর তরঙ্গের দূর কলস্বর—
সে রাত্রে কি তাদের আবার পড়ে মনে
  সেই সব ছেলেদের সেই কচি মুখ—
কত স্নেহময়ী মাতা তরুণ তরুণী
  কত নিমেষের কত ক্ষুদ্র সুখ দুখ?
মনে পড়ে সেই সব হাসি আর গান—
  মনে পড়ে—কোথা তারা, সব অবসান!

অভিমানিনী

ও আমার অভিমানী মেয়ে
ওরে কেউ কিছু বোলো না।
ও আমার কাছে এসেছে,
ও আমায় ভালো বেসেছে,
ওরে কেউ কিছু বোলো না।

এলোথেলো চুলগুলি ছড়িয়ে
ওই দেখো সে দাঁড়িয়ে রয়েছে,
নিমেষহারা আঁখির পাতা দুটি
চোখের জলে ভরে এয়েছে।
গ্রীবাখানি ঈষৎ বাঁকানো,
দুটি হাতে মুঠি আছে চাপি,
ছোটো ছোটো রাঙা রাঙা ঠোঁট
ফুলে ফুলে উঠিতেছে কাঁপি।
সাধিলে ও কথা কবে না,
ডাকিলে ও আসিবে না কাছে,
সবার ’পরে অভিমান করে
আপ্‌না নিয়ে দাঁড়িয়ে শুধু আছে।

কী হয়েছে কী হয়েছে বলে
বাতাস এসে চুলগুলি দোলায়,
রাঙা ওই কপোলখানিতে
রবির হাসি হেসে চুমো খায়।
কচি হাতে ফুল দুখানি ছিল,
রাগ করে ওই ফেলে দিয়েছে—
পায়ের কাছে পড়ে পড়ে তারা
মুখের পানে চেয়ে রয়েছে।

আয় বাছা, তুই কোলে ব’সে বল্‌
কী কথা তোর বলিবার আছে,
অভিমানে রাঙা মুখখানি
আন দেখি তুই এ বুকের কাছে।
ধীরে ধীরে আধো আধো বল্‌
কেঁদে কেঁদে ভাঙা ভাঙা কথা,
আমায় যদি না বলিবি তুই
কে শুনিবে শিশু-প্রাণের ব্যথা।

নিশীথজগৎ

জন্মেছি নিশীথে আমি, তারার আলোকে
রয়েছি বসিয়া।
চারি দিকে নিশীথিনী মাঝে মাঝে হু হু করি
উঠিছে শ্বসিয়া।
পশ্চিমে করেছে মেঘ, নিবিড় মেঘের প্রান্তে
স্ফুরিছে দামিনী,
দুঃস্বপ্ন ভাঙিয়া যেন শিহরি মেলিছে আঁখি
চকিত যামিনী।
আঁধারে অরণ্যভূমি নয়ন মুদিয়া
করিতেছে ধ্যান,
অসীম আঁধার নিশা আপনার পানে চেয়ে
হারায়েছে জ্ঞান।
মাথার উপর দিয়া উড়িছে বাদুড়,
কাঁদিছে পেচক—
একেলা রয়েছি বসি, চেয়ে শূন্য-পানে,
না পড়ে পলক।

আঁধারের প্রাণী যত ভূমিতলে হাত দিয়া
ঘুরিয়া বেড়ায়—
চোখে উড়ে পড়ে ধুলা, কোন্‌খানে কী যে আছে
দেখিতে না পায়।
চরণে বাধিছে বাধা, পাষাণে বাজিছে মাথা,
কাঁদিছে বসিয়া—
অগ্নিহাসি উপহাসি উল্কা-অভিশাপশিখা
পড়িছে খসিয়া।
তাদের মাথার 'পরে সীমাহীন অন্ধকার
স্তব্ধ গগনেতে,
আঁধারের ভারে যেন নুইয়া পড়িছে মাথা
মাটির পানেতে।
নড়িলে গাছের পাতা চকিতে চমকি উঠে,
চায় চারি ধারে—
ঘোর আঁধারের মাঝে কোথা কী লুকায়ে আছে
কে বলিতে পারে।

গহন বনের মাঝে চলিয়াছে শিশু
মার হাত ধরে,
মুহূর্ত ছেড়েছে হাত, পড়েছে পিছায়ে
খেলাবার তরে—
অমনি হারায়ে পথ কেঁদে ওঠে শিশু,
ডাকে "মা মা" বলে—

"আয় মা, আয় মা, আয়, কোথা চলে গেলি,
মোরে নে মা কোলে।"
মা অমনি চমকিয়া "বাছা বাছা" বলে ছোটে,
দেখিতে না পায়—
শুধু সেই অন্ধকারে "মা মা" ধ্বনি পশে কানে,
চারি দিকে চায়।

সহসা সমুখ দিয়া কে গেল ছায়ার মতো,
লাগিল তরাস,
কে জানে সহসা যেন কোথা কোন্ দিক হতে
শুনি দীর্ঘশ্বাস।
কে বসে রয়েছে পাশে? কে ছুঁইল দেহ মোর
হিমহস্তে তার?
ও কী ও? এ কী রে শুনি! কোথা হতে উঠিল রে
ঘোর হাহাকার?
ও কী হোথা দেখা যায়—ওই দূরে অতি দূরে
ও কিসের আলো?
ও কী ও উড়িছে শূন্যে দীর্ঘ নিশাচর পাখি?
মেঘ কালো কালো?

এই আঁধারের মাঝে কত-না অদৃশ্য প্রাণী
কাঁদিছে বসিয়া—
নীরবে টুটিছে প্রাণ, চাহিছে তারার পানে
অরণ্যে পশিয়া।
কেহ বা রয়েছে শুয়ে দগ্ধ হৃদয়ের 'পরে
স্মৃতিরে জড়ায়ে—
কেহ না দেখিছে তারে, অন্ধকারে অশ্রুধারা
পড়িছে গড়ায়ে।
কেহ বা শুনিছে সাড়া, ঊর্ধ্বকণ্ঠে নাম ধরে
ডাকিছে মরণে—
পশিয়া হৃদয়-মাঝে আশার অঙ্কুরগুলি
দলিছে চরণে।

ও দিকে আকাশ-'পরে মাঝে মাঝে থেকে থেকে
উঠে অট্টহাস,
ঘন ঘন করতালি, উনমাদ কণ্ঠস্বরে
কাঁপিছে আকাশ।
জ্বালিয়া মশাল-আলো নাচিছে গাইছে তারা,
ক্ষণিক উল্লাস—
আঁধার মুহূর্ত-তরে হাসে যথা প্রাণপণে
আলেয়ার হাস।

অরণ্যের প্রান্তভাগে নদী এক চলিয়াছে
বাঁকিয়া বাঁকিয়া—
স্তব্ধ জল, শব্দ নাই, ফণী-সম ফুঁসি উঠে
থাকিয়া থাকিয়া।
আঁধারে চলিতে পান্থ দেখিতে না পায় কিছু,
জলে গিয়া পড়ে,
মুহূর্তের হাহাকার মুহূর্তে ভাসিয়া যায়
খরস্রোতভরে।
সখা তার তীরে বসি একেলা কাঁদিতে থাকে,
ডাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে—
কাহারো না পেয়ে সাড়া শূন্যপ্রাণ প্রতিধ্বনি
কেঁদে ফিরে আসে।

নিশীথের কারাগারে কে বেঁধে রেখেছে মোরে
রয়েছি পড়িয়া—
কেবল রয়েছি বেঁচে স্বপন কুড়ায়ে লয়ে
ভাঙিয়া গড়িয়া।
আঁধারে নিজের পানে চেয়ে দেখি, ভালো করে
দেখিতে না পাই—
হৃদয়ে অজানা দেশে পাখি গায়, ফুল ফোটে,
পথ জানি নাই।
অন্ধকারে আপনারে দেখিতে না পাই যত
তত ভালোবাসি,
তত তারে বুকে করে বাহুতে বাঁধিয়া লয়ে
হরষেতে ভাসি।
তত যেন মনে হয় পাছে রে চলিতে পথে
তৃণ ফুটে পায়,
যতনের ধন পাছে চমকি কাঁদিয়া ওঠে
কুসুমের ঘায়!
সদা হয় অবিশ্বাস কারেও চিনি না হেথা,
সবি অনুমান,
ভালোবেসে কাছে গেলে দূরে চলে যায় সবে,
ভয়ে কাঁপে প্রাণ।
গোপনেতে অশ্রু ফেলে মুছে ফেলে, পাছে কেহ
দেখিবারে পায়—
মরমের দীর্ঘশ্বাস মরমে রুধিয়া রাখে,
পাছে শোনা যায়।

সখারে কাঁদিয়া বলে—"বড়ো সাধ যায় সখা,
দেখি ভালো করে!
তুই শৈশবের বঁধু, চিরজন্ম কেটে গেল
দেখিনু না তোরে!

বুঝি তুমি দূরে আছ, একবার কাছে এসে
দেখাও তোমায়।”
সে অমনি কেঁদে বলে—“আপনারে দেখি নাই,
কী দেখাব হায়।”

অন্ধকার ভাগ করি, আঁধারের রাজ্য লয়ে
চলিছে বিবাদ।
সখারে বধিছে সখা, সন্তানে হানিছে পিতা—
ঘোর পরমাদ।
মৃতদেহ পড়ে থাকে, শকুনি বিবাদ করে
কাছে ঘুরে ঘুরে।
মাংস লয়ে টানাটানি, করিতেছে হানাহানি
শৃগালে কুকুরে।
অন্ধকার ভেদ করি অহরহ শুনা যায়
আকুল বিলাপ—
আহতের আর্তস্বর, হিংসার উল্লাসধ্বনি,
ঘোর অভিশাপ।

মাঝে মাঝে থেকে থেকে কোথা হতে ভেসে আসে
ফুলের সুবাস—
প্রাণ যেন কেঁদে ওঠে, অশ্রুজলে ভাসে আঁখি,
উঠে রে নিশ্বাস।
চারি দিক ভুলে যাই, প্রাণে যেন জেগে ওঠে
স্বপন-আবেশ—
কোথা রে ফুটেছে ফুল, আঁধারের কোন্ তীরে
কোথা কোন্ দেশ!

রুদ্ধপ্রাণ ক্ষুদ্র প্রাণী, রুদ্ধ প্রাণীদের সাথে
কত রে রহিব—
ছোটো ছোটো সুখ দুখ, ছোটো ছোটো আশাগুলি
পুষিয়া রাখিব!

নিদ্রাহীন আঁখি মেলি পূরব-আকাশ-পানে
রয়েছি চাহিয়া—
কবে রে প্রভাত হবে, আনন্দে বিহঙ্গগুলি
উঠিবে গাহিয়া।

ওই যে পূরবে হেরি অরুণ-কিরণে সাজে
মেঘ-মরীচিকা।
না রে না, কিছুই নয়—পূরব শ্মশানে উঠে
চিতানলশিখা।

নিশীথচেতনা

স্তব্ধ বাদুড়ের মতো জড়ায়ে অযুত শাখা
দলে দলে অন্ধকার ঘুমায় মুদিয়া পাখা।
মাঝে মাঝে পা টিপিয়া বহিছে নিশীথবায়,
গাছে নড়ে ওঠে পাতা, শব্দটুকু শোনা যায়।
আকাশের পানে চেয়ে জাগিয়া রয়েছি বসি,
মাঝে মাঝে দুয়েকটি তারা পড়িতেছে খসি।
ঘুমাইছে পশুপাখি, বসুন্ধরা অচেতনা—
শুধু এবে দলে দলে আঁধারের তলে তলে
আকাশ করিয়া পূর্ণ স্বপ্ন করে আনাগোনা।

স্বপ্ন করে আনাগোনা! কোথা দিয়ে আসে যায়!
আঁধার আকাশ-মাঝে আঁখি চারি দিকে চায়।
মনে হয় আসিতেছে শত স্বপ্ন নিশাচরী
আকাশের পার হতে, আঁধার ফেলিছে ভরি।
চারি দিকে ভাসিতেছে চারি দিকে হাসিতেছে,
এ উহারে ডাকিতেছে আকাশের পানে চেয়ে—
বলিতেছে, "আয় বোন, আয় তোরা আয় ধেয়ে।"
হাতে হাতে ধরি ধরি নাচে যত সহচরী,
চমকি ছুটিয়া যায় চপলা মায়ার মেয়ে।
যেন মোর কাছ দিয়ে এই তারা গেল চলে,
কেহ বা মাথায় মোর, কেহ বা আমার কোলে।
কেহ বা মারিছে উঁকি হৃদয়-মাঝারে পশি,
আঁখির পাতার 'পরে কেহ বা দুলিছে বসি।
মাথার উপর দিয়া কেহ বা উড়িয়া যায়,
নয়নের পানে মোর কেহ বা ফিরিয়া চায়।
এখনি শুনিব যেন অতি মৃদু পদধ্বনি,
ছোটো ছোটো নূপুরের অতি মৃদু রনরনি।
রয়েছি চকিত হয়ে আঁখির নিমেষ ভুলি—
এখনি দেখিব যেন স্বপ্নমুখী ছায়াগুলি।

অয়ি স্বপ্ন মোহময়ী, দেখা দাও একবার।
কোথা দিয়ে আসিতেছ, কোথা দিয়ে চলিতেছ,
কোথা গিয়ে পশিতেছ বড়ো সাধ দেখিবার।
আঁধার পরানে পশি সারা রাত করি খেলা
কোন্‌খানে কোন্ দেশে পালাও সকালবেলা!
অরুণের মুখ দেখে কেন এত হয় লাজ—
সারা দিন কোথা বসে না জানি কী কর কাজ।
ঘুম-ঘুম আঁখি মেলি তোমরা স্বপনবালা,
নন্দনের ছায়ে বসি শুধু বুঝি গাঁথ মালা।
শুধু বুঝি গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ গান কর,

আপনার গান শুনে আপনি ঘুমায়ে পড়।

আজি এই রজনীতে অচেতন চারি ধার—
এই আবরণ ঘোর ভেদ করি মন মোর
স্বপনের রাজ্য-মাঝে দাঁড়া দেখি একবার!
নিদ্রার সাগরজলে মহা-আঁধারের তলে
চারি দিকে প্রসারিত এ কী এ নূতন দেশ—
একত্রে স্বরগ-মর্ত্য, নাহিকো দিকের শেষ।
কী যে যায় কী যে আসে চারি দিকে আশেপাশে—
কেহ কাঁদে কেহ হাসে, কেহ থাকে কেহ যায়!
মিশিতেছে, ফুটিতেছে, গড়িতেছে, টুটিতেছে,
অবিশ্রাম লুকাচুরি—আঁখি না সন্ধান পায়।
কত আলো কত ছায়া, কত আশা কত মায়া,
কত ভয় কত শোক, কত কী যে কোলাহল—
কত পশু কত পাখি, কত মানুষের দল।
উপরেতে চেয়ে দেখো কী প্রশান্ত বিভাবরী—
নিশ্বাস পড়ে না, যেন জগৎ রয়েছে মরি।
একবার করো মনে আঁধারের সংগোপনে
কী গভীর কলরব, চেতনার ছেলেখেলা,
সমস্ত জগৎ ব্যেপে স্বপনের মহামেলা!
মনে মনে ভাবি তাই এও কি নহে রে ভাই,
চৌদিকে যা-কিছু দেখি জাগিয়া সকালবেলা,
এও কি নহে রে শুধু চেতনার ছেলেখেলা!

স্বপ্ন, তুমি এসো কাছে, মোর মুখপানে চাও,
তোমার পাখার 'পরে মোরে তুলে লয়ে যাও।
হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে ভ্রমি মোরা সারা নিশি
প্রাণে প্রাণে খেলাইয়া প্রভাতে যাইব মিশি।
ওই যে মায়ের কোলে মেয়েটি ঘুমায়ে আছে,
একবার নিয়ে যাও ওদের প্রাণের কাছে।
দেখিব কোমল প্রাণে সুখের প্রভাতহাসি
সুধায় ভরিয়া প্রাণ কেমনে বেড়ায় ভাসি।
ওই যে প্রেমিক দুটি কুসুমকাননে শুয়ে
ঘুমাইছে মুখে মুখে চরণে চরণ থুয়ে,
ওদের প্রাণের ছায়ে বসিতে গিয়েছে সাধ—
মায়া করি ঘটাইব বিরহের পরমাদ।
ঘুমন্ত আঁখির কোণে দেখা দিবে আঁখিজল,
বিরহবিলাপগানে ছাইবে মরমতল।
সহসা উঠিবে জাগি, চমকি শিহরি কাঁপি
দ্বিগুণ আদরে পুন বুকেতে ধরিবে চাপি।
ছোটো দুটি শিশু ভাই ঘুমাইছে গলাগলি,
তাদের হৃদয়-মাঝে আমরা যাইব চলি।

কুসুমকোমল হিয়া কভু বা দুলিবে ভয়ে,
রবির কিরণে কভু হাসিবে আকুল হয়ে।

আমি যদি হইতাম স্বপনবাসনাময়
কত বেশ ধরিতাম, কত দেশ ভ্রমিতাম,
বেড়াতেম সাঁতারিয়া ঘুমের সাগরময়।
নীরব চন্দ্রমা-তারা, নীরব আকাশ-ধরা—
আমি শুধু চুপি চুপি ভ্রমিতাম বিশ্বময়।
প্রাণে প্রাণে রচিতাম কত আশা কত ভয়—
এমন করুণ কথা প্রাণে আসিতাম কয়ে,
প্রভাতে পুরবে চাহি ভাবিত তাহাই লয়ে।
জাগিয়া দেখিত যারে বুকেতে ধরিত তারে,
যতনে মুছায়ে দিত ব্যথিতের অশ্রুজল,
মুমূর্ষু প্রেমের প্রাণ পাইত নূতন বল।

ওরে স্বপ্ন, আমি যদি স্বপন হতেম হায়,
যাইতাম তার প্রাণে যে মোরে ফিরে না চায়।
প্রাণে তার ভ্রমিতাম, প্রাণে তার গাহিতাম,
প্রাণে তার খেলাতেম অবিরাম নিশি নিশি।
যেমনি প্রভাত হত আলোকে যেতাম মিশি।
দিবসে আমার কাছে কভু সে খোলে না প্রাণ,
শোনে না আমার কথা, বোঝে না আমার গান।
মায়ামন্ত্রে প্রাণ তার গোপনে দিতাম খুলি,
বুঝায়ে দিতেম তারে এই মোর গানগুলি।
পরদিন দিবসেতে যাইতাম কাছে তার,
তা হলে কি মুখপানে চাহিত না একবার?

রবীন্দ্রনাথ। ১৮৮১

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

উৎসর্গ

ভানুসিংহের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুমি আমাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলে। তখন সে অনুরোধ পালন করি নাই। আজ ছাপাইয়াছি, আজ তুমি আর দেখিতে পাইলে না।

সূচনা

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় পর্যায়ক্রমে বৈষ্ণব পদাবলী প্রকাশের কাজে যখন নিযুক্ত হয়েছিলেন আমার বয়স তখন যথেষ্ট অল্প। সময়নির্ণয় সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা তখনো ছিল, এখনো আছে। সেই কারণে চিঠিতে আমার তারিখকে যাঁরা ঐতিহাসিক বলে ধরে নেন তাঁরা প্রায়ই ঠকেন। বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের কাল অনুমান করা অনেকটা সহজ। বোম্বাইয়ে মেজদাদার কাছে যখন গিয়েছিলুম তখন আমার বয়স ষোলোর কাছাকাছি, বিলাতে যখন গিয়েছি তখন আমার বয়স সতেরো। নূতন-প্রকাশিত পদাবলী নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, সে আরো কিছুকাল পূর্বের কথা। ধরে নেওয়া যাক, তখন আমি চোদ্দয় পা দিয়েছি। খণ্ড খণ্ড পদাবলীগুলি প্রকাশ্যে ভোগ করবার যোগ্যতা আমার তখন ছিল না। অথচ আমাদের বাড়িতে আমিই একমাত্র তার পাঠক ছিলুম। দাদাদের ডেস্ক্ থেকে যখন সেগুলি অন্তর্ধান করত তখন তাঁরা তা লক্ষ্য করতেন না।

পদাবলীর যে ভাষাকে ব্রজবুলি বলা হত আমার কৌতূহল প্রধানত ছিল তাকে নিয়ে। শব্দতত্ত্বে আমার ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। টীকায় যে শব্দার্থ দেওয়া হয়েছিল তা আমি নির্বিচারে ধরে নিই নি। এক শব্দ যতবার পেয়েছি তার সমুচ্চয় তৈরি করে যাচ্ছিলুম। একটি ভালো বাঁধানো খাতা শব্দে ভরে উঠেছিল। তুলনা করে আমি অর্থ নির্ণয় করেছি। পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপতির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন আমার খাতা তিনি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই খাতা তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে ফিরে পাবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারি নি। যদি ফিরে পেতুম তা হলে দেখাতে পারতুম কোথাও কোথাও যেখানে তিনি নিজের ইচ্ছামতো মানে করেছেন ভুল করেছেন। এটা আমার নিজের মত।

তার পরের সোপানে ওঠা গেল পদাবলীর জালিয়াতিতে। অক্ষয়বাবুর কাছে শুনেছিলুম বালক কবি চ্যাটার্টনের গল্প। তাঁকে নকল করবার লোভ হয়েছিল। এ কথা মনেই ছিল না যে, ঠিকমত নকল করতে হলেও, শুধু ভাষায় নয়, ভাবে খাঁটি হওয়া চাই। নইলে কথার গাঁথনিটা ঠিক হলেও সুরে তার ফাঁকি ধরা পড়ে। পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয়, তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না। তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই। এইজন্যে ভানুসিংহের পদাবলী বহুকাল সংকোচের সঙ্গে বহন করে এসেছি। একে সাহিত্যের একটা অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত বলেই গণ্য করি।

প্রথম গানটি লিখেছিলুম একটা স্লেটের উপরে, অন্তঃপুরের কোণের ঘরে—

গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে।

মনে বিশ্বাস হল চ্যাটার্টনের চেয়ে পিছিয়ে থাকব না।

এ কথা বলে রাখি ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা। তাদের মধ্যে ভালোমন্দ সমান দরের নয়।

১১।৭।৪০
শান্তিনিকেতন

১

বসন্ত আওল রে!
মধুকর গুন গুন, অমুয়ামঞ্জরী
কানন ছাওল রে।
শুন শুন সজনী হৃদয় প্রাণ মম
হরখে আকুল ভেল,
জর জর রিঝসে দুখ জ্বালা সব
দূরে দূরে চলি গেল।
মরমে বহই বসন্তসমীরণ,
মরমে ফুটই ফুল,
মরমকুঞ্জ'পর বোলই কুহু কুহু
অহরহ কোকিলকুল।
সখি রে উছসত প্রেমভরে অব
ঢলঢল বিহ্বল প্রাণ,
নিখিল জগত জনু হরখভোর ভই
গায় রভসরসগান।
বসন্তভূষণভূষিত ত্রিভুবন
কহিছে, দুখিনী রাধা,
কঁহি রে সো প্রিয়, কঁহি সো প্রিয়তম,
হৃদিবসন্ত সো মাধা?
ভানু কহত, অতি গহন রয়ন অব,
বসন্তসমীরশ্বাসে
মোদিত বিহ্বল চিত্তকুঞ্জতল
ফুল্ল বাসনা-বাসে।

২

শুনহ শুনহ বালিকা,
রাখ কুসুমমালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহি রে।
দুলই কুসুমমুঞ্জরী,
ভমর ফিরই গুঞ্জরি,
অলস যমুনা বহয়ি যায় ললিত গীত গাহি রে।
শশিসনাথ যামিনী,
বিরহবিধুর কামিনী,
কুসুমহার ভইল ভার—হৃদয় তার দাহিছে।

অধর উঠই কাঁপিয়া
সখিকরে কর আপিয়া,
কুঞ্জভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে।
মৃদু সমীর সঞ্চলে
হরয়ি শিথিল অঞ্চলে,
চকিত হৃদয় চঞ্চলে কাননপথ চাহি রে।
কুঞ্জপানে হেরিয়া
অশ্রুবারি ডারিয়া
ভানু গায় শূন্যকুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহি রে!

৩

হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে,
কণ্ঠে বিমলিন মালা।
বিরহবিষে দহি বহি গল রয়নী,
নহি নহি আওল কালা।
বুঝনু বুঝনু সখি বিফল বিফল সব,
বিফল এ পীরিতি লেহা—
বিফল রে এ মঝু জীবন যৌবন,
বিফল রে এ মঝু দেহা!
চল সখি গৃহ চল, মুঞ্চ নয়নজল,
চল সখি চল গৃহকাজে।
মালতিমালা রাখহ বালা,
ছি ছি সখি মরু মরু লাজে।
সখি লো দারুণ আধিভরাতুর
এ তরুণ যৌবন মোর,
সখি লো দারুণ প্রণয়হলাহল
জীবন করল অঘোর।
তৃষিত প্রাণ মম দিবসযামিনী
শ্যামক দরশন আশে,
আকুল জীবন থেহ ন মানে,
অহরহ জ্বলত হুতাশে।
সজনি, সত্য কহি তোয়,
খোয়াব কব হম শ্যামক প্রেম
সদা ডর লাগয়ে মোয়।
হিয়ে হিয়ে অব রাখত মাধব,
সো দিন আসব সখি রে—
বাত ন বোলবে, বদন ন হেরবে,
মরিব হলাহল ভখি রে।

ঐস বৃথা ভয় না কর বালা,
ভানু নিবেদয় চরণে,
সুজনক পীরিতি নৌতুন নিতি নিতি,
নহি টুটে জীবনমরণে।

৪

শ্যাম রে, নিপট কঠিন মন তোর।
বিরহ সাথি করি সজনী রাধা
রজনী করত হি ভোর।
একলি নিরল বিরল পর বৈঠত
নিরখত যমুনা-পানে,
বরখত অশ্রু, বচন নহি নিকসত,
পরান থেহ ন মানে।
গহন তিমির নিশি ঝিল্লিমুখর দিশি
শূন্য কদম তরুমূলে,
ভূমিশয়ন'পর আকুল কুন্তল,
কাঁদই আপন ভূলে।
মুগধ মৃগীসম চমকি উঠই কভু
পরিহরি সব গৃহকাজে
চাহি শূন্য-'পর কহে করুণস্বর—
বাজে রে বাঁশরি বাজে।
নিঠুর শ্যাম রে, কৈসন অব তুঁহু
রহই দূর মথুরায়—
রয়ন নিদারুণ কৈসন যাপসি,
কৈস দিবস তব যায়!
কৈস মিটাওসি প্রেমপিপাসা,
কঁহা বজাওসি বাঁশি?
পীতবাস তুঁহু কথি রে ছোড়লি,
কথি সো বঙ্কিম হাসি?
কনকহার অব পহিরলি কণ্ঠে,
কথি ফেকলি বনমালা?
হৃদিকমলাসন শূন্য করলি রে,
কনকাসন কর আলা!
এ দুখ চিরদিন রহল চিত্তমে,
ভানু কহে, ছি ছি কালা!
ঝটিতি আও তুঁহু হমারি সাথে,
বিরহব্যাকুলা বালা।

৫

সজনি সজনি রাধিকা লো
দেখ অবহুঁ চাহিয়া,
মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া।
পিনহ ঝটিত কুসুমহার,
পিনহ নীল আঙিয়া।
সুন্দরি সিন্দুর দেকে
সীঁথি করহ রাঙিয়া।
সহচরি সব, নাচ নাচ
মিলনগীতি গাও রে,
চঞ্চল মঞ্জীর-রাব
কুঞ্জগগন ছাও রে।
সজনি অব উজার মঁদির
কনকদীপ জ্বালিয়া,
সুরভি করহ কুঞ্জভবন
গন্ধসলিল ঢালিয়া।
মল্লিকা চমেলী বেলি
কুসুম তুলহ বালিকা,
গাঁথ যূথি, গাঁথ জাতি,
গাঁথ বকুলমালিকা।
তৃষিতনয়ন ভানুসিংহ
কুঞ্জপথম চাহিয়া—
মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া।

৬

বঁধুয়া, হিয়া 'পর আও রে,
মিঠি মিঠি হাসয়ি, মৃদু মধু ভাষয়ি,
হমার মুখ 'পর চাও রে!
যুগযুগসম কত দিবস বহয়ি গল,
শ্যাম তু আওলি না,
চন্দ্র-উজর মধু-মধুর কুঞ্জ'পর
মুরলি বজাওলি না!
লয়ি গলি সাথ বয়ানক হাস রে,
লয়ি গলি নয়নআনন্দ!
শূন্য কুঞ্জবন, শূন্য হৃদয়মন,
কঁহি তব ও মুখচন্দ?

ইথি ছিল আকুল গোপনয়নজল,
কথি ছিল ও তব হাসি?
ইতি ছিল নীরব বংশীবটতট,
কথি ছিল ও তব বাঁশি?
তুঝ মুখ চাহয়ি শতযুগভর দুখ
নিমিখে ভেল অবসান।
লেশ হাসি তুঝ দূর করল রে
সকল মানঅভিমান।
ধন্য ধন্য রে ভানু গাহিছে—
প্রেমক নাহিক ওর।
হরখে পুলকিত জগতচরাচর
দুঁহুক প্রেমরস ভোর।

৭

শুন সখি, বাজত বাঁশি
গভীর রজনী, উজল কুঞ্জপথ,
চন্দ্রম ডারত হাসি।
দক্ষিণপবনে কম্পিত তরুগণ,
তম্ভিত যমুনাবারি,
কুসুমসুবাস উদাস ভইল, সখি,
উদাস হৃদয় হমারি।
বিগলিত মরম, চরণ খলিতগতি,
শরম ভরম গয়ি দূর,
নয়ন বারিভর, গরগর অন্তর,
হৃদয় পুলকপরিপূর।
কহ সখি, কহ সখি, মিনতি রাখ সখি,
সো কি হমারই শ্যাম?
মধুর কাননে মধুর বাঁশরি
বজায় হমারি নাম?
কত কত যুগ সখি, পুণ্য করনু হম,
দেবত করনু ধেয়ান,
তব ত মিলল সখি, শ্যামরতন মম,
শ্যাম পরানক প্রাণ।
শ্যাম রে,
শুনত শুনত তব মোহন বাঁশি,
জপত জপত তব নামে,
সাধ ভইল ময় দেহ ডুবায়ব
চাঁদউজল যমুনামে!

'চলহ তুরিত গতি শ্যাম চকিত অতি,
ধরহ সখীজন হাত,
নীদমগন মহী, ভয় ডর কছু নাহি,
ভানু চলে তব সাথ।'

৮

গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস-লোকলাজে
সজনি, আও আও লো।
অঙ্গে চারু নীল বাস,
হৃদয়ে প্রণয়কুসুমরাশ,
হরিণনেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জবনমে আও লো॥
ঢালে কুসুম সুরভভার,
ঢালে বিহগ সুরবসার,
ঢালে ইন্দু অমৃতধার
বিমল রজত ভাতি রে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি, পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথি জাতি রে॥
দেখ সজনি, শ্যামরায়
নয়নে প্রেম উথল যায়,
মধুর বদন অমৃতসদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে।
আও আও সজনিবৃন্দ,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ
ভানুসিংহ বন্দিছে॥

৯

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী,
শূন্য নিকুঞ্জঅরণ্য।
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহবিষণ্ণ!

নীল আকাশে তারক ভাসে,
যমুনা গাওত গান,
পাদপ মরমর, নির্ঝর ঝরঝর,
কুসুমিত বল্লিবিতান।
তৃষিত নয়ানে বন-পথ পানে
নিরখে ব্যাকুল বালা,
দেখ না পাওয়ে, আঁখ ফিরাওয়ে,
গাঁথে বনফুলমালা।
সহসা রাধা চাহল সচকিত,
দূরে খেপল মালা,
কহল—সজনি শুন, বাঁশরি বাজে,
কুঞ্জে আওল কালা।
চকিত গহন নিশি, দূর দূর দিশি
বাজত বাঁশি সুতানে।
কণ্ঠ মিলাওল ঢলঢল যমুনা
কল কল কল্লোলগানে।
ভণে ভানু, অব শুন গো কানু,
পিয়াসিত গোপিনী প্রাণ।
তোঁহার পীরিত বিমল অমৃতরস
হরষে করবে পান।

১০

বজাও রে মোহন বাঁশি।
সারা দিবসক বিরহদহনদুখ,
মরমক তিয়াষ নাশি।
রিঝমনভেদন বাঁশরিবাদন
কঁহা শিখলি রে কান?
হানে থিরথির মরমঅবশকর
লহু লহু মধুময় বাণ।
ধসধস করতহ উরহ বিয়াকুলু,
ঢুলু ঢুলু অবশনয়ান;
কত কত বরষক বাত সোঁয়ারয়,
অধীর করয় পরান।
কত শত আশা পূরল না বঁধু,
কত সুখ করল পয়ান।
পহু গো, কত শত পীরিতযাতন
হিয়ে বিঁধাওল বাণ।
হৃদয় উদাসয়, নয়ন উছাসয়
দারুণ মধুময় গান!

সাধ যায়, বঁধু, যমুনাবারিম
ডারিব দগধপরান।
সাধ যায়, পহু, রাখি চরণ তব
হৃদয়মাঝ, হৃদয়েশ,
হৃদয়জুড়াওন বদনচন্দ্র তব
হেরব জীবনশেষ।
সাধ যায়, ইহ চন্দ্রমাকিরণে
কুসুমিত কুঞ্জবিতানে
বসন্তবায়ে প্রাণ মিশায়ব
বাঁশিক সুমধুর গানে।
প্রাণ ভৈবে মঝু বেণুগীতময়,
রাধাময় তব বেণু।
জয় জয় মাধব, জয় জয় রাধা,
চরণে প্রণমে ভানু।

১১

আজু সখি, মুহু মুহু
গাহে পিক কুহু কুহু,
কুঞ্জবনে দুঁহু দুঁহু
দোঁহার পানে চায়।
যুবনমদবিলসিত
পুলকে হিয়া উলসিত,
অবশ তনু অলসিত
মুরছি জনু যায়।
আজু মধু চাঁদনী
প্রাণউনমাদনী,
শিথিল সব বাঁধনী,
শিথিল ভই লাজ।
বচন মৃদু মরমর
কাঁপে রিঝ থরথর,
শিহরে তনু জরজর
কুসুমবনমাঝ।
মলয় মৃদু কলয়িছে,
চরণ নহি চলয়িছে,
বচন মুহু খলয়িছে,
অঞ্চল লুটায়।
আধফুট শতদল
বায়ুভরে টলমল
আঁখি জনু ঢলঢল
চাহিতে নাহি চায়।

অলকে ফুল কাঁপয়ি
কপোলে পড়ে ঝাঁপয়ি,
মধু-অনলে তাপয়ি
খসয়ি পড়ু পায়।
ঝরই শিরে ফুলদল,
যমুনা বহে কলকল,
হাসে শশি ঢলঢল—
ভানু মরি যায়।

১২

শ্যাম, মুখে তব মধুর অধরমে
হাস বিকশিত কায়?
কোন স্বপন অব দেখত মাধব,
কহবে কোন হমায়!
নীদ-মেঘ'পর স্বপনবিজলিসম
রাধা বিলসত হাসি!
শ্যাম, শ্যাম মম, কৈসে শোধব
তুঁহুক প্রেমঋণরাশি।
বিহঙ্গ, কাহ তু বোলন লাগলি?
শ্যাম ঘুমায় হমারা!
রহ রহ চন্দ্রম, ঢাল ঢাল তব
শীতল জোছনধারা।
তারকমালিনী সুন্দর যামিনী
অবহুঁ ন যাও রে ভাগি।
নিরদয় রবি, অব কাহ তু আওলি,
জ্বাললি বিরহক আগি।
ভানু কহত—অব রবি অতি নিষ্ঠুর
নলিন-মিলন অভিলাষে
কত নরনারীক মিলন টুটাওত,
ডারত বিরহহুতাশে।

১৩

সজনি গো,
শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা,
নিশীথযামিনী রে।
কুঞ্জপথে, সখি, কৈসে যাওব
অবলা কামিনী রে।

উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত,
ঘন ঘন গর্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুত, পথতরু লুণ্ঠত,
থরহর কম্পত দেহ।
ঘন ঘন রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্
বরখত নীরদপুঞ্জ।
ঘোর গহন ঘন তালতমালে
নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।
বোল ত সজনী, এ দুরুযোগে
কুঞ্জে নিরদয় কান
দারুণ বাঁশি কাহ বজায়ত
সকরুণ রাধা নাম।

সজনি,
মোতিম হারে বেশ বনা দে,
সীঁথি লগা দে ভালে।
উরহি বিলোলিত শিথিল চিকুর মম
বাঁধহ মালত মালে
খোল দুয়ার ত্বরা করি সখি রে,
ছোড় সকল ভয়লাজে—
হৃদয় বিহগসম ঝটপট করত হি
পঞ্জরপিঞ্জরমাঝে।
গহন রয়নমে ন যাও বালা
নওলকিশোরক পাশ—
গরজে ঘন ঘন, বহু ডর পাওব,
কহে ভানু তব দাস।

১৪

বাদরবরখন নীরদগরজন
বিজুলী চমকন ঘোর,
উপেখই কৈছে আও তু কুঞ্জে
নিতি নিতি, মাধব মোর।
ঘন ঘন চপলা চমকয় যব পহু,
বজরপাত যব হোয়,
তুঁহুক বাত তব সমরয় প্রিয়তম,
ডর অতি লাগত মোয়।
অঙ্গবসন তব ভীঁখত মাধব,
ঘন ঘন বরখত মেহ—
ক্ষুদ্র বালি হম, হমকো লাগয়
কাহ উপেখবি দেহ?

বইস বইস পহু, কুসুমশয়ন 'পর
পদযুগ দেহ পসারি—
সিক্ত চরণ তব মোছব যতনে—
কুন্তলভার উঘারি।
শ্রান্ত অঙ্গ তব হে ব্রজসুন্দর,
রাখ বক্ষ-'পর মোর,
তনু তব ঘেরব পুলকিত পরশে
বাহুমৃণালক ডোর।
ভানু কহে, বৃকভানুনন্দিনী,
প্রেমসিন্দু মম কালা,
তোঁহার লাগয়, প্রেমক লাগয়
সব কছু সহবে জ্বালা।

১৫

মাধব, না কহ আদরবাণী,
না কর প্রেমক নাম।
জানয়ি মুঝকো অবলা সরলা
ছলনা না কর শ্যাম।
কপট, কাহ তুঁহু ঝুট বোলসি,
পীরিত করসি তু মোয়?
ভালে ভালে হম অলপে চিহ্নু,
না পতিয়াব রে তোয়।
ছিদল তরী-সম কপট প্রেম'পর
ডারনু যব মনপ্রাণ,
ডুবনু ডুবনু রে ঘোর সায়রে
অব কুত নাহিক ত্রাণ।
মাধব, কঠোর বাত হমারা
মনে লাগল কি তোর?
মাধব, কাহ তু মলিন করলি মুখ,
ক্ষমহ গো কুবচন মোর!
নিদয় বাত অব কবহুঁ ন বোলব,
তুঁহু মম প্রাণক প্রাণ।
অতিশয় নির্মম ব্যথিনু হিয়া তব
ছোড়য়ি কুবচনবাণ।
মিটল মান অব—ভানু হাসতহি
হেরই পীরিতলীলা।
কভু অভিমানিনী, আদরিণী কভু
পীরিতিসাগর বালা।

১৬

সখি লো, সখি লো, নিকরুণ মাধব
মথুরাপুর যব যায়
করল বিষম পণ মানিনী রাধা,
রোয়বে না সো, না দিবে বাধা—
কঠিনহিয়া সই, হাসয়ি হাসয়ি
শ্যামক করব বিদায়।
মৃদু মৃদু গমনে আওল মাধা,
বয়নপান তছু চাহল রাধা,
চাহয়ি রহল স চাহয়ি রহল,
দণ্ড দণ্ড সখি, চাহয়ি রহল,
মন্দ মন্দ সখি, নয়নে বহল
বিন্দু বিন্দু জলধার।
মৃদু মৃদু হাসে বৈঠল পাশে,
কহল শ্যাম কত মৃদু মধু ভাষে,
টুটয়ি গইল পণ, টুটইল মান,
গদগদ আকুলব্যাকুলপ্রাণ
ফুকরয়ি উছসয়ি কাঁদল রাধা,
গদগদ ভাষ নিকাশল আধা,
শ্যামক চরণে বাহু পসারি,
কহল—শ্যাম রে, শ্যাম হমারি,
রহ তুঁহু, রহ তুঁহু, বঁধু গো, রহ তুঁহু,
অনুখন সাথ সাথ রে রহ পঁহু,
তুঁহু বিনে মাধব, বল্লভ, বান্ধব,
আছয় কোন হমার!
পড়ল ভূমি'পর শ্যামচরণ ধরি,
রাখল মুখ তছু শ্যামচরণ'পরি,
উছসি উছসি কত কাঁদয়ি কাঁদয়ি
রজনী করল প্রভাত।
মাধব বৈসল, মৃদু মধু হাসল,
কত অশোয়াসবচন মিঠ ভাষল,
ধরইল বালিক হাত।
সখি লো, সখি লো, বোল ত সখি লো,
যত দুখ পাওল রাধা
নিঠুর শ্যাম কিয়ে আপন মনমে
পাওল তছু কছু আধা?
হাসয়ি হাসয়ি নিকটে আসয়ি
বহুত স প্রবোধ দেল,
হাসয়ি হাসয়ি পলটয়ি চাহয়ি
দূর দূর চলি গেল।
অব সো মথুরাপুরক পন্থমে,

ইঁহ যব রোয়ত রাধা,
মরমে কি লাগল তিলভর বেদন,
চরণে কি তিলভর বাধা?
বরখি আঁখিজল ভানু কহে—অতি
দুখের জীবন ভাই।
হাসিবার তর সঙ্গ মিলে বহু,
কাঁদিবার কো নাই।

১৭

বার বার সখি, বারণ করনু,
ন যাও মথুরাধাম।
বিসরি প্রেমদুখ রাজভোগ যথি
করত হমারই শ্যাম।
ধিক তুঁহু দাম্ভিক, ধিক রসনা ধিক,
লইলি কাহারই নাম?
বোল ত সজনি, মথুরাঅধিপতি
সো কি হমারই শ্যাম?
ধনকো শ্যাম সো, মথুরাপুরকো,
রাজ্য-মানকো হোয়।
নহ পীরিতিকো, ব্রজকামিনীকো,
নিচয় কহনু ময় তোয়।
যব তুঁহু ঠারবি সো নব নরপতি
জনি রে করে অবমান,
ছিন্নকুসুমসম ঝরব ধরা 'পর,
পলকে খোয়ব প্রাণ।
বিসরল বিসরল সো সব বিসরল
বৃন্দাবন সুখসঙ্গ,
নব নগরে সখি নবীন নাগর
উপজল নব নব রঙ্গ।
ভানু কহত—অয়ি বিরহকাতরা
মনমে বাঁধহ থেহ।
মুগুধা বালা, বুঝই বুঝলি না,
হমার শ্যামক লেহ।

১৮

হম যব না রব সজনী,
নিভৃত বসন্ত-নিকুঞ্জবিতানে
আসবে নির্মল রজনী,

মিলনপিপাসিত আসবে যব সখি
শ্যাম হমারি আশে,
ফুকারবে যব রাধা রাধা
মুরলি উরধ শ্বাসে,
যব সব গোপিনী আসবে ছুটই,
যব হম আসব না,
যব সব গোপিনী জাগবে চমকই,
যব হম জাগব না,
তব কি কুঞ্জপথ হমারি আশে
হেরবে আকুল শ্যাম?
বন বন ফেরই সো কি ফুকারবে
রাধা রাধা নাম?
না যমুনা, সো এক শ্যাম মম,
শ্যামক শত শত নারী—
হম যব যাওব শত শত রাধা
চরণে রহবে তারি।
তব সখি যমুনে, যাই নিকুঞ্জে,
কাহ তয়াগব দে?
হমারি লাগি এ বৃন্দাবনমে,
কহ সখি, রোয়ব কে?
ভানু কহে চুপি—মানভরে রহ,
আও বনে, ব্রজনারী,
মিলবে শ্যামক থরথর আদর
ঝরঝর লোচনবারি।

১৯

মরণ রে,
তুঁহু মম শ্যামসমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজুট,
রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান।
তুঁহু মম শ্যামসমান।
মরণ রে,
শ্যাম তোঁহারই নাম!
চির বিসরল যব নিরদয় মাধব
তুঁহু ন ভইবি মোয় বাম।
আকুল রাধা-রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝরঝর।

তুঁহু মম মাধব, তুঁহু মম দোসর,
তুঁহু মম তাপ ঘুচাও,
মরণ, তু আও রে আও।
ভুজপাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু আসব মোদয়ি,
কোরউপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
নীদ ভরব সব দেহ।
তুঁহু নহি বিসরবি, তুঁহু নহি ছোড়বি,
রাধাহৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয় হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন,
অতুলন তোঁহার লেহ।
দূর সঙে তুঁহু বাঁশি বজাওসি,
অনুখন ডাকসি, অনুখন ডাকসি
রাধা রাধা রাধা!
দিবস ফুরাওল, অবহুঁ ম যাওব,
বিরহতাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব,
কুঞ্জবাট'পর অবহুঁ ম ধাওব,
সব কছু টুটইব বাধা।
গগন সঘন অব, তিমিরমগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘরব,
শালতালতরু সভয় তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর—
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যা'ক' পিয়া তুঁহু কি ভয় তাহারে,
ভয় বাধা সব অভয় মুরতি ধরি,
পন্থ দেখাওব মোর।
ভানুসিংহ কহে—ছিয়ে ছিয়ে রাধা,
চঞ্চল হৃদয় তোহারি,
মাধব পহু মম, পিয় স মরণসে
অব তুঁহু দেখ বিচারি।

২০

কো তুঁহু বোলবি মোয়!
হৃদয়মাহ মঝু জাগসি অনুখন,
আঁখউপর তুঁহু রচলহি আসন,
অরুণ নয়ন তব মরমসঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

হৃদয়কমল তব চরণে টলমল,
নয়নযুগল মম উছলে ছলছল,
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল
চাহে মিলাইতে তোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

বাঁশরিধ্বনি তুহ অমিয় গরল রে,
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে,
আকুল কাকলি ভুবন ভরল রে,
উতল প্রাণ উতরোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল,
চরণকমলযুগ ছোঁয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

গোপবধূজন বিকশিতযৌবন,
পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন,
নীলনীর'পর ধীর সমীরণ,
পলকে প্রাণমন খোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

তৃষিত আঁখি, তব মুখ'পর বিহরই,
মধুর পরশ তব রাধা শিহরই,
প্রেমরতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই
পদতলে অপনা থোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

কো তুঁহু কো তুঁহু সব জন পুছয়ি
অনুদিন সঘন নয়নজল মুছয়ি।
যাচে ভানু— সব সংশয় ঘুচায়ি,
জনম চরণ 'পর গোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

সংযোজন

১

সখিরে—পিরীত বুঝবে কে?
আঁধার হৃদয়ক দুঃখ কাহিনী
বোলব, শুনবে কে?
রাধিকার অতি অন্তর বেদন
কে বুঝবে অয়ি সজনী
কে বুঝবে সখি রোয়ত রাধা
কোন দুখে দিন রজনী?
কলঙ্ক রটায়ব জনি সখি রটাও
কলঙ্ক নাহিক মানি,
সকল তয়াগব লভিতে শ্যামক
একঠো আদর বাণী।
মিনতি করিলো সখি শত শত বার, তু
শ্যামক না দিহ গারি,
শীল মান কুল, অপনি সজনি হম
চরণে দেয়নু ডারি।
সখিলো—
বৃন্দাবনকো দুরুজন মানুখ
পিরীত নাহিক জানে,
বৃথাই নিন্দা কাহ রটায়ত
হমার শ্যামক নামে?
কলঙ্কিনী হম রাধা, সখিলো
ঘৃণা করহ জনি মনমে
ন আসিও তব্ কবহুঁ সজনিলো
হমার আঁধা ভবনমে।
কহে ভানু অব—বুঝবে না সখি
কোহি মরমকো বাত,
বিরলে শ্যামক কহিও বেদন,
বক্ষে রাখয়ি মাথ।

২

হম সখি দারিদ নারী!
জনম অবধি হম পীরিতি করনু
মোচনু লোচন-বারি।
রূপ নাহি মম, কছুই নাহি গুণ
দুখিনী আহির জাতি,

নাহি জানি কছু বিলাস-ভঙ্গিম
যৌবন গরবে মাতি।
অবলা রমণী, ক্ষুদ্র হৃদয় ভরি
পীরিত করনে জানি;
এক নিমিখ পল, নিরখি শ্যাম জনি
সোই বহুত করি মানি।
কুঞ্জ পথে যব নিরখি সজনি হম,
শ্যামক চরণক চীনা,
শত শত বেরি ধূলি চুম্বি সখি,
রতন পাই জনু দীনা।
নিঠুর বিধাতা, এ দুখ-জনমে
মাঙব কি তুয়া পাশ!
জনম অভাগী, উপেখিতা হম,
বহুত নাহি করি আশ,—
দূর থাকি হম রূপ হেরইব,
দূরে শুনইব বাঁশি।
দূর দূর রহি সুখে নিরীখব
শ্যামক মোহন হাসি।
শ্যাম-প্রেয়সি রাধা! সখিলো!
থাক' সুখে চিরদিন!
তুয়া সুখে হম রোয়ব না সখি
অভাগিনী গুণ হীন।
অপন দুখে সখি, হম রোয়ব লো,
নিভৃতে মুছইব বারি।
কোহি ন জানব, কোন বিষাদে
তন-মন দহে হমারি।
ভানু সিংহ ভনয়ে, শুন কালা
দুখিনী অবলা বালা—
উপেখার অতি তিখিনী বাণে
না দিহ না দিহ জ্বালা।

কড়ি ও কোমল

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দাদা মহাশয়

করকমলেষু

কবির মন্তব্য

যৌবন হচ্ছে জীবনে সেই ঋতুপরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কড়ি ও কোমল আমার সেই নবযৌবনের রচনা। আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন যেন প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম। মনে পড়ে তখনকার দিনে নিজের মনের একটা উদ্‌বেল অবস্থা। তখন আমার বেশভূষায় আবরণ ছিল বিরল। গায়ে থাকত ধুতির সঙ্গে কেবল একটা পাতলা চাদর, তার খুঁটোয় বাঁধা ভোরবেলায় তোলা একমুঠো বেলফুল, পায়ে একজোড়া চটি। মনে আছে থ্যাকারের দোকানে বই কিনতে গেছি কিন্তু এর বেশি পরিচ্ছন্নতা নেই, এতে ইংরেজ দোকানদারের স্বীকৃত আদবকায়দার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ হত। এই আত্মবিস্মৃত বেআইনী প্রমত্ততা কড়ি ও কোমলের কবিতায় অবাধে প্রকাশ পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে এই রীতির কবিতা তখনো প্রচলিত ছিল না। সেইজন্যেই কাব্যবিশারদ প্রভৃতি সাহিত্যবিচারকদের কাছ থেকে কটুভাষায় ভর্ৎসনা সহ্য করেছিলুম। সে-সব যে উপেক্ষা করেছি অনায়াসে সে কেবল যৌবনের তেজে। আপনার মধ্যে থেকে যা প্রকাশ পাচ্ছিল, সে আমার কাছেও ছিল নূতন এবং আন্তরিক। তখন হেম বাঁড়ুজ্জে এবং নবীন সেন ছাড়া এমন কোনো দেশপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না যাঁরা নূতন কবিদের কোনো-একটা কাব্যরীতির বাঁধা পথে চালনা করতে পারতেন। কিন্তু আমি তাঁদের সম্পূর্ণই ভুলে ছিলুম। আমাদের পরিবারের বন্ধু কবি বিহারীলালকে ছেলেবেলা থেকে জানতুম এবং তাঁর কবিতার প্রতি অনুরাগ আমার ছিল অভ্যস্ত। তাঁর প্রবর্তিত কবিতার রীতি ইতিপূর্বেই আমার রচনা থেকে সম্পূর্ণ স্খলিত হয়ে গিয়েছিল। বড়োদাদার স্বপ্নপ্রয়াণের আমি ছিলুম অত্যন্ত ভক্ত, কিন্তু তাঁর বিশেষ কবিপ্রকৃতির সঙ্গে আমার বোধ হয় মিল ছিল না, সেইজন্য ভালো লাগা সত্ত্বেও তাঁর প্রভাব আমার কবিতা গ্রহণ করতে পারে নি। তাই কড়ি ও কোমলের কবিতা মনের অন্তঃস্তরের উৎসের থেকে উছলে উঠেছিল। তার সঙ্গে বাহিরের কোনো মিশ্রণ যদি ঘটে থাকে তো সে গৌণভাবে।

এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টি-প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আর প্রথম আমি সেই কথা বলেছি যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বরাবর প্রবাহিত হয়েছে।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,

যা নৈবেদ্যে আর-এক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

কড়ি ও কোমলে যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর-একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উদ্ভব।

৭।১২।৩৯
শান্তিনিকেতন

প্রাণ

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রু-ময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।
হাসিমুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।

পুরাতন

হেথা হতে যাও, পুরাতন!
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।
আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে।
সুনীল আকাশ-'পরে শুভ্র মেঘ থরে থরে
শ্রান্ত যেন রবির আলোকে,
পাখিরা ঝাড়িছে পাখা, কাঁপিছে তরুর শাখা,
খেলাইছে বালিকা বালকে।
সমুখের সরোবরে আলো ঝিকিমিকি করে,
ছায়া কাঁপিতেছে থরথর,
জলের পানেতে চেয়ে ঘাটে বসে আছে মেয়ে,
শুনিছে পাতার মরমর।
কী জানি কত কী আশে চলিয়াছে চারি পাশে
কত লোক কত সুখে দুখে,
সবাই তো ভুলে আছে, কেহ হাসে কেহ নাচে,
তুমি কেন দাঁড়াও সমুখে।
বাতাস যেতেছে বহি, তুমি কেন রহি রহি
তারি মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস।
সুদূরে বাজিছে বাঁশি, তুমি কেন ঢাল আসি
তারি মাঝে বিলাপ-উচ্ছ্বাস।
উঠেছে প্রভাতরবি, আঁকিছে সোনার ছবি,
তুমি কেন ফেল তাহে ছায়া।
বারেক যে চলে যায় তারে তো কেহ না চায়
তবু তার কেন এত মায়া।
তবু কেন সন্ধ্যাকালে জলদের অন্তরালে
লুকায়ে ধরার পানে চায়—
নিশীথের অন্ধকারে পুরানো ঘরের দ্বারে
কেন এসে পুন ফিরে যায়।
কী দেখিতে আসিয়াছ! যাহা কিছু ফেলে গেছ
কে তাদের করিবে যতন!
স্মরণের চিহ্ন যত ছিল পড়ে দিন-কত
ঝরে-পড়া পাতার মতন
আজি বসন্তের বায় একেকটি করে হায়
উড়ায়ে ফেলিছে প্রতিদিন—
ধূলিতে মাটিতে রহি হাসির কিরণে দহি
ক্ষণে ক্ষণে হতেছে মলিন।
ঢাকো তবে ঢাকো মুখ, নিয়ে যাও দুঃখ সুখ,
চেয়ো না চেয়ো না ফিরে ফিরে।

হেথায় আলয় নাহি, অনন্তের পানে চাহি
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে।

নূতন

হেথাও তো পশে সূর্যকর।
ঘোর ঝটিকার রাতে দারুণ অশনিপাতে
বিদীরিল যে গিরিশিখর—
বিশাল পর্বত কেটে পাষাণহৃদয় ফেটে
প্রকাশিল যে ঘোর গহ্বর—
প্রভাতে পুলকে ভাসি বহিয়া নবীন হাসি
হেথাও তো পশে সূর্যকর!
দুয়ারেতে উঁকি মেরে ফিরে তো যায় না সে রে,
শিহরি উঠে না আশঙ্কায়,
ভাঙা পাষাণের বুকে খেলা করে কোন্ সুখে,
হেসে আসে, হেসে চলে যায়।
হেরো হেরো হায় হায়, যত প্রতিদিন যায়—
কে গাঁথিয়া দেয় তৃণজাল।
লতাগুলি লতাইয়া বাহুগুলি বিথাইয়া
ঢেকে ফেলে বিদীর্ণ কঙ্কাল।
বজ্রদগ্ধ অতীতের নিরাশার অতিথের
ঘোর স্তব্ধ সমাধি-আবাস
ফুল এসে, পাতা এসে কেড়ে নেয় হেসে হেসে,
অন্ধকারে করে পরিহাস।

এরা সব কোথা ছিল, কেই বা সংবাদ দিল,
গৃহহারা আনন্দের দল—
বিশ্বে তিল শূন্য হলে অনাহূত আসে চলে,
বাসা বাঁধে করি কোলাহল।
আনে হাসি, আনে গান, আনে রে নূতন প্রাণ,
সঙ্গে করে আনে রবিকর—
অশোক শিশুর প্রায় এত হাসে এত গায়,
কাঁদিতে দেয় না অবসর।
বিষাদ বিশালকায়া ফেলেছে আঁধার ছায়া,
তারে এরা করে না তো ভয়—
চারি দিক হতে তারে ছোটো ছোটো হাসি মারে,
অবশেষে করে পরাজয়।

এই যে রে মরুস্থল, দাবদগ্ধ ধরাতল
এইখানে ছিল 'পুরাতন'—

একদিন ছিল তার শ্যামল যৌবনভার,
ছিল তার দক্ষিণপবন।
যদি রে সে চলে গেল, সঙ্গে যদি নিয়ে গেল
গীত গান হাসি ফুল ফল—
শুষ্ক স্মৃতি কেন মিছে রেখে তবে গেল পিছে,
শুষ্ক শাখা শুষ্ক ফুলদল।
সে কি চায় শুষ্ক বনে গাহিবে বিহঙ্গগণে
আগে তারা গাহিত যেমন।
আগেকার মতো করে স্নেহে তার নাম ধরে
উচ্ছ্বসিবে বসন্তপবন?
নহে নহে, সে কি হয়! সংসার জীবনময়,
নাহি হেথা মরণের স্থান।
আয় রে, নূতন, আয়, সঙ্গে করে নিয়ে আয়
তোর সুখ, তোর হাসি গান।
ফোটা নব ফুলচয়, ওঠা নব কিশলয়,
নবীন বসন্ত আয় নিয়ে।
যে যায় সে চলে যাক, সব তার নিয়ে যাক,
নাম তার যাক মুছে দিয়ে।

এ কি ঢেউ-খেলা হায়, এক আসে, আর যায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে আসে হাসি,
বিলাপের শেষ তান না হইতে অবসান
কোথা হতে বেজে ওঠে বাঁশি।
আয় রে কাঁদিয়া লই, শুকাবে দুদিন বই
এ পবিত্র অশ্রুবারিধারা।
সংসারে ফিরিব ভুলি, ছোটো ছোটো সুখগুলি
রচি দিবে আনন্দের কারা।
না রে, করিব না শোক, এসেছে নূতন লোক,
তারে কে করিবে অবহেলা।
সেও চলে যাবে কবে, গীত গান সাঙ্গ হবে,
ফুরাইবে দুদিনের খেলা।

উপকথা

মেঘের আড়ালে বেলা কখন যে যায়।
বৃষ্টি পড়ে সারাদিন থামিতে না চায়।
আর্দ্র-পাখা পাখিগুলি গীতগান গেছে ভুলি,
নিস্তব্ধে ভিজিছে তরুলতা।
বসিয়া আঁধার ঘরে বরষার ঝরঝরে
মনে পড়ে কত উপকথা।

কভু মনে লয় হেন এ-সব কাহিনী যেন
সত্য ছিল নবীন জগতে।
উড়ন্ত মেঘের মতো ঘটনা ঘটিত কত,
সংসার উড়িত মনোরথে।
রাজপুত্র অবহেলে কোন্ দেশে যেত চলে
কত নদী কত সিন্ধু-পার।
সরোবর-ঘাট আলা, মণি হাতে নাগবালা
বসিয়া বাঁধিত কেশভার।
সিন্ধুতীরে কত দূরে কোন্ রাক্ষসের পুরে
ঘুমাইত রাজার ঝিয়ারি।
হাসি তার মণিকণা কেহ তাহা দেখিত না,
মুকুতা ঢালিত অশ্রুবারি।
সাত ভাই একত্তরে চাঁপা হয়ে ফুটিত রে,
এক বোন ফুটিত পারুল।
সম্ভব কি অসম্ভব একত্রে আছিল সব—
দুটি ভাই সত্য আর ভুল।
বিশ্ব নাহি ছিল বাঁধা, না ছিল কঠিন বাধা,
নাহি ছিল বিধির বিধান,
হাসিকান্না লঘুকায়া শরতের আলোছায়া,
কেবল সে ছুঁয়ে যেত প্রাণ!
আজি ফুরায়েছে বেলা, জগতের ছেলেখেলা
গেছে আলো-আঁধারের দিন।
আর তো নাই রে ছুটি, মেঘরাজ্য গেছে টুটি,
পদে পদে নিয়ম-অধীন।
মধ্যাহ্নে রবির দাপে বাহিরে কে রবে তাপে,
আলয় গড়িতে সবে চায়।
যবে হায় প্রাণপণ করে তাহা সমাপন
খেলারই মতন ভেঙে যায়।

যোগিয়া

বহুদিন পরে আজি মেঘ গেছে চলে,
রবির কিরণসুধা আকাশে উথলে।
স্নিগ্ধ শ্যাম পত্রপুটে আলোক ঝলকি উঠে
পুলক নাচিছে গাছে গাছে।
নবীন যৌবন যেন প্রেমের মিলনে কাঁপে,
আনন্দ বিদ্যুত-আলো নাচে।
জুঁই সরোবরতীরে নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে
ঝরিয়া পড়িতে চায় ভুঁয়ে,

অতি মৃদু হাসি তার, বরষার বৃষ্টিধার
গন্ধটুকু নিয়ে গেছে ধুয়ে।
আজিকে আপন প্রাণে না জানি বা কোন্‌খানে
যোগিয়া রাগিণী গায় কে রে।
ধীরে ধীরে সুর তার মিলাইছে চারি ধার,
আচ্ছন্ন করিছে প্রভাতেরে।
গাছপালা চারি ভিতে সংগীতের মাধুরীতে
মগ্ন হয়ে ধরে স্বপ্নছবি।
এ প্রভাত মনে হয় আরেক প্রভাতময়,
রবি যেন আর কোনো রবি।
ভাবিতেছি মনে মনে কোথা কোন্‌ উপবনে
কী ভাবে সে গাইছে না জানি,
চোখে তার অশ্রুরেখা একটু দেছে কি দেখা,
ছড়ায়েছে চরণ দুখানি।
তার কি পায়ের কাছে বাঁশিটি পড়িয়া আছে—
আলোছায়া পড়েছে কপোলে।
মলিন মালাটি তুলি ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি
ভাসাইছে সরসীর জলে।
বিষাদ-কাহিনী তার সাধ যায় শুনিবার,
কোন্‌খানে তাহার ভবন।
তাহার আঁখির কাছে যার মুখ জেগে আছে
তাহারে বা দেখিতে কেমন।
এ কী রে আকুল ভাষা! প্রাণের নিরাশ আশা
পল্লবের মর্মরে মিশালো।
না জানি কাহারে চায় তার দেখা নাহি পায়
ম্লান তাই প্রভাতের আলো।
এমন কত-না প্রাতে চাহিয়া আকাশপাতে
কত লোক ফেলেছে নিশ্বাস,
সে-সব প্রভাত গেছে, তারা তার সাথে গেছে,
লয়ে গেছে হৃদয়-হুতাশ!
এমন কত-না আশা কত ম্লান ভালোবাসা
প্রতিদিন পড়িছে ঝরিয়া,
তাদের হৃদয়-ব্যথা তাদের মরণ-গাথা
কে গাইছে একত্র করিয়া,
পরস্পর পরস্পরে ডাকিতেছে নাম ধরে,
কেহ তাহা শুনিতে না পায়।
কাছে আসে, বসে পাশে, তবুও কথা না ভাষে,
অশ্রুজলে ফিরে ফিরে যায়।
চায় তবু নাহি পায়, অবশেষে নাহি চায়,
অবশেষে নাহি গায় গান,
ধীরে ধীরে শূন্য হিয়া বনের ছায়ায় গিয়া
মুছে আসে সজল নয়ান।

কাঙালিনী

আনন্দময়ীর আগমনে
  আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হেরো ওই ধনীর দুয়ারে
  দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।
উৎসবের হাসি-কোলাহল
  শুনিতে পেয়েছে ভোরবেলা,
নিরানন্দ গৃহ তেয়াগিয়া
  তাই আজ বাহির হইয়া
আসিয়াছে ধনীর দুয়ারে
  দেখিবারে আনন্দের খেলা।
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশি,
  কানে তাই পশিতেছে আসি,
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
  দুরাশার সুখের স্বপন;
চারি দিকে প্রভাতের আলো
  নয়নে লেগেছে বড়ো ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
  শরতের কনক তপন।
কত কে যে আসে, কত যায়,
  কেহ হাসে, কেহ গান গায়,
কত বরনের বেশভূষা—
  ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন,
কত পরিজন দাসদাসী,
  পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি
চোখের উপরে পড়িতেছে
  মরীচিকা-ছবির মতন।
হেরো তাই রহিয়াছে চেয়ে
  শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।

শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
  তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে,
মার মায়া পায় নি কখনো,
  মা কেমন দেখিতে এসেছে।
তাই বুঝি আঁখি ছলছল,
  বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা!
চেয়ে যেন মার মুখপানে
বালিকা কাতর অভিমানে
  বলে, ‘মা গো, এ কেমন ধারা।
এত বাঁশি, এত হাসিরাশি,

এত তোর রতন-ভূষণ,
তুই যদি আমার জননী
মোর কেন মলিন বসন!'

ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলি
ভাইবোন করি গলাগলি
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই:
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে—
আমি তো ওদের কেহ নই।
স্নেহ ক'রে আমার জননী
পরায়ে তো দেয় নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে করে নিয়ে
মুছায়ে তো দেয় নি নয়ন।

আপনার ভাই নেই বলে
ওরে কি রে ডাকিবে না কেহ?
আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কি রে করিবে না স্নেহ?
ও কি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে রবে চেয়ে,
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে?

ওর প্রাণ আঁধার যখন
করুণ শুনায় বড়ো বাঁশি,
দুয়ারেতে সজল নয়ন,
এ বড়ো নিষ্ঠুর হাসিরাশি।
আজি এই উৎসবের দিনে
কত লোক ফেলে অশ্রুধার,
গেহ নেই, স্নেহ নেই, আহা,
সংসারেতে কেহ নেই তার।
শূন্য হাতে গৃহে যায় কেহ,
ছেলেরা ছুটিয়া আসে কাছে,
কী দিবে কিছুই নেই তার,
চোখে শুধু অশ্রুজল আছে।
অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা, আয় তোরা সব।
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব!
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,

তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল-কলস।

ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি

সম্মুখে রয়েছে পড়ি যুগ-যুগান্তর।
অসীম নীলিমে লুটে ধরণী ধাইবে ছুটে,
প্রতিদিন আসিবে, যাইবে রবিকর।
প্রতিদিন প্রভাতে জাগিবে নরনারী,
প্রতিসন্ধ্যা শ্রান্তদেহে ফিরিয়া আসিবে গেহে,
প্রতিরাত্রে তারকা ফুটিবে সারি সারি।
কত আনন্দের ছবি, কত সুখ আশা
আসিবে যাইবে হায়, সুখ-স্বপনের প্রায়
কত প্রাণে জাগিবে, মিলাবে ভালোবাসা।
তখনো ফুটিবে হেসে কুসুম-কানন,
তখনো রে কত লোকে কত স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে
আঁকিবে আকাশ-পটে সুখের স্বপন।
নিবিলে দিনের আলো, সন্ধ্যা হলে, নিতি
বিরহী নদীর ধারে না জানি ভাবিবে কারে,
না-জানি সে কী কাহিনী, কী সুখ, কী স্মৃতি।

দূর হতে আসিতেছে, শুন কান পেতে—
কত গান, সেই মহা-রঙ্গভূমি হতে
কত যৌবনের হাসি, কত উৎসবের বাঁশি,
তরঙ্গের কলধ্বনি প্রমোদের স্রোতে।
কত মিলনের গীত, বিরহের শ্বাস,
তুলেছে মর্মর তান বসন্ত-বাতাস,
সংসারের কোলাহল ভেদ করি অবিরল
লক্ষ নব কবি ঢালে প্রাণের উচ্ছ্বাস।

ওই দূর খেলাঘরে খেলাইছ কারা!
উঠেছে মাথার 'পরে আমাদেরি তারা।
আমাদেরি ফুলগুলি সেথাও নাচিছে দুলি,
আমাদেরি পাখিগুলি গেয়ে হল সারা।
ওই দূর খেলাঘরে করে আনাগোনা
হাসে কাঁদে কত কে যে নাহি যায় গণা।
আমাদের পানে হায় ভুলেও তো নাহি চায়,
মোদের ওরা তো কেউ ভাই বলিবে না।
ওই সব মধুমুখ অমৃত-সদন
না জানি রে আর কারা করিবে চুম্বন।

শরমময়ীর পাশে বিজড়িত আধ-ভাষে
আমরা তো শুনাব না প্রাণের বেদন।

আমাদের খেলাঘরে কারা খেলাইছ!
সাঙ্গ না হইতে খেলা চলে এনু সন্ধেবেলা,
ধূলির সে ঘর ভেঙে কোথা ফেলাইছ।
হোথা, যেথা বসিতাম মোরা দুই জন,
হাসিয়া কাঁদিয়া হত মধুর মিলন,
মাটিতে কাটিয়া রেখা কত লিখিতাম লেখা,
কে তোরা মুছিলি সেই সাধের লিখন।
সুধাময়ী মেয়েটি সে হোথায় লুটিত,
চুমো খেলে হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিত।
তাই রে মাধবীলতা মাথা তুলেছিল হোথা,
ভেবেছিনু চিরদিন রবে মুকুলিত।
কোথায় রে, কে তাহারে করিলি দলিত।

ওই যে শুকানো ফুল ছুঁড়ে ফেলে দিলে
উহার মরম-কথা বুঝিতে নারিলে।
ও যেদিন ফুটেছিল নব রবি উঠেছিল,
কানন মাতিয়াছিল বসন্ত-অনিলে।
ওই যে শুকায় চাঁপা পড়ে একাকিনী
তোমরা তো জানিবে না উহার কাহিনী।
কবে কোন্ সন্ধেবেলা ওরে তুলেছিল বালা,
ওরি মাঝে বাজে কোন্ পূরবীরাগিণী।
যারে দিয়েছিল ওই ফুল উপহার
কোথায় সে গেছে চলে, সে তো নেই আর।
একটু কুসুমকণা তাও নিতে পারিল না,
ফেলে রেখে যেতে হল মরণের পার;
কত সুখ, কত ব্যথা, সুখের দুখের কথা
মিশিছে ধূলির সাথে ফুলের মাঝার।

মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর,
সম্মুখে রয়েছে পড়ে যুগ-যুগান্তর।

মথুরায়

বাঁশরি বাজাতে চাহি, বাঁশরি বাজিল কই?
বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন কুসুমে সাজিল ওই।
বাঁশরি বাজাতে চাহি, বাঁশরি বাজিল কই?

বিকচ বকুল ফুল দেখে যে হতেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল গুঞ্জরে কোথায়!
এ নহে কি বৃন্দাবন? কোথা সেই চন্দ্রানন?
ওই কি নূপুরধ্বনি বনপথে শুনা যায়?
একা আছি বনে বসি, পীত ধড়া পড়ে খসি,
সোঙরি সে মুখশশী পরান মজিল সই।
বাঁশরি বাজাতে চাহি, বাঁশরি বাজিল কই?

এক বার রাধে রাধে ডাক্‌ বাঁশি, মনোসাধে,
আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী ভায়।
কোথা সে বিধুরা বালা, মলিন মালতীমালা,
হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা, এ নিশি পোহায়, হায়।
কবি যে হল আকুল, এ কি রে বিধির ভুল,
মথুরায় কেন ফুল ফুটেছে আজি লো সই?
বাঁশরি বাজাতে গিয়ে বাঁশরি বাজিল কই?

বনের ছায়া

কোথা রে তরুর ছায়া, বনের শ্যামল স্নেহ!
তট-তরু কোলে কোলে সারাদিন কলরোলে
স্রোতস্বিনী যায় চলে সুদূরে সাধের গেহ;
কোথা রে তরুর ছায়া, বনের শ্যামল স্নেহ!
কোথা রে সুনীল দিশে বনান্ত রয়েছে মিশে
অনন্তের অনিমিষে নয়ন নিমেষ-হারা!
দূর হতে বায়ু এসে চলে যায় দূর-দেশে,
গীত-গান যায় ভেসে, কোন্‌ দেশে যায় তারা।
হাসি, বাঁশি, পরিহাস, বিমল সুখের শ্বাস,
মেলামেশা বারো মাস নদীর শ্যামল তীরে;
কেহ খেলে, কেহ দোলে, ঘুমায় ছায়ার কোলে,
বেলা শুধু যায় চলে কুলুকুলু নদীনীরে।
বকুল কুড়োয় কেহ, কেহ গাঁথে মালাখানি;
ছায়াতে ছায়ার প্রায় বসে বসে গান গায়,
করিতেছে কে কোথায় চুপিচুপি কানাকানি।
খুলে গেছে চুলগুলি, বাঁধিতে গিয়েছে ভুলি,
আঙুলে ধরেছে তুলি আঁখি পাছে ঢেকে যায়,
কাঁকন খসিয়া গেছে, খুঁজিছে গাছের ছায়।
বনের মর্মের মাঝে বিজনে বাঁশরি বাজে,
তারি সুরে মাঝে মাঝে ঘুঘু দুটি গান গায়।
ঝুরু ঝুরু কত পাতা গাহিছে বনের গাথা,
কত না মনের কথা তারি সাথে মিশে যায়।

লতাপাতা কত শত খেলে কাঁপে কত মতো
ছোটো ছোটো আলোছায়া ঝিকিমিকি বন ছেয়ে,
তারি সাথে তারি মতো খেলে কত ছেলেমেয়ে।

কোথায় সে গুন্ গুন্ ঝরঝর মরমর,
কোথা সে মাথার 'পরে লতাপাতা থরথর।
কোথায় সে ছায়া আলো, ছেলেমেয়ে খেলাধুলি,
কোথা সে ফুলের মাঝে এলোচুলে হাসিগুলি।
কোথা রে সরল প্রাণ, গভীর আনন্দ-গান,
অসীম শান্তির মাঝে প্রাণের সাধের গেহ,
তরুর শীতল ছায়া, বনের শ্যামল স্নেহ।

কোথায়

হায়, কোথা যাবে!
অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি,
পথ কোথা পাবে!
হায়, কোথা যাবে!

কঠিন বিপুল এ জগৎ,
খুঁজে নেয় যে যাহার পথ।
স্নেহের পুতলি তুমি সহসা অসীমে গিয়ে
কার মুখে চাবে।
হায়, কোথা যাবে!

মোরা কেহ সাথে রহিব না,
মোরা কেহ কথা কহিব না।
নিমেষ যেমনি যাবে, আমাদের ভালোবাসা
আর নাহি পাবে।
হায়, কোথা যাবে!

মোরা বসে কাঁদিব হেথায়,
শূন্যে চেয়ে ডাকিব তোমায়;
মহা সে বিজন-মাঝে হয়তো বিলাপধ্বনি
মাঝে মাঝে শুনিবারে পাবে,
হায়, কোথা যাবে!

দেখো, এই ফুটিয়াছে ফুল,
বসন্তেরে করিছে আকুল,
পুরানো সুখের স্মৃতি বাতাস আনিছে নিতি

কত স্নেহভাবে,
হায়, কোথা যাবে!

খেলাধুলা পড়ে না কি মনে,
কত কথা স্নেহের স্মরণে।
সুখে দুখে শত ফেরে সে-কথা জড়িত যে রে,
সেও কি ফুরাবে!
হায়, কোথা যাবে!

চিরদিন তরে হবে পর,
এ-ঘর রবে না তব ঘর।
যারা ওই কোলে যেত তারাও পরের মতো
বারেক ফিরেও নাহি চাবে।
হায়, কোথা যাবে!

হায়, কোথা যাবে!
যাবে যদি, যাও যাও, অশ্রু তব মুছে যাও,
এইখানে দুঃখ রেখে যাও।
যে বিশ্রাম চেয়েছিলে তাই যেন সেথা মিলে—
আরামে ঘুমাও।
যাবে যদি, যাও।

শান্তি

থাক্ থাক্ চুপ কর্ তোরা, ও আমার ঘুমিয়ে পড়েছে।
আবার যদি জেগে ওঠে বাছা কান্না দেখে কান্না পাবে যে।
কত হাসি হেসে গেছে ও, মুছে গেছে কত অশ্রুধার,
হেসে কেঁদে আজ ঘুমাল, ওরে তোরা কাঁদাস নে আর।

কত রাত গিয়েছিল হায়, বয়েছিল বসন্তের বায়,
পুবের জানালাখানি দিয়ে চন্দ্রালোক পড়েছিল গায়;
কত রাত গিয়েছিল হায়, দূর হতে বেজেছিল বাঁশি,
সুরগুলি কেঁদে ফিরেছিল বিছানার কাছে কাছে আসি।
কত রাত গিয়েছিল হায়, কোলেতে শুকানো ফুলমালা
নত মুখে উলটি পালটি চেয়ে চেয়ে কেঁদেছিল বালা।
কত দিন ভোরে শুকতারা উঠেছিল ওর আঁখি 'পরে,
সমুখের কুসুম-কাননে ফুল ফুটেছিল থরে থরে।
একটি ছেলেরে কোলে নিয়ে বলেছিল সোহাগের ভাষা,
কারেও বা ভালোবেসেছিল, পেয়েছিল কারো ভালোবাসা।
হেসে হেসে গলাগলি করে খেলেছিল যাহাদের নিয়ে
আজো তারা ওই খেলা করে, ওর খেলা গিয়েছে ফুরিয়ে।

সেই রবি উঠেছে সকালে, ফুটেছে সুমুখে সেই ফুল,
ও কখন খেলাতে খেলাতে মাঝখানে ঘুমিয়ে আকুল।
শ্রান্ত দেহ, নিস্পন্দ নয়ন, ভুলে গেছে হৃদয়-বেদনা।
চুপ করে চেয়ে দেখো ওরে, থামো থামো, হেসো না কেঁদো না।

পাষাণী মা

হে ধরণী, জীবের জননী,
শুনেছি যে মা তোমায় বলে,
তবে কেন তোর কোলে সবে
কেঁদে আসে, কেঁদে যায় চলে।
তবে কেন তোর কোলে এসে
সন্তানের মেটে না পিয়াসা।
কেন চায়, কেন কাঁদে সবে,
কেন কেঁদে পায় না ভালোবাসা।
কেন হেথা পাষাণ-পরান,
কেন সবে নীরস নিষ্ঠুর,
কেঁদে কেঁদে দুয়ারে যে আসে
কেন তারে করে দেয় দূর।
কাঁদিয়া যে ফিরে চলে যায়
তার তরে কাঁদিস নে কেহ,
এই কি মা, জননীর প্রাণ,
এই কি মা, জননীর স্নেহ!

হৃদয়ের ভাষা

হৃদয়, কেন গো মোরে ছলিছ সতত,
আপনার ভাষা তুমি শিখাও আমায়।
প্রত্যহ আকুল কণ্ঠে গাহিতেছি কত,
ভগ্ন বাঁশরিতে শ্বাস করে হায় হায়!
সন্ধ্যাকালে নেমে যায় নীরব তপন
সুনীল আকাশ হতে সুনীল সাগরে।
আমার মনের কথা, প্রাণের স্বপন
ভাসিয়া উঠিছে যেন আকাশের 'পরে।
ধ্বনিছে সন্ধ্যার মাঝে কার শান্ত বাণী,
ও কি রে আমারি গান? ভাবিতেছি তাই।
প্রাণের যে কথাগুলি আমি নাহি জানি
সে-কথা কেমন করে জেনেছে সবাই।
মোর হৃদয়ের গান সকলেই গায়,
গাহিতে পারি নে তাহা আমি শুধু হায়।

বিদেশী ফুলের গুচ্ছ

মধুর সূর্যের আলো, আকাশ বিমল,
সঘনে উঠিছে নাচি তরঙ্গ উজ্জ্বল।
মধ্যাহ্নের স্বচ্ছ করে
সাজিয়াছে থরে থরে
ক্ষুদ্র নীল দ্বীপগুলি, শুভ্র শৈলশির।
কাননে কুঁড়িরে ঘিরি
পড়িতেছে ধীরি ধীরি
পৃথিবীর অতি মৃদু নিশ্বাসসমীর।
একই আনন্দে যেন গায় শত প্রাণ—
বাতাসের গান আর পাখিদের গান।
সাগরের জলরব
পাখিদের কলরব
এসেছে কোমল হয়ে স্তব্ধতার সংগীত-সমান।

২

আমি দেখিতেছি চেয়ে সমুদ্রের জলে
শৈবাল বিচিত্রবর্ণ ভাসে দলে দলে।
আমি দেখিতেছি চেয়ে
উপকূল-পানে ধেয়ে
মুঠি মুঠি তারাবৃষ্টি করে ঢেউগুলি।
বিরলে বালুকাতীরে
একা বসে রয়েছি রে,
চারি দিকে চমকিছে জলের বিজুলি।
তালে তালে ঢেউগুলি করিছে উত্থান—
তাই হতে উঠিতেছে কী একটি তান।
মধুর ভাবের ভরে
হৃদয় কেমন করে,
আমার সে ভাব আজি বুঝিবে কি আর কোনো প্রাণ।

৩

হায় মোর নাই আশা, নাইকো আরাম—
ভিতরে নাইকো শান্তি, বাহিরে বিরাম।
নাই সে সন্তোষধন
জ্ঞানী ঋষি যোগীগণ
ধ্যানসাধনায় যাহা পায় করতলে—
আনন্দ-মগন-মন
করে তারা বিচরণ,
বিমল মহিমালোক অন্তরেতে জ্বলে।

নাই যশ, নাই প্রেম, নাই অবসর—
পূর্ণ করে আছে এরা সকলেরি ঘর।
সুখে তারা হাসে খেলে,
সুখের জীবন বলে—
আমার কপালে বিধি লিখিয়াছে আরেক অক্ষর।

৪

কিন্তু নিরাশাও শান্ত হয়েছে এমন
যেমন বাতাস এই, সলিল যেমন।
মনে হয় মাথা থুয়ে
এইখানে থাকি শুয়ে
অতিশয় শ্রান্তকায় শিশুটির মতো।
কাঁদিয়া দুঃখের প্রাণ
করে দিই অবসান—
যে দুঃখ বহিতে হবে, বহিয়াছি কত।
আসিবে ঘুমের মতো মরণের কোল,
ধীরে ধীরে হিম হয়ে আসিবে কপোল।
মুমূর্ষু শ্রবণতলে
মিশাইবে পলে পলে
সাগরের অবিরাম একতান অন্তিম কল্লোল।

—Shelley

সারাদিন গিয়েছিনু বনে
ফুলগুলি তুলেছি যতনে।
প্রাতে মধুপানে রত
মুগ্ধ মধুপের মতো
গান গাহিয়াছি আনমনে।

এখন চাহিয়া দেখি, হায়,
ফুলগুলি শুকায় শুকায়।
যত চাপিলাম মুঠি
পাপড়িগুলি গেল টুটি—
কান্না ওঠে, গান থেমে যায়।

কী বলিছ সখা হে আমার—
ফুল নিতে যাব কি আবার।
থাক্ বঁধু, থাক্ থাক্,
আর কেহ যায় যাক,
আমি তো যাব না কভু আর।

শ্রান্ত এ হৃদয় অতি দীন,
পরান হয়েছে বলহীন।
ফুলগুলি মুঠা ভরি
মুঠায় রহিবে মরি
আমি না মরিব যত দিন।

—Mrs. Browning

আমায় রেখো না ধরে আর,
আর হেথা ফুল নাহি ফুটে।
হেমন্তের পড়িছে নীহার,
আমায় রেখো না ধরে আর।
যাই হেথা হতে যাই উঠে,
আমার স্বপন গেছে টুটে।
কঠিন পাষাণপথে
যেতে হবে কোনোমতে
পা দিয়েছি যবে।
একটি বসন্তরাতে
ছিলে তুমি মোর সাথে—
পোহালো তো চলে যাও তবে।

—Ernest Myers

প্রভাতে একটি দীর্ঘশ্বাস
একটি বিরল অশ্রুবারি
ধীরে ওঠে, ধীরে ঝরে যায়,
শুনিলে তোমার নাম আজ।
কেবল একটুখানি লাজ—
এই শুধু বাকি আছে হায়।
আর সব পেয়েছে বিনাশ।
এক কালে ছিল যে আমারি
গেছে আজ করি পরিহাস।

—Aubrey De Vere

গোলাপ হাসিয়া বলে, 'আগে বৃষ্টি যাক চলে,
দিক দেখা তরুণ তপন—
তখন ফুটাব এ যৌবন।'
গেল মেঘ, এল উষা, আকাশের আঁখি হতে
মুছে দিল বৃষ্টিবারিকণা—
সে তো রহিল না।

কোকিল ভাবিছে মনে, ‘শীত যাবে কত ক্ষণে,
গাছপালা ছাইবে মুকুলে—
তখন গাহিব মন খুলে।’
কুয়াশা কাটিয়া যায়, বসন্ত হাসিয়া চায়,
কানন কুসুমে ভরে গেল—
সে যে মরে গেল!

—Augusta Webster

এত শীঘ্র ফুটিলি কেন রে!
ফুটিলে পড়িতে হয় ঝরে—
মুকুলের দিন আছে তবু,
ফোটা ফুল ফোটে না তো আর।
বড়ো শীঘ্র গেলি মধুমাস,
দুদিনেই ফুরালো নিশ্বাস।
বসন্ত আবার আসে বটে,
গেল যে সে ফেরে না আবার।

—Augusta Webster

হাসির সময় বড়ো নেই,
দুদণ্ডের তরে গান গাওয়া।
নিমেষের মাঝে চুমো খেয়ে
মুহূর্তে ফুরাবে চুমো খাওয়া।
বেলা নাই শেষ করিবারে
অসম্পূর্ণ প্রেমের মন্ত্রণা—
সুখস্বপ্ন পলকে ফুরায়,
তার পরে জাগ্রত যন্ত্রণা।
কিছু ক্ষণ কথা কয়ে লও,
তাড়াতাড়ি দেখে লও মুখ,
দুদণ্ডের খোঁজ দেখাশুনা—
ফুরাইবে খুঁজিবার সুখ।
বেলা নাই কথা কহিবারে
যে কথা কহিতে ফাটে প্রাণ।
দেবতারে দুটো কথা ব'লে
পূজার সময় অবসান।
কাঁদিতে রয়েছে দীর্ঘ দিন—
জীবন করিতে মরুময়,
ভাবিতে রয়েছে চিরকাল—
ঘুমাইতে অনন্ত সময়।

—P. B. Marston

বেঁচেছিল, হেসে হেসে
খেলা করে বেড়াত সে—
হে প্রকৃতি, তারে নিয়ে কী হল তোমার!
শত রঙ-করা পাখি,
তোর কাছে ছিল না কি—
কত তারা, বন, সিন্ধু, আকাশ অপার!
জননীর কোল হতে কেন তবে কেড়ে নিলি!
লুকায়ে ধরার কোলে ফুল দিয়ে ঢেকে দিলি!

শত-তারা-পুষ্পময়ী
মহতী প্রকৃতি অয়ি,
নাহয় একটি শিশু নিলি চুরি ক'রে—
অসীম ঐশ্বর্য তব
তাহে কি বাড়িল নব?
নূতন আনন্দকণা মিলিল কি ওরে?
অথচ তোমারি মতো বিশাল মায়ের হিয়া
সব শূন্য হয়ে গেল একটি সে শিশু গিয়া।

—Victor Hugo

নিদাঘের শেষ গোলাপ কুসুম
একা বন আলো করিয়া,
রূপসী তাহার সহচরীগণ
শুকায়ে পড়েছে ঝরিয়া।
একাকিনী আহা, চারি দিকে তার
কোনো ফুল নাহি বিকাশে
হাসিতে তাহার মিশাইতে হাসি
নিশাস তাহার নিশাসে।

বোঁটার উপরে শুকাইতে তোরে
রাখিব না একা ফেলিয়া—
সবাই ঘুমায়, তুইও ঘুমাগে
তাহাদের সাথে মিলিয়া।
ছড়ায়ে দিলাম দলগুলি তোর
কুসুমসমাধিশয়নে
যেথা তোর বনসখীরা সবাই
ঘুমায় মুদিত নয়নে।
তেমনি আমার সখারা যখন
যেতেছেন মোরে ফেলিয়া
প্রেমহার হতে একটি একটি
রতন পড়িছে খুলিয়া,

প্রণয়ীহৃদয় গেল গো শুকায়ে
　　প্রিয়জন গেল চলিয়া—
তবে এ আঁধার আঁধার জগতে
　　রহিব বলো কী বলিয়া।

—Moore

ওই আদরের নামে ডেকো সখা মোরে!
ছেলেবেলা ওই নামে আমায় ডাকিত—
তাড়াতাড়ি খেলাধুলা সব ত্যাগ করে
　　অমনি যেতেম ছুটে,
　　কোলে পড়িতাম লুটে,
রাশি-করা ফুলগুলি পড়িয়া থাকিত।

নীরব হইয়া গেছে সে স্নেহের স্বর—
　　কেবল স্তব্ধতা বাজে
　　আজি এ শ্মশান-মাঝে,
কেবল ডাকি গো আমি 'ঈশ্বর ঈশ্বর'!

মৃত কণ্ঠে আর যাহা শুনিতে না পাই
সে নাম তোমারি মুখে শুনিবারে চাই।
হাঁ সখা, ডাকিয়ো তুমি সেই নাম ধরে—
　　ডাকিলেই সাড়া পাবে,
　　কিছু না বিলম্ব হবে,
তখনি কাছেতে যাব সব ত্যাগ করে।

—Mrs. Browning

কেমনে কী হল পারি নে বলিতে,
　　এইটুকু শুধু জানি—
নবীন কিরণে ভাসিছে সে দিন
　　প্রভাতের তনুখানি।
বসন্ত তখনো কিশোর কুমার,
　　কুঁড়ি উঠে নাই ফুটি,
শাখায় শাখায় বিহগ বিহগী
　　বসে আছে দুটি দুটি।

কী যে হয়ে গেল পারি নে বলিতে,
　　এইটুকু শুধু জানি—
বসন্তও গেল, তাও চলে গেল
　　একটি না কয়ে বাণী।

যা-কিছু মধুর সব ফুরাইল,
সেও হল অবসান—
আমারেই শুধু ফেলে রেখে গেল
সুখহীন ম্রিয়মাণ।

—Christina Rossetti

রবির কিরণ হতে আড়াল করিয়া রেখে
মনটি আমার আমি গোলাপে রাখিনু ঢেকে—
সে বিছানা সুকোমল, বিমল নীহার চেয়ে,
তারি মাঝে মনখানি রাখিলাম লুকাইয়ে।
একটি ফুল না নড়ে, একটি পাতা না পড়ে—
তবু কেন ঘুমায় না, চমকি চমকি চায়?
ঘুম কেন পাখা নেড়ে উড়িয়ে পালিয়ে যায়?
আর কিছু নয়, শুধু গোপনে একটি পাখি
কোথা হতে মাঝে মাঝে উঠিতেছে ডাকি ডাকি।

ঘুমা তুই, ওই দেখ, বাতাস মুদেছে পাখা,
রবির কিরণ হতে পাতায় আছিস ঢাকা—
ঘুমা তুই, ওই দেখ, তো চেয়ে দুরন্ত বায়
ঘুমেতে সাগর-'পরে ঢুলে পড়ে পায় পায়।
দুখের কাঁটায় কি রে বিঁধিতেছে কলেবর?
বিষাদের বিষদাঁতে করিছে কি জরজর?
কেন তবে ঘুম তোর ছাড়িয়া গিয়াছে আঁখি?
কে জানে, গোপনে কোথা ডাকিছে একটি পাখি।

শ্যামল কানন এই মোহমন্ত্রজালে ঢাকা,
অমৃতমধুর ফল ভরিয়ে রয়েছে শাখা,
স্বপনের পাখিগুলি চঞ্চল ডানাটি তুলি
উড়িয়া চলিয়া যায় আঁধার প্রান্তর-'পরে—
গাছের শিখর হতে ঘুমের সংগীত ঝরে।
নিভৃত কানন-'পর শুনি না ব্যাধের স্বর,
তবে কেন এ হরিণী চমকায় থাকি থাকি।
কে জানে, গোপনে কোথা ডাকিছে একটি পাখি।

—Swinburne

দেখিনু যে এক আশার স্বপন
শুধু তা স্বপন, স্বপনময়—
স্বপন বই সে কিছুই নয়।
অবশ হৃদয় অবসাদময়
হারাইয়া সুখ শ্রান্ত অতিশয়—
আজিকে উঠিনু জাগি
কেবল একটি স্বপন লাগি!

বীণাটি আমার নীরব হইয়া
গেছে গীতগান ভুলি,
ছিঁড়িয়া টুটিয়া ফেলেছি তাহার
একে একে তারগুলি।
নীরব হইয়া রয়েছে পড়িয়া
সুদূরে শ্মশান-'পরে,
কেবল একটি স্বপন-তরে!

থাম্ থাম্ ওরে হৃদয় আমার,
থাম্ থাম্ একেবারে,
নিতান্তই যদি টুটিয়া পড়িবি
একেবারে ভেঙে যা রে—
এই তোর কাছে মাগি।
আমার জগৎ, আমার হৃদয়—
আগে যাহা ছিল এখন তা নয়
কেবল একটি স্বপন লাগি।

—Christina Rossetti

নহে নহে এ নহে মরণ।
সহসা এ প্রাণপূর্ণ নিশ্বাসবাতাস
নীরবে করে যে পলায়ন,
আলোতে ফুটায় আলো এই আঁখিতারা
নিবে যায় একদা নিশীথে,
বহে না রুধিরনদী, সুকোমল তনু
ধুলায় মিলায় ধরণীতে,
ভাবনা মিলায় শূন্যে, মৃত্তিকার তলে
রুদ্ধ হয় অমর হৃদয়—
এই মৃত্যু? এ তো মৃত্যু নয়।

কিন্তু রে পবিত্র শোক যায় না যে দিন
পিরিতির স্মিরিতিমন্দিরে,
উপেক্ষিত অতীতের সমাধির 'পরে
তৃণরাজি দোলে ধীরে ধীরে,
মরণ-অতীত চির-নূতন পরান
স্মরণে করে না বিচরণ—
সেই বটে সেই তো মরণ!

—Hood

কোনো জাপানি কবিতার ইংরাজী অনুবাদ হইতে

বাতাসে অশথপাতা পড়িছে খসিয়া,
বাতাসেতে দেবদারু উঠিছে শ্বসিয়া।

দিবসের পরে বসি রাত্রি মুদে আঁখি,
নীড়েতে বসিয়া যেন পাহাড়ের পাখি।
শ্রান্ত পদে ভ্রমি আমি নগরে নগরে
বিজন অরণ্য দিয়া পর্বতে সাগরে।
উড়িয়া গিয়াছে সেই পাখিটি আমার,
খুঁজিয়া বেড়াই তারে সকল সংসার।
দিন রাত্রি চলিয়াছি, শুধু চলিয়াছি—
ভুলে যেতে ভুলিয়া গিয়াছি।

আমি যত চলিতেছি রৌদ্র বৃষ্টি বায়ে
হৃদয় আমার তত পড়িছে পিছায়ে।
হৃদয় রে, ছাড়াছাড়ি হল তোর সাথে—
এক ভাব রহিল না তোমাতে আমাতে।
নীড় বেঁধেছিনু যেথা যা রে সেইখানে,
একবার ডাক্ গিয়ে আকুল পরানে।
কে জানে, হতেও পারে, সে নীড়ের কাছে
হয়তো পাখিটি মোর লুকাইয়ে আছে।
কেঁদে কেঁদে বৃষ্টিজলে আমি ভ্রমিতেছি—
ভুলে যেতে ভুলিয়ে গিয়েছি।

দেশের সবাই জানে কাহিনী আমার।
বলে তারা, 'এত প্রেম আছে বা কাহার!'
পাখি সে পলায়ে গেছে কথাটি না ব'লে,
এমন তো সব পাখি উড়ে যায় চলে।
চিরদিন তারা কভু থাকে না সমান
এমন তো কত শত রয়েছে প্রমাণ।
ডাকে আর গায় আর উড়ে যায় পরে,
এ ছাড়া বলো তো তারা আর কিবা করে?
পাখি গেল যার, তার এক দুঃখ আছে—
ভুলে যেতে ভুলে সে গিয়াছে!

সারা দিন দেখি আমি উড়িতেছে কাক,
সারা রাত শুনি আমি পেচকের ডাক।
চন্দ্র উঠে অস্ত যায় পশ্চিমসাগরে,
পুরবে তপন উঠে জলদের স্তরে।
পাতা ঝরে, শুভ্র রেণু উড়ে চারি ধার—
বসন্তমুকুল এ কি? অথবা তুষার?
হৃদয়, বিদায় লই এবে তোর কাছে—
বিলম্ব হইয়া গেল, সময় কি আছে?
শান্ত হ' রে, একদিন সুখী হবি তবু—
মরণ সে ভুলে যেতে ভোলে না তো কভু!

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান

দিনের আলো নিবে এল,
সুর্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে
চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে,
রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা
বাজল ঠং ঠং।
ও পারেতে বিষ্টি এল
ঝাপসা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায়
একশো মানিক জ্বালা।
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদী এল বান।"

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা
কোথায় বা সীমানা!
দেশে দেশে খেলে বেড়ায়
কেউ করে না মানা।
কত নতুন ফুলের বনে
বিষ্টি দিয়ে যায়!
পলে পলে নতুন খেলা
কোথায় ভেবে পায়!
মেঘের খেলা দেখে কত
খেলা পড়ে মনে!
কত দিনের নুকোচুরি
কত ঘরের কোণে!
তারি সঙ্গে মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদী এল বান।"

মনে পড়ে ঘরটি আলো
মায়ের হাসিমুখ,
মনে পড়ে মেঘের ডাকে
গুরু গুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে
ঘুমিয়ে আছে খোকা,

মায়ের পরে দৌরাত্মি, সে
না যায় লেখাজোকা।
ঘরেতে দুরন্ত ছেলে
করে দাপাদাপি,
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে
সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
মনে পড়ে মায়ের মুখে
শুনেছিলেম গান
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদী এল বান।"

মনে পড়ে সুয়োরানী
দুয়োরানীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী
কঙ্কাবতীর ব্যথা,
মনে পড়ে ঘরের কোণে
মিটিমিটি আলো,
চারি দিকে দেয়ালেতে
ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ
ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্—
দস্যি ছেলে গল্প শোনে
একেবারে চুপ।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে
মেঘলা দিনের গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদী এল বান।"

কবে বিষ্টি পড়েছিল,
বান এল সে কোথা!
শিব-ঠাকুরের বিয়ে হল
কবেকার সে কথা;
সে দিনো কি এমনিতরো
মেঘের ঘটাখানা?
থেকে থেকে বিজুলি কি
দিতেছিল হানা?
তিন কন্যে বিয়ে ক'রে
কী হল তার শেষে!
না জানি কোন্ নদীর ধারে,
না জানি কোন্ দেশে,

কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে
কে গাহিল গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদী এল বান।"

সাত ভাই চম্পা

সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে,
সাতটি চাঁপা ভাই:
রাঙা-বসন পারুল দিদি,
তুলনা তার নাই।
সাতটি সোনা চাঁপার মধ্যে
সাতটি সোনা মুখ,
পারুল দিদির কচি মুখটি
করতেছে টুক্‌টুক্!
ঘুমটি ভাঙে পাখির ডাকে
রাতটি যে পোহাল,
ভোরের বেলা চাঁপায় পড়ে
চাঁপার মতো আলো।
শিশির দিয়ে মুখটি মেজে
মুখখানি বের করে,
কী দেখছে সাত ভায়েতে
সারা সকাল ধ'রে!

দেখছে চেয়ে ফুলের বনে
গোলাপ ফোটে ফোটে,
পাতায় পাতায় রোদ পড়েছে,
চিক্‌চিকিয়ে ওঠে।
দোলা দিয়ে বাতাস পালায়
দুষ্টু ছেলের মতো,
লতায় পাতায় হেলাদোলা
কোলাকুলি কত!
গাছটি কাঁপে নদীর ধারে
ছায়াটি কাঁপে জলে,
ফুলগুলি সব কেঁদে পড়ে
শিউলি গাছের তলে।
ফুলের থেকে মুখ বাড়িয়ে
দেখছে ভাই বোন,
দুখিনী এক মায়ের তরে
আকুল হল মন।

সারাটা দিন কেঁপে কেঁপে
পাতার ঝুরু ঝুরু,
মনের সুখে বনের যেন
বুকের দুরু দুরু!
কেবল শুনি কুলুকুলু
এ কি ঢেউয়ের খেলা!
বনের মধ্যে ডাকে ঘুঘু
সারা দুপুর বেলা।
মৌমাছি সে গুনগুনিয়ে
খুঁজে বেড়ায় কা'কে,
ঘাসের মধ্যে ঝিঁঝিঁ ক'রে
ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে।
ফুলের পাতায় মাথা রেখে
শুনছে ভাই বোন,
মায়ের কথা মনে প'ড়ে
আকুল করে মন।

মেঘের পানে চেয়ে দেখে
মেঘ চলেছে ভেসে,
পাখিগুলি উড়ে উড়ে
চলেছে কোন্ দেশে।
প্রজাপতির বাড়ি কোথায়
জানে না তো কেউ।
সমস্ত দিন কোথায় চলে
লক্ষ হাজার ঢেউ!
দুপুর বেলা থেকে থেকে
উদাস হল বায়,
শুকনো পাতা খ'সে প'ড়ে
কোথায় উড়ে যায়!
ফুলের মাঝে গালে হাত
দেখছে ভাই বোন,
মায়ের কথা পড়ছে মনে
কাঁদছে প্রাণমন।

সন্ধে হলে জোনাই জ্বলে
পাতায় পাতায়,
অশথ গাছে দুটি তারা
গাছের মাথায়।
বাতাস বওয়া বন্ধ হল,
স্তব্ধ পাখির ডাক,
থেকে থেকে করছে কা কা
দুটো-একটা কাক!

পশ্চিমেতে ঝিকিমিকি,
পুবে আঁধার করে,
সাতটি ভায়ে গুটিসুটি
চাঁপা ফুলের ঘরে।
"গল্প বলো পারুল দিদি"
সাতটি চাঁপা ডাকে,
পারুল দিদির গল্প শুনে
মনে পড়ে মাকে।

প্রহর বাজে, রাত হয়েছে,
ঝাঁ ঝাঁ করে বন,
ফুলের মাঝে ঘুমিয়ে প'ল
আটটি ভাই বোন।
সাতটি তারা চেয়ে আছে
সাতটি চাঁপার বাগে,
চাঁদের আলো সাতটি ভায়ের
মুখের 'পরে লাগে।
ফুলের গন্ধ ঘিরে আছে
সাতটি ভায়ের তনু—
কোমল শয্যা কে পেতেছে
সাতটি ফুলের রেণু।
ফুলের মধ্যে সাত ভায়েতে
স্বপন দেখে মাকে—
সকাল বেলা "জাগো জাগো"
পারুল দিদি ডাকে।

পুরোনো বট

লুটিয়ে পড়ে জটিল জটা,
ঘন পাতার গহন ঘটা,
হেথা হোথায় রবির ছটা,
পুকুরধারে বট।
দশ দিকেতে ছড়িয়ে শাখা,
কঠিন বাহু আঁকাবাঁকা,
স্তব্ধ যেন আছে আঁকা,
শিরে আকাশ পট।
নেবে নেবে গেছে জলে
শিকড়গুলো দলে দলে,
সাপের মতো রসাতলে,
আলয় খুঁজে মরে।

শতেক শাখা বাহু তুলি,
বায়ুর সাথে কোলাকুলি,
আনন্দেতে দোলাদুলি,
গভীর প্রেমভরে।
ঝড়ের তালে নড়ে মাথা,
কাঁপে লক্ষকোটি পাতা,
আপন মনে কী গাও গাথা
দুলাও মহাকায়া।
তড়িৎ পাশে উঠে হেসে,
ঝড়ের বেলা ঝটিৎ এসে
দাঁড়িয়ে থাকে এলোকেশে,
তলে গভীর ছায়া।
দখিন-বায়ু তোমার কোলে
তোমার বাহু-'পরে দোলে,
গান গাহে সে উতরোলে,
ঘুমোলে তবে থামে।
পাতার ফাঁকে তারা ফুটে,
পাতার কোলে বাতাস লুটে,
ডাইনে তব প্রভাত উঠে,
সন্ধ্যা টুটে বামে।

নিশি-দিশি দাঁড়িয়ে আছ
মাথায় লয়ে জট,
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে
ওগো প্রাচীন বট?
কতই পাখি তোমার শাখে
বসে যে চলে গেছে,
ছোটো ছেলেরে তাদেরি মতো
ভুলে কি যেতে আছে?
তোমার মাঝে হৃদয় তারি
বেঁধেছিল যে নীড়।
ডালেপালায় সাধগুলি তার
কত করেছে ভিড়।
মনে কি নেই সারাটা দিন
বসিয়ে বাতায়নে,
তোমার পানে রইত চেয়ে
অবাক দুনয়নে?
তোমার তলে মধুর ছায়া
তোমার তলে ছুটি,
তোমার তলে নাচত বসে
শালিখ পাখি দুটি।

ভাঙা ঘাটে নাইত কারা
তুলত কারা জল,
পুকুরেতে ছায়া তোমার
করত টলমল।
জলের উপর রোদ পড়েছে
সোনামাখা মায়া,
ভেসে বেড়ায় দুটি হাঁস,
দুটি হাঁসের ছায়া।
ছোটো ছেলে রইত চেয়ে
বাসনা অগাধ,
মনের মধ্যে খেলাত তার
কত খেলার সাধ।
বায়ুর মতো খেলত যদি
তোমার চারি ভিতে,
ছায়ার মতো শুত যদি
তোমার ছায়াটিতে,
পাখির মতো উড়ে যেত
উড়ে আসত ফিরে,
হাঁসের মতো ভেসে যেত
তোমার তীরে তীরে।
নাইছে যারা তাদের মতো
নাইতে যেত যদি,
জল আনতে যেত পথে
কোথায় গঙ্গা নদী!
খেলত যে-সব ছেলেগুলি
ডাকত যদি তারে।
তাদের সাথে খেলত সুখে
তাদের ঘরে দ্বারে।

মনে হত তোমার ছায়ে
কতই কী যে আছে,
কাদের যেন ঘুম পাড়াতে
ঘুঘু ডাকত গাছে।
মনে হত তোমার মাঝে
কাদের যেন ঘর।
আমি যদি তাদের হতেম!
কেন হলেম পর?
ছায়ার তলে তারা থাকে
পাতার ঝরঝরে,
গুন্‌গুনিয়ে সবাই মিলে
কতই যে গান করে!

দূরে বাজে মুলতানে তান
পড়ে আসে বেলা,
ঘাসে বসে দেখে তারা
আলোছায়ার খেলা।
সন্ধে হলে বেণী বাঁধে
তাদের মেয়েগুলি,
ছেলেরা সব দোলায় বসে
খেলায় দুলি দুলি।
গহিন রাতে দখিন বাতে
নিঝুম চারি ভিত,
চাঁদের আলোয় শুভ্রতনু—
ঝিমিঝিমি গীত!
ওখানেতে পাঠশালা নেই,
পণ্ডিতমশাই,
বেত হাতে নাইকো বসে
মাধব গোঁসাই।
সারাটা দিন ছুটি কেবল,
সারাটা দিন খেলা,
পুকুর ধারে আঁধার-করা
বট গাছের তলা।

আজকে কেন নাইকো তারা?
আছে আর সকলে,
তারা তাদের বাসা ভেঙে
কোথায় গেছে চলে!
ছায়ার মধ্যে মায়া ছিল
ভেঙে দিল কে?
ছায়া কেবল রইল পড়ে,
কোথায় গেল সে?
ডালে বসে পাখিরা আজ
কোন্ প্রাণেতে ডাকে?
রবির আলো কাদের খোঁজে
পাতার ফাঁকে ফাঁকে?
গল্প কত ছিল যেন
তোমার খোপে খাপে,
পাখির সঙ্গে মিলে মিশে
ছিল চুপেচাপে—
দুপুর বেলা নূপুর তাদের
বাজত অনুক্ষণ,
শুনে ছোটো ভাই-ভগিনীর
আকুল হত মন।

ছেলেবেলায় ছিল তারা,
কোথায় গেল শেষে!
গেছে বুঝি ঘুমপাড়ানি
মাসি-পিসির দেশে!

হাসিরাশি

নাম রেখেছি বাব্‌লা রানী,
একরত্তি মেয়ে।
হাসিখুশি চাঁদের আলো
মুখটি আছে ছেয়ে।
ফুটফুটে তার দাঁত কখানি
পুটপুটে তার ঠোঁট।
মুখের মধ্যে কথাগুলি সব
উলোট-পালোট।
কচি কচি হাত দুখানি,
কচি কচি মুঠি,
মুখ নেড়ে কেউ কইলে কথা
হেসেই কুটিকুটি।
তাই তাই তাই তালি দিলে
দুলে দুলে নড়ে,
চুলগুলি সব কালো কালো
মুখে এসে পড়ে।
"চলি—চলি—পা—পা—"
টলি টলি যায়,
গরবিনী হেসে হেসে
আড়ে আড়ে চায়।
হাতটি তুলে চুড়ি দুগাছি
দেখায় যাকে তাকে,
হাসির সঙ্গে নেচে নেচে
নোলক দোলে নাকে।
রাঙা দুটি ঠোঁটের কাছে
মুক্তো আছে ফ'লে,
মায়ের চুমোখানি যেন
মুক্তো হয়ে দোলে!
আকাশেতে চাঁদ দেখেছে
দুহাত তুলে চায়,
মায়ের কোলে দুলে দুলে
ডাকে আয় আয়।

চাঁদের আঁখি জুড়িয়ে গেল
তার মুখেতে চেয়ে,
চাঁদ ভাবে কোত্থেকে এল
চাঁদের মতো মেয়ে!
কচি প্রাণের হাসিখানি
চাঁদের পানে ছোটে,
চাঁদের মুখের হাসি আরো
বেশি ফুটে ওঠে।
এমন সাধের ডাক শুনে চাঁদ
কেমন করে আছে,
তারাগুলি ফেলে বুঝি
নেমে আসবে কাছে!
সুধামুখের হাসিখানি
চুরি করে নিয়ে,
রাতারাতি পালিয়ে যাবে
মেঘের আড়াল দিয়ে।
আমরা তারে রাখব ধরে
রানীর পাশেতে।
হাসিরাশি বাঁধা রবে
হাসিরাশিতে।

মা লক্ষ্মী

কার পানে, মা, চেয়ে আছ
মেলি দুটি করুণ আঁখি!
কে ছিঁড়েছে ফুলের পাতা,
কে ধরেছে বনের পাখি!
কে কারে কী বলেছে গো,
কার প্রাণে বেজেছে ব্যথা,
করুণায় যে ভরে এল
দুখানি তোর আঁখির পাতা!
খেলতে খেলতে মায়ের আমার
আর বুঝি হল না খেলা!
ফুলের গুচ্ছ কোলে প'ড়ে
কেন মা এ হেলাফেলা!
অনেক দুঃখ আছে হেথায়,
এ জগৎ যে দুঃখে ভরা,
তোমার দুটি আঁখির সুধায়
জুড়িয়ে গেল নিখিল ধরা!
লক্ষ্মী আমার বল্ দেখি মা
লুকিয়ে ছিলি কোন্ সাগরে!

সহসা আজ কাহার পুণ্যে
উদয় হলি মোদের ঘরে!
সঙ্গে করে নিয়ে এলি
হৃদয়-ভরা স্নেহের সুধা,
হৃদয় ঢেলে মিটিয়ে যাবি
এ জগতের প্রেমের ক্ষুধা।

থামো, থামো, ওর কাছেতে
কোয়ো না কেউ কঠোর কথা,
করুণ আঁখির বালাই নিয়ে
কেউ কারে দিয়ো না ব্যথা!
সইতে যদি না পারে ও,
কেঁদে যদি চলে যায়—
এ ধরণীর পাষাণ প্রাণে
ফুলের মতো ঝরে যায়!
ও যে আমার শিশিরকণা
ও যে আমার সাঁঝের তারা।
কবে এল, কবে যাবে,
এই ভয়েতে হই রে সারা!

আকুল আহ্বান

অভিমান করে কোথায় গেলি,
আয় মা ফিরে, আয় মা, ফিরে আয়!
দিন রাত কেঁদে কেঁদে ডাকি
আয় মা ফিরে, আয় মা, ফিরে আয়!
সন্ধে হল, গৃহ অন্ধকার,
মাগো, হেথায় প্রদীপ জ্বলে না!
একে একে সবাই ঘরে এল,
আমায় যে, মা, 'মা' কেউ বলে না!
সময় হল বেঁধে দেব চুল,
পরিয়ে দেব রাঙা কাপড়খানি।
সাঁঝের তারা সাঁঝের গগনে—
কোথায় গেল রানী আমার রানী।

রাত হল, আঁধার করে আসে,
ঘরে ঘরে প্রদীপ নিবে যায়।
আমার ঘরে ঘুম নেইকো শুধু—
শূন্য শয়ন শূন্য-পানে চায়।
কোথায় দুটি নয়ন ঘুমে-ভরা,
নেতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে!

শ্রান্ত দেহ ঢুলে ঢুলে পড়ে,
মায়ের তরে আছে তবু চেয়ে!

আঁধার রাতে চলে গেলি তুই,
আঁধার রাতে চুপিচুপি আয়।
কেউ তো তোরে দেখতে পাবে না,
তারা শুধু তারার পানে চায়।
পথে কোথাও জনপ্রাণী নেই,
ঘরে ঘরে সবাই ঘুমিয়ে আছে।
মা তোর শুধু একলা দ্বারে ব'সে,
চুপিচুপি আয় মা, মায়ের কাছে।
এ জগৎ কঠিন—কঠিন—
কঠিন, শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া,
সেইখানে তুই আয় মা, ফিরে আয়,
এত ডাকি দিবি নে কি সাড়া?

মায়ের আশা

ফুলের দিনে সে যে চলে গেল,
ফুল ফোটা সে দেখে গেল না,
ফুলে ফুলে ভরে গেল বন,
একটি সে তো পরতে পেল না।
ফুল ফোটে, ফুল ঝরে যায়—
ফুল নিয়ে আর সবাই পরে,
ফিরে এসে সে যদি দাঁড়ায়,
একটিও রবে না তার তরে!
তার তরে যে মা কেবল আছে,
আছে শুধু জননীর স্নেহ,
আছে শুধু মার অশ্রুজল,
কিছু নাই—নাই আর কেহ!
খেলত যারা তারা খেলতে গেছে,
হাসত যারা আজও তারা হাসে,
তার তরে যে কেহ বসে নেই,
মা শুধু রয়েছে তার আশে!
হায় গো বিধি, এ কি ব্যর্থ হবে!
ব্যর্থ হবে মার ভালোবাসা!
কত জনের কত আশা পুরে,
ব্যর্থ হবে মার প্রাণের আশা!

পত্র

নৌকাযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া লিখিত

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন স্থলচরবরেষু

জলে বাসা বেঁধেছিলেম, ডাঙায় বড়ো কিচিমিচি।
সবাই গলা জাহির করে, চেঁচায় কেবল মিছিমিছি।
সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে, ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়,
ভদ্রলোকের গায়ে প'ড়ে কলম নেড়ে কালি ছিটোয়।
এখেনে যে বাস করা দায় ভনভনানির বাজারে,
প্রাণের মধ্যে গুলিয়ে উঠে হট্টগোলের মাঝারে।
কানে যখন তালা ধরে, উঠি যখন হাঁপিয়ে—
কোথায় পালাই, কোথায় পালাই—জলে পড়ি ঝাঁপিয়ে।
গঙ্গাপ্রাপ্তির আশা ক'রে গঙ্গাযাত্রা করেছিলেম।
তোমাদের না বলে কয়ে আস্তে আস্তে সরেছিলেম।

দুনিয়ার এ মজলিশেতে এসেছিলেম গান শুনতে,
আপন মনে গুন্‌গুনিয়ে রাগ-রাগিণীর জাল বুনতে।
গান শোনে সে কাহার সাধ্য, ছোঁড়াগুলো বাজায় বাদ্য,
বিদ্যেখানা ফাটিয়ে ফেলে থাকে তারা তুলো ধুনতে।
ডেকে বলে, হেঁকে বলে, ভঙ্গি করে বেঁকে বলে—
"আমার কথা শোনো সবাই, গান শোনো আর নাই শোনো।
গান যে কাকে বলে সেইটে বুঝিয়ে দেব, তাই শোনো।"
টীকে করেন, ব্যাখ্যা করেন, জেঁকে ওঠে বক্তিমে—
কে দেখে তার হাত-পা নাড়া, চক্ষু দুটোর রক্তিমে!
চন্দ্র সূর্য জ্বলছে মিছে আকাশখানার চালাতে—
তিনি বলেন, "আমিই আছি জ্বলতে এবং জ্বালাতে।"
কুঞ্জবনের তানপুরোতে সুর বেঁধেছে বসন্ত,
সেটা শুনে নাড়েন কর্ণ, হয় নাকো তাঁর পছন্দ।
তাঁরি সুরে গাক-না সবাই টপ্পা খেয়াল ধ্রুবোদ—
গায় না যে কেউ, আসল কথা নাইকো কারো সুর-বোধ!
কাগজওয়ালা সারি সারি নাড়ছে কাগজ হাতে নিয়ে—
বাঙলা থেকে শান্তি বিদায় তিনশো কুলোর বাতাস দিয়ে।
কাগজ দিয়ে নৌকা বানায় বেকার যত ছেলেপিলে,
কর্ণ ধরে পার করবেন দু-এক পয়সা খেয়া দিলে।
সস্তা শুনে ছুটে আসে যত দীর্ঘকর্ণগুলো—
বঙ্গদেশের চতুর্দিকে তাই উড়েছে এত ধুলো।
খুদে খুদে 'আর্য'গুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে,
ছুঁচোলো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে।
তাঁরা বলেন "আমি কল্কি"—গাঁজার কল্কি হবে বুঝি!
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলিঘুঁজি।

পাড়ায় এমন কত আছে কত কব তার!
বঙ্গদেশে মেলাই এল বরা'-অবতার।
দাঁতের জোরে হিন্দুশাস্ত্র তুলবে তারা পাঁকের থেকে,
দাঁতকপাটি লাগে তাদের দাঁত-খিঁচুনির ভঙ্গি দেখে।
আগাগোড়াই মিথ্যে কথা, মিথ্যেবাদীর কোলাহল,
জিব নাচিয়ে বেড়ায় যত জিহ্বাওয়ালা সঙের দল।
বাক্যবন্যা ফেনিয়ে আসে, ভাসিয়ে নে যায় তোড়ে—
কোনোক্রমে রক্ষে পেলেম মা-গঙ্গারই ক্রোড়ে।

হেথায় কিবা শান্তি-ঢালা কুলুকুলু তান!
সাগর-পানে বহন করে গিরিরাজের গান।
ধীরি ধীরি বাতাসটি দেয় জলের গায়ে কাঁটা।
আকাশেতে আলো-আঁধার খেলে জোয়ার-ভাঁটা।
তীরে তীরে গাছের সারি পল্লবেরই ঢেউ।
সারা দিবস হেলে দোলে, দেখে না তো কেউ।
পূর্বতীরে তরুশিরে অরুণ হেসে চায়—
পশ্চিমেতে কুঞ্জ-মাঝে সন্ধ্যা নেমে যায়।
তীরে ওঠে শঙ্খধ্বনি, ধীরে আসে কানে,
সন্ধ্যাতারা চেয়ে থাকে ধরণীর পানে।
ঝাউবনের আড়ালেতে চাঁদ ওঠে ধীরে,
ফোটে সন্ধ্যাদীপগুলি অন্ধকার তীরে।
এই শান্তি-সলিলেতে দিয়েছিলেম ডুব,
হট্টগোলটা ভুলেছিলেম, সুখে ছিলেম খুব।

জান তো ভাই আমি হচ্ছি জলচরের জাত,
আপন মনে সাঁৎরে বেড়াই—ভাসি দিনরাত।
রোদ পোহাতে ডাঙায় উঠি, হাওয়াটি খাই চোখ বুজে,
ভয়ে ভয়ে কাছে এগোই তেমন তেমন লোক বুঝে।
গতিক মন্দ দেখলে আবার ডুবি অগাধ জলে,
এমনি করেই দিনটা কাটাই লুকোচুরির ছলে।
তুমি কেন ছিপ ফেলেছ শুকনো ডাঙায় বসে?
বুকের কাছে বিঁধ করে টান মেরেছ কষে।
আমি তোমায় জলে টানি, তুমি ডাঙায় টানো—
অটল হয়ে বসে আছ, হার তো নাহি মানো।
আমারি নয় হার হয়েছে, তোমারি নয় জিৎ—
খাবি খাচ্ছি ডাঙায় পড়ে হয়ে প'ড়ে চিৎ।
আর কেন ভাই, ঘরে চলো, ছিপ গুটিয়ে নাও,
'রবীন্দ্রনাথ পড়ল ধরা' ঢাক পিটিয়ে দাও।

বিরহীর পত্র

হয় কি না হয় দেখা, ফিরি কি না ফিরি,
দূরে গেলে এই মনে হয়;
দুজনার মাঝখানে অন্ধকারে ঘিরি
জেগে থাকে সতত সংশয়।
এত লোক, এত জন, এত পথ, গলি,
এমন বিপুল এ সংসার—
ভয়ে ভয়ে হাতে হাতে বেঁধে বেঁধে চলি,
ছাড়া পেলে কে আর কাহার।

তারায় তারায় সদা থাকে চোখে চোখে
অন্ধকারে অসীম গগনে।
ভয়ে ভয়ে অনিমেষে কম্পিত আলোকে
বাঁধা থাকে নয়নে নয়নে।
চৌদিকে অটল স্তব্ধ সুগভীর রাত্রি,
তরুহীন মরুময় ব্যোম—
মুখে মুখে চেয়ে তাই চলে যত যাত্রী
চলে গ্রহ রবি তারা সোম।

নিমেষের অন্তরালে কী আছে কে জানে
নিমেষে অসীম পড়ে ঢাকা—
অন্ধ কালতুরঙ্গম রাশ নাহি মানে,
বেগে ধায় অদৃষ্টের চাকা।
কাছে কাছে পাছে পাছে চলিবারে চাই
জেগে জেগে দিতেছি পাহারা,
একটু এসেছে ঘুম—চমকি তাকাই
গেছে চলে কোথায় কাহারা।

ছাড়িয়া চলিয়া গেলে কাঁদি তাই একা
বিরহের সমুদ্রের তীরে।
অনন্তের মাঝখানে দুদণ্ডের দেখা
তাও কেন রাহু এসে ঘিরে।
মৃত্যু যেন মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যায়,
পাঠায় সে বিরহের চর।
সকলেই চলে যাবে, পড়ে রবে হায়
ধরণীর শূন্য খেলাঘর।

গ্রহ তারা ধূমকেতু কত রবি শশী,
শূন্য ঘেরি জগতের ভিড়,
তারি মাঝে যদি ভাঙে, যদি যায় খসি
আমাদের দুদণ্ডের নীড়—

কোথায় কে হারাইব—কোন্ রাত্রিবেলা
কে কোথায় হইব অতিথি!
তখন কি মনে রবে দুদিনের খেলা,
দরশের পরশের স্মৃতি!

তাই মনে ক'রে কি রে চোখে জল আসে
একটুকু চোখের আড়ালে!
প্রাণ যারে প্রাণের অধিক ভালোবাসে
সেও কি রবে না এক কালে!
আশা নিয়ে এ কি শুধু খেলাই কেবল—
সুখ দুঃখ মনের বিকার!
ভালোবাসা কাঁদে, হাসে, মোছে অশ্রুজল,
চায়, পায়, হারায় আবার।

মঙ্গলগীত

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু। নাসিক।

এত বড়ো এ ধরণী মহাসিন্ধু-ঘেরা
দুলিতেছে আকাশসাগরে—
দিন-দুই হেথা রহি মোরা মানবেরা
শুধু কি মা যাব খেলা করে।
তাই কি ধাইছে গঙ্গা ছাড়ি হিমগিরি,
অরণ্য বহিছে ফুল ফল—
শত কোটি রবি তারা আমাদের ঘিরি
গণিতেছে প্রতি দণ্ড পল!

শুধু কি মা হাসি-খেলা প্রতি দিন রাত
দিবসের প্রত্যেক প্রহর!
প্রভাতের পরে আসি নূতন প্রভাত
লিখিছে কি একই অক্ষর!
কানাকানি হাসাহাসি কোণেতে গুটায়ে
অলস নয়ন নিমীলন,
দণ্ড-দুই ধরণীর ধূলিতে লুটায়ে
ধূলি হয়ে ধূলিতে শয়ন!

নাই কি মা মানবের গভীর ভাবনা,
হৃদয়ের সীমাহীন আশা!
জেগে নাই অন্তরেতে অনন্ত চেতনা,
জীবনের অনন্ত পিপাসা!
হৃদয়েতে শুষ্ক কি মা, উৎস করুণার,
শুনি না কি দুখীর ক্রন্দন!

জগৎ শুধু কি মা গো তোমার আমার
　　ঘুমাবার কুসুম-আসন!

শুনো না কাহারা ওই করে কানাকানি
　　অতি তুচ্ছ ছোটো ছোটো কথা।
পরের হৃদয় লয়ে করে টানাটানি,
　　শকুনির মতো নির্মমতা।
শুনো না করিছে কারা কথা-কাটাকাটি
　　মাতিয়া জ্ঞানের অভিমানে,
রসনায় রসনায় ঘোর লাঠালাঠি,
　　আপনার বুদ্ধিরে বাখানে।

তুমি এসো দূরে এসো, পবিত্র নিভৃতে,
　　ক্ষুদ্র অভিমান যাও ভুলি।
সযতনে ঝেড়ে ফেলো বসন হইতে
　　প্রতি নিমেষের যত ধূলি!
নিমেষের ক্ষুদ্র কথা ক্ষুদ্র রেণুজাল
　　আচ্ছন্ন করিছে মানবেরে,
উদার অনন্ত তাই হতেছে আড়াল
　　তিল তিল ক্ষুদ্রতার ঘেরে।

আছে মা, তোমার মুখে স্বর্গের কিরণ,
　　হৃদয়েতে উষার আভাস,
খুঁজিছে সরল পথ ব্যাকুল নয়ন—
　　চারি দিকে মর্ত্যের প্রবাস।
আপনার ছায়া ফেলি আমরা সকলে
　　পথ তোর অন্ধকারে ঢাকি—
ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র কাজে, ক্ষুদ্র শত ছলে,
　　কেন তোরে ভুলাইয়া রাখি।

কেন মা, তোমারে কেহ চাহে না জানাতে
　　মানবের উচ্চ কুলশীল—
অনন্ত জগৎব্যাপী ঈশ্বরের সাথে
　　তোমার যে সুগভীর মিল।
কেন কেহ দেখায় না—চারি দিকে তব
　　ঈশ্বরের বাহুর বিস্তার!
ঘেরি তোরে ভোগসুখ ঢালি নব নব
　　গৃহ বলি রচে কারাগার।

অনন্তের মাঝখানে দাঁড়াও মা আসি,
　　চেয়ে দেখো আকাশের পানে—

পড়ুক বিমল বিভা পূর্ণরূপরাশি
স্বর্গমুখী কমলনয়ানে।
আনন্দে ফুটিয়া ওঠো শুভ্র সূর্যোদয়ে
প্রভাতের কুসুমের মতো,
দাঁড়াও সায়াহ্ন-মাঝে পবিত্র হৃদয়ে
মাথাখানি করিয়া আনত।

শোনো শোনো উঠিতেছে সুগম্ভীর বাণী,
ধ্বনিতেছে আকাশ পাতাল!
বিশ্ব-চরাচর গাহে কাহারে বাখানি
আদিহীন অন্তহীন কাল!
যাত্রী সবে ছুটিয়াছে শূন্যপথ দিয়া,
উঠেছে সংগীতকোলাহল,
ওই নিখিলের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া
মা, আমরা যাত্রা করি চল্।

যাত্রা করি বৃথা যত অহংকার হতে,
যাত্রা করি ছাড়ি হিংসা দ্বেষ,
যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে,
শিরে ধরি সত্যের আদেশ।
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,
আয় মা গো, যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ শোক।

জেনো মা, এ সুখে-দুঃখে-আকুল সংসারে
মেটে না সকল তুচ্ছ আশ--
তা বলিয়া অভিমানে অনন্ত তাঁহারে
কোরো না, কোরো না অবিশ্বাস।
সুখ বলে যাহা চাই সুখ তাহা নয়,
কী যে চাই জানি না আপনি--
আঁধারে জ্বলিছে ওই, ওরে কোরো ভয়,
ভুজঙ্গের মাথার ও মণি।

ক্ষুদ্র সুখ ভেঙে যায়, না সহে নিশ্বাস,
ভাঙে বালুকার খেলাঘর--
ভেঙে গিয়ে বলে দেয়, এ নহে আবাস,
জীবনের এ নহে নির্ভর।
সকলে শিশুর মতো কত আবদার
আনিছে তাঁহার সন্নিধান--
পূর্ণ যদি নাহি হল, অমনি তাহার
ঈশ্বরে করিছে অপমান!

কিছুই চাব না মা গো আপনার তরে,
পেয়েছি যা শুধিব সে ঋণ—
পেয়েছি যে প্রেমসুধা হৃদয়-ভিতরে,
ঢালিয়া তা দিব নিশিদিন।
সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে,
প্রেম দিলে প্রেমে পুরে প্রাণ,
নিশিদিশি আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান।

মধুপাত্রে-হতপ্রাণ পিপীলির মতো
ভোগসুখে জীর্ণ হয়ে থাকা,
ঝুলে থাকা বাদুড়ের মতো শির নত
আঁকড়িয়া সংসারের শাখা,
জগতের হিসাবেতে শূন্য হয়ে হায়
আপনারে আপনি ভক্ষণ,
ফুলে উঠে ফেটে যাওয়া জলবিম্বপ্রায়
এই কি রে সুখের লক্ষণ!

এই অহিফেন-সুখ কে চায় ইহাকে!
মানবত্ব এ নয় এ নয়।
রাহুর মতন সুখ গ্রাস করে রাখে
মানবের মানবহৃদয়।
মানবেরে বল দেয় সহস্র বিপদ,
প্রাণ দেয় সহস্র ভাবনা
দারিদ্র্যে খুঁজিয়া পাই মনের সম্পদ,
শোকে পাই অনন্ত সান্ত্বনা।

চিরদিবসের সুখ রয়েছে গোপন
আপনার আত্মার মাঝার।
চারি দিকে সুখ খুঁজে শ্রান্ত প্রাণ মন—
হেথা আছে, কোথা নেই আর।
বাহিরের সুখ সে, সুখের মরীচিকা—
বাহিরেতে নিয়ে যায় ছ'লে,
যখন মিলায়ে যায় মায়া-কুহেলিকা
কেন কাঁদি সুখ নেই ব'লে!

দাঁড়াও সে অন্তরের শান্তিনিকেতনে
চিরজ্যোতি চিরছায়াময়—
ঝড়হীন রৌদ্রহীন নিভৃত সদনে
জীবনের অনন্ত আলয়।
পুণ্যজ্যোতি মুখে লয়ে পুণ্য হাসিখানি,
অন্নপূর্ণা জননী-সমান,

মহাসুখে সুখ দুঃখ কিছু নাহি মানি
করো সবে সুখ শান্তি দান।

মা, আমার এই জেনো হৃদয়ের সাধ
তুমি হও লক্ষ্মীর প্রতিমা—
মানবেরে জ্যোতি দাও, করো আশীর্বাদ,
অকলঙ্ক-মূর্তি মধুরিমা।
কাছে থেকে এত কথা বলা নাহি হয়,
হেসে খেলে দিন যায় কেটে,
দূরে ভয় হয় পাছে না পাই সময়,
বলিবার সাধ নাহি মেটে।

কত কথা বলিবারে চাহি প্রাণপণে,
কিছুতে মা বলিতে না পারি—
স্নেহমুখখানি তোর পড়ে মোর মনে,
নয়নে উথলে অশ্রুবারি।
সুন্দর মুখেতে তোর মগ্ন আছে ঘুমে
একখানি পবিত্র জীবন;
ফলুক সুন্দর ফল সুন্দর কুসুমে
আশীর্বাদ করো মা, গ্রহণ।

বাল্দোরা।

২

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু। নাসিক।

চারি দিকে তর্ক উঠে সাঙ্গ নাহি হয়,
কথায় কথায় বাড়ে কথা।
সংশয়ের উপরেতে চাপিছে সংশয়,
কেবলি বাড়িছে ব্যাকুলতা।
ফেনার উপরে ফেনা, ঢেউ-'পরে ঢেউ,
গরজনে বধির শ্রবণ—
তীর কোন্ দিকে আছে নাহি জানে কেউ,
হা হা করে আকুল পবন।

এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এসো কেহ
পরিপূর্ণ একটি জীবন,
নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ,
থেমে যাবে সহস্র বচন।
তোমার চরণে আসি মাগিবে মরণ
লক্ষ্যহারা শত শত মত,
যে দিকে ফিরাবে তুমি দুখানি নয়ন
সে দিকে হেরিবে সবে পথ।

অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে,
মানে না বাহুর আক্রমণ।
একটি আলোকশিখা সমুখে ধরিলে
নীরবে করে সে পলায়ন।
এসো মা, উষার আলো, অকলঙ্ক প্রাণ,
দাঁড়াও এ সংসার-আঁধারে।
জাগাও জাগ্রত হৃদে আনন্দের গান,
কূল দাও নিদ্রার পাথারে।

চারি দিকে নৃশংসতা করে হানাহানি,
মানবের পাষাণ পরান।
শাণিত ছুরির মতো বিঁধাইয়া বাণী
হৃদয়ের রক্ত করে পান।
তৃষিত কাতর প্রাণী মাগিতেছে জল,
উল্কাধারা করিছে বর্ষণ—
শ্যামল আশার ক্ষেত্র করিয়া বিফল
স্বার্থ দিয়ে করিছে কর্ষণ।

শুধু এসে একবার দাঁড়াও কাতরে
মেলি দুটি সকরুণ চোখ
পড়ুক দু-ফোঁটা অশ্রু জগতের 'পরে
যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক।
ব্যথিত করুক স্নান তোমার নয়নে,
করুণার অমৃতনির্ঝরে,
তোমারে কাতর হেরি মানবের মনে
দয়া হবে মানবের 'পরে।

সমুদয় মানবের সৌন্দর্যে ডুবিয়া
হও তুমি অক্ষয় সুন্দর।
ক্ষুদ্র রূপ কোথা যায় বাতাসে উবিয়া
দুই-চারি পলকের পর।
তোমার সৌন্দর্যে হোক মানব সুন্দর,
প্রেমে তব বিশ্ব হোক আলো।
তোমারে হেরিয়া যেন মুগ্ধ-অন্তর
মানুষে মানুষ বাসে ভালো।

বান্দোরা।

৩

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু। নাসিক।

আমার এ গান মা গো, শুধু কি নিমেষে
মিলাইবে হৃদয়ের কাছাকাছি এসে?

আমার প্রাণের কথা
নিদ্রাহীন আকুলতা
শুধু নিশ্বাসের মতো যাবে কি মা ভেসে!

এ গান তোমারে সদা ঘিরে যেন রাখে,
সত্যের পথের 'পরে নাম ধরে ডাকে।
সংসারের সুখে দুখে
চেয়ে থাকে তোর মুখে,
চির আশীর্বাদ-সম কাছে কাছে থাকে।

বিজনে সঙ্গীর মতো করে যেন বাস,
অনুক্ষণ শোনে তোর হৃদয়ের আশ।
পড়িয়া সংসারঘোরে
কাঁদিতে হেরিলে তোরে
ভাগ করে নেয় যেন দুখের নিশ্বাস।

সংসারের প্রলোভন যবে আসি হানে
মধুমাখা বিষবাণী দুর্বল পরানে,
এ গান আপন সুরে
মন তোর রাখে পুরে,
ইষ্টমন্ত্র-সম সদা বাজে তোর কানে।

আমার এ গান যেন সুদীর্ঘ জীবন
তোমার বসন হয়, তোমার ভূষণ।
পৃথিবীর ধূলিজাল
করে দেয় অন্তরাল,
তোমারে করিয়া রাখে সুন্দর শোভন।

আমার এ গান যেন নাহি মানে মানা,
উদার বাতাস হয়ে এলাইয়া ডানা
সৌরভের মতো তোরে
নিয়ে যায় চুরি করে—
খুঁজিয়া দেখাতে যায় স্বর্গের সীমানা।

এ গান যেন রে হয় তোর ধ্রুবতারা,
অন্ধকারে অনিমেষে নিশি করে সারা।
তোমার মুখের 'পরে
জেগে থাকে স্নেহভরে,
অকূলে নয়ন মেলি দেখায় কিনারা।

আমার এ গান যেন পশি তোর কানে
মিলায়ে মিশায়ে যায় সমস্ত পরানে।

তপ্ত শোণিতের মতো
বহে শিরে অবিরত,
আনন্দে নাচিয়া উঠে মহত্ত্বের গানে।

এ গান বাঁচিয়া থাকে যেন তোর মাঝে,
আঁখিতারা হয়ে তোর আঁখিতে বিরাজে।
এ যেন রে করে দান
সতত নূতন প্রাণ,
এ যেন জীবন পায় জীবনের কাজে।

যদি যাই, মৃত্যু যদি নিয়ে যায় ডাকি,
এই গানে রেখে যাব মোর স্নেহ-আঁখি।
যবে হায় সব গান
হয়ে যাবে অবসান,
এ গানের মাঝে আমি যেন বেঁচে থাকি।

খেলা

পথের ধারে অশথতলে
মেয়েটি খেলা করে;
আপন মনে আপনি আছে
সারাটি দিন ধরে।
উপর-পানে আকাশ শুধু,
সমুখ-পানে মাঠ,
শরৎকালে রোদ পড়েছে,
মধুর পথ ঘাট।
দুটি-একটি পথিক চলে,
গল্প করে, হাসে।
লজ্জাবতী বধূটি গেল
ছায়াটি নিয়ে পাশে।
আকাশ-ঘেরা মাঠের ধারে
বিশাল খেলাঘরে
একটি মেয়ে আপন মনে
কতই খেলা করে।

মাথার 'পরে ছায়া পড়েছে,
রোদ পড়েছে কোলে,
পায়ের কাছে একটি লতা
বাতাস পেয়ে দোলে।

মাঠের থেকে বাছুর আসে,
দেখে নূতন লোক,
ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে থাকে
ড্যাবা ড্যাবা চোখ।
কাঠবিড়ালি উসুখুসু
আশেপাশে ছোটে,
শব্দ পেলে লেজটি তুলে
চমক খেয়ে ওঠে।
মেয়েটি তাই চেয়ে দেখে
কত যে সাধ যায়—
কোমল গায়ে হাত বুলায়ে
চুমো খেতে চায়।

সাধ যেতেছে কাঠবিড়ালি
তুলে নিয়ে বুকে,
ভেঙে ভেঙে টুকুটুকু
খাবার দেবে মুখে।
মিষ্টি নামে ডাকবে তারে
গালের কাছে রেখে,
বুকের মধ্যে রেখে দেবে
আঁচল দিয়ে ঢেকে।
"আয় আয়" ডাকে সে তাই—
করুণ স্বরে কয়,
"আমি কিছু বলব না তো,
আমায় কেন ভয়!"
মাথা তুলে চেয়ে থাকে
উঁচু ডালের পানে—
কাঠবিড়ালি ছুটে পালায়,
ব্যথা সে পায় প্রাণে।

রাখাল ছেলের বাঁশি বাজে
সুদূর তরুছায়,
খেলতে খেলতে মেয়েটি তাই
খেলা ভুলে যায়।
তরুর মূলে মাথা রেখে
চেয়ে থাকে পথে,
না জানি কোন্ পরীর দেশে
ধায় সে মনোরথে।
একলা কোথায় ঘুরে বেড়ায়
মায়া-দ্বীপে গিয়ে—
হেনকালে চাষী আসে
দুটি গোরু নিয়ে।

শব্দ শুনে কেঁপে ওঠে,
চমক ভেঙে চায়।
আঁখি হতে মিলায় মায়া,
স্বপন টুটে যায়।

পাখির পালক

খেলাধুলো সব রহিল পড়িয়া
ছুটে চলে আসে মেয়ে—
বলে তাড়াতাড়ি—"ওমা দেখ্ দেখ্,
কী এনেছি দেখ্ চেয়ে!"
আঁখির পাতায় হাসি চমকায়,
ঠোঁটে নেচে ওঠে হাসি,
হয়ে যায় ভুল, বাঁধে নাকো চুল,
খুলে পড়ে কেশরাশি!
দুটি হাত তার ঘিরিয়া ঘিরিয়া
রাঙা চুড়ি কয়গাছি,
করতালি পেয়ে বেজে ওঠে তারা
কেঁপে ওঠে তারা নাচি।
মায়ের গলায় বাহুদুটি বেঁধে
কোলে এসে বসে মেয়ে।
বলে তাড়াতাড়ি—"ওমা দেখ্ দেখ্,
কী এনেছি দেখ্ চেয়ে!"

সোনালি রঙের পাখির পালক
ধোয়া সে সোনার স্রোতে,
খসে এল যেন তরুণ আলোক
অরুণের পাখা হতে;
নয়ন-ঢুলানো কোমল পরশ
ঘুমের পরশ যথা,
মাখা যেন তায় মেঘের কাহিনী
নীল আকাশের কথা!
ছোটোখাটো নীড়, শাবকের ভিড়
কতমতো কলরব,
প্রভাতের সুখ, উড়িবার আশা
মনে পড়ে যেন সব।
লয়ে সে পালক কপোলে বুলায়,
আঁখিতে বুলায় মেয়ে,
বলে হেসে হেসে, "ওমা দেখ্ দেখ্,
কী এনেছি দেখ্ চেয়ে।"

মা দেখিল চেয়ে, কহিল হাসিয়ে,
"কিবা জিনিসের ছিরি?"
ভূমিতে ফেলিয়া যাইল চলিয়া,
আর না চাহিল ফিরি।
মেয়েটির মুখে কথা না ফুটিল,
মাটিতে রহিল বসি।
শূন্য হতে যেন পাখির পালক
ভূতলে পড়িল খসি!
খেলাধুলো তার হল নাকো আর,
হাসি মিলাইল মুখে,
ধীরে ধীরে শেষে দুটি ফোঁটা জল
দেখা দিল দুটি চোখে।
পালকটি লয়ে রাখিল লুকায়ে
গোপনের ধন তার,
আপনি খেলিত, আপনি তুলিত,
দেখাত না কারে আর!

আশীর্বাদ

ইহাদের করো আশীর্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি,
নন্দনের এনেছে সম্বাদ,
ইহাদের করো আশীর্বাদ।

ছোটো ছোটো হাসিমুখ
জানে না ধরার দুখ,
হেসে আসে তোমাদের দ্বারে।
নবীন নয়ন তুলি
কৌতুকেতে দুলি দুলি
চেয়ে চেয়ে দেখে চারি ধারে।
সোনার রবির আলো
কত তার লাগে ভালো,
ভালো লাগে মায়ের বদন।
হেথায় এসেছে ভুলি,
ধূলিরে জানে না ধূলি,
সবই তার আপনার ধন।
কোলে তুলে লও এরে,
এ যেন কেঁদে না ফেরে,
হরষেতে না ঘটে বিষাদ,

বুকের মাঝারে নিয়ে
পরিপূর্ণ প্রাণ দিয়ে
ইহাদের করো আশীর্বাদ।

তোমার কোলের কাছে
কত সাধে আসিয়াছে,
তোমা-'পরে কত-না বিশ্বাস।
ওই কোল হতে খ'সে
এ যেন গো পথে ব'সে
এক দিন না ফেলে নিশ্বাস।
নতুন প্রবাসে এসে
সহস্র পথের দেশে
নীরবে চাহিছে চারি ভিতে,
এত শত লোক আছে
এসেছে তোমারি কাছে
সংসারের পথ শুধাইতে।
যেথা তুমি লয়ে যাবে
কথাটি না কয়ে যাবে,
সাথে যাবে ছায়ার মতন,
তাই বলি—দেখো দেখো,
এ বিশ্বাস রেখো রেখো,
পাথারে দিয়ো না বিসর্জন!

ক্ষুদ্র এ মাথার 'পর
রাখো গো করুণ কর,
ইহারে কোরো না অবহেলা।
এ ঘোর সংসার-মাঝে
এসেছে কঠিন কাজে,
আসে নি করিতে শুধু খেলা!
দেখে মুখশতদল
চোখে মোর আসে জল,
মনে হয় বাঁচিবে না বুঝি,
পাছে সুকুমার প্রাণ
ছিঁড়ে হয় খান্ খান্,
জীবনের পারাবারে যুঝি!
এই হাসিমুখগুলি
হাসি পাছে যায় ভুলি,
পাছে ঘেরে আঁধার প্রমাদ!
উহাদের কাছে ডেকে,
বুকে রেখে, কোলে রেখে
তোমরা করো গো আশীর্বাদ।

বলো, "সুখে যাও চলে
ভবের তরঙ্গ দ'লে,
স্বর্গ হতে আসুক বাতাস—
সুখ দুঃখ কোরো হেলা
সে কেবল ঢেউ-খেলা
নাচিবে তোদের চারি পাশ।"

বসন্ত-অবসান

কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান!
কখন বকুল-মূল ছেয়েছিল ঝরা ফুল,
কখন যে ফুল-ফোটা হয়ে গেল অবসান!
কখন বসন্ত গেল এবার হল না গান!

এবার বসন্তে কি রে যূথিগুলি জাগে নি রে!
অলিকুল গুঞ্জরিয়া করে নি কি মধুপান!
এবার কি সমীরণ জাগায় নি ফুলবন,
সাড়া দিয়ে গেল না তো, চলে গেল ম্রিয়মাণ!
কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান!

যতগুলি পাখি ছিল গেয়ে বুঝি চলে গেল,
সমীরণে মিলে গেল বনের বিলাপতান।
ভেঙেছে ফুলের মেলা, চলে গেছে হাসি-খেলা,
এতক্ষণে সন্ধ্যাবেলা জাগিয়া চাহিল প্রাণ।
কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান!

বসন্তের শেষ রাতে এসেছি রে শূন্য হাতে,
এবার গাঁথি নি মালা, কী তোমারে করি দান!
কাঁদিছে নীরব বাঁশি, অধরে মিলায় হাসি,
তোমার নয়নে ভাসে ছলছল অভিমান।
এবার বসন্ত গেল, হল না, হল না গান!

বাঁশি

ওগো, শোনো কে বাজায়!
বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়।
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি চুরি করে হাসিখানি,
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়।
ওগো শোনো কে বাজায়!

কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে,
বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে।
যমুনারই কলতান কানে আসে, কাঁদে প্রাণ,
আকাশে ওই মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়!
ওগো শোনো কে বাজায়!

বিরহ

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
আকুলনয়ন রে!
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে
কুসুমচয়ন রে!
কত শারদ যামিনী হইবে বিফল,
বসন্ত যাবে চলিয়া!
কত উদিবে তপন আশার স্বপন,
প্রভাতে যাইবে ছলিয়া!
এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া,
মরিব কাঁদিয়া রে!
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
সাধিয়া সাধিয়া রে।

আমি কার পথ চাহি এ জনম বাহি,
কার দরশন যাচি রে!
যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া,
তাই আমি বসে আছি রে।
তাই মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়
নীলবাসে তনু ঢাকিয়া,
তাই বিজন আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে
একেলা রয়েছি জাগিয়া।
ওগো তাই কত নিশি চাঁদ ওঠে হাসি,
তাই কেঁদে যায় প্রভাতে।
ওগো তাই ফুলবনে মধুসমীরণে
ফুটে ফুল কত শোভাতে!

ওই বাঁশিস্বর তার আসে বার বার,
সেই শুধু কেন আসে না!
এই হৃদয়-আসন শূন্য যে থাকে,
কেঁদে মরে শুধু বাসনা।
মিছে পরশিয়া কায় বায়ু বহে যায়,
বহে যমুনার লহরী,

কেন কুহু কুহু পিক কুহরিয়া ওঠে—
যামিনী যে ওঠে শিহরি।
ওগো যদি নিশিশেষে আসে হেসে হেসে
মোর হাসি আর রবে কি!
এই জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন
আমারে হেরিয়া কবে কী!
আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা
প্রভাতে চরণে ঝরিব,
ওগো আছে সুশীতল যমুনার জল—
দেখে তারে আমি মরিব।

বাকি

কুসুমের গিয়েছে সৌরভ,
জীবনের গিয়েছে গৌরব।
এখন যা-কিছু সব ফাঁকি,
ঝরিতে মরিতে শুধু বাকি।

বিলাপ

ওগো এত প্রেম-আশা প্রাণের তিয়াষা
কেমনে আছে সে পাসরি!
তবে সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী,
সেথা কি বাজে না বাঁশরি!
সখী, হেথা সমীরণ লুঠে ফুলবন,
সেথা কি পবন বহে না!
সে যে তার কথা মোরে কহে অনুক্ষণ,
মোর কথা তারে কহে না!
যদি আমারে আজি সে ভুলিবে সজনী
আমারে ভুলালে কেন সে!
ওগো এ চিরজীবন করিব রোদন
এই ছিল তার মানসে!
যবে কুসুমশয়নে নয়নে নয়নে
কেটেছিল সুখরাতি রে,
তবে কে জানিত তার বিরহ আমার
হবে জীবনের সাথী রে!
যদি মনে নাহি রাখে, সুখে যদি থাকে,
তোরা একবার দেখে আয়—
এই নয়নের তৃষা পরানের আশা
চরণের তলে রেখে আয়।

আর নিয়ে যা রাধার বিরহের ভার,
কত আর ঢেকে রাখি বল্।
আর পারিস যদি তো আনিস হরিয়ে
এক ফোঁটা তার আঁখিজল।
না না, এত প্রেম সখী ভুলিতে যে পারে
তারে আর কেহ সেধো না।
আমি কথা নাহি কব, দুখ লয়ে রব,
মনে মনে স'ব বেদনা।
ওগো মিছে মিছে সখী, মিছে এই প্রেম,
মিছে পরানের বাসনা।
ওগো সুখদিন হায় যবে চলে যায়
আর ফিরে আর আসে না।

সারাবেলা

হেলাফেলা সারাবেলা
এ কী খেলা আপন-সনে!
এই বাতাসে ফুলের বাসে
মুখখানি কার পড়ে মনে!
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি
কে জানে গো কাহার হাসি!
দুটি ফোঁটা নয়নসলিল
রেখে যায় এই নয়নকোণে!
কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী
দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন
কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে।
সারা দিন গাঁথি গান
কারে চাহে, গাহে প্রাণ,
তরুতলের ছায়ার মতন
বসে আছি ফুলবনে।

আকাঙ্ক্ষা

আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়!
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে,
বিহগবিহগী কী যে গায়!

আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে,
রহে না আবাসে মন হায়!
কোন্ কুসুমের আশে কোন্ ফুলবাসে
সুনীল আকাশে মন ধায়!

আজি কে যেন গো নাই, এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো!
তাই চারি দিকে চায়, মন কেঁদে গায়—
'এ নহে, এ নহে, নয় গো!'
কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়!
আজি কোন্ উপবনে বিরহবেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায়!

আমি যদি গাঁথি গান অথির-পরান
সে গান শুনাব কারে আর!
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলডালা
কাহারে পরাব ফুলহার!
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান
দিব প্রাণ তবে কার পায়!
সদা ভয় হয় মনে পাছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়!

তুমি

তুমি কোন্ কাননের ফুল,
তুমি কোন্ গগনের তারা!
তোমায় কোথায় দেখেছি
যেন কোন্ স্বপনের পারা!
কবে তুমি গেয়েছিলে,
আঁখির পানে চেয়েছিলে
ভুলে গিয়েছি।
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে
ওই নয়নের তারা।
তুমি কথা কোয়ো না,
তুমি চেয়ে চলে যাও।
এই চাঁদের আলোতে
তুমি হেসে গলে যাও।

আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে
চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে,
তোমার আঁখির মতন দুটি তারা
ঢালুক কিরণ-ধারা।

ভুল

বিদায় করেছ যারে
নয়নজলে,
এখন ফিরাবে তারে
কিসের ছলে!
আজি মধু-সমীরণে,
নিশীথে কুসুম-বনে
তাহারে পড়েছে মনে
বকুলতলে!
এখন ফিরাবে তারে
কিসের ছলে!

সেদিনও তো মধুনিশি
প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশ দিশি
কুসুম-দলে;
দুটি সোহাগের বাণী
যদি হত কানাকানি,
যদি ওই মালাখানি
পরাতে গলে!
এখন ফিরাবে আর
কিসের ছলে!

মধুরাতি পূর্ণিমার
ফিরে আসে বার বার,
সে জন ফেরে না আর
যে গেছে চলে!
ছিল তিথি অনুকূল,
শুধু নিমেষের ভুল,
চিরদিন তৃষাকুল
পরান জ্বলে!
এখন ফিরাবে তারে
কিসের ছলে!

গান

ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে!
আমার ঘরে কেহ নাই যে!
তারে মনে পড়ে যারে চাই যে!
তার আকুল পরান বিরহের গান
বাঁশি বুঝি গেল জানায়ে!
আমি আমার কথা তারে জানাব কী করে,
প্রাণ কাঁদে মোর তাই যে!

কুসুমের মালা গাঁথা হল না,
ধূলিতে পড়ে শুকায় রে!
নিশি হয় ভোর, রজনীর চাঁদ
মলিন মুখ লুকায় রে!
সারা বিভাবরী কার পূজা করি
যৌবনডালা সাজায়ে!
ওই বাঁশিস্বরে হায় প্রাণ নিয়ে যায়,
আমি কেন থাকি হায় রে!

ছোটো ফুল

আমি শুধু মালা গাঁথি ছোটো ছোটো ফুলে,
সে ফুল শুকায়ে যায় কথায় কথায়।
তাই যদি, তাই হোক, দুঃখ নাহি তায়—
তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে।
যারা থাকে অন্ধকারে, পাষাণকারায়,
আমার এ মালা যদি লহে গলে তুলে,
নিমেষের তরে তারা যদি সুখ পায়,
নিষ্ঠুর বন্ধন-ব্যথা যদি যায় ভুলে!
ক্ষুদ্র ফুল, আপনার সৌরভের সনে
নিয়ে আসে স্বাধীনতা, গভীর আশ্বাস—
মনে আনে রবিকর নিমেষস্বপনে,
মনে আনে সমুদ্রের উদার বাতাস।
ক্ষুদ্র ফুল দেখে যদি কারো পড়ে মনে
বৃহৎ জগৎ, আর বৃহৎ আকাশ!

যৌবনস্বপ্ন

আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।

পরানে পুলক বিকাশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস
যেথা ছিল যত বিরহিণী সকলের কুড়ায়ে নিশ্বাস!
বসন্তের কুসুমকাননে গোলাপের আঁখি কেন নত?
জগতের যত লাজময়ী যেন মোর আঁখির সকাশ
কাঁপিছে গোলাপ হয়ে এসে, মরমের শরমে বিব্রত!
প্রতি নিশি ঘুমাই যখন পাশে এসে বসে যেন কেহ,
সচকিত স্বপনের মতো জাগরণে পলায় সলাজে।
যেন কার আঁচলের বায় উষায় পরশি যায় দেহ,
শত নূপুরের রুনুঝুনু বনে যেন গুঞ্জরিয়া বাজে।
মদির প্রাণের ব্যাকুলতা ফুটে ফুটে বকুলমুকুলে;
কে আমারে করেছে পাগল— শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে!
যেন কোন্ উর্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে!

ক্ষণিক মিলন

আকাশের দুই দিক হতে দুইখানি মেঘ এল ভেসে,
দুইখানি দিশাহারা মেঘ— কে জানে এসেছে কোথা হতে!
সহসা থামিল থমকিয়া আকাশের মাঝখানে এসে।
দোঁহা-পানে চাহিল দুজনে চতুর্থীর চাঁদের আলোতে।
ক্ষীণালোকে বুঝি মনে পড়ে দুই অচেনার চেনাশোনা,
মনে পড়ে কোন্ ছায়া-দ্বীপে, কোন্ কুহেলিকা-ঘেরা দেশে,
কোন্ সন্ধ্যাসাগরের কূলে দুজনের ছিল আনাগোনা!
মেলে দোঁহে তবুও মেলে না, তিলেক বিরহ রহে মাঝে—
চেনা বলে মিলিবারে চায়, অচেনা বলিয়া মরে লাজে।
মিলনের বাসনার মাঝে আধখানি চাঁদের বিকাশ—
দুটি চুম্বনের ছোঁয়াছুঁয়ি, মাঝে যেন শরমের হাস!
দুখানি অলস আঁখিপাতা, মাঝে সুখস্বপন-আভাস!
দোঁহার পরশ লয়ে দোঁহে ভেসে গেল, কহিল না কথা—
বলে গেল সন্ধ্যার কাহিনী, লয়ে গেল উষার বারতা।

গানোচ্ছ্বাস

নীরব বাঁশরিখানি বেজেছে আবার।
প্রিয়ার বারতা বুঝি এসেছে আমার
বসন্তকানন-মাঝে বসন্তসমীরে!
তাই বুঝি মনে পড়ে ভোলা গান যত!
তাই বুঝি ফুলবনে জাহ্নবীর তীরে
পুরাতন হাসিগুলি ফুটে শত শত!

তাই বুঝি হৃদয়ের বিস্মৃত বাসনা
জাগিছে নবীন হয়ে পল্লবের মতো!
জগতকমলবনে কমল-আসনা
কতদিন পরে বুঝি তাই এল ফিরে!
সে এল না, এল তার মধুর মিলন!
বসন্তের গান হয়ে এল তার স্বর!
দৃষ্টি তার ফিরে এল, কোথা সে নয়ন?
চুম্বন এসেছে তার, কোথা সে অধর?

স্তন

নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল,
বিকশিত যৌবনের বসন্তসমীরে
কুসুমিত হয়ে ওই ফুটেছে বাহিরে,
সৌরভসুধায় করে পরান পাগল।
মরমের কোমলতা তরঙ্গ তরল
উথলি উঠেছে যেন হৃদয়ের তীরে।
কী যেন বাঁশির ডাকে জগতের প্রেমে
বাহিরিয়া আসিতেছে সলাজ হৃদয়,
সহসা আলোতে এসে গেছে যেন থেমে-
শরমে মরিতে চায় অঞ্চল-আড়ালে।
প্রেমের সংগীত যেন বিকশিয়া রয়,
উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃদয়ের তালে।
হেরো গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর—
হেরো নারীহৃদয়ের পবিত্র মন্দির।

২

পবিত্র সুমেরু বটে এই সে হেথায়,
দেবতাবিহারভূমি কনক-অচল।
উন্নত সতীর স্তন স্বরগপ্রভায়
মানবের মর্তভূমি করেছে উজ্জ্বল।
শিশু রবি হোথা হতে ওঠে সুপ্রভাতে,
শ্রান্ত রবি সন্ধ্যাবেলা হোথা অস্ত যায়।
দেবতার আঁখিতারা জেগে থাকে রাতে,
বিমল পবিত্র দুটি বিজন শিখরে।
চিরস্নেহ-উৎসধারে অমৃতনির্ঝরে
সিক্ত করি তুলিতেছে বিশ্বের অধর।
জাগে সদা সুখসুপ্ত ধরণীর 'পরে,
অসহায় জগতের অসীম নির্ভর।

ধরণীর মাঝে থাকি স্বর্গ আছে চুমি,
দেবশিশু মানবের ওই মাতৃভূমি।

চুম্বন

অধরের কানে যেন অধরের ভাষা।
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে।
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধরসংগমে।
দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে।
ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে,
দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা।
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরেতে থর থরে চুম্বনের লেখা।
দুখানি অধর হতে কুসুমচয়ন,
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে।
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসরশয়ন।

বিবসনা

ফেলো গো বসন ফেলো, ঘুচাও অঞ্চল।
পরো শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ
সুরবালিকার বেশ কিরণবসন।
পরিপূর্ণ তনুখানি বিকচ কমল,
জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা।
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে দাঁড়াও একেলা।
সর্বাঙ্গে পড়ুক তব চাঁদের কিরণ,
সর্বাঙ্গে মলয়-বায়ু করুক সে খেলা।
অসীম নীলিমা-মাঝে হও নিমগন
তারাময়ী বিবসনা প্রকৃতির মতো।
অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।
আসুক বিমল উষা মানবভবনে,
লাজহীনা পবিত্রতা—শুভ্র বিবসনে।

বাহু

কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা,
কাহারে কাঁদিয়া বলে 'যেয়ো না যেয়ো না'।
কেমনে প্রকাশ করে ব্যাকুল বাসনা,
কে শুনেছে বাহুর নীরব আকুলতা!
কোথা হতে নিয়ে আসে হৃদয়ের কথা,
গায়ে লিখে দিয়ে যায় পুলক-অক্ষরে।
পরশে বহিয়া আনে মরমবারতা,
মোহ মেখে রেখে যায় প্রাণের ভিতরে।
কণ্ঠ হতে উতারিয়া যৌবনের মালা
দুইটি আঙুলে ধরি তুলি দেয় গলে।
দুটি বাহু বহি আনে হৃদয়ের ডালা,
রেখে দিয়ে যায় যেন চরণের তলে।
লতায়ে থাকুক বুকে চির-আলিঙ্গন,
ছিঁড়ো না ছিঁড়ো না দুটি বাহুর বন্ধন।

চরণ

দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়—
দুখানি অলস রাঙা কোমল চরণ।
শত বসন্তের স্মৃতি জাগিছে ধরায়,
শত লক্ষ কুসুমের পরশস্বপন।
শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায়।
প্রভাতের প্রদোষের দুটি সূর্যলোক
অস্ত গেছে যেন দুটি চরণছায়ায়।
যৌবনসংগীত পথে যেতেছে ছড়ায়ে,
নূপুর কাঁদিয়া মরে চরণ জড়ায়ে,
নৃত্য সদা বাঁধা যেন মধুর মায়ায়।
হোথা যে নিঠুর মাটি, শুষ্ক ধরাতল—
এসো গো হৃদয়ে এসো, ঝুরিছে হেথায়
লাজরক্ত লালসার রাঙা শতদল।

হৃদয়-আকাশ

আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখি,
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ।

দুখানি আঁখির পাতে কী রেখেছ ঢাকি,
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে উষার আভাস।
হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী
আঁখি-তারকার দেশে করিবারে বাস।
ওই গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি,
হোথায় হারাতে চায় এ গীত-উচ্ছ্বাস।
তোমার হৃদয়াকাশ অসীম বিজন—
বিমল নীলিমা তার শান্ত সুকুমার,
যদি নিয়ে যাই ওই শূন্য হয়ে পার
আমার দুখানি পাখা কনকবরন।
হৃদয় চাতক হয়ে চাবে অশ্রুধার,
হৃদয়চকোর চাবে হাসির কিরণ।

অঞ্চলের বাতাস

পাশ দিয়ে গেল চলি চকিতের প্রায়,
অঞ্চলের প্রান্তখানি ঠেকে গেল গায়,
শুধু দেখা গেল তার আধখানি পাশ—
শিহরি পরশি গেল অঞ্চলের বায়।
অজানা হৃদয়বনে উঠেছে উচ্ছ্বাস,
অঞ্চলে বহিয়া এল দক্ষিণ বাতাস,
সেথা যে বেজেছে বাঁশি তাই শুনা যায়,
সেথায় উঠিছে কেঁদে ফুলের সুবাস।
কার প্রাণখানি হতে করি হায় হায়
বাতাসে উড়িয়া এল পরশ-আভাস!
ওগো কার তনুখানি হয়েছে উদাস,
ওগো কে জানাতে চাহে মরমবারতা!
দিয়ে গেল সর্বাঙ্গের আকুল নিশ্বাস,
বলে গেল সর্বাঙ্গের কানে কানে কথা।

দেহের মিলন

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ-তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ-'পরে।
তোমার নয়ন-পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।

তৃষিত পরান আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।
হৃদয় লুকানো আছে দেহের সায়রে,
চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন।
সর্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য-মাঝে হইব মগন।
আমার এ দেহ মন চির রাত্রিদিন
তোমার সর্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।

তনু

ওই তনুখানি তব আমি ভালোবাসি।
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।
শিশিরেতে টলমল ঢলঢল ফুল
টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকাশি।
চারি দিকে গুঞ্জরিছে জগৎ আকুল,
সারা নিশি সারা দিন ভ্রমর পিপাসী।
ভালোবেসে বায়ু এসে দুলাইছে দুল,
মুখে পড়ে মোহভরে পূর্ণিমার হাসি।
পূর্ণ দেহখানি হতে উঠিছে সুবাস।
মরি মরি, কোথা সেই নিভৃত নিলয়
কোমল শয়নে যেথা ফেলিছে নিশ্বাস
তনুঢাকা মধুমাখা বিজন হৃদয়!
ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব, বালা,
পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা।

স্মৃতি

ওই দেহ-পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্ব জনমের স্মৃতি।
সহস্র হারানো সুখ আছে ও নয়নে,
জন্ম-জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।
যেন গো আমারি তুমি আত্মবিস্মরণ,
অনন্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক,
কত নব জগতের কুসুমকানন,
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক।
কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ,
সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা
মধুর মুরতি ধরি দেখা দিল আজ।

তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন
জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন।

হৃদয়-আসন

কোমল দুখানি বাহু শরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়,
তারি মাঝখানে কি রে রয়েছে লুকায়ে
অতিশয় সযতন গোপন হৃদয়!
সেই নিরালায় সেই কোমল আসনে
দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়
কিশোর প্রেমের মৃদু প্রদোষকিরণে
আনত আঁখির তলে রাখিবে আমায়!
কত-না মধুর আশা ফুটিছে সেথায়—
গভীর নিশীথে কত বিজন কল্পনা,
উদাস নিশ্বাস-বায়ু বসন্তসন্ধ্যায়,
গোপনে চাঁদিনী রাতে দুটি অশ্রুকণা!
তারি মাঝে আমারে কি রাখিবে যতনে
হৃদয়ের সুমধুর স্বপন-শয়নে!

কল্পনার সাথী

যখন কুসুমবনে ফির একাকিনী,
ধরায় লুটায়ে পড়ে পূর্ণিমাযামিনী,
দক্ষিণবাতাসে আর তটিনীর গানে
শোন যবে আপনার প্রাণের কাহিনী—
যখন শিউলি ফুলে কোলখানি ভরি
দুটি পা ছড়ায়ে দিয়ে আনতবয়ানে
ফুলের মতন দুটি অঙ্গুলিতে ধরি
মালা গাঁথ ভোরবেলা গুন্ গুন্ তানে—
মধ্যাহ্নে একেলা যবে বাতায়নে বসে
নয়নে মিলাতে চায় সুদূর আকাশ,
কখন আঁচলখানি পড়ে যায় খসে,
কখন হৃদয় হতে উঠে দীর্ঘশ্বাস,
কখন অশ্রুটি কাঁপে নয়নের পাতে—
তখন আমি কি সখী, থাকি তব সাথে!

হাসি

সুদূর প্রবাসে আজি কেন রে কী জানি
কেবলি পড়িছে মনে তার হাসিখানি।
কখন নামিয়া গেল সন্ধ্যার তপন,
কখন থামিয়া গেল সাগরের বাণী।
কোথায় ধরার ধারে বিরহবিজন
একটি মাধবীলতা আপন ছায়াতে
দুটি অধরের রাঙা কিশলয়-পাতে
হাসিটি রেখেছে ঢেকে কুঁড়ির মতন!
সারা রাত নয়নের সলিল সিঞ্চিয়া
রেখেছে কাহার তরে যতনে সঞ্চিয়া!
সে হাসিটি কে আসিয়া করিবে চয়ন,
লুব্ধ এই জগতের সবারে বঞ্চিয়া!
তখন দুখানি হাসি মরিয়া বাঁচিয়া
তুলিবে অমর করি একটি চুম্বন।

নিদ্রিতার চিত্র

মায়ায় রয়েছে বাঁধা প্রদোষ-আঁধার,
চিত্রপটে সন্ধ্যাতারা অস্ত নাহি যায়।
এলাইয়া ছড়াইয়া গুচ্ছ কেশভার
বাহুতে মাথাটি রেখে রমণী ঘুমায়।
চারি দিকে পৃথিবীতে চিরজাগরণ,
কে ওরে পাড়ালে ঘুম তারি মাঝখানে!
কোথা হতে আহরিয়া নীরব গুঞ্জন
চিরদিন রেখে গেছে ওরই কানে কানে!
ছবির আড়ালে কোথা অনন্ত নির্ঝর
নীরব ঝর্ঝর-গানে পড়িছে ঝরিয়া।
চিরদিন কাননের নীরব মর্মর,
লজ্জা চিরদিন আছে দাঁড়ায়ে সমুখে—
যেমনি ভাঙিবে ঘুম, মরমে মরিয়া
বুকের বসনখানি তুলে দিবে বুকে।

কল্পনামধুপ

প্রতিদিন প্রাতে শুধু গুন্ গুন্ গান,
লালসে-অলস-পাখা অলির মতন।
বিকল হৃদয় লয়ে পাগল পরান
কোথায় করিতে যায় মধু অন্বেষণ।

বেলা বহে যায় চলে— শ্রান্ত দিনমান,
তরুতলে ক্লান্ত ছায়া করিছে শয়ন,
মুরছিয়া পড়িতেছে বাঁশরির তান,
সেঁউতি শিথিলবৃন্ত মুদিছে নয়ন।
কুসুমদলের বেড়া, তারি মাঝে ছায়া,
সেথা বসে করি আমি কল্পমধু পান—
বিজনে সৌরভময়ী মধুময়ী মায়া,
তাহারি কুহকে আমি করি আত্মদান।
রেণুমাখা পাখা লয়ে ঘরে ফিরে আসি,
আপন সৌরভে থাকি আপনি উদাসী।

পূর্ণ মিলন

নিশিদিন কাঁদি সখী মিলনের তরে
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন।
লও লও বেঁধে লও কেড়ে লও মোরে—
লও লজ্জা, লও বস্ত্র, লও আবরণ।
এ তরুণ তনুখানি লহ চুরি করে—
আঁখি হতে লও ঘুম, ঘুমের স্বপন।
জাগ্রত বিপুল বিশ্ব লও তুমি হরে,
অনন্ত কালের মোর জীবন মরণ।
বিজন বিশ্বের মাঝে মিলনশ্মশানে
নির্বাপিত সূর্যালোক লুপ্ত চরাচর,
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর।
এ কী দুরাশার স্বপ্ন, হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে!

শ্রান্তি

সুখশ্রমে আমি সখী শ্রান্ত অতিশয়;
পড়েছে শিথিল হয়ে শিরার বন্ধন।
অসহ্য কোমল ঠেকে কুসুমশয়ন,
কুসুমরেণুর সাথে হয়ে যাই লয়।
স্বপনের জালে যেন পড়েছি জড়ায়ে।
যেন কোন্‌ অস্তাচলে সন্ধ্যাস্বপ্নময়
রবির ছবির মতো যেতেছি গড়ায়ে,
সুদূরে মিলিয়া যায় নিখিল নিলয়।
ডুবিতে ডুবিতে যেন সুখের সাগরে
কোথাও না পাই ঠাঁই, শ্বাস রুদ্ধ হয়—

পরান কাঁদিতে থাকে মৃত্তিকার তরে।
এ যে সৌরভের বেড়া, পাষাণের নয়—
কেমনে ভাঙিতে হবে ভাবিয়া না পাই,
অসীম নিদ্রার ভারে পড়ে আছি তাই।

বন্দী

দাও খুলে দাও, সখী, ওই বাহুপাশ।
চুম্বনমদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরান।
কোথায় উষার আলো, কোথায় আকাশ!
এ চির পূর্ণিমারাত্রি হোক অবসান।
আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ,
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ!
আকুল অঙ্গুলিগুলি করি কোলাকুলি
গাঁথিছে সর্বাঙ্গে মোর পরশের ফাঁদ।
ঘুমঘোরে শূন্য-পানে দেখি মুখ তুলি
শুধু অবিশ্রামহাসি একখানি চাঁদ।
স্বাধীন করিয়া দাও, বেঁধো না আমায়—
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়।

কেন

কেন গো এমন স্বরে বাজে তবে বাঁশি,
মধুর সুন্দর রূপে কেঁদে ওঠে হিয়া,
রাঙা অধরের কোণে হেরি মধুহাসি
পুলকে যৌবন কেন উঠে বিকশিয়া!
কেন তনু বাহুডোরে ধরা দিতে চায়,
ধায় প্রাণ দুটি কালো আঁখির উদ্দেশে,
হায় যদি এত লজ্জা কথায় কথায়,
হায় যদি এত শ্রান্তি নিমেষে নিমেষে!
কেন কাছে ডাকে যদি মাঝে অন্তরাল,
কেন রে কাঁদায় প্রাণ সবই যদি ছায়া,
আজ হাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিবে কাল,
এরি তরে এত তৃষ্ণা—এ কাহার মায়া!
মানবহৃদয় নিয়ে এত অবহেলা,
খেলা যদি, কেন হেন মর্মভেদী খেলা!

মোহ

এ মোহ ক'দিন থাকে, এ মায়া মিলায়,
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে।
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়,
মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।
কেহ কারে নাহি চিনে আঁধার নিশায়।
ফুল ফোটা সাঙ্গ হলে গাহে না পাখিতে।
কোথা সেই হাসিপ্রান্ত চুম্বনতৃষিত
রাঙা পুষ্পটুকু যেন প্রস্ফুট অধর!
কোথা কুসুমিত তনু পূর্ণবিকশিত,
কম্পিত পুলকভরে, যৌবনকাতর!
তখন কি মনে পড়ে সেই ব্যাকুলতা,
সেই চিরপিপাসিত যৌবনের কথা,
সেই প্রাণপরিপূর্ণ মরণ-অনল—
মনে প'ড়ে হাসি আসে? চোখে আসে জল?

পবিত্র প্রেম

ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না ওরে, দাঁড়াও সরিয়া।
ম্লান করিয়ো না আর মলিন পরশে।
ওই দেখো তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া,
বাসনানিশ্বাস তব গরল বরষে।
জান না কি হৃদি-মাঝে ফুটেছে যে ফুল
ধুলায় ফেলিলে তারে ফুটিবে না আর।
জান না কি সংসারের পাথার অকূল,
জান না কি জীবনের পথ অন্ধকার।
আপনি উঠেছে ওই তব ধ্রুবতারা,
আপনি ফুটেছে ফুল বিধির কৃপায়,
সাধ করে কে আজি রে হবে পথহারা—
সাধ করে এ কুসুম কে দলিবে পায়!
যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস,
যারে ভালোবাস তারে করিছ বিনাশ!

পবিত্র জীবন

মিছে হাসি মিছে বাঁশি মিছে এ যৌবন,
মিছে এই দরশের পরশের খেলা।
চেয়ে দেখো, পবিত্র এ মানবজীবন,
কে ইহারে অকাতরে করে অবহেলা!

ভেসে ভেসে এই মহা চরাচরস্রোতে
কে জানে গো আসিয়াছে কোন্‌খান হতে,
কোথা হতে নিয়ে এল প্রেমের আভাস,
কোন্‌ অন্ধকার ভেদি উঠিল আলোতে।
এ নহে খেলার ধন, যৌবনের আশ—
বোলো না ইহার কানে আবেশের বাণী!
নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিয়ো না টানি!
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল-আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি।

মরীচিকা

এসো, ছেড়ে এসো সখী, কুসুমশয়ন।
বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে।
কত আর করিবে গো বসিয়া বিরলে
আকাশকুসুমবনে স্বপন চয়ন।
দেখো ওই দূর হতে আসিছে ঝটিকা,
স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে।
দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপশিখা
দহিবে আঁধার নিদ্রা বিমল অনলে।
চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
সুখ দুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়—
হাসি কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসারসংশয়রাত্রি রহিব নির্ভয়।
সুখরৌদ্রমরীচিকা নহে বাসস্থান,
মিলায় মিলায় বলি ভয়ে কাঁপে প্রাণ।

গান-রচনা

এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা,
এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন—
এ শুধু আপন মনে মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা
নিমেষের হাসিকান্না গান গেয়ে সমাপন।
শ্যামল পল্লবপাতে রবিকরে সারাবেলা
আপনার ছায়া লয়ে খেলা করে ফুলগুলি,
এও সেই ছায়া-খেলা বসন্তের সমীরণে।
কুহকের দেশে যেন সাধ ক'রে পথ ভুলি।

হেথা হোথা ঘুরি ফিরি সারাদিন আনমনে।
কারে যেন দেব ব'লে কোথা যেন ফুল তুলি,
সন্ধ্যায় মলিন ফুল উড়ে যায় বনে বনে।
এ খেলা খেলিবে হায় খেলার সাথী কে আছে?
ভুলে ভুলে গান গাই— কে শোনে, কে নাই শোনে—
যদি কিছু মনে পড়ে, যদি কেহ আসে কাছে!

সন্ধ্যার বিদায়

সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা ফিরে চায়, শিথিল কবরী পড়ে খুলে—
যেতে যেতে কনক-আঁচল বেধে যায় বকুলকাননে,
চরণের পরশরাঙিমা রেখে যায় যমুনার কূলে—
নীরবে-বিদায়-চাওয়া চোখে, গ্রন্থি-বাঁধা রক্তিম দুকূলে
আঁধারের ম্লানবধূ যায় বিষাদের বাসরশয়নে।
সন্ধ্যাতারা পিছনে দাঁড়ায়ে চেয়ে থাকে আকুল নয়নে।
যমুনা কাঁদিতে চাহে বুঝি, কেন রে কাঁদে না কণ্ঠ তুলে—
বিস্ফারিত হৃদয় বহিয়া চলে যায় আপনার মনে।
মাঝে মাঝে ঝাউবন হতে গভীর নিশ্বাস ফেলে ধরা।
সপ্ত ঋষি দাঁড়াইল আসি নন্দনের সুরতরুমূলে—
চেয়ে থাকে পশ্চিমের পথে, ভুলে যায় আশীর্বাদ করা।
নিশীথিনী রহিল জাগিয়া বদন ঢাকিয়া এলোচুলে।
কেহ আর কহিল না কথা, একটিও বহিল না শ্বাস—
আপনার সমাধি-মাঝারে নিরাশা নীরবে করে বাস।

রাত্রি

জগতেরে জড়াইয়া শত পাকে যামিনীনাগিনী
আকাশ-পাতাল জুড়ি ছিল পড়ে নিদ্রায় মগনা,
আপনার হিম দেহে আপনি বিলীনা একাকিনী।
মিটি মিটি তারকায় জ্বলে তার অন্ধকার ফণা।
উষা আসি মন্ত্র পড়ি বাজাইল ললিত রাগিণী।
রাঙা আঁখি পাকালিয়া সাপিনী উঠিল তাই জাগি—
একে একে খুলে পাক, আঁকি বাঁকি কোথা যায় ভাগি।
পশ্চিমসাগরতলে আছে বুঝি বিরাট গহবর,
সেথায় ঘুমাবে বলে ডুবিতেছে বাসুকি-ভগিনী
মাথায় বহিয়া তার শত লক্ষ রতনের কণা।
শিয়রেতে সারা দিন জেগে রবে বিপুল সাগর—
নিভৃতে স্তিমিত দীপে চুপি চুপি কহিয়া কাহিনী
মিলি কত নাগবালা স্বপ্নমালা করিবে রচনা।

বৈতরণী

অশ্রুস্রোতে স্ফীত হয়ে বহে বৈতরণী,
চৌদিকে চাপিয়া আছে আঁধার রজনী।
পূর্ব তীর হতে হুহু আসিছে নিশ্বাস,
যাত্রী লয়ে পশ্চিমেতে চলেছে তরণী।
মাঝে মাঝে দেখা দেয় বিদ্যুৎ-বিকাশ,
কেহ কারে নাহি চেনে ব'সে নতশিরে।
গলে ছিল বিদায়ের অশ্রুকণা-হার,
ছিন্ন হয়ে একে একে ঝরে পড়ে নীরে।
ওই বুঝি দেখা যায় ছায়া-পরপার,
অন্ধকারে মিটি মিটি তারা-দীপ জ্বলে।
হোথায় কি বিস্মরণ, নিঃস্বপ্ন নিদ্রার
শয়ন রচিয়া দিবে ঝরা ফুলদলে!
অথবা অকূলে শুধু অনন্ত রজনী
ভেসে চলে কর্ণধারবিহীন তরণী!

মানবহৃদয়ের বাসনা

নিশীথে রয়েছি জেগে; দেখি অনিমিখে,
লক্ষ হৃদয়ের সাধ শূন্যে উড়ে যায়।
কত দিক হতে তারা ধায় কত দিকে।
কত-না অদৃশ্যকায়া ছায়া-আলিঙ্গন
বিশ্বময় কারে চাহে, করে হায় হায়।
কত স্মৃতি খুঁজিতেছে শ্মশানশয়ন—
অন্ধকারে হেরো শত তৃষিত নয়ন
ছায়াময় পাখি হয়ে কার পানে ধায়।
ক্ষীণশ্বাস মুমূর্ষুর অতৃপ্ত বাসনা
ধরণীর কূলে কূলে ঘুরিয়া বেড়ায়।
উদ্দেশে ঝরিছে কত অশ্রুবারিকণা,
চরণ খুঁজিয়া তারা মরিবারে চায়।
কে শুনিছে শত কোটি হৃদয়ের ডাক!
নিশীথিনী স্তব্ধ হয়ে রয়েছে অবাক।

সিন্ধুগর্ভ

উপরে স্রোতের ভরে ভাসে চরাচর
নীল সমুদ্রের 'পরে নৃত্য ক'রে সারা।
কোথা হতে ঝরে যেন অনন্ত নির্ঝর,
ঝরে আলোকের কণা রবি শশী তারা।

ঝরে প্রাণ, ঝরে গান, ঝরে প্রেমধারা—
পূর্ণ করিবারে চায় আকাশ সাগর।
সহসা কে ডুবে যায় জলবিম্ব-পারা—
দুয়েকটি আলো-রেখা যায় মিলাইয়া,
তখন ভাবিতে বসি কোথায় কিনারা—
কোন্ অতলের পানে ধাই তলাইয়া!
নিম্নে জাগে সিন্ধুগর্ভ স্তব্ধ অন্ধকার।
কোথা নিবে যায় আলো, থেমে যায় গীত-
কোথা চিরদিন তরে অসীম আড়াল!
কোথায় ডুবিয়া গেছে অনন্ত অতীত!

ক্ষুদ্র অনন্ত

অনন্ত দিবসরাত্রি কালের উচ্ছ্বাস—
তারি মাঝখানে শুধু একটি নিমেষ,
একটি মধুর সন্ধ্যা, একটু বাতাস,
মৃদু আলো-আঁধারের মিলন-আবেশ—
তারি মাঝখানে শুধু একটুকু জুঁই ;
একটুকু হাসিমাখা সৌরভের লেশ—
একটু অধর তার ছুঁই কি না ছুঁই,
আপন আনন্দ লয়ে উঠিতেছে ফুটে,
আপন আনন্দ লয়ে পড়িতেছে টুটে।
সমগ্র অনন্ত ওই নিমেষের মাঝে
একটি বনের প্রান্তে জুঁই হয়ে উঠে।
পলকের মাঝখানে অনন্ত বিরাজে।
যেমনি পলক টুটে ফুল ঝরে যায়,
অনন্ত আপনা-মাঝে আপনি মিলায়।

সমুদ্র

কিসের অশান্তি এই মহাপারাবারে,
সতত ছিঁড়িতে চাহে কিসের বন্ধন!
অব্যক্ত অস্ফুট বাণী ব্যক্ত করিবারে
শিশুর মতন সিন্ধু করিছে ক্রন্দন।

যুগ-যুগান্তর ধরি যোজন যোজন
ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে উত্তাল উচ্ছ্বাস—
অশান্ত বিপুল প্রাণ করিছে গর্জন,
নীরবে শুনিছে তাই প্রশান্ত আকাশ।
আছাড়ি চূর্ণিতে চাহে সমগ্র হৃদয়
কঠিন পাষাণময় ধরণীর তীরে,
জোয়ারে সাধিতে চায় আপন প্রলয়,
ভাটায় মিলাতে চায় আপনার নীরে।
অন্ধ প্রকৃতির হৃদে মৃত্তিকায় বাঁধা
সতত দুলিছে ওই অশ্রুর পাথার,
উন্মুখী বাসনা পায় পদে পদে বাধা,
কাঁদিয়া ভাসাতে চাহে জগৎ-সংসার।
সাগরের কণ্ঠ হতে কেড়ে নিয়ে কথা
সাধ যায় ব্যক্ত করি মানবভাষায়—
শান্ত করে দিই ওই চির ব্যাকুলতা,
সমুদ্রবায়ুর ওই চির হায় হায়।
সাধ যায় মোর গীতে দিবস রজনী
ধ্বনিবে পৃথিবী-ঘেরা সংগীতের ধ্বনি।

অস্তমান রবি

আজ কি তপন তুমি যাবে অস্তাচলে
না শুনে আমার মুখে একটিও গান!
দাঁড়াও গো, বিদায়ের দুটো কথা বলে
আজিকার দিন আমি করি অবসান।
থামো ওই সমুদ্রের প্রান্তরেখা-'পরে,
মুখে মোর রাখো তব একমাত্র আঁখি।
দিবসের শেষ পলে নিমেষের তরে
তুমি চেয়ে থাকো আর আমি চেয়ে থাকি।
দুজনের আঁখি-'পরে সায়াহ্ন-আঁধার
আঁখির পাতার মতো আসুক মুদিয়া,
গভীর তিমিরস্নিগ্ধ শান্তির পাথার
নিবায়ে ফেলুক আজি দুটি দীপ্ত হিয়া।
শেষ গান সাঙ্গ করে থেমে গেছে পাখি,
আমার এ গানখানি ছিল শুধু বাকি।

অস্তাচলের পরপারে

সন্ধ্যাসূর্যের প্রতি

আমার এ গান তুমি যাও সাথে করে
নূতন সাগরতীরে দিবসের পানে।
সায়াহ্নের কূল হতে যদি ঘুমঘোরে
এ গান উষার কূলে পশে কারো কানে,
সারা রাত্রি নিশীথের সাগর বাহিয়া
স্বপনের পরপারে যদি ভেসে যায়,
প্রভাত-পাখিরা যবে উঠিবে গাহিয়া
আমার এ গান তারা যদি খুঁজে পায়।
গোধূলির তীরে বসে কেঁদেছে যে জন,
ফেলেছে আকাশে চেয়ে অশ্রুজল কত,
তার অশ্রু পড়িবে কি হইয়া নূতন
নবপ্রভাতের মাঝে শিশিরের মতো।
সায়াহ্নের কুঁড়িগুলি আপনা টুটিয়া
প্রভাতে কি ফুল হয়ে উঠে না ফুটিয়া!

প্রত্যাশা

সকলে আমার কাছে যত কিছু চায়
সকলেরে আমি তাহা পেরেছি কি দিতে!
আমি কি দিই নি ফাঁকি কত জনে হায়,
রেখেছি কত-না ঋণ এই পৃথিবীতে।
আমি তবে কেন বকি সহস্র প্রলাপ,
সকলের কাছে চাই ভিক্ষা কুড়াইতে!
এক তিল না পাইলে দিই অভিশাপ,
অমনি কেন রে বসি কাতরে কাঁদিতে!
হা ঈশ্বর, আমি কিছু চাহি নাকো আর,
ঘুচাও আমার এই ভিক্ষার বাসনা।
মাথায় বহিয়া লয়ে চির ঋণভার
'পাই নি' 'পাই নি' বলে আর কাঁদিব না।
তোমারেও মাগিব না, অলস কাঁদনি—
আপনারে দিলে তুমি আসিবে আপনি।

স্বপ্নরুদ্ধ

নিষ্ফল হয়েছি আমি সংসারের কাজে,
লোকমাঝে আঁখি তুলে পারি না চাহিতে।
ভাসায়ে জীবনতরী সাগরের মাঝে
তরঙ্গ লঙ্ঘন করি পারি না বাহিতে।

পুরুষের মতো যত মানবের সাথে
যোগ দিতে পারি নাকো লয়ে নিজ বল,
সহস্র সংকল্প শুধু ভরা দুই হাতে
বিফলে শুকায় যেন লক্ষ্মণের ফল।
আমি গাঁথি আপনার চারি দিক ঘিরে
সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন।
মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে,
দেখি না এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন।
কেন আমি আপনার অন্তরালে থাকি!
মুদ্রিত পাতার মাঝে কাঁদে অন্ধ আঁখি।

অক্ষমতা

এ যেন রে অভিশপ্ত প্রেতের পিপাসা—
সলিল রয়েছে প'ড়ে, শুধু দেহ নাই।
এ কেবল হৃদয়ের দুর্বল দুরাশা
সাধের বস্তুর মাঝে করে চাই চাই।
দুটি চরণেতে বেঁধে ফুলের শৃঙ্খল
কেবল পথের পানে চেয়ে বসে থাকা!
মানবজীবন যেন সকলি নিষ্ফল—
বিশ্ব যেন চিত্রপট, আমি যেন আঁকা!
চিরদিন বুভুক্ষিত প্রাণহুতাশন
আমারে করিছে ছাই প্রতি পলে পলে,
মহত্ত্বের আশা শুধু ভারের মতন
আমারে ডুবায়ে দেয় জড়ত্বের তলে।
কোথা সংসারের কাজে জাগ্রত হৃদয়!
কোথা রে সাহস মোর অস্থিমজ্জাময়!

জাগিবার চেষ্টা

মা কেহ কি আছ মোর, কাছে এসো তবে,
পাশে বসে স্নেহ ক'রে জাগাও আমায়।
স্বপ্নের সমাধি-মাঝে বাঁচিয়া কী হবে,
যুঝিতেছি জাগিবারে—আঁখি রুদ্ধ হায়,
ডেকো না ডেকো না মোরে ক্ষুদ্রতার মাঝে,
স্নেহময় আলস্যেতে রেখো না বাঁধিয়া,

আশীর্বাদ করে মোরে পাঠাও গো কাজে—
পিছনে ডেকো না আর কাতরে কাঁদিয়া।
মোর বলে কাহারেও দেব না কি বল!
মোর প্রাণে পাবে না কি কেহ নব প্রাণ!
করুণা কি শুধু ফেলে নয়নের জল,
প্রেম কি ঘরের কোণে গাহে শুধু গান!
তবেই ঘুচিবে মোর জীবনের লাজ
যদি মা করিতে পারি কারো কোনো কাজ।

কবির অহংকার

গান গাহি বলে কেন অহংকার করা!
শুধু গাহি বলে কেন কাঁদি না শরমে!
খাঁচার পাখির মতো গান গেয়ে মরা,
এই কি মা আদি অন্ত মানবজনমে!
সুখ নাই, সুখ নাই, শুধু মর্মব্যথা—
মরীচিকা-পানে শুধু মরি পিপাসায়।
কে দেখালে প্রলোভন, শূন্য অমরতা—
প্রাণে ম'রে গানে কি রে বেঁচে থাকা যায়!
কে আছ মলিন হেথা, কে আছ দুর্বল,
মোরে তোমাদের মাঝে করো গো আহ্বান-
বারেক একত্রে বসে ফেলি অশ্রুজল,
দূর করি হীন গর্ব, শূন্য অভিমান!
তার পরে একসাথে এসো কাজ করি,
কেবলি বিলাপগান দূরে পরিহরি।

বিজনে

আমারে ডেকো না আজি, এ নহে সময়-
একাকী রয়েছি হেথা গভীর বিজন,
রুধিয়া রেখেছি আমি অশান্ত হৃদয়,
দুরন্ত হৃদয় মোর করিব শাসন।
মানবের মাঝে গেলে এ যে ছাড়া পায়,
সহস্রের কোলাহলে হয় পথহারা,
লুব্ধ মুষ্টি যাহা পায় আঁকড়িতে চায়,
চিরদিন চিররাত্রি কেঁদে কেঁদে সারা।
ভর্ৎসনা করিব তারে বিজনে বিরলে,
একটুকু ঘুমাক সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,

শ্যামল বিপুল কোলে আকাশ-অঞ্চলে
প্রকৃতি জননী তারে রাখুন বাঁধিয়া।
শান্ত স্নেহকোলে বসে শিখুক সে স্নেহ,
আমারে আজিকে তোরা ডাকিস নে কেহ।

সিন্ধুতীরে

হেথা নাই ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ কানাকানি,
ধ্বনিত হতেছে চিরদিবসের বাণী।
চিরদিবসের রবি ওঠে, অস্ত যায়,
চিরদিবসের কবি গাহিছে হেথায়।
ধরণীর চারি দিকে সীমাশূন্য গানে
সিন্ধু শত তটিনীরে করিছে আহ্বান—
হেথায় দেখিলে চেয়ে আপনার পানে
দুই চোখে জল আসে, কেঁদে ওঠে প্রাণ।
শত যুগ হেথা বসে মুখপানে চায়,
বিশাল আকাশে পাই হৃদয়ের সাড়া।
তীব্র বক্র ক্ষুদ্র হাসি পায় যদি ছাড়া
রবির কিরণে এসে মরে সে লজ্জায়।
সবারে আনিতে বুকে বুক বেড়ে যায়,
সবারে করিতে ক্ষমা আপনারে ছাড়া।

সত্য

ভয়ে ভয়ে ভ্রমিতেছি মানবের মাঝে
হৃদয়ের আলোটুকু নিবে গেছে ব'লে!
কে কী বলে তাই শুনে মরিতেছি লাজে,
কী হয় কী হয় ভেবে ভয়ে প্রাণ দোলে!
'আলো' 'আলো' খুঁজে মরি পরের নয়নে,
'আলো' 'আলো' খুঁজে খুঁজে কাঁদি পথে পথে,
অবশেষে শুয়ে পড়ি ধূলির শয়নে—
ভয় হয় এক পদ অগ্রসর হতে!
বজ্রের আলোক দিয়ে ভাঙো অন্ধকার,
হৃদি যদি ভেঙে যায় সেও তবু ভালো।
যে গৃহে জানালা নাই সে তো কারাগার—
ভেঙে ফেলো, আসিবেক স্বরগের আলো।
হায় হায় কোথা সেই অখিলের জ্যোতি!
চলিব সরল পথে অশঙ্কিতগতি।

জ্বালায়ে আঁধার শূন্যে কোটি রবি শশী
দাঁড়ায়ে রয়েছ একা অসীমসুন্দর।
সুগভীর শান্ত নেত্র রয়েছে বিকশি,
চিরস্থির শুভ্র হাসি, প্রসন্ন অধর।
আনন্দে আঁধার মরে চরণ পরশি,
লাজ ভয় লাজে ভয়ে মিলাইয়া যায়—
আপন মহিমা হেরি আপনি হরষি
চরাচর শির তুলি তোমাপানে চায়।
আমার হৃদয়দীপ আঁধার হেথায়,
ধূলি হতে তুলি এরে দাও জ্বালাইয়া—
ওই ধ্রুবতারাখানি রেখেছ যেথায়
সেই গগনের প্রান্তে রাখো ঝুলাইয়া।
চিরদিন জেগে রবে নিবিবে না আর,
চিরদিন দেখাইবে আঁধারের পার।

আত্মাভিমান

আপনি কণ্টক আমি, আপনি জর্জর।
আপনার মাঝে আমি শুধু ব্যথা পাই।
সকলের কাছে কেন যাচি গো নির্ভর—
গৃহ নাই, গৃহ নাই, মোর গৃহ নাই!
অতি তীক্ষ্ণ অতি ক্ষুদ্র আত্ম-অভিমান
সহিতে পারে না হায় তিল অসম্মান।
আগেভাগে সকলের পায়ে ফুটে যায়
ক্ষুদ্র ব'লে পাছে কেহ জানিতে না পায়।
বরঞ্চ আঁধারে রব ধুলায় মলিন,
চাহি না চাহি না এই দীন অহংকার—
আপন দারিদ্র্যে আমি রহিব বিলীন,
বেড়াব না চেয়ে চেয়ে প্রসাদ সবার।
আপনার মাঝে যদি শান্তি পায় মন
বিনীত ধুলার শয্যা সুখের শয়ন।

আত্ম-অপমান

মোছো তবে অশ্রুজল, চাও হাসিমুখে
বিচিত্র এ জগতের সকলের পানে।
মানে আর অপমানে সুখে আর দুখে
নিখিলেরে ডেকে লও প্রসন্ন পরানে।

কেহ ভালোবাসে কেহ নাহি ভালোবাসে,
কেহ দূরে যায় কেহ কাছে চলে আসে—
আপনার মাঝে গৃহ পেতে চাও যদি
আপনারে ভুলে তবে থাকো নিরবধি।
ধনীর সন্তান আমি, নহি গো ভিখারী,
হৃদয়ে লুকানো আছে প্রেমের ভান্ডার—
আমি ইচ্ছা করি যদি বিলাইতে পারি
গভীর সুখের উৎস হৃদয় আমার।
দুয়ারে দুয়ারে ফিরি মাগি অন্নপান
কেন আমি করি তবে আত্ম-অপমান!

ক্ষুদ্র আমি

বুঝেছি বুঝেছি সখা, কেন হাহাকার,
আপনার 'পরে মোর কেন সদা রোষ।
বুঝেছি বিফল কেন জীবন আমার—
আমি আছি, তুমি নাই, তাই অসন্তোষ।
সকল কাজের মাঝে আমারেই হেরি—
ক্ষুদ্র আমি জেগে আছে ক্ষুধা লয়ে তার,
শীর্ণবাহু-আলিঙ্গনে আমারেই ঘেরি
করিছে আমার হায় অস্থিচর্ম সার।
কোথা নাথ, কোথা তব সুন্দর বদন—
কোথায় তোমার, নাথ, বিশ্ব-ঘেরা হাসি।
আমারে কাড়িয়া লও, করো গো গোপন—
আমারে তোমার মাঝে করো গো উদাসী।
ক্ষুদ্র আমি করিতেছে বড়ো অহংকার,
ভাঙো নাথ, ভাঙো নাথ, অভিমান তার।

প্রার্থনা

তুমি কাছে নাই ব'লে হেরো সখা, তাই
'আমি বড়ো' 'আমি বড়ো' করিছে সবাই।
সকলেই উঁচু হয়ে দাঁড়ায়ে সমুখে
বলিতেছে, 'এ জগতে আর কিছু নাই।'
নাথ, তুমি একবার এসো হাসিমুখে
এরা সবে ম্লান হয়ে লুকাক লজ্জায়—
সুখ দুঃখ টুটে যাক তব মহাসুখে,
যাক আলো অন্ধকার তোমার প্রভায়।

নহিলে ডুবেছি আমি, মরেছি হেথায়,
নহিলে ঘুচে না আর মর্মের ক্রন্দন—
শুষ্ক ধূলি তুলি শুধু সুধাপিপাসায়,
প্রেম ব'লে পরিয়াছি মরণবন্ধন।
কভু পড়ি কভু উঠি, হাসি আর কাঁদি—
খেলাঘর ভেঙে প'ড়ে রচিবে সমাধি।

বাসনার ফাঁদ

যারে চাই তার কাছে আমি দিই ধরা,
সে আমার না হইতে আমি হই তার।
পেয়েছি বলিয়ে মিছে অভিমান করা,
অন্যেরে বাঁধিতে গিয়ে বন্ধন আমার।
নিরখিয়া দ্বারমুক্ত সাধের ভাণ্ডার
দুই হাতে লুটে নিই রত্ন ভূরি ভূরি—
নিয়ে যাব মনে করি, ভারে চলা ভার,
চোরা দ্রব্য বোঝা হয়ে চোরে করে চুরি।
চিরদিন ধরণীর কাছে ঋণ চাই,
পথের সম্বল ব'লে জমাইয়া রাখি,
আপনারে বাঁধা রাখি সেটা ভুলে যাই—
পাথেয় লইয়া শেষে কারাগারে থাকি।
বাসনার বোঝা নিয়ে ডোবে-ডোবে তরী—
ফেলিতে সরে না মন, উপায় কী করি!

চিরদিন

কোথা রাত্রি, কোথা দিন, কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য তারা,
কে বা আসে কে বা যায়, কোথা বসে জীবনের মেলা,
কে বা হাসে কে বা গায়, কোথা খেলে হৃদয়ের খেলা,
কোথা পথ, কোথা গৃহ, কোথা পান্থ, কোথা পথহারা!
কোথা খ'সে পড়ে পত্র জগতের মহাবৃক্ষ হতে,
উড়ে উড়ে ঘুরে মরে অসীমেতে না পায় কিনারা,
বহে যায় কালবায়ু অবিশ্রাম আকাশের পথে,
ঝর ঝর মর মর শুষ্ক পত্র শ্যাম পত্রে মিলে!
এত ভাঙা এত গড়া, আনাগোনা জীবন্ত নিখিলে,
এত গান এত তান এত কান্না এত কলরব—
কোথা কে বা, কোথা সিন্ধু, কোথা ঊর্মি, কোথা তার বেলা-
গভীর অসীম গর্ভে নির্বাসিত নির্বাপিত সব!
জনপূর্ণ সুবিজনে, জ্যোতির্বিম্ব আঁধারে বিলীন
আকাশ-মণ্ডপে শুধু বসে আছে এক 'চিরদিন'।

২

কী লাগিয়া বসে আছ, চাহিয়া রয়েছ কার লাগি,
প্রলয়ের পরপারে নেহারিছ কার আগমন,
কার দূর পদধ্বনি চিরদিন করিছ শ্রবণ,
চিরবিরহীর মতো চিররাত্রি রহিয়াছ জাগি!
অসীম অতৃপ্তি লয়ে মাঝে মাঝে ফেলিছ নিশ্বাস,
আকাশ-প্রান্তরে তাই কেঁদে উঠে প্রলয়বাতাস,
জগতের উর্ণাজাল ছিঁড়ে টুটে কোথা যায় ভাগি!
অনন্ত আঁধার-মাঝে কেহ তব নাহিকো দোসর,
পশে না তোমার প্রাণে আমাদের হৃদয়ের আশ,
পশে না তোমার কানে আমাদের পাখিদের স্বর।
সহস্র জগতে মিলি রচে তব বিজন প্রবাস,
সহস্র শবদে মিলি বাঁধে তব নিঃশব্দের ঘর—
হাসি, কাঁদি, ভালোবাসি, নাই তব হাসি কান্না মায়া—
আসি, থাকি, চলে যাই কত ছায়া কত উপছায়া!

৩

তাই কি? সকলি ছায়া? আসে, থাকে, আর মিলে যায়?
তুমি শুধু একা আছ, আর সব আছে আর নাই?
যুগ-যুগান্তর ধরে ফুল ফুটে, ফুল ঝরে তাই?
প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই, সে কি শুধু মরণের পায়?
এ ফুল চাহে না কেহ? লহে না এ পূজা-উপহার?
এ প্রাণ, প্রাণের আশা, টুটে কি অসীম শূন্যতায়?
বিশ্বের উঠিছে গান, বধিরতা বসি সিংহাসনে?
বিশ্বের কাঁদিছে প্রাণ, শূন্যে ঝরে অশ্রুবারিধার?
যুগ-যুগান্তের প্রেম কে লইবে, নাই ত্রিভুবনে?
চরাচর মগ্ন আছে নিশিদিন আশার স্বপনে—
বাঁশি শুনি চলিয়াছে, সে কি হায় বৃথা অভিসার!
বোলো না সকলি স্বপ্ন, সকলি এ মায়ার ছলন—
বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে, সে স্বপন কাহার স্বপন?
সে কি এই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার?

৪

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ।
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
অসীমে উঠিছে প্রেম শুধিবারে অসীমের ঋণ—
যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।
যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতিদিন—
যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ।
যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে উঠে দীনহীন,
অসীমে জগতে একি পিরীতির আদান-প্রদান!

কাহারে পূজিছে ধরা শ্যামল যৌবন-উপহারে,
নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন।
প্রেমে টেনে আনে প্রেম, সে প্রেমের পাথার কোথা রে!
প্রাণ দিলে প্রাণ আসে, কোথা সেই অনন্ত জীবন!
ক্ষুদ্র আপনারে দিলে, কোথা পাই অসীম আপন--
সে কি ওই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকারে!

বঙ্গভূমির প্রতি

কেন চেয়ে আছ, গো মা, মুখপানে!
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে!
এরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না
মিথ্যা কহে শুধু কত কী ভানে!
তুমি তো দিতেছ মা, যা আছে তোমার -
স্বর্ণশস্য তব, জাহ্নবীবারি,
জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্যকাহিনী।
এরা কী দেবে তোরে, কিছু না, কিছু না-
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরানে!
মনের বেদনা রাখো মা মনে,
নয়নবারি নিবারো নয়নে,
মুখ লুকাও মা, ধূলিশয়নে—
ভুলে থাকো যত হীন সন্তানে।
শূন্য-পানে চেয়ে প্রহর গণি গণি
দেখো কাটে কি না দীর্ঘ রজনী,
দুঃখ জানায়ে কী হবে জননী,
নির্মম চেতনহীন পাষাণে!

বঙ্গবাসীর প্রতি

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ কি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা
শুধু মিছে কথা ছলনা!
আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,

এ যে বুক-ফাটা দুখে গুমরিছে বুকে
গভীর মরমবেদনা।
এ কি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা!
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা কয়ে মিছে যশ লয়ে
মিছে কাজে নিশিযাপনা!
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ—
কাতরে কাঁদিবে, মা'র পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা।
এ কি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা!

আহ্বানগীত

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ,
শুনিতে পেয়েছি ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান,
কই রে বাঙালি কই!
সুগভীর স্বর কাঁদিয়া বেড়ায়
বঙ্গসাগরের তীরে,
'বাঙালির ঘরে কে আছিস আয়'
ডাকিতেছে ফিরে ফিরে।
ঘরে ঘরে কেন দুয়ার ভেজানো,
পথে কেন নাই লোক,
সারা দেশ ব্যাপি মরেছে কে যেন—
বেঁচে আছে শুধু শোক।
গঙ্গা বহে শুধু আপনার মনে,
চেয়ে থাকে হিমগিরি,
রবি শশী উঠে অনন্ত গগনে
আসে যায় ফিরি ফিরি।

কত-না সংকট, কত-না সন্তাপ
মানবশিশুর তরে,
কত-না বিবাদ কত-না বিলাপ
মানবশিশুর ঘরে!
কত ভায়ে ভায়ে নাহি যে বিশ্বাস,
কেহ কারে নাহি মানে,

ঈর্ষা নিশাচরী ফেলিছে নিশ্বাস
হৃদয়ের মাঝখানে।
হৃদয়ে লুকানো হৃদয়বেদনা,
সংশয়-আঁধারে যুঝে,
কে কাহারে আজি দিবে গো সান্ত্বনা—
কে দিবে আলয় খুঁজে!
মিটাতে হইবে শোক তাপ ত্রাস,
করিতে হইবে রণ,
পৃথিবী হইতে উঠেছে উচ্ছ্বাস—
শোনো শোনো সৈন্যগণ!

পৃথিবী ডাকিছে আপন সন্তানে,
বাতাস ছুটেছে তাই—
গৃহ তেয়াগিয়া ভায়ের সন্ধানে
চলিয়াছে কত ভাই।
বঙ্গের কুটীরে এসেছে বারতা,
শুনেছে কি তাহা সবে?
জেগেছে কি কবি শুনাতে সে কথা
জলদগম্ভীর রবে?
হৃদয় কি কারো উঠেছে উথলি?
আঁখি খুলেছে কি কেহ?
ভেঙেছে কি কেহ সাধের পুতলি?
ছেড়েছে খেলার গেহ?
কেন কানাকানি, কেন রে সংশয়?
কেন মরো ভয়ে লাজে?
খুলে ফেলো দ্বার, ভেঙে ফেলো ভয়,
চলো পৃথিবীর মাঝে।

ধরা-প্রান্তভাগে ধুলিতে লুটায়ে
জড়িমা-জড়িত তনু,
আপনার মাঝে আপনি গুটায়ে
ঘুমায় কীটের অণু।
চারি দিকে তার আপন-উল্লাসে
জগৎ ধাইছে কাজে,
চারি দিকে তার অনন্ত আকাশে
স্বরগ-সংগীত বাজে!
চারি দিকে তার মানবমহিমা
উঠিছে গগন-পানে,
খুঁজিছে মানব আপনার সীমা
অসীমের মাঝখানে!
সে কিছুই তার করে না বিশ্বাস,
আপনারে জানে বড়ো—

আপনি গণিছে আপন নিশ্বাস,
ধূলা করিতেছে জড়ো।

সুখ দুঃখ লয়ে অনন্ত সংগ্রাম,
জগতের রঙ্গভূমি—
হেথায় কে চায় ভীরুর বিশ্রাম,
কেন গো ঘুমাও তুমি।
ডুবিছ ভাসিছ অশ্রুর হিল্লোলে,
শুনিতেছ হাহাকার—
তীর কোথা আছে দেখো মুখ তুলে,
এ সমুদ্র করো পার।
মহা কলরবে সেতু বাঁধে সবে,
তুমি এসো, দাও যোগ—
বাধার মতন জড়াও চরণ
এ কী রে করম-ভোগ।
তা যদি না পারো সরো তবে সরো,
ছেড়ে দাও তবে স্থান,
ধূলায় পড়িয়া মরো তবে মরো—
কেন এ বিলাপগান!

ওরে চেয়ে দেখ্ মুখ আপনার,
ভেবে দেখ্ তোরা কারা,
মানবের মতো ধরিয়া আকার,
কেন রে কীটের পারা?
আছে ইতিহাস, আছে কুলমান,
আছে মহত্ত্বের খনি—
পিতৃপিতামহ গেয়েছে যে গান
শোন্ তার প্রতিধ্বনি।
খুঁজেছেন তাঁরা চাহিয়া আকাশে
গ্রহতারকার পথ,
জগৎ ছাড়ায়ে অসীমের আশে
উড়াতেন মনোরথ।
চাতকের মতো সত্যের লাগিয়া
তৃষিত আকুল প্রাণে
দিবস রজনী ছিলেন জাগিয়া
চাহিয়া বিশ্বের পানে।

তবে কেন সবে বধির হেথায়,
কেন অচেতন প্রাণ—
বিফল উচ্ছ্বাসে কেন ফিরে যায়
বিশ্বের আহ্বানগান!

মহত্ত্বের গাথা পশিতেছে কানে,
কেন রে বুঝি নে ভাষা?
তীর্থযাত্রী যত পথিকের গানে
কেন রে জাগে না আশা?
উন্নতির ধ্বজা উড়িছে বাতাসে,
কেন রে নাচে না প্রাণ?
নবীন কিরণ ফুটেছে আকাশে,
কেন রে জাগে না গান?
কেন আছি শুয়ে, কেন আছি চেয়ে,
পড়ে আছি মুখোমুখি—
মানবের স্রোত চলে গান গেয়ে,
জগতের সুখে সুখী!

চলো দিবালোকে, চলো লোকালয়ে,
চলো জনকোলাহলে—
মিশাব হৃদয় মানবহৃদয়ে
অসীম আকাশতলে।
তরঙ্গ তুলিব তরঙ্গের পরে,
নৃত্য গীত নব নব—
বিশ্বের কাহিনী কোটি কণ্ঠস্বরে
এককণ্ঠ হয়ে কব।
মানবের সুখ মানবের আশা
বাজিবে আমার প্রাণে,
শত লক্ষ কোটি মানবের ভাষা
ফুটিবে আমার গানে।
মানবের কাজে মানবের মাঝে
আমরা পাইব ঠাঁই,
বঙ্গের দুয়ারে তাই শিঙা বাজে—
শুনিতে পেয়েছি ভাই!

মুছে ফেলো ধুলা, মুছ অশ্রুজল,
ফেলো ভিখারীর চীর—
পরো নব সাজ, ধরো নব বল,
তোলো তোলো নত শির।
তোমাদের কাছে আজি আসিয়াছে
জগতের নিমন্ত্রণ—
দীনহীন বেশ ফেলে যেয়ো পাছে,
দাসত্বের আভরণ।
সভার মাঝারে দাঁড়াবে যখন,
হাসিয়া চাহিবে ধীরে,
পুরব রবির হিরণ কিরণ
পড়িবে তোমার শিরে।

বাঁধন টুটিয়া উঠিবে ফুটিয়া
হৃদয়ের শতদল,
জগৎ-মাঝারে যাইবে লুটিয়া
প্রভাতের পরিমল।

উঠ বঙ্গকবি, মায়ের ভাষায়
মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ—
জগতের লোক সুধার আশায়
সে ভাষা করিবে পান।
চাহিবে মোদের মায়ের বদনে,
ভাসিবে নয়নজলে—
বাঁধিবে জগৎ গানের বাঁধনে
মায়ের চরণতলে।
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে
কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে
স্থান কিনে দাও তুমি।
একবার কবি মায়ের ভাষায়
গাও জগতের গান—
সকল জগৎ ভাই হয়ে যায়,
ঘুচে যায় অপমান।

শেষ কথা

মনে হয় কী একটি শেষ কথা আছে,
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়।
কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে তারি পাছে পাছে,
তারি তরে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয়।
শত গান উঠিতেছে তারি অন্বেষণে,
পাখির মতন ধায় চরাচরময়।
শত গান ম'রে গিয়ে নূতন জীবনে
একটি কথায় চাহে হইতে বিলয়।
সে কথা হইলে বলা নীরব বাঁশরি,
আর বাজাব না বীণা চিরদিন-তরে।
সে কথা শুনিতে সবে আছে আশা করি,
মানব এখনো তাই ফিরিছে না ঘরে।
সে কথায় আপনারে পাইব জানিতে,
আপনি কৃতার্থ হব আপন বাণীতে।

সংযোজন

শরতের শুকতারা

একাদশী রজনী
পোহায় ধীরে ধীরে—
রাঙা মেঘ দাঁড়ায়
উষারে ঘিরে ঘিরে।
ক্ষীণ চাঁদ নভের
আড়ালে যেতে চায়,
মাঝখানে দাঁড়ায়ে
কিনারা নাহি পায়।
বড়ো ম্লান হয়েছে
চাঁদের মুখখানি,
আপনাতে আপনি
মিশাবে অনুমানি।
হেরো দেখো কে ওই
এসেছে তার কাছে,
শুকতারা চাঁদের
মুখেতে চেয়ে আছে।
মরি মরি কে তুমি
একটুখানি প্রাণ,
কী না জানি এনেছ
করিতে ওরে দান!
চেয়ে দেখো আকাশে
আর তো কেহ নাই,
তারা যত গিয়েছে
যে যার নিজ ঠাঁই।
সাথীহারা চন্দ্রমা
হেরিছে চারি ধার,
শূন্য আহা নিশির
বাসর ঘর তার!
শরতের প্রভাতে
বিমল মুখ নিয়ে
তুমি শুধু রয়েছ
শিয়রে দাঁড়াইয়ে।
ও হয়তো দেখিতে
পেলে না মুখ তোর!
ও হয়তো আপন
স্বপনে আছে ভোর!
ও হয়তো তারার
খেলার গান গায়,

ও হয়তো বিরাগে
উদাসী হতে চায়!
ও কেবল নিশির
হাসির অবশেষ!
ও কেবল অতীত
সুখের স্মৃতিলেশ!
দ্রুতপদে তাহারা
কোথায় চলে গেছে—
সাথে যেতে পারে নি
পিছনে পড়ে আছে!
কত দিন উঠেছ
নিশির শেষাশেষি,
দেখিয়াছ চাঁদেতে
তারাতে মেশামেশি!
দুই দণ্ড চাহিয়া
আবার চলে যেতে,
মুখখানি লুকাতে
উষার আঁচলেতে।
পুরবের একান্তে
একটু দিয়ে দেখা,
কী ভাবিয়া তখনি
ফিরিতে একা একা।
আজ তুমি দেখেছ
চাঁদের কেহ নাই,
স্নেহময়ি, আপনি
এসেছ তুমি তাই!
দেহখানি মিলায়
মিলায় বুঝি তার!
হাসিটুকু রহে না
রহে না বুঝি আর!
দুই দণ্ড পরে তো
রবে না কিছু হায়!
কোথা তুমি, কোথায়
চাঁদের ক্ষীণকায়!
কোলাহল তুলিয়া
গরবে আসে দিন,
দুটি ছোটো প্রাণের
লিখন হবে লীন।
সুখশ্রমে মলিন
চাঁদের একসনে
নবপ্রেম মিলাবে
কাহার রবে মনে!

পত্র

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু।

স্টীমার। খুলনা।

মাগো আমার লক্ষ্মী,
মনিষ্যি না পক্ষী!
এই ছিলেম তরীতে,
কোথায় এনু স্বরিতে!
কাল ছিলেম খুলনায়,
তাতে তো আর ভুল নাই,
কলকাতায় এসেছি সদ্য,
বসে বসে লিখছি পদ্য।

তোদের ফেলে সারাটা দিন
আছি অমনি এক রকম,
খোপে বসে পায়রা যেন
করছি কেবল বক্‌বকম!
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
মেঘ করেছে আকাশে,
উষার রাঙা মুখখানি গো
কেমন যেন ফ্যাকাশে!
বাড়িতে যে কেউ কোথা নেই
দুয়োরগুলো ভেজানো,
ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াই
ঘরে আছে কে যেন!
পক্ষীটি সেই ঝুপসি হয়ে
ঝিমচ্ছে রে খাঁচাতে,
ভুলে গেছে নেচে নেচে
পুচ্ছটি তার নাচাতে!
ঘরের কোণে আপন মনে
শূন্য প'ড়ে বিছেনা,
কাহার তরে কেঁদে মরে
সে কথাটা মিছে না!
বইগুলো সব ছড়িয়ে প'ড়ে,
নাম লেখা তায় কার গো!
এমনি তারা রবে কি রে
খুলবে না কেউ আর গো!
এটা আছে সেটা আছে
অভাব কিছু নেই তো,
স্মরণ করে দেয় রে যারে
থাকে নাকো সেই তো!

বাগানে ওই দুটো গাছে
ফুল ফুটেছে রাশি রাশি,
ফুলের গন্ধে মনে পড়ে
যারে যারে ভালোবাসি!
ফুলের গন্ধে মনে পড়ে
ফুল কে আমায় দিত মেলা,
বিছেনায় কার মুখটি দেখে
সকাল হত সকালবেলা!
জল থেকে তুই আসবি কবে
মাটির লক্ষ্মী মাটিতে
ঠাকুরবাবুর ছয় নম্বর
জোড়াসাঁকোর বাটীতে!

ইস্টিম ওই রে ফুরিয়ে এল
নোঙর তবে ফেলি অদ্য।
অবিদিত নেই তো তোমার
রবিকাকা কুঁড়ের হদ্দ!
আজকে নাকি মেঘ করেছে
ঠেকছে কেমন ফাঁকা-ফাঁকা,
তাই খানিকটা ফোঁসফোঁসিয়ে
বিদায় হল—
কলিকাতা। রবি কাকা!

পত্র

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু।

স্টীমার। খুলনা

বসে বসে লিখলেম চিঠি,
পুরিয়ে দিলেম চারটে পিঠই,
পেলেম না তার জবাবই,
এমনি তোমার নবাবী!

দুটো ছত্র লিখবি পত্র
একলা তোমার "রবু-কা" যে!
পোড়ারমুখী তাও হবে না
আলিস্যি তোর সব কাজে!
ঝগড়াটে নয় স্বভাব আমার
নইলে দেখতে কারখানা,
গলার চোটে আকাশ ফেটে
হয়ে যেত চারখানা,

বাছা আমার, দেখতে পেতে
এই কলমের ধারখানা!

তোমার মতো এমন মা তো
দেখি নি এ বঙ্গে গো,
মায়া দয়া যা-কিছু সে
যদিন থাকে সঙ্গে গো!
চোখের আড়াল প্রাণের আড়াল
কেমনতরো ঢঙ এ গো!
তোমার প্রাণ যে পাষাণ-সম
জানি সেটা long ago!

সংসারে যে সবি মায়া
সেটা নেহাত গল্প না!
বাইরেতে এক ভিতরে এক
এ যেন কার খল-পনা!
সত্যি বলে যেটা দেখি
সেটা আমার কল্পনা!
ভেবে একবার দেখ বাছা
ফিলজফি অল্প না!

মস্ত একটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ
কে রেখেছে সাজিয়ে,
যা করি তা কেবল "থোড়া
জমির বাস্তে কাজিয়ে!"
বৃষ্টি পড়ে চিঠি না পাই,
মনটা নিয়ে ততই হাঁপাই,
শূন্যে চেয়ে ততই ভাবি
সকলি ভোজ-বাজি এ!
ফিলজফি মনের মধ্যে
ততই ওঠে গাজিয়ে!

দূর হোক গে, এত কথা
কেনই বলি তোমাকে!
ভরা নায়ে পা দিয়েছ,
আছ তুমি দেমাকে!

তোমার সঙ্গে আর কথা না,
তুমি এখন লোকটা মস্ত,
কাজ কি বাপু, এইখেনেতেই
রবীন্দ্রনাথ হলেন অস্ত।

জন্মতিথির উপহার

একটি কাঠের বাক্স

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু।

স্নেহ-উপহার এনেছি রে দিতে
লিখেও এনেছি দু-তিন ছত্তর।
দিতে কত কী যে সাধ যায় তোরে
দেবার মতো নেই জিনিস-পত্তর!
টাকাকড়িগুলো ট্যাঁকশালে আছে
ব্যাঙ্কে আছে সব জমা,
ট্যাঁকে আছে খালি গোটা দুত্তিন,
এবার করো বাছা ক্ষমা!
হীরে জহরাৎ যত ছিল মোর
পোঁতা ছিল সব মাটিতে,
জহরী যে যেত সন্ধান পেয়ে
নে গেছে যে যার বাটীতে!
দুনিয়া শহর জমিদারি মোর,
পাঁচ ভূতে করে কাড়াকাড়ি,
হাতের কাছেতে যা-কিছু পেলুম,
নিয়ে এনু তাই তাড়াতাড়ি!
স্নেহ যদি কাছে রেখে যাওয়া যেত
চোখে যদি দেখা যেত রে,
বাজারে-জিনিস কিনে নিয়ে এসে
বল্‌ দেখি দিত কে তোরে!
জিনিসটা অতি যৎসামান্য
রাখিস ঘরের কোণে,
বাক্সখানি ভরে স্নেহ দিনু তোরে
এইটে থাকে যেন মনে!
বড়োসড়ো হবি ফাঁকি দিয়ে যাবি,
কোন্‌খেনে র'বি লুকিয়ে,
কাকা-ফাকা সব ধুয়ে-মুছে ফেলে
দিবি একেবারে চুকিয়ে,
তখন যদি রে এই কাঠখানা
মনে একটুকু তোলে ঢেউ—
একবার যদি মনে পড়ে তোর
"রুজি" বলে বুঝি ছিল কেউ!
এই যে সংসারে আছি মোরা সবে
এ বড়ো বিষম দেশটা!

ফাঁকিফুঁকি দিয়ে দূরে চলে যেতে
ভুলে যেতে সবার চেষ্টা!
ভয়ে ভয়ে তাই সবারে সবাই
কত কী যে এনে দিচ্ছে,
এটা-ওটা দিয়ে স্মরণ জাগিয়ে
বেঁধে রাখিবার ইচ্ছে!
মনে রাখতে যে মেলাই কাঠ-খড় চাই,
ভুলে যাবার ভারি সুবিধে,
ভালোবাস যারে কাছে রাখ তারে
যাহা পাস তারে খুব দে!
বুঝে কাজ নেই এত শত কথা,
ফিলজফি হোক ছাই!
বেঁচে থাকো তুমি সুখে থাকো বাছা
বালাই নিয়ে মরে যাই!

চিঠি

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু
স্টীমার "রাজহংস"। গংগা।

চিঠি লিখব কথা ছিল,
দেখছি সেটা ভারি শক্ত।
তেমন যদি খবর থাকে
লিখতে পারি তক্ত তক্ত।
খবর বয়ে বেড়ায় ঘুরে
খবরওয়ালা ঝাঁকা-মুটে।
আমি বাপু ভাবের ভক্ত
বেড়াই নাকো খবর খুঁটে।
এত ধুলো, এত খবর
কলকাতাটার গলিতে!
নাকে চোকে খবর ঢোকে
দু-চার কদম চলিতে।
এত খবর সয় না আমার
মরি আমি হাঁপোষে।
ঘরে এসেই খবরগুলো
মুছে ফেলি পাপোষে।
আমাকে তো জানই বাছা!
আমি একজন খেয়ালি।

কথাগুলো যা বলি, তার
অধিকাংশই হেঁয়ালি।
আমার যত খবর আসে
ভোরের বেলা পূব দিয়ে।
পেটের কথা তুলি আমি
পেটের মধ্যে ডুব দিয়ে।
আকাশ ঘিরে জাল ফেলে
তারা ধরাই ব্যবসা।
থাক গে তোমার পাটের হাটে
মথুর কুণ্ডু শিবু সা।
কল্পতরুর তলায় থাকি
নই গো আমি খবুরে।
হাঁ করিয়ে চেয়ে আছি
মেওয়া ফলে সবুরে।
তবে যদি নেহাত কর
খবর নিয়ে টানাটানি।
আমি বাপু একটি কেবল
দুষ্টু মেয়ের খবর জানি!
দুষ্টুমি তার শোন যদি
অবাক হবে সত্যি!
এত্ত বড়ো বড়ো কথা তার
মুখখানি একরত্তি।
মনে মনে জানেন তিনি
ভারি মস্ত লোকটা।
লোকের সঙ্গে না-হক কেবল
ঝগড়া করবার ঝোঁকটা।
আমার সঙ্গেই যত বিবাদ
কথায় কথায় আড়ি।
এর নাম কি ভদ্র ব্যাভার!
বড্ড বাড়াবাড়ি।
মনে করেছি তার সঙ্গে
কথাবার্তা বন্ধ করি।
প্রতিজ্ঞা থাকে না পাছে
সেইটে ভারি সন্দ করি।
সে না হলে সকাল বেলায়
চামেলি কি ফুটবে!
সে নইলে কি সন্ধে বেলায়
সন্ধেতারা উঠবে।
সে না হলে দিনটা ফাঁকি
আগাগোড়াই মস্কারা।
পোড়ারমুখী জানে সেটা
তাই এত তার আস্কারা।

চুড়ি-পরা হাত দুখানি
কতই জানে ফন্দি।
কোনোমতে তার সাথে তাই
করে আছি সন্ধি।

নাম যদি তার জিগেস কর
নামটি বলা হবে না।
কী জানি সে শোনে যদি
প্রাণটি আমার রবে না।
নামের খবর কে রাখে তার
ডাকি তারে যা খুশি।
দুষ্টু বলো, দস্যি বলো,
পোড়ারমুখী, রাক্ষুসী!
বাপ মায়ে যে নাম দিয়েছে
বাপ মায়েরি থাক্‌ সে।
ছিষ্টি খুঁজে মিষ্টি নামটি
তুলে রাখুন বাক্সে!
এক জনেতে নাম রাখবে
অন্নপ্রাশনে।
বিশ্বসুদ্ধ সে নাম নেবে
বিষম শাসন এ!
নিজের মনের মতো সবাই
করুক নামকরণ।
বাবা ডাকুন "চন্দ্রকুমার"
খুড়ো "রামচরণ"!
ধার-করা নাম নেব আমি
হবে না তো সিটি।
জানই আমার সকল কাজে
Originality।
ঘরের মেয়ে তার কি সাজে
সস্কৃত নাম।
এতে কেবল বেড়ে ওঠে
অভিধানের দাম।
আমি বাপু ডেকে বসি
যেটা মুখে আসে,
যারে ডাকি সেই তা বোঝে
আর সকলে হাসে!

দুষ্টু মেয়ের দুষ্টুমি— তায়
কোথায় দেব দাঁড়ি!
অকূল পাথার দেখে শেষে
কলমের হাল ছাড়ি!

শোনো বাছা, সত্যি কথা
বলি তোমার কাছে—
ত্রিজগতে তেমন মেয়ে
একটি কেবল আছে!
বর্ণিমেটা কারো সঙ্গে
মিলে পাছে যায়—
তুমুল ব্যাপার উঠবে বেধে
হবে বিষম দায়!
হপ্তাখানেক বকাবকি
ঝগড়াঝাঁটির পালা,
একটু চিঠি লিখে, শেষে
প্রাণটা ঝালাফালা।
আমি বাপু ভালোমানুষ
মুখে নেইকো রা।
ঘরের কোণে বসে বসে
গোঁফে দিচ্ছি তা।
আমি যত গোলে পড়ি
শুনি নানান বাক্যি।
খোঁড়ার পা যে খানায় পড়ে
আমিই তাহার সাক্ষি।
আমি কারো নাম করি নি
তবু ভয়ে মরি।
তুই পাছে নিস গায়ে পেতে
সেইটো বড়ো ডরি!
কথা একটা উঠলে মনে
ভারি তোরা জ্বালাস।
আমি বাপু আগে থাকতে
বলে হলুম খালাস!

পত্র

শ্রীমান্ দামু বসু এবং চামু বসু
সম্পাদক সমীপেষু।

দামু বোস আর চামু বোসে
কাগজ বেনিয়েছে,
বিদ্যেখানা বড্ড ফেনিয়েছে!
(আমার দামু, আমার চামু!)

কোথায় গেল বাবা তোমার
মা জননী কই!
সাত-রাজার-ধন মানিক ছেলের
মুখে ফুটছে খই!
(আমার দামু আমার চামু!)
দামু ছিল একরত্তি
চামু তথৈবচ,
কোথা থেকে এল শিখে
এতই খচমচ!
(আমার দামু আমার চামু!)
দামু বলেন "দাদা আমার"
চামু বলেন "ভাই",
আমাদের দোঁহাকার মতো
ত্রিভুবনে নাই!
(আমার দামু আমার চামু!)
গায়ে পড়ে গাল পাড়ছে
বাজার সরগরম,
মেছুনি-সংহিতায় ব্যাখ্যা
হিঁদুর ধরম।
(দামু আমার চামু!)
দামুচন্দ্র অতি হিঁদু
আরো হিঁদু চামু
সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গায় হিঁদু
রামু বামু শামু -
(দামু আমার চামু!)
রব উঠেছে ভারতভূমে
হিঁদু মেলা ভার,
দামু চামু দেখা দিয়েছেন
ভয় নেইকো আর।
(ওরে দামু, ওরে চামু!)
নাই বটে গোতম অত্রি
যে যার গেছে সরে,
হিঁদু দামু চামু এলেন
কাগজ হাতে করে!
(আহা দামু আহা চামু!)
লিখছে দোঁহে হিঁদুশাস্ত্র
এডিটোরিয়াল,
দামু বলছে মিথ্যে কথা
চামু দিচ্ছে গাল।
(হায় দামু হায় চামু!)
এমন হিঁদু মিলবে না রে
সকল হিঁদুর সেরা,

বোস বংশ আর্যবংশ
সেই বংশের এ'রা!
(বোস দাম্‌ বোস চাম্‌!)

কলির শেষে প্রজাপতি
তুলেছিলেন হাই,
সুড়সুড়িয়ে বেরিয়ে এলেন
আর্য দুটি ভাই;
(আর্য দামু চামু!)

দন্ত দিয়ে খুঁড়ে তুলছে
হিন্দু শাস্ত্রের মূল,
মেলাই কচুর আমদানিতে
বাজার হুলুস্থুল।
(দামু চামু অবতার!)

মনু বলেন "মনু আমি"
বেদের হল ভেদ,
দামু চামু শাস্ত্র ছাড়ে,
রইল মনে খেদ!
(ওরে দামু ওরে চামু!)

মেড়ার মতো লড়াই করে
লেজের দিকটা মোটা,
দাপে কাঁপে থরথর
হিন্দুয়ানির খোঁটা!
(আমার হিন্দু দামু চামু!)

দামু চামু কেঁদে আকুল
কোথায় হিন্দুয়ানি!
ট্যাঁকে আছে গোঁজা' যেথায়
সিকি দুয়ানি।
(থলের মধ্যে হিন্দুয়ানি!)

দামু চামু ফুলে উঠল
হিন্দুয়ানি বেচে,
হামাগুড়ি ছেড়ে এখন
বেড়ায় নেচে নেচে!
(ষেটের বাছা দামু চামু!)

আদর পেয়ে নাদুস নুদুস
আহার করছে কসে,
তরিবৎটা শিখলে নাকো
বাপের শিক্ষাদোষে!
(ওরে দামু চামু!)

এসো বাপু কানটি নিয়ে,
শিখবে সদাচার,
কানের যদি অভাব থাকে

তবেই নাচার!
(হায় দামু হায় চামু!)
পড়াশুনো করো, ছাড়ো
শাস্ত্র আষাঢ়ে,
মেজে ঘষে তোল্ রে বাপু
স্বভাব চাষাড়ে।
(ও দামু ও চামু!)
ভদ্রলোকের মান রেখে চল্
ভদ্র বলবে তোকে,
মুখ ছুটোলে কুলশীলটা
জেনে ফেলবে লোকে!
(হায় দামু হায় চামু!)
পয়সা চাও তো পয়সা দেব
থাকো সাধুপথে,
তাবচ্চ শোভতে কেউ কেউ
যাবৎ ন ভাষতে!
(হে দামু হে চামু!)

মানসী

ভূমিকা

প্রথম সংস্করণ

এই গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর স্বরূপ গণ্য করা হইয়াছে। সেরূপ স্থলে সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে যুক্তাক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া না পড়িলে ছন্দ রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। যথা—

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল;
ঊর্ধ্বে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।

'নিম্নে' 'স্বচ্ছ' এবং 'ঊর্ধ্বে' এই কয়েকটি শব্দে তিন মাত্রা গণনা না করিলে পয়ার ছন্দ থাকে না। আমার বিশ্বাস যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর স্বরূপ গণনা করাই স্বাভাবিক এবং তাহাতে ছন্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, কেবল বাঙ্গালা ছন্দ পাঠ করিয়া বিকৃত অভ্যাস হওয়াতেই সহসা তাহা দুঃসাধ্য মনে হইতে পারে। শব্দের আরম্ভ অক্ষর যুক্ত হইলেও তাহাকে যুক্তাক্ষর স্বরূপে গণনা করা যায় নাই—পাঠকেরা এইরূপ আরো দুই-একটি ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবেন।

গ্রন্থের আরম্ভ ভাগের কতকগুলি কবিতা ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত কবিতাই রচনাকালের পর্যায় অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে।

'শেষ উপহার' নামক কবিতাটি আমার কোনো বন্ধুর রচিত এক ইংরাজি কবিতা অবলম্বন করিয়া রচনা করিয়াছি। মূল কবিতাটি এইখানে উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমার বন্ধু সম্প্রতি সুদূর প্রবাসে থাকা প্রযুক্ত তাহা পারিলাম না।

গ্রন্থকার

সূচনা

বাল্যকাল থেকে পশ্চিম-ভারত আমার কাছে রোম্যান্টিক কল্পনার বিষয় ছিল। এইখানেই নিরবচ্ছিন্নকাল বিদেশীয়দের সঙ্গে এ দেশের সংযোগ ও সংঘর্ষ ঘটে এসেছে। বহু শতাব্দী ধরে এইখানেই ইতিহাসের বিপুল পটভূমিকায় বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন এবং নব নব ঐশ্বর্যের বিকাশ ও বিলয় আপন বিচিত্র বর্ণের ছবির ধারা অঙ্কিত করে চলেছে। অনেক দিন ইচ্ছা করেছি এই পশ্চিম-ভারতের কোনো-এক জায়গায় আশ্রয় নিয়ে ভারতবর্ষের বিরাট বিক্ষুব্ধ অতীত যুগের স্পর্শলাভ করব মনের মধ্যে। অবশেষে এক সময়ে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলুম। এত দেশ থাকতে কেন যে গাজিপুর বেছে নিয়েছিলুম তার দুটো কারণ আছে। শুনেছিলুম গাজিপুরে আছে গোলাপের খেত। আমি যেন মনের মধ্যে গোলাপবিলাসী সিরাজের ছবি এঁকে নিয়েছিলুম। তারই মোহ আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল। সেখানে গিয়ে দেখলুম ব্যবসাদারের গোলাপের খেত, এখানে বুলবুলের আমন্ত্রণ নেই, কবিরও নেই; হারিয়ে গেল সেই ছবি। অপর পক্ষে, গাজিপুরে মহিমান্বিত প্রাচীন ইতিহাসের স্বাক্ষর কোথাও বড়ো রেখায় ছাপ দেয় নি। আমার চোখে এর চেহারা ঠেকল সাদা-কাপড়-পরা বিধবার মতো, সেও কোনো বড়োঘরের ঘরনী নয়।

তবু গাজিপুরেই রয়ে গেলুম তার একটা কারণ এখানে ছিলেন আমাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয় গগনচন্দ্র রায়, আফিম-বিভাগের একজন বড়ো কর্মচারী। এখানে আমার সমস্ত ব্যবস্থা সহজ হল তাঁরই সাহায্যে। একখানা বড়ো বাংলা পাওয়া গেল, গঙ্গার ধারেও বটে, ঠিক গঙ্গার ধারেও নয়। প্রায় মাইলখানেক চর পড়ে গেছে, সেখানে যবের ছোলার শর্ষের খেত, দূর থেকে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণ-টানা নৌকো চলেছে মন্থর গতিতে। বাড়ির সংলগ্ন অনেকখানি জমি, অনাদৃত, বাংলা-দেশের মাটি হলে জঙ্গল হয়ে উঠত। ইঁদারা থেকে পুর চলছে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কলকল শব্দে। গোলকচাঁপার ঘনপল্লব থেকে কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়। পশ্চিম কোণে প্রাচীন একটা মহানিম গাছ, তার বিস্তীর্ণ ছায়াতলে বসবার জায়গা। সাদা ধুলোর রাস্তা চলেছে বাড়ির গা ঘেঁষে, দূরে দেখা যায় খোলার-চালওয়ালা পল্লী।

গাজিপুর আগ্রা-দিল্লীর সমকক্ষ নয়, সিরাজ-সমরখন্দের সঙ্গেও এর তুলনা হয় না। তবু মন নিমগ্ন হল অক্ষুন্ন অবকাশের মধ্যে। আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূলহস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এল মনোরাজ্যে। এই আব-হাওয়ায় আমার কাব্য-রচনার একটা নতুন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল। আমার কল্পনার উপর নূতন পরিবেষ্টনের প্রভাব বার বার দেখেছি। এইজন্যেই আলমোড়ায় যখন ছিলুম আমার লেখনী হঠাৎ নতুন পথ নিল 'শিশু'র কবিতায়, অথচ সে-জাতীয় কবিতার কোনো প্রেরণা কোনো উপলক্ষই সেখানে ছিল না। পূর্বতন রচনাধারা থেকে স্বতন্ত্র এ একটা নূতন কাব্যরূপের প্রকাশ। 'মানসী'ও সেইরকম। নূতন আবেষ্টনে

এই কবিতাগুলি সহসা যেন নবদেহ ধারণ করল। পূর্ববর্তী 'কড়ি ও কোমল'-এর সঙ্গে এর বিশেষ মিল পাওয়া যাবে না। আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। 'মানসী'তেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২৮.২.১৯৪০

উপহার

নিভৃত এ চিত্ত-মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিন রাত।
সুখ দুঃখ গীতস্বর ফুটিতেছে নিরন্তর,
ধ্বনি শুধু, সাথে নাই ভাষা।
বিচিত্র সে কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।
এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই,
রচি শুধু অসীমের সীমা।
আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে,
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহমন্ত্র-গানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা,
ছাড়ি অন্তঃপুরবাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্তিমতী মর্মের কামনা।
অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস।
সেই আনন্দমুহূর্তগুলি তব করে দিনু তুলি
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ।

জোড়াসাঁকো
১০ বৈশাখ ১৮৯০

ভুলে

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া,
এসেছি ভুলে।
তবু একবার চাও মুখপানে
নয়ন তুলে।
দেখি, ও নয়নে নিমেষের তরে
সেদিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,
সজল আবেগে আঁখিপাতা দুটি
পড়ে কি ঢুলে।
ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙায়ো না,
এসেছি ভুলে।

বেল-কুঁড়ি দুটি করে ফুটি-ফুটি
অধর খোলা।
মনে পড়ে গেল সেকালের সেই
কুসুম তোলা।
সেই শুকতারা সেই চোখে চায়,
বাতাস কাহারে খুঁজিয়া বেড়ায়,
উষা না ফুটিতে হাসি ফুটে তার
গগনমূলে।
সেদিন যে গেছে ভুলে গেছি, তাই
এসেছি ভুলে।

ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে
পড়ে না মনে,
দূরে থেকে কবে ফিরে গিয়েছিলে
নাই স্মরণে।
শুধু মনে পড়ে হাসিমুখখানি
লাজে বাধো-বাধো সোহাগের বাণী,
মনে পড়ে সেই হৃদয়-উছাস
নয়নকূলে।
তুমি যে ভুলেছ ভুলে গেছি, তাই
এসেছি ভুলে।

কাননের ফুল, এরা তো ভোলে নি,
আমরা ভুলি?
সেই তো ফুটেছে পাতায় পাতায়
কামিনীগুলি!
চাঁপা কোথা হতে এনেছে ধরিয়া

অরুণকিরণ কোমল করিয়া,
বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায়
কাহার চুলে?
কেহ ভোলে, কেউ ভোলে না যে, তাই
এসেছি ভুলে।

এমন করিয়া কেমনে কাটিবে
মাধবী রাতি?
দখিনে বাতাসে কেহ নেই পাশে
সাথের সাথী!
চারি দিক হতে বাঁশি শোনা যায়,
সুখে আছে যারা তারা গান গায়—
আকুল বাতাসে, মদির সুবাসে,
বিকচ ফুলে,
এখনো কি কেঁদে চাহিবে না কেউ
আসিলে ভুলে?

বৈশাখ ১৮৮৮

ভুল-ভাঙা

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর।
মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে,
রয়েছে ডোর।
নেই আর সেই চুপি-চুপি চাওয়া,
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া-
চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ
বাহুতে মোর।

হাসিটুকু আর পড়ে না তো ধরা
অধরকোণে।
আপনারে আর চাহ না লুকাতে
আপন মনে।
স্বর শুনে আর উতলা হৃদয়
উথলি উঠে না সারা দেহময়,
গান শুনে আর ভাসে না নয়নে
নয়নলোর।
আঁখিজলরেখা ঢাকিতে চাহে না
শরম চোর।

বসন্ত নাহি এ ধরায় আর
আগের মতো,
জ্যোৎস্নাযামিনী যৌবনহারা
জীবনহত।
আর বুঝি কেহ বাজায় না বীণা,
কে জানে কাননে ফুল ফোটে কি না—
কে জানে সে ফুল তোলে কি না কেউ
ভরি আঁচোর!
কে জানে সে ফুলে মালা গাঁথে কি না
সারা প্রহর!

বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু যেই—
থামিল বাঁশি।
এখন কেবল চরণে শিকল
কঠিন ফাঁসি।
মধুনিশা গেছে, স্মৃতি তারি আজ
মর্মে মর্মে হানিতেছে লাজ—
সুখ গেছে, আছে সুখের ছলনা
হৃদয়ে তোর।
প্রেম গেছে, শুধু আছে প্রাণপণ
মিছে আদর।

কতই না জানি জেগেছ রজনী
করুণ দুখে,
সদয় নয়নে চেয়েছ আমার
মলিন মুখে।
পরদুখভার সহে নাকো আর,
লতায়ে পড়িছে দেহ সুকুমার,
তবু আসি আমি পাষাণ হৃদয়
বড়ো কঠোর।
ঘুমাও, ঘুমাও, আঁখি ঢুলে আসে
ঘুমে কাতর।

৪৯ পার্ক স্ট্রীট
বৈশাখ ১৮৮৭

বিরহানন্দ

এই ছন্দে যে যে স্থানে ফাঁক সেইখানে দীর্ঘ যতিপতন আবশ্যক

ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী
বিরহতপোবনে আনমনে উদাসী।

আঁধারে আলো মিশে দিশে দিশে খেলিত,
অটবী বায়ুবশে উঠিত সে উছাসি।
কখনো ফুল দুটো আঁখিপুট মেলিত,
কখনো পাতা ঝরে পড়িত রে নিশাসি।

তবু সে ছিনু ভালো আধা-আলো- আঁধারে,
গহন শত-ফের বিষাদের মাঝারে।
নয়নে কত ছায়া কত মায়া ভাসিত,
উদাস বায়ু সে তো ডেকে যেত আমারে।
ভাবনা কত সাজে হৃদি-মাঝে আসিত,
খেলাত অবিরত কত শত আকারে!

বিরহপরিপুত ছায়াযুত শয়নে
ঘুমের সাথে স্মৃতি আসে নিতি নয়নে।
কপোত দুটি ডাকে বসি শাখে মধুরে,
দিবস চলে যায় গলে যায় গগনে।
কোকিল কুহুতানে ডেকে আনে বধূরে,
নিবিড় শীতলতা তরুলতা- গহনে।

আকাশে চাহিতাম গাহিতাম একাকী,
মনের যত কথা ছিল সেথা লেখা কি?
দিবসনিশি ধ'রে ধ্যান ক'রে তাহারে
নীলিমা-পরপার পাব তার দেখা কি?
তটিনী অনুখন ছোটে কোন্ পাথারে,
আমি যে গান গাই তারি ঠাঁই শেখা কি?

বিরহে তারি নাম শুনিতাম পবনে,
তাহারি সাথে থাকা মেঘে ঢাকা ভবনে।
পাতার মরমর কলেবর হরষে,
তাহারি পদধ্বনি যেন গণি কাননে।
মুকুল সুকুমার যেন তার পরশে,
চাঁদের চোখে ক্ষুধা তারি সুধা- স্বপনে।

করুণা অনুখন প্রাণ মন ভরিত,
ঝরিলে ফুলদল চোখে জল ঝরিত।
পবন হু হু করে করিত রে হাহাকার,
ধরার তরে যেন মোর প্রাণ ঝুরিত।
হেরিলে দুখে শোকে কারো চোখে আঁখিধার
তোমারি আঁখি কেন মনে যেন পড়িত।

শিশুরে কোলে নিয়ে জুড়াইয়ে যেত বুক,
আকাশে বিকশিত তোরি মতো স্নেহমুখ।

দেখিলে আঁখি-রাঙা পাখাভাঙা পাখিটি
'আহাহা' ধ্বনি তোর প্রাণে মোর দিত দুখ।
মুছালে দুখনীর দুখিনীর আঁখিটি,
জাগিত মনে ত্বরা দয়া-ভরা তোর সুখ।

সারাটা দিনমান রচি গান কত-না!
তোমারি পাশে রহি যেন কহি বেদনা।
কানন মরমরে কত স্বরে কহিত,
ধ্বনিত যেন দিশে তোমারি সে রচনা।
সতত দূরে কাছে আগে পাছে বহিত
তোমারি যত কথা পাতা-লতা ঝরনা।

তোমারে আঁকিতাম, রাখিতাম ধরিয়া
বিরহ ছায়াতল সুশীতল করিয়া।
কখনো দেখি যেন ম্লান-হেন মুখানি,
কখনো আঁখিপুটে হাসি উঠে ভরিয়া।
কখনো সারা রাত ধরি হাত দুখানি
রহি গো বেশবাসে কেশপাশে মরিয়া।

বিরহ সুমধুর হল দূর কেন রে?
মিলনদাবানলে গেল জ্বলে যেন রে।
কই সে দেবী কই, হেরো ওই একাকার,
শ্মশানবিলাসিনী বিবাসিনী বিহরে।
নাই গো দয়ামায়া স্নেহছায়া নাহি আর—
সকলি করে ধু ধু, প্রাণ শুধু শিহরে।

জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৭

ক্ষণিক মিলন

একদা এলোচুলে কোন্ ভুলে ভুলিয়া
আসিল সে আমার ভাঙা দ্বার খুলিয়া।
জ্যোৎস্না অনিমিখ, চারি দিক সুবিজন,
চাহিল একবার আঁখি তার তুলিয়া।
দখিন-বায়ু-ভরে থরথরে কাঁপে বন,
উঠিল প্রাণ মম তারি সম দুলিয়া।

আবার ধীরে ধীরে গেল ফিরে আলসে,
আমার সব হিয়া মাড়াইয়া গেল সে।
আমার যাহা ছিল সব নিল আপনায়,
হরিল আমাদের আকাশের আলো সে।

সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হয়ে যায়
তাহারি চরণের শরণের লালসে।

যে জন চলিয়াছে তারি পাছে সবে ধায়,
নিখিলে যত প্রাণ যত গান ঘিরে তায়।
সকল রূপ-হার উপহার চরণে.
ধায় গো উদাসিয়া যত হিয়া পায় পায়।
যে জন পড়ে থাকে একা ডাকে মরণে,
সুদূর হতে হাসি আর বাঁশি শোনা যায়।

শবদ নাহি আর, চারি ধার প্রাণহীন—
কেবল ধুক্ ধুক্ করে বুক নিশিদিন।
যেন গো ধ্বনি এই তারি সেই চরণের
কেবলি বাজে শুনি, তাই গুনি দুই তিন।
কুড়ায়ে সব-শেষ অবশেষ স্মরণের
বসিয়া একজন আনমন উদাসীন।

জোড়াসাঁকো
৯ ভাদ্র ১৮৮৯

শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা

আবার মোরে পাগল করে
দিবে কে?
হৃদয় যেন পাষাণ-হেন
বিরাগ-ভরা বিবেকে।
আবার প্রাণে নূতন টানে
প্রেমের নদী
পাষাণ হতে উছল স্রোতে
বহায় যদি!
আবার দুটি নয়নে লুটি
হৃদয় হরে নিবে কে?
আবার মোরে পাগল করে
দিবে কে?

আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা?
কাহার প্রেমে আসিবে নেমে
স্বরগ হতে করুণা?
নিশীথ-নভে শুনিব কবে
গভীর গান,

যে দিকে চাব দেখিতে পাব
নবীন প্রাণ,
নূতন প্রীতি আনিবে নিতি
কুমারী উষা অরুণা :
আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা ?

কোথা এ মোর জীবন-ডোর
বাঁধা রে ?
প্রেমের ফুল ফুটে আকুল
কোথায় কোন্ আঁধারে ?
গভীরতম বাসনা মম
কোথায় আছে ?
আমার গান আমার প্রাণ
কাহার কাছে ?
কোন্ গগনে মেঘের কোণে
লুকায়ে কোন্ চাঁদা রে ?
কোথায় মোর জীবন-ডোর
বাঁধা রে ?

অনেক দিন পরানহীন
ধরণী।
বসনাবৃত খাঁচার মতো
তামসঘনবরনী।
নাই সে শাখা, নাই সে পাখা,
নাই সে পাতা,
নাই সে ছবি, নাই সে রবি,
নাই সে গাথা :
জীবন চলে আঁধার জলে
আলোকহীন তরণী।
অনেক দিন পরানহীন
ধরণী।

মায়া-কারায় বিভোর-প্রায়
সকলি,
শতেক পাকে জড়ায়ে রাখে
ঘুমের ঘোর শিকলি।
দানব-হেন আছে কে যেন
দুয়ার আঁটি।
কাহার কাছে না জানি আছে
সোনার কাঠি ?

পরশ লেগে উঠিবে জেগে
হরষ-রস-কাকলি!
মায়া-কারায় বিভোর-প্রায়
সকলি।

দিবে সে খুলি এ ঘোর ধূলি-
আবরণ।
তাহার হাতে আঁখির পাতে
জগত-জাগা জাগরণ।
সে হাসিখানি আনিবে টানি
সবার হাসি,
গড়িবে গেহ, জাগাবে স্নেহ,
জীবনরাশি।
প্রকৃতিবধূ চাহিবে মধু,
পরিবে নব আভরণ।
সে দিবে খুলি এ ঘোর ধূলি-
আবরণ।

পাগল করে দিবে সে মোরে
চাহিয়া,
হৃদয়ে এসে মধুর হেসে
প্রাণের গান গাহিয়া।
আপনা থাকি ভাসিবে আঁখি
আকুল নীরে,
ঝরনা-সম জগৎ মম
ঝরিবে শিরে।
তাহার বাণী দিবে গো আনি
সকল বাণী বাহিয়া।
পাগল করে দিবে সে মোরে
চাহিয়া।

৪৯ পার্ক স্ট্রীট
আষাঢ় ১৮৮৭

আত্মসমর্পণ

আমি এ কেবল মিছে বলি,
শুধু আপনার মন ছলি।
কঠিন বচন শুনায়ে তোমারে
আপন মর্মে জ্বলি।

থাক্ তবে থাক্ ক্ষীণ প্রতারণা,
কী হবে লুকায়ে বাসনা বেদনা,
যেমন আমার হৃদয়-পরান
তেমনি দেখাব খুলি।

আমি মনে করি যাই দূরে,
তুমি রয়েছ বিশ্ব জুড়ে।
যত দূরে যাই ততই তোমার
কাছাকাছি ফিরি ঘুরে।
চোখে চোখে থেকে কাছে নহ তবু,
দূরেতে থেকেও দূর নহ কভু,
সৃষ্টি ব্যাপিয়া রয়েছ তবুও
আপন অন্তঃপুরে।

আমি যেমনি করিয়া চাই,
আমি যেমনি করিয়া গাই,
বেদনাবিহীন ওই হাসিমুখ
সমান দেখিতে পাই।
ওই রূপরাশি আপনা বিকাশি
রয়েছে পূর্ণ গৌরবে ভাসি,
আমার ভিখারী প্রাণের বাসনা
হোথায় না পায় ঠাঁই।

শুধু ফুটন্ত ফুল-মাঝে
দেবী, তোমার চরণ সাজে।
অভাব-কঠিন মলিন মর্ত্য
কোমল চরণে বাজে।
জেনে শুনে তবু কী ভ্রমে ভুলিয়া
আপনারে আমি এনেছি তুলিয়া,
বাহিরে আসিয়া দরিদ্র আশা
লুকাতে চাহিছে লাজে।

তবু থাক্ পড়ে ওইখানে,
চেয়ে তোমার চরণ-পানে।
যা দিয়েছি তাহা গেছে চিরকাল,
আর ফিরিবে না প্রাণে।
তবে ভালো করে দেখো একবার
দীনতা হীনতা যা আছে আমার,
ছিন্ন মলিন অনাবৃত হিয়া
অভিমান নাহি জানে।

তবে লুকাব না আমি আর
এই ব্যথিত হৃদয়ভার।
আপনার হাতে চাব না রাখিতে
আপনার অধিকার।
বাঁচিলাম প্রাণে তেয়াগিয়া লাজ,
বন্ধ বেদনা ছাড়া পেল আজ,
আশা-নিরাশায় তোমারি যে আমি
জানাইনু শত বার।

জোড়াসাঁকো
১১ ভাদ্র ১৮৮৯

নিষ্ফল কামনা

বৃথা এ ক্রন্দন!
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা!

রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার আকাশেতে আলো।
সন্ধ্যা নত-আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।
বহে কি না বহে
বিদায়বিষাদশ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।
দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি-মাঝে।
খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি!
যে অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়!
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমিরতলে কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্য-শিখা।
তাই চেয়ে আছি।
প্রাণ মন সব লয়ে তাই ডুবিতেছি
অতল আকাঙ্ক্ষা-পারাবারে।
তোমার আঁখির মাঝে,
হাসির আড়ালে,
বচনের সুধাস্রোতে,

তোমার বদনব্যাপী
করুণ শান্তির তলে
তোমারে কোথায় পাব—
তাই এ ক্রন্দন!

বৃথা এ ক্রন্দন!
হায় রে দুরাশা!
এ রহস্য, এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস তাই ভালো,
হাসিটুকু, কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টিটুকু,
প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস!
কী আছে বা তোর,
কী পারিবি দিতে!
আছে কি অনন্ত প্রেম?
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব?
মহাকাশ-ভরা
এ অসীম জগৎ-জনতা,
এ নিবিড় আলো অন্ধকার,
কোটি ছায়াপথ, মায়াপথ,
দুর্গম উদয়-অস্তাচল,
এরই মাঝে পথ করি
পারিবি কি নিয়ে যেতে
চিরসহচরে
চিররাত্রিদিন
একা অসহায়?
যে জন আপনি ভীত, কাতর, দুর্বল,
ম্লান, ক্ষুধাতৃষাতুর, অন্ধ, দিশাহারা,
আপন হৃদয়ভারে পীড়িত জর্জর,
সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন-তরে?

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।
অতি সযতনে,
অতি সংগোপনে,
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে,
শত ঋতু-আবর্তনে,

বিশ্বজগতের তরে, ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি ;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে ?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্যবিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

শান্ত সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে,
চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই।

১৩ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

সংশয়ের আবেগ

ভালোবাস কি না বাস বুঝিতে পারি নে,
তাই কাছে থাকি।
তাই তব মুখপানে রাখিয়াছি মেলি
সর্বগ্রাসী আঁখি।
তাই সারা রাত্রিদিন শ্রান্তি-তৃপ্তি-নিদ্রাহীন
করিতেছি পান
যতটুকু হাসি পাই, যতটুকু কথা,
যতটুকু গান।

তাই কভু ফিরে যাই, কভু ফেলি শ্বাস,
কভু ধরি হাত।
কখনো কঠিন কথা, কখনো সোহাগ,
কভু অশ্রুপাত।
তুলি ফুল দেব ব'লে, ফেলে দিই ভূমিতলে
করি' খান খান।
কখনো আপন মনে আপনার সাথে
করি অভিমান।

জানি যদি ভালোবাস চির-ভালোবাসা
জনমে বিশ্বাস,
যেথা তুমি যেতে বল সেথা যেতে পারি—
ফেলি নে নিশ্বাস।

তরঙ্গিত এ হৃদয় তরঙ্গিত সমুদয়
বিশ্বচরাচর
মুহূর্তে হইবে শান্ত, টলমল প্রাণ
পাইবে নির্ভর।

বাসনার তীব্র জ্বালা দূর হয়ে যাবে,
যাবে অভিমান—
হৃদয়দেবতা হবে, করিব চরণে
পুষ্প-অর্ঘ্য দান।
দিবানিশি অবিরল লয়ে শ্বাস অশ্রুজল
লয়ে হা-হুতাশ
চির ক্ষুধাতৃষা লয়ে আঁখির সম্মুখে
করিব না বাস।

তোমার প্রেমের ছায়া আমারে ছাড়ায়ে
পড়িবে জগতে,
মধুর আঁখির আলো পড়িবে সতত
সংসারের পথে।
দূরে যাবে ভয় লাজ, সাধিব আপন কাজ
শতগুণ বলে—
বাড়িবে আমার প্রেম পেয়ে তব প্রেম,
দিব তা সকলে।

নহে তো আঘাত করো কঠোর কঠিন
কেঁদে যাই চলে।
কেড়ে লও বাহু তব, ফিরে লও আঁখি,
প্রেম দাও দ'লে।
কেন এ সংশয়-ডোরে বাঁধিয়া রেখেছ মোরে,
বহে যায় বেলা।
জীবনের কাজ আছে—প্রেম নহে ফাঁকি,
প্রাণ নহে খেলা।

১৩ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

বিচ্ছেদের শান্তি

সেই ভালো, তবে তুমি যাও।
তবে আর কেন মিছে করুণ-নয়নে
আমার মুখের পানে চাও!
এ চোখে ভাসিছে জল, এ শুধু মায়ার ছল,
কেন কাঁদি তাও নাহি জানি।

নীরব আঁধার রাতি, তারকার ম্লান ভাতি,
মোহ আনে বিদায়ের বাণী।
নিশিশেষে দিবালোকে এ জল রবে না চোখে,
শান্ত হবে অধীর হৃদয়—
জাগ্রত জগত-মাঝে ধাইব আপন কাজে,
কাঁদিবার রবে না সময়।

দেখেছি অনেক দিন বন্ধন হয়েছে ক্ষীণ,
ছেঁড় নাই করুণার বশে।
গানে লাগিত না সুর, কাছে থেকে ছিলে দূর—
যাও নাই কেবল আলসে।
পরান ধরিয়া তবু পারিতাম না তো কভু
তোমা ছেড়ে করিতে গমন।
প্রাণপণে কাছে থাকি দেখিতাম মেলি আঁখি
পলে পলে প্রেমের মরণ।
তুমি তো আপনা হতে এসেছ বিদায় ল'তে—
সেই ভালো, তবে তুমি যাও।
যে প্রেমেতে এত ভয় এত দুঃখ লেগে রয়
সে বন্ধন তুমি ছিঁড়ে দাও।

আমি রহি এক ধারে, তুমি যাও পরপারে,
মাঝখানে বহুক বিস্মৃতি—
একেবারে ভুলে যেয়ো, শতগুণে ভালো সেও,
ভালো নয় প্রেমের বিকৃতি।
কে বলে যায় না ভোলা! মরণের দ্বার খোলা,
সকলেরই আছে সমাপন।
নিবে যায় দাবানল, শুকায় সমুদ্রজল,
থেমে যায় ঝটিকার রণ।
থাকে শুধু মহা শান্তি, মৃত্যুর শ্যামল কান্তি
জীবনের অনন্ত নির্ঝর—
শত সুখ দুঃখ দ'লে কালচক্র যায় চলে,
রেখা পড়ে যুগ-যুগান্তর।

যেখানে যে এসে পড়ে, আপনার কাজ করে
সহস্র জীবন-মাঝে মিশে—
কত যায় কত থাকে, কত ভোলে কত রাখে,
চলে যায় বিষাদে হরিষে।
তুমি আমি যাব দূরে— তবুও জগৎ ঘুরে,
চন্দ্র সূর্য জাগে অবিরল,
থাকে সুখ দুঃখ লাজ, থাকে শত শত কাজ,
এ জীবন হয় না নিষ্ফল।

মিছে কেন কাটে কাল, ছিঁড়ে দাও স্বপ্নজাল,
চেতনার বেদনা জাগাও—
নূতন আশ্রয়-ঠাঁই দেখি পাই কি না পাই—
সেই ভালো তবে তুমি যাও!

১৪ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

তবু

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি,
সেই পুরাতন প্রেম যদি এক কালে
হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি—
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।
তবু মনে রেখো, যদি বড়ো কাছে থাকি,
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন,
দেখে না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি,
পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন।
তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে
উদাস বিষাদভরে কাটে সন্ধ্যাবেলা,
অথবা শারদ প্রাতে বাধা পড়ে কাজে,
অথবা বসন্ত-রাতে থেমে যায় খেলা।
তবু মনে রেখো, যদি মনে প'ড়ে আর
আঁখিপ্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধার।

১৫ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

একাল ও সেকাল

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী।
গাঢ় ছায়া সারাদিন,
মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।

আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা-অভিসার
পাগলিনী রাধিকার,
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে।
সেদিনও এমনি বায়ু রহিয়া রহিয়া—
এমনি অশ্রান্ত বৃষ্টি,

তড়িতচকিত দৃষ্টি,
এমনি কাতর হায় রমণীর হিয়া।

বিরহিণী মর্মে-মরা মেঘমন্দ্র স্বরে—
নয়নে নিমেষ নাহি,
গগনে রহিত চাহি,
আঁকিত প্রাণের আশা জলদের স্তরে।

চাহিত পথিকবধূ শূন্য পথপানে।
মল্লার গাহিত কারা,
ঝরিত বরষাধারা,
নিতান্ত বাজিত গিয়া কাতর পরানে।

যক্ষনারী বীণা কোলে ভূমিতে বিলীন—
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ,
অযত্নশিথিল বেশ—
সেদিনও এমনিতরো অন্ধকার দিন।

সেই কদম্বের মূল, যমুনার তীর,
সেই সে শিখীর নৃত্য
এখনো হরিছে চিত্ত—
ফেলিছে বিরহ-ছায়া শ্রাবণতিমির।

আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা
সারানিশি, সারাবেলা,
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়কুটীরে।

২১ বৈশাখ ১৮৮৮

আকাঙ্ক্ষা

আর্দ্র তীব্র পূর্ব-বায়ু বহিতেছে বেগে,
ঢেকেছে উদয়পথ ঘননীল মেঘে।
দূরে গঙ্গা, নৌকা নাই, বালু উড়ে যায়,
বসে বসে ভাবিতেছি—আজি কে কোথায়!

শুষ্ক পাতা উড়ে পড়ে জনহীন পথে,
বনের উতল রোল আসে দূর হতে।
নীরব প্রভাত-পাখি, কম্পিত কুলায়,
মনে জাগিতেছে সদা—আজি সে কোথায়!

কত কাল ছিল কাছে, বলি নি তো কিছু—
দিবস চলিয়া গেছে দিবসের পিছু।
কত হাস্যপরিহাস, বাক্য-হানাহানি,
তার মাঝে রয়ে গেছে হৃদয়ের বাণী।

মনে হয় আজ যদি পাইতাম কাছে,
বলিতাম হৃদয়ের যত কথা আছে।
বচনে পড়িত নীল জলদের ছায়,
ধ্বনিতে ধ্বনিত আর্দ্র উতরোল বায়।

ঘনাইত নিস্তব্ধতা দূরে ঝটিকার,
নদীতীরে মেঘে বনে হত একাকার।
এলোকেশ মুখে তার পড়িত নামিয়া,
নয়নে সজল বাষ্প রহিত থামিয়া।

জীবনমরণময় সুগম্ভীর কথা,
অরণ্যমর্মর-সম মর্মব্যাকুলতা,
ইহপরকালব্যাপী সুমহান প্রাণ,
উচ্ছ্বসিত উচ্চ আশা, মহত্ত্বের গান,

বৃহৎ বিষাদ-ছায়া, বিরহ গভীর,
প্রচ্ছন্ন হৃদয়রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা অধীর,
বর্ণন-অতীত যত অস্ফুট বচন—
নির্জন ফেলিত ছেয়ে মেঘের মতন।

যথা দিবা-অবসানে, নিশীথনিলয়ে
বিশ্ব দেখা দেয় তার গ্রহতারা লয়ে,
হাস্যপরিহাসমুক্ত হৃদয়ে আমার
দেখিত সে অন্তহীন জগতবিস্তার।

নিম্নে শুধু কোলাহল খেলাধুলা হাস,
উপরে নির্লিপ্ত শান্ত অন্তর-আকাশ।
আলোকেতে দেখো শুধু ক্ষণিকের খেলা,
অন্ধকারে আছি আমি অসীম একেলা।

কতটুকু ক্ষুদ্র মোরে দেখে গেছে চলে,
কত ক্ষুদ্র সে বিদায় তুচ্ছ কথা বলে।

কল্পনার সত্যরাজ্য দেখাই নি তারে,
বসাই নি এ নির্জন আত্মার আঁধারে।

এ নিভৃতে, এ নিস্তব্ধে, এ মহত্ত্ব-মাঝে
দুটি চিত্ত চিরনিশি যদি রে বিরাজে,
হাসিহীন শব্দশূন্য ব্যোম দিশাহারা,
প্রেমপূর্ণ চারি চক্ষু জাগে চারি তারা!

শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই, বাধা নাই পথে,
জীবন ব্যাপিয়া যায় জগতে জগতে—
দুটি প্রাণতন্ত্রী হতে পূর্ণ একতানে
উঠে গান অসীমের সিংহাসন-পানে।

২০ বৈশাখ ১৮৮৮

নিষ্ঠুর সৃষ্টি

মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়মনিগড়ে,
আনাগোনা মেলামেশা সবই অন্ধ দৈবের ঘটনা।
এই ভাঙে, এই গড়ে,
এই উঠে, এই পড়ে—
কেহ নাহি চেয়ে দেখে কার কোথা বাজিছে বেদনা।

মনে হয়, যেন ওই অবারিত শূন্যতলপথে
অকস্মাৎ আসিয়াছে সৃজনের বন্যা ভয়ানক—
অজ্ঞাত শিখর হতে
সহসা প্রচণ্ড স্রোতে
ছুটে আসে সূর্য চন্দ্র, ধেয়ে আসে লক্ষকোটি লোক।

কোথাও পড়েছে আলো, কোথাও বা অন্ধকার নিশি—
কোথাও সফেন শুভ্র, কোথাও বা আবর্ত আবিল—
সৃজনে প্রলয়ে মিশি
আক্রমিছে দশ দিশি,
অনন্ত প্রশান্ত শূন্য তরঙ্গিয়া করিছে ফেনিল।

মোরা শুধু খড়কুটো স্রোতোমুখে চলিয়াছি ছুটি,
অর্ধ পলকের তরে কোথাও দাঁড়াতে নাহি ঠাঁই।
এই ডুবি, এই উঠি,
ঘুরে ঘুরে পড়ি লুটি—
এই যারা কাছে আসে এই তারা কাছাকাছি নাই।

সৃষ্টিস্রোত-কোলাহলে বিলাপ শুনিবে কে-বা কার!
আপন গর্জনে বিশ্ব আপনারে করেছে বধির।
শতকোটি হাহাকার
কলধ্বনি রচে তার—
পিছু ফিরে চাহিবার কাল নাই, চলেছে অধীর।

হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানবহৃদয়,
খসিয়া পড়িলি কোন্ নন্দনের তটতরু হতে?
যার লাগি সদা ভয়,
পরশ নাহিকো সয়,
কে তারে ভাসালে হেন জড়ময় সৃজনের স্রোতে?

তুমি কি শুনিছ বসি হে বিধাতা, হে অনাদি কবি,
ক্ষুদ্র এ মানবশিশু রচিতেছে প্রলাপজল্পনা?
সত্য আছে স্তব্ধ ছবি
যেমন উষার রবি,
নিম্নে তারি ভাঙে গড়ে মিথ্যা যত কুহককল্পনা।

গাজিপুর
১৩ বৈশাখ ১৮৮৮

প্রকৃতির প্রতি

শত শত প্রেমপাশে টানিয়া হৃদয়
একি খেলা তোর?
ক্ষুদ্র এ কোমল প্রাণ, ইহারে বাঁধিতে
কেন এত ডোর?
ঘুরে ফিরে পলে পলে
ভালোবাসা নিস ছলে,
ভালো না বাসিতে চাস
হায় মনচোর!

হৃদয় কোথায় তোর খুঁজিয়া বেড়াই
নিষ্ঠুরা প্রকৃতি!
এত ফুল, এত আলো, এত গন্ধ গান,
কোথায় পিরীতি!
আপন রূপের রাশে
আপনি লুকায়ে হাসে,
আমরা কাঁদিয়া মরি—
এ কেমন রীতি!

শূন্যক্ষেত্রে নিশিদিন আপনার মনে
কৌতুকের খেলা।
বুঝিতে পারি নে তোর কারে ভালোবাসা
কারে অবহেলা।
প্রভাতে যাহার 'পর
বড়ো স্নেহ সমাদর,
বিস্মৃত সে ধূলিতলে
সেই সন্ধ্যাবেলা।

তবু তোরে ভালোবাসি, পারি নে ভুলিতে
অয়ি মায়াবিনী!
স্নেহহীন আলিঙ্গন জাগায় হৃদয়ে
সহস্র রাগিণী।
এই সুখে দুঃখে শোকে
বেঁচে আছি দিবালোকে,
নাহি চাহি হিমশান্ত
অনন্ত যামিনী।

আধো-ঢাকা আধো-খোলা ওই তোর মুখ
রহস্যনিলয়,
প্রেমের বেদনা আনে হৃদয়ের মাঝে,
সঙ্গে আনে ভয়।
বুঝিতে পারি নে তব
কত ভাব নব নব,
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রাণ
পরিপূর্ণ হয়।

প্রাণ মন পসারিয়া ধাই তোর পানে,
নাহি দিস ধরা।
দেখা যায় মৃদু মধু কৌতুকের হাসি
অরুণ-অধরা!
যদি চাই দূরে যেতে
কত ফাঁদ থাক পেতে—
কত ছল, কত বল
চপলা-মুখরা!

আপনি নাহিকো জান আপনার সীমা,
রহস্য আপন।
তাই, অন্ধ রজনীতে যবে সপ্তলোক
নিদ্রায় মগন,

চুপি চুপি কৌতূহলে
দাঁড়াস আকাশতলে,
জ্বালাইয়া শতলক্ষ
নক্ষত্রকিরণ।

কোথাও বা বসে আছ চির-একাকিনী,
চির-মৌনব্রতা।
চারি দিকে সুকঠিন তৃণতরুহীন
মরুনির্জনতা।
রবি শশী শিরোপর
উঠে যুগ-যুগান্তর,
চেয়ে শুধু চলে যায়,
নাহি কয় কথা।

কোথাও বা খেলা কর বালিকার মতো,
উড়ে কেশ বেশ—
হাসিরাশি উচ্ছ্বসিত উৎসের মতন,
নাহি লজ্জালেশ।
রাখিতে পারে না প্রাণ
আপনার পরিমাণ,
এত কথা এত গান
নাহি তার শেষ।

কখনো বা হিংসাদীপ্ত উন্মাদ নয়ন
নিমেষনিহত
অনাথা ধরার বক্ষে অগ্নি-অভিশাপ
হানে অবিরত।
কখনো বা সন্ধ্যালোকে
উদাস উদার শোকে
মুখে পড়ে ম্লান ছায়া
করুণার মতো।

তবে তো করেছ বশ এমনি করিয়া
অসংখ্য পরান।
যুগ-যুগান্তর ধ'রে রয়েছে নূতন
মধুর বয়ান।
সাজি শত মায়াবাসে
আছ সকলেরই পাশে,
তবু আপনারে কারে
কর নাই দান।

যত অন্ত নাহি পাই তত জাগে মনে
মহা রূপরাশি।
তত বেড়ে যায় প্রেম যত পাই ব্যথা,
যত কাঁদি হাসি।
যত তুই দূরে যাস
তত প্রাণে লাগে ফাঁস,
যত তোরে নাহি বুঝি
তত ভালোবাসি।

১৫ বৈশাখ ১৮৮৮

মরণস্বপ্ন

কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ। প্রথম সন্ধ্যায়
ম্লান চাঁদ দেখা দিল গগনের কোণে।
ক্ষুদ্র নৌকা থরথরে চলিয়াছে পালভরে
কালস্রোতে যথা ভেসে যায়
অলস ভাবনাখানি আধোজাগা মনে।

এক পারে ভাঙা তীর ফেলিয়াছে ছায়া,
অন্য পারে ঢালু তট শুভ্র বালুকায়
মিশে যায় চন্দ্রালোকে— ভেদ নাহি পড়ে চোখে—
বৈশাখের গঙ্গা কৃশকায়া
তীরতলে ধীরগতি অলস লীলায়।

স্বদেশ পুরব হতে বায়ু বহে আসে
দূর স্বজনের যেন বিরহের শ্বাস।
জাগ্রত আঁখির আগে কখনো বা চাঁদ জাগে,
কখনো বা প্রিয়মুখ ভাসে—
আধেক উলস প্রাণ আধেক উদাস।

ঘনচ্ছায়া আম্রকুঞ্জ উত্তরের তীরে—
যেন তারা সত্য নহে, স্মৃতি-উপবন।
তীর, তরু, গৃহ, পথ, জ্যোৎস্নাপটে চিত্রবৎ—
পড়িয়াছে নীলাকাশনীরে
দূর মায়াজগতের ছায়ার মতন।

স্বপ্নাকুল আঁখি মুদি ভাবিতেছি মনে—
রাজহংস ভেসে যায় অপার আকাশে
দীর্ঘ শুভ্র পাখা খুলি চন্দ্রালোক-পানে তুলি,
পৃষ্ঠে আমি কোমল শয়নে;
সুখের মরণ-সম ঘুমঘোর আসে।

যেন রে প্রহর নাই, নাইকো প্রহরী,
এ যেন রে দিবাহারা অনন্ত নিশীথ।
নিখিল নির্জন স্তব্ধ, শুধু শুনি জলশব্দ
কলকল-কল্লোল-লহরী—
নিদ্রাপারাবার যেন স্বপ্নচঞ্চলিত।

কত যুগ চলে যায় নাহি পাই দিশা,
বিশ্ব নিবু-নিবু, যেন দীপ তৈলহীন।
গ্রাসিয়া আকাশকায়া ক্রমে পড়ে মহাছায়া,
নতশিরে বিশ্বব্যাপী নিশা
গণিতেছে মৃত্যু-পল এক দুই তিন।

চন্দ্র শীর্ণতর হয়ে লুপ্ত হয়ে যায়,
কলধ্বনি ক্ষীণ হয়ে মৌন হয়ে আসে।
প্রেত-নয়নের মতো নির্নিমেষ তারা যত
সবে মিলে মোর পানে চায়,
একা আমি জনপ্রাণী অখণ্ড আকাশে।

চির যুগরাত্রি ধরে শত কোটি তারা
পরে পরে নিবে গেল গগন-মাঝার।
প্রাণপণে চক্ষু চাহি আঁখিতে আলোক নাহি,
বিঁধিতে পারে না আঁখিতারা
তুষারকঠিন মৃত্যুহিম অন্ধকার।

অসাড় বিহঙ্গ-পাখা পড়িল ঝুলিয়া,
লুটায় সুদীর্ঘ গ্রীবা নামিল মরাল।
ধরিয়া অযুত অব্দ হু হু পতনের শব্দ
কর্ণরন্ধ্রে উঠে আকুলিয়া—
দ্বিধা হয়ে ভেঙে যায় নিশীথ করাল।

সহসা এ জীবনের সমুদয় স্মৃতি
ক্ষণেক জাগ্রত হয়ে নিমেষে চকিতে
আমারে ছাড়িয়া দূরে পড়ে গেল ভেঙেচুরে,
পিছে পিছে আমি ধাই নিতি—
একটি কণাও আর পাই না লখিতে।

কোথাও রাখিতে নারি দেহ আপনার,
সর্বাঙ্গ অবশ ক্লান্ত নিজ লৌহভারে।
কাতরে ডাকিতে চাহি, শ্বাস নাহি, স্বর নাহি,
কণ্ঠেতে চেপেছে অন্ধকার—
বিশ্বের প্রলয় একা আমার মাঝারে।

দীর্ঘ তীক্ষ্ণ হই ক্রমে তীব্র গতিবলে
ব্যগ্রগামী ঝটিকার আর্তস্বর-সম,
সূক্ষ্ম বাণ সূচিমুখ অনন্ত কালের বুক
বিদীর্ণ করিয়া যেন চলে—
রেখা হয়ে মিশে আসে দেহমন মম।

ক্রমে মিলাইয়া গেল সময়ের সীমা,
অনন্তে মুহূর্তে কিছু ভেদ নাহি আর।
ব্যাপ্তিহারা শূন্যসিন্ধু শুধু যেন এক বিন্দু
গাঢ়তম অন্তিম কালিমা—
আমারে গ্রাসিল সেই বিন্দুপারাবার।

অন্ধকারহীন হয়ে গেল অন্ধকার।
'আমি' ব'লে কেহ নাই, তবু যেন আছে।
অচৈতন্যতলে অন্ধ চৈতন্য হইল বন্ধ,
রহিল প্রতীক্ষা করি কার—
মৃত হয়ে প্রাণ যেন চিরকাল বাঁচে।

নয়ন মেলিনু, সেই বহিছে জাহ্নবী—
পশ্চিমে গৃহের মুখে চলেছে তরণী।
তীরে কুটীরের তলে স্তিমিত প্রদীপ জ্বলে,
শূন্যে চাঁদ সুধামুখচ্ছবি।
সুপ্ত জীব কোলে লয়ে জাগ্রত ধরণী।

১৭ বৈশাখ ১৮৮৮

কুহুধ্বনি

প্রখর মধ্যাহ্নতাপে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে
বাষ্পশিখা অনলশ্বসনা—
অন্বেষিয়া দশ দিশা যেন ধরণীর তৃষা
মেলিয়াছে লেলিহা রসনা।
ছায়া মেলি সারি সারি স্তব্ধ আছে তিন-চারি
সিসু গাছ পাণ্ডুকিশলয়,
নিম্ববৃক্ষ ঘনশাখা গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পে ঢাকা,
আম্রবন তাম্রফলময়।
গোলকচাঁপার ফুলে গন্ধের হিল্লোল তুলে,
বন হতে আসে বাতায়নে—
ঝাউ গাছ ছায়াহীন নিশ্বসিছে উদাসীন
শূন্যে চাহি আপনার মনে।

দূরান্ত প্রান্তর শূধূ তপনে করিছে ধূ ধূ,
বাঁকা পথ শুষ্ক তপ্তকায়া—
তারি প্রান্তে উপবন, মৃদুমন্দ সমীরণ,
ফুলগন্ধ, শ্যামস্নিগ্ধ ছায়া।
ছায়ায় কুটীরখানা দু ধারে বিছায়ে ডানা
পক্ষী-সম করিছে বিরাজ,
তারি তলে সবে মিলি চলিতেছে নিরিবিলি
সুখে দুঃখে দিবসের কাজ।
কোথা হতে নিদ্রাহীন রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ দিন
কোকিল গাহিছে কুহুস্বরে।
সেই পুরাতন তান প্রকৃতির মর্মগান
পশিতেছে মানবের ঘরে।

বসি আঙিনার কোণে গম ভাঙে দুই বোনে,
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি।
বাঁধা কূপ, তরুতল, বালিকা তুলিছে জল
খরতাপে ম্লান মুখখানি।
দূরে নদী, মাঝে চর; বসিয়া মাচার 'পর
শস্যখেত আগলিছে চাষী।
রাখালশিশুরা জুটে নাচে গায় খেলে ছুটে,
দূরে তরী চলিয়াছে ভাসি।
কত কাজ কত খেলা কত মানবের মেলা,
সুখ দুঃখ ভাবনা অশেষ—
তারি মাঝে কুহুস্বর একতান সকাতর
কোথা হতে লভিছে প্রবেশ।
নিখিল করিছে মগ্ন— জড়িত মিশ্রিত ভগ্ন
গীতহীন কলরব কত,
পড়িতেছে তারি 'পর পরিপূর্ণ সুধাস্বর
পরিস্ফুট পুষ্পটির মতো।
এত কাণ্ড, এত গোল, বিচিত্র এ কলরোল
সংসারের আবর্তবিভ্রমে—
তবু সেই চিরকাল অরণ্যের অন্তরাল
কুহুধ্বনি ধ্বনিছে পঞ্চমে।
যেন কে বসিয়া আছে বিশ্বের বক্ষের কাছে
যেন কোন্ সরলা সুন্দরী,
যেন সেই রূপবতী সংগীতের সরস্বতী
সম্মোহন-বীণা করে ধরি—
সুকুমার কর্ণে তার ব্যথা দেয় অনিবার
গণ্ডগোল দিবসে নিশীথে,
জটিল সে ঝঞ্ঝনায় বাঁধিয়া তুলিতে চায়
সৌন্দর্যের সরল সংগীতে।

তাই ওই চিরদিন ধ্বনিতেছে শ্রান্তিহীন
কুহুতান, করিছে কাতর—
সংগীতের ব্যথা বাজে, মিশিয়াছে তার মাঝে
করুণার অনুনয়স্বর।

কেহ ব'সে গৃহ-মাঝে, কেহ বা চলেছে কাজে,
কেহ শোনে, কেহ নাহি শোনে—
তবুও সে কী মায়ায় ওই ধ্বনি থেকে যায়
বিশ্বব্যাপী মানবের মনে।
তবু যুগ-যুগান্তর মানবজীবনস্তর
ওই গানে আর্দ্র হয়ে আসে,
কত কোটি কুহুতান মিশায়েছে নিজ প্রাণ
জীবের জীবন-ইতিহাসে।
সুখে দুঃখে উৎসবে গান উঠে কলরবে
বিরল গ্রামের মাঝখানে,
তারি সাথে সুধাস্বরে মিশে ভালোবাসাভরে
পাখি-গানে মানবের গানে।
কোজাগর পূর্ণিমায় শিশু শূন্যে হেসে চায়,
ঘিরে হাসে জনকজননী—
সুদূর বনান্ত হতে দক্ষিণ সমীর-স্রোতে
ভেসে আসে কুহুকুহু ধ্বনি।
প্রচ্ছায়তমসাতীরে শিশু কুশলব ফিরে,
সীতা হেরে বিষাদে হরিষে—
ঘন সহকারশাখে মাঝে মাঝে পিক ডাকে,
কুহুতানে করুণা বরিষে।
লতাকুঞ্জে তপোবনে বিজনে দুষ্মন্তসনে
শকুন্তলা লাজে থরথর,
তখনো সে কুহুভাষা রমণীর ভালোবাসা
করেছিল সুমধুরতর।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তাই অতীতের মাঝে ধাই
শুনিয়া আকুল কুহুরব—
বিশাল মানবপ্রাণ মোর মাঝে বর্তমান
দেশ কাল করি অভিভব।
অতীতের দুঃখ সুখ, দূরবাসী প্রিয়মুখ,
শৈশবের স্বপ্নশ্রুত গান,
ওই কুহুমন্ত্রবলে জাগিতেছে দলে দলে,
লভিতেছে নূতন পরান।

গাজিপুর
২২ বৈশাখ ১৮৮৮
সংশোধন :
শান্তিনিকেতন। ৫ কার্তিক ১৮৮৮

পত্র

বাসস্থান পরিবর্তন-উপলক্ষে

বন্ধুবর,

দক্ষিণে বেঁধেছি নীড়, চুকেছে লোকের ভিড়,
বকুনির বিড়বিড় গেছে থেমে-থুমে।
আপনারে করে জড়ো কোণে বসে আছি দড়ো,
আর সাধ নেই বড়ো আকাশকুসুমে।
সুখ নেই, আছে শান্তি, ঘুচেছে মনের ভ্রান্তি,
'বিমুখা বান্ধবা যান্তি' বুঝিয়াছি সার।
কাছে থেকে কাটে সুখে গল্প ও গুড়ুক ফুঁকে,
গেলে দক্ষিণের মুখে দেখা নেই আর।
কাজ কী এ মিছে নাট, তুলেছি দোকান-পাট,
গোলমাল চন্ডীপাঠ আছি ভাই ভুলি।
তবু কেন খিটিমিটি, মাঝে মাঝে কড়া চিঠি,
থেকে থেকে দু-চারিটি চোখা চোখা বুলি!
'পেটে খেলে পিঠে সয়' এই তো প্রবাদে কয়,
ভুলে যদি দেখা হয় তবু সয়ে থাকি।
হাত করে নিশপিশ, মাঝে রেখে পোস্টাপিস
ছাড় শুধু দশ-বিশ শব্দভেদী ফাঁকি।
বিষম উৎপাত এ কী! হায় নারদের ঢেঁকি!
শেষকালে এ যে দেখি ঝগড়ার মতো।
মেলা কথা হল জমা, এইখানে দিই comma,
আমার স্বভাব ক্ষমা, নির্বিবাদ ব্রত।
কেদারার 'পরে চাপি ভাবি শুধু ফিলজাফি,
নিতান্তই চুপিচাপি মাটির মানুষ।
লেখা তো লিখেছি ঢের, এখন পেয়েছি টের
সে কেবল কাগজের রঙিন ফানুস।
আঁধারের কূলে কূলে ক্ষীণশিখা মরে দুলে,
পথিকেরা মুখ তুলে চেয়ে দেখে তাই।
নকল নক্ষত্র হায় ধ্রুবতারা-পানে ধায়,
ফিরে আসে এ ধরায় একরত্তি ছাই।
সবারে সাজে না ভালো, হৃদয়ে স্বর্গের আলো
আছে যার, সেই জ্বালো আকাশের ভালে—
মাটির প্রদীপ যার নিভে-নিভে বার বার
সে দীপ জ্বলুক তার গৃহের আড়ালে!
যারা আছে কাছাকাছি তাহাদের নিয়ে আছি,
শুধু ভালোবেসে বাঁচি, বাঁচি যত কাল।
আশা কভু নাহি মেটে ভূতের বেগার খেটে,
কাগজে আঁচড় কেটে সকাল বিকাল।

কিছু নাহি করি দাওয়া, ছাতে বসে খাই হাওয়া,
যতটুকু পড়ে-পাওয়া ততটুকু ভালো—
যারা মোরে ভালোবাসে ঘুরে ফিরে কাছে আসে,
হাসিখুশি আশেপাশে নয়নের আলো।
বাহবা যে জন চায় বসে থাক্ চৌমাথায়,
নাচুক তৃণের প্রায় পথিকের স্রোতে—
পরের মুখের বুলি ভরুক ভিক্ষার ঝুলি,
নাই চাল নাই চুলি ধূলির পর্বতে।
বেড়ে যায় দীর্ঘ ছন্দ, লেখনী না হয় বন্ধ,
বক্তৃতার নামগন্ধ পেলে রক্ষে নেই।
ফেনা ঢোকে নাকে চোখে, প্রবল মিলের ঝোঁকে
ভেসে যাই একরোখে বুঝি দক্ষিণেই।
বাহিরেতে চেয়ে দেখি দেবতা-দুর্যোগ এ কী!
বসে বসে লিখিতে কি আর সরে মন!
আর্দ্র বায়ু বহে বেগে, গাছপালা ওঠে জেগে
ঘনঘোর স্নিগ্ধ মেঘে আঁধার গগন।
বেলা যায়, বৃষ্টি বাড়ে, বসি আলিসার আড়ে
ভিজে কাক ডাক ছাড়ে মনের অসুখে।
রাজপথ জনহীন, শুধু পান্থ দুই তিন
ছাতার ভিতরে লীন ধায় গৃহমুখে।
বৃষ্টি-ঘেরা চারি ধার, ঘনশ্যাম অন্ধকার,
ঝুপ ঝুপ শব্দ আর ঝরঝর পাতা।
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু গরজনে
মেঘদূত পড়ে মনে আষাঢ়ের গাথা।
পড়ে মনে বরিষার বৃন্দাবন-অভিসার,
একাকিনী রাধিকার চকিতচরণ—
শ্যামল তমালতল, নীল যমুনার জল,
আর দুটি ছলছল নলিননয়ন!
এ ভরা বাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়।
বিজন যমুনাকূলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরান বুলে বিরহব্যথায়।
দোহাই কল্পনা তোর, ছিন্ন কর্ মায়াডোর,
কবিতায় আর মোর নাই কোনো দাবি।
বিরহ, বকুল, আর বৃন্দাবন স্তূপাকার—
সেগুলো চাপাই কার স্কন্ধে তাই ভাবি।
এখন ঘরের ছেলে বাঁচি ঘরে ফিরে গেলে
দুদণ্ড সময় পেলে নাবার খাবার।
কলম হাঁকিয়ে ফেরা সকল রোগের সেরা,
তাই কবি-মানুষেরা অস্থিচর্মসার।
কলমের গোলামিটা আর নাহি লাগে মিঠা,
তার চেয়ে দুধ-ঘি'টা বহুগুণে শ্রেয়।

সাঙ্গ করি এইখানে— শেষে বলি কানে কানে,
পুরানো বন্ধুর পানে মুখ তুলে চেয়ো।

বৈশাখ ১৮৮৭

সিন্ধুতরঙ্গ

পুরী-তীর্থযাত্রী তরণীর নিমজ্জন উপলক্ষে

দোলে রে প্রলয় দোলে অকূল সমুদ্র-কোলে
উৎসব ভীষণ।
শত পক্ষ ঝাপটিয়া বেড়াইছে দাপটিয়া
দুর্দম পবন।
আকাশ সমুদ্র-সাথে প্রচণ্ড মিলনে মাতে,
অখিলের আঁখিপাতে আবরি তিমির।
বিদ্যুৎ চমকে ত্রাসি, হা হা করে ফেনরাশি,
তীক্ষ্ম শ্বেত রুদ্র হাসি জড়-প্রকৃতির।
চক্ষুহীন কর্ণহীন গেহহীন স্নেহহীন
মত্ত দৈত্যগণ
মরিতে ছুটেছে কোথা, ছিঁড়েছে বন্ধন।

হারাইয়া চারি ধার নীলাম্বুধি অন্ধকার
কল্লোলে, ক্রন্দনে,
রোষে ত্রাসে, ঊর্ধ্বশ্বাসে, অট্টরোলে, অট্টহাসে,
উন্মাদ গর্জনে,
ফাটিয়া ফুটিয়া উঠে, চূর্ণ হয়ে যায় টুটে—
খুঁজিয়া মরিছে ছুটে আপনার কূল—
যেন রে পৃথিবী ফেলি বাসুকি করিছে কেলি
সহস্রৈক ফণা মেলি, আছাড়ি লাঙ্গুল।
যেন রে তরল নিশি টলমলি দশ দিশি
উঠেছে নড়িয়া,
আপন নিদ্রার জাল ফেলিছে ছিঁড়িয়া।

নাই সুর, নাই ছন্দ, অর্থহীন নিরানন্দ
জড়ের নর্তন।
সহস্র জীবনে বেঁচে ওই কি উঠেছে নেচে
প্রকাণ্ড মরণ?
জল বাষ্প বজ্র বায়ু লভিয়াছে অন্ধ আয়ু,
নূতন জীবনস্নায়ু দানিছে হতাশে—
দিগ্বিদিক নাহি জানে, বাধাবিঘ্ন নাহি মানে,
ছুটেছে প্রলয়-পানে আপনারি ত্রাসে!

হেরো, মাঝখানে তারি আট শত নরনারী
বাহু বাঁধি বুকে,
প্রাণে আঁকড়িয়া প্রাণ চাহিয়া সম্মুখে।

তরণী ধরিয়া ঝাঁকে— রাক্ষসী ঝটিকা হাঁকে,
'দাও, দাও, দাও!'
সিন্ধু ফেনোচ্ছল ছলে কোটি ঊর্ধ্বকরে বলে,
'দাও, দাও, দাও!'
বিলম্ব দেখিয়া রোষে ফেনায়ে ফেনায়ে ফোঁসে
নীল মৃত্যু মহাক্রোশে শ্বেত হয়ে উঠে।
ক্ষুদ্র তরী গুরুভার সহিতে পারে না আর,
লৌহবক্ষ ওই তার যায় বুঝি টুটে।
অধ-ঊর্ধ্ব এক হয়ে ক্ষুদ্র এ খেলেনা লয়ে
খেলিবারে চায়।
দাঁড়াইয়া কর্ণধার তরীর মাথায়।

নরনারী কম্পমান ডাকিতেছে, ভগবান!
হায় ভগবান!
দয়া করো, দয়া করো— উঠিছে কাতর স্বর,
রাখো রাখো প্রাণ!
কোথা সেই পুরাতন রবি শশী তারাগণ
কোথা আপনার ধন ধরণীর কোল!
আজন্মের স্নেহসার কোথা সেই ঘরদ্বার
পিশাচী এ বিমাতার হিংস্র উতরোল!
যে দিকে ফিরিয়া চাই পরিচিত কিছু নাই,
নাই আপনার—
সহস্র করাল মুখ সহস্র আকার।

ফেটেছে তরণীতল, সবেগে উঠিছে জল,
সিন্ধু মেলে গ্রাস।
নাই তুমি, ভগবান, নাই দয়া, নাই প্রাণ—
জড়ের বিলাস।
ভয় দেখে ভয় পায়, শিশু কাঁদে উভরায়—
নিদারুণ 'হায় হায়' থামিল চকিতে।
নিমেষেই ফুরাইল, কখন জীবন ছিল
কখন জীবন গেল নারিল লখিতে।
যেন রে একই ঝড়ে নিবে গেল একত্তরে
শত দীপ-আলো,
চকিতে সহস্র গৃহে আনন্দ ফুরালো।

প্রাণহীন এ মত্ততা না জানে পরের ব্যথা,
না জানে আপন।

এর মাঝে কেন রয় ব্যথাভরা স্নেহময়
মানবের মন!
মা কেন রে এইখানে, শিশু চায় তার পানে,
ভাই সে ভায়ের টানে কেন পড়ে বুকে!
মধুর রবির করে কত ভালোবাসা-ভরে
কতদিন খেলা করে কত সুখে দুখে!
কেন করে টলমল দুটি ছোটো অশ্রুজল,
সকরুণ আশা!
দীপশিখা-সম কাঁপে ভীত ভালোবাসা।

এমন জড়ের কোলে কেমনে নির্ভয়ে দোলে
নিখিল মানব!
সব সুখ সব আশ কেন নাহি করে গ্রাস
মরণ দানব!
ওই যে জন্মের তরে জননী ঝাঁপায়ে পড়ে,
কেন বাঁধে বক্ষোপরে সন্তান আপন!
মরণের মুখে ধায়, সেথাও দিবে না তায়,
কাড়িয়া রাখিতে চায় হৃদয়ের ধন!
আকাশেতে পারাবারে দাঁড়ায়েছে এক ধারে,
এক ধারে নারী—
দুর্বল শিশুটি তার কে লইবে কাড়ি?

এ বল কোথায় পেলে! আপন কোলের ছেলে
এত ক'রে টানে!
এ নিষ্ঠুর জড়-স্রোতে প্রেম এল কোথা হতে
মানবের প্রাণে!
নৈরাশ্য কভু না জানে, বিপত্তি কিছু না মানে,
অপূর্ব অমৃত পানে অনন্ত নবীন—
এমন মায়ের প্রাণ যে বিশ্বের কোনোখান
তিলেক পেয়েছে স্থান, সে কি মাতৃহীন?
এ প্রলয়-মাঝখানে অবলা জননী-প্রাণে
স্নেহ মৃত্যুজয়ী—
এ স্নেহ জাগায়ে রাখে কোন্ স্নেহময়ী?

পাশাপাশি এক ঠাঁই দয়া আছে, দয়া নাই—
বিষম সংশয়।
মহা শঙ্কা মহা আশা একত্র বেঁধেছে বাসা,
একসাথে রয়।
কে বা সত্য, কে বা মিছে, নিশিদিন আকুলিছে,
কভু ঊর্ধ্বে কভু নিচে টানিছে হৃদয়।
জড় দৈত্য শক্তি হানে, মিনতি নাহিকো মানে—
প্রেম এসে কোলে টানে, দূর করে ভয়।

এ কি দুই দেবতার দ্যূত খেলা অনিবার
ভাঙাগড়াময়?
চিরদিন অন্তহীন জয়পরাজয়?

৪৯ পার্ক স্ট্রীট
আষাঢ় ১৮৮৭

শ্রাবণের পত্র

বন্ধু হে,
পরিপূর্ণ বরষায় আছি তব ভরসায়,
কাজকর্ম করো সায়, এসো চট্‌পট্‌!
শাম্‌লা আঁটিয়া নিত্য তুমি কর ডেপুটিত্ব
একা প'ড়ে মোর চিত্ত করে ছট্‌ফট্‌।
যখন যা সাজে, ভাই, তখন করিবে তাই—
কালাকাল মানা নাই কলির বিচার!
শ্রাবণে ডেপুটিপনা এ তো কভু নয় সনা-
তন প্রথা, এ যে অনা-সৃষ্টি অনাচার।
ছুটি লয়ে কোনোমতে পোর্ট্‌মান্টো তুলি রথে
সেজেগুজে রেলপথে করো অভিসার।
লয়ে দাড়ি লয়ে হাসি অবতীর্ণ হও আসি,
রুধিয়া জানালা শার্সি বসি একবার!
বজ্ররবে সচকিত কাঁপিবে গৃহের ভিত,
পথে শুনি কদাচিৎ চক্র খড়্‌খড়্‌।
হা রে রে ইংরাজ-রাজ, এ সাধে হানিলি বাজ—
শুধু কাজ, শুধু কাজ, শুধু ধড়্‌ফড়্‌।
আম্‌লা-শাম্‌লা-স্রোতে ভাসাইলি এ ভারতে
যেন নেই ত্রিজগতে হাসি গল্প গান—
নেই বাঁশি, নেই বঁধু, নেই রে যৌবন-মধু,
মুচেছে পথিকবধূ সজল নয়ান!
যেন রে শরম টুটে কদম্ব আর না ফুটে,
কেতকী শিহরি উঠে করে না আকুল—
কেবল জগৎটাকে জড়ায়ে সহস্র পাকে
গবর্মেন্টো পড়ে থাকে বিরাট বিপুল।
বিষম রাক্ষস ওটা, মেলিয়া আপিস-কোটা
গ্রাস করে গোটা গোটা বন্ধুবান্ধবেরে—
বৃহৎ বিদেশে দেশে কে কোথা তলায় শেষে
কোথাকার সর্বনেশে সার্ভিসের ফেরে।
এ দিকে বাদর ভরা, নবীন শ্যামল ধরা,
নিশিদিন জল-ঝরা সঘন গগন।
এ দিকে ঘরের কোণে বিরহিণী বাতায়নে,
দিগন্তে তমালবনে নয়ন মগন।

হেঁট মুণ্ড করি হেঁট মিছে কর agitate,
খালি রেখে খালি পেট ভরিছ কাগজ।
এদিকে যে গোরা মিলে কালা বন্ধু লুটে নিলে,
তার বেলা কী করিলে নাই কোনো খোঁজ।
দেখিছ না আঁখি খুলে ম্যাঞ্চেস্টর লিভারপুলে
দেশী শিল্প জলে গুলে করিল finish।
'আষাঢ়ে গল্প' সে কই! সেও বুঝি গেল ওই
আমাদের নিতান্তই দেশের জিনিস।
তুমি আছ কোথা গিয়া, আমি আছি শূন্যহিয়া,
কোথায় বা সে তাকিয়া শোকতাপহরা।
সে তাকিয়া—গল্পগীতি সাহিত্যচর্চার স্মৃতি
কত হাসি কত প্রীতি কত তুলো -ভরা!
কোথায় সে যদুপতি, কোথা মথুরার গতি,
অথ, চিন্তা করি ইতি কুরু মনস্থির—
মায়াময় এ জগৎ নহে সৎ নহে সৎ,
যেন পদ্মপত্রবৎ, তদুপরি নীর।
অতএব ত্বরা ক'রে উত্তর লিখিবে মোরে,
সর্বদা নিকটে ঘোরে কাল সে করাল—
(সুধী তুমি ত্যজি নীর গ্রহণ করিয়ো ক্ষীর)
এই তত্ত্ব এ চিঠির জানিয়ো moral।

বৈশাখ ১৮৮৭

নিষ্ফল প্রয়াস

ওই যে সৌন্দর্য লাগি পাগল ভুবন,
ফুটন্ত অধরপ্রান্তে হাসির বিলাস,
গভীরতিমিরমগ্ন আঁখির কিরণ,
লাবণ্যতরঙ্গভঙ্গ গতির উচ্ছ্বাস,
যৌবনললিতলতা বাহুর বন্ধন,
এরা তো তোমারে ঘিরে আছে অনুক্ষণ,
তুমি কি পেয়েছ নিজ সৌন্দর্য-আভাস?
মধুরাতে ফুলপাতে করিয়া শয়ন
বুঝিতে পার কি নিজ মধু-আলিংগন?
আপনার প্রস্ফুটিত তনুর উল্লাস
আপনারে করেছে কি মোহ-নিমগন?
তবে মোরা কী লাগিয়া করি হা-হুতাশ।
দেখো শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন:
রূপ নাহি ধরা দেয়—বৃথা সে প্রয়াস।

৪৯ পার্ক স্ট্রীট
১৮ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

হৃদয়ের ধন

কাছে যাই, ধরি হাত, বুকে লই টানি—
তাহার সৌন্দর্য লয়ে আনন্দে মাখিয়া
পূর্ণ করিবারে চাহি মোর দেহখানি,
আঁখিতলে বাহুপাশে কাড়িয়া রাখিয়া।
অধরের হাসি লব করিয়া চুম্বন,
নয়নের দৃষ্টি লব নয়নে আঁকিয়া,
কোমল পরশখানি করিয়া বসন
রাখিব দিবসনিশি সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া।

নাই, নাই, কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ—
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে—শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে?

১৮ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

নিভৃত আশ্রম

সন্ধ্যায় একেলা বসি বিজন ভবনে
অনুপম জ্যোতির্ময়ী মাধুরীমুরতি
স্থাপনা করিব যত্নে হৃদয়-আসনে।
প্রেমের প্রদীপ লয়ে করিব আরতি।
রাখিব দুয়ার রুধি আপনার মনে,
তাহার আলোকে র'ব আপন ছায়ায়—
পাছে কেহ কুতূহলে কৌতুকনয়নে
হৃদয়দুয়ারে এসে দেখে হেসে যায়।
ভ্রমর যেমন থাকে কমলশয়নে,
সৌরভসদনে, কারো পথ নাহি চায়,
পদশব্দ নাহি গণে, কথা নাহি শোনে,
তেমনি হইব মগ্ন পবিত্র মায়ায়।
লোকালয়-মাঝে থাকি র'ব তপোবনে,
একেলা থেকেও তবু র'ব সাথী-সনে।

১৮ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

নারীর উক্তি

মিছে তর্ক—থাক্ তবে থাক্।
কেন কাঁদি বুঝিতে পার না?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি? এই মুছিলাম আঁখি—
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা।

আমি কি চেয়েছি পায়ে ধরে
ওই তব আঁখি-তুলে চাওয়া—
ওই কথা, ওই হাসি, ওই কাছে-আসা-আসি,
অলক দুলায়ে দিয়ে হেসে চলে যাওয়া?

কেন আন বসন্তনিশীথে
আঁখিভরা আবেশ বিহ্বল—
যদি বসন্তের শেষে শ্রান্ত মনে ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল?

আছি যেন সোনার খাঁচায়
একখানি পোষ-মানা প্রাণ।
এও কি বুঝাতে হয় প্রেম যদি নাহি রয়
হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান?

মনে আছে সেই একদিন
প্রথম প্রণয় সে তখন।
বিমল শরৎকাল, শুভ্র ক্ষীণ মেঘজাল,
মৃদু শীতবায়ে স্নিগ্ধ রবির কিরণ।

কাননে ফুটিত শেফালিকা,
ফুলে ছেয়ে যেত তরুমূল।
পরিপূর্ণ সুরধুনী, কুলুকুলু ধ্বনি শুনি,
পরপারে বনশ্রেণী কুয়াশা-আকুল।

আমা-পানে চাহিয়ে তোমার
আঁখিতে কাঁপিত প্রাণখানি।
আনন্দে বিষাদে মেশা সেই নয়নের নেশা
তুমি তো জানো না তাহা, আমি তাহা জানি।

সে কি মনে পড়িবে তোমার—
সহস্র লোকের মাঝখানে
যেমনি দেখিতে মোরে কোন্ আকর্ষণ-ডোরে
আপনি আসিতে কাছে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে।

ক্ষণিক বিরহ-অবসানে
নিবিড় মিলন-ব্যাকুলতা
মাঝে মাঝে সব ফেলি রহিতে নয়ন মেলি,
আঁখিতে শুনিতে যেন হৃদয়ের কথা।

কোনো কথা না রহিলে তবু
শুধাইতে নিকটে আসিয়া।
নীরবে চরণ ফেলে চুপিচুপি কাছে এলে
কেমনে জানিতে পেতে, ফিরিতে হাসিয়া।

আজ তুমি দেখেও দেখ না,
সব কথা শুনিতে না পাও।
কাছে আস আশা ক'রে আছি সারা দিন ধ'রে,
আনমনে পাশ দিয়ে তুমি চলে যাও।

দীপ জেবলে দীর্ঘ ছায়া লয়ে
বসে আছি সন্ধ্যায় ক'জনা--
হয়তো বা কাছে এস, হয়তো বা দূরে বস,
সে সকলই ইচ্ছাহীন দৈবের ঘটনা।

এখন হয়েছে বহু কাজ,
সতত রয়েছ অন্যমনে।
সর্বত্র ছিলাম আমি-- এখন এসেছি নামি
হৃদয়ের প্রান্তদেশে, ক্ষুদ্র গৃহকোণে!

দিয়েছিলে হৃদয় যখন
পেয়েছিলে প্রাণ মন দেহ--
আজ সে হৃদয় নাই, যতই সোহাগ পাই
শুধু তাই অবিশ্বাস বিষাদ সন্দেহ।

জীবনের বসন্তে যাহারে
ভালোবেসেছিলে একদিন,
হায় হায় কী কুগ্রহ, আজ তারে অনুগ্রহ--
মিষ্ট কথা দিবে তারে গুটি দুই-তিন!

অপবিত্র ও করপরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।
মনে কি করেছ, বঁধু, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে, শুধু হাসি দিলে।

তুমিই তো দেখালে আমায়
(স্বপ্নেও ছিল না এত আশা)

প্রেমে দেয় কতখানি কোন্ হাসি কোন্ বাণী,
হৃদয় বাসিতে পারে কত ভালোবাসা।

তোমারি সে ভালোবাসা দিয়ে
বুঝেছি আজি এ ভালোবাসা—
আজি এই দৃষ্টি হাসি, এ আদর রাশি রাশি,
এই দূরে চলে যাওয়া, এই কাছে আসা।

বুক ফেটে কেন অশ্রু পড়ে
তবুও কি বুঝিতে পার' না?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি! এই মুছিলাম আঁখি—
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা।

২১ অগ্রহায়ণ ১৪৮৭

পুরুষের উক্তি

যেদিন সে প্রথম দেখিনু
সে তখন প্রথম যৌবন।
প্রথম জীবনপথে বাহিরিয়া এ জগতে
কেমনে বাঁধিয়া গেল নয়নে নয়ন।

তখন উষার আধো আলো
পড়েছিল মুখে দুজনার।
তখন কে জানে কারে, কে জানিত আপনারে
কে জানিত সংসারের বিচিত্র ব্যাপার!

কে জানিত শ্রান্তি তৃপ্তি ভয়,
কে জানিত নৈরাশ্যযাতনা!
কে জানিত শুধু ছায়া যৌবনের মোহমায়া,
আপনার হৃদয়ের সহস্র ছলনা!

আঁখি মেলি যারে ভালো লাগে
তাহারেই ভালো বলে জানি।
সব প্রেম প্রেম নয় ছিল না তো সে সংশয়,
যে আমারে কাছে টানে তারে কাছে টানি।

অনন্ত বাসরসুখ যেন
নিত্যহাসি প্রকৃতিবধূর—
পুষ্প যেন চিরপ্রাণ, পাখির অশ্রান্ত গান,
বিশ্ব করেছিল ভান অনন্ত মধুর।

সেই গানে, সেই ফুল্ল ফুলে,
সেই প্রাতে প্রথম যৌবনে,
ভেবেছিনু এ হৃদয় অনন্ত অমৃতময়,
প্রেম চিরদিন রয় এ চিরজীবনে।

তাই সেই আশার উল্লাসে
মুখ তুলে চেয়েছিনু মুখে।
সুধাপাত্র লয়ে হাতে কিরণকিরীট মাথে
তরুণ দেবতা-সম দাঁড়ানু সম্মুখে।

পত্রপুষ্প-গ্রহতারা-ভরা
নীলাম্বরে মগ্ন চরাচর,
তুমি তারি মাঝখানে কী মূর্তি আঁকিলে প্রাণে—
কী ললাট, কী নয়ন, কী শান্ত অধর!

সুগভীর কলধ্বনিময়
এ বিশ্বের রহস্য অকূল,
মাঝে তুমি শতদল ফুটেছিলে ঢলঢল—
তীরে আমি দাঁড়াইয়া সৌরভে আকুল।

পরিপূর্ণ পূর্ণিমার মাঝে
ঊর্ধ্বমুখে চকোর যেমন
আকাশের ধারে যায়, ছিঁড়িয়া দেখিতে চায়
অগাধ-স্বপন-ছাওয়া জ্যোৎস্না-আবরণ—

তেমনি সভয়ে প্রাণ মোর
তুলিতে যাইত কত বার
একান্ত নিকটে গিয়ে সমস্ত হৃদয় দিয়ে
মধুর রহস্যময় সৌন্দর্য তোমার।

হৃদয়ের কাছাকাছি সেই
প্রেমের প্রথম আনাগোনা,
সেই হাতে হাতে ঠেকা, সেই আধো চোখে-দেখা
চুপিচুপি প্রাণের প্রথম জানাশোনা!

অজানিত সকলি নূতন,
অবশ চরণ টলমল!
কোথা পথ কোথা নাই, কোথা যেতে কোথা যাই,
কোথা হতে উঠে হাসি কোথা অশ্রুজল!

অতৃপ্ত বাসনা প্রাণে লয়ে
অবারিত প্রেমের ভবনে

যাহা পাই তাই তুলি,   খেলাই আপনা ভুলি—
কী যে রাখি কী যে ফেলি বুঝিতে পারি নে।

ক্রমে আসে আনন্দ-আলস—
কুসুমিত ছায়াতরুতলে
জাগাই সরসীজল,   ছিঁড়ি বসে ফুলদল,
ধূলি সেও ভালো লাগে খেলাবার ছলে।

অবশেষে সন্ধ্যা হয়ে আসে,
শ্রান্তি আসে হৃদয় ব্যাপিয়া—
থেকে থেকে সন্ধ্যাবায়   করে ওঠে হায় হায়,
অরণ্য মর্মরি ওঠে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

মনে হয় এ কি সব ফাঁকি!
এই বুঝি, আর কিছু নাই!
অথবা যে রত্ন-তরে   এসেছিনু আশা ক'রে
অনেক লইতে গিয়ে হারাইনু তাই!

সুখের কাননতলে বসি
হৃদয়ের মাঝারে বেদনা—
নিরখি কোলের কাছে   মৃৎপিণ্ড পড়িয়া আছে,
দেবতারে ভেঙে ভেঙে করেছি খেলনা।

এরই মাঝে ক্লান্তি কেন আসে,
উঠিবারে করি প্রাণপণ!
হাসিতে আসে না হাসি,   বাজাতে বাজে না বাঁশি,
শরমে তুলিতে নারি নয়নে নয়ন।

কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে,
রহিলে না ধ্যান-ধারণার!
সেই মায়া-উপবন   কোথা হল অদর্শন,
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকালো পাথার!

স্বপ্নরাজ্য ছিল ও হৃদয়—
প্রবেশিয়া দেখিনু সেখানে
এই দিবা এই নিশা   এই ক্ষুধা এই তৃষা,
প্রাণপাখি কাঁদে এই বাসনার টানে!

আমি চাই তোমারে যেমন
তুমি চাও তেমনি আমারে—
কৃতার্থ হইব আশে   গেলেম তোমার পাশে,
তুমি এসে বসে আছ আমার দুয়ারে।

সৌন্দর্যসম্পদ-মাঝে বসি
কে জানিত কাঁদিছে বাসনা!
ভিক্ষা ভিক্ষা সব ঠাঁই— তবে আর কোথা যাই
ভিখারিনী হল যদি কমল-আসনা!

তাই আর পারি না সঁপিতে
সমস্ত এ বাহির অন্তর।
এ জগতে তোমা-ছাড়া ছিল না তোমার বাড়া,
তোমারে ছেড়েও আজ আছে চরাচর।

কখনো বা চাঁদের আলোতে
কখনো বসন্তসমীরণে
সেই ত্রিভুবনজয়ী অপাররহস্যময়ী
আনন্দমূরতিখানি জেগে ওঠে মনে।

কাছে যাই তেমনি হাসিয়া
নবীন যৌবনময় প্রাণে—
কেন হেরি অশ্রুজল হৃদয়ের হলাহল,
রূপ কেন রাহুগ্রস্ত মানে অভিমানে।

প্রাণ দিয়ে সেই দেবীপূজা
চেয়ো না চেয়ো না তবে আর।
এসো থাকি দুই জনে সুখে দুঃখে গৃহকোণে,
দেবতার তরে থাক্ পুষ্প-অর্ঘ্যভার।

পার্ক স্ট্রীট
২৩ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

শূন্য গৃহে

কে তুমি দিয়েছ স্নেহ মানবহৃদয়ে,
কে তুমি দিয়েছ প্রিয়জন!
বিরহের অন্ধকারে কে তুমি কাঁদাও তারে,
তুমিও কেন গো সাথে কর না ক্রন্দন!

প্রাণ যাহা চায় তাহা দাও বা না দাও,
তা বলে কি করুণা পাব না?
দুর্লভ ধনের তরে শিশু কাঁদে সকাতরে,
তা বলে কি জননীর বাজে না বেদনা?

দুর্বল মানব-হিয়া বিদীর্ণ যেথায়,
মর্মভেদী যন্ত্রণা বিষম,
জীবন নির্ভরহারা ধুলায় লুটায় সারা,
সেথাও কেন গো তব কঠিন নিয়ম!

সেথাও জগৎ তব চিরমৌনী কেন,
নাহি দেয় আশ্বাসের সুখ।
ছিন্ন করি অন্তরাল অসীম রহস্যজাল
কেন না প্রকাশ পায় গুপ্ত স্নেহমুখ!

ধরণী জননী কেন বলিয়া উঠে না
—করুণমর্মর কণ্ঠস্বর—
'আমি শুধু ধূলি নই, বৎস, আমি প্রাণময়ী
জননী, তোদের লাগি অন্তর কাতর!

'নহ তুমি পরিত্যক্ত অনাথ সন্তান
চরাচর নিখিলের মাঝে—
তোমার ব্যাকুল স্বর উঠিছে আকাশ-'পর,
তারায় তারায় তার ব্যথা গিয়ে বাজে।'

কাল ছিল প্রাণ জুড়ে, আজ কাছে নাই—
নিতান্ত সামান্য এ কি নাথ?
তোমার বিচিত্র ভবে কত আছে কত হবে—
কোথাও কি আছে প্রভু হেন বজ্রপাত?

আছে সেই সূর্যালোক, নাই সেই হাসি;
আছে চাঁদ, নাই চাঁদমুখ।
শূন্য পড়ে আছে গেহ, নাই কেহ, নাই কেহ—
রয়েছে জীবন, নেই জীবনের সুখ।

সেইটুকু মুখখানি, সেই দুটি হাত,
সেই হাসি অধরের ধারে,
সে নহিলে এ জগৎ শুষ্ক মরুভূমিবৎ—
নিতান্ত সামান্য এ কি এ বিশ্বব্যাপারে?

এ আর্তস্বরের কাছে রহিবে অটুট
চৌদিকের চিরনীরবতা?
সমস্ত মানবপ্রাণ বেদনায় কম্পমান,
নিয়মের লৌহবক্ষে বাজিবে না ব্যথা!

গাজিপুর
১১ বৈশাখ ১৮৮৮

জীবনমধ্যাহ্ন

জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে,
চলেছিনু আপনার বলে.
সুদীর্ঘ জীবনযাত্রা নবীন প্রভাতে
আরম্ভিনু খেলিবার ছলে।
অশ্রুতে ছিল না তাপ, হাস্যে উপহাস,
বচনে ছিল না বিষানল—
ভাবনাভ্রূকুটিহীন সরল ললাট
সুপ্রশান্ত আনন্দ-উজ্জ্বল।

কুটিল হইল পথ, জটিল জীবন,
বেড়ে গেল জীবনের ভার—
ধরণীর ধূলি-মাঝে গুরু আকর্ষণ,
পতন হইল কত বার।
আপনার 'পরে আর কিসের বিশ্বাস,
আপনার মাঝে আশা নাই—
দর্প চূর্ণ হয়ে গেছে, ধূলি-সাথে মিশে
লজ্জাবস্ত্র জীর্ণ শত ঠাঁই।

তাই আজ বার বার ধাই তব পানে,
ওহে তুমি নিখিলনির্ভর!
অনন্ত এ দেশকাল আচ্ছন্ন করিয়া
আছ তুমি আপনার 'পর।
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে পথে দেখিতেছি চেয়ে
তোমার এ ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ—
কোথায় এসেছি আমি, কোথায় যেতেছি,
কোন্ পথে চলেছে জগৎ!

প্রকৃতির শান্তি আজি করিতেছি পান
চিরস্রোত সান্ত্বনার ধারা—
নিশীথ-আকাশ-মাঝে নয়ন তুলিয়া
দেখিতেছি কোটি গ্রহতারা—
সুগভীর তামসীর ছিদ্রপথে যেন
জ্যোতির্ময় তোমার আভাস,
ওহে মহা-অন্ধকার, ওহে মহাজ্যোতি,
অপ্রকাশ, চির-স্বপ্রকাশ!

যখন জীবন-ভার ছিল লঘু অতি,
যখন ছিল না কোনো পাপ,
তখন তোমার পানে দেখি নাই চেয়ে,
জানি নাই তোমার প্রতাপ,

তোমার অগাধ শান্তি, রহস্য অপার,
সৌন্দর্য অসীম অতুলন।
স্তব্ধভাবে মুগ্ধনেত্রে নিবিড় বিস্ময়ে
দেখি নাই তোমার ভুবন।

কোমল সায়াহ্নলেখা বিষণ্ণ উদার
প্রান্তরের প্রান্ত-আম্রবনে,
বৈশাখের নীলধারা বিমলবাহিনী
ক্ষীণ গঙ্গা সৈকতশয়নে,
শিরোপরি সপ্ত ঋষি যুগ-যুগান্তের
ইতিহাসে নিবিষ্ট-নয়ান,
নিদ্রাহীন পূর্ণচন্দ্র নিস্তব্ধ নিশীথে
নিদ্রার সমুদ্রে ভাসমান—

নিত্যনিশ্বসিত বায়ু, উন্মেষিত উষা,
কনকে শ্যামল সম্মিলন,
দূর দূরান্তরশায়ী মধ্যাহ্ন উদাস,
বনচ্ছায়া নিবিড় গহন,
যতদূর নেত্র যায় শস্যশীর্ষরাশি
ধরার অঞ্চলতল ভরি—
জগতের মর্ম হতে মোর মর্মস্থলে
আনিতেছে জীবনলহরী।

বচন-অতীত ভাবে ভরিছে হৃদয়,
নয়নে উঠিছে অশ্রুজল,
বিরহবিষাদ মোর গলিয়া ঝরিয়া
ভিজায় বিশ্বের বক্ষস্থল।
প্রশান্ত গভীর এই প্রকৃতির মাঝে
আমার জীবন হয় হারা,
মিশে যায় মহাপ্রাণসাগরের বুকে
ধূলিম্লান পাপতাপধারা।

শুধু জেগে উঠে প্রেম মঙ্গল মধুর,
বেড়ে যায় জীবনের গতি,
ধূলিধৌত দুঃখশোক শুভ্রশান্ত বেশে
ধরে যেন আনন্দমুরতি।
বন্ধন হারায়ে গিয়ে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয়
অবারিত জগতের মাঝে,
বিশ্বের নিশ্বাস লাগি জীবনকুহরে
মঙ্গল-আনন্দধ্বনি বাজে।

১৪ বৈশাখ ১৮৮৮

শ্রান্তি

কত বার মনে করি পূর্ণিমানিশীথে
স্নিগ্ধ সমীরণ,
নিদ্রালস আঁখি-সম ধীরে যদি মুদে আসে
এ শ্রান্ত জীবন।
গগনের অনিমেষ জাগ্রত চাঁদের পানে
মুক্ত দুটি বাতায়নদ্বার—
সুদূরে প্রহর বাজে, গঙ্গা কোথা বহে চলে,
নিদ্রায় সুষুপ্ত দুই পার।
মাঝি গান গেয়ে যায় বৃন্দাবন-গাথা
আপনার মনে,
চিরজীবনের স্মৃতি অশ্রু হয়ে গলে আসে
নয়নের কোণে।
স্বপ্নের সুধীর স্রোতে দূরে ভেসে যায় প্রাণ
স্বপ্ন হতে নিঃস্বপ্ন অতলে,
ভাসানো প্রদীপ যথা নিবে গিয়ে সন্ধ্যাবায়ে
ডুবে যায় জাহ্নবীর জলে।

১৬ বৈশাখ ১৮৮৮

বিচ্ছেদ

ব্যাকুল নয়ন মোর, অস্তমান রবি,
সায়াহ্ন মেঘাবনত পশ্চিম গগনে,
সকলে দেখিতেছিল সেই মুখচ্ছবি—
একা সে চলিতেছিল আপনার মনে।

ধরণী ধরিতেছিল কোমল চরণ,
বাতাস লভিতেছিল বিমল নিশ্বাস,
সন্ধ্যার-আলোক-আঁকা দুখানি নয়ন
ভুলায়ে লইতেছিল পশ্চিম আকাশ।

রবি তারে দিতেছিল আপন কিরণ,
মেঘ তারে দিতেছিল স্বর্ণময় ছায়া,
মুগ্ধহিয়া পথিকের উৎসুক নয়ন
মুখে তার দিতেছিল প্রেমপূর্ণ মায়া।

চারি দিকে শস্যরাশি চিত্র-সম স্থির,
প্রান্তে নীল নদীরেখা, দূর পরপারে

শুভ্র চর, আরো দূরে বনের তিমির
দহিতেছে অগ্নিদীপ্তি দিগন্ত-মাঝারে।

দিবসের শেষ দৃষ্টি— অন্তিম মহিমা—
সহসা ঘেরিল তারে কনক-আলোকে,
বিষণ্ণ কিরণপটে মোহিনী প্রতিমা
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে অনিমেষ চোখে।

নিমেষে ঘুরিল ধরা, ডুবিল তপন,
সহসা সম্মুখে এল ঘোর অন্তরাল—
নয়নের দৃষ্টি গেল, রহিল স্বপন,
অনন্ত আকাশ, আর ধরণী বিশাল।

১৯ বৈশাখ ১৮৮৮

মানসিক অভিসার

মনে হয় সেও যেন রয়েছে বসিয়া
চাহি বাতায়ন হতে নয়ন উদাস—
কপোলে, কানের কাছে, যায় নিশ্বসিয়া
কে জানে কাহার কথা বিষণ্ণ বাতাস।

ত্যজি তার তনুখানি কোমল হৃদয়
বাহির হয়েছে যেন দীর্ঘ অভিসারে,
সম্মুখে অপার ধরা কঠিন নিদয়—
একাকিনী দাঁড়ায়েছে তাহারি মাঝারে।

হয়তো বা এখনি সে এসেছে হেথায়,
মৃদুপদে পশিতেছে এই বাতায়নে,
মানসমুরতিখানি আকুল আমায়
বাঁধিতেছে দেহহীন স্বপ্ন-আলিঙ্গনে।

তারি ভালোবাসা, তারি বাহু সুকোমল,
উৎকণ্ঠ চকোর-সম বিরহতিয়াষ,
বহিয়া আনিছে এই পুষ্পপরিমল—
কাঁদায়ে তুলিছে এই বসন্তবাতাস।

২১ বৈশাখ ১৮৮৮

পত্রের প্রত্যাশা

চিঠি কই! দিন গেল! বইগুলো ছুঁড়ে ফেলো,
আর তো লাগে না ভালো ছাইপাঁশ পড়া।
মিটায়ে মনের খেদ গেঁথে গেছে অবিচ্ছেদ,
পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদ মিছে মন-গড়া।
কাননপ্রান্তের কাছে ছায়া পড়ে গাছে গাছে,
ম্লান আলো শুয়ে আছে বালুকার তীরে।
বায়ু উঠে ঢেউ তুলি, টলমল পড়ে দুলি
কূলে বাঁধা নৌকাগুলি জাহ্নবীর নীরে।

চিঠি কই! হেথা এসে একা বসে দূর দেশে
কী পড়িব দিনশেষে সন্ধ্যার আলোকে!
গোধূলির ছায়াতলে কে বলে গো মায়াবলে
সেই মুখ অশ্রুজলে এঁকে দেবে চোখে!
গভীর গুঞ্জনস্বনে ঝিল্লিরব উঠে বনে,
কে মিশাবে তারি সনে স্মৃতিকণ্ঠস্বর!
তীরতরু-ছায়ে-ছায়ে কোমল সন্ধ্যার বায়ে
কে আনিয়া দিবে গায়ে সুকোমল কর!

পাখি তরুশিরে আসে, দূর হতে নীড়ে আসে
তরীগুলি তীরে আসে, ফিরে আসে সবে
তার সেই স্নেহস্বর ভেদি দূর দূরান্তর
কেন এ কোলের 'পর আসে না নীরবে!
দিনান্তে স্নেহের স্মৃতি একবার আসে নিতি
কলরব-ভরা প্রীতি লয়ে তার মুখে—
দিবসের ভার যত তবে হয় অপগত,
নিশি নিমেষের মতো কাটে স্বপ্নসুখে।

সকলই তো মনে আছে যত দিন ছিল কাছে
কত কথা বলিয়াছে কত ভালোবেসে—
কত কথা শুনি নাই, হৃদয়ে পায় নি ঠাঁই,
মুহূর্তে শুনিয়া তাই ভুলেছি নিমেষে।
পাতা পোরাবার ছলে আজ সে যা-কিছু বলে,
তাই শুনে মন গলে, চোখে আসে জল—
তারি লাগি কত ব্যথা কত মনোব্যাকুলতা,
দু-চারিটি তুচ্ছ কথা জীবনসম্বল!

দিবা যেন আলোহীনা এই দুটি কথা বিনা
'তুমি ভালো আছ কি না' 'আমি ভালো আছি'
স্নেহ যেন নাম ডেকে কাছে এসে যায় দেখে,
দুটি কথা দূর থেকে করে কাছাকাছি।

দরশ পরশ যত সকল বন্ধন গত,
মাঝে ব্যবধান কত নদীগিরিপারে—
স্মৃতি শুধু স্নেহ বয়ে দুহু করস্পর্শ লয়ে
অক্ষরের মালা হয়ে বাঁধে দুজনারে।

কই চিঠি! এল নিশা, তিমিরে ডুবিল দিশা,
সারা দিবসের তৃষা রয়ে গেল মনে—
অন্ধকার নদীতীরে বেড়াতেছি ফিরে ফিরে,
প্রকৃতির শান্তি ধীরে পশিছে জীবনে।
ক্রমে আঁখি ছলছল, দুটি ফোঁটা অশ্রুজল
ভিজায় কপোলতল, শুকায় বাতাসে—
ক্রমে অশ্রু নাহি বয়, ললাট শীতল হয়
রজনীর শান্তিময় শীতল নিশ্বাসে।

আকাশে অসংখ্য তারা চিন্তাহারা ক্লান্তিহারা,
হৃদয় বিস্ময়ে সারা হেরি একদিঠি—
আর যে আসে না আসে মুক্ত এই মহাকাশে
প্রতি সন্ধ্যা পরকাশে অসীমের চিঠি।
অনন্ত বারতা বহে— অন্ধকার হতে কহে,
'যে রহে যে নাহি রহে কেহ নহে একা—
সীমাপরপারে থাকি সেথা হতে সবে ডাকি
প্রতি রাত্রে লিখে রাখি জ্যোতিপত্রলেখা।'

২৩ বৈশাখ ১৮৮৮

বধূ

'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল্!'—
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল!
কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশথতল!
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে 'জলকে চল্'।

কলসী লয়ে কাঁখে— পথ সে বাঁকা,
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধু ধু,
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দিঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দুধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।

গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে,
পিক কুহরে তীরে অমিয়-মাখা।
পথে আসিতে ফিরে, আঁধার তরুশিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা।

অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি,
সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি।
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল,
করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি।
প্রাচীর বেয়ে বেয়ে সবুজে ফেলে ছেয়ে
বেগুনি-ফুলে-ভরা লতিকা দুটি।
ফাটলে দিয়ে আঁখি আড়ালে বসে থাকি,
আঁচল পদতলে পড়েছে লুটি।

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এ ধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁষে।
বাঁধের জলরেখা ঝলসে, যায় দেখা,
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।
চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি,
কে জানে কত শত নূতন দেশে।

হায় রে রাজধানী পাষাণকায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে
ব্যাকুল বালিকারে, নাহিকো মায়া।
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথঘাট,
পাখির গান কই, বনের ছায়া!

কে যেন চারি দিকে দাঁড়িয়ে আছে,
খুলিতে নারি মন, শুনিবে পাছে!
হেথায় বৃথা কাঁদা, দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন-কাছে।

আমার আঁখিজল কেহ না বোঝে,
অবাক্ হয়ে সবে কারণ খোঁজে।
'কিছুতে নাহি তোষ, এ তো বিষম দোষ
গ্রাম্য বালিকার স্বভাব ও যে!
স্বজন প্রতিবেশী এত যে মেশামেশি,
ও কেন কোণে বসে নয়ন বোজে?'

কেহ বা দেখে মুখ, কেহ বা দেহ—
কেহ বা ভালো বলে, বলে না কেহ।
ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি,
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন করে কাটে সারাটা বেলা!
ইঁটের 'পরে ইঁট, মাঝে মানুষ-কীট—
নাইকো ভালোবাসা, নাইকো খেলা।

কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো!
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁ গো!
উঠিলে নব শশী ছাদের 'পরে বসি
আর কি উপকথা বলিবি না গো!
হৃদয়বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি মা আঁখিজলে রজনী জাগো!
কুসুম তুলি লয়ে প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো।

হেথাও উঠে চাঁদ ছাদের পারে,
প্রবেশ মাগে আলো ঘরের দ্বারে।
আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছে দেশে দেশে,
যেন সে ভালোবেসে চাহে আমারে।

নিমেষ তরে তাই আপনা ভুলি
ব্যাকুল ছুটে যাই দুয়ার খুলি।
অমনি চারি ধারে নয়ন উঁকি মারে,
শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি।

দেবে না ভালোবাসা, দেবে না আলো।
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দিঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।

ডাক্ লো ডাক্ তোরা, বল্ লো বল্—
'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল্!'
কবে পড়িবে বেলা, ফুরাবে সব খেলা,
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল,
জানিস যদি কেহ আমায় বল্।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮
সংশোধন-পরিবর্ধন :
শান্তিনিকেতন। ৭ কার্তিক

ব্যক্ত প্রেম

কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ-আবরণ?
হৃদয়ের দ্বার হেনে বাহিরে আনিলে টেনে,
শেষে কি পথের মাঝে করিবে বর্জন?

আপন অন্তরে আমি ছিলাম আপনি—
সংসারের শত কাজে ছিলাম সবার মাঝে,
সকলে যেমন ছিল আমিও তেমনি।

তুলিতে পূজার ফুল যেতেম যখন
সেই পথ ছায়া-করা, সেই বেড়া লতা-ভরা,
সেই সরসীর তীরে করবীর বন—

সেই কুহরিত পিক শিরীষের ডালে,
প্রভাতে সখীর মেলা, কত হাসি কত খেলা—
কে জানিত কী ছিল এ প্রাণের আড়ালে!

বসন্তে উঠিত ফুটে বনে বেলফুল,
কেহ বা পরিত মালা, কেহ বা ভরিত ডালা,
করিত দক্ষিণবায়ু অঞ্চল আকুল।

বরষার ঘনঘটা, বিজুলি খেলায়—
প্রান্তরের প্রান্তদিশে মেঘে বনে যেত মিশে,
জুঁইগুলি বিকশিত বিকেল বেলায়।

বর্ষ আসে বর্ষ যায়, গৃহকাজ করি—
সুখদুঃখভাগ লয়ে প্রতিদিন যায় বয়ে,
গোপন স্বপন লয়ে কাটে বিভাবরী।

লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত!
আঁধার হৃদয়তলে মানিকের মতো জ্বলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো।

ভাঙিয়া দেখিলে ছি ছি নারীর হৃদয়!
লাজে ভয়ে থরথর ভালোবাসা-সকাতর
তার লুকাবার ঠাঁই কাড়িলে নিদয়!

আজিও তো সেই আসে বসন্ত শরৎ।
বাঁকা সেই চাঁপা-শাখে সোনা-ফুল ফুটে থাকে,
সেই তারা তোলে এসে—সেই ছায়াপথ!

সবাই যেমন ছিল, আছে অবিকল—
সেই তারা কাঁদে হাসে, কাজ করে, ভালোবাসে,
করে পূজা, জ্বালে দীপ, তুলে আনে জল।

কেহ উঁকি মারে নাই তাহাদের প্রাণে—
ভাঙিয়া দেখে নি কেহ হৃদয় গোপন গেহ,
আপন মরম তারা আপনি না জানে।

আমি আজ ছিন্ন ফুল রাজপথে পড়ি,
পল্লবের সুচিকন ছায়াস্নিগ্ধ আবরণ
তেয়াগি ধুলায় হায় যাই গড়াগড়ি।

নিতান্ত ব্যথার ব্যথী ভালোবাসা দিয়ে
সযতনে চিরকাল রচি দিবে অন্তরাল,
নগ্ন করেছিনু প্রাণ সেই আশা নিয়ে।

মুখ ফিরাতেছ সখা আজ কী বলিয়া!
ভুল করে এসেছিলে? ভুলে ভালোবেসেছিলে?
ভুল ভেঙে গেছে তাই যেতেছ চলিয়া?

তুমি তো ফিরিয়া যাবে আজ বই কাল—
আমার যে ফিরিবার পথ রাখ নাই আর,
ধূলিসাৎ করেছ যে প্রাণের আড়াল।

এ কি নিদারুণ ভুল! নিখিলনিলয়ে
এত শত প্রাণ ফেলে ভুল করে কেন এলে
অভাগিনী রমণীর গোপন হৃদয়ে!

ভেবে দেখো আনিয়াছ মোরে কোন্‌খানে—
শত লক্ষ আঁখিভরা কৌতুককঠিন ধরা
চেয়ে রবে অনাবৃত কলঙ্কের পানে!

ভালোবাসা তাও যদি ফিরে নেবে শেষে,
কেন লজ্জা কেড়ে নিলে, একাকিনী ছেড়ে দিলে
বিশাল ভবের মাঝে বিবসনাবেশে!

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

পরিবর্ধন : শান্তিনিকেতন। ৭ কার্তিক

গুপ্ত প্রেম

তবে পরানে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কী দিয়ে!

মনে গোপনে থাকে প্রেম, যায় না দেখা,
কুসুম দেয় তাই দেবতায়।
দাঁড়ায়ে থাকি দ্বারে, চাহিয়া দেখি তারে
কী ব'লে আপনারে দিব তায়!

ভালো বাসিলে ভালো যারে দেখিতে হয়
সে যেন পারে ভালো বাসিতে।
মধুর হাসি তার দিক সে উপহার
মাধুরী ফুটে যার হাসিতে!

যার নবনীসুকুমার কপোলতল
কী শোভা পায় প্রেমলাজে গো!
যাহার ঢলঢল নয়নশতদল
তারেই আঁখিজল সাজে গো!

তাই লুকায়ে থাকি সদা পাছে সে দেখে,
ভালোবাসিতে মরি শরমে।
রুধিয়া মনোদ্বার প্রেমের কারাগার
রচেছি আপনার মরমে।

আহা এ তনু-আবরণ শ্রীহীন ম্লান
ঝরিয়া পড়ে যদি শুকায়ে,
হৃদয়-মাঝে মম দেবতা মনোরম
মাধুরী নিরুপম লুকায়ে।

যত গোপনে ভালোবাসি পরান ভরি
পরান ভরি উঠে শোভাতে—
যেমন কালো মেঘে অরুণ-আলো লেগে
মাধুরী উঠে জেগে প্রভাতে।

আমি সে শোভা কাহারে তো দেখাতে নারি,
এ পোড়া দেহ সবে দেখে যায়—
প্রেম যে চুপে চুপে ফুটিতে চাহে রূপে,
মনেরই অন্ধকূপে থেকে যায়।

দেখো বনের ভালোবাসা আঁধারে বসি
কুসুমে আপনারে বিকাশে,
তারকা নিজ হিয়া তুলিছে উজলিয়া
আপন আলো দিয়া লিখা সে।

ভবে প্রেমের আঁখি প্রেম কাড়িতে চাহে,
মোহন রূপ তাই ধরিছে।
আমি যে আপনায় ফুটাতে পারি নাই,
পরান কেঁদে তাই মরিছে।

আমি আপন মধুরতা আপনি জানি
পরানে আছে যাহা জাগিয়া,
তাহারে লয়ে সেথা দেখাতে পারিলে তা
যেত এ ব্যাকুলতা ভাগিয়া।

আমি রূপসী নহি, তবু আমারো মনে
প্রেমের রূপ সে তো সমধুর।
ধন সে যতনের শয়ন-স্বপনের,
করে সে জীবনের তমোদূর।

আমি আমার অপমান সহিতে পারি,
প্রেমের সহে না তো অপমান।
অমরাবতী ত্যেজে হৃদয়ে এসেছে যে,
তাহারো চেয়ে সে যে মহীয়ান।

পাছে কুরূপ কভু তারে দেখিতে হয়
কুরূপ দেহ-মাঝে উদিয়া,
প্রাণের এক ধারে দেহের পরপারে
তাই তো রাখি তারে রুধিয়া।

তাই আঁখিতে প্রকাশিতে চাহি নে তারে,
নীরবে থাকে তাই রসনা।
মুখে সে চাহে যত নয়ন করি নত,
গোপনে মরে কত বাসনা।

তাই যদি সে কাছে আসে পালাই দূরে,
আপন মনোআশা দলে যাই,
পাছে সে মোরে দেখে থমকি বলে 'এ কে!'
দুহাতে মুখ ঢেকে চলে যাই।

পাছে নয়নে বচনে সে বুঝিতে পারে
আমার জীবনের কাহিনী—

পাছে সে মনে ভাবে, 'এও কি প্রেম জানে!
আমি তো এর পানে চাহি নি!'

তবে পরানে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কী দিয়ে?

১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

অপেক্ষা

সকল বেলা কাটিয়া গেল
বিকাল নাহি যায়।
দিনের শেষে শ্রান্তছবি
কিছুতে যেতে চায় না রবি,
চাহিয়া থাকে ধরণী-পানে,
বিদায় নাহি চায়।

মেঘেতে দিন জড়ায়ে থাকে,
মিলায়ে থাকে মাঠে—
পড়িয়া থাকে তরুর শিরে,
কাঁপিতে থাকে নদীর নীরে,
দাঁড়ায়ে থাকে দীর্ঘ ছায়া
মেলিয়া ঘাটে বাটে।

এখনো ঘুঘু ডাকিছে ডালে
করুণ একতানে।
অলস দুখে দীর্ঘ দিন
ছিল সে বসে মিলনহীন,
এখনো তার বিরহগাথা
বিরাম নাহি মানে।

বধূরা দেখো আইল ঘাটে,
এল না ছায়া তবু।
কলস-ঘায়ে ঊর্মি টুটে,
রশ্মিরাশি চূর্ণি উঠে,
শ্রান্ত বায়ু প্রান্তনীর
চুম্বি যায় কভু।

দিবসশেষে বাহিরে এসে
সেও কি এতক্ষণে
নীলাম্বরে অঙ্গ ঘিরে
নেমেছে সেই নিভৃত নীরে,
প্রাচীরে-ঘেরা ছায়াতে-ঢাকা
বিজন ফুলবনে!

স্নিগ্ধ জল মুগ্ধভাবে
ধরেছে তনুখানি।
মধুর দুটি বাহুর ঘায়
অগাধ জল টুটিয়া যায়,
গ্রীবার কাছে নাচিয়া উঠি
করিছে কানাকানি।

কপোলে তার কিরণ প'ড়ে
তুলেছে রাঙা করি।
মুখের ছায়া পড়িয়া জলে
নিজেরে যেন খুঁজিছে ছলে,
জলের 'পরে ছড়ায়ে পড়ে
আঁচল খসি পড়ি।

জলের 'পরে এলায়ে দিয়ে
আপন রূপখানি,
শরমহীন আরামসুখে
হাসিটি ভাসে মধুর মুখে,
বনের ছায়া ধরার চোখে
দিয়েছে পাতা টানি।

সলিলতলে সোপান-'পরে
উদাস বেশবাস।
আধেক কায়া আধেক ছায়া
জলের 'পরে রচিছে মায়া,
দেহেরে যেন দেহের ছায়া
করিছে পরিহাস।

আম্রবন মুকুলে ভরা
গন্ধ দেয় তীরে!
গোপন শাখে বিরহী পাখি
আপন মনে উঠিছে ডাকি,
বিবশ হয়ে বকুল ফুল
খসিয়া পড়ে নীরে।

দিবস ক্রমে মুদিয়া আসে,
মিলায়ে আসে আলো।
নিবিড় ঘন বনের রেখা
আকাশশেষে যেতেছে দেখা,
নিদ্রালস আঁখির 'পরে
ভুরুর মতো কালো।

বুঝি বা তীরে উঠিয়াছে সে
জলের কোল ছেড়ে।
ত্বরিত পদে চলেছে গেহে,
সিক্ত বাস লিপ্ত দেহে—
যৌবনলাবণ্য যেন
লইতে চাহে কেড়ে।

মাজিয়া তনু যতন ক'রে
পরিবে নব বাস।
কাঁচল পরি আঁচল টানি
আঁটিয়া লয়ে কাঁকনখানি
নিপুণ করে রচিয়া বেণী
বাঁধিবে কেশপাশ।

উরসে পরি যূথীর হার
বসনে মাথা ঢাকি
বনের পথে নদীর তীরে
অন্ধকারে বেড়াবে ধীরে
গন্ধটুকু সন্ধ্যাবায়ে
রেখার মতো রাখি।

বাজিবে তার চরণধ্বনি
বুকের শিরে শিরে।
কখন, কাছে না আসিতে সে
পরশ যেন লাগিবে এসে,
যেমন করে দখিন বায়ু
জাগায় ধরণীরে।

যেমনি কাছে দাঁড়াব গিয়ে
আর কি হবে কথা?
ক্ষণেক শুধু অবশ কায়
থমকি রবে ছবির প্রায়,
মুখের পানে চাহিয়া শুধু
সুখের আকুলতা।

দোঁহার মাঝে ঘুচিয়া যাবে
আলোর ব্যবধান।
আঁধারতলে গুপ্ত হয়ে
বিশ্ব যাবে লুপ্ত হয়ে,
আসিবে মুদে লক্ষকোটি
জাগ্রত নয়ান।

অন্ধকারে নিকট করে,
আলোতে করে দূর।
যেমন দুটি ব্যথিত প্রাণে
দুঃখনিশি নিকটে টানে,
সুখের প্রাতে যাহারা রহে
আপনা-ভরপুর।

আঁধারে যেন দুজনে আর
দুজন নাহি থাকে।
হৃদয়-মাঝে যতটা চাই
ততটা যেন পুরিয়া পাই,
প্রলয়ে যেন সকল যায়—
হৃদয় বাকি রাখে।

হৃদয় দেহ আঁধারে যেন
হয়েছে একাকার।
মরণ যেন অকালে আসি
দিয়েছে সব বাঁধন নাশি,
ত্বরিতে যেন গিয়েছি দোঁহে
জগৎ-পরপার।

দুদিক হতে দুজনে যেন
বহিয়া খরধারে
আসিতেছিল দোঁহার পানে
ব্যাকুলগতি ব্যগ্রপ্রাণে,
সহসা এসে মিশিয়া গেল
নিশীথপারাবারে।

থামিয়া গেল অধীর স্রোত,
থামিল কলতান—
মৌন এক মিলনরাশি
তিমিরে সব ফেলিল গ্রাসি,
প্রলয়তলে দোঁহার মাঝে
দোঁহার অবসান।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

দুরন্ত আশা

মর্মে যবে মত্ত আশা
সর্পসম ফোঁসে,
অদৃষ্টের বন্ধনেতে
দাপিয়া বৃথা রোষে,
তখনো ভালো-মানুষ সেজে
বাঁধানো হুঁকা যতনে মেজে
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে
খেলিতে হবে কষে!
অন্নপায়ী বঙ্গবাসী
স্তন্যপায়ী জীব
জন-দশেকে জটলা করি
তক্তপোশে ব'সে।

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো,
পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে
শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি
মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্টগতি—
গৃহের প্রতি টান।
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু
নিদ্রারসে ভরা,
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো
বাঙালি সন্তান।

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন!
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবন-স্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশিদিন।
বর্শা হাতে, ভরসা প্রাণে,
সদাই নিরুদ্দেশ,
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল-বাধা-হীন।

বিপদ-মাঝে ঝাঁপায়ে প'ড়ে
শোণিত উঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে
জীবন জেগে উঠে—
অন্ধকারে সূর্যালোতে
সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে
মত্ত হাসি টুটে।
বিশ্ব-মাঝে মহান যাহা
সঙ্গী পরানের,
ঝঞ্ঝা-মাঝে ধায় সে প্রাণ
সিন্ধু-মাঝে লুটে।

নিমেষতরে ইচ্ছা করে
বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে
জীবন-উচ্ছ্বাসে—
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্ধ্ব নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে
আম্রবনছায়ে
সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে
গুপ্ত গৃহবাসে।

বেহালাখানা বাঁকায়ে ধরি
বাজাও ওকি সুর—
তবলা-বাঁয়া কোলেতে টেনে
বাদ্যে ভরপুর!
কাগজ নেড়ে উচ্চ স্বরে
পোলিটিকাল তর্ক করে,
জানলা দিয়ে পশিছে ঘরে
বাতাস ঝুরুঝুর।
পানের বাটা, ফুলের মালা,
তবলা-বাঁয়া দুটো,
দম্ভ-ভরা কাগজগুলো
করিয়া দাও দূর।

কিসের এত অহংকার!
দম্ভ নাহি সাজে—

বরং থাকো মৌন হয়ে
সসংকোচ লাজে।
অত্যাচারে মত্ত-পারা
কভু কি হও আত্মহারা?
তপ্ত হয়ে রক্তধারা
ফুটে কি দেহ-মাঝে?
অহর্নিশি হেলার হাসি
তীব্র অপমান
মর্মতল বিদ্ধ করি
বজ্রসম বাজে?

দাস্যসুখে হাস্যমুখ,
বিনীত জোড়-কর,
প্রভুর পদে সোহাগ-মদে
দোদুল কলেবর!
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি
ঘৃণায়-মাখা অন্ন খুঁটি
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি
যেতেছ ফিরি ঘর।
ঘরেতে বসে গর্ব কর
পূর্বপুরুষের,
আর্যতেজ-দর্প-ভরে
পৃথ্বী থরহর!

হেলায়ে মাথা, দাঁতের আগে
মিষ্ট হাসি টানি
বলিতে আমি পারিব না তো
ভদ্রতার বাণী।
উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি
বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি,
প্রকাশহীন চিন্তারাশি
করিছে হানাহানি।
কোথাও যদি ছুটিতে পাই
বাঁচিয়া যাই তবে—
ভব্যতার গণ্ডিমাঝে
শান্তি নাহি মানি।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

দেশের উন্নতি

বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ,
    রয়েছে রেশ কানে—
কী যেন করা উচিত ছিল,
    কী করি কে তা জানে!
অন্ধকারে ওই রে শোন্
ভারতমাতা করেন groan
এ হেন কালে ভীষ্ম দ্রোণ
    গেলেন কোন্‌খানে!
দেশের দুখে সতত দহি
মনের ব্যথা সবারে কহি,
এসো তো করি নামটা সহি
    লম্বা পিটিশানে।
আয় রে ভাই, সবাই মাতি
যতটা পারি ফুলাই ছাতি,
নহিলে গেল আর্যজাতি
    রসাতলের পানে।

উৎসাহেতে জ্বলিয়া উঠি
    দুহাতে দাও তালি।
'আমরা বড়ো' এ যে না বলে
    তাহারে দাও গালি।
কাগজ ভরে লেখো রে লেখো,
এমনি করে যুদ্ধ শেখো,
হাতের কাছে রেখো রে রেখো
    কলম আর কালি!
চারটি করে অন্ন খেয়ো,
দুপুর বেলা আপিস যেয়ো,
তাহার পরে সভায় ধেয়ো
    বাক্যানল জ্বালি—
কাঁদিয়া লয়ে দেশের দুখে
সন্ধেবেলা বাসায় ঢুকে
শ্যালীর সাথে হাস্যমুখে
    করিয়ো চতুরালি।

দূর হউক এ বিড়ম্বনা,
    বিদ্রুপের ভান।
সবারে চাহে বেদনা দিতে
    বেদনা-ভরা প্রাণ।
আমার এই হৃদয়তলে
শরম-তাপ সতত জ্বলে

তাই তো চাহি হাসির ছলে
করিতে লাজ দান।
আয়-না ভাই, বিরোধ ভুলি—
কেন রে মিছে লাথিয়ে তুলি
পথের যত মতের ধূলি
আকাশপরিমাণ!
পরের মাঝে ঘরের মাঝে
মহৎ হব সকল কাজে,
নীরবে যেন মরে গো লাজে
মিথ্যা অভিমান।

ক্ষুদ্রতার মন্দিরেতে
বসায়ে আপনারে
আপন পায়ে না দিই যেন
অর্ঘ্য ভারে ভারে।
জগতে যত মহৎ আছে
হইব নত সবার কাছে,
হৃদয় যেন প্রসাদ যাচে
তাঁদের দ্বারে দ্বারে।
যখন কাজ ভুলিয়া যাই
মর্মে যেন লজ্জা পাই,
নিজেরে নাহি ভুলাতে চাই
বাক্যের আঁধারে।
ক্ষুদ্র কাজ ক্ষুদ্র নয়
এ কথা মনে জাগিয়া রয়,
বৃহৎ বলে না মনে হয়
বৃহৎ কল্পনারে।

পরের কাছে হইব বড়ো
এ কথা গিয়ে ভুলে
বৃহৎ যেন হইতে পারি
নিজের প্রাণমূলে।
অনেক দূরে লক্ষ্য রাখি
চুপ করে না বসিয়া থাকি
স্বপ্নাতুর দুইটি আঁখি
শূন্য-পানে তুলে।
ঘরের কাজ রয়েছে পড়ি,
তাহাই যেন সমাধা করি,
'কী করি' বলে ভেবে না মরি
সংশয়েতে দুলে।
করিব কাজ নীরবে থেকে,
মরণ যবে লইবে ডেকে

জীবনরাশি যাইব রেখে
ভবের উপকূলে।

সবাই বড়ো হইলে তবে
স্বদেশ বড়ো হবে,
যে কাজে মোরা লাগাব হাত
সিদ্ধ হবে তবে।
সত্যপথে আপন বলে
তুলিয়া শির সকলে চলে,
মরণভয় চরণতলে
দলিত হয়ে রবে।
নহিলে শুধু কথাই সার,
বিফল আশা লক্ষবার,
দলাদলি ও অহংকার
উচ্চ কলরবে।
আমোদ করা কাজের ভানে-
পেখম তুলি গগন-পানে
সবাই মাতে আপন মানে
আপন গৌরবে।

বাহবা কবি! বলিছ ভালো,
শুনিতে লাগে বেশ।
এমনি ভাবে বলিলে হবে
উন্নতি বিশেষ।
'ওজস্বিতা' 'উদ্দীপনা'
ছুটাও ভাষা অগ্নিকণা,
আমরা করি সমালোচনা
জাগায়ে তুলি দেশ!
বীর্যবল বাঙ্গালার
কেমনে বলো টিঁকিবে আর,
প্রেমের গানে করেছে তার
দুর্দশার শেষ।
যাক-না দেখা দিন-কতক
যেখানে যত রয়েছে লোক
সকলে মিলে লিখুক শ্লোক
'জাতীয়' উপদেশ।
নয়ন বাহি অনর্গল
ফেলিব সবে অশ্রুজল,
উৎসাহেতে বীরের দল
লোমাঞ্চিতকেশ।

রক্ষা করো! উৎসাহের
যোগ্য আমি কই!
সভা-কাঁপানো করতালিতে
কাতর হয়ে রই!
দশজনাতে যুক্তি ক'রে
দেশের যারা মুক্তি করে,
কাঁপায় ধরা বসিয়া ঘরে,
তাদের আমি নই।
'জাতীয়' শোকে সবাই জুটে
মরিছে যবে মাথাটা কুটে,
দশ দিকেতে উঠিছে ফুটে
বক্তৃতার খই—
হয়তো আমি শয্যা পেতে
মুখধহিয়া আলস্যেতে
ছন্দ গেঁথে নেশায় মেতে
প্রেমের কথা কই।
শুনিয়া যত বীরশাবক
দেশের যাঁরা অভিভাবক
দেশের কানে হস্ত হানে,
ফুকারে হৈ-হৈ!

চাহি না আমি অনুগ্রহ-
বচন এত শত।
'ওজস্বিতা' 'উদ্দীপনা'
থাকুক আপাতত।
পষ্ট তবে খুলিয়া বলি—
তুমিও চলো আমিও চলি,
পরস্পরে কেন এ ছলি
নির্বোধের মতো?

ঘরেতে ফিরে খেলো গে তাস,
লুটায়ে ভুঁয়ে মিটায়ে আশ
মরিয়া থাকো বারোটি মাস
আপন আঙিনায়।
পরের দোষে নাসিকা গুঁজে
গল্প খুঁজে গুজব খুঁজে
আরামে আঁখি আসিবে বুজে
মলিনপশুপ্রায়।
তরল হাসি-লহরী তুলি
রচিয়ো বসি বিবিধ বুলি,
সকল কিছু যাইয়ো ভুলি,
ভুলো না আপনায়!

আমিও রব তোমারি দলে
পড়িয়া এক ধার!
মাদুর পেতে ঘরের ছাতে
ডাবা হুঁকোটি ধরিয়া হাতে
করিব আমি সবার সাথে
দেশের উপকার।
বিজ্ঞভাবে নাড়িব শির,
অসংশয়ে করিব স্থির
মোদের বড়ো এ পৃথিবীর
কেহই নহে আর!
নয়ন যদি মুদিয়া থাকো
সে ভুল কভু ভাঙিবে নাকো,
নিজেরে বড়ো করিয়া রাখো
মনেতে আপনার!
বাঙালি বড়ো চতুর, তাই
আপনি বড়ো হইয়া যাই,
অথচ কোনো কষ্ট নাই
চেষ্টা নাই তার।
হোথায় দেখো খাটিয়া মরে,
দেশে বিদেশে ছড়ায়ে পড়ে,
জীবন দেয় ধরার তরে
ম্লেচ্ছ সংসার!
ফুকারো তবে উচ্চ রবে
বাঁধিয়া এক সার—
মহৎ মোরা বঙ্গবাসী
আর্যপরিবার!

১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

বঙ্গবীর

ভুলুবাবু বসি পাশের ঘরেতে
নামতা পড়েন উচ্চস্বরেতে—
হিস্ট্রি কেতাব লইয়া করেতে
কেদারা হেলান দিয়ে
দুই ভাই মোরা সুখে সমাসীন,
মেজের উপরে জ্বলে কেরাসিন,
পড়িয়া ফেলেছি চ্যাপ্টার তিন—
দাদা এমে, আমি বিএ।

যত পড়ি তত পুড়ে যায় তেল,
মগজে গজিয়ে ওঠে আক্কেল,
কেমন করিয়া বীর ক্রমোয়েল
পাড়িল রাজার মাথা,
বালক যেমন ঠেঙার বাড়িতে
পাকা আমগুলো রহে গো পাড়িতে—
কৌতুক ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে
উলটি ব'য়ের পাতা।

কেহ মাথা ফেলে ধর্মের তরে,
পরহিতে কারো মাথা খসে পড়ে,
রণভূমে কেহ মাথা রেখে মরে
কেতাবে রয়েছে লেখা।
আমি কেদারায় মাথাটি রাখিয়া
এই কথাগুলি চাখিয়া চাখিয়া
সুখে পাঠ করি থাকিয়া থাকিয়া,
পড়ে কত হয় শেখা!

পড়িয়াছি বসে জানালার কাছে
জ্ঞান খুঁজে কারা ধরা ভ্রমিয়াছে,
কবে মরে তারা মুখস্থ আছে
কোন্ মাসে কী তারিখে।
কর্তব্যের কঠিন শাসন
সাধ ক'রে কারা করে উপাসন,
গ্রহণ করেছে কণ্টকাসন—
খাতায় রেখেছি লিখে।

বড়ো কথা শুনি, বড়ো কথা কই,
জড়ো করে নিয়ে পড়ি বড়ো বই,
এমনি করিয়া ক্রমে বড়ো হই—
কে পারে রাখিতে চেপে!
কেদারায় বসে সারা দিন ধ'রে
বই পড়ে পড়ে মুখস্থ ক'রে
কভু মাথা ধরে কভু মাথা ঘোরে,
বুঝি বা যাইব খেপে।

ইংরেজ চেয়ে কিসে মোরা কম!
আমরা যে ছোটো সেটা ভারি ভ্রম;
আকার-প্রকার রকম-সকম
এতেই যা কিছু ভেদ।
যাহা লেখে তারা তাই ফেলি শিখে,
তাহাই আবার বাংলায় লিখে

করি কতমতো গুরুমারা টাঁকে,
লেখনীর ঘুচে খেদ।

মোক্ষমূলর বলেছে 'আর্য',
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য,
মোরা বড়ো বলে করেছি ধার্য,
আরামে পড়েছি শুয়ে।
মনু নাকি ছিল আধ্যাত্মিক,
আমরাও তাই—করিয়াছি ঠিক,
এ যে নাহি বলে ধিক্ তারে ধিক্,
শাপ দি' পইতে ছুঁয়ে।

কে বলিতে চায় মোরা নহি বীর,
প্রমাণ যে তার রয়েছে গভীর,
পূর্বপুরুষ ছুঁড়িতেন তীর
সাক্ষী বেদব্যাস।
আর-কিছু তবে নাহি প্রয়োজন,
সভাতলে মিলে বারো-তেরো জন
শুধু তরজন আর গরজন
এই করো অভ্যাস।

আলো-চাল আর কাঁচকলা-ভাতে
মেখেচুখে নিয়ে কদলীর পাতে
ব্রহ্মচর্য পেত হাতে হাতে
ঋষিগণ তপ ক'রে।
আমরা যদিও পাতিয়াছি মেজ,
হোটেলে ঢুকেছি পালিয়ে কালেজ,
তবু আছে সেই ব্রাহ্মণ-তেজ
মনু-তর্জমা প'ড়ে।

সংহিতা আর মুর্গি-জবাই
এই দুটো কাজে লেগেছি সবাই,
বিশেষত এই আমরা ক' ভাই
নিমাই নেপাল ভুতো।
দেশের লোকের কানের গোড়াতে
বিদ্যেটা নিয়ে লাঠিম ঘোরাতে,
বক্তৃতা আর কাগজ পোরাতে
শিখেছি হাজার ছুতো।

ম্যারাথন আর থর্মপলিতে
কী যে হয়েছিল বলিতে বলিতে

শিরায় শোণিত রহে গো জ্বলিতে
পাটের পলিতে-সম।
মূর্খ যাহারা কিছু পড়ে নাই
তারা এত কথা কী বুঝিবে ছাই!
হাঁ করিয়া থাকে, কভু তোলে হাই—
বুক ফেটে যায় মম।

আগাগোড়া যদি তাহারা পড়িত
গারিবাল্‌ডির জীবনচরিত
না জানি তা হলে কী তারা করিত
কেদারায় দিয়ে ঠেস!
মিল করে করে কবিতা লিখিত,
দু-চারটে কথা বলিতে শিখিত,
কিছুদিন তবু কাগজ টিঁকিত—
উন্নত হত দেশ—

না জানিল তারা সাহিত্যরস,
ইতিহাস নাহি করিল পরশ,
ওয়াশিংটনের জন্ম-বরষ
মুখস্থ হল নাকো।
ম্যাট্‌সিনি-লীলা এমন সরেস
এরা সে কথার না জানিল লেশ—
হা অশিক্ষিত অভাগা স্বদেশ,
লজ্জায় মুখ ঢাকো।

আমি দেখো ঘরে চৌকি টানিয়ে
লাইব্রেরি হতে হিস্ট্রি আনিয়ে
কত পড়ি, লিখি বানিয়ে বানিয়ে
শানিয়ে শানিয়ে ভাষা।
জ্বলে ওঠে প্রাণ, মরি পাখা ক'রে,
উদ্দীপনায় শুধু মাথা ঘোরে—
তবুও যা হোক স্বদেশের তরে
একটুকু হয় আশা।

যাক, পড়া যাক 'ন্যাস্‌বি' সমর—
আহা, ক্রমোয়েল, তুমিই অমর!
থাক্‌ এইখেনে, ব্যথিছে কোমর,
কাহিল হতেছে বোধ।

ঝি কোথায় গেল, নিয়ে আয় সাবু।
আরে, আরে এসো! এসো ননিবাবু,
তাস পেড়ে নিয়ে খেলা যাক গ্রাবু,
কালকের দেব শোধ!

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

সুরদাসের প্রার্থনা

ঢাকো ঢাকো মুখ টানিয়া বসন,
আমি কবি সুরদাস।
দেবী, আসিয়াছি ভিক্ষা মাগিতে,
পুরাতে হইবে আশ!
অতি অসহন বহ্নিদহন
মর্ম-মাঝারে করি যে বহন,
কলঙ্করাহু প্রতি পলে পলে
জীবন করিছে গ্রাস।
পবিত্র তুমি, নির্মল তুমি,
তুমি দেবী, তুমি সতী—
কুৎসিত দীন অধম পামর
পঙ্কিল আমি অতি।
তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই শক্তি,
হৃদয়ে আমার পাঠাও ভক্তি—
পাপের তিমির পুড়ে যায় জ্বলে
কোথা সে পুণ্যজ্যোতি!
দেবের করুণা মানবী-আকারে,
আনন্দধারা বিশ্ব-মাঝারে,
পতিতপাবনী গঙ্গা যেমন
এলেন পাপীর কাজে—
তোমার চরিত রবে নির্মল,
তোমার ধর্ম রবে উজ্জ্বল,
আমার এ পাপ করি দাও লীন
তোমার পুণ্য-মাঝে।

তোমারে কহিব লজ্জাকাহিনী
লজ্জা নাহিকো তায়।
তোমার আভায় মলিন লজ্জা
পলকে মিলায়ে যায়।
যেমন রয়েছ তেমনি দাঁড়াও,
আঁখি নত করি আমা-পানে চাও,
খুলে দাও মুখ আনন্দময়ী,
আবরণে নাহি কাজ।

নিরখি তোমারে ভীষণ মধুর,
আছ কাছে তবু আছ অতি দূর—
উজ্জ্বল যেন দেবরোষানল,
উদ্যত যেন বাজ।

জান কি আমি এ পাপ-আঁখি মেলি
তোমারে দেখেছি চেয়ে?
গিয়েছিল মোর বিভোর বাসনা
ওই মুখপানে ধেয়ে।
তুমি কি তখন পেরেছ জানিতে?
বিমল হৃদয়-আরশিখানিতে
চিহ্ন কিছু কি পড়েছিল এসে
নিশ্বাসরেখাছায়া?
ধরার কুয়াশা ম্লান করে যথা
আকাশ-উষার কায়া!
লজ্জা সহসা আসি অকারণে
বসনের মতো রাঙা আবরণে
চাহিয়াছিল কি ঢাকিতে তোমায়
লুব্ধ নয়ন হতে?
মোহচঞ্চল সে লালসা মম
কৃষ্ণবরন ভ্রমরের সম
ফিরিতেছিল কি গুন্ গুন্ কেঁদে
তোমার দৃষ্টিপথে?

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত
প্রভাতরশ্মি-সম—
লও, বিঁধে দাও বাসনাসঘন
এ কালো নয়ন মম।
এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই,
ফুটেছে মর্মতলে—
নির্বাণহীন অঙ্গার-সম
নিশিদিন শুধু জ্বলে।
সেথা হতে তারে উপাড়িয়া লও
জ্বালাময় দুটো চোখ,
তোমার লাগিয়া তিয়াষ যাহার
সে আঁখি তোমারি হোক।

অপার ভুবন, উদার গগন,
শ্যামল কাননতল,
বসন্ত অতি মুগ্ধমুরতি,
স্বচ্ছ নদীর জল,

বিবিধবরন সন্ধ্যানীরদ,
গ্রহতারাময়ী নিশি,
বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র
প্রসারিত দূর দিশি,
সুনীল গগনে ঘনতর নীল
অতিদূর গিরিমালা,
তারি পরপারে রবির উদয়
কনককিরণ-জ্বালা,
চকিততড়িৎ সঘন বরষা,
পূর্ণ ইন্দ্রধনু,
শরৎ-আকাশে অসীমবিকাশ
জ্যোৎস্না শুভ্রতনু—
লও, সব লও, তুমি কেড়ে লও,
মাগিতেছি অকপটে,
তিমিরতুলিকা দাও বুলাইয়া
আকাশ-চিত্রপটে।

ইহারা আমারে ভুলায় সতত,
কোথা নিয়ে যায় টেনে!
মাধুরীমদিরা পান ক'রে শেষে
প্রাণ পথ নাহি চেনে।
সবে মিলে যেন বাজাইতে চায়
আমার বাঁশরি কাড়ি,
পাগলের মতো রচি নব গান,
নব নব তান ছাড়ি।
আপন ললিত রাগিণী শুনিয়া
আপনি অবশ মন—
ডুবাইতে থাকে কুসুমগন্ধ
বসন্তসমীরণ।
আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে,
ফুল মোরে ঘিরে বসে,
কেমনে না জানি জ্যোৎস্নাপ্রবাহ
সর্বশরীরে পশে।
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে
ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবন-ভরা বাহুপাশে তার
বেষ্টন করে কায়া।
চারি দিকে ঘিরি করে আনাগোনা
কল্পমুরতি কত,
কুসুমকাননে বেড়াই ফিরিয়া
যেন বিভোরের মতো।

শ্লথ হয়ে আসে হৃদয়তন্ত্রী,
বীণা খসে যায় পড়ি,
নাহি বাজে আর হরিনামগান
বরষ বরষ ধরি।
হরিহীন সেই অনাথ বাসনা
পিয়াসে জগতে ফিরে—
বাড়ে তৃষা, কোথা পিপাসার জল
অকূল লবণনীরে।
গিয়েছিল, দেবী, সেই ঘোর তৃষা
তোমার রূপের ধারে—
আঁখির সহিতে আঁখির পিপাসা
লোপ করো একেবারে।

ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার মূর্তি
পশেছে জীবনমূলে,
এই ছুরি দিয়ে সে মুরতিখানি
কেটে কেটে লও তুলে।
তারি সাথে হায় আঁধারে মিশাবে
নিখিলের শোভা যত—
লক্ষ্মী যাবেন, তাঁরি সাথে যাবে
জগৎ ছায়ার মতো।

যাক, তাই যাক! পারি নে ভাসিতে
কেবলি মুরতি-স্রোতে!
লহো মোরে তুলে আলোকমগন
মুরতিভুবন হতে।
আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে—
একাকী অসীম ভরা,
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন
মিলাবে সকল ধরা।
আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে
আমার বিজন বাস,
প্রলয়-আসন জুড়িয়া বসিয়া
রব আমি বারো মাস।

থামো একটুকু, বুঝিতে পারি নে,
ভালো করে ভেবে দেখি—
বিশ্ববিলোপ বিমল আঁধার
চিরকাল রবে সে কি?
ক্রমে ধীরে ধীরে নিবিড় তিমিরে
ফুটিয়া উঠিবে না কি

পবিত্র মুখ মধুর মূর্তি,
স্নিগ্ধ আনত আঁখি?
এখন যেমন রয়েছ দাঁড়ায়ে
দেবীর প্রতিমা-সম,
স্থিরগম্ভীর করুণ নয়নে
চাহিছ হৃদয়ে মম,
বাতায়ন হতে সন্ধ্যাকিরণ
পড়েছে ললাটে এসে,
মেঘের আলোক লভিছে বিরাম
নিবিড়-তিমির কেশে,
শান্তিরূপিণী এ মুরতি তব
অতি অপূর্ব সাজে
অনলরেখায় ফুটিয়া উঠিবে
অনন্তনিশি-মাঝে।
চৌদিকে তব নূতন জগৎ
আপনি সৃজিত হবে,
এ সন্ধ্যাশোভা তোমারে ঘিরিয়া
চিরকাল জেগে রবে।
এই বাতায়ন, ওই চাঁপা গাছ,
দূর সরযূর রেখা,
নিশাদনহীন অন্ধ হৃদয়ে
চিরদিন যাবে দেখা।
সে নব জগতে কালস্রোত নাই,
পরিবর্তন নাহি—
আজি এই দিন অনন্ত হয়ে
চিরদিন রবে চাহি।

তবে তাই হোক, হোয়ো না বিমুখ,
দেবী, তাহে কিবা ক্ষতি—
হৃদয়-আকাশে থাক্-না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি।
বাসনামলিন আঁখিকলঙ্ক
ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয় নীল-উৎপল
চিরদিন রবে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা,
হেরিব আমার হরি—
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব
অনন্ত বিভাবরী।

২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

নিন্দুকের প্রতি নিবেদন

হউক ধন্য তোমার যশ
লেখনী ধন্য হোক,
তোমার প্রতিভা উজ্জ্বল হয়ে
জাগাক সপ্তলোক।
যদি পথে তব দাঁড়াইয়া থাকি
আমি ছেড়ে দিব ঠাঁই—
কেন হীন ঘৃণা, ক্ষুদ্র এ দ্বেষ,
বিদ্রূপ কেন ভাই!
আমার এ লেখা কারো ভালো লাগে
তাহা কি আমার দোষ?
কেহ কবি বলে (কেহ বা বলে না)—
কেন তাহে তব রোষ?

কত প্রাণপণ, দগ্ধ হৃদয়,
বিনিদ্র বিভাবরী,
জান কি বন্ধু, উঠেছিল গীত
কত ব্যথা ভেদ করি?
রাঙা ফুল হয়ে উঠিছে ফুটিয়া
হৃদয়শোণিতপাত,
অশ্রু ঝলিছে শিশিরের মতো
পোহাইয়ে দুখরাত।
উঠিতেছে কত কণ্টকলতা,
ফুলে পল্লবে ঢাকে—
গভীর গোপন বেদনা-মাঝারে
শিকড় আঁকড়ি থাকে।
জীবনে যে সাধ হয়েছে বিফল
সে সাধ ফুটিছে গানে—
মরীচিকা রচি মিছে সে তৃপ্তি,
তৃষ্ণা কাঁদিছে প্রাণে।
এনেছি তুলিয়া পথের প্রান্তে
মর্মকুসুম মম—
আসিছে পান্থ, যেতেছে লইয়া
স্মরণচিহ্ন-সম।
কোনো ফুল যাবে দুদিনে ঝরিয়া,
কোনো ফুল বেঁচে রবে—
কোনো ছোটো ফুল আজিকার কথা
কালিকার কানে কবে।
তুমি কেন, ভাই, বিমুখ এমন—
নয়নে কঠোর হাসি।

দূর হতে যেন ফুঁসিছ সবেগে
উপেক্ষা রাশি রাশি—
কঠিন বচন জরিছে অধরে
উপহাস হলাহলে,
লেখনীর মুখে করিতে দগ্ধ
ঘৃণার অনল জ্বলে।

ভালোবেসে যাহা ফুটেছে পরানে
সবার লাগিবে ভালো,
যে জ্যোতি হরিছে আমার আঁধার
সবারে দিবে সে আলো—
অন্তর-মাঝে সবাই সমান,
বাহিরে প্রভেদ ভবে,
একের বেদনা করুণাপ্রবাহে
সান্ত্বনা দিবে সবে।
এই মনে করে ভালোবেসে আমি
দিয়েছিনু উপহার—
ভালো নাহি লাগে ফেলে যাবে চলে,
কিসের ভাবনা তার!

তোমার দেবার যদি কিছু থাকে
তুমিও দাও-না এনে।
প্রেম দিলে সবে নিকটে আসিবে
তোমারে আপন জেনে।
কিন্তু জানিয়ো আলোক কখনো
থাকে না তো ছায়া বিনা,
ঘৃণার টানেও কেহ বা আসিবে,
তুমি করিয়ো না ঘৃণা!
এতই কোমল মানবের মন
এমনি পরের বশ,
নিষ্ঠুর বাণে সে প্রাণ ব্যথিতে
কিছুই নাহিকো যশ।
তীক্ষ্ম হাসিতে বাহিরে শোণিত,
বচনে অশ্রু উঠে,
নয়নকোণের চাহনি-ছুরিতে
মর্মতন্তু টুটে।
সান্ত্বনা দেওয়া নহে তো সহজ,
দিতে হয় সারা প্রাণ,
মানবমনের অনল নিবাতে
আপনারে বলিদান।

ঘৃণা জ্বলে মরে আপনার বিষে,
রহে না সে চিরদিন—
অমর হইতে চাহ যদি, জেনো
প্রেম সে মরণহীন।
তুমিও রবে না, আমিও রব না,
দুদিনের দেখা ভবে—
প্রাণ খুলে প্রেম দিতে পারো যদি
তাহা চিরদিন রবে।

দুর্বল মোরা, কত ভুল করি,
অপূর্ণ সব কাজ।
নেহারি আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা
আপনি যে পাই লাজ।
তা বলে যা পারি তাও করিব না?
নিষ্ফল হব ভবে?
প্রেমফুল ফোটে, ছোটো হল বলে
দিব না কি তাহা সবে?
হয়তো এ ফুল সুন্দর নয়,
ধরেছি সবার আগে—
চলিতে চলিতে আঁখির পলকে
ভুলে কারো ভালো লাগে।
যদি ভুল হয় ক'দিনের ভুল!
দুদিনে ভাঙিবে তবে।
তোমার এমন শাণিত বচন
সেই কি অমর হবে?

২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

কবির প্রতি নিবেদন

হেথা কেন দাঁড়ায়েছ, কবি,
যেন কাষ্ঠপুত্তল ছবি?
চারি দিকে লোকজন চলিতেছে সারাক্ষণ,
আকাশে উঠিছে খর রবি।

কোথা তব বিজন ভবন,
কোথা তব মানসভুবন?
তোমারে ঘেরিয়া ফেলি কোথা সেই করে কেলি
কল্পনা, মুক্ত পবন?

নিখিলের আনন্দধাম
কোথা সেই গভীর বিরাম?

জগতের গীতধার কেমনে শুনিবে আর?
শুনিতেছ আপনারই নাম।

আকাশের পাখি তুমি ছিলে,
ধরণীতে কেন ধরা দিলে?
বলে সবে বাহা-বাহা, সকলে পড়ায় যাহা
তুমি তাই পড়িতে শিখিলে!

প্রভাতের আলোকের সনে
অনাবৃত প্রভাতগগনে
বহিয়া নূতন প্রাণ ঝরিয়া পড়ে না গান
ঊর্ধ্বনয়ন এ ভুবনে।

পথ হতে শত কলরবে
'গাও গাও' বলিতেছে সবে।
ভাবিতে সময় নাই— গান চাই, গান চাই,
থামিতে চাহিছে প্রাণ যবে।

থামিলে চলিয়া যাবে সবে,
দেখিতে কেমনতরো হবে!
উচ্চ আসনে লীন প্রাণহীন গানহীন
পুতলির মতো বসে রবে।

শ্রান্তি লুকাতে চাও ত্রাসে,
কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে আসে।
শুনে যারা যায় চলে দু-চারিটা কথা ব'লে
তারা কি তোমায় ভালোবাসে?

কতমতো পরিয়া মুখোশ
মাগিছ সবার পরিতোষ।
মিছে হাসি আনো দাঁতে, মিছে জল আঁখিপাতে,
তবু তারা ধরে কত দোষ।

মন্দ কহিছে কেহ ব'সে,
কেহ বা নিন্দা তব ঘোষে।
তাই নিয়ে অবিরত তর্ক করিছ কত,
জ্বলিয়া মরিছ মিছে রোষে।

মূর্খ, দম্ভ-ভরা দেহ,
তোমারে করিয়া যায় স্নেহ।
হাত বুলাইয়া পিঠে কথা বলে মিঠে মিঠে,
'শাবাশ' 'শাবাশ' বলে কেহ।

হায় কবি, এত দেশ ঘুরে
আসিয়া পড়েছ কোন্ দূরে!
এ যে কোলাহলমরু— নাই ছায়া, নাই তরু
যশের কিরণে মরো পুড়ে।

দেখো, হোথা নদী-পর্বত,
অবারিত অসীমের পথ।
প্রকৃতি শান্ত মুখে ছুটায় গগনবুকে
গ্রহতারাময় তার রথ।

সবাই আপন কাজে ধায়,
পাশে কেহ ফিরিয়া না চায়।
ফুটে চিররূপরাশি চিরমধুময় হাসি
আপনারে দেখিতে না পায়।

হোথা দেখো একেলা আপনি
আকাশের তারা গণি গণি
ঘোর নিশীথের মাঝে কে জাগে আপন কাজে,
সেথায় পশে না কলধ্বনি।

দেখো হোথা নূতন জগৎ—
ওই কারা আত্মহারাবৎ
যশ-অপযশ-বাণী কোনো কিছু নাহি মানি
রচিছে সুদূর ভবিষ্যৎ।

ওই দেখো না পুরিতে আশ
মরণ করিল কারে গ্রাস।
নিশি না হইতে সারা খসিয়া পড়িল তারা,
রাখিয়া গেল না ইতিহাস।

ওই কারা গিরির মতন
আপনাতে আপনি বিজন—
হৃদয়ের স্রোত উঠি গোপন আলয় টুটি
দূর দূরে করিছে মগন।

ওই কারা বসে আছে দূরে
কল্পনা-উদয়াচল-পুরে—
অরুণপ্রকাশ-প্রায় আকাশ ভরিয়া যায়
প্রতিদিন নব নব সুরে।

হোথা উঠে নবীন তপন,
হোথা হতে বহিছে পবন।

হোথা চির ভালোবাসা— নব গান, নব আশা—
অসীম বিরামনিকেতন।
হোথা মানবের জয় উঠিছে জগৎময়,
ওইখানে মিলিয়াছে নরনারায়ণ।

হেথা, কবি, তোমারে কি সাজে
ধূলি আর কলরোল-মাঝে?

২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

গুরু গোবিন্দ

"বন্ধু, তোমরা ফিরে যাও ঘরে,
এখনো সময় নয়"—
নিশি-অবসান, যমুনার তীর,
ছোটো গিরিমালা, বন সুগভীর;
গুরু গোবিন্দ কহিলা ডাকিয়া
অনুচর গুটিছয়।

"যাও রামদাস, যাও গো লেহারি,
সাহু, ফিরে যাও তুমি।
দেখায়ো না লোভ, ডাকিয়ো না মোরে
ঝাঁপায়ে পড়িতে কর্মসাগরে,
এখনো পড়িয়া থাক্ বহু দূরে
জীবনরঙ্গভূমি।

ফিরায়েছি মুখ, রুধিয়াছি কান,
লুকায়েছি বনমাঝে।
সুদূরে মানবসাগর অগাধ,
চিরক্রন্দিত ঊর্মিনিনাদ—
হেথায় বিজনে রয়েছি মগন
আপন গোপন কাজে।

মানবের প্রাণ ডাকে যেন মোরে
সেই লোকালয় হতে।
সুপ্ত নিশীথে জেগে উঠে তাই
চমকিয়া উঠে বলি 'যাই যাই',
প্রাণ মন দেহ ফেলে দিতে চাই
প্রবল মানবস্রোতে।

তোমাদের হেরি চিত চঞ্চল,
উদ্দাম ধায় মন।

রক্ত-অনল শত শিখা মেলি
সর্প-সমান করি উঠে কেলি,
গঞ্জনা দেয় তরবারি যেন
কোষমাঝে ঝন্‌ঝন্‌।

হায়, সে কী সুখ, এ গহন ত্যজি
হাতে লয়ে জয়তূরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে—
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ম ছুরি।

তুরঙ্গসম অন্ধ নিয়তি—
বন্ধন করি তায়
রশ্মি পাকড়ি আপনার করে
বিঘ্ন বিপদ লঙ্ঘন ক'রে
আপনার পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায়।

সম্মুখে যে আসে, সরে যায় কেহ,
পড়ে যায় কেহ ভূমে।
দ্বিধা হয়ে বাধা হতেছে ভিন্ন,
পিছে পড়ে থাকে চরণচিহ্ন,
আকাশের আঁখি করিছে খিন্ন
প্রলয়বহ্নিধূমে।

শতবার ক'রে মৃত্যু ডিঙায়ে
পড়ি জীবনের পারে।
প্রান্তগগনে তারা অনিমিখ
নিশীথতিমিরে দেখাইছে দিক,
লোকের প্রবাহ ফেনায়ে ফেনায়ে
গরজিছে দুই ধারে।

কভু অমানিশা নীরব নিবিড়,
কভু বা প্রখর দিন।
কভু বা আকাশে চারিদিকময়
বজ্র লুকায়ে মেঘ জড়ো হয়—
কভু বা ঝটিকা মাথার উপরে
ভেঙে পড়ে দয়াহীন।

'আয় আয় আয়' ডাকিতেছি সবে,
আসিতেছে সবে ছুটে।

বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙে বাহিরায় সব পরিবার,
সুখ সম্পদ মায়া মমতার
বন্ধন যায় টুটে।

সিন্ধু-মাঝারে মিশিছে যেমন
পঞ্চনদীর জল—
আহ্বান শুনে কে কারে থামায়,
ভক্তহৃদয় মিলিছে আমায়,
পঞ্জাব জুড়ি উঠিছে জাগিয়া
উন্মাদ কোলাহল।

কোথা যাবি ভীরু, গহনে গোপনে
পশিছে কণ্ঠ মোর।
প্রভাতে শুনিয়া 'আয় আয় আয়'
কাজের লোকেরা কাজ ভুলে যায়,
নিশীথে শুনিয়া 'আয় তোরা আয়'
ভেঙে যায় ঘুমঘোর।

যত আগে চলি বেড়ে যায় লোক,
ভরে যায় ঘাট বাট।
ভুলে যায় সবে জাতি-অভিমান,
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে যায় মান অপমান
ব্রাহ্মণ আর জাঠ।

থাক্ ভাই, থাক্, কেন এ স্বপন—
এখনো সময় নয়।
এখনো একাকী দীর্ঘ রজনী
জাগিতে হইবে পল গণি গণি
অনিমেষ চোখে পূর্বগগনে
দেখিতে অরুণোদয়।

এখনো বিহার কল্পজগতে,
অরণ্য রাজধানী—
এখনো কেবল নীরব ভাবনা,
কর্মবিহীন বিজন সাধনা,
দিবানিশি শুধু ব'সে ব'সে শোনা
আপন মর্মবাণী।

একা ফিরি তাই যমুনার তীরে,
দুর্গম গিরি-মাঝে

মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে,
মিশাতেছি গান নদীকলরোলে,
গড়িতেছি মন আপনার মনে,
যোগ্য হতেছি কাজে।

এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ,
আরো কতদিন হবে—
চারি দিক হতে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ,
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে।

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
'পেয়েছি আমার শেষ।
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে—
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।

নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগুপিছু।
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ,
নাই তার কাছে জীবন মরণ
নাই নাই আর কিছু।'

হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে
দৈববাণীর মতো—
'উঠিয়া দাঁড়াও আপন আলোতে,
ওই চেয়ে দেখো কত দূর হতে
তোমার কাছেতে ধরা দিবে ব'লে
আসে লোক কত শত।

'ওই শোনো শোনো কল্লোলধ্বনি
ছুটে হৃদয়ের ধারা।
স্থির থাকো তুমি, থাকো তুমি জাগি
প্রদীপের মতো আলস তেয়াগি—
এ নিশীথ-মাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তারা।'

ওই চেয়ে দেখো দিগন্ত-পানে
ঘনঘোর ঘটা অতি।

আসিতেছে ঝড় মরণেরে লয়ে,
তাই বসে বসে হৃদয়-আলয়ে
জ্বালাতেছি আলো—নিবিবে না ঝড়ে,
দিবে অনন্ত জ্যোতি।

যাও তবে সাহু, যাও রামদাস,
ফিরে যাও সখাগণ।
এসো দেখি সবে যাবার সময়—
বলো দেখি সবে 'গুরুজির জয়',
দুই হাত তুলি বলো 'জয় জয়
অলখ নিরঞ্জন'!"

বলিতে বলিতে প্রভাততপন
উঠিল আকাশ-'পরে।
গিরির শিখরে গুরুর মূরতি
কিরণছটায় প্রোজ্জ্বল অতি,
বিদায় মাগিল অনুচরগণ—
নমিল ভক্তিভরে।

২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

নিষ্ফল উপহার

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল।
ঊর্ধ্বে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।
মাঝে গহ্বর, তাহে পশি জলধার
ছল ছল করতালি দেয় অনিবার।

বরষার নির্ঝরে অঙ্কিতকায়
দুই তীরে গিরিমালা কতদূর যায়!
স্থির তারা, নিশিদিন তবু যেন চলে,
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।

মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে,
মেঘেরে ডাকিছে গিরি হস্ত বাড়ায়ে।
তৃণহীন সুকঠিন বিদীর্ণ ধরা,
রৌদ্র-বরন ফুলে কাঁটাগাছ ভরা।

দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে
পথহীন, জনহীন, শব্দবিহীন।
ডুবে রবি, যেমন সে ডুবে প্রতিদিন।

রঘুনাথ হেথা আসি যবে উতরিলা,
শিখগুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা।
রঘু কহিলেন নমি চরণে তাঁহার,
'দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার!'

বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধায়ে কুশল
আশিসিলা মাথায় পরশি করতল।
কনকে হীরকে গাঁথা বলয় দুখানি
গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি দুই পাণি।

ভূমিতল হতে বালা লইলেন তুলে,
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে আঙুলে।
হীরকের সূচিমুখ শতবার ঘুরি
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি।

ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিলা রাখি,
আবার সে পুঁথি-'পরে নিবেশিলা আঁখি।
সহসা একটি বালা শিলাতল হতে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।

'আহা আহা' চীৎকার করি রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দুহাত।
আগ্রহে যেন তার প্রাণ মন কায়
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায়।

বারেকের তরে গুরু না তুলিলা মুখ,
নিভৃত হৃদয়ে তাঁর জাগে পাঠসুখ।
কালো জল চুপে চুপে বহিল গোপন
ছল-ভরা সুগভীর চুরির মতন।

দিবালোক চলে গেল দিবসের পিছু।
যমুনা উতলা করি না মিলিল কিছু।
সিক্ত বসন লয়ে শ্রান্ত শরীরে
রঘুনাথ গুরু-কাছে আসিলেন ফিরে।

'এখনো উঠাতে পারি' করজোড়ে যাচে,
'যদি দেখাইয়া দাও কোন্‌খানে আছে।'
দ্বিতীয় বলয়খানি ছুঁড়ি দিয়া জলে
গুরু কহিলেন, 'আছে ওই নদীতলে।'

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৮৪

পরিত্যক্ত

বন্ধু,

মনে আছে সেই প্রথম বয়স,
নূতন বঙ্গভাষা
তোমাদের মুখে জীবন লভিছে
বহিয়া নূতন আশা।
নিমেষে নিমেষে আলোকরশ্মি
অধিক জাগিয়া উঠে,
বঙ্গহৃদয় উন্মীলি যেন
রক্তকমল ফুটে।

প্রতিদিন যেন পূর্বগগনে
চাহি রহিতাম একা,
কখন ফুটিবে তোমাদের ওই
লেখনী-অরুণ-লেখা।
তোমাদের ওই প্রভাত-আলোক
প্রাচীন তিমির নাশি
নবজাগ্রত নয়নে আনিবে
নূতন জগৎরাশি।

একদা জাগিনু, সহসা দেখিনু
প্রাণমন আপনার—
হৃদয়ের মাঝে জীবন জাগিছে
পরশ লভিনু তার।
ধন্য হইল মানবজনম,
ধন্য তরুণ প্রাণ—
মহৎ আশায় বাড়িল হৃদয়,
জাগিল হর্ষগান।
দাঁড়ায়ে বিশাল ধরণীর তলে
ঘুচে গেল ভয় লাজ,
বুঝিতে পারিনু এ জগৎ-মাঝে
আমারও রয়েছে কাজ।
স্বদেশের কাছে দাঁড়ায়ে প্রভাতে
কহিলাম জোড়করে,
'এই লহো, মাতঃ, এ চিরজীবন
সঁপিনু তোমারি তরে।'

বন্ধু, এ দীন হয়েছে বাহির
তোমাদেরই কথা শুনে।
সেইদিন হতে কণ্টকপথে
চলিয়াছি দিন গুনে।

পদে পদে জাগে নিন্দা ও ঘৃণা
ক্ষুদ্র অত্যাচার,
একে একে সবে পর হয়ে যায়
ছিল যারা আপনার।
ধ্রুবতারা-পানে রাখিয়া নয়ন
চলিয়াছি পথ ধরি,
সত্য বলিয়া জানিয়াছি যাহা
তাহাই পালন করি।

কোথা গেল সেই প্রভাতের গান,
কোথা গেল সেই আশা!
আজিকে বন্ধু তোমাদের মুখে
এ কেমনতরো ভাষা!
আজি বলিতেছ, 'বসে থাকো, বাপু,
ছিল যাহা তাই ভালো।
যা হবার তাহা আপনি হইবে,
কাজ কি এতই আলো!'
কলম মুছিয়া তুলিয়া রেখেছ,
বন্ধ করেছ গান,
সহসা সবাই প্রাচীন হয়েছ,
নিতান্ত সাবধান।
আনন্দে যারা চলিতে চাহিছে
ছিঁড়ি অসত্য-পাশ,
ঘর হতে বসি করিছ তাদের
উপহাস পরিহাস।
এত দূরে এনে ফিরিয়া দাঁড়ায়ে
হাসিছ নিঠুর হাসি,
চিরজীবনের প্রিয়তম ব্রত
চাহিছ ফেলিতে নাশি।
তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
ভেঙেছ মাটির আল,
তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে
উজান স্রোতের কাল।
নিজের জীবন মিশায়ে যাহারে
আপনি তুলেছ গড়ি
হাসিয়া হাসিয়া আজিকে তাহারে
ভাঙিছ কেমন করি!

তবে সেই ভালো, কাজ নেই তবে,
তবে ফিরে যাওয়া যাক—
গৃহকোণে এই জীবন-আবেগ
করি বসে পরিপাক;

সানাই বাজিয়ে ঘরে নিয়ে আসি
আট বরষের বধূ,
শৈশব-কুঁড়ি ছিঁড়িয়া বাহির
করি যৌবনমধু!
ফুটন্ত নবজীবনের 'পরে
চাপায়ে শাস্ত্রভার
জীর্ণ যুগের ধূলিসাথে তারে
করে দিই একাকার!

বন্ধু, এ তব বিফল চেষ্টা,
আর কি ফিরিতে পারি?
শিখরগুহায় আর ফিরে যায়
নদীর প্রবল বারি?
জীবনের স্বাদ পেয়েছি যখন,
চলেছি যখন কাজে,
কেমনে আবার করিব প্রবেশ
মৃত বরষের মাঝে?
সে নবীন আশা নাইকো যদিও
তবু যাব এই পথে,
পাব না শুনিতে আশিস্-বচন
তোমাদের মুখ হতে।
তোমাদের ওই হৃদয় হইতে
নূতন পরান আনি
প্রতি পলে পলে আসিবে না আর
সেই আশ্বাসবাণী।
শত হৃদয়ের উৎসাহ মিলি
টানিয়া লবে না মোরে,
আপনার বলে চলিতে হইবে
আপনার পথ ক'রে।
আকাশে চাহিব, হায়, কোথা সেই
পুরাতন শুকতারা!
তোমাদের মুখ ভ্রূকুটিকুটিল,
নয়ন আলোকহারা।
মাঝে মাঝে শুধু শুনিতে পাইব
হা-হা-হা অট্টহাসি,
শ্রান্ত হৃদয়ে আঘাত করিবে
নিঠুর বচন আসি।
ভয় নাই যার কী করিবে তার
এই প্রতিকূল স্রোতে!
তোমারি শিক্ষা করিবে রক্ষা
তোমারি বাক্য হতে।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

ভৈরবী গান

ওগো, কে তুমি বসিয়া উদাসমুরতি
বিষাদশান্ত শোভাতে!
ওই ভৈরবী আর গেয়ো নাকো এই
প্রভাতে—
মোর গৃহছাড়া এই পথিক-পরান
তরুণ হৃদয় লোভাতে।

ওই মন-উদাসীন ওই আশাহীন
ওই ভাষাহীন কাকলি
দেয় ব্যাকুল পরশে সকল জীবন
বিকলি।
দেয় চরণে বাঁধিয়া প্রেমবাহু-ঘেরা
অশ্রুকোমল শিকলি।
হায়, মিছে মনে হয় জীবনের ব্রত,
মিছে মনে হয় সকলি।

যারে ফেলিয়া এসেছি, মনে করি, তারে
ফিরে দেখে আসি শেষ বার।
ওই কাঁদিছে সে যেন এলায়ে আকুল
কেশভার।
যারা গৃহছায়ে বসি সজল নয়ন
মুখ মনে পড়ে সে সবার।

এই সংকটময় কর্মজীবন
মনে হয় মরু সাহারা,
দূরে মায়াময় পুরে দিতেছে দৈত্য
পাহারা।
তবে ফিরে যাওয়া ভালো তাহাদের পাশে
পথ চেয়ে আছে যাহারা।

সেই ছায়াতে বসিয়া সারা দিনমান
তরুমর্মর পবনে,
সেই মুকুল-আকুল বকুলকুঞ্জ-
ভবনে,
সেই কুহুকুহরিত বিরহরোদন
থেকে থেকে পশে শ্রবণে।

সেই চিরকলতান উদার গঙ্গা
বহিছে আঁধারে আলোকে,

সেই তীরে চিরদিন খেলিছে বালিকা-
বালকে।
ধীরে সারা দেহ যেন মুদিয়া আসিছে
স্বপ্নপাখির পালকে।

হায়, অতৃপ্ত যত মহৎ বাসনা
গোপনমর্মদাহিনী,
এই আপনা-মাঝারে শুষ্ক জীবন-
বাহিনী!
ওই ভৈরবী দিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া
রচিব নিরাশাকাহিনী।

সদা করুণ কণ্ঠ কাঁদিয়া গাহিবে—
'হল না, কিছুই হবে না।
এই মায়াময় ভবে চিরদিন কিছু
রবে না।
কেহ জীবনের যত গুরুভার ব্রত
ধূলি হতে তুলি লবে না।

'এই সংশয়-মাঝে কোন্ পথে যাই,
কার তরে মরি খাটিয়া!
আমি কার মিছে দুখে মরিতেছি বুক
ফাটিয়া!
ভবে সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ,
কে রেখেছে মত আঁটিয়া!

'যদি কাজ নিতে হয়, কত কাজ আছে,
একা কি পারিব করিতে!
কাঁদে শিশিরবিন্দু জগতের তৃষা
হরিতে!
কেন অকূল সাগরে জীবন সঁপিব
একেলা জীর্ণ তরীতে!

'শেষে দেখিব—পড়িল সুখযৌবন
ফুলের মতন খসিয়া,
হায় বসন্তবায়ু মিছে চলে গেল
শ্বসিয়া,
সেই যেখানে জগৎ ছিল এক কালে
সেইখানে আছে বসিয়া!

'শুধু আমারি জীবন মরিল ঝুরিয়া
চিরজীবনের তিয়াষে।

এই দগ্ধ হৃদয় এত দিন আছে
কী আশে!
সেই ডাগর নয়ন, সরস অধর
গেল চলি কোথা দিয়া সে!"

ওগো, থামো, যারে তুমি বিদায় দিয়েছ
তারে আর ফিরে চেয়ো না।
ওই অশ্রুসজল ভৈরবী আর
গেয়ো না।
আজি প্রথম প্রভাতে চলিবার পথ
নয়নবাষ্পে ছেয়ো না।

ওই কুহক রাগিণী এখনি কেন গো
পথিকের প্রাণ বিবশে!
পথে এখনো উঠিবে প্রখর তপন
দিবসে।
পথে রাক্ষসী সেই তিমিররজনী
না জানি কোথায় নিবসে!

থামো, শুধু একবার ডাকি নাম তাঁর
নবীন জীবন ভরিয়া—
যাব যাঁর বল পেয়ে সংসারপথ
তরিয়া,
যত মানবের গুরু মহৎজনের
চরণচিহ্ন ধরিয়া।

যাও তাহাদের কাছে ঘরে যারা আছে
পাষাণে পরান বাঁধিয়া,
গাও তাদের জীবনে তাদের বেদনে
কাঁদিয়া।
তারা প'ড়ে ভূমিতলে ভাসে আঁখিজলে
নিজ সাধে বাদ সাধিয়া।

হায়, উঠিতে চাহিছে পরান, তবুও
পারে না তাহারা উঠিতে।
তারা পারে না ললিতলতার বাঁধন
টুটিতে।
তারা পথ জানিয়াছে, দিবানিশি তবু
পথপাশে রহে লুটিতে!

তারা অলস বেদন করিবে যাপন
অলস রাগিণী গাহিয়া,

রবে দূর আলো-পানে আবিষ্টপ্রাণে
চাহিয়া।
ওই মধুর রোদনে ভেসে যাবে তারা
দিবসরজনী বাহিয়া।

সেই আপনার গানে আপনি গলিয়া
আপনারে তারা ভুলাবে,
স্নেহে আপনার দেহে সকরুণ কর
বুলাবে।
সুখে কোমল শয়নে রাখিয়া জীবন
ঘুমের দোলায় দুলাবে।

ওগো, এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন,
নিঠুর আঘাত চরণে।
যাব আজীবন কাল পাষাণকঠিন
সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
সুখ আছে সেই মরণে।

জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

ধর্মপ্রচার

এই কবিতায় বর্ণিত ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

কলিকাতার এক বাসায়

ওই শোনো ভাই বিশু,
পথে শুনি 'জয় যিশু'!
কেমনে এ নাম করিব সহ্য
আমরা আর্যশিশু!

কূর্ম, কল্কি, স্কন্দ
এখন করো তো বন্ধ।
যদি যিশু ভজে রবে না ভারতে
পুরাণের নামগন্ধ।

ওই দেখো ভাই, শুনি—
যাজ্ঞবল্ক্য মুনি,
বিষ্ণু, হারীত, নারদ, অত্রি
কেঁদে হল খুনোখুনি!

কোথায় রহিল কর্ম,
কোথা সনাতন ধর্ম!
সম্প্রতি তবু কিছু শোনা যায়
বেদ-পুরাণের মর্ম!

ওঠো, ওঠো ভাই, জাগো,
মনে মনে খুব রাগো!
আর্যশাস্ত্র উদ্ধার করি,
কোমর বাঁধিয়া লাগো!

কাছাকোঁচা লও আঁটি,
হাতে তুলে লও লাঠি।
হিন্দুধর্ম করিব রক্ষা,
খৃষ্টানি হবে মাটি।

কোথা গেল ভাই ভজা
হিন্দুধর্মধ্বজা?
ষণ্ডা ছিল সে, সে যদি থাকিত
আজ হত দুশো মজা!

এসো মোনো, এসো ভুতো,
প'রে লও বুট জুতো।
পাদ্রি বেটার পা মাড়িয়ে দিয়ো
পাও যদি কোনো ছুতো!

আগে দেব দুয়ো তালি,
তার পরে দেব গালি।
কিছু না বলিলে পড়িব তখন
বিশ-পঁচিশ বাঙালি।

তুমি আগে যেয়ো তেড়ে,
আমি নেব টুপি কেড়ে।
গোলেমালে শেষে পাঁচজনে প'ড়ে
মাটিতে ফেলিয়ো পেড়ে।

কাঁচি দিয়ে তার চুল
কেটে দেব বিলকুল।
কোটের বোতাম আগাগোড়া তার
করে দেব নির্মূল।

তবে উঠ, সবে উঠ—
বাঁধো কটি, আঁটো মুঠো।

দেখো, ভাই, যেন ভুলো না, অমনি
সাথে নিয়ো লাঠি দুটো!

দলপতির শিস ও গান :

প্রাণসই রে,
মনোজ্বালা কারে কই রে!

কোমরে চাদর বাঁধিয়া, লাঠি হস্তে, মহোৎসাহে সকলের প্রস্থান।
পথে বিশু হারু মোনো ভুতোর সমাগম। গেরুয়াবস্ত্রাচ্ছাদিত অনাবৃতপদ
মুক্তিফৌজের প্রচারক :

ধন্য হউক তোমার প্রেম,
ধন্য তোমার নাম,
ভুবন-মাঝারে হউক উদয়
নূতন জেরুজিলাম।
ধরণী হইতে যাক ঘৃণাদ্বেষ,
নিঠুরতা দূর হোক—
মুছে দাও, প্রভু, মানবের আঁখি,
ঘুচাও মরণশোক।
তৃষিত যাহারা, জীবনের বারি
করো তাহাদের দান!
দয়াময় যিশু, তোমার দয়ায়
পাপীজনে করো ত্রাণ।

'ওরে ভাই বিশু, এ কে,
জুতো কোথা এল রেখে!
গোরা বটে, তবু হতেছে ভরসা
গেরুয়া বসন দেখে।'

'হারু, তবে তুই এগো!
বল্‌—বাছা, তুমি কে গো!
কিচিমিচি রাখো, খিদে পেয়েছে কি?
দুটো কলা এনে দে গো!'

বধির নিদয় কঠিন হৃদয়
তারে প্রভু দাও কোল!
অক্ষম আমি কী করিতে পারি—
'হরিবোল হরিবোল!'

'আরে, রেখে দাও খৃষ্ট!
এখনি দেখাও পৃষ্ঠ!
দাঁড়ে উঠে চড়ো, পড়ো বাবা পড়ো
হরে হরে হরে কৃষ্ট!'

তুমি যা সয়েছ তাহাই স্মরিয়া
সহিব সকল ক্লেশ,
ক্রুস গুরুভার করিব বহন—
'বেশ, বাবা, বেশ বেশ!'

দাও ব্যথা, যদি কারো মুছে পাপ
আমার নয়ননীরে।
প্রাণ দিব, যদি এ জীবন দিলে
পাপীর জীবন ফিরে।
আপনার জন, আপনার দেশ,
হয়েছি সর্ব-ত্যাগী।
হৃদয়ের প্রেম সব ছেড়ে যায়
তোমার প্রেমের লাগি।

সুখ, সভ্যতা, রমণীর প্রেম,
বন্ধুর কোলাকুলি—
ফেলি দিয়া পথে তব মহাব্রত
মাথায় লয়েছি তুলি।
এখনো তাদের ভুলিতে পারি নে,
মাঝে মাঝে জাগে প্রাণে—
চিরজীবনের সুখবন্ধন
সেই গৃহ-মাঝে টানে।
তখন তোমার রক্তসিক্ত
ওই মুখপানে চাহি,
ও প্রেমের কাছে স্বদেশ বিদেশ
আপনা ও পর নাহি।
ওই প্রেম তুমি করো বিতরণ
আমার হৃদয় দিয়ে,
বিষ দিতে যারা এসেছে তাহারা
ঘরে যাক সুধা নিয়ে।
পাপ লয়ে প্রাণে এসেছিল যারা
তাহারা আসুক বুকে—
পড়ুক প্রেমের মধুর আলোক
ভ্রূকুটিকুটিল মুখে!

'আর প্রাণে নাহি সহে,
আর্যরক্ত দহে!'
'ওহে হারু, ওহে মাধু, লাঠি নিয়ে
ঘা-কতক দাও তো হে!'
'যদি চাস তুই ইষ্ট
বল্‌ মুখে বল্‌ কৃষ্ট।'

ধন্য হউক তোমার নাম
দয়াময় যিশুখৃষ্ট!
'তবে রে! লাগাও লাঠি
কোমরে কাপড় আঁটি।'
'হিন্দুধর্ম হউক রক্ষা
খৃষ্টানি হোক মাটি!'

প্রচারকের মাথায় লাঠি প্রহার। মাথা ফাটিয়া রক্তপাত। রক্ত মুছিয়া .

প্রভু তোমাদের করুন কুশল,
দিন তিনি শুভমতি।
আমি তাঁর দীন অধম ভৃত্য,
তিনি জগতের পতি।

'ওরে শিবু, ওরে হারু,
ওরে নুনি, ওরে চারু,
তামাশা দেখার এই কি সময়—
প্রাণে ভয় নেই কারু!'

'পুলিস আসিছে গুঁতা উঁচাইয়া,
এইবেলা দাও দৌড়!'
'ধন্য হইল আর্য ধর্ম,
ধন্য হইল গৌড়!'

ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন।
বাসায় ফিরিয়া :

সাহেব মেরেছি! বঙ্গবাসীর
কলঙ্ক গেছে ঘুচি।
মেজবউ কোথা! ডেকে দাও তারে-
কোথা ছোকা, কোথা লুচি!
এখনো আমার তপ্ত রক্ত
উঠিতেছে উচ্ছ্বসি—
তাড়াতাড়ি আজ লুচি না পাইলে
কী জানি কী ক'রে বসি!
স্বামী যবে এল যুদ্ধ সারিয়া
ঘরে নেই লুচি ভাজা!
আর্যনারীর এ কেমন প্রথা,
সমুচিত দিব সাজা।
যাজ্ঞবল্ক্য অত্রি হারীত
জলে গুলে খেলে সবে—
মারধোর ক'রে হিন্দুধর্ম
রক্ষা করিতে হবে।

কোথা পুরাতন পাতিব্রত্য,
সনাতন লুচি ছোকা—
বৎসরে শুধু সংসারে আসে
একখানি করে খোকা।

৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ

বাসরশয়নে

বর। জীবনে জীবন প্রথম মিলন,
সে সুখের কোথা তুলা নাই।
এসো সব ভুলে আজি আঁখি তুলে
শুধু দুঁহু দোঁহা-মুখ চাই।
মরমে মরমে শরমে ভরমে
জোড়া লাগিয়াছে এক ঠাঁই।
যেন এক মোহে ভুলে আছি দোঁহে,
যেন এক ফুলে মধু খাই।
জনম অবধি বিরহে দগধি
এ পরান হয়ে ছিল ছাই—
তোমার অপার প্রেমপারাবার,
জুড়াইতে আমি এনু তাই।
বলো একবার, 'আমিও তোমার,
তোমা ছাড়া কারে নাহি চাই।'
ওঠো কেন, ও কি, কোথা যাও সখী?
কনে। (সরোদনে) আইমার কাছে শুতে যাই!

দুদিন পরে

বর। কেন, সখী, কোণে কাঁদিছ বসিয়া
চোখে কেন জল পড়ে?
উষা কি তাহার শুকতারা-হারা,
তাই কি শিশির ঝরে?
বসন্ত কি নাই, বনলক্ষ্মী তাই
কাঁদিছে আকুল স্বরে?
উদাসিনী স্মৃতি কাঁদিছে কি বসি
আশার সমাধি-'পরে?
খসে-পড়া তারা করিছে কি শোক
নীল আকাশের তরে?
কী লাগি কাঁদিছ?
কনে। পুষি মেনিটিরে
ফেলিয়া এসেছি ঘরে।

অন্দরের বাগানে

বর। কী করিছ বনে শ্যামল শয়নে
আলো করে বসে তরুমূল?
কোমল কপোলে যেন নানা ছলে
উড়ে এসে পড়ে এলোচুল।
পদতল দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
বহে যায় নদী কুলুকুল।
সারা দিনমান শুনি সেই গান
তাই বুঝি আঁখি ঢুলুঢুলু।
আঁচল ভরিয়া মরমে মরিয়া
পড়ে আছে বুঝি ঝরো ফুল?
বুঝি মুখ কার মনে পড়ে, আর
মালা গাঁথিবারে হয় ভুল?
তার কথা বলি বায়ু পড়ে ঢলি,
কানে দুলাইয়া যায় দুল?
গুন্ গুন্ ছলে কার নাম বলে
চঞ্চল যত অলিকুল?
কানন নিরালা, আঁখি হাসি-ঢালা,
মন সুখস্মৃতি-সমাকুল—
কী করিছ বনে কুঞ্জভবনে?

কনে। খেতেছি বসিয়া টোপাকুল।

বর। আসিয়াছি কাছে মনে যাহা আছে
বলিবারে চাহি সমুদয়।
আপনার ভার বহিবারে আর
পারে না ব্যাকুল এ হৃদয়।
আজি মোর মন কী জানি কেমন
বসন্ত আজি মধুময়,
আজি প্রাণ খুলে মালতীমুকুলে
বায়ু করে যায় অনুনয়।
যেন আঁখি দুটি মোর পানে ফুটি
আশা-ভরা দুটি কথা কয়,
ও হৃদয় টুটে যেন প্রেম উঠে
নিয়ে আধো-লাজ আধো-ভয়।
তোমার লাগিয়া পরান জাগিয়া
দিবসরজনী সারা হয়,
কোন্ কাজে তব দিবে তার সব
তারি লাগি যেন চেয়ে রয়।
জগৎ ছানিয়া কী দিব আনিয়া
জীবন যৌবন করি ক্ষয়?
তোমা তরে, সখী, বলো করিব কী?

কনে। আরো কুল পাড়ো গোটা ছয়।

১।২৬

বর। তবে যাই সখী, নিরাশাকাতর
শূন্য জীবন নিয়ে।
আমি চলে গেলে এক ফোঁটা জল
পড়িবে কি আঁখি দিয়ে?
বসন্তবায়ু মায়ানিশ্বাসে
বিরহ জ্বালাবে হিয়ে?
ঘুমন্তপ্রায় আকাঙ্ক্ষা যত
পরানে উঠিবে জিয়ে?
বিষাদিনী বসি বিজন বিপিনে
কী করিবে তুমি প্রিয়ে?
বিরহের বেলা কেমনে কাটিবে?
কনে। দেব পুতুলের বিয়ে।

গাজিপুর
২৩ আষাঢ় ১৮৮৮

প্রকাশবেদনা

আপন প্রাণের গোপন বাসনা
টুটিয়া দেখাতে চাহি রে—
হৃদয়বেদনা হৃদয়েই থাকে,
ভাষা থেকে যায় বাহিরে।

শুধু কথার উপরে কথা,
নিষ্ফল ব্যাকুলতা।
বুঝিতে বোঝাতে দিন চলে যায়,
ব্যথা থেকে যায় ব্যথা।

মর্মবেদন আপন আবেগে
স্বর হয়ে কেন ফোটে না?
দীর্ণ হৃদয় আপনি কেন রে
বাঁশি হয়ে বেজে ওঠে না?

আমি চেয়ে থাকি শুধু মুখে
ক্রন্দনহারা দুখে;
শিরায় শিরায় হাহাকার কেন
ধ্বনিয়া উঠে না বুকে?

অরণ্য যথা চিরনিশিদিন
শুধু মর্মর স্বনিছে,
অনন্ত কালের বিজন বিরহ
সিন্ধু-মাঝারে ধ্বনিছে—

যদি ব্যাকুল ব্যথিত প্রাণ
তেমনি গাহিত গান
চিরজীবনের বাসনা তাহার
হইত মূর্তিমান!

তীরের মতন পিপাসিত বেগে
ক্রন্দনধ্বনি ছুটিয়া
হৃদয় হইতে হৃদয়ে পশিত,
মর্মে রহিত ফুটিয়া।

আজ মিছে এ কথার মালা,
মিছে এ অশ্রু ঢালা!
কিছু নেই পোড়া ধরণী-মাঝারে
বোঝাতে মর্মজ্বালা!

সোলাপুর
৬ বৈশাখ ১৮৮৯

মায়া

বৃথা এ বিড়ম্বনা!
কিসের লাগিয়া এতই তিয়াষ,
কেন এত যন্ত্রণা!

ছায়ার মতন ভেসে চলে যায়
দরশন পরশন—
এই যদি পাই, এই ভুলে যাই,
তৃপ্তি না মানে মন।
কত বার আসে, কত বার ভাসে,
মিশে যায় কত বার—
পেলেও যেমন না পেলে তেমন
শুধু থাকে হাহাকার।
সন্ধ্যাপবনে কুঞ্জভবনে
নির্জন নদীতীরে
ছায়ার মতন হৃদয়বেদন
ছায়ার লাগিয়া ফিরে।

কত দেখাশোনা কত আনাগোনা
চারি দিকে অবিরত,
শুধু তারি মাঝে একটি কে আছে
তারি তরে ব্যথা কত!
চিরদিন ধ'রে এমনি চলিছে,
যুগ-যুগ গেছে চ'লে।

মানবের মেলা করে গেছে খেলা
এই ধরণীর কোলে!
এই ছায়া লাগি কত নিশি জাগি
কাঁদায়েছে কাঁদিয়াছে—
মহাসুখ মানি প্রিয়তনুখানি
বাহুপাশে বাঁধিয়াছে!
নিশিদিন কত ভেবেছে সতত
নিয়ে কার হাসি কথা!
কোথা তারা আজ— সুখ দুখ লাজ,
কোথা তাহাদের ব্যথা?
কোথা সেদিনের অতুলরূপসী
হৃদয়প্রেয়সীচয়?
নিখিলের প্রাণে ছিল যে জাগিয়া,
আজ সে স্বপনও নয়!
ছিল সে নয়নে অধরের কোণে
জীবন মরণ কত—
বিকচ সরস তনুর পরশ
কোমল প্রেমের মতো!
এত সুখ দুখ তীব্র কামনা
জাগরণ হা-হুতাশ
যে রূপজ্যোতিরে সদা ছিল ঘিরে
কোথা তার ইতিহাস?
যমুনার ঢেউ সন্ধ্যারঙিন
মেঘখানি ভালোবাসে—
এও চলে যায়, সেও চলে যায়,
অদৃষ্ট বসে হাসে।

রোজ্ ব্যাঙ্ক্। খিরকি
১ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৯

বর্ষার দিনে

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়!
এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জন চারি ধার।
দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী,
আকাশে জল ঝরে অনিবার।
জগতে কেহ যেন নাহি আর।

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।
কেবল আঁখি দিয়ে   আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব।
আঁধারে মিশে গেছে আর সব।

বলিতে বাজিবে না নিজ কানে,
চমক লাগিবে না নিজ প্রাণে।
সে কথা আঁখিনীরে   মিশিয়া যাবে ধীরে
এ ভরা বাদলের মাঝখানে।
সে কথা মিশে যাবে দুটি প্রাণে।

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার
নামাতে পারি যদি মনোভার?
শ্রাবণবরিষনে   একদা গৃহকোণে
দুকথা বলি যদি কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার?

আছে তো তার পরে বারো মাস,
উঠিবে কত কথা কত হাস।
আসিবে কত লোক   কত-না দুখশোক,
সে কথা কোন্‌খানে পাবে নাশ।
জগৎ চলে যাবে বারো মাস।

ব্যাকুল বেগে আজি বহে যায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে   রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।

জোড়াসাঁকো। খিড়কি
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৯

মেঘের খেলা

স্বপ্ন যদি হ'ত জাগরণ,
সত্য যদি হ'ত কল্পনা,
তবে এ ভালোবাসা   হ'ত না হত-আশা
কেবল কবিতার জল্পনা।

মেঘের খেলা-সম হ'ত সব
মধুর মায়াময় ছায়াময়।

কেবল আনাগোনা, নীরবে জানাশোনা,
জগতে কিছু আর কিছু নয়।

কেবল মেলামেশা গগনে,
সুনীল সাগরের পরপারে
সুদূরে ছায়াগিরি তাহারে ঘিরি ঘিরি,
শ্যামল ধরণীর ধারে ধারে।

কখনো ধীরে ধীরে ভেসে যায়,
কখনো মিশে যায় ভাঙিয়া—
কখনো ঘননীল বিজুলি-ঝিলিমিল,
কখনো উষারাগে রাঙিয়া।

যেমন প্রাণপণ বাসনা
তেমনি বাধা তার সুকঠিন—
সকলি লঘু হয়ে কোথায় যেত বয়ে,
ছায়ার মতো হ'ত কায়াহীন।

চাঁদের আলো হ'ত সুখহাস,
অশ্রু শরতের বরষন।
সাক্ষী করি বিধু মিলন হত মৃদু
কেবল প্রাণে প্রাণে পরশন।

শান্তি পেত এই চিরতৃষা
চিত্ত চঞ্চল সকাতর,
প্রেমের থরে থরে বিরাম জাগিত রে—
দুখের ছায়া-মাঝে রবিকর।

রোজ্ ব্যাঙ্ক্। খিরকি
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৯

ধ্যান

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি;
তুমি আছ মোর জীবন মরণ
হরণ করি।

তোমার পাই নে কূল—
আপনা-মাঝারে আপনার প্রেম
তাহারো পাই নে তুল।

উদয়শিখরে সূর্যের মতো
সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষ-নিহত
একটি নয়ন-সম—
অগাধ অপার উদাস দৃষ্টি,
নাহিকো তাহার সীমা।
তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দপূর্ণিমা।
তুমি প্রশান্ত চিরনিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরামবিহীন
চঞ্চল অনিবার—
যত দূর হেরি দিক্‌দিগন্তে
তুমি আমি একাকার।

জোড়াসাঁকো
১৬ শ্রাবণ ১৮৮৯

পূর্বকালে

প্রাণমন দিয়ে ভালোবাসিয়াছে
এত দিন এত লোক,
এত কবি এত গেঁথেছে প্রেমের শ্লোক,
তবু তুমি ভবে চিরগৌরবে
ছিলে না কি একেবারে
হৃদয় সবার করি অধিকার!
তোমা ছাড়া কেহ কারে
বুঝিতে পারি নে ভালো কি বাসিতে পারে!

গিয়েছে এসেছে কেঁদেছে হেসেছে
ভালো তো বেসেছে তারা,
আমি তত দিন কোথা ছিনু দলছাড়া?
ছিনু বুঝি বসে কোন্ এক পাশে
পথপাদপের ছায়,
সৃষ্টিকালের প্রত্যুষ হতে
তোমারি প্রতীক্ষায়—
চেয়ে দেখি কত পথিক চলিয়া যায়।

অনাদি বিরহবেদনা ভেদিয়া
ফুটেছে প্রেমের সুখ
যেমনি আজিকে দেখেছি তোমার মুখ।

সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে,
তাই তো আমার মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে!
এ প্রেম আমার সুখ নহে, দুখ নহে।

জোড়াসাঁকো
২ ভাদ্র ১৮৮৯

অনন্ত প্রেম

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শত রূপে শত বার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার,
কত রূপ ধরে পরেছ গলায়,
নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।

যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতি পুরাতন বিরহমিলন-কথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমিররজনী ভেদিয়া
তোমারি মুরতি এসে,
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়নসলিলে,
মিলনমধুর লাজে—
পুরাতন প্রেম নিত্যনূতন সাজে।

আজি সেই চিরদিবসের প্রেম
অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।

নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ,
নিখিল প্রাণের প্রীতি,
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি—
সকল কালের সকল কবির গীতি।

জোড়াসাঁকো
২ ভাদ্র ১৮৮৯

আশঙ্কা

কে জানে এ কি ভালো!
আকাশ-ভরা কিরণধারা
আছিল মোর তপন-তারা,
আজিকে শুধু একেলা তুমি
আমার আঁখি-আলো—
কে জানে এ কি ভালো!

কত-না শোভা, কত-না সুখ,
কত-না ছিল অমিয়-মুখ,
নিত্য-নব পুষ্পরাশি
ফুটিত মোর দ্বারে—
ক্ষুদ্র আশা ক্ষুদ্র স্নেহ
মনের ছিল শতেক গেহ,
আকাশ ছিল, ধরণী ছিল
আমার চারি ধারে—
কোথায় তারা, সকলে আজি
তোমাতেই লুকালো।
কে জানে এ কি ভালো!

কম্পিত এ হৃদয়খানি
তোমার কাছে তাই।
দিবসনিশি জাগিয়া আছি,
নয়নে ঘুম নাই।
সকল গান সকল প্রাণ
তোমারে আমি করেছি দান—
তোমারে ছেড়ে বিশ্বে মোর
তিলেক নাহি ঠাঁই।

সকল পেয়ে তবুও যদি
তৃপ্তি নাহি মেলে,
তবুও যদি চলিয়া যাও
আমারে পাছে ফেলে,

নিমেষে সব শূন্য হবে
তোমারি এই আসন ভবে,
চিহ্নসম কেবল রবে
মৃত্যু-রেখা কালো।
কে জানে এ কি ভালো!

জোড়াসাঁকো
১৪ ভাদ্র ১৮৮৯

ভালো করে বলে যাও

ওগো, ভালো করে বলে যাও।
বাঁশরি বাজায়ে যে কথা জানাতে
সে কথা বুঝায়ে দাও।
যদি না বলিবে কিছু, তবে কেন এসে
মুখপানে শুধু চাও!

আজি অন্ধতামসী নিশি।
মেঘের আড়ালে গগনের তারা
সবগুলি গেছে মিশি।
শুধু বাদলের বায় করি হায়-হায়
আকুলিছে দশ দিশি!

আমি কুন্তল দিব খুলে।
অঞ্চল-মাঝে ঢাকিব তোমায়
নিশীথনিবিড় চুলে।
দুটি বাহুপাশে বাঁধি নত মুখখানি
বক্ষে লইব তুলে।

সেথা নিভৃত-নিলয়-সুখে
আপনার মনে বলে যেয়ো কথা
মিলনমুদিত বুকে।
আমি নয়ন মুদিয়া শুনিব কেবল,
চাহিব না মুখে মুখে।

যবে ফুরাবে তোমার কথা,
যে যেমন আছি রহিব বসিয়া
চিত্রপুতলি যথা।
শুধু শিয়রে দাঁড়ায়ে করে কানাকানি
মর্মর তরুলতা।

শেষে রজনীর অবসানে
অরুণ উদিলে, ক্ষণেকের তরে

চাব দুঁহু দোঁহা-পানে।
ধীরে ঘরে যাব ফিরে দোঁহে দুই পথে
জলভরা দুনয়ানে।

তবে ভালো করে বলে যাও।
আঁখিতে বাঁশিতে যে কথা ভাষিতে
সে কথা বুঝায়ে দাও।
শুধু কম্পিত সুরে আধো ভাষা পুরে
কেন এসে গান গাও!

শান্তিনিকেতন
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯০

মেঘদূত

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সংগীত-মাঝে পুঞ্জীভূত করে।

সেদিন সে উজ্জয়িনী প্রাসাদশিখরে
কী না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দাম পবনবেগ, গুরুগুরু রব।
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘসংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদক্রন্দন
এক দিনে। ছিন্ন করি কালের বন্ধন
সেই দিন ঝরে পড়েছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি তোমার উদার শ্লোকরাশি।

সেদিন কি জগতের যতেক প্রবাসী
জোড়হস্তে মেঘপানে শূন্যে তুলি মাথা
গেয়েছিল সমস্বরে বিরহের গাথা
ফিরি প্রিয়গৃহপানে? বন্ধনবিহীন
নবমেঘপক্ষ-'পরে করিয়া আসীন
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রেমের বারতা
অশ্রুবাষ্প-ভরা—দূর বাতায়নে যথা
বিরহিণী ছিল শুয়ে ভূতলশয়নে
মুক্ত কেশে, ম্লান বেশে, সজল নয়নে?

তাদের সবার গান তোমার সংগীতে
পাঠায়ে কি দিলে, কবি, দিবসে নিশীথে
দেশে দেশান্তরে, খুঁজি বিরহিণী প্রিয়া?
শ্রাবণে জাহ্নবী যথা যায় প্রবাহিয়া
টানি লয়ে দিশ-দিশান্তের বারিধারা
মহাসমুদ্রের মাঝে হতে দিশাহারা।
পাষাণশৃঙ্খলে যথা বন্দী হিমাচল
আষাঢ়ে অনন্ত শূন্যে হেরি মেঘদল
স্বাধীন, গগনচারী, কাতরে নিশ্বাসি
সহস্র কন্দর হতে বাষ্প রাশি রাশি
পাঠায় গগন-পানে; ধায় তারা ছুটি
উধাও কামনা-সম; শিখরেতে উঠি
সকলে মিলিয়া শেষে হয় একাকার,
সমস্ত গগনতল করে অধিকার।

সেদিনের পরে গেছে কত শতবার
প্রথম দিবস স্নিগ্ধ নববরষার।
প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের 'পরে করি বরিষন
নববৃষ্টিবারিধারা, করিয়া বিস্তার
নবঘনস্নিগ্ধচ্ছায়া, করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের,
স্ফীত করি স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষাতরঙ্গিণী-সম।

কত কাল ধরে
কত সঙ্গীহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে,
বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ততারাশশী
আষাঢ়সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি
ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজনবেদন!
সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি-সম
তব কাব্য হতে।

ভারতের পূর্বশেষে
আমি বসে আজি; যে শ্যামল বঙ্গদেশে
জয়দেব কবি, আর এক বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমালবিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।

আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝরঝর্,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার
খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া।

অন্ধকার রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত; গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশদেশান্তরে। কোথা আছে
সানুমান আম্রকূট; কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপদমূলে
উপলব্যথিতগতি; বেত্রবতীকূলে
পরিণতফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা;
পথতরুশাখে কোথা গ্রামবিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড়, কলরবে ঘিরে
বনস্পতি; না জানি সে কোন্ নদীতীরে
যূথীবনবিহারিণী বনাঙ্গনা ফিরে,
তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল
মেঘের ছায়ার লাগি হতেছে বিকল;
ভ্রূবিলাস শেখে নাই কারা সেই নারী
জনপদবধূজন, গগনে নেহারি
ঘনঘটা, ঊর্ধ্বনেত্রে চাহি মেঘ-পানে,
ঘননীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়ানে;
কোন্ মেঘশ্যামশৈলে মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনা
স্নিগ্ধ নবঘন হেরি আছিল উন্মনা
শিলাতলে, সহসা আসিতে মহা ঝড়
চকিত চকিত হয়ে ভয়ে জড়সড়
সম্বরি বসন ফিরে গুহাশ্রয় খুঁজি,
বলে, 'মা গো, গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি!'
কোথায় অবন্তিপুরী; নির্বিন্ধ্যা তটিনী;
কোথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী
স্বমহিমচ্ছায়া—যেথা নিশি-দ্বিপ্রহরে
প্রণয়চাঞ্চল্য ভুলি ভবনশিখরে
সুপ্ত পারাবত, শুধু বিরহবিকারে
রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে
সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথ-মাঝে
ক্বচিৎ-বিদ্যুতালোকে; কোথা সে বিরাজে
ব্রহ্মাবর্তে কুরুক্ষেত্র; কোথা কন্‌খল,
যেথা সেই জহ্নুকন্যা যৌবনচঞ্চল,

গৌরীর ভ্রূকুটিভঙ্গি করি অবহেলা
ফেনপরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা
লয়ে ধূর্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল।

এইমতো মেঘরূপে ফিরি দেশে দেশে
হৃদয় ভাসিয়া চলে, উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে,
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি। সেথা কে পারিত
লয়ে যেতে, তুমি ছাড়া, করি অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী— অমর ভুবনে!
অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীল শৈলমূলে
সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকূলে
মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা।
মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা
শয্যাপ্রান্তে লীনতনু ক্ষীণ শশীরেখা
পূর্ব গগনের মূলে যেন অস্তপ্রায়।
কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা;
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্তসৌন্দর্য-মাঝে একাকী জাগিয়া।

আবার হারায়ে যায়— হেরি চারি ধার
বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রাম; ঘনায়ে আঁধার
আসিছে নির্জন নিশা; প্রান্তরের শেষে
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকূল-উদ্দেশে।
ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান,
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ?
সশরীরে কোন্‌ নর গেছে সেইখানে,
মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদী গিরি সকলের শেষে!

শান্তিনিকেতন
৭।৮ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯০। অপরাহ্নে। ঘনবর্ষায়

অহল্যার প্রতি

কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি,
অহল্যা, পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি,
নির্বাপিত-হোম-অগ্নি তাপসবিহীন
শূন্য তপোবনচ্ছায়ে? আছিলে বিলীন
বৃহৎ পৃথ্বীর সাথে হয়ে এক-দেহ,
তখন কি জেনেছিলে তার মহাস্নেহ?
ছিল কি পাষাণতলে অস্পষ্ট চেতনা?
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,
মাতৃধৈর্যে মৌন মূক সুখ দুঃখ যত
অনুভব করেছিলে স্বপনের মতো
সুপ্ত আত্মা-মাঝে? দিবারাত্রি অহরহ
লক্ষ কোটি পরানীর মিলন, কলহ,
আনন্দবিষাদক্ষুব্ধ ক্রন্দন গর্জন,
অযুত পান্থের পদধ্বনি অনুক্ষণ—
পশিত কি অভিশাপ নিদ্রা ভেদ করে
কর্ণে তোর? জাগাইয়া রাখিত কি তোরে
নেত্রহীন মূঢ় রূঢ় অর্ধজাগরণে?
বুঝিতে কি পেরেছিলে আপনার মনে
নিত্যনিদ্রাহীন ব্যথা মহাজননীর?
যেদিন বহিত নব বসন্তসমীর,
ধরণীর সর্বাঙ্গের পুলকপ্রবাহ
স্পর্শ কি করিত তোরে? জীবন-উৎসাহ
ছুটিত সহস্র পথে মরুদিগ্বিজয়ে
সহস্র আকারে, উঠিত সে ক্ষুব্ধ হয়ে
তোমার পাষাণ ঘেরি, করিতে নিপাত
অনুর্বরা-অভিশাপ তব, সে আঘাত
জাগাত কি জীবনের কম্প তব দেহে?

যামিনী আসিত যবে মানবের গেহে
ধরণী লইত টানি শ্রান্ত তনুগুলি
আপনার বক্ষ-'পরে; দুঃখশ্রম ভুলি
ঘুমাত অসংখ্য জীব—জাগিত আকাশ—
তাদের শিথিল অঙ্গ, সুষুপ্ত নিশ্বাস
বিভোর করিয়া দিত ধরণীর বুক—
মাতৃ-অঙ্গে সেই কোটিজীবস্পর্শসুখ—
কিছু তার পেয়েছিলে আপনার মাঝে?
যে গোপন অন্তঃপুরে জননী বিরাজে,

বিচিত্রিত যবনিকা পত্রপুষ্পজালে
বিবিধ বর্ণের লেখা, তারি অন্তরালে

রহিয়া অসূর্যম্পশ্য নিত্য চুপে চুপে
ভরিছে সন্তানগৃহ ধনধান্যরূপে
জীবনে যৌবনে, সেই গূঢ় মাতৃকক্ষে
সুপ্ত ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে
চিররাত্রিসুশীতল বিস্মৃতি-আলয়ে
যেথায় অনন্তকাল ঘুমায় নির্ভয়ে
লক্ষ জীবনের ক্লান্তি ধূলির শয্যায়;
নিমেষে নিমেষে যেথা ঝরে পড়ে যায়
দিবসের তাপে শুষ্ক ফুল, দগ্ধ তারা,
জীর্ণ কীর্তি, শ্রান্ত সুখ, দুঃখ দাহহারা।

সেথা স্নিগ্ধ হস্ত দিয়ে পাপতাপরেখা
মুছিয়া দিয়াছে মাতা; দিলে আজি দেখা
ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মতো
সুন্দর, সরল, শুভ্র; হয়ে বাক্যহত
চেয়ে আছ প্রভাতের জগতের পানে।
যে শিশির পড়েছিল তোমার পাষাণে
রাত্রিবেলা, এখন সে কাঁপিছে উল্লাসে
আজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।
যে শৈবাল রেখেছিল ঢাকিয়া তোমায়
ধরণীর শ্যামশোভা অঞ্চলের প্রায়
বহু বর্ষ হতে, পেয়ে বহু বর্ষাধারা
সতেজ সরস ঘন, এখনো তাহারা
লগ্ন হয়ে আছে তব নগ্ন গৌর দেহে
মাতৃদত্ত বস্ত্রখানি সুকোমল স্নেহে।

হাসে পরিচিত হাসি নিখিল সংসার।
তুমি চেয়ে নির্নিমেষ; হৃদয় তোমার
কোন্ দূর কালক্ষেত্রে চলে গেছে একা
আপনার ধূলিলিপ্ত পদচিহ্নরেখা
পদে পদে চিনে চিনে। দেখিতে দেখিতে
চারি দিক হতে সব এল চারি ভিতে
জগতের পূর্ব পরিচয়; কৌতূহলে
সমস্ত সংসার ওই এল দলে দলে
সম্মুখে তোমার; থেমে গেল কাছে এসে
চমকিয়া। বিস্ময়ে রহিল অনিমেষে।

অপূর্ব রহস্যময়ী মূর্তি বিবসন,
নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন—
পূর্ণস্ফুট পুষ্প যথা শ্যামপত্রপুটে
শৈশবে যৌবনে মিশে উঠিয়াছে ফুটে
এক বৃন্তে। বিস্মৃতিসাগর-নীলনীরে

প্রথম উষার মতো উঠিয়াছ ধীরে।
তুমি বিশ্ব-পানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমা-পানে চেয়ে কথা নাহি কয়;
দোঁহে মুখোমুখি। অপাররহস্যতীরে
চিরপরিচয়-মাঝে নব পরিচয়।

শান্তিনিকেতন
১২ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯০

গোধূলি

অন্ধকার তরুশাখা দিয়ে
সন্ধ্যার বাতাস বহে যায়।
আয়, নিদ্রা, আয় ঘনাইয়ে
শ্রান্ত এই আঁখির পাতায়।
কিছু আর নাহি যায় দেখা,
কেহ নাই, আমি শুধু একা—
মিশে যাক জীবনের রেখা
বিস্মৃতির পশ্চিমসীমায়।
নিষ্ফল দিবস অবসান—
কোথা আশা, কোথা গীতগান!
শুয়ে আছে সঙ্গীহীন প্রাণ
জীবনের তটবালুকায়।
দূরে শুধু ধ্বনিছে সতত
অবিশ্রাম মর্মরের মতো,
হৃদয়ের হত আশা যত
অন্ধকারে কাঁদিয়ে বেড়ায়।
আয় শান্তি, আয় রে নির্বাণ,
আয় নিদ্রা, শ্রান্ত প্রাণে আয়!
মূর্ছাহত হৃদয়ের 'পরে
চিরাগত প্রেয়সীর প্রায়
আয়, নিদ্রা, আয়!

সোলাপুর
১ ভাদ্র ১৮৯০

উচ্ছৃঙ্খল

এ মুখের পানে চাহিয়া রয়েছ
কেন গো অমন করে?
তুমি চিনিতে নারিবে, বুঝিতে নারিবে মোরে।
আমি কেঁদেছি হেসেছি ভালো যে বেসেছি
এসেছি যেতেছি সরে
কী জানি কিসের ঘোরে।

কোথা হতে এত বেদনা বহিয়া
এসেছে পরান মম।
বিধাতার এক অর্থবিহীন
প্রলাপবচন-সম
প্রতিদিন যারা আছে সুখে দুখে
আমি তাহাদের নই—
আমি এসেছি নিমেষে, যাইব নিমেষ বই।
আমি আমারে চিনি নে, তোমারে জানি নে,
আমার আলয় কই!

জগৎ বেড়িয়া নিয়মের পাশ,
অনিয়ম শুধু আমি।
বাসা বেঁধে আছে কাছে কাছে সবে,
কত কাজ করে কত কলরবে,
চিরকাল ধরে দিবস চলিছে
দিবসের অনুগামী—
শুধু আমি নিজবেগ সামালিতে নারি
ছুটেছি দিবসযামী।

প্রতিদিন বহে মৃদু সমীরণ,
প্রতিদিন ফুটে ফুল।
ঝড় শুধু আসে ক্ষণেকের তরে
সৃজনের এক ভুল!
দুরন্ত সাধ কাতর বেদনা
ফুকারিয়া উভরায়
আঁধার হইতে আঁধারে ছুটিয়া যায়।

এ আবেগ নিয়ে কার কাছে যাব,
নিতে কে পারিবে মোরে!
কে আমারে পারে আঁকড়ি রাখিতে
দুখানি বাহুর ডোরে!

আমি কেবল কাতর গীত!
কেহ বা শুনিয়া ঘুমায় নিশীথে,
কেহ জাগে চমকিত।
কত-যে বেদনা সে কেহ বোঝে না,
কত-যে আকুল আশা,
কত-যে তীব্র পিপাসাকাতর ভাষা।

ওগো তোমরা জগৎবাসী,
তোমাদের আছে বরষ বরষ
দরশ-পরশ-রাশি—

আমার কেবল একটি নিমেষ,
তারি তরে ধেয়ে আসি।

মহাসুন্দর একটি নিমেষ
ফুটেছে কাননশেষে,
আমি তারি পানে ধাই, ছিঁড়ে নিতে চাই,
ব্যাকুল বাসনা-সংগীত গাই
অসীমকালের আঁধার হইতে
বাহির হইয়া এসে।

শুধু একটি মুখের এক নিমেষের
একটি মধুর কথা,
তারি তরে বহি চিরদিবসের
চিরমনোব্যাকুলতা।
কালের কাননে নিমেষ লুটিয়া
কে জানে চলেছি কোথা!
ওগো, মিটে না তাহাতে মিটে না প্রাণের ব্যথা।

অধিক সময় নাই।
ঝড়ের জীবন ছুটে চলে যায়
শুধু কেঁদে 'চাই চাই'—
যার কাছে আসি তার কাছে শুধু
হাহাকার রেখে যাই।

ওগো, তবে থাক্, যে যায় সে যাক—
তোমরা দিয়ো না ধরা!
আমি চলে যাব ত্বরা!
মোরে কেহ কোরো ভয়, কেহ কোরো ঘৃণা,
ক্ষমা কোরো যদি পারো!
বিস্মিত চোখে ক্ষণেক চাহিয়া
তার পরে পথ ছাড়ো!

তার পরদিনে উঠিবে প্রভাত,
ফুটিবে কুসুম কত,
নিয়মে চলিবে নিখিল জগৎ
প্রতিদিবসের মতো।
কোথাকার এই শৃঙ্খল-ছেঁড়া
সৃষ্টি-ছাড়া এ ব্যথা

কাঁদিয়া কাঁদিয়া, গাহিয়া গাহিয়া,
অজানা আঁধার-সাগর বাহিয়া,
মিশায়ে যাইবে কোথা!
এক রজনীর প্রহরের মাঝে
ফুরাবে সকল কথা।

সোলাপুর
৫ ভাদ্র ১৮৯০

আগন্তুক

ওগো সুখী প্রাণ, তোমাদের এই
ভব-উৎসব-ঘরে
অচেনা অজানা পাগল অতিথি
এসেছিল ক্ষণতরে।
ক্ষণেকের তরে বিস্ময়-ভরে
চেয়েছিল চারি দিকে
বেদনা-বাসনা-ব্যাকুলতা-ভরা
তৃষাতুর অনিমিখে।
উৎসববেশ ছিল না তাহার,
কণ্ঠে ছিল না মালা,
কেশপাশ দিয়ে বাহিরিতেছিল
দীপ্ত অনলজ্বালা।
তোমাদের হাসি তোমাদের গান
থেমে গেল তারে দেখে—
শুধালে না কেহ পরিচয় তার,
বসালে না কেহ ডেকে।
কী বলিতে গিয়ে বলিল না আর,
দাঁড়ায়ে রহিল দ্বারে—
দীপালোক হতে বাহিরিয়া গেল
বাহির-অন্ধকারে।
তার পরে কেহ জান কি তোমরা
কী হইল তার শেষে?
কোন্ দেশ হতে এসে চলে গেল
কোন্ গৃহহীন দেশে?

সোলাপুর
৫ ভাদ্র ১৮৯০

বিদায়

অকূল সাগর-মাঝে চলেছে ভাসিয়া
জীবনতরণী। ধীরে লাগিছে আসিয়া
তোমার বাতাস, বহি আনি কোন্ দূর
পরিচিত তীর হতে কত সুমধুর
পুষ্পগন্ধ, কত সুখস্মৃতি, কত ব্যথা,
আশাহীন কত সাধ, ভাষাহীন কথা।
সম্মুখেতে তোমারি নয়ন জেগে আছে
আসন্ন আঁধার-মাঝে অস্তাচল-কাছে
স্থির ধ্রুবতারা-সম ; সেই অনিমেষ
আকর্ষণে চলেছি কোথায়, কোন্ দেশ,
কোন্ নিরুদ্দেশ-মাঝে! এমনি করিয়া
চিহ্নহীন পথহীন অকূল ধরিয়া
দূর হতে দূরে ভেসে যাব— অবশেষে
দাঁড়াইব দিবসের সর্বপ্রান্তদেশে
এক মুহূর্তের তরে— সারাদিন ভেসে
মেঘখণ্ড যথা রজনীর তীরে এসে
দাঁড়ায় থমকি। ওগো, বারেক তখন
জীবনের খেলা রেখে করুণ নয়ন
পাঠায়ো পশ্চিম-পানে, দাঁড়ায়ো একাকী
ওই দূর তীরদেশে অনিমেষ-আঁখি
মুহূর্তে আঁধার নামি দিবে সব ঢাকি
বিদায়ের পথ ; তোমার অজ্ঞাত দেশে
আমি চলে যাব ; তুমি ফিরে যেয়ো হেসে
সংসারের খেলাঘরে, তোমার নবীন
দিবালোকে। অবশেষে যবে একদিন—
বহুদিন পরে— তোমার জগৎ-মাঝে
সন্ধ্যা দেখা দিবে, দীর্ঘ জীবনের কাজে
প্রমোদের কোলাহলে শ্রান্ত হবে প্রাণ,
মিলায়ে আসিবে ধীরে স্বপন-সমান
চিররৌদ্রদগ্ধ এই কঠিন সংসার,
সেইদিন এইখানে আসিয়ো আবার ;
এই তটপ্রান্তে বসে শ্রান্ত দুনয়ানে
চেয়ে দেখো ওই অস্ত-অচলের পানে
সন্ধ্যার তিমিরে, যেথা সাগরের কোলে
আকাশ মিশায়ে গেছে, দেখিবে তা হলে
আমার সে বিদায়ের শেষ চেয়ে-দেখা
এইখানে রেখে গেছে জ্যোতির্ময় রেখা।
সে অমর অশ্রুবিন্দু সন্ধ্যাতারকার
বিষণ্ণ আকার ধরি উদিবে তোমার
নিদ্রাতুর আঁখি-'পরে ; সারা রাত্রি ধরে

তোমার সে জনহীন বিশ্রামশিয়রে
একাকী জাগিয়া রবে। হয়তো স্বপনে
ধীরে ধীরে এনে দেবে তোমার স্মরণে
জীবনের প্রভাতের দু-একটি কথা।
এক ধারে সাগরের চিরচঞ্চলতা
তুলিবে অস্ফুট ধ্বনি, রহস্য অপার,
অন্য ধারে ঘুমাইবে সমস্ত সংসার।

কোর্নোভল টেরেস। লন্ডন
আশ্বিন ১৮৯০। রাত্রি

সন্ধ্যায়

ওগো, তুমি অমনি সন্ধ্যার মতো হও।
সুদূর পশ্চিমাচলে কনক-আকাশতলে
অমনি নিস্তব্ধ চেয়ে রও।
অমনি সুন্দর শান্ত অমনি করুণ কান্ত
অমনি নীরব উদাসিনী,
ওইমতো ধীরে ধীরে আমার জীবনতীরে
বারেক দাঁড়াও একাকিনী।
জগতের পরপারে নিয়ে যাও আপনারে
দিবসনিশার প্রান্তদেশে।
থাক্ হাস্য-উৎসব, না আসুক কলরব
সংসারের জনহীন শেষে।
এসো তুমি চুপে চুপে শ্রান্তিরূপে, নিদ্রারূপে,
এসো তুমি নয়ন-আনত।
এসো তুমি ম্লান হেসে দিবাদগ্ধ আয়ুশেষে
মরণের আশ্বাসের মতো।
আমি শুধু চেয়ে থাকি অশ্রুহীন শ্রান্ত-আঁখি,
পড়ে থাকি পৃথিবীর 'পরে—
খুলে দাও কেশভার, ঘনস্নিগ্ধ অন্ধকার
মোরে ঢেকে দিক স্তরে স্তরে।
রাখো এ কপালে মম নিদ্রার আবেশ-সম
হিমস্নিগ্ধ করতলখানি।
বাক্যহীন স্নেহভরে অবশ দেহের 'পরে
অঞ্চলের প্রান্ত দাও টানি।
তার পরে পলে পলে করুণার অশ্রুজলে
ভরে যাক নয়নপল্লব।
সেই স্তব্ধ আকুলতা গভীর বিদায়ব্যথা
কায়মনে করি অনুভব।

রেড সী
৭ কার্তিক ১৮৯০

শেষ উপহার

আমি রাত্রি, তুমি ফুল। যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি
জাগিয়া চাহিয়া ছিনু আঁধার আকাশ জুড়ি
সমস্ত নক্ষত্র নিয়ে, তোমারে লুকায়ে বুকে।
যখন ফুটিলে তুমি সুন্দর তরুণ মুখে,
তখনি প্রভাত এল, ফুরালো আমার কাল;
আলোকে ভাঙিয়া গেল রজনীর অন্তরাল।
এখন বিশ্বের তুমি; গুন্ গুন্ মধুকর
চারি দিকে তুলিয়াছে বিস্ময়ব্যাকুল স্বর;
গাহে পাখি, বহে বায়ু; প্রমোদহিল্লোলধারা
নবস্ফুট জীবনেরে করিতেছে দিশাহারা।
এত আলো, এত সুখ, এত গান, এত প্রাণ
ছিল না আমার কাছে— আমি করেছিনু দান
শুধু নিদ্রা, শুধু শান্তি, সযতন নীরবতা,
শুধু চেয়ে-থাকা আঁখি, শুধু মনে মনে কথা।

আর কি দিই নি কিছু? প্রলুব্ধ প্রভাত যবে
চাহিল তোমার পানে, শত পাখি শত রবে
ডাকিল তোমার নাম, তখন পড়িল ঝ'রে
আমার নয়ন হতে তোমার নয়ন-'পরে
একটি শিশিরকণা। চলে গেনু পরপার।
সেই বিষাদের বিন্দু, বিদায়ের উপহার,
প্রখর প্রমোদ হতে রাখিবে শীতল ক'রে
তোমার তরুণ মুখ; রজনীর অশ্রু-'পরে
পড়ি প্রভাতের হাসি দিবে শোভা অনুপম,
বিকচ সৌন্দর্য তব করিবে সুন্দরতম।

রেড সী
১ কার্তিক ১৮৯০

মৌন ভাষা

থাক্ থাক্, কাজ নাই, বলিয়ো না কোনো কথা।
চেয়ে দেখি, চলে যাই, মনে মনে গান গাই,
মনে মনে রচি বসে কত সুখ কত ব্যথা।
বিরহী পাখির প্রায় অজানা কানন-ছায়
উড়িয়া বেড়াক সদা হৃদয়ের কাতরতা—
তারে বাঁধিয়ো না ধরে, বলিয়ো না কোনো কথা।

আঁখি দিয়ে যাহা বল সহসা আসিয়া কাছে
সেই ভালো, থাক্ তাই, তার বেশি কাজ নাই—
কথা দিয়ে বল যদি মোহ ভেঙে যায় পাছে।

এত মৃদু এত আধো অশ্রুজলে বাধো-বাধো
শরমে-সভয়ে-ম্লান এমন কি ভাষা আছে?
কথায় বোলো না তাহা আঁখি যাহা বলিয়াছে।

তুমি হয়তো বা পার আপনারে বুঝাইতে—
মনের সকল ভাষা প্রাণের সকল আশা
পার তুমি গেঁথে গেঁথে রচিতে মধুর গীতে।
আমি তো জানি নে মোরে, দেখি নাই ভালো করে
মনের সকল কথা পশিয়া আপন চিতে—
কী বুঝিতে কী বুঝেছি, কী বলিব কী বলিতে।

তবে থাক্। ওই শোনো, অন্ধকারে শোনা যায়
জলের কল্লোলস্বর পল্লবের মরমর—
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শুনিয়া শিহরে কায়।
আরো ঊর্ধ্বে দেখো চেয়ে অনন্ত আকাশ ছেয়ে
কোটি কোটি মৌন দৃষ্টি তারকায় তারকায়।
প্রাণপণ দীপ্ত ভাষা জ্বালিয়া ফুটিতে চায়।

এসো চুপ করে শুনি এই বাণী স্তব্ধতার
এই অরণ্যের তলে কানাকানি জলে স্থলে,
মনে করি হল বলা ছিল যাহা বলিবার।
হয়তো তোমার ভাবে তুমি এক বুঝে যাবে,
আমার মনের মতো আমি বুঝে যাব আর—
নিশীথের কণ্ঠ দিয়ে কথা হবে দুজনার।

মনে করি দুটি তারা জগতের এক ধারে
পাশাপাশি কাছাকাছি তৃষাতুর চেয়ে আছি,
চিনিতেছি চিরযুগ, চিনি নাকো কেহ কারে।
দিবসের কোলাহলে প্রতিদিন যাই চলে,
ফিরে আসি রজনীর ভাষাহীন অন্ধকারে—
বুঝিবার নহে যাহা চাই তাহা বুঝিবারে।

তোমার সাহস আছে, আমার সাহস নাই।
এই-যে শঙ্কিত আলো অন্ধকারে জ্বলে ভালো,
কে বলিতে পারে বলো যাহা চাও এ কি তাই!
তবে ইহা থাক্ দূরে কল্পনার স্বপ্নপুরে,
যার যাহা মনে লয় তাই মনে করে যাই—
এই চির-আবরণ খুলে ফেলে কাজ নাই।

এসো তবে বসি হেথা, বলিয়ো না কোনো কথা।
নিশীথের অন্ধকারে ঘিরে দিক দুজনারে,
আমাদের দুজনের জীবনের নীরবতা।

দুজনের কোলে বুকে আঁধারে বাড়ুক সুখে
দুজনের এক শিশু জনমের মনোব্যথা।
তবে আর কাজ নাই, বলিয়ো না কোনো কথা।

রেড সী
১০ কার্তিক ১৮৯০

আমার সুখ

ভালোবাসা-ঘেরা ঘরে কোমল শয়নে তুমি
যে সুখেই থাকো,
যে মাধুরী এ জীবনে আমি পাইয়াছি তাহা
তুমি পেলে নাকো।
এই-যে অলস বেলা, অলস মেঘের মেলা,
জলেতে আলোতে খেলা সারা দিনমান,
এরি মাঝে চারি পাশে কোথা হতে ভেসে আসে
ওই মুখ, ওই হাসি, ওই দুনয়ান।
সদা শুনি কাছে দূরে মধুর কোমল সুরে
তুমি মোরে ডাকো—
তাই ভাবি, এ জীবনে আমি যাহা পাইয়াছি
তুমি পেলে নাকো।

কোনোদিন একদিন আপনার মনে, শুধু
এক সন্ধ্যাবেলা,
আমারে এমনি করে ভাবিতে পারিতে যদি
বসিয়া একেলা—
এমনি সুদূরে বাঁশি শ্রবণে পশিত আসি,
বিষাদকোমল হাসি ভাসিত অধরে,
নয়নে জলের রেখা এক বিন্দু দিত দেখা,
তারি 'পরে সন্ধ্যালোক কাঁপিত কাতরে—
ভেসে যেত মনখানি কনকতরণী-সম
গৃহহীন স্রোতে—
শুধু একদিন তরে আমি ধন্য হইতাম
তুমি ধন্য হতে।

তুমি কি করেছ মনে দেখেছ, পেয়েছ তুমি
সীমারেখা মম?
ফেলিয়া দিয়াছ মোরে আদি অন্ত শেষ করে
পড়া পুঁথি-সম?
নাই সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে,
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।

আমারেও দিয়ে তুমি এ বিপুল বিশ্বভূমি
এ আকাশ এ বাতাস দিতে পারো ভরে।
আমাতেও স্থান পেত অবাধে সমস্ত তব
জীবনের আশা।
একবার ভেবে দেখো এ পরানে ধরিয়াছে
কত ভালোবাসা।

সহসা কী শুভক্ষণে অসীম হৃদয়রাশি
দৈবে পড়ে চোখে।
দেখিতে পাও নি যদি, দেখিতে পাবে না আর,
মিছে মরি বকে!
আমি যা পেয়েছি তাই সাথে নিয়ে ভেসে যাই,
কোনোখানে সীমা নাই ও মধু মুখের—
শুধু স্বপ্ন, শুধু স্মৃতি, তাই নিয়ে থাকি নিতি,
আর আশা নাহি রাখি সুখের দুখের।
আমি যাহা দেখিয়াছি, আমি যাহা পাইয়াছি
এ জনম-সই,
জীবনের সব শূন্য আমি যাহে ভরিয়াছি
তোমার তা কই!

রেড সী
১১ কার্তিক ১৮৯০

সংযোজন

নিষ্ফল উপহার

নিম্নে আবর্তিয়া ছুটে যমুনার জল—
দুই তীরে গিরিতট, উচ্চ শিলাতল!
সংকীর্ণ গুহার পথে মূর্ছি জলধার
উন্মত্ত প্রলাপে ওঠে গর্জি অনিবার।

এলায়ে জটিল বক্র নির্ঝরের বেণী
নীলাভ দিগন্তে ধায় নীল গিরিশ্রেণী।
স্থির তাহা, নিশিদিন তবু যেন চলে—
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।

মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে,
মেঘেরে ডাকিছে গিরি ইঙ্গিত বাড়ায়ে।
তৃণহীন সুকঠিন শতদীর্ণ ধরা,
রৌদ্রবর্ণ বনফুলে কাঁটাগাছ ভরা।

দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে—
পথশূন্য, জনশূন্য, সাড়া-শব্দ-হীন।
ডুবে রবি, যেমন সে ডুবে প্রতিদিন।

রঘুনাথ হেথা আসি যবে উত্তরিলা,
শিখগুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা।
রঘু কহিলেন নমি চরণে তাঁহার,
"দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার।"

বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধায়ে কুশল
আশিসিলা মাথায় পরশি করতল।
কনকে মাণিক্যে গাঁথা বলয় দুখানি
গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি দুই পাণি।

ভূমিতল হতে বালা লইলেন তুলে,
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে অঙ্গুলে।
হীরকের সূচিমুখ শতবার ঘুরি
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি।

ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিলা রাখি,
আবার সে পুঁথি-'পরে নিবেশিলা আঁখি।

সহসা একটি বালা শিলাতল হতে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।

"আহা আহা" চীৎকার করি রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু হাত
আগ্রহে সমস্ত তার প্রাণ মন কায়
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায়।

বারেকের তরে গুরু না তুলিলা মুখ,
নিভৃত অন্তরে তাঁর জাগে পাঠ-সুখ।
কালো জল কটাক্ষিয়া চলে ঘুরি ঘুরি,
যেন সে ছলনা-ভরা সুগভীর চুরি।

দিবালোক চলে গেল দিবসের পিছু,
যমুনা উতলা করি না মিলিল কিছু।
সিক্ত বস্ত্রে, রিক্ত হাতে, শ্রান্ত নতশিরে
রঘুনাথ গুরু-কাছে আসিলেন ফিরে।

"এখনো উঠাতে পারি" করজোড়ে যাচে,
"যদি দেখাইয়া দাও কোন্‌খানে আছে।"
দ্বিতীয় কঙ্কণখানি ছুঁড়ি দিয়া জলে
গুরু কহিলেন, "আছে ওই নদীতলে।"

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

সোনার তরী

কবি-ভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন
মহাশয়ের কর-কমলে
তদীয় ভক্তের এই
প্রীতি-উপহার
সাদরে সমর্পিত
হইল।

সূচনা

জীবনের বিশেষ পর্বে কোনো বিশেষ প্রকৃতির কাব্য কোন্ উত্তেজনায় স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দেখা দেয় এ প্রশ্ন কবিকে জিজ্ঞাসা করলে তাকে বিপন্ন করা হয়। কী করে সে জানবে। প্রাণের প্রবৃদ্ধিতে যে-সব পরিবর্তন ঘটতে থাকে তার ভিতরকার রহস্য সহজে ধরা পড়ে না। গাছের সব ডাল একই দিকে একই রকম করে ছড়ায় না, এ দিকে ও দিকে তারা বেঁকেচুরে পাশ ফেরে, তার বৈজ্ঞানিক কারণ লুকিয়ে আছে আকাশে বাতাসে আলোকে মাটিতে। গাছ যদি বা চিন্তা করতে পারত তবু সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার এই মন্ত্রণা-সভায় সে জায়গা পেত না, তার ভোট থাকত না, সে কেবল স্বীকার করে নেয়, এই তার স্বভাবসংগত কাজ। বাইরে বসে আছে যে প্রাণবিজ্ঞানী সে বরঞ্চ অনেক খবর দিতে পারে।

কিন্তু বাইরের লোক যদি তাদের পাওনার মূল্য নিয়েই সন্তুষ্ট না থাকে, যদি জিজ্ঞাসা করে মালগুলো কেমন করে কোন্ ছাঁচে তৈরি হল, তা হলে কবির মধ্যে যে আত্মসন্ধানের হেড-আপিস আছে সেখানে একবার তাগাদা করে দেখতে হয়। বস্তুত সোনার তরী তার নানা পণ্য নিয়ে কোন্ রপ্তানির ঘাট থেকে আমদানির ঘাটে এসে পৌঁছল, ইতিপূর্বে কখনো এ প্রশ্ন নিজেকে করি নি, কেননা এর উত্তর দেওয়া আমার কর্তব্যের অঙ্গ নয়। মূলধন যার হাতে সেই মহাজনকে জিজ্ঞাসা করলে সে কথা কয় না, আমি তো মাঝি, হাতের কাছে যা জোটে তাই কুড়িয়ে নিয়ে এসে পৌঁছিয়ে দিই।

মানসীর অধিকাংশ কবিতা লিখেছিলুম পশ্চিমের এক শহরের বাংলা-ঘরে। নতুনের স্পর্শ আমার মনের মধ্যে জাগিয়েছিল নতুন স্বাদের উত্তেজনা। সেখানে অপরিচিতের নির্জন অবকাশে নতুন নতুন ছন্দের যে বুনুনির কাজ করেছিলুম এর পূর্বে তা আর কখনো করি নি। নূতনত্বের মধ্যে অসীমত্ব আছে, তারই এসেছিল ডাক, মন দিয়েছিল সাড়া। যা তার মধ্যে পূর্ব হতেই কুঁড়ির মতো শাখায় শাখায় লুকিয়ে ছিল, আলোতে তাই ফুটে উঠতে লাগল। কিন্তু সোনার তরীর লেখা আর-এক পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে-অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারি নে বেগানা দেশ, তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানা-শোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্‌বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটো গল্পের নিরন্তর ধারায়। সে-ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম। যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরের কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষেত্রে।

আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এ পারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানা বর্ণের

আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয় নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা, বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল সোনার তরীতে। তখনই সংশয় প্রকাশ করেছি, এ তরী নিঃশেষে আমার ফসল তুলে নেবে, কিন্তু আমাকে নেবে কি।

সোনার তরী

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা,
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা।
এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা-পালে চলে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দুধারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

ওগো তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে,
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেয়ো যেথা যেতে চাও,
যারে খুশি তারে দাও,
শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে।

যত চাও তত লও তরণী-'পরে।
আর আছে?—আর নাই, দিয়েছি ভরে।

এতকাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে—
এখন আমারে লহো করুণা করে।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই—ছোটো সে তরী
আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি—
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

শিলাইদহ। বোট
ফাল্গুন ১২৯৮

বিম্ববতী

রূপকথা

সযত্নে সাজিল রানী, বাঁধিল কবরী,
নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী
পরিল অনেক সাধে। তার পরে ধীরে
গুপ্ত আবরণ খুলি আনিল বাহিরে
মায়াময় কনকদর্পণ। মন্ত্র পড়ি
শুধাইল তারে—কহো মোরে সত্য করি
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে।
ফুটিয়া উঠিল ধীরে মুকুরের মাঝে
মধুমাখা হাসি-আঁকা একখানি মুখ,
দেখিয়া বিদারি গেল মহিষীর বুক—
রাজকন্যা বিম্ববতী সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে।

তার পরদিন রানী প্রবালের হার
পরিল গলায়। খুলি দিল কেশভার
আজানুচুম্বিত। গোলাপি অঞ্চলখানি,
লজ্জার আভাস-সম, বক্ষে দিল টানি।
সুবর্ণমুকুর রাখি কোলের উপরে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি—কহো সত্য করে
ধরা-মাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী।
দর্পণে উঠিল ফুটে সেই মুখশশী।

কাঁপিয়া কহিল রানী, অগ্নিসম জ্বালা—
পরালেম তারে আমি বিষফুলমালা,
তবু মরিল না জ্বলে সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!

তার পরদিনে—আবার রুধিল দ্বার
শয়নমন্দিরে। পরিল মুক্তার হার,
ভালে সিন্দুরের টিপ, নয়নে কাজল,
রক্তাম্বর পট্টবাস, সোনার আঁচল।
শুধাইল দর্পণেরে—কহো সত্য করি
ধরাতলে সব চেয়ে কে আজি সুন্দরী।
উজ্জ্বল কনকপটে ফুটিয়া উঠিল
সেই হাসিমাখা মুখ। হিংসায় লুটিল
রানী শয্যার উপরে। কহিল কাঁদিয়া,
বনে পাঠালেম তারে কঠিন বাঁধিয়া,
এখনো সে মরিল না সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে!

তার পরদিনে—আবার সাজিল সুখে
নব অলংকারে; বিরচিল হাসিমুখে
কবরী নূতন ছাঁদে বাঁকাইয়া গ্রীবা,
পরিল যতন করি নবরৌদ্রবিভা
নব পীতবাস। দর্পণ সম্মুখে ধরে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি—সত্য কহো মোরে
ধরা-মাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী।
সেই হাসি সেই মুখ উঠিল বিকশি
মোহন মুকুরে। রানী কহিল জ্বলিয়া,
বিষফল খাওয়ালেম তাহারে ছলিয়া,
তবুও সে মরিল না সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!

তার পরদিনে রানী কনক রতনে
খচিত করিল তনু অনেক যতনে।
দর্পণেরে শুধাইল বহু দর্পভরে,
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ কার বল্‌ সত্য করে।
দুইটি সুন্দর মুখ দেখা দিল হাসি—
রাজপুত্র রাজকন্যা দোঁহে পাশাপাশি
বিবাহের বেশে। অঙ্গে অঙ্গে শিরা যত
রানীরে দংশিল যেন বৃশ্চিকের মতো।

চীৎকারি কহিল রানী কর হানি বুকে,
মরিতে দেখেছি তারে আপন সম্মুখে.
কার প্রেমে বাঁচিল সে সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!

ঘষিতে লাগিল রানী কনকমুকুর
বালু দিয়ে— প্রতিবিম্ব না হইল দূর।
মসী লেপি দিল তবু ছবি ঢাকিল না।
অগ্নি দিল তবুও তো গলিল না সোনা।
আছাড়ি ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে,
ভাঙিল না সে মায়া-দর্পণ। ভূমিতলে
চকিতে পড়িল রানী, টুটি গেল প্রাণ—
সর্বাঙ্গে হীরকমণি অগ্নির সমান
লাগিল জ্বলিতে। ভূমে পড়ি তারি পাশে
কনকদর্পণে দুটি হাসিমুখ হাসে।
বিম্ববতী, মহিষীর সতিনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।

ফাল্গুন ১২৯৮

শৈশবসন্ধ্যা

ধীরে ধীরে বিস্তারিছে ঘেরি চারি ধার
শ্রান্তি আর শান্তি আর সন্ধ্যা-অন্ধকার,
মায়ের অঞ্চল-সম। দাঁড়ায়ে একাকী
মেলিয়া পশ্চিম-পানে অনিমেষ আঁখি
স্তব্ধ চেয়ে আছি। আপনারে মগ্ন করি
অতলের তলে, ধীরে লইতেছি ভরি
জীবনের মাঝে— আজিকার এই ছবি,
জনশূন্য নদীতীর, অস্তমান রবি,
ম্লান মূর্ছাতুর আলো— রোদন-অরুণ,
ক্লান্ত নয়নের যেন দৃষ্টি সকরুণ
স্থির বাক্যহীন— এই গভীর বিষাদ,
জলে স্থলে চরাচরে শ্রান্তি অবসাদ।

সহসা উঠিল গাহি কোন্‌খান হতে
বন-অন্ধকারঘন কোন্‌ গ্রামপথে
যেতে যেতে গৃহমুখে বালক-পথিক।
উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর নিশ্চিন্ত নির্ভীক
কাঁপিছে সপ্তম সুরে, তীব্র উচ্চতান
সন্ধ্যারে কাটিয়া যেন করিবে দুখান।

দেখিতে না পাই তারে। ওই যে সম্মুখে
প্রান্তরের সর্বপ্রান্তে, দক্ষিণের মুখে,
আখের খেতের পারে, কদলী সুপারি
নিবিড় বাঁশের বন, মাঝখানে তারি
বিশ্রাম করিছে গ্রাম, হোথা আঁখি ধায়।
হোথা কোন্ গৃহ-পানে গেয়ে চলে যায়
কোন্ রাখালের ছেলে, নাহি ভাবে কিছু,
নাহি চায় শূন্য-পানে, নাহি আগুপিছু।

দেখে শুনে মনে পড়ে সেই সন্ধ্যাবেলা
শৈশবের। কত গল্প, কত বাল্যখেলা,
এক বিছানায় শুয়ে মোরা সঙ্গী তিন;
সে কি আজিকার কথা, হল কত দিন।
এখনো কি বৃদ্ধ হয়ে যায় নি সংসার।
ভোলে নাই খেলাধুলা, নয়নে তাহার
আসে নাই নিদ্রাবেশ শান্ত সুশীতল,
বাল্যের খেলানাগুলি করিয়া বদল
পায় নি কঠিন জ্ঞান? দাঁড়ায়ে হেথায়
নির্জন মাঠের মাঝে, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,
শুনিয়া কাহার গান পড়ি গেল মনে—
কত শত নদীতীরে, কত আম্রবনে,
কাংসাঘণ্টামুখরিত মন্দিরের ধারে,
কত শস্যক্ষেত্রপ্রান্তে, পুকুরের পাড়ে
গৃহে গৃহে জাগিতেছে নব হাসিমুখ,
নবীন হৃদয়ভরা নব নব সুখ,
কত অসম্ভব কথা, অপূর্ব কল্পনা,
কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা,
অনন্ত বিশ্বাস। দাঁড়াইয়া অন্ধকারে
দেখিনু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক,
সন্ধ্যাশয্যা, মার মুখ, দীপের আলোক।

শিলাইদহ
ফাল্গুন ১২৯৮

রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে

রূপকথা

১

প্রভাতে

রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।
দুজনে দেখা হত পথের মাঝে,
কে জানে কবেকার কথা।
রাজার মেয়ে দূরে সরে যেত,
চুলের ফুল তার পড়ে যেত,
রাজার ছেলে এসে তুলে দিত
ফুলের সাথে বনলতা।
রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।
পথের দুই পাশে ফুটেছে ফুল,
পাখিরা গান গাহে গাছে।
রাজার মেয়ে আগে এগিয়ে চলে,
রাজার ছেলে যায় পাছে।

২

মধ্যাহ্নে

উপরে বসে পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নিচে বসে।
পুঁথি খুলিয়া শেখে কত কী ভাষা,
খড়ি পাতিয়া আঁক কষে।
রাজার মেয়ে পড়া যায় ভুলে,
পুঁথিটি হাত হতে পড়ে খুলে,
রাজার ছেলে এসে দেয় তুলে,
আবার পড়ে যায় খসে।
উপরে বসে পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নিচে বসে।
দুপুরে খরতাপ, বকুলশাখে
কোকিল কুহু কুহরিছে।
রাজার ছেলে চায় উপর-পানে,
রাজার মেয়ে চায় নিচে।

৩

সায়াহ্নে

রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসে,
 রাজার মেয়ে যায় ঘরে।
খুলিয়া গলা হতে মোতির মালা
 রাজার মেয়ে খেলা করে।
পথে সে মালাখানি গেল ভুলে,
রাজার ছেলে সেটি নিল তুলে,
আপন মণিহার মনোভুলে
 দিল সে বালিকার করে।
রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া এল,
 রাজার মেয়ে গেল ঘরে।
শ্রান্ত রবি ধীরে অস্ত যায়
 নদীর তীরে একশেষে।
সাঙ্গ হয়ে গেল দোঁহার পাঠ,
 যে যার গেল নিজ দেশে।

৪

নিশীথে

রাজার মেয়ে শোয় সোনার খাটে,
 স্বপনে দেখে রূপরাশি।
রূপোর খাটে শুয়ে রাজার ছেলে
 দেখিছে কার সুধা-হাসি।
করিছে আনাগোনা সুখ দুখ,
কখনো দুরু দুরু করে বুক,
অধরে কভু কাঁপে হাসিটুক,
 নয়ন কভু যায় ভাসি।
রাজার মেয়ে কার দেখিছে মুখ,
 রাজার ছেলে কার হাসি।
বাদর ঝর ঝর, গরজে মেঘ,
 পবন করে মাতামাতি।
শিথানে মাথা রাখি বিথান বেশ,
 স্বপনে কেটে যায় রাতি।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
 চৈত্র ১২৯৮

নিদ্রিতা

রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে,
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।
যেখানে যত মধুর মুখ আছে
বাকি তো কিছু রাখি নি দেখিবার।
কেহ বা ডেকে কয়েছে দুটো কথা,
কেহ বা চেয়ে করেছে আঁখি নত,
কাহারো হাসি ছুরির মতো কাটে
কাহারো হাসি আঁখিজলেরই মতো।
গরবে কেহ গিয়েছে নিজ ঘর,
কাঁদিয়া কেহ চেয়েছে ফিরে ফিরে।
কেহ বা কারে কহে নি কোনো কথা,
কেহ বা গান গেয়েছে ধীরে ধীরে।
এমনি করে ফিরেছি দেশে দেশে;
অনেক দূরে তেপান্তর-শেষে
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা,
তাহারি গলে এসেছি দিয়ে মালা।

একদা রাতে নবীন যৌবনে
স্বপ্ন হতে উঠিনু চমকিয়া,
বাহিরে এসে দাঁড়ানু একবার
ধরার পানে দেখিনু নিরখিয়া।
শীর্ণ হয়ে এসেছে শুকতারা,
পূর্বতটে হতেছে নিশি ভোর।
আকাশ-কোণে বিকাশে জাগরণ,
ধরণীতলে ভাঙে নি ঘুমঘোর।
সমুখে পড়ে দীর্ঘ রাজপথ,
দু-ধারে তারি দাঁড়ায়ে তরুসার,
নয়ন মেলি সুদূর-পানে চেয়ে
আপন মনে ভাবিনু একবার—
আমারি মতো আজি এ নিশিশেষে
ধরার মাঝে নূতন কোন্ দেশে,
দুগ্ধফেনশয়ন করি আলা
স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা।

অশ্ব চড়ি তখনি বাহিরিনু,
কত যে দেশ-বিদেশ হনু পার।
একদা এক ধূসর সন্ধ্যায়
ঘুমের দেশে লভিনু পুরদ্বার।
সবাই সেথা অচল অচেতন,
কোথাও জেগে নাইকো জনপ্রাণী,

নদীর তীরে জলের কলতানে
ঘুমায়ে আছে বিপুল পুরীখানি।
ফেলিতে পদ সাহস নাহি মানি,
নিমেষে পাছে সকল দেশ জাগে।
প্রাসাদ-মাঝে পশিনু সাবধানে,
শঙ্কা মোর চলিল আগে আগে।
ঘুমায় রাজা, ঘুমায় রানীমাতা,
কুমার-সাথে ঘুমায় রাজভ্রাতা;
একটি ঘরে রত্নদীপ জ্বালা,
ঘুমায়ে সেথা রয়েছে রাজবালা।

কমলফুলবিমল শেজখানি,
নিলীন তাহে কোমল তনুলতা।
মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে,
বাজিল বুকে সুখের মতো ব্যথা।
মেঘের মতো গুচ্ছ কেশরাশি
শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে;
একটি বাহু বক্ষ-'পরে পড়ি,
একটি বাহু লুটায় এক ধারে।
আঁচলখানি পড়েছে খসি পাশে,
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি;
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি।
দেখিনু তারে, উপমা নাহি জানি—
ঘুমের দেশে স্বপন একখানি,
পালঙ্কেতে মগন রাজবালা
আপন ভরা-লাবণ্যে নিরালা।

ব্যাকুল বুকে চাপিনু দুই বাহু,
না মানে বাধা হৃদয়কম্পন।
ভূতলে বসি আনত করি শির
মুদিত আঁখি করিনু চুম্বন।
পাতার ফাঁকে আঁখির তারা দুটি,
তাহারি পানে চাহিনু একমনে,
দ্বারের ফাঁকে দেখিতে চাহি যেন
কী আছে কোথা নিভৃত নিকেতনে।
ভূর্জপাতে কাজলমসী দিয়া
লিখিয়া দিনু আপন নামধাম।
লিখিনু, "অয়ি নিদ্রানিমগনা,
আমার প্রাণ তোমারে সঁপিলাম।"

যতন করি কনক-সুতে গাঁথি
রতন-হারে বাঁধিয়া দিনু পাঁতি।
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা,
তাহারি গলে পরায়ে দিনু মালা।

শান্তিনিকেতন
১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

সুপ্তোত্থিতা

ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম,
উঠিল কলস্বর।
গাছের শাখে জাগিল পাখি
কুসুমে মধুকর।
অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া,
হস্তিশালে হাতি।
মল্লশালে মল্ল জাগি
ফুলায় পুন ছাতি।
জাগিল পথে প্রহরিদল,
দুয়ারে জাগে দ্বারী।
আকাশে চেয়ে নিরখে বেলা
জাগিয়া নরনারী।
উঠিল জাগি রাজাধিরাজ,
জাগিল রানীমাতা।
কচালি আঁখি কুমার-সাথে
জাগিল রাজভ্রাতা।
নিভৃত ঘরে ধূপের বাস,
রতন-দীপ জ্বালা,
জাগিয়া উঠি শয্যাতলে
শুধাল রাজবালা—
কে পরালে মালা!

খসিয়া-পড়া আঁচলখানি
বক্ষে তুলি দিল।
আপন-পানে নেহারি চেয়ে
শরমে শিহরিল।
ত্রস্ত হয়ে চকিত চোখে
চাহিল চারি দিকে,
বিজন গৃহ, রতন-দীপ
জ্বলিছে অনিমিখে।
গলার মালা খুলিয়া লয়ে
ধরিয়া দুটি করে

সোনার সুতে যতনে গাঁথা
লিখনখানি পড়ে।
পড়িল নাম, পড়িল ধাম,
পড়িল লিপি তার,
কোলের 'পরে বিছায়ে দিয়ে
পড়িল শতবার।
শয়নশেষে রহিল বসে,
ভাবিল রাজবালা—
আপন ঘরে ঘুমায়েছিনু
নিতান্ত নিরালা—
কে পরালে মালা!

নূতন-জাগা কুঞ্জবনে
কুহরি উঠে পিক,
বসন্তের চুম্বনেতে
বিবশ দশ দিক।
বাতাস ঘরে প্রবেশ করে
ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে,
নবীন ফুলমঞ্জরীর
গন্ধ লয়ে আসে।
জাগিয়া উঠি বৈতালিক
গাহিছে জয়গান,
প্রাসাদদ্বারে ললিত স্বরে
বাঁশিতে উঠে তান।
শীতলছায়া নদীর পথে
কলসে লয়ে বারি—
কাঁকন বাজে, নূপুর বাজে—
চলিছে পুরনারী।
কাননপথে মর্মরিয়া
কাঁপিছে গাছপালা,
আধেক মুদি নয়ন দুটি
ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা!

বারেক মালা গলায় পরে,
বারেক লহে খুলি,
দুইটি করে চাপিয়া ধরে
বুকের কাছে তুলি।
শয়ন-'পরে মেলায়ে দিয়ে
তৃষিত চেয়ে রয়,
এমনি করে পাইবে যেন
অধিক পরিচয়।

জগতে আজ কত-না ধ্বনি
উঠিছে কত ছলে—
একটি আছে গোপন কথা,
সে কেহ নাহি বলে।
বাতাস শুধু কানের কাছে
বহিয়া যায় হুহু,
কোকিল শুধু অবিশ্রাম
ডাকিছে কুহু কুহু।
নিভৃত ঘরে পরান-মন
একান্ত উতালা,
শয়নশেষে নীরবে বসে
ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা!

কেমন বীর-মুরতি তার
মাধুরী দিয়ে মিশা।
দীপ্তিভরা নয়ন-মাঝে
তৃপ্তিহীন তৃষা।
স্বপ্নে তারে দেখেছে যেন
এমনি মনে লয়—
ভুলিয়া গেছে, রয়েছে শুধু
অসীম বিস্ময়।
পারশে যেন বসিয়াছিল,
ধরিয়াছিল কর,
এখনো তার পরশে যেন
সরস কলেবর।
চমকি মুখ দুহাতে ঢাকে,
শরমে টুটে মন,
লজ্জাহীন প্রদীপ কেন
নিভে নি সেই ক্ষণ।
কণ্ঠ হতে ফেলিল হার
যেন বিজুলিজ্বালা,
শয়ন-'পরে লুটায়ে পড়ে
ভাবিল রাজবালা—
কে পরালে মালা!

এমনি ধীরে একটি করে
কাটিছে দিন রাতি।
বসন্ত সে বিদায় নিল
লইয়া যূথী জাতি।
সঘন মেঘে বরষা আসে,
বরষে ঝরঝর।

কাননে ফুটে নবমালতী
কদম্বকেশর।
স্বচ্ছ হাসি শরৎ আসে
পূর্ণিমা-মালিকা।
সকল বন আকুল করে
শুভ্র শেফালিকা।
আসিল শীত সঙ্গে লয়ে
দীর্ঘ দুখনিশা।
শিশির-ঝরা কুন্দফুলে
হাসিয়া কাঁদে দিশা।
ফাগুন মাস আবার এল
বহিয়া ফুলডালা।
জানালা-পাশে একেলা বসে
ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা!

শান্তিনিকেতন
১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

তোমরা ও আমরা

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মতো।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
আপনা-আপনি কানাকানি কর সুখে,
কৌতুকছটা উছসিছে চোখে মুখে,
কমলচরণ পড়িছে ধরণী-মাঝে,
কনকনূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে।

অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গপাশে,
বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা।
ইঙ্গিতরসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি,
নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।
আঁখি নত করি একেলা গাঁথিছ ফুল,
মুকুর লইয়া যতনে বাঁধিছ চুল।
গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা,
কী কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা।

চকিতে পলকে অলক উড়িয়া পড়ে,
ঈষৎ হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও—
নিমেষ ফেলিতে আঁখি না মেলিতে, ত্বরা
নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও।

যৌবনরাশি টুটিতে লুটিতে চায়,
বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।
তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে,
চলিতে ফিরিতে ঝলকি চলকি উঠে।

আমরা মূর্খ কহিতে জানি নে কথা,
    কী কথা বলিতে কী কথা বলিয়া ফেলি।
অসময়ে গিয়ে লয়ে আপনার মন,
    পদতলে দিয়ে চেয়ে থাকি আঁখি মেলি।
তোমরা দেখিয়া চুপিচুপি কথা কও,
সখীতে সখীতে হাসিয়া অধীর হও,
বসন-আঁচল বুকেতে টানিয়া লয়ে
হেসে চলে যাও আশার অতীত হয়ে।

আমরা বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মতো
    আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি।
বিপুল আঁধারে অসীম আকাশ ছেয়ে
    টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি।
তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও,
আঁধার ছেদিয়া মরম বিঁধিয়া দাও,
গগনের গায়ে আগুনের রেখা আঁকি
চকিত চরণে চলে যাও দিয়ে ফাঁকি।

অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ,
    নয়ন অধর দেয় নি ভাষায় ভরে।
মোহন মধুর মন্ত্র জানি নে মোরা,
    আপনা প্রকাশ করিব কেমন করে?
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি,
কোনো সুলগনে হব না কি কাছাকাছি।
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে!

১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

সোনার বাঁধন

বন্দী হয়ে আছ তুমি সুমধুর স্নেহে
অয়ি গৃহলক্ষ্মী, এই করুণ ক্রন্দন
এই দুঃখদৈন্য-ভরা মানবের গেহে।
তাই দুটি বাহু-'পরে সুন্দরবন্ধন
সোনার কঙ্কণ দুটি বহিতেছে দেহে
শুভচিহ্ন, নিখিলের নয়ননন্দন।

পুরুষের দুই বাহু কিণাঙ্ককঠিন
সংসারসংগ্রামে, সদা বন্ধনবিহীন;
যুদ্ধ-দ্বন্দ্ব যত কিছু নিদারুণ কাজে
বহ্নিবাণ বজ্রসম সর্বত্র স্বাধীন।
তুমি বদ্ধ স্নেহ-প্রেম-করুণার মাঝে—
শুধু শুভকর্ম, শুধু সেবা নিশিদিন।
তোমার বাহুতে তাই কে দিয়াছে টানি
দুইটি সোনার গন্ডি, কাঁকন দুখানি।

শান্তিনিকেতন
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

বর্ষাযাপন

রাজধানী কলিকাতা; তেতালার ছাতে
কাঠের কুঠরি এক ধারে;
আলো আসে পূর্ব দিকে প্রথম প্রভাতে,
বায়ু আসে দক্ষিণের দ্বারে।

মেঝেতে বিছানা পাতা, দুয়ারে রাখিয়া মাথা
বাহিরে আঁখিরে দিই ছুটি,
সৌধ-ছাদ শত শত ঢাকিয়া রহস্য কত
আকাশেরে করিছে ভ্রূকুটি।
নিকটে জানালা-গায় এক কোণে আলিসায়
একটুকু সবুজের খেলা,
শিশু অশথের গাছ আপন ছায়ার নাচ
সারা দিন দেখিছে একেলা।
দিগন্তের চারি পাশে আষাঢ় নামিয়া আসে,
বর্ষা আসে হইয়া ঘোরালো,
সমস্ত আকাশ-জোড়া গরজে ইন্দ্রের ঘোড়া
চিক্‌মিকে বিদ্যুতের আলো।
চারি দিকে অবিরল ঝরঝর বৃষ্টিজল
এই ছোটো প্রান্ত-ঘরটিরে
দেয় নির্বাসিত করি দশ দিক অপহরি
সমুদয় বিশ্বের বাহিরে।
বসে বসে সঙ্গীহীন ভালো লাগে কিছুদিন
পড়িবারে মেঘদূত-কথা—
বাহিরে দিবস রাতি বায়ু করে মাতামাতি
বহিয়া বিফল ব্যাকুলতা;
বহু পূর্ব আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন ভারতের
নগ-নদী-নগরী বাহিয়া
কত শ্রুতিমধু নাম কত দেশ কত গ্রাম
দেখে যাই চাহিয়া চাহিয়া।

ভালো করে দোঁহে চিনি, বিরহী ও বিরহিণী
জগতের দু-পারে দুজন—
প্রাণে প্রাণে পড়ে টান, মাঝে মহা ব্যবধান,
মনে মনে কল্পনা সৃজন।
যক্ষবধূ গৃহকোণে ফুল নিয়ে দিন গণে
দেখে শুনে ফিরে আসি চলি।
বর্ষা আসে ঘন রোলে, যত্নে টেনে লই কোলে
গোবিন্দদাসের পদাবলী।
সুর করে বার বার পড়ি বর্ষা-অভিসার—
অন্ধকার যমুনার তীর,
নিশীথে নবীনা রাধা নাহি মানে কোনো বাধা,
খুঁজিতেছে নিকুঞ্জ-কুটীর।
অনুক্ষণ দর দর বারি ঝরে ঝর ঝর,
তাহে অতি দূরতর বন;
ঘরে ঘরে রুদ্ধ দ্বার, সঙ্গে কেহ নাহি আর
শুধু এক কিশোর মদন।

আষাঢ় হতেছে শেষ, মিশায়ে মল্লার দেশ
রচি "ভরা বাদরের" সুর।
খুলিয়া প্রথম পাতা, গীতগোবিন্দের গাথা
গাহি "মেঘে অম্বর মেদুর"।
স্তব্ধ রাত্রি দ্বিপ্রহরে ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ে—
শুয়ে শুয়ে সুখ-অনিদ্রায়
'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন'
সেই গান মনে পড়ে যায়।
'পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে'
মনসুখে নিদ্রায় মগন—
সেই ছবি জাগে মনে পুরাতন বৃন্দাবনে
রাধিকার নির্জন স্বপন।
মৃদু মৃদু বহে শ্বাস, অধরে লাগিছে হাস
কেঁপে উঠে মুদিত পলক;
বাহুতে মাথাটি থুয়ে, একাকিনী আছে শুয়ে,
গৃহকোণে ম্লান দীপালোক।
গিরিশিরে মেঘ ডাকে, বৃষ্টি ঝরে তরুশাখে
দাদুরী ডাকিছে সারারাতি—
হেনকালে কী না ঘটে, এ সময়ে আসে বটে
একা ঘরে স্বপনের সাথী।
মরি মরি স্বপ্নশেষে পুলকিত রসাবেশে
যখন সে জাগিল একাকী,
দেখিল বিজন ঘরে দীপ নিবু নিবু করে
প্রহরী প্রহর গেল হাঁকি।

বাড়িছে বৃষ্টির বেগ, থেকে থেকে ডাকে মেঘ,
ঝিল্লিরব পৃথিবী ব্যাপিয়া,
সেই ঘনঘোরা নিশি স্বপ্নে জাগরণে মিশি
না জানি কেমন করে হিয়া।

লয়ে পুঁথি দু-চারিটি নেড়ে চেড়ে ইটি সিটি
এইমতো কাটে দিনরাত।
তার পরে টানি লই বিদেশী কাব্যের বই,
উলটি পালটি দেখি পাত—
কোথা রে বর্ষার ছায়া অন্ধকার মেঘমায়া
ঝরঝর ধ্বনি অহরহ,
কোথায় সে কর্মহীন একান্তে আপনে-লীন
জীবনের নিগূঢ় বিরহ!
বর্ষার সমান সুরে অন্তর বাহির পূরে
সংগীতের মুষলধারায়,
পরানের বহুদূর কূলে কূলে ভরপুর,
বিদেশী কাব্যে সে কোথা হায়!
তখন সে পুঁথি ফেলি, দুয়ারে আসন মেলি
বসি গিয়ে আপনার মনে,
কিছু করিবার নাই চেয়ে চেয়ে ভাবি তাই
দীর্ঘ দিন কাটিবে কেমনে।
মাথাটি করিয়া নিচু বসে বসে রচি কিছু
বহু যত্নে সারাদিন ধরে—
ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।
ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি' মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।
জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা, অখ্যাত কীর্তির ধুলা,
কত ভাব, কত ভয় ভুল—
সংসারের দশ দিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝরঝর বরষার মতো—
ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি
শব্দ তার শুনি অবিরত।

সেই সব হেলাফেলা, নিমেষের লীলাখেলা
চারি দিকে করি স্তূপাকার,
তাই দিয়ে করি সৃষ্টি একটি বিস্মৃতিবৃষ্টি
জীবনের শ্রাবণনিশার।

শান্তিনিকেতন
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

হিং টিং ছট্

স্বপ্নমঙ্গল

স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ,
অর্থ তার ভাবি ভাবি গবুচন্দ্র চুপ।
শিয়রে বসিয়ে যেন তিনটে বাঁদরে
উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে।
একটু নড়িতে গেলে গালে মারে চড়,
চোখে মুখে লাগে তার নখের আঁচড়।
সহসা মিলাল তারা, এল এক বেদে,
'পাখি উড়ে গেছে' ব'লে মরে কেঁদে কেঁদে;
সম্মুখে রাজারে দেখি তুলি নিল ঘাড়ে,
ঝুলায়ে বসায়ে দিল উচ্চ এক দাঁড়ে।
নিচেতে দাঁড়ায়ে এক বুড়ি থুড়থুড়ি
হাসিয়া পায়ের তলে দেয় সুড়সুড়ি।
রাজা বলে, 'কী আপদ!' কেহ নাহি ছাড়ে,
পা দুটা তুলিতে চাহে, তুলিতে না পারে।
পাখির মতন রাজা করে ঝট্‌পট্‌,
বেদে কানে কানে বলে— 'হিং টিং ছট্‌।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

হবুপুর রাজ্যে আজ দিন ছয়-সাত
চোখে কারো নিদ্রা নাই, পেটে নাই ভাত।
শীর্ণ গালে হাত দিয়ে নত করি শির
রাজ্যসুদ্ধ বালবৃদ্ধ ভেবেই অস্থির।
ছেলেরা ভুলেছে খেলা, পণ্ডিতেরা পাঠ,
মেয়েরা করেছে চুপ— এতই বিভ্রাট।
সারি সারি বসে গেছে কথা নাহি মুখে,
চিন্তা যত ভারী হয় মাথা পড়ে ঝুঁকে।
ভুঁইফোঁড়া তত্ত্ব যেন ভূমিতলে খোঁজে,
সবে যেন বসে গেছে নিরাকার ভোজে।

মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উঠে—'হিং টিং ছট্।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

চারি দিক হতে এল পণ্ডিতের দল—
অযোধ্যা কনোজ কাঞ্চী মগধ কোশল।
উজ্জয়িনী হতে এল বুধ-অবতংস
কালিদাস কবীন্দ্রের ভাগিনেয়বংশ।
মোটা মোটা পুঁথি লয়ে উলটায় পাতা,
ঘন ঘন নাড়ে বসি টিকিসুদ্ধ মাথা।
বড়ো বড়ো মস্তকের পাকা শস্যখেত
বাতাসে দুলিছে যেন শীর্ষ-সমেত।
কেহ শ্রুতি, কেহ স্মৃতি, কেহ বা পুরাণ,
কেহ ব্যাকরণ দেখে, কেহ অভিধান।
কোনোখানে নাহি পায় অর্থ কোনোরূপ,
বেড়ে উঠে অনুস্বর বিসর্গের স্তূপ।
চুপ করে বসে থাকে বিষম সংকট,
থেকে থেকে হেঁকে ওঠে—'হিং টিং ছট্।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

কহিলেন হতাশ্বাস হবুচন্দ্ররাজ,
'ম্লেচ্ছদেশে আছে নাকি পণ্ডিত-সমাজ,
তাহাদের ডেকে আনো যে যেখানে আছে—
অর্থ যদি ধরা পড়ে তাহাদের কাছে।'
কটাচুল নীলচক্ষু কপিশকপোল,
যবন পণ্ডিত আসে, বাজে ঢাক ঢোল।
গায়ে কালো মোটা মোটা ছাঁটাছোঁটা কুর্তি,
গ্রীষ্মতাপে উষ্মা বাড়ে, ভারি উগ্রমূর্তি।
ভূমিকা না করি কিছু ঘড়ি খুলি কয়—
'সতেরো মিনিট মাত্র রয়েছে সময়,
কথা যদি থাকে কিছু বলো চট্‌পট্।'
সভাসুদ্ধ বলি উঠে—'হিং টিং ছট্।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

স্বপ্ন শুনি ম্লেচ্ছমুখ রাঙা টকটকে,
আগুন ছুটিতে চায় মুখে আর চোখে।
হানিয়া দক্ষিণ মুষ্টি বাম করতলে
'ডেকে এনে পরিহাস' রেগেমেগে বলে।

ফরাসি পণ্ডিত ছিল, হাস্যোজ্জ্বলমুখে
কহিল নোয়ায়ে মাথা, হস্ত রাখি বুকে,
'স্বপ্ন যাহা শুনিলাম রাজযোগ্য বটে;
হেন স্বপ্ন সকলের অদৃষ্টে না ঘটে।
কিন্তু তবু স্বপ্ন ওটা করি অনুমান
যদিও রাজার শিরে পেয়েছিল স্থান।
অর্থ চাই, রাজকোষে আছে ভূরি ভূরি,
রাজস্বপ্নে অর্থ নাই, যত মাথা খুঁড়ি।
নাই অর্থ কিন্তু তবু কহি অকপট,
শুনিতে কী মিষ্ট আহা, হিং টিং ছট্।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

শুনিয়া সভাস্থ সবে করে ধিক ধিক—
কোথাকার গণ্ডমূর্খ পাষণ্ড নাস্তিক!
স্বপ্ন শুধু স্বপ্নমাত্র মস্তিষ্ক-বিকার,
এ কথা কেমন করে করিব স্বীকার।
জগৎ-বিখ্যাত মোরা 'ধর্মপ্রাণ' জাতি
স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে!—দুপুরে ডাকাতি!
হবুচন্দ্র রাজা কহে পাকালিয়া চোখ—
'গবুচন্দ্র, এদের উচিত শিক্ষা হোক।
হেঁটোয় কণ্টক দাও, উপরে কণ্টক,
ডালকুত্তাদের মাঝে করহ বণ্টক।'
সতেরো মিনিট কাল না হইতে শেষ,
ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের আর না মিলে উদ্দেশ।
সভাস্থ সবাই ভাসে আনন্দাশ্রুনীরে,
ধর্মরাজ্যে পুনর্বার শান্তি এল ফিরে।
পণ্ডিতেরা মুখ চক্ষু করিয়া বিকট
পুনর্বার উচ্চারিল 'হিং টিং ছট্।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

অতঃপর গৌড় হতে এল হেন বেলা
যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা।
নগ্নশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে—
কাছা-কোঁচা শতবার খসে খসে পড়ে।
অস্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণ খর্বদেহ,
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ।
এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।
না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল,
পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যত মুষল।

সগর্বে জিজ্ঞাসা করে, 'কী লয়ে বিচার,
শুনিলে বলিতে পারি কথা দুই-চার,
ব্যাখ্যায় করিতে পারি উলট-পালট।'
সমস্বরে কহে সবে—'হিং টিং ছট্।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

স্বপ্নকথা শুনি মুখ গম্ভীর করিয়া
কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া,
'নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার,
বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।
ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্তন আবর্তন সম্বর্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আণব চৌম্বকবলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্মবিদ্যুৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট—
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হিং টিং ছট্।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

'সাধু সাধু সাধু' রবে কাঁপে চারি ধার,
সবে বলে—'পরিষ্কার, অতি পরিষ্কার।
দুর্বোধ যা-কিছু ছিল হয়ে গেল জল,
শূন্য আকাশের মতো অত্যন্ত নির্মল।'
হাঁপ ছাড়ি উঠিলেন হবুচন্দ্ররাজ,
আপনার মাথা হতে খুলি লয়ে তাজ
পরাইয়া দিল ক্ষীণ বাঙালির শিরে,
ভারে তার মাথাটুকু পড়ে বুঝি ছিঁড়ে।
বহুদিন পরে আজ চিন্তা গেল ছুটে,
হাবুডুবু হবু-রাজ্য নড়িচড়ি উঠে।
ছেলেরা ধরিল খেলা, বৃদ্ধেরা তামুক,
এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মুখ।
দেশজোড়া মাথাধরা ছেড়ে গেল চট্,
সবাই বুঝিয়া গেল—হিং টিং ছট্।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

—

যে শুনিবে এই স্বপ্নমঙ্গলের কথা,
সর্বভ্রম ঘুচে যাবে নহিবে অন্যথা।
বিশ্বে কভু বিশ্ব ভেবে হবে না ঠকিতে,
সত্যেরে সে মিথ্যা বলি বুঝিবে চকিতে।
যা আছে তা নাই আর নাই যাহা আছে,
এ কথা জাজ্বল্যমান হবে তার কাছে।
সবাই সরলভাবে দেখিবে যা কিছু,
সে আপন লেজুড় জুড়িবে তার পিছু।
এসো ভাই, তোলো হাই, শুয়ে পড়ো চিত,
অনিশ্চিত এ সংসারে এ কথা নিশ্চিত—
জগতে সকলি মিথ্যা সব মায়াময়,
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

শান্তিনিকেতন
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

পরশ-পাথর

খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।
মাথায় বৃহৎ জটা ধুলায় কাদায় কটা,
মলিন ছায়ার মতো ক্ষীণ কলেবর।
ওষ্ঠে অধরেতে চাপি অন্তরের দ্বার ঝাঁপি
রাত্রিদিন তীব্র জ্বালা জ্বেলে রাখে চোখে।
দুটো নেত্র সদা যেন নিশার খদ্যোত-হেন
উড়ে উড়ে খোঁজে কারে নিজের আলোকে।
নাহি যার চালচুলা গায়ে মাখে ছাইধুলা
কটিতে জড়ানো শুধু ধূসর কৌপীন,
ডেকে কথা কয় তারে কেহ নাই এ সংসারে
পথের ভিখারী হতে আরো দীনহীন,
তার এত অভিমান, সোনারূপা তুচ্ছজ্ঞান,
রাজসম্পদের লাগি নহে সে কাতর,
দশা দেখে হাসি পায়, আর কিছু নাহি চায়
একেবারে পেতে চায় পরশ-পাথর!

সম্মুখে গরজে সিন্ধু অগাধ অপার।
তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি হেসে হল কুটিকুটি
সৃষ্টিছাড়া পাগলের দেখিয়া ব্যাপার।
আকাশ রয়েছে চাহি, নয়নে নিমেষ নাহি,
হু হু করে সমীরণ ছুটেছে অবাধ।

সূর্য ওঠে প্রাতঃকালে পূর্ব গগনের ভালে,
সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে উঠে আসে চাঁদ।
জলরাশি অবিরল করিতেছে কলকল,
অতল রহস্য যেন চাহে বলিবারে।
কাম্য ধন আছে কোথা জানে যেন সব কথা,
সে-ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাহি, মহা গাথা গান গাহি
সমুদ্র আপনি শুনে আপনার স্বর।
কেহ যায়, কেহ আসে, কেহ কাঁদে, কেহ হাসে,
খ্যাপা তীরে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।

একদিন, বহুপূর্বে, আছে ইতিহাস—
নিকষে সোনার রেখা সবে যেন দিল দেখা—
আকাশে প্রথম সৃষ্টি পাইল প্রকাশ।
মিলি যত সুরাসুর কৌতূহলে ভরপুর
এসেছিল পা টিপিয়া এই সিন্ধুতীরে।
অতলের পানে চাহি নয়নে নিমেষ নাহি
নীরবে দাঁড়ায়ে ছিল স্থির নতশিরে।
বহুকাল স্তব্ধ থাকি শুনেছিল মুদে আঁখি
এই মহাসমুদ্রের গীতি চিরন্তন;
তার পরে কৌতূহলে ঝাঁপায়ে অগাধ জলে
করেছিল এ অনন্ত রহস্য মন্থন।
বহুকাল দুঃখ সেবি নিরখিল, লক্ষ্মীদেবী
উদিলা জগৎ-মাঝে অতুল সুন্দর।
সেই সমুদ্রের তীরে শীর্ণ দেহে জীর্ণ চীরে
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।

এতদিনে বুঝি তার ঘুচে গেছে আশ।
খুঁজে খুঁজে ফিরে তবু বিশ্রাম না জানে কভু,
আশা গেছে, যায় নাই খোঁজার অভ্যাস।
বিরহী বিহঙ্গ ডাকে সারা দিন তরুশাখে,
যারে ডাকে তার দেখা পায় না অভাগা।
তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন,
একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা।
আর-সব কাজ ভুলি আকাশে তরঙ্গ তুলি
সমুদ্র না জানি কারে চাহে অবিরত।
যত করে হায় হায় কোনোকালে নাহি পায়,
তবু শূন্যে তোলে বাহু, ওই তার ব্রত।
কারে চাহি ব্যোমতলে গ্রহতারা লয়ে চলে,
অনন্ত সাধনা করে বিশ্বচরাচর।
সেইমতো সিন্ধুতটে ধূলিমাখা দীর্ঘজটে
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।

একদা শুধাল তারে গ্রামবাসী ছেলে,
'সন্ন্যাসীঠাকুর, এ কী, কাঁকালে ও কী ও দেখি,
সোনার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে।'
সন্ন্যাসী চমকি ওঠে শিকল সোনার বটে,
লোহা সে হয়েছে সোনা জানে না কখন।
একি কান্ড চমৎকার, তুলে দেখে বার বার,
আঁখি কচালিয়া দেখে এ নহে স্বপন।
কপালে হানিয়া কর বসে পড়ে ভূমি-'পর,
নিজেরে করিতে চাহে নির্দয় লাঞ্ছনা;
পাগলের মতো চায়— কোথা গেল, হায় হায়,
ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা।
কেবল অভ্যাসমত নুড়ি কুড়াইত কত,
ঠন্ করে ঠেকাইত শিকলের 'পর,
চেয়ে দেখিত না, নুড়ি দূরে ফেলে দিত ছুঁড়ি,
কখন ফেলেছে ছুঁড়ে পরশ-পাথর।

তখন যেতেছে অস্তে মলিন তপন।
আকাশ সোনার বর্ণ, সমুদ্র গলিত স্বর্ণ,
পশ্চিম দিগ্‌বধূ দেখে সোনার স্বপন।
সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্বপথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নূতন ক'রে হারানো রতন।
সে শকতি নাহি আর নুয়ে পড়ে দেহভার
অন্তর লুটায় ছিন্ন তরুর মতন।
পুরাতন দীর্ঘ পথ পড়ে আছে মৃতবৎ
হেথা হতে কত দূর নাহি তার শেষ।
দিক হতে দিগন্তরে মরুবালি ধূ ধূ করে,
আসন্ন রজনী-ছায়ে ম্লান সর্বদেশ।
অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি
স্পর্শ লভেছিল যার এক পল-ভর,
বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর।

শান্তিনিকেতন
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

বৈষ্ণব কবিতা

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান!
পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,
বৃন্দাবনগাথা— এই প্রণয়-স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,

চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
শরমে সম্ভ্রমে—এ কি শুধু দেবতার!
এ সংগীতরসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতিরজনীর আর প্রতিদিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা?

এ গীত-উৎসব-মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জনে বিরাজে;
দাঁড়ায়ে বাহির-দ্বারে মোরা নরনারী
উৎসুক শ্রবণ পাতি শুনি যদি তারি
দুয়েকটি তান—দূর হতে তাই শুনে
তরুণ বসন্তে যদি নবীন ফাল্গুনে
অন্তর পুলকি উঠে, শুনি সেই সুর
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর
আমাদের ধরা—মধুময় হয়ে উঠে
আমাদের বনচ্ছায়ে যে নদীটি ছুটে,
মোদের কুটীর-প্রান্তে যে কদম্ব ফুটে
বরষার দিনে—সেই প্রেমাতুর তানে
যদি ফিরে চেয়ে দেখি মোর পার্শ্ব-পানে
ধরি মোর বাম বাহু রয়েছে দাঁড়ায়ে
ধরার সঙ্গিনী মোর, হৃদয় বাড়ায়ে
মোর দিকে, বহি নিজ মৌন ভালোবাসা,
ওই গানে যদি বা সে পায় নিজ ভাষা,
যদি তার মুখে ফুটে পূর্ণ প্রেমজ্যোতি—
তোমার কি তাঁর, বন্ধু, তাহে কার ক্ষতি?

সত্য করে কহো মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।
বিজন বসন্তরাতে মিলনশয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি! এত প্রেমকথা—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে! আজ তার নাহি অধিকার
সে সংগীতে! তারি নারীহৃদয়-সঞ্চিত
তার ভাষা হতে তারে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন!

আমাদেরি কুটীর-কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন-তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেমগীতিহার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলনমেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই,
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্যপথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয়গৃহতরে
যথাসাধ্য যে যাহার; যুগে যুগান্তরে
চিরদিন পৃথিবীতে যুবকযুবতী
নরনারী এমনি চঞ্চল মতিগতি।
দুই পক্ষে মিলে একেবারে আত্মহারা
অবোধ অজ্ঞান। সৌন্দর্যের দস্যু তারা
লুটেপুটে নিতে চায় সব। এত গীতি,
এত ছন্দ, এত ভাবে উচ্ছ্বাসিত প্রীতি,
এত মধুরতা দ্বারের সম্মুখ দিয়া
বহে যায়—তাই তারা পড়েছে আসিয়া
সবে মিলি কলরবে সেই সুধাস্রোতে।
সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হতে
কলস ভরিয়া তারা লয়ে যায় তীরে
বিচার না করি কিছু, আপন কুটীরে
আপনার তরে। তুমি মিছে ধর দোষ,
হে সাধু পণ্ডিত, মিছে করিতেছ রোষ।
যাঁর ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে
অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন বসে।

শাহাজাদপুর
১৮ আষাঢ় ১২৯৯

দুই পাখি

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে।

বনের পাখি বলে, খাঁচার পাখি ভাই,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।
খাঁচার পাখি বলে, বনের পাখি, আয়
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।
বনের পাখি বলে—না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।
খাঁচার পাখি বলে—হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব!

বনের পাখি গাহে বাহিরে বসি বসি
বনের গান ছিল যত,
খাঁচার পাখি পড়ে শিখানো বুলি তার—
দোঁহার ভাষা দুইমতো।
বনের পাখি বলে, খাঁচার পাখি ভাই,
বনের গান গাও দিখি।
খাঁচার পাখি বলে, বনের পাখি ভাই,
খাঁচার গান লহো শিখি।
বনের পাখি বলে—না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই।
খাঁচার পাখি বলে—হায়,
আমি কেমনে বন-গান গাই!

বনের পাখি বলে, আকাশ ঘননীল,
কোথাও বাধা নাহি তার।
খাঁচার পাখি বলে, খাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারি ধার।
বনের পাখি বলে, আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।
খাঁচার পাখি বলে, নিরালা সুখকোণে
বাঁধিয়া রাখো আপনারে!
বনের পাখি বলে—না,
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই!
খাঁচার পাখি বলে—হায়,
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই!

এমনি দুই পাখি দোঁহারে ভালোবাসে
তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে,
নীরবে চোখে চোখে চায়।

দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে,
বুঝাতে নারে আপনায়।
দুজনে একা একা ঝাপটি মরে পাখা,
কাতরে কহে, কাছে আয়!
বনের পাখি বলে—না,
কবে খাঁচায় রুধি দিবে দ্বার।
খাঁচার পাখি বলে—হায়,
মোর শকতি নাহি উড়িবার।

শাহাজাদপুর
১৯ ভাদ্র ১২৯৯

আকাশের চাঁদ

হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ—
এই হল তার বুলি।
দিবস রজনী যেতেছে বহিয়া,
কাঁদে সে দু-হাত তুলি।
হাসিছে আকাশ, বহিছে বাতাস,
পাখিরা গাহিছে সুখে।
সকালে রাখাল চলিয়াছে মাঠে,
বিকালে ঘরের মুখে।
বালক বালিকা ভাই বোনে মিলে
খেলিছে আঙিনা-কোণে,
কোলের শিশুরে হেরিয়া জননী
হাসিছে আপন মনে।
কেহ হাটে যায় কেহ বাটে যায়
চলেছে যে যার কাজে,
কত জনরব কত কলরব
উঠিছে আকাশ-মাঝে।
পথিকেরা এসে তাহারে শুধায়,
'কে তুমি কাঁদিছ বসি।'
সে কেবল বলে নয়নের জলে,
'হাতে পাই নাই শশী।'

সকালে বিকালে ঝরি পড়ে কোলে
অযাচিত ফুলদল,
দখিন সমীর বুলায় ললাটে
দক্ষিণ করতল।
প্রভাতের আলো আশিস-পরশ
করিছে তাহার দেহে,
রজনী তাহারে বুকের আঁচলে
ঢাকিছে নীরব স্নেহে।

কাছে আসি শিশু মাগিছে আদর
কণ্ঠ জড়ায়ে ধরি,
পাশে আসি যুবা চাহিছে তাহারে
লইতে বন্ধু করি।
এই পথে গৃহে কত আনাগোনা,
কত ভালোবাসাবাসি,
সংসারসুখ কাছে কাছে তার
কত আসে যায় ভাসি,
মুখ ফিরাইয়া সে রহে বসিয়া,
কহে সে নয়নজলে,
'তোমাদের আমি চাহি না কারেও,
শশী চাই করতলে।'

শশী যেথা ছিল সেথাই রহিল,
সেও ব'সে এক ঠাঁই।
অবশেষে যবে জীবনের দিন
আর বেশি বাকি নাই,
এমন সময়ে সহসা কী ভাবি
চাহিল সে মুখ ফিরে,
দেখিল ধরণী শ্যামল মধুর
সুনীল সিন্ধুতীরে।
সোনার ক্ষেত্রে কৃষাণ বসিয়া
কাটিতেছে পাকা ধান,
ছোটো ছোটো তরী পাল তুলে যায়,
মাঝি বসে গায় গান।
দূরে মন্দিরে বাজিছে কাঁসর,
বধূরা চলেছে ঘাটে,
মেঠো পথ দিয়ে গৃহস্থ জন
আসিছে গ্রামের হাটে।
নিশ্বাস ফেলি রহে আঁখি মেলি,
কহে ম্রিয়মাণ মন,
'শশী নাহি চাই যদি ফিরে পাই
আর বার এ জীবন।'

দেখিল চাহিয়া জীবনপূর্ণ
সুন্দর লোকালয়
প্রতি দিবসের হরষে বিষাদে
চির-কল্লোলময়।
স্নেহসুধা লয়ে গৃহের লক্ষ্মী
ফিরিছে গৃহের মাঝে,
প্রতি দিবসেরে করিছে মধুর
প্রতি দিবসের কাজে।

সকাল, বিকাল, দুটি ভাই আসে
ঘরের ছেলের মতো,
রজনী সবারে কোলেতে লইছে
নয়ন করিয়া নত।
ছোটো ছোটো ফুল, ছোটো ছোটো হাসি,
ছোটো কথা, ছোটো সুখ,
প্রতি নিমেষের ভালোবাসাগুলি,
ছোটো ছোটো হাসিমুখ
আপনা-আপনি উঠিছে ফুটিয়া
মানবজীবন ঘিরি,
বিজন শিখরে বসিয়া সে তাই
দেখিতেছে ফিরি ফিরি।

দেখে বহুদূরে ছায়াপুরী-সম
অতীত জীবন-রেখা,
অস্তরবির সোনার কিরণে
নূতন বরনে লেখা।
যাহাদের পানে নয়ন তুলিয়া
চাহে নি কখনো ফিরে,
নবীন আভায় দেখা দেয় তারা
স্মৃতিসাগরের তীরে।
হতাশ হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
পূরবীরাগিণী বাজে,
দু-বাহু বাড়ায়ে ফিরে যেতে চায়
ওই জীবনের মাঝে।
দিনের আলোক মিলায়ে আসিল
তবু পিছে চেয়ে রহে—
যাহা পেয়েছিল তাই পেতে চায়
তার বেশি কিছু নহে।
সোনার জীবন রহিল পড়িয়া
কোথা সে চলিল ভেসে।
শশীর লাগিয়া কাঁদিতে গেল কি
রবিশশীহীন দেশে।

বোট। যমুনায়। বিরাহিমপুরের পথে
২২ আষাঢ় ১২৯৯

গানভঙ্গ

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা, ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর সাতটি যেন পোষা পাখি।
শাণিত তরবারি গলাটি যেন নাচিয়া ফিরে দশ দিকে,
কখন কোথা যায় না পাই দিশা, বিজুলি-হেন ঝিকিমিকে।

আপনি গড়ি তোলে বিপদজাল,   আপনি কাটি দেয় তাহা।
সভার লোকে শুনে অবাক মানে,   সঘনে বলে 'বাহা বাহা'।

কেবল বুড়া রাজা প্রতাপ রায়   কাঠের মতো বসি আছে;
বরজলাল ছাড়া কাহারো গান   ভালো না লাগে তার কাছে।
বালক-বেলা হতে তাহারি গীতে   দিল সে এত কাল যাপি—
বাদল দিনে কত মেঘের গান,   হোলির দিনে কত কাফি।
গেয়েছে আগমনী শরৎপ্রাতে,   গেয়েছে বিজয়ার গান—
হৃদয় উছসিয়া অশ্রুজলে   ভাসিয়া গেছে দুনয়ান।
যখনি মিলিয়াছে বন্ধুজনে   সভার গৃহ গেছে পুরে,
গেয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা   ভূপালি মুলতানি সুরে।
ঘরেতে বারবার এসেছে কত   বিবাহ-উৎসব-রাতি—
পরেছে দাসদাসী লোহিত বাস,   জ্বলেছে শত শত বাতি,
বসেছে নব বর সলাজ মুখে   পরিয়া মণি-আভরণ,
করিছে পরিহাস কানের কাছে   সমবয়সী প্রিয়জন,
সামনে বসি তার বরজলাল   ধরেছে সাহানার সুর—
সে-সব দিন আর সে-সব গান   হৃদয়ে আছে পরিপুর।
সে ছাড়া কারো গান শুনিলে তাই   মর্মে গিয়ে নাহি লাগে,
অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে   নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।
প্রতাপ রায় তাই দেখিছে শুধু   কাশীর বৃথা মাথা-নাড়া,
সুরের পরে সুর ফিরিয়া যায়,   হৃদয়ে নাহি পায় সাড়া।

থামিল গান যবে, ক্ষণেক-তরে   বিরাম মাগে কাশীনাথ;
বরজলাল-পানে প্রতাপ রায়   হাসিয়া করে আঁখিপাত।
কানের কাছে তার রাখিয়া মুখ   কহিল, "ওস্তাদজি,
গানের মতো গান শুনায়ে দাও,   এরে কি গান বলে, ছি!
এ যেন পাখি লয়ে বিবিধ ছলে,   শিকারী বিড়ালের খেলা!
সে কালে গান ছিল, এ কালে হায়   গানের বড়ো অবহেলা।"

বরজলাল বুড়া শুক্লকেশ,   শুভ্র উষ্ণীষ শিরে,
বিনতি করি সবে, সভার মাঝে   আসন নিল ধীরে ধীরে।
শিরা-বাহির-করা শীর্ণ করে   তুলিয়া নিল তানপুর,
ধরিল নতশিরে নয়ন মুদি   ইমন-কল্যাণ সুর।
কাঁপিয়া ক্ষীণ স্বর মরিয়া যায়   বৃহৎ সভাগৃহ-কোণে,
ক্ষুদ্র পাখি যথা ঝড়ের মাঝে   উড়িতে নারে প্রাণপণে।
বসিয়া বাম পাশে প্রতাপ রায়,   দিতেছে শত উৎসাহ—
"আহাহা বাহা বাহা" কহিছে কানে,   "গলা ছাড়িয়া গান গাহো।"

সভার লোকে সবে অন্যমনা,   কেহ বা কানাকানি করে।
কেহ বা তোলে হাই, কেহ বা ঢোলে,   কেহ বা চলে যায় ঘরে।
"ওরে রে আয় লয়ে তামাকু পান"   ভৃত্যে ডাকি কেহ কয়।
সঘনে পাখা নাড়ি কেহ বা বলে,   "গরম আজি অতিশয়।"

করিছে আনাগোনা ব্যস্ত লোক, ক্ষণেক নাহি রহে চুপ।
নীরব ছিল সভা, ক্রমশ সেথা শব্দ উঠে শতরূপ।
বুড়ার গান তাহে ডুবিয়া যায়, তুফান-মাঝে ক্ষীণ তরী—
কেবল দেখা যায় তানপুরায় আঙুল কাঁপে থরথরি।
হৃদয়ে যেথা হতে গানের সুর উছসি উঠে নিজসুখে
হেলার কলরব শিলার মতো চাপে সে উৎসের মুখে—
কোথায় গান আর কোথায় প্রাণ, দু-দিকে ধায় দুই জনে,
তবুও রাখিবারে প্রভুর মান বরজ গায় প্রাণপণে।

গানের এক পদ মনের ভ্রমে হারায়ে গেল কী করিয়া,
আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গাহে—লইতে চাহে শুধরিয়া।
আবার ভুলে যায়, পড়ে না মনে, শরমে মস্তক নাড়ি
আবার শুরু হতে ধরিল গান, আবার ভুলি দিল ছাড়ি।
দ্বিগুণ থরথরি কাঁপিছে হাত, স্মরণ করে গুরুদেবে।
কণ্ঠ কাঁপিতেছে কাতরে, যেন বাতাসে দীপ নেবে-নেবে।
গানের পদ তবে ছাড়িয়া দিয়া রাখিল সুরটুকু ধরি,
সহসা হাহা রবে উঠিল কাঁদি গাহিতে গিয়া হা হা করি।
কোথায় দূরে গেল সুরের খেলা, কোথায় তাল গেল ভাসি,
গানের সুতা ছিঁড়ি পড়িল খসি, অশ্রু-মুকুতার রাশি।
কোলের সখী তানপুরার 'পরে রাখিল লজ্জিত মাথা—
ভুলিল শেখা গান, পড়িল মনে বাল্যক্রন্দনগাথা।
নয়ন ছলছল, প্রতাপ রায় কর বুলায় তার দেহে—
"আইস হেথা হতে আমরা যাই" কহিল সকরুণ স্নেহে।
শতেক-দীপ-জ্বালা নয়ন-ভরা ছাড়ি সে উৎসবঘর
বাহিরে গেল দুটি প্রাচীন সখা ধরিয়া দুঁহু দোঁহা-কর।

বরজ করজোড়ে কহিল, "প্রভু, মোদের সভা হল ভঙ্গ।
এখন আসিয়াছে নূতন লোক, ধরায় নব নব রঙ্গ।
জগতে আমাদের বিজন সভা, কেবল তুমি আর আমি—
সেথায় আনিয়ো না নূতন শ্রোতা, মিনতি তব পদে স্বামী।
একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুই জনে—
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ, তবে সে কলতান উঠে—
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে, তবে সে মর্মর ফুটে।
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি যুগল মিলিয়াছে আগে—
যেখানে প্রেম নাই, বোবার সভা, সেখানে গান নাহি জাগে।"

বোট। শিলাইদহ
২৪ আষাঢ় ১২৯৯

যেতে নাহি দিব

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি; বেলা দ্বিপ্রহর;
হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর।
জনশূন্য পল্লিপথে ধূলি উড়ে যায়
মধ্যাহ্ন-বাতাসে; স্নিগ্ধ অশথের ছায়
ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিণী জীর্ণ বস্ত্র পাতি
ঘুমায়ে পড়েছে; যেন রৌদ্রময়ী রাতি
ঝাঁ ঝাঁ করে চারি দিকে নিস্তব্ধ নিঃঝুম—
শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ঘুম।

গিয়েছে আশ্বিন—পূজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহুদূরদেশে
সেই কর্মস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হয়ে
বাঁধিছে জিনিসপত্র দড়াদড়ি লয়ে,
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এ-ঘরে ও-ঘরে।
ঘরের গৃহিণী, চক্ষু ছলছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,
তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার
একদণ্ড তরে; বিদায়ের আয়োজনে
ব্যস্ত হয়ে ফিরে; যথেষ্ট না হয় মনে
যত বাড়ে বোঝা। আমি বলি, 'এ কী কাণ্ড!
এত ঘট এত পট হাঁড়ি সরা ভাণ্ড
বোতল বিছানা বাক্স রাজ্যের বোঝাই
কী করিব লয়ে! কিছু এর রেখে যাই
কিছু লই সাথে।'
সে কথায় কর্ণপাত
নাহি করে কোনো জন। 'কী জানি দৈবাৎ
এটা ওটা আবশ্যক যদি হয় শেষে
তখন কোথায় পাবে বিভুঁই বিদেশে!
সোনামুগ সরু চাল সুপারি ও পান;
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান
গুড়ের পাটালি; কিছু ঝুনো নারিকেল;
দুই ভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল;
আমসত্ত্ব আমচুর; সের-দুই দুধ—
এই-সব শিশি কৌটা ওষুধবিষুধ।
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে,
মাথা খাও, ভুলিয়ো না, খেয়ো মনে করে।'
বুঝিনু যুক্তির কথা বৃথা বাক্যব্যয়।
বোঝাই হইল উঁচু পর্বতের ন্যায়।
তাকানু ঘড়ির পানে, তার পরে ফিরে
চাহিনু প্রিয়ার মুখে, কহিলাম ধীরে,

'তবে আসি'। অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষু-'পরে বস্ত্রাঞ্চল টানি
অমঙ্গল অশ্রুজল করিল গোপন।

বাহিরে দ্বারের কাছে বসি অন্যমন
কন্যা মোর চারি বছরের। এতক্ষণ
অন্য দিনে হয়ে যেত স্নান সমাপন,
দুটি অন্ন মুখে না তুলিতে আঁখিপাতা
মুদিয়া আসিত ঘুমে; আজি তার মাতা
দেখে নাই তারে; এত বেলা হয়ে যায়
নাই স্নানাহার। এতক্ষণ ছায়াপ্রায়
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে ঘেঁষে,
চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্নিমেষে
বিদায়ের আয়োজন। শ্রান্তদেহে এবে
বাহিরের দ্বারপ্রান্তে কী জানি কী ভেবে
চুপিচাপি বসে ছিল। কহিনু যখন
'মা গো, আসি' সে কহিল বিষণ্ণ-নয়ন
ম্লান মুখে, 'যেতে আমি দিব না তোমায়।'
যেখানে আছিল বসে রহিল সেথায়,
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার,
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ-অধিকার
প্রচারিল—'যেতে আমি দিব না তোমায়'।
তবুও সময় হল শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হল।

ওরে মোর মূঢ় মেয়ে,
কে রে তুই, কোথা হতে কী শকতি পেয়ে
কহিলি এমন কথা, এত স্পর্ধাভরে—
'যেতে আমি দিব না তোমায়'? চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে দুটি ছোটো হাতে
গরবিনী, সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বসি গৃহদ্বারপ্রান্তে শ্রান্ত ক্ষুদ্র দেহ
শুধু লয়ে ওইটুকু বুকভরা স্নেহ।
ব্যথিত হৃদয় হতে বহু ভয়ে লাজে
মর্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে, শুধু বলে রাখা 'যেতে দিতে
ইচ্ছা নাহি'। হেন কথা কে পারে বলিতে
'যেতে নাহি দিব'! শুনি তোর শিশুমুখে
স্নেহের প্রবল গর্ববাণী, সকৌতুকে
হাসিয়া সংসার টেনে নিয়ে গেল মোরে,
তুই শুধু পরাভূত চোখে জল ভ'রে

দুয়ারে রহিলি বসে ছবির মতন,
আমি দেখে চলে এনু মুছিয়া নয়ন।

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধ-পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো
নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগ-যুগান্তরক্লান্ত দিগন্তবিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিশ্বাস।

কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর
'যেতে আমি দিব না তোমায়'। ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে,
'যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।' সবে
কহে 'যেতে নাহি দিব'। তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে 'যেতে নাহি দিব'।
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব,
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে
কহিতেছে শত বার 'যেতে দিব না রে'।
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন—'যেতে নাহি দিব'। হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদি কাল হতে।
প্রলয়সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে
প্রসারিত-ব্যগ্র-বাহু জ্বলন্ত-আঁখিতে
'দিব না দিব না যেতে' ডাকিতে ডাকিতে
হু হু করে তীব্রবেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে।
সম্মুখ-ঊর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ
'দিব না দিব না যেতে'—নাহি শুনে কেউ,
নাহি কোনো সাড়া।

চারি দিক হতে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি
সেই বিশ্ব-মর্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যাকণ্ঠস্বরে ; শিশুর মতন
বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধরে
যাহা পায় তাই সে হারায়, তবু তো রে
শিথিল হল না মুষ্টি, তবু অবিরত
সেই চারি বৎসরের কন্যাটির মতো
অক্ষুন্ন প্রেমের গর্বে কহিছে সে ডাকি
'যেতে নাহি দিব'। ম্লান মুখ, অশ্রু-আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব,
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব,
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধ কণ্ঠে কয়
'যেতে নাহি দিব'। যত বার পরাজয়
তত বার কহে, 'আমি ভালোবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে!
আমার আকাঙ্ক্ষা-সম এমন আকুল,
এমন সকল-বাড়া, এমন অকূল,
এমন প্রবল, বিশ্বে কিছু আছে আর!'
এত বলি দর্পভরে করে সে প্রচার
'যেতে নাহি দিব'। তখনি দেখিতে পায়,
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলি-সম উড়ে চলে যায়
একটি নিশ্বাসে তার আদরের ধন ;
অশ্রুজলে ভেসে যায় দুইটি নয়ন,
ছিন্নমূল তরু-সম পড়ে পৃথ্বীতলে
হতগর্ব নতশির। তবু প্রেম বলে,
'সত্যভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকার-লিপি।'— তাই স্ফীত বুকে
সর্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে 'মৃত্যু তুমি নাই'।— হেন গর্বকথা!
মৃত্যু হাসে বসি। মরণপীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিষণ্ন নয়ন-'পরে
অশ্রুবাষ্প-সম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে
চির-কম্পমান। আশাহীন শ্রান্ত আশা
টানিয়া রেখেছে এক বিষাদ-কুয়াশা
বিশ্বময়। আজি যেন পড়িছে নয়নে—
দুখানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে
জড়ায়ে পড়িয়া আছে নিখিলেরে ঘিরে,
স্তব্ধ সকাতর। চঞ্চল স্রোতের নীরে

পড়ে আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া—
অশ্রুবৃষ্টিভরা কোন্ মেঘের সে মায়া।

তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্মরে
এত ব্যাকুলতা; অলস ঔদাস্যভরে
মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র লয়ে; বেলা ধীরে যায় চলে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশথের তলে।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর-মাঝে; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন; মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ মর্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো।

জোড়াসাঁকো
১৪ কার্তিক ১২৯৯

সমুদ্রের প্রতি

পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া

হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন; তাই উঠে বেদমন্ত্র-সম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দির-পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে। এ কী সুগম্ভীর স্নেহখেলা
অম্বুনিধি, ছল করি দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা
ধীরি ধীরি পা টিপিয়া পিছু হটি চলি যাও দূরে,
যেন ছেড়ে যেতে চাও; আবার আনন্দপূর্ণ সুরে
উল্লসি ফিরিয়া আসি কল্লোলে ঝাঁপায়ে পড় বুকে—
রাশি রাশি শুভ্রহাস্যে, অশ্রুজলে, স্নেহগর্বসুখে

আর্দ্র করি দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্মল ললাট
আশীর্বাদে। নিত্যবিগলিত তব অন্তর বিরাট,
আদি অন্ত স্নেহরাশি—আদি অন্ত তাহার কোথা রে!
কোথা তার তল! কোথা কূল! বলো কে বুঝিতে পারে
তাহার অগাধ শান্তি, তাহার অপার ব্যাকুলতা,
তার সুগভীর মৌন, তার সমুচ্ছল কলকথা,
তার হাস্য, তার অশ্রুরাশি!—কখনো বা আপনারে
রাখিতে পার না যেন, স্নেহপূর্ণ স্ফীতস্তনভারে
উন্মাদিনী ছুটে এসে ধরণীরে বক্ষে ধর চাপি
নির্দয় আবেগে; ধরা প্রচণ্ড পীড়নে উঠে কাঁপি,
রুদ্ধশ্বাসে ঊর্ধ্বশ্বাসে চীৎকারি উঠিতে চাহে কাঁদি,
উন্মত্ত স্নেহক্ষুধায় রাক্ষসীর মতো তারে বাঁধি
পীড়িয়া নাড়িয়া যেন টুটিয়া ফেলিয়া একেবারে
অসীম অতৃপ্তি-মাঝে গ্রাসিতে নাশিতে চাহ তারে
প্রকাণ্ড প্রলয়ে। পরক্ষণে মহা অপরাধীপ্রায়
পড়ে থাক তটতলে স্তব্ধ হয়ে বিষণ্ন ব্যথায়
নিষণ্ন নিশ্চল—ধীরে ধীরে প্রভাত উঠিয়া এসে
শান্তদৃষ্টি চাহে তোমা-পানে; সন্ধ্যাসখী ভালোবেসে
স্নেহকরস্পর্শ দিয়ে সান্ত্বনা করিয়ে চুপেচুপে
চলে যায় তিমির-মন্দিরে; রাত্রি শোনে বন্ধুরূপে
গুমরি ক্রন্দন তব রুদ্ধ অনুতাপে ফুলে ফুলে।

আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম তার—বোবার ইঙ্গিতভাষা-হেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে, সেও যেন ওই ভাষা জানে,
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ-মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে; সেই জন্মপূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী-'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।
দিক হতে দিগন্তরে যুগ হতে যুগান্তর গণি
তখন আছিলে তুমি একাকিনী অখণ্ড অকূল
আত্মহারা; প্রথম গর্ভের মহা রহস্য বিপুল
না বুঝিয়া। দিবারাত্রি গূঢ় এক স্নেহব্যাকুলতা,
গর্ভিণীর পূর্বরাগ, অলক্ষিতে অপূর্ব মমতা,

অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষারাশি, নিঃসন্তান শূন্য বক্ষোদেশে
নিরন্তর উঠিত ব্যাকুলি। প্রতি প্রাতে উষা এসে
অনুমান করি যেত মহাসন্তানের জন্মদিন,
নক্ষত্র রহিত চাহি নিশি নিশি নিমেষবিহীন
শিশুহীন শয়নশিয়রে। সেই আদিজননীর
জনশূন্য জীবশূন্য স্নেহচঞ্চলতা সুগভীর,
আসন্ন প্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা,
অগাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা
অনাগত মহাভবিষ্যৎ লাগি, হৃদয়ে আমার
যুগান্তরস্মৃতি-সম উদিত হতেছে বারংবার।
আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথাভরে,
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য সুদূর-তরে
উঠিছে মর্মর স্বর। মানবহৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে,
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্ধ-অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি
আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।
তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম তারে সত্য বলি জানে,
সহস্র ব্যাঘাত-মাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে,
জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে,
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ উঠে পুরে।
প্রাণভরা ভাষাহরা দিশাহারা সেই আশা নিয়ে
চেয়ে আছি তোমা-পানে; তুমি সিন্ধু, প্রকাণ্ড হাসিয়ে
টানিয়া নিতেছ যেন মহাবেগে কী নাড়ীর টানে
আমার এ মর্মখানি তোমার তরঙ্গ-মাঝখানে
কোলের শিশুর মতো।

হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি
আমার মানবভাষা। জান কি তোমার ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এ পাশ ও পাশ,
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণ শ্বাস।
নাহি জানে কী যে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃষা,
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকা-জালে। অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহ সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মতো; স্নিগ্ধ মাতৃপাণি
চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারংবার হানি,
সর্বাঙ্গে সহস্র বার দিয়া তারে স্নেহময় চুমা,
বলো তারে, 'শান্তি, শান্তি', বলো তারে, 'ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা'।

রামপুর বোয়ালিয়া
১৭ চৈত্র ১২৯৯

প্রতীক্ষা

ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে
বেঁধেছিস বাসা।
যেখানে নির্জন কুঞ্জে ফুটে আছে যত মোর
স্নেহ-ভালোবাসা,
গোপন মনের আশা, জীবনের দুঃখ সুখ,
মর্মের বেদনা,
চিরদিবসের যত হাসি-অশ্রু-চিহ্ন-আঁকা
বাসনা-সাধনা ;
যেখানে নন্দন-ছায়ে নিঃশঙ্কে করিছে খেলা
অন্তরের ধন,
স্নেহের পুত্তলিগুলি, আজন্মের স্নেহস্মৃতি,
আনন্দকিরণ ;
কত আলো, কত ছায়া, কত ক্ষুদ্র বিহঙ্গের
গীতিময়ী ভাষা—
ওরে মৃত্যু, জানিয়াছি, তারি মাঝখানে এসে
বেঁধেছিস বাসা।

নিশিদিন নিরন্তর জগৎ জুড়িয়া খেলা,
জীবন চঞ্চল।
চেয়ে দেখি রাজপথে চলেছে অশ্রান্তগতি
যত পান্থদল ;
রৌদ্রপাণ্ডু নীলাম্বরে পাখিগুলি উড়ে যায়
প্রাণপূর্ণ বেগে,
সমীরকম্পিত বনে নিশিশেষে নব নব
পুষ্প উঠে জেগে ;
চারি দিকে কত শত দেখাশোনা আনাগোনা
প্রভাতে সন্ধ্যায়,
দিনগুলি প্রতি প্রাতে খুলিতেছে জীবনের
নূতন অধ্যায় ;
তুমি শুধু এক প্রান্তে বসে আছ অহর্নিশি
স্তব্ধ নেত্র খুলি—
মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা উঠ পক্ষ ঝাপটিয়া,
বক্ষ উঠে দুলি।

যে সুদূর সমুদ্রের পরপার-রাজ্য হতে
আসিয়াছ হেথা,
এনেছ কি সেথাকার নূতন সংবাদ কিছু
গোপন বারতা।
সেথা শব্দহীন তীরে ঊর্মিগুলি তালে তালে
মহামন্দ্রে বাজে,

সেই ধ্বনি কী করিয়া ধ্বনিয়া তুলিছ মোর
ক্ষুদ্র বক্ষোমাঝে।
রাত্রি দিন ধ্বক ধ্বক হৃদয়পঞ্জর-তটে
অনন্তের ঢেউ,
অবিশ্রাম বাজিতেছে সুগম্ভীর সমতানে,
শুনিছে না কেউ।
আমার এ হৃদয়ের ছোটোখাটো গীতগুলি,
স্নেহ-কলরব,
তারি মাঝে কে আনিল দিশাহীন সমুদ্রের
সংগীত ভৈরব।

তুই কি বাসিস ভালো আমার এ বক্ষোবাসী
পরান-পক্ষীরে,
তাই এর পার্শ্বে এসে কাছে বসেছিস ঘেঁষে
অতি ধীরে ধীরে!
দিনরাত্রি নির্নিমেষে চাহিয়া নেত্রের পানে
নীরব সাধনা,
নিস্তব্ধ আসনে বসি একাগ্র আগ্রহভরে
রুদ্র আরাধনা।
চপল চঞ্চল প্রিয়া ধরা নাহি দিতে চায়,
স্থির নাহি থাকে,
মেলি নানাবর্ণ পাখা উড়ে উড়ে চলে যায়
নব নব শাখে;
তুই তবু একমনে মৌনব্রত একাসনে
বসি নিরলস।
ক্রমে সে পড়িবে ধরা, গীত বন্ধ হয়ে যাবে,
মানিবে সে বশ।

তখন কোথায় তারে ভুলায়ে লইয়া যাবি
কোন্ শূন্যপথে,
অচৈতন্য প্রেয়সীরে অবহেলে লয়ে কোলে
অন্ধকার রথে!
যেথায় অনাদি রাত্রি রয়েছে চিরকুমারী—
আলোকপরশ
একটি রোমাঞ্চরেখা আঁকে নি তাহার গাত্রে
অসংখ্য বরষ;
সৃজনের পরপ্রান্তে যে অনন্ত অন্তঃপুরে
কভু দৈববশে
দূরতম জ্যোতিষ্কের ক্ষীণতম পদধ্বনি
তিল নাহি পশে,
সেথায় বিরাট পক্ষ দিবি তুই বিস্তারিয়া
বন্ধনবিহীন,

কাঁপিবে বক্ষের কাছে নবপরিণীতা বধূ
নূতন স্বাধীন।

ক্রমে সে কি ভুলে যাবে ধরণীর নীড়খানি
তৃণে পত্রে গাঁথা—
এ আনন্দ-সূর্যালোক, এই স্নেহ, এই গেহ,
এই পুষ্পপাতা?
ক্রমে সে প্রণয়ভরে তোরেও কি করি লবে
আত্মীয় স্বজন,
অন্ধকার বাসরেতে হবে কি দুজনে মিলি
মৌন আলাপন।
তোর স্নিগ্ধ সুগম্ভীর অচঞ্চল প্রেমমূর্তি,
অসীম নির্ভর,
নির্নিমেষ নীল নেত্র, বিশ্বব্যাপ্ত জটাজুট,
নির্বাক অধর—
তার কাছে পৃথিবীর চঞ্চল আনন্দগুলি
তুচ্ছ মনে হবে,
সমুদ্রে মিশিলে নদী বিচিত্র তটের স্মৃতি
স্মরণে কি রবে?

ওগো মৃত্যু, ওগো প্রিয়, তবু থাক্ কিছুকাল
ভুবন-মাঝারে।
এরি মাঝে বধূবেশে অনন্তবাসর-দেশে
লইয়ো না তারে।
এখনো সকল গান করে নি সে সমাপন
সন্ধ্যায় প্রভাতে;
নিজের বক্ষের তাপে মধুর উত্তপ্ত নীড়ে
সুপ্ত আছে রাতে;
পান্থপাখিদের সাথে এখনো যে যেতে হবে
নব নব দেশে,
সিন্ধুতীরে কুঞ্জবনে নব নব বসন্তের
আনন্দ-উদ্দেশে।
ওগো মৃত্যু, কেন তুই এখনি তাহার নীড়ে
বসেছিস এসে?
তার সব ভালোবাসা আঁধার করিতে চাস
তুই ভালোবেসে?

এ যদি সত্যই হয় মৃত্তিকার পৃথ্বী-'পরে
মুহূর্তের খেলা,
এই সব মুখোমুখি এই সব দেখাশোনা
ক্ষণিকের মেলা,

প্রাণপণ ভালোবাসা সেও যদি হয় শুধু
মিথ্যার বন্ধন,
পরশে খসিয়া পড়ে, তার পরে দণ্ড-দুই
অরণ্যে ক্রন্দন,
তুমি শুধু চিরস্থায়ী, তুমি শুধু সীমাশূন্য
মহাপরিণাম,
যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লভে
অনন্ত বিশ্রাম,
তবে মৃত্যু, দূরে যাও, এখনি দিয়ো না ভেঙে
এ খেলার পুরী,
ক্ষণেক বিলম্ব করো, আমার দুদিন হতে
করিয়ো না চুরি।

একদা নামিবে সন্ধ্যা, বাজিবে আরতিশঙ্খ
অদূর মন্দিরে,
বিহঙ্গ নীরব হবে, উঠিবে ঝিল্লির ধ্বনি
অরণ্য-গভীরে,
সমাপ্ত হইবে কর্ম, সংসার-সংগ্রাম-শেষে
জয়পরাজয়,
আসিবে তন্দ্রার ঘোর পান্থের নয়ন-'পরে
ক্লান্ত অতিশয়,
দিনান্তের শেষ আলো দিগন্তে মিলায়ে যাবে,
ধরণী আঁধার,
সুদূরে জ্বলিবে শুধু অনন্তের যাত্রাপথে
প্রদীপ তারার,
শিয়রে শয়ন-শেষে বসি যারা অনিমেষে
তাহাদের চোখে
আসিবে শ্রান্তির ভার নিদ্রাহীন যামিনীতে
স্তিমিত আলোকে—

একে একে চলে যাবে আপন আলয়ে সবে
সখাতে সখীতে,
তৈলহীন দীপশিখা নিবিয়া আসিবে ক্রমে
অর্ধরজনীতে,
উচ্ছ্বসিত সমীরণ আনিবে সুগন্ধ বহি
অদৃশ্য ফুলের,
অন্ধকার পূর্ণ করি আসিবে তরঙ্গধ্বনি
অজ্ঞাত কূলের,
ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে নির্জন শয়নপ্রান্তে
এসো বরবেশে।
আমার পরান-বধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালোবেসে

ধরিবে তোমার বাহু; তখন তাহারে তুমি
মন্ত্র পড়ি নিয়ো,
রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বন দানে
পাণ্ডু করি দিয়ো।

রামপুর বোয়ালিয়া - নাটোর - শিলাইদহ বোট
১৬-২০-২৭ অগ্রহায়ণ ১২৯৯

মানসসুন্দরী

আজ কোনো কাজ নয়—সব ফেলে দিয়ে
ছন্দ বন্ধ গ্রন্থ গীত—এসো তুমি প্রিয়ে,
আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার
কবিতা, কল্পনালতা। শুধু একবার
কাছে বোসো। আজ শুধু কূজন গুঞ্জন
তোমাতে আমাতে; শুধু নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যাকিরণের সুবর্ণ মদিরা—
যতক্ষণ অন্তরের শিরা-উপশিরা
লাবণ্যপ্রবাহভরে ভরি নাহি উঠে,
যতক্ষণে মহানন্দে নাহি যায় টুটে
চেতনাবেদনাবন্ধ, ভুলে যাই সব—
কী আশা মেটে নি প্রাণে, কী সংগীতরব
গিয়েছে নীরব হয়ে, কী আনন্দসুধা
অধরের প্রান্তে এসে অন্তরের ক্ষুধা
না মিটায়ে গিয়াছে শুকায়ে। এই শান্তি,
এই মধুরতা, দিক সৌম্য ম্লান কান্তি
জীবনের দুঃখ দৈন্য অতৃপ্তির 'পর
করুণকোমল আভা গভীর সুন্দর।

বীণা ফেলে দিয়ে এসো, মানসসুন্দরী,
দুটি রিক্ত হস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও—মৃণালপরশে
রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে মর্মান্ত হরষে,
কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছলছল,
মুগ্ধ তনু মরি যায়, অন্তর কেবল
অঙ্গের সীমান্ত-প্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে,
এখনি ইন্দ্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে।
অর্ধেক অঞ্চল পাতি বসাও যতনে
পার্শ্বে তব; সুমধুর প্রিয়সম্বোধনে
ডাকো মোরে, বলো, 'প্রিয়', বলো, 'প্রিয়তম'—
কুন্তল-আকুল মুখ বক্ষে রাখি মম

হৃদয়ের কানে কানে অতি মৃদু ভাষে
সংগোপনে বলে যাও যাহা মুখে আসে
অর্থহারা ভাবে-ভরা ভাষা। অয়ি প্রিয়া,
চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া
বাঁকায়ো না গ্রীবাখানি, ফিরায়ো না মুখ,
উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ
রেখো ওষ্ঠাধরপুটে, ভক্ত ভৃঙ্গ তরে
সম্পূর্ণ চুম্বন এক, হাসি স্তরে স্তরে
সরস সুন্দর; নবস্ফুট পুষ্প-সম
হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীবা বৃন্ত নিরুপম
মুখখানি তুলে ধোরো; আনন্দ-আভায়
বড়ো বড়ো দুটি চক্ষু পল্লবপ্রচ্ছায়
রেখো মোর মুখপানে প্রশান্ত বিশ্বাসে,
নিতান্ত নির্ভরে। যদি চোখে জল আসে
কাঁদিব দুজনে; যদি ললিত কপোলে
মৃদু হাসি ভাসি উঠে, বসি মোর কোলে,
বক্ষ বাঁধি বাহুপাশে, স্কন্ধে মুখ রাখি
হাসিয়ো নীরবে অর্ধ-নিমীলিত আঁখি।
যদি কথা পড়ে মনে তবে কলস্বরে
বলে যেয়ো কথা, তরল আনন্দভরে
নির্ঝরের মতো, অর্ধেক রজনী ধরি
কত-না কাহিনী স্মৃতি কল্পনালহরী—
মধুমাখা কণ্ঠের কাকলি। যদি গান
ভালো লাগে, গেয়ো গান। যদি মুগ্ধপ্রাণ
নিঃশব্দ নিস্তব্ধ শান্ত সম্মুখে চাহিয়া
বসিয়া থাকিতে চাও, তাই রব প্রিয়া।
হেরিব অদূরে পদ্মা, উচ্চতটতলে
শ্রান্ত রূপসীর মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে
প্রসারিয়া তনুখানি, সায়াহ্ন-আলোকে
শুয়ে আছে; অন্ধকার নেমে আসে চোখে
চোখের পাতার মতো; সন্ধ্যাতারা ধীরে
সন্তর্পণে করে পদার্পণ, নদীতীরে
অরণ্যশিয়রে; যামিনী শয়ন তার
দেয় বিছাইয়া, একখানি অন্ধকার
অনন্ত ভুবনে। দোঁহে মোরা রব চাহি
অপার তিমিরে; আর কোথা কিছু নাহি,
শুধু মোর করে তব করতলখানি,
শুধু অতি কাছাকাছি দুটি জনপ্রাণী
অসীম নির্জনে; বিষণ্ণ বিচ্ছেদরাশি
চরাচরে আর সব ফেলিয়াছে গ্রাসি—
শুধু এক প্রান্তে তার প্রলয় মগন
বাকি আছে একখানি শঙ্কিত মিলন,

দুটি হাত, ত্রস্ত কপোতের মতো দুটি
বক্ষ দুরুদুরু—দুই প্রাণে আছে ফুটি
শুধু একখানি ভয়, একখানি আশা,
একখানি অশ্রুভরে নম্র ভালোবাসা।

আজিকে এমনি তবে কাটিবে যামিনী
আলস্য-বিলাসে। অয়ি নিরভিমানিনী,
অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেয়সী,
মোর ভাগ্য-গগনের সৌন্দর্যের শশী,
মনে আছে কবে কোন্ ফুল্ল যূথীবনে,
বহু বাল্যকালে, দেখা হত দুই জনে
আধো-চেনাশোনা? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কী খেলা খেলাতে
সখী, আসিতে হাসিয়া, তরুণ প্রভাতে
নবীন বালিকামূর্তি, শুভ্রবস্ত্র পরি
উষার কিরণধারে সদ্য স্নান করি
বিকচ কুসুম-সম ফুল্ল মুখখানি
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টানি
উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে
শৈশব-কর্তব্য হতে ভুলায়ে আমারে,
ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি,
দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি
পাঠশালা-কারা হতে; কোথা গৃহকোণে
নিয়ে যেতে নির্জনেতে রহস্যভবনে;
জনশূন্য গৃহছাদে আকাশের তলে
কী করিতে খেলা, কী বিচিত্র কথা ব'লে
ভুলাতে আমারে, স্বপ্ন-সম চমৎকার
অর্থহীন, সত্য মিথ্যা তুমি জান তার।
দুটি কর্ণে দুলিত মুকুতা, দুটি করে
সোনার বলয়, দুটি কপোলের 'পরে
খেলিত অলক, দুটি স্বচ্ছ নেত্র হতে
কাঁপিত আলোক, নির্মল নির্ঝর-স্রোতে
চূর্ণরশ্মি-সম। দোঁহে দোঁহা ভালো করে
চিনিবার আগে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসভরে
খেলাধুলা ছুটাছুটি দুজনে সতত—
কথাবার্তা বেশবাস বিথান বিতত।

তার পরে একদিন—কী জানি সে কবে—
জীবনের বনে যৌবনবসন্তে যবে
প্রথম মলয়বায়ু ফেলেছে নিশ্বাস,
মুকুলিয়া উঠিতেছে শত নব আশ,

সহসা চকিত হয়ে আপন সংগীতে
চমকিয়া হেরিলাম—খেলা-ক্ষেত্র হতে
কখন অন্তরলক্ষ্মী এসেছ অন্তরে,
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসি আছ মহিষীর মতো। কে তোমারে
এনেছিল বরণ করিয়া। পুরদ্বারে
কে দিয়াছে হুলুধ্বনি! ভরিয়া অঞ্চল
কে করেছে বরিষন নব পুষ্পদল
তোমার আনম্র শিরে আনন্দে আদরে!
সুন্দর সাহানা-রাগে বংশীর সুস্বরে
কী উৎসব হয়েছিল আমার জগতে,
যেদিন প্রথম তুমি পুষ্পফুল্ল পথে
লজ্জামুকুলিত মুখে রক্তিম অম্বরে
বধূ হয়ে প্রবেশিলে চিরদিনতরে
আমার অন্তর-গৃহে—যে গুপ্ত আলয়ে
অন্তর্যামী জেগে আছে সুখ দুঃখ লয়ে,
যেখানে আমার যত লজ্জা আশা ভয়
সদা কম্পমান, পরশ নাহিকো সয়
এত সুকুমার! ছিলে খেলার সঙ্গিনী,
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কোথা সেই
অমূলক হাসি-অশ্রু, সে চাঞ্চল্য নেই,
সে বাহুল্য কথা। স্নিগ্ধ দৃষ্টি সুগম্ভীর
স্বচ্ছ নীলাম্বর-সম; হাসিখানি স্থির
অশ্রুশিশিরেতে ধৌত; পরিপূর্ণ দেহ
মঞ্জরিত বল্লরীর মতো; প্রীতি স্নেহ
গভীর সংগীততানে উঠিছে ধ্বনিয়া
স্বর্ণবীণাতন্ত্রী হতে রনিয়া রনিয়া
অনন্ত বেদনা বহি। সে অবধি প্রিয়ে,
রয়েছি বিস্মিত হয়ে—তোমারে চাহিয়ে
কোথাও না পাই সীমা। কোন্ বিশ্বপার
আছে তবে জন্মভূমি। সংগীত তোমার
কত দূরে নিয়ে যাবে, কোন্ কল্পলোকে
আমারে করিবে বন্দী গানের পুলকে
বিমুগ্ধ কুরঙ্গসম। এই যে বেদনা,
এর কোনো ভাষা আছে? এই যে বাসনা,
এর কোনো তৃপ্তি আছে? এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চির দিবানিশি
কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোনো কূল আছে? সৌন্দর্যপাথারে

যে বেদনা-বায়ুভরে ছুটে মন-তরী
সে বাতাসে, কত বার মনে শঙ্কা করি,
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল;
অভয় আশ্বাসভরা নয়ন বিশাল
হেরিয়া ভরসা পাই; বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে—আছে এক মহা উপকূল
এই সৌন্দর্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ।

হাসিতেছ ধীরে
চাহি মোর মুখে, ওগো রহস্যমধুরা!
কী বলিতে চাহ মোরে প্রণয়বিধুরা
সীমন্তিনী মোর, কী কথা বুঝাতে চাও।
কিছু বলে কাজ নাই—শুধু ঢেকে দাও
আমার সর্বাঙ্গ মন তোমার অঞ্চলে,
সম্পূর্ণ হরণ করি লহো গো সবলে
আমার আমারে; নগ্ন বক্ষে বক্ষ দিয়া
অন্তররহস্য তব শুনে নিই প্রিয়া।
তোমার হৃদয়কম্প অঙ্গুলির মতো
আমার হৃদয়তন্ত্রী করিবে প্রহত,
সংগীত-তরঙ্গধ্বনি উঠিবে গুঞ্জরি
সমস্ত জীবন ব্যাপি থরথর করি।
নাই বা বুঝিনু কিছু, নাই বা বলিনু,
নাই বা গাঁথিনু গান, নাই বা চলিনু
ছন্দোবন্ধ পথে, সলজ্জ হৃদয়খানি
টানিয়া বাহিরে। শুধু ভুলে গিয়ে বাণী
কাঁপিব সংগীতভরে, নক্ষত্রের প্রায়
শিহরি জ্বলিব শুধু কম্পিত শিখায়,
শুধু তরঙ্গের মতো ভাঙিয়া পড়িব
তোমার তরঙ্গ-পানে, বাঁচিব মরিব
শুধু, আর কিছু করিব না। দাও সেই
প্রকাণ্ড প্রবাহ, যাহে এক মুহূর্তেই
জীবন করিয়া পূর্ণ, কথা না বলিয়া
উন্মত্ত হইয়া যাই উদ্দাম চলিয়া।

মানসীরূপিণী ওগো, বাসনাবাসিনী,
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমিই কি মূর্তিমতী হয়ে
জন্মিবে মানব-গৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্যসুন্দরী? এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হতে মর্তভূমি

করিছ বিহার; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি; বসন্তবাতাসে
চঞ্চল বাসনাব্যথা সুগন্ধ নিশ্বাসে
করিছ প্রকাশ; নিষুপ্ত পূর্ণিমা রাতে
নির্জন গগনে, একাকিনী ক্লান্ত হাতে
বিছাইছ দুগ্ধশুভ্র বিরহশয়ন;
শরৎ-প্রত্যূষে উঠি করিছ চয়ন
শেফালি, গাঁথিতে মালা, ভুলে গিয়ে শেষে
তরুতলে ফেলে দিয়ে, আলুলিত কেশে
গভীর অরণ্য-ছায়ে উদাসিনী হয়ে
বসে থাক; ঝিকিমিকি আলোছায়া লয়ে
কম্পিত অঙ্গুলি দিয়ে বিকালবেলায়
বসন বয়ন কর বকুলতলায়;
অবসন্ন দিবালোকে কোথা হতে ধীরে
ঘনপল্লবিত কুঞ্জে সরোবর-তীরে
করুণ কপোতকণ্ঠে গাও মুলতান;
কখন অজ্ঞাতে আসি ছুঁয়ে যাও প্রাণ
সকৌতুকে; করি দাও হৃদয় বিকল,
অঞ্চল ধরিতে গেলে পালাও চঞ্চল
কলকণ্ঠে হাসি, অসীম আকাঙ্ক্ষারাশি
জাগাইয়া প্রাণে, দ্রুতপদে উপহাসি
মিলাইয়া যাও নভোনীলিমার মাঝে।
কখনো মগন হয়ে আছি যবে কাজে
স্খলিতবসন তব শুভ্র রূপখানি
নগ্ন বিদ্যুতের আলো নয়নেতে হানি
চকিতে চমকি চলি যায়। জানালায়
একেলা বসিয়া যবে আঁধার সন্ধ্যায়,
মুখে হাত দিয়ে, মাতৃহীন বালকের
মতো বহুক্ষণ কাঁদি স্নেহ-আলোকের
তরে—ইচ্ছা করি, নিশার আঁধারস্রোতে
মুছে ফেলে দিয়ে যায় সৃষ্টিপট হতে
এই ক্ষীণ অর্থহীন অস্তিত্বের রেখা,
তখন করুণাময়ী দাও তুমি দেখা
তারকা-আলোক-জ্বালা স্তব্ধ রজনীর
প্রান্ত হতে নিঃশব্দে আসিয়া অশ্রুনীর
অঞ্চলে মুছায়ে দাও, চাও মুখপানে
স্নেহময় প্রশ্নভরা করুণ নয়ানে,
নয়ন চুম্বন কর, স্নিগ্ধ হস্তখানি
ললাটে বুলায়ে দাও, না কহিয়া বাণী,

সান্ত্বনা ভরিয়া প্রাণে, কবিরে তোমার
ঘুম পাড়াইয়া দিয়া কখন আবার
চলে যাও নিঃশব্দ চরণে।

সেই তুমি
মূর্তিতে দিবে কি ধরা? এই মর্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব ঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ, ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি?
নদী হতে লতা হতে আনি তব গতি
অঙ্গে অঙ্গে নানা ভঙ্গে দিবে হিল্লোলিয়া—
বাহুতে বাঁকিয়া পড়ি, গ্রীবায় হেলিয়া
ভাবের বিকাশভরে? কী নীল বসন
পরিবে সুন্দরী তুমি? কেমন কঙ্কণ
ধরিবে দুখানি হাতে? কবরী কেমনে
বাঁধিবে, নিপুণ বেণী বিনায়ে যতনে?
কচি কেশগুলি পড়ি শুভ্র গ্রীবা-'পরে
শিরীষকুসুম-সম সমীরণভরে
কাঁপিবে কেমন? শ্রাবণে দিগন্তপারে
যে গভীর স্নিগ্ধ দৃষ্টি ঘন মেঘভারে
দেখা দেয় নব নীল অতি সুকুমার,
সে দৃষ্টি না জানি ধরে কেমন আকার
নারীচক্ষে! কী সঘন পল্লবের ছায়,
কী সুদীর্ঘ কী নিবিড় তিমির-আভায়
মুগ্ধ অন্তরের মাঝে ঘনাইয়া আনে
সুখবিভাবরী! অধর কী সুধাদানে
রহিবে উন্মুখ, পরিপূর্ণ বাণীভরে
নিশ্চল নীরব! লাবণ্যের থরে থরে
অঙ্গখানি কী করিয়া মুকুলি বিকশি
অনিবার সৌন্দর্যেতে উঠিবে উচ্ছ্বসি
নিঃসহ যৌবনে?

জানি, আমি জানি সখী,
যদি আমাদের দোঁহে হয় চোখোচোখি
সেই পরজন্ম-পথে, দাঁড়াব থমকি;
নিদ্রিত অতীত কাঁপি উঠিবে চমকি
লভিয়া চেতনা। জানি মনে হবে মম
চিরজীবনের মোর ধ্রুবতারা-সম

চিরপরিচয়ভরা ওই কালো চোখ।
আমার নয়ন হতে লইয়া আলোক,
আমার অন্তর হতে লইয়া বাসনা,
আমার গোপন প্রেম করেছে রচনা
এই মুখখানি। তুমিও কি মনে মনে
চিনিবে আমারে? আমাদের দুই জনে
হবে কি মিলন? দুটি বাহু দিয়ে, বালা,
কখনো কি এই কণ্ঠে পরাইবে মালা
বসন্তের ফুলে? কখনো কি বক্ষ ভরি
নিবিড় বন্ধনে, তোমারে হৃদয়েশ্বরী,
পারিব বাঁধিতে? পরশে পরশে দোঁহে
করি বিনিময় মরিব মধুর মোহে
দেহের দুয়ারে? জীবনের প্রতিদিন
তোমার আলোক পাবে বিচ্ছেদবিহীন,
জীবনের প্রতি রাত্রি হবে সুমধুর
মাধুর্যে তোমার, বাজিবে তোমার সুর
সর্ব দেহে মনে? জীবনের প্রতি সুখে
পড়িবে তোমার শুভ্র হাসি, প্রতি দুখে
পড়িবে তোমার অশ্রুজল, প্রতি কাজে
রবে তব শুভহস্ত দুটি, গৃহ-মাঝে
জাগায়ে রাখিবে সদা সুমঙ্গল জ্যোতি।
এ কি শুধু বাসনার বিফল মিনতি,
কল্পনার ছল? কার এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ—
পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কি না তুমি
আমারি জীবন-বনে সৌন্দর্যে কুসুমি,
প্রণয়ে বিকশি। মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।
ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারি ধার।
গৃহের বনিতা ছিলে, টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়—
তবু কোন্ মায়া-ডোরে চিরসোহাগিনী,
হৃদয়ে দিয়েছ ধরা, বিচিত্র রাগিণী
জাগায়ে তুলিছ প্রাণে চিরস্মৃতিময়।
তাই তো এখনো মনে আশা জেগে রয়
আবার তোমারে পাব পরশবন্ধনে।
এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে সৃজনে
জ্বলিছে নিবিছে, যেন খদ্যোতের জ্যোতি,
কখনো বা ভাবময়, কখনো মুরতি।

রজনী গভীর হল, দীপ নিবে আসে;
পদ্মার সুদূর পারে পশ্চিম আকাশে
কখন যে সায়াহ্নের শেষ স্বর্ণরেখা
মিলাইয়া গেছে; সপ্তর্ষি দিয়েছে দেখা
তিমিরগগনে; শেষ ঘট পূর্ণ করে
কখন বালিকা-বধূ চলে গেছে ঘরে;
হেরি কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি, একাদশী তিথি,
দীর্ঘ পথ, শূন্য ক্ষেত্র, হয়েছে অতিথি
গ্রামে গৃহস্থের ঘরে পান্থ পরবাসী;
কখন গিয়েছে থেমে কলরবরাশি
মাঠপারে কৃষিপল্লী হতে; নদীতীরে
বৃদ্ধ কৃষাণের জীর্ণ নিভৃত কুটীরে
কখন জ্বলিয়াছিল সন্ধ্যাদীপখানি,
কখন নিবিয়া গেছে— কিছুই না জানি।

কী কথা বলিতেছিনু, কী জানি, প্রেয়সী,
অর্ধ-অচেতনভাবে মনোমাঝে পশি
স্বপ্নমুগ্ধ-মতো। কেহ শুনেছিলে সে কি,
কিছু বুঝেছিলে প্রিয়ে, কোথাও আছে কি
কোনো অর্থ তার? সব কথা গেছি ভুলে,
শুধু এই নিদ্রাপূর্ণ নিশীথের কূলে
অন্তরের অন্তহীন অশ্রুপারাবার
উদ্বেলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ে আমার
গম্ভীর নিস্বনে।

এসো সুপ্তি, এসো শান্তি,
এসো প্রিয়ে, মুগ্ধ মৌন সকরুণ কান্তি,
বক্ষে মোরে লহো টানি— শোয়াও যতনে
মরণসুস্নিগ্ধ শুভ্র বিস্মৃতিশয়নে।

শিলাইদহ, বোট
৪ পৌষ ১২৯৯

অনাদৃত

তখন তরুণ রবি প্রভাতকালে
আনিছে উষার পূজা সোনার থালে।
সীমাহীন নীল জল
করিতেছে থলথল্,
রাঙা রেখা জ্বলজ্বল্
কিরণমালে।
তখন উঠিছে রবি গগনভালে।

গাঁথিতেছিলাম জাল বসিয়া তীরে।
বারেক অতল-পানে চাহিনু ধীরে—
শুনিনু কাহার বাণী
পরান লইল টানি,
যতনে সে জালখানি
তুলিয়া শিরে
ঘুরায়ে ফেলিয়া দিনু সুদূর নীরে;

নাহি জানি কত কী যে উঠিল জালে।
কোনোটা হাসির মতো কিরণ ঢালে,
কোনোটা বা টলটল্
কঠিন নয়নজল,
কোনোটা শরম-ছল
বধূর গালে,
সেদিন সাগরতীরে প্রভাতকালে।

বেলা বেড়ে ওঠে, রবি ছাড়ি পূরবে
গগনের মাঝখানে ওঠে গরবে।
ক্ষুধাতৃষা সব ভুলি
জাল ফেলে টেনে তুলি,
উঠিল গোধূলি-ধূলি
ধূসর নভে।
গাভীগণ গৃহে ধায় হরষ-রবে।

লয়ে দিবসের ভার ফিরিনু ঘরে,
তখন উঠিছে চাঁদ আকাশ-'পরে।
গ্রামপথে নাহি লোক,
পড়ে আছে ছায়ালোক,
মুদে আসে দুটি চোখ
স্বপনভরে;
ডাকিছে বিরহী পাখি কাতর স্বরে।

সে তখন গৃহকাজ সমাধা করি
কাননে বসিয়া ছিল মালাটি পরি।
কুসুম একটি দুটি
তরু হতে পড়ে টুটি,
সে করিছে কুটিকুটি
নখেতে ধরি;
আলসে আপন মনে সময় হরি।

বারেক আগিয়ে যাই, বারেক পিছু।
কাছে গিয়ে দাঁড়ালেম, নয়ন নিচু।

যা ছিল চরণে রেখে
ভূমিতল দিনু ঢেকে,
সে কহিল দেখে দেখে,
'চিনি নে কিছু।'
শুনি রহিলাম শির করিয়া নিচু।

ভাবিলাম, সারাদিন সারাটি বেলা
বসে বসে করিয়াছি কী ছেলেখেলা!
না জানি কী মোহে ভুলে
গেনু অকূলের কূলে,
ঝাঁপ দিনু কুতূহলে—
আনিনু মেলা
অজানা সাগর হতে অজানা ঢেলা।

বুঝি নাই, খুঁজি নাই হাটের মাঝে,
এমন হেলার ধন দেওয়া কি সাজে!
কোনো দুখ নাহি যার,
কোনো তৃষা বাসনার,
এ-সব লাগিবে তার
কিসের কাজে!
কুড়ায়ে লইনু পুন মনের লাজে।

সারাটি রজনী বসি দুয়ারদেশে
একে একে ফেলে দিনু পথের শেষে।
সুখহীন ধনহীন
চলে গেনু উদাসীন,
প্রভাতে পরের দিন
পথিকে এসে
সব তুলে নিয়ে গেল আপন দেশে।

তালদণ্ডা খাল
পাণ্ডুয়া হইতে কটকের পথে
২২ ফাল্গুন ১২৯১

নদীপথে

গগন ঢাকা ঘন মেঘে,
পবন বহে খর বেগে।
অশনি ঝনঝন
ধ্বনিছে ঘন ঘন,
নদীতে ঢেউ উঠে জেগে।
পবন বহে খর বেগে।

তীরেতে তরুরাজি দোলে
আকুল মর্মর-রোলে।
চিকুর চিকিমিকে
চকিয়া দিকে দিকে
তিমির চিরি যায় চলে।
তীরেতে তরুরাজি দোলে।

ঝরিছে বাদলের ধারা
বিরাম-বিশ্রামহারা।
বারেক থেমে আসে,
দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে
আবার পাগলের পারা
ঝরিছে বাদলের ধারা।

মেঘেতে পথরেখা লীন,
প্রহর তাই গতিহীন।
গগন-পানে চাই,
জানিতে নাহি পাই
গেছে কি নাহি গেছে দিন;
প্রহর তাই গতিহীন।

তীরেতে বাঁধিয়াছি তরী,
রয়েছি সারা দিন ধরি।
এখনো পথ নাকি
অনেক আছে বাকি,
আসিছে ঘোর বিভাবরী।
তীরেতে বাঁধিয়াছি তরী।

বসিয়া তরণীর কোণে
একেলা ভাবি মনে মনে—
মেঝেতে শেজ পাতি
সে আজি জাগে রাতি,
নিদ্রা নাহি দুনয়নে।
বসিয়া ভাবি মনে মনে।

মেঘের ডাক শুনে কাঁপে,
হৃদয় দুই হাতে চাপে।
আকাশ-পানে চায়,
ভরসা নাহি পায়,
তরাসে সারা নিশি যাপে,
মেঘের ডাক শুনে কাঁপে।

কভু বা বায়ুবেগভরে
দুয়ার ঝনঝনি পড়ে।
প্রদীপ নিবে আসে,
ছায়াটি কাঁপে ত্রাসে,
নয়নে আঁখিজল ঝরে,
বক্ষ কাঁপে থরথরে।

চকিত আঁখি দুটি তার
মনে আসিছে বার বার।
বাহিরে মহা ঝড়,
বজ্র কড়মড়,
আকাশ করে হাহাকার।
মনে পড়িছে আঁখি তার।

গগন ঢাকা ঘন মেঘে,
পবন বহে খর বেগে।
অশনি ঝনঝন
ধ্বনিছে ঘন ঘন,
নদীতে ঢেউ উঠে জেগে।
পবন বহে আজি বেগে।

খালপথে [illegible]। অপরাহ্ন
২৩ [illegible] ১২৯৯

দেউল

রচিয়াছিনু দেউল একখানি
অনেক দিনে অনেক দুখ মানি।
রাখি নি তার জানালা দ্বার
সকল দিক অন্ধকার,
ভূধর হতে পাষাণভার
যতনে বহি আনি
রচিয়াছিনু দেউল একখানি।

দেবতাটিরে বসায়ে মাঝখানে
ছিলাম চেয়ে তাহারি মুখপানে।
বাহিরে ফেলি এ ত্রিভুবন
ভুলিয়া গিয়া বিশ্বজন
ধেয়ান তারি অনুক্ষণ
করেছি একপ্রাণে,
দেবতাটিরে বসায়ে মাঝখানে।

যাপন করি অন্তহীন রাতি
জ্বালায়ে শত গন্ধময় বাতি।
কনকমণি-পাত্রপুটে,
সুরভি ধূপধূম্র উঠে,
গুরু অগুরু-গন্ধ ছুটে,
পরান উঠে মাতি।
যাপন করি অন্তহীন রাতি।

নিদ্রাহীন বসিয়া এক চিতে
চিত্র কত এঁকেছি চারি ভিতে।
স্বপ্নসম চমৎকার,
কোথাও নাহি উপমা তার,
কত বরন, কত আকার
কে পারে বরনিতে
চিত্র যত এঁকেছি চারি ভিতে।

স্তম্ভগুলি জড়ায়ে শত পাকে
নাগবালিকা ফণা তুলিয়া থাকে।
উপরে ঘিরি চারিটি ধার
দৈত্যগুলি বিকটাকার,
পাষাণময় ছাদের ভার
মাথায় ধরি রাখে।
নাগবালিকা ফণা তুলিয়া থাকে।

সৃষ্টিছাড়া সৃজন কত মতো।
পক্ষিরাজ উড়িছে শত শত।
ফুলের মতো লতার মাঝে
নারীর মুখ বিকশি রাজে
প্রণয়ভরা বিনয়ে লাজে
নয়ন করি নত।
সৃষ্টিছাড়া সৃজন কত মতো।

ধ্বনিত এই ধরার মাঝখানে
শুধু এ গৃহ শব্দ নাহি জানে।
ব্যাঘ্রাজিন-আসন পাতি
বিবিধরূপ ছন্দ গাঁথি
মন্ত্র পড়ি দিবস রাতি
গুঞ্জরিত তানে,
শব্দহীন গৃহের মাঝখানে।

এমন করে গিয়েছে কত দিন,
জানি নে কিছু, আছি আপন-লীন।
চিত্ত মোর নিমেষহত
ঊর্ধ্বমুখী শিখার মতো,
শরীরখানি মূর্ছাহত
ভাবের তাপে ক্ষীণ।
এমন করে গিয়েছে কত দিন।

একদা এক বিষম ঘোর স্বরে
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।
বেদনা এক তীক্ষ্ণতম
পশিল গিয়ে হৃদয়ে মম,
অগ্নিময় সর্পসম
কাটিল অন্তরে।
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।

পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি,
গৃহের মাঝে দিবস উঠে ফুটি।
নীরব ধ্যান করিয়া চুর
কঠিন বাঁধ করিয়া দূর
সংসারের অশেষ সুর
ভিতরে এল ছুটি।
পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি।

দেবতা-পানে চাহিনু একবার,
আলোক আসি পড়েছে মুখে তাঁর।
নূতন এক মহিমারাশি
ললাটে তাঁর উঠেছে ভাসি,
জাগিছে এক প্রসাদহাসি
অধর-চারিধার।
দেবতা-পানে চাহিনু একবার।

শরমে দীপ মলিন একেবারে
লুকাতে চাহে চির-অন্ধকারে।
শিকলে বাঁধা স্বপ্নমতো
ভিত্তি-আঁকা চিত্র যত
আলোক দেখি লজ্জাহত
পালাতে নাহি পারে।
শরমে দীপ মলিন একেবারে।

যে গান আমি নারিনু রচিবারে
সে গান আজি উঠিল চারি ধারে।

আমার দীপ জ্বালিল রবি,
প্রকৃতি আসি আঁকিল ছবি,
গাঁথিল গান শতেক কবি
কতই ছন্দ-হারে।
কী গান আজি উঠিল চারি ধারে।

দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি—
ভিতরে আর বাহিরে কোলাকুলি,
দেবের করপরশ লাগি
দেবতা মোর উঠিল জাগি,
বন্দী নিশি গেল সে ভাগি
আঁধার পাখা তুলি।
দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি।

তালদণ্ডা খাল
বালিয়া হইতে কটক-পথে
২৩ ফাল্গুন ১২৯৯

বিশ্বনৃত্য

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা!
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য,
বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সংগীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।

সঘন অশ্রুমগন হাস্য
জাগিবে তাহার বদনে।
প্রভাত-অরুণকিরণরশ্মি
ফুটিবে তাহার নয়নে।
দক্ষিণ করে ধরিয়া যন্ত্র
ঝনন রণন স্বর্ণতন্ত্র,
কাঁপিয়া উঠিবে মোহন মন্ত্র
নির্মল নীল গগনে।

হা হা করি সবে উচ্ছল রবে
চঞ্চল কলকলিয়া
চৌদিক হতে উন্মাদ স্রোতে
আসিবে তূর্ণ চলিয়া।

ছুটিবে সঙ্গে মহাতরঙ্গে
ঘিরিয়া তাঁহারে হরষরঙ্গে
বিঘ্নতরণ চরণভঙ্গে
পথকণ্টক দলিয়া।

দ্যুলোক চাহিয়া সে লোকসিন্ধু
বন্ধনপাশ নাশিবে,
অসীম পুলকে বিশ্ব-ভূলোকে
অঙ্কে তুলিয়া হাসিবে।
ঊর্মিলীলায় সূর্যকিরণ
ঠিকরি উঠিবে হিরণবরন,
বিঘ্ন বিপদ দুঃখ-মরণ
ফেনের মতন ভাসিবে।

ওগো কে বাজায়—বুঝি শোনা যায়—
মহা রহস্যে রসিয়া,
চিরকাল ধরে গম্ভীর স্বরে
অম্বর-'পরে বসিয়া।
গ্রহমণ্ডল হয়েছে পাগল,
ফিরিছে নাচিয়া চিরচঞ্চল,
গগনে গগনে জ্যোতি-অঞ্চল
পড়িছে খসিয়া খসিয়া।

ওগো কে বাজায়—কে শুনিতে পায়—
না জানি কী মহা রাগিণী!
দুলিয়া ফুলিয়া নাচিছে সিন্ধু
সহস্রশির নাগিনী।
ঘন অরণ্য আনন্দে দুলে—
অনন্ত নভে শত বাহু তুলে,
কী গাহিতে গিয়ে কথা যায় ভুলে,
মর্মর দিনযামিনী।

নির্ঝর ঝরে উচ্ছ্বাসভরে
বন্ধুর শিলা-সরণে।
ছন্দে ছন্দে সুন্দর গতি
পাষাণহৃদয়-হরণে।
কোমল কণ্ঠে কুল কুলু সুর
ফুটে অবিরল তরল মধুর,
সদাশিঞ্জিত মানিকনূপুর
বাঁধা চঞ্চল চরণে।

নাচে ছয় ঋতু, না মানে বিরাম,
বাহুতে বাহুতে ধরিয়া
শ্যামল স্বর্ণ বিবিধ বর্ণ
নব নব বাস পরিয়া।
চরণ ফেলিতে কত বনফুল
ফুটে ফুটে টুটে হইয়া আকুল,
উঠে ধরণীর হৃদয় বিপুল
হাসি-ক্রন্দনে ভরিয়া।

পশু-বিহঙ্গ কীটপতঙ্গ
জীবনের ধারা ছুটিছে।
কী মহা খেলায় মরণবেলায়
তরঙ্গ তার টুটিছে।
কোনোখানে আলো কোনোখানে ছায়া,
জেগে জেগে ওঠে নব নব কায়া,
চেতনাপূর্ণ অদ্ভুত মায়া
বুদ্বুদ-সম ফুটিছে।

ওই কে বাজায় দিবসনিশায়
বসি অন্তর-আসনে,
কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর,
কেহ শোনে কেহ না শোনে।
অর্থ কী তার ভাবিয়া না পাই,
কত গুণী জ্ঞানী চিন্তিছে তাই,
মহান মানব-মানস সদাই
উঠে পড়ে তারি শাসনে।

শুধু হেথা কেন আনন্দ নাই,
কেন আছে সবে নীরবে।
তারকা না দেখি পশ্চিমাকাশে,
প্রভাত না দেখি পুরবে।
শুধু চারি দিকে প্রাচীন পাষাণ
জগৎ-ব্যাপ্ত সমাধিসমান
গ্রাসিয়া রেখেছে অযুত পরান,
রয়েছে অটল গরবে।

সংসারস্রোত জাহ্নবী-সম
বহু দূরে গেছে সরিয়া।
এ শুধু ঊষর বালুকাধূসর
মরুরূপে আছে মরিয়া।
নাহি কোনো গতি, নাহি কোনো গান,
নাহি কোনো কাজ, নাহি কোনো প্রাণ,

বসে আছে এক মহানির্বাণ,
আঁধার-মুকুট পরিয়া।

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানবহৃদয়ে মিশিতে—
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস-নিশীথে।
আজন্মকাল পড়ে আছি মৃত
জড়তার মাঝে হয়ে পরাজিত,
একটি বিন্দু জীবন-অমৃত
কে গো দিবে এই তৃষিতে।

জগৎ-মাতানো সংগীততানে
কে দিবে এদের নাচায়ে!
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দিবে এদের বাঁচায়ে!
ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতিজালপাশ,
মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস,
ঘুচায়ে ফেলিয়া মিথ্যা তরাস
ভাঙিবে জীর্ণ খাঁচা এ।

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
বাজুক বিশ্ববাজনা!
উঠুক চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হয়ে আপনা।
টুটুক বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সংগীতে নূতন ছন্দ—
হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাক নবীন বাসনা।

বৈতরণী। জাহাজ 'উড়িয়া'
কটক হইতে কলিকাতা-পথে
২৬ ফাল্গুন ১২৯৯

দুর্বোধ

তুমি মোরে পার না বুঝিতে?
প্রশান্ত বিষাদভরে
দুটি আঁখি প্রশ্ন ক'রে
অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে,
চন্দ্রমা যেমন ভাবে স্থিরনতমুখে
চেয়ে দেখে সমুদ্রের বুকে।

কিছু আমি করি নি গোপন।
যাহা আছে সব আছে
তোমার আঁখির কাছে
প্রসারিত অবারিত মন।
দিয়েছি সমস্ত মোর করিতে ধারণা,
তাই মোরে বুঝিতে পার না?

এ যদি হইত শুধু মণি,
শত খণ্ড করি তারে
সযত্নে বিবিধাকারে
একটি একটি করি গণি
একখানি সূত্রে গাঁথি একখানি হার
পরাতেম গলায় তোমার।

এ যদি হইত শুধু ফুল,
সুগোল সুন্দর ছোটো,
উষালোকে ফোটো-ফোটো,
বসন্তের পবনে দোদুল,
বৃন্ত হতে সযতনে আনিতাম তুলে,
পরায়ে দিতেম কালো চুলে।

এ যে সখী, সমস্ত হৃদয়।
কোথা জল, কোথা কূল,
দিক হয়ে যায় ভুল,
অন্তহীন রহস্যনিলয়।
এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান রানী—
এ তবু তোমার রাজধানী।

কী তোমারে চাহি বুঝাইতে?
গভীর হৃদয়-মাঝে
নাহি জানি কী যে বাজে
নিশিদিন নীরব সংগীতে—
শব্দহীন স্তব্ধতায় ব্যাপিয়া গগন
রজনীর ধ্বনির মতন।

এ যদি হইত শুধু সুখ,
কেবল একটি হাসি
অধরের প্রান্তে আসি
আনন্দ করিত জাগরূক।
মুহূর্তে বুঝিয়া নিতে হৃদয়বারতা,
বলিতে হত না কোনো কথা।

এ যদি হইত শুধু দুখ,
দুটি বিন্দু অশ্রুজল
দুই চক্ষে ছলছল,
বিষণ্ণ অধর, ম্লান মুখ—
প্রত্যক্ষ দেখিতে পেতে অন্তরের ব্যথা,
নীরবে প্রকাশ হত কথা।

এ যে সখী, হৃদয়ের প্রেম,
সুখদুঃখবেদনার
আদি অন্ত নাহি যার—
চিরদৈন্য চিরপূর্ণ হেম।
নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবারাতে,
তাই আমি না পারি বুঝাতে।

নাই বা বুঝিলে তুমি মোরে!
চিরকাল চোখে চোখে
নূতন নূতনালোকে
পাঠ করো রাত্রি দিন ধরে।
বুঝা যায় আধো প্রেম, আধখানা মন—
সমস্ত কে বুঝেছে কখন?

পদ্মায়। 'মিনো' জাহাজ
রাজশাহী যাইবার পথে
১১ চৈত্র ১২৯৯

ঝুলন

আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে
মরণখেলা
নিশীথবেলা।
সঘন বরষা, গগন আঁধার,
হেরো বারিধারে কাঁদে চারি ধার,
ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে
ভাসাই ভেলা;
বাহির হয়েছি স্বপ্নশয়ন
করিয়া হেলা
রাত্রিবেলা।

ওগো, পবনে গগনে সাগরে আজিকে
কী কল্লোল,
দে দোল্ দোল্।
পশ্চাৎ হতে হা হা ক'রে হাসি
মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি,

যেন এ লক্ষ যক্ষশিশুর
অট্টরোল।
আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে
হট্টগোল।
দে দোল্ দোল্।

আজি জাগিয়া উঠিয়া পরান আমার
বসিয়া আছে
বুকের কাছে।
থাকিয়া থাকিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
ধরিছে আমার বক্ষ চাপিয়া,
নিঠুর নিবিড় বন্ধনসুখে
হৃদয় নাচে,
ত্রাসে উল্লাসে পরান আমার
ব্যাকুলিয়াছে
বুকের কাছে।

হায়, এতকাল আমি রেখেছিনু তারে
যতনভরে
শয়ন-'পরে।
ব্যথা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে,
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে
বাসরশয়ন করেছি রচন
কুসুম-থরে,
দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তারে
গোপন ঘরে
যতনভরে।

কত সোহাগ করেছি চুম্বন করি
নয়নপাতে
স্নেহের সাথে।
শুনায়েছি তারে মাথা রাখি পাশে
কত প্রিয় নাম মৃদু মধুভাষে,
গুঞ্জরতান করিয়াছি গান
জ্যোৎস্নারাতে।
যা-কিছু মধুর দিয়েছিনু তার
দুখানি হাতে
স্নেহের সাথে।

শেষে সুখের শয়নে শ্রান্ত পরান
আলস-রসে
আবেশবশে।

পরশ করিলে জাগে না সে আর,
কুসুমের হার লাগে গুরুভার,
ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার
নিশিদিবসে।
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ
মরমে পশে
আবেশবশে।

ঢালি মধুরে মধুর বধুরে আমার
হারাই বুঝি,
পাই নে খুঁজি।
বাসরের দীপ নিবে নিবে আসে—
ব্যাকুল নয়নে হেরি চারি পাশে
শুধু রাশি রাশি শুষ্ক কুসুম
হয়েছে পুঁজি।
অতল স্বপ্নসাগরে ডুবিয়া
মরি যে যুঝি
কাহারে খুঁজি।

তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে
নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।
মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া
মারিবে ঠেলা,
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে
ঝুলনখেলা
নিশীথবেলা।

দে দোল্ দোল্।
দে দোল্ দোল্।
এ মহাসাগরে তুফান তোল্।
বধূরে আমার পেয়েছি আবার—
ভরেছে কোল।
প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে
প্রলয়রোল।
বক্ষ-শোণিতে উঠেছে আবার
কী হিল্লোল!
ভিতরে বাহিরে জেগেছে আমার
কী কল্লোল!

উড়ে কুন্তল, উড়ে অঞ্চল,
উড়ে বনমালা বায়ুচঞ্চল,
বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিণী
মত্ত-বোল।
দে দোল্ দোল্।
আয় রে ঝঞ্ঝা, পরান-বধূর
আবরণরাশি করিয়া দে দূর,
করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন-
বসন খোল্।
দে দোল্ দোল্।

প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয়-লাজ,
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে
ভাবে বিভোল।
দে দোল্ দোল্।
স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরেছে আজ
দুটো পাগল।
দে দোল্ দোল্।

রামপুর বোয়ালিয়া
১৪ চৈত্র ১২৯৯

হৃদয়-যমুনা

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো এসো, মোর
হৃদয়নীরে।
তলতল ছলছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে।
আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড়কুন্তল-সম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।
ওই যে শবদ চিনি নূপুর রিনিকিঝিনি,
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে।
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো এসো, মোর
হৃদয়নীরে।

যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে—
হেথা শ্যাম দূর্বাদল, নবনীল নভস্তল,
বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে।
দুটি কালো আঁখি দিয়া মন যাবে বাহিরিয়া,
অঞ্চল খসিয়া গিয়া পড়িবে খুলে।

চাহিয়া বঞ্জুলবনে কী জানি পড়িবে মনে
বসি কুঞ্জে তৃণাসনে শ্যামল কূলে!
যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে।

যদি গাহন করিতে চাহ, এসো নেমে এসো হেথা
গহনতলে।
নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এসো আজ,
ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে।
সোহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি,
উচ্ছ্বসি পড়িবে আসি উরসে গলে--
ঘুরে ফিরে চারি পাশে কভু কাঁদে কভু হাসে,
কুলুকুলু কলভাষে কত কী ছলে!
যদি গাহন করিতে চাহ, এসো নেমে এসো হেথা
গহনতলে।

যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিল-মাঝে।
স্নিগ্ধ শান্ত সুগভীর, নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যু-সম নীল নীর স্থির বিরাজে।
নাহি রাত্রি দিনমান, আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভুলে, নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে।
যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিল-মাঝে।

১২ আষাঢ় ১৩০০

ব্যর্থ যৌবন

আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে?
কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল
নয়নে!
এ বেশভূষণ লহো সখী, লহো,
এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ—
এমন যামিনী কাটিল, বিরহ-
শয়নে।
আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে।

আমি বৃথা অভিসারে এ যমুনাপারে
         এসেছি।
বহি বৃথা মনোআশা এত ভালোবাসা
         বেসেছি।
শেষে নিশিশেষে বদন মলিন,
ক্লান্ত চরণ, মন উদাসীন,
ফিরিয়া চলেছি কোন্ সুখহীন
         ভবনে!
হায়, যে রজনী যায় ফিরাইব তায়
         কেমনে?

কত উঠেছিল চাঁদ নিশীথ-অগাধ
         আকাশে!
বনে দুলেছিল ফুল গন্ধব্যাকুল
         বাতাসে।
তরুমর্মর, নদীকলতান
কানে লেগেছিল স্বপ্ন-সমান,
দূর হতে আসি পশেছিল গান
         শ্রবণে।
আজি সে রজনী যায়, ফিরাইব তায়
         কেমনে।

মনে লেগেছিল হেন আমারে সে যেন
         ডেকেছে।
যেন চিরযুগ ধরে মোরে মনে করে
         রেখেছে।
সে আনিবে বহি ভরা অনুরাগ,
যৌবননদী করিবে সজাগ,
আসিবে নিশীথে, বাঁধিবে সোহাগ-
         বাঁধনে।
আহা, সে রজনী যায়, ফিরাইব তায়
         কেমনে।

ওগো, ভোলা ভালো তবে, কাঁদিয়া কী হবে
         মিছে আর?
যদি যেতে হল হায়, প্রাণ কেন চায়
         পিছে আর?
কুঞ্জদুয়ারে অবোধের মতো
রজনীপ্রভাতে বসে রব কত!

এবারের মতো বসন্ত গত
জীবনে।
হায় যে রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে।

১৬ আষাঢ় ১৩০০

ভরা ভাদরে

নদী ভরা কূলে কূলে, খেতে ভরা ধান।
আমি ভাবিতেছি বসে কী গাহিব গান।
কেতকী জলের ধারে
ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে,
নিরাকুল ফুলভারে
বকুল-বাগান।
কানায় কানায় পূর্ণ আমার পরান।

ঝিলিমিলি করে পাতা, ঝিকিমিকি আলো
আমি ভাবিতেছি কার আঁখিদুটি কালো।
কদম্ব গাছের সার,
চিকন পল্লবে তার
গন্ধে-ভরা অন্ধকার
হয়েছে ঘোরালো।
কারে বলিবারে চাহি কারে বাসি ভালো।

অম্লান উজ্জ্বল দিন, বৃষ্টি অবসান।
আমি ভাবিতেছি আজি কী করিব দান।
মেঘখণ্ড থরে থরে
উদাস বাতাস-ভরে
নানা ঠাঁই ঘুরে মরে
হতাশ-সমান।
সাধ যায় আপনারে করি শতখান।

দিবস অবশ যেন হয়েছে আলসে।
আমি ভাবি আর কেহ কী ভাবিছে বসে।
তরুশাখে হেলাফেলা
কামিনীফুলের মেলা,
থেকে থেকে সারাবেলা
পড়ে খ'সে খ'সে।
কী বাঁশি বাজিছে সদা প্রভাতে প্রদোষে।

পাখির প্রমোদগানে পূর্ণ বনস্থল।
আমি ভাবিতেছি চোখে কেন আসে জল।
দোয়েল দুলায়ে শাখা
গাহিছে অমৃতমাখা,
নিভৃত পাতায় ঢাকা
কপোতযুগল।
আমারে সকলে মিলে করেছে বিকল।

২৭ আষাঢ় ১৩০০

প্রত্যাখ্যান

অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না।
অমন সুধা-করুণ সুরে
গেয়ো না।
সকালবেলা সকল কাজে
আসিতে যেতে পথের মাঝে
আমারি এই আঙিনা দিয়ে
যেয়ো না।
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না।

মনের কথা রেখেছি মনে
যতনে,
ফিরিছ মিছে মাগিয়া সেই
রতনে।
তুচ্ছ অতি, কিছু সে নয়,
দু-চারি ফোঁটা অশ্রুময়
একটি শুধু শোণিত-রাঙা
বেদনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না।

কাহার আশে দুয়ারে কর
হানিছ?
না জানি তুমি কী মোরে মনে
মানিছ!
রয়েছি হেথা লুকাতে লাজ,
নাহিকো মোর রানীর সাজ,

পরিয়া আছি জীর্ণচীর
 বাসনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি
 চেয়ো না।

কী ধন তুমি এনেছ ভরি
 দু-হাতে।
অমন করি যেয়ো না ফেলি
 ধুলাতে।
এ ঋণ যদি শুধিতে চাই
কী আছে হেন, কোথায় পাই—
জনম-তরে বিকাতে হবে
 আপনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি
 চেয়ো না।

ভেবেছি মনে, ঘরের কোণে
 রহিব।
গোপন দুখ আপন বুকে
 বহিব।
কিসের লাগি করিব আশা,
বলিতে চাহি, নাহিকো ভাষা,
রয়েছে সাধ, না জানি তার
 সাধনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি
 চেয়ো না।

যে সুর তুমি ভরেছ তব
 বাঁশিতে
উহার সাথে আমি কি পারি
 গাহিতে।
গাহিতে গেলে ভাঙিয়া গান
উছলি উঠে সকল প্রাণ,
না মানে রোধ অতি অবোধ
 রোদনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি
 চেয়ো না।

এসেছ তুমি গলায় মালা
 ধরিয়া,
নবীন বেশ, শোভন ভূষা
 পরিয়া।

হেথায় কোথা কনকথালা,
কোথায় ফুল, কোথায় মালা—
বাসরসেবা করিবে কে বা
রচনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না।

ভুলিয়া পথ এসেছ সখা,
এ ঘরে।
অন্ধকারে মালা-বদল
কে করে।
সন্ধ্যা হতে কঠিন ভুঁয়ে
একাকী আমি রয়েছি শুয়ে,
নিবায়ে দীপ জীবননিশি
যাপনা।
অমন দীন-নয়নে আর
চেয়ো না।

২৭ আষাঢ় ১৩০০

লজ্জা

আমার হৃদয় প্রাণ
সকলি করেছি দান,
কেবল শরমখানি রেখেছি।
চাহিয়া নিজের পানে
নিশিদিন সাবধানে
সযতনে আপনারে ঢেকেছি।

হে বঁধু, এ স্বচ্ছ বাস
করে মোরে পরিহাস,
সতত রাখিতে নারি ধরিয়া—
চাহিয়া আঁখির কোণে
তুমি হাস মনে মনে,
আমি তাই লাজে যাই মরিয়া।

দক্ষিণ পবনভরে
অঞ্চল উড়িয়া পড়ে
কখন যে, নাহি পারি লখিতে,
পুলকব্যাকুল হিয়া
অঙ্গে উঠে বিকশিয়া,
আবার চেতনা হয় চকিতে।

বন্ধ গৃহে করি বাস
রুদ্ধ যবে হয় শ্বাস
আধেক বসনবন্ধ খুলিয়া
বসি গিয়া বাতায়নে,
সুখসন্ধ্যাসমীরণে
ক্ষণতরে আপনারে ভুলিয়া।

পূর্ণচন্দ্রকররাশি
মূর্ছাতুর পড়ে আসি
এই নবযৌবনের মুকুলে,
অঙ্গ মোর ভালোবেসে
ঢেকে দেয় মৃদু হেসে
আপনার লাবণ্যের দুকূলে—

মুখে বক্ষে কেশপাশে
ফিরে বায়ু খেলা-আশে,
কুসুমের গন্ধ ভাসে গগনে—
হেনকালে তুমি এলে
মনে হয় স্বপ্ন ব'লে,
কিছু আর নাহি থাকে স্মরণে।

থাক্ বঁধু, দাও ছেড়ে,
ওটুকু নিয়ো না কেড়ে,
এ শরম দাও মোরে রাখিতে—
সকলের অবশেষ
এইটুকু লাজলেশ
আপনারে আধখানি ঢাকিতে।

ছলছল-দুনয়ান
করিয়ো না অভিমান,
আমিও যে কত নিশি কেঁদেছি,
বুঝাতে পারি নে যেন
সব দিয়ে তবু কেন
সবটুকু লাজ দিয়ে বেঁধেছি—

কেন যে তোমার কাছে
একটু গোপন আছে,
একটু রয়েছি মুখ হেলায়ে।
এ নহে গো অবিশ্বাস—
নহে সখা, পরিহাস,
নহে নহে ছলনার খেলা এ।

বসন্তনিশীথে বঁধু,
লহো গন্ধ, লহো মধু,
সোহাগে মুখের পানে তাকিয়ো।
দিয়ো দোল আশেপাশে,
কোয়ো কথা মৃদু ভাষে—
শুধু এর বৃন্তটুকু রাখিয়ো।

সেটুকুতে ভর করি
এমন মাধুরী ধরি
তোমা-পানে আছি আমি ফুটিয়া,
এমন মোহনভঙ্গে
আমার সকল অঙ্গে
নবীন লাবণ্য যায় লুটিয়া।

এমন সকল বেলা
পবনে চঞ্চল খেলা,
বসন্তকুসুম-মেলা দুধারি।
শুন বঁধু, শুন তবে
সকলি তোমার হবে,
কেবল শরম থাক্ আমারি।

২৮ আষাঢ় ১৩০০

পুরস্কার

সেদিন বরষা ঝরঝর ঝরে,
কহিল কবির স্ত্রী,
'রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়ো,
রচিতেছ বসি পুঁথি বড়ো বড়ো,
মাথার উপরে বাড়ি পড়ো-পড়ো
তার খোঁজ রাখ কি!
গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব—
মাথা ও মুণ্ড, ছাই ও ভস্ম;
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব,
না মিলে শস্যকণা।
অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা,
নিশিদিন ধরে এ কী ছেলেখেলা,
ভারতীরে ছাড়ি ধরো এইবেলা
লক্ষ্মীর উপাসনা।
ওগো ফেলে দাও পুঁথি ও লেখনী,
যা করিতে হয় করহ এখনি।

এত শিখিয়াছ, এটুকু শেখ নি
　　কিসে কড়ি আসে দুটো।'
দেখি সে মুরতি সর্বনাশিয়া
কবির পরান উঠিল ত্রাসিয়া,
পরিহাসছলে ঈষৎ হাসিয়া
　　কহে জুড়ি করপুট—
'ভয় নাহি করি ও মুখ-নাড়ারে,
লক্ষ্মী সদয় লক্ষ্মীছাড়ারে,
ঘরেতে আছেন নাইকো ভাঁড়ারে
　　এ কথা শুনিবে কে বা।
আমার কপালে বিপরীত ফল,
চপলা লক্ষ্মী মোরে অচপল,
ভারতী না থাকে থির এক পল
　　এত করি তাঁর সেবা।
তাই তো কপাটে লাগাইয়া খিল
স্বর্গে মর্তে খুঁজিতেছি মিল,
আনমনা যদি হই এক তিল
　　অমনি সর্বনাশ।'
মনে মনে হাসি মুখ করি ভার
কহে কবিজায়া, 'পারি নেকো আর,
ঘর-সংসার গেল ছারেখার,
　　সব তাতে পরিহাস।'
এতেক বলিয়া বাঁকায়ে মুখানি
শিঞ্জিত করি কাঁকন দুখানি
চঞ্চল করে অঞ্চল টানি
　　রোষছলে যায় চলি।
হেরি সে ভুবন-গরব-দমন
অভিমানবেগে অধীর গমন,
উচাটন কবি কহিল, 'অমন
　　যেয়ো না হৃদয় দলি।
ধরা নাহি দিলে ধরিব দু-পায়
কী করিতে হবে বলো সে উপায়,
ঘর ভরি দিব সোনায় রুপায়,
　　বুদ্ধি জোগাও তুমি।
একটুকু ফাঁকা যেখানে যা পাই
তোমার মুরতি সেখানে চাপাই,
বুদ্ধির চাষ কোনোখানে নাই—
　　সমস্ত মরুভূমি।'
'হয়েছে, হয়েছে, এত ভালো নয়'
হাসিয়া রুষিয়া গৃহিণী ভনয়,
'যেমন বিনয় তেমনি প্রণয়
　　আমার কপালগুণে।

কথার কখনো ঘটে নি অভাব,
যখনি বলেছি পেয়েছি জবাব,
একবার ওগো বাক্য-নবাব
চলো দেখি কথা শুনে।
শুভ দিনখন দেখো পাঁজি খুলি,
সঙ্গে করিয়া লহো পুঁথিগুলি,
ক্ষণিকের তরে আলস্য ভুলি
চলো রাজসভা-মাঝে।
আমাদের রাজা গুণীর পালক,
মানুষ হইয়া গেল কত লোক—
ঘরে তুমি জমা করিলে শোলোক
লাগিবে কিসের কাজে!'
কবির মাথায় ভাঙি পড়ে বাজ,
ভাবিল, 'বিপদ দেখিতেছি আজ,
কখনো জানি নে রাজা-মহারাজ—
কপালে কী জানি আছে!'
মুখে হেসে বলে, 'এই বই নয়!
আমি বলি আরো কী করিতে হয়—
প্রাণ দিতে পারি, শুধু জাগে ভয়
বিধবা হইবে পাছে।
যেতে যদি হয় দেরিতে কী কাজ,
ত্বরা করে তবে নিয়ে এসো সাজ,
হেমকুণ্ডল, মণিময় তাজ,
কেয়ূর, কনকহার।
বলে দাও মোর সারথিরে ডেকে
ঘোড়া বেছে নেয় ভালো ভালো দেখে,
কিংকরগণ সাথে যাবে কে কে
আয়োজন করো তার।'
ব্রাহ্মণী কহে, 'মুখাগ্রে যার
বাধে না কিছুই, কী চাহে সে আর,
মুখ ছুটাইলে রথাশ্বে তার
না দেখি আবশ্যক।
নানা বেশভূষা হীরা রুপা সোনা
এনেছি পাড়ার করি উপাসনা,
সাজ করে লও পুরায়ে বাসনা,
রসনা ক্ষান্ত হোক।'
এতেক বলিয়া ত্বরিতচরণ
আনে বেশবাস নানান ধরন;
কবি ভাবে মুখ করি বিবরন,
'আজিকে গতিক মন্দ।'
গৃহিণী স্বয়ং নিকটে বসিয়া
তুলিল তাহারে মাজিয়া ঘষিয়া,

আপনার হাতে যতনে কষিয়া
পরাইল কটিবন্ধ।
উষ্ণীষ আনি মাথায় চড়ায়,
কণ্ঠী আনিয়া কণ্ঠে জড়ায়,
অঙ্গদ দুটি বাহুতে পরায়,
কুণ্ডল দেয় কানে।
অঙ্গে যতই চাপায় রতন
কবি বসি থাকে ছবির মতন,
প্রেয়সীর নিজ হাতের যতন
সেও আজি হার মানে।
এই মতে দুই প্রহর ধরিয়া
বেশভূষা সব সমাধা করিয়া
গৃহিণী নিরখে ঈষৎ সরিয়া
বাঁকায়ে মধুর গ্রীবা।
হেরিয়া কবির গম্ভীর মুখ
হৃদয়ে উপজে মহা কৌতুক,
হাসি উঠি কহে ধরিয়া চিবুক,
'আ মরি সেজেছ কিবা!'
ধরিল সমুখে আরশি আনিয়া,
কহিল বচন অমিয় ছানিয়া,
'পুরনারীদের পরান হানিয়া
ফিরিয়া আসিবে আজি—
তখন দাসীরে ভুলো না গরবে,
এই উপকার মনে রেখো তবে,
মোরেও এমনি পরাইতে হবে
রতনভূষণরাজি।'
কোলের উপরে বসি', বাহুপাশে
বাঁধিয়া কবিরে সোহাগে সহাসে
কপোল রাখিয়া কপোলের পাশে
কানে কানে কথা কয়।
দেখিতে দেখিতে কবির অধরে
হাসিরাশি আর কিছুতে না ধরে,
মুগ্ধ হৃদয় গলিয়া আদরে
ফাটিয়া বাহির হয়।
কহে উচ্ছ্বসি, 'কিছু না মানিব,
এমনি মধুর শ্লোক বাখানিব,
রাজভাণ্ডার টানিয়া আনিব
ও রাঙা চরণতলে।'
বলিতে বলিতে বুক উঠে ফুলি,
উষ্ণীষ-পরা মস্তক তুলি
পথে বাহিরায় গৃহদ্বার খুলি—
দ্রুত রাজগৃহে চলে।

কবির রমণী কুতূহলে ভাসে,
তাড়াতাড়ি উঠি বাতায়নপাশে
উঁকি মারি চায়, মনে মনে হাসে,
কালো চোখে আলো নাচে।
কহে মনে মনে বিপুল পুলকে,
'রাজপথ দিয়ে চলে এত লোকে
এমনটি আর পড়িল না চোখে
আমার যেমন আছে।'

এদিকে কবির উৎসাহ ক্রমে
নিমেষে নিমেষে আসিতেছে কমে,
যখন পশিল নৃপ-আশ্রমে
মরিতে পাইলে বাঁচে।
রাজসভাসদ সৈন্য পাহারা
গৃহিণীর মতো নহে তো তাহারা,
সারি সারি দাড়ি করে দিশাহারা,
হেথা কি আসিতে আছে!
হেসে ভালোবেসে দুটো কথা কয়
রাজসভাগৃহ হেন ঠাঁই নয়,
মন্ত্রী হইতে দ্বারী মহাশয়
সবে গম্ভীর মুখ।
মানুষে কেন যে মানুষের প্রতি
ধরি আছে হেন যমের মুরতি,
তাই ভাবি কবি না পায় ফুরতি
দমি যায় তার বুক।
বসি মহারাজ মহেন্দ্র রায়
মহোচ্চ গিরি-শিখরের প্রায়,
জন-অরণ্য হেরিছে হেলায়
অচল অটল ছবি।
কৃপানির্ঝর পড়িছে ঝরিয়া
শত শত দেশ সরস করিয়া,
সে মহা মহিমা নয়ন ভরিয়া
চাহিয়া দেখিল কবি।
বিচার সমাধা হল যবে, শেষে
ইঙ্গিত পেয়ে মন্ত্রি-আদেশে
জোড়করপুটে দাঁড়াইল এসে
দেশের প্রধান চর।
অতি সাধুমতো আকারপ্রকার,
এক তিল নাহি মুখের বিকার,
ব্যবসা যে তাঁর মানুষ-শিকার
নাহি জানে কোনো নর।
ব্রত নানামতো সতত পালয়ে,

এক কানাকড়ি মূল্য না লয়ে
ধর্মোপদেশ আলয়ে আলয়ে
বিতরিছে যাকে তাকে।
চোরা কটাক্ষ চক্ষে ঠিকরে,
কী ঘটিছে কার, কে কোথা কী করে,
পাতায় পাতায় শিকড়ে শিকড়ে
সন্ধান তার রাখে।
নামাবলী গায়ে বৈষ্ণব-রূপে
যখন সে আসি প্রণমিল ভূপে,
মন্ত্রী রাজারে অতি চুপে চুপে
কী করিল নিবেদন।
অমনি আদেশ হইল রাজার,
'দেহো এ'রে টাকা পঞ্চ হাজার।'
'সাধু সাধু' কহে সভার মাঝার
যত সভাসদজন।
পুলক প্রকাশে সবার গাত্রে,
'এ-যে দান ইহা যোগ্য পাত্রে,
দেশের আবালবনিতা-মাত্রে
ইথে না মানিবে দ্বেষ।'
সাধু নুয়ে পড়ে নম্রতাভরে,
দেখি সভাজন আহা আহা করে,
মন্ত্রীর শুধু জাগিল অধরে
ঈষৎ হাস্যলেশ।
আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ
ধূলি-ভরা দুটি লইয়া চরণ
চিহ্নিত করি রাজাস্তরণ
পবিত্র পদপঙ্কে।
ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম,
বলি-অঙ্কিত শিথিল চর্ম,
প্রখর মূর্তি অগ্নিশর্ম,
ছাত্র মরে আতঙ্কে।
কোনো দিকে কোনো লক্ষ্য না ক'রে
পড়ি গেল শ্লোক বিকট হাঁ ক'রে,
মটর-কড়াই মিশায়ে কাঁকরে
চিবাইল যেন দাঁতে।
কেহ তার নাহি বুঝে আগুপিছু,
সবে বসি থাকে মাথা করি নিচু,
রাজা বলে, 'এ'রে দক্ষিণা কিছু
দাও দক্ষিণ হাতে।'
তার পরে এল গনৎকার,
গণনায় রাজা চমৎকার,
টাকা ঝন্ ঝন্ ঝনৎকার

বাজায়ে সে গেল চলি।
আসে এক বুড়া গণ্যমান্য
করপুটে লয়ে দূর্বাধান্য
রাজা তাঁর প্রতি অতি বদান্য
ভরিয়া দিলেন থলি।
আসে নট-ভাট রাজপুরোহিত,
কেহ একা কেহ শিষ্য-সহিত,
কারো বা মাথায় পাগড়ি লোহিত,
কারো বা হরিৎবর্ণ।
আসে দ্বিজগণ পরমারাধ্য,
কন্যার দায়, পিতার শ্রাদ্ধ—
যার যথামতো পায় বরাদ্দ,
রাজা আজি দাতাকর্ণ।
যে যাহার সবে যায় স্বভবনে,
কবি কী করিবে ভাবে মনে মনে,
রাজা দেখে তারে সভাগৃহকোণে
বিপন্নমুখছবি।
কহে ভূপ, 'হোথা বসিয়া কে ওই,
এসো তো মন্ত্রী, সন্ধান লই।'
কবি কহি উঠে, 'আমি কেহ নই,
আমি শুধু এক কবি।'
রাজা কহে, 'বটে, এসো এসো তবে,
আজিকে কাব্য-আলোচনা হবে।'
বসাইলা কাছে মহাগৌরবে
ধরি তার কর দুটি।
মন্ত্রী ভাবিল, 'যাই এইবেলা,
এখন তো শুরু হবে ছেলেখেলা।'
কহে, 'মহারাজ, কাজ আছে মেলা,
আদেশ পাইলে উঠি।'
রাজা শুধু মৃদু নাড়িলা হস্ত,
নৃপ-ইঙ্গিতে মহা ত্রস্ত
বাহির হইয়া গেল সমস্ত
সভাস্থ দলবল—
পাত্র মিত্র অমাত্য আদি,
অর্থী প্রার্থী বাদী প্রতিবাদী,
উচ্চ তুচ্ছ বিবিধ উপাধি
বন্যার যেন জল।

চলি গেল যবে সভাসুজন,
মুখোমুখি করি বসিলা দুজন,
রাজা বলে, 'এবে কাব্যকূজন
আরম্ভ করো কবি।'

কবি তবে দুই কর জুড়ি বুকে
বাণীবন্দনা করে নতমুখে,
'প্রকাশো জননী, নয়নসমুখে
প্রসন্ন মুখছবি।
বিমল মানসসরসবাসিনী,
শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী,
বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী
কমলকুঞ্জাসনা,
তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন
খ্যাপার মতন আছি চিরদিন
উদাসীন আনমনা।
চারি দিকে সবে বাঁটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া
আমি তব স্নেহবচন শুনিয়া
পেয়েছি স্বরগসুধা।
সেই মোর ভালো, সেই বহু মানি,
তবু মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে প্রাণী,
সুরের খাদ্যে জান তো মা বাণী,
নরের মিটে না ক্ষুধা।
যা হবার হবে, সে কথা ভাবি না,
মা গো, একবার ঝংকারো বীণা,
ধরহ রাগিণী বিশ্বপ্লাবিনা
অমৃত-উৎস-ধারা।
যে রাগিণী শুনি নিশিদিনমান
বিপুল হর্ষে দ্রব ভগবান
মলিন মর্ত্য-মাঝে বহমান
নিয়ত আত্মহারা।
যে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া
হোমশিখা-সম উঠিছে কাঁপিয়া,
অনাদি অসীমে পড়িছে ঝাঁপিয়া,
বিশ্বতন্ত্রী হতে।
যে রাগিণী চির-জন্ম ধরিয়া
চিত্তকুহরে উঠে কুহরিয়া,
অশ্রুহাসিতে জীবন ভরিয়া,
ছুটে সহস্র স্রোতে।
কে আছে কোথায়, কে আসে কে যায়,
নিমেষে প্রকাশে, নিমেষে মিলায়,
বালুকার 'পরে কালের বেলায়
ছায়া-আলোকের খেলা!
জগতের যত রাজা-মহারাজ,
কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ,

সকালে ফুটিছে সুখদুখলাজ,
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা।
শুধু তার মাঝে ধ্বনিতেছে সুর
বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর,
চিরদিন তাহে আছে ভরপুর,
মগন গগনতল।
যে জন শুনেছে সে অনাদি ধ্বনি
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়তরণী,
জানে না আপনা, জানে না ধরণী,
সংসার-কোলাহল।
সে জন পাগল, পরান বিকল,
ভবকূল হতে ছিঁড়িয়া শিকল
কেমনে এসেছে ছাড়িয়া সকল
ঠেকেছে চরণে তব।
তোমার অমল কমলগন্ধ
হৃদয়ে ঢালিছে মহা আনন্দ,
অপূর্ব গীত, অলোক ছন্দ
শুনিছে নিত্য নব।
বাজুক সে বীণা, মজুক ধরণী,
বারেকের তরে ভুলাও জননী,
কে বড়ো কে ছোটো, কে দীন কে ধনী,
কেবা আগে কেবা পিছে—
কার জয় হল কার পরাজয়,
কাহার বৃদ্ধি কার হল ক্ষয়,
কেবা ভালো আর কেবা ভালো নয়,
কে উপরে কেবা নিচে।
গাঁথা হয়ে যাক এক গীতরবে,
ছোটো জগতের ছোটো-বড়ো সবে,
সুখে প'ড়ে রবে পদপল্লবে,
যেন মালা একখানি।
তুমি মানসের মাঝখানে আসি
দাঁড়াও মধুর মুরতি বিকাশি,
কুন্দবরন সুন্দর হাসি
বীণাহাতে বীণাপাণি।
ভাসিয়া চলিবে রবিশশীতারা
সারি সারি যত মানবের ধারা
অনাদিকালের পান্থ যাহারা
তব সংগীতস্রোতে।
দেখিতে পাইব ব্যোমে মহাকাল
ছন্দে ছন্দে বাজাইছে তাল,
দশ দিক্‌বধূ খুলি কেশজাল
নাচে দশ দিক হতে।'

এতেক বলিয়া ক্ষণপরে কবি
করুণ কথায় প্রকাশিল ছবি
পুণ্যকাহিনী রঘুকুলরবি
রাঘবের ইতিহাস।
অসহ দুঃখ সহি নিরবধি
কেমনে জনম গিয়েছে দগধি,
জীবনের শেষ দিবস অবধি
অসীম নিরাশ্বাস।
কহিল, 'বারেক ভাবি দেখো মনে
সেই এক দিন কেটেছে কেমনে
যেদিন মলিন বাকল-বসনে
চলিলা বনের পথে,
ভাই লক্ষ্মণ বয়স নবীন,
ম্লান ছায়া-সম বিষাদ-বিলীন
নববধূ সীতা আভরণহীন
উঠিলা বিদায়-রথে।
রাজপুরী-মাঝে উঠে হাহাকার,
প্রজা কাঁদিতেছে পথে সারে সার,
এমন বজ্র কখনো কি আর
পড়েছে এমন ঘরে।
অভিষেক হবে, উৎসবে তার
আনন্দময় ছিল চারি ধার,
মঙ্গলদীপ নিবিয়া আঁধার
শুধু নিমেষের ঝড়ে।
আর-এক দিন, ভেবে দেখো মনে,
যেদিন শ্রীরাম লয়ে লক্ষ্মণে
ফিরিয়া নিভৃত কুটীর-ভবনে
দেখিলা জানকী নাহি—
'জানকী জানকী' আর্ত রোদনে
ডাকিয়া ফিরিলা কাননে কাননে,
মহা অরণ্য আঁধার-আননে
রহিল নীরবে চাহি।
তার পরে দেখো শেষ কোথা এর,
ভেবে দেখো কথা সেই দিবসের;
এক বিষাদের এত বিরহের
এত সাধনের ধন,
সেই সীতাদেবী রাজসভা-মাঝে
বিদায়-বিনয়ে নমি রঘুরাজে,
দ্বিধা ধরাতলে অভিমানে লাজে
হইলা অদর্শন।
সে-সকল দিন সেও চলে যায়;
সে অসহ শোক, চিহ্ন কোথায়—

যায় নি তো এ'কে ধরণীর গায়
অসীম দগ্ধ রেখা।
স্নিগ্ধ ধরাভূমি জুড়েছে আবার,
দণ্ডকবনে ফুটে ফুলভার,
সরযূর কূলে দুলে তৃণসার
প্রফুল্ল শ্যামলেখা।
শুধু সেদিনের একখানি সুর
চিরদিন ধরে বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর
মধুর করুণ তানে;
সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে
আজিও সে গীত মহাসংগীতে
বাজে মানবের কানে।'
তার পরে কবি কহিল সে কথা,
কুরুপাণ্ডব-সমর-বারতা—
'গৃহবিবাদের ঘোর মত্ততা
ব্যাপিল সর্ব দেশ,
দুইটি যমজ তরু পাশাপাশি,
ঘর্ষণে জ্বলে হুতাশনরাশি,
মহাদাবানল ফেলে শেষে গ্রাসি
অরণ্য-পরিবেশ।
এক গিরি হতে দুই স্রোত-পারা
দুইটি শীর্ণ বিদ্বেষধারা
সরীসৃপগতি মিলিল তাহারা
নিষ্ঠুর অভিমানে—
দেখিতে দেখিতে হল উপনীত
ভারতের যত ক্ষত্র-শোণিত,
ত্রাসিত ধরণী করিল ধ্বনিত
প্রলয়বন্যা-গানে।
দেখিতে দেখিতে ডুবে গেল কূল,
আত্ম ও পর হয়ে গেল ভুল,
গৃহবন্ধন করি নির্মূল
ছুটিল রক্তধারা,
ফেনায়ে উঠিল মরণাম্বুধি,
বিশ্ব রহিল নিশ্বাস রুধি,
কাঁপিল গগন শত আঁখি মুদি
নিবায়ে সূর্যতারা।
সমরবন্যা যবে অবসান
সোনার ভারত বিপুল শ্মশান,
রাজগৃহ যত ভূতল-শয়ান
পড়ে আছে ঠাঁই ঠাঁই—

ভীষণা শান্তি রক্তনয়নে
বসিয়া শোণিত-পঙ্কশয়নে,
চাহি ধরা-পানে আনত বয়নে
মুখেতে বচন নাই।
বহুদিন পরে ঘুচিয়াছে খেদ,
মরণে মিটেছে সব বিচ্ছেদ,
সমাধা যজ্ঞ মহা নরমেধ
বিদ্বেষ-হুতাশনে।
সকল কামনা করিয়া পূর্ণ,
সকল দম্ভ করিয়া চূর্ণ,
পাঁচ ভাই গিয়া বসিলা শূন্য
স্বর্ণসিংহাসনে।
স্তব্ধ প্রাসাদ বিষাদ-আঁধার,
শ্মশান হইতে আসে হাহাকার,
রাজপুরবধূ যত অনাথার
মর্ম-বিদার রব।
'জয় জয় জয় পাণ্ডুতনয়'
সারি সারি দ্বারী দাঁড়াইয়া কয়,
পরিহাস ব'লে আজি মনে হয়,
মিছে মনে হয় সব।
কালি যে ভারত সারাদিন ধরি
অট্ট গরজে অম্বর ভরি
রাজার রক্তে খেলেছিল হোরি
ছাড়ি কুলভয়লাজে,
পরদিনে চিতাভস্ম মাখিয়া
সন্ন্যাসীবেশে অংগ ঢাকিয়া
বসি একাকিনী শোকার্ত হিয়া
শূন্য শ্মশান-মাঝে।
কুরুপান্ডব মুছে গেছে সব,
সে রণরঙ্গ হয়েছে নীরব,
সে চিতাবহ্নি অতি ভৈরব
ভস্মও নাহি তার;
যে ভূমি লইয়া এত হানাহানি
সে আজি কাহার তাহাও না জানি,
কোথা ছিল রাজা, কোথা রাজধানী
চিহ্ন নাহিকো আর।
তবু কোথা হতে আসিছে সে স্বর—
যেন সে অমর সমর-সাগর
গ্রহণ করেছে নব কলেবর
একটি বিরাট গানে;
বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ,
সফল আশার বিষাদ মহান,

উদাস শান্তি করিতেছে দান
 চিরমানবের প্রাণে।
'হায়, এ ধরায় কত অনন্ত
বরষে বরষে শীত বসন্ত
সুখে দুখে ভরি দিক্‌দিগন্ত
 হাসিয়া গিয়াছে ভাসি.
এমনি বরষা আজিকার মতো
কতদিন কত হয়ে গেছে গত,
নব মেঘভারে গগন আনত
 ফেলেছে অশ্রুরাশি।
যুগে যুগে লোক গিয়েছে এসেছে,
দুখীরা কেঁদেছে. সুখীরা হেসেছে.
প্রেমিক যে জন ভালো সে বেসেছে
 আজি আমাদেরি মতো;
তারা গেছে. শুধু তাহাদের গান
দু-হাতে ছড়ায়ে করে গেছে দান.
দেশে দেশে. তার নাহি পরিমাণ.
 ভেসে ভেসে যায় কত।
শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে;
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
 ভরে আসে আঁখিজল—
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা.
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা.
লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা
 সুন্দর ধরাতল।
এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ
চাহি নে করিতে বাদপ্রতিবাদ,
যে কদিন আছি মানসের সাধ
 মিটাব আপন মনে;
যার যাহা আছে তার থাক্‌ তাই.
কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই.
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই
 একটি নিভৃত কোণে।
শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি.
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি,
পুষ্পের মতো সংগীতগুলি
 ফুটাই আকাশ-ভালে।
অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
 সংসার-ধূলিজালে।

অতি দুর্গম সৃষ্টিশিখরে
অসীম কালের মহাকন্দরে
সতত বিশ্বনির্ঝর ঝরে
ঝর্ঝর সংগীতে,
স্বরতরঙ্গ যত গ্রহতারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা –
সেথা হতে টানি লব গীতধারা
ছোটো এই বাঁশরিতে।
ধরণীর শ্যাম করপুটখানি
ভরি দিব আমি সেই গীত আনি,
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী
মধুর-অর্থ-ভরা।
নবীন আষাঢ়ে রচি নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
করে দিয়ে যাব বসন্তকায়া
বাসন্তীবাস-পরা।
ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে, অরণ্য-ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।
সংসার-মাঝে দু-একটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর—
তার পরে ছুটি নিব।
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে,
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ-'পরে
শিশিরের মতো রবে।
না পারে বুঝাতে, আপনি না বুঝে,
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
মাগিছে তেমনি সুর—
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু-চারিটা কথা
রেখে যাব সুমধুর।
থাকো হৃদাসনে জননী ভারতী,
তোমারি চরণে প্রাণের আরতি,

চাহি না চাহিতে আর কারো প্রতি,
রাখি না কাহারো আশা।
কত সুখ ছিল, হয়ে গেছে দুখ,
কত বান্ধব হয়েছে বিমুখ,
ম্লান হয়ে গেছে কত উৎসুক
উন্মুখ ভালোবাসা।
শুধু ও-চরণ হৃদয়ে বিরাজে,
শুধু ওই বীণা চিরদিন বাজে,
স্নেহসুরে ডাকে অন্তর-মাঝে—
আয় রে বৎস, আয়,
ফেলে রেখে আয় হাসিক্রন্দন,
ছিঁড়ে আয় যত মিছে বন্ধন,
হেথা ছায়া আছে চিরনন্দন
চিরবসন্ত বায়।
সেই ভালো মা গো, যাক যাহা যায়,
জন্মের মতো বরিনু তোমায়,
কমলগন্ধ কোমল দু-পায়
বার বার নমো নম।'
এত বলি কবি থামাইল গান,
বসিয়া রহিল মুগ্ধ নয়ান,
বাজিতে লাগিল হৃদয় পরান
বীণাঝংকার-সম।
পুলকিত রাজা, আঁখি ছলছল,
আসন ছাড়িয়া নামিলা ভূতল,
দু-বাহু বাড়ায়ে পরান উতল
কবিরে লইলা বুকে।
কহিলা, 'ধন্য, কবি গো, ধন্য,
আনন্দে মন সমাচ্ছন্ন,
তোমারে কী আমি কহিব অন্য,
চিরদিন থাকো সুখে।
ভাবিয়া না পাই কী দিব তোমারে,
করি পরিতোষ কোন্ উপহারে,
যাহা কিছু আছে রাজভাণ্ডারে
সব দিতে পারি আনি।'

প্রেমোচ্ছ্বসিত আনন্দ-জলে
ভরি দু-নয়ন কবি তাঁরে বলে,
'কণ্ঠ হইতে দেহো মোর গলে
ওই ফুলমালাখানি।'

মালা বাঁধি কেশে কবি যায় পথে,
কেহ শিবিকায়, কেহ ধায় রথে,

নানা দিকে লোক যায় নানা মতে
কাজের অন্বেষণে।
কবি নিজ মনে ফিরিছে লুব্ধ,
যেন সে তাহার নয়ন মুগ্ধ
কল্পধেনুর অমৃত-দুগ্ধ
দোহন করিছে মনে।
কবির রমণী বাঁধি কেশপাশ,
সন্ধ্যার মতো পরি রাঙা বাস,
বসি একাকিনী বাতায়ন-পাশ,
সুখহাস মুখে ফুটে।
কপোতের দল চারি দিকে ঘিরে
নাচিয়া ডাকিয়া বেড়াইছে ফিরে,
যবের কণিকা তুলিয়া সে ধীরে
দিতেছে চঞ্চুপুটে।
অঙ্গুলি তার চলিছে যেমন
কত কী যে কথা ভাবিতেছে মন,
হেনকালে পথে ফেলিয়া নয়ন
সহসা কবিরে হেরি
বাহুখানি নাড়ি মৃদু ঝিনি ঝিনি
বাজাইয়া দিল করকিঙ্কিণী,
হাসিজালখানি অতুলহাসিনী
ফেলিলা কবিরে ঘেরি।
কবির চিত্ত উঠে উল্লাসি,
অতি সত্বর সম্মুখে আসি
কহে কৌতুকে মৃদু মৃদু হাসি,
'দেখো কী এনেছি বালা।
নানা লোকে নানা পেয়েছে রতন,
আমি আনিয়াছি করিয়া যতন
তোমার কণ্ঠে দেবার মতন
রাজকণ্ঠের মালা।'
এত বলি মালা শির হতে খুলি
প্রিয়ার গলায় দিতে গেল তুলি,
কবিনারী রোষে কর দিল ঠেলি,
ফিরায়ে রহিল মুখ।
মিছে ছল করি মুখে করে রাগ,
মনে মনে তার জাগিছে সোহাগ,
গরবে ভরিয়া উঠে অনুরাগ,
হৃদয়ে উথলে সুখ।
কবি ভাবে, 'বিধি অপ্রসন্ন,
বিপদ আজিকে হেরি আসন্ন।'
বসি থাকে মুখ করি বিষণ্ণ
শূন্যে নয়ন মেলি।

কবির ললনা আধখানি বেঁকে
চোর-কটাক্ষে চাহে থেকে থেকে,
পতির মুখের ভাবখানা দেখে
মুখের বসন ফেলি
উচ্চকণ্ঠে উঠিল হাসিয়া,
তুচ্ছ ছলনা গেল সে ভাসিয়া,
চকিতে সরিয়া নিকটে আসিয়া
পড়িল তাহার বুকে,
সেথায় লুকায়ে হাসিয়া কাঁদিয়া,
কবির কণ্ঠ বাহুতে বাঁধিয়া,
শত বার করি আপনি সাধিয়া
চুম্বিল তার মুখে।
বিস্মিত কবি বিহ্বলপ্রায়,
আনন্দে কথা খুঁজিয়া না পায়—
মালাখানি লয়ে আপন গলায়
আদরে পরিলা সতী।
ভক্তি-আবেগে কবি ভাবে মনে
চেয়ে সেই প্রেমপূর্ণ বদনে—
বাঁধা প'ল এক মাল্য-বাঁধনে
লক্ষ্মী সরস্বতী।

সাহাজাদপুর
১৩ শ্রাবণ ১৩০০

বসুন্ধরা

আমারে ফিরায়ে লহো, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চল-তলে। ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই;
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো; বিদারিয়া
এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার, হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে; উত্তরে দক্ষিণে,
পুরবে পশ্চিমে; শৈবালে শাদ্বলে তৃণে

শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবন-রসে; যাই পরশিয়া
স্বর্ণশীর্ষে আনমিত শস্যক্ষেত্রতল
অঙ্গুলির আন্দোলনে; নব পুষ্পদল
করি পূর্ণ সংগোপনে সুবর্ণলেখায়
সুধাগন্ধে মধুবিন্দুভারে; নীলিমায়
পরিব্যাপ্ত করি দিয়া মহাসিন্ধুনীর
তীরে তীরে করি নৃত্য স্তব্ধ ধরণীর,
অনন্ত কল্লোলগীতে; উল্লসিত রঙ্গে
ভাষা প্রসারিয়া দিই তরঙ্গে তরঙ্গে
দিক-দিগন্তরে; শুভ্র উত্তরীয়প্রায়
শৈলশৃঙ্গে বিছাইয়া দিই আপনায়
নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জনে,
নিঃশব্দ নিভৃতে।

যে ইচ্ছা গোপনে মনে
উৎস-সম উঠিতেছে অজ্ঞাতে আমার
বহুকাল ধ'রে, হৃদয়ের চারি ধার
ক্রমে পরিপূর্ণ করি বাহিরিতে চাহে
উদ্বেল উদ্দাম মুক্ত উদার প্রবাহে
সিঞ্চিতে তোমায়— ব্যথিত সে বাসনারে
বন্ধমুক্ত করি দিয়া শতলক্ষ ধারে
দেশে দেশে দিকে দিকে পাঠাব কেমনে
অন্তর ভেদিয়া। বসি শুধু গৃহকোণে
লুব্ধ চিত্তে করিতেছি সদা অধ্যয়ন,
দেশে দেশান্তরে কারা করেছে ভ্রমণ
কৌতূহলবশে; আমি তাহাদের সনে
করিতেছি তোমারে বেষ্টন মনে মনে
কল্পনার জালে।

সুদুর্গম দূরদেশ—
পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ,
মহাপিপাসার রঙ্গভূমি; রৌদ্রালোকে
জ্বলন্ত বালুকারাশি সূচি বিঁধে চোখে;
দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশয্যা-'পরে
জ্বরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে পড়ে
তপ্তদেহ, উষ্ণশ্বাস বহ্নিজ্বালাময়,
শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ, নির্দয়।
কতদিন গৃহপ্রান্তে বসি বাতায়নে
দূরদূরান্তের দৃশ্য আঁকিয়াছি মনে
চাহিয়া সম্মুখে; চারি দিকে শৈলমালা,
মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা

স্ফটিকনির্মল স্বচ্ছ; খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি; হিমরেখা
নীলগিরিশ্রেণী-'পরে দূরে যায় দেখা
দৃষ্টিরোধ করি, যেন নিশ্চল নিষেধ
উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি ভেদ
যোগমগ্ন ধূর্জটির তপোবন-দ্বারে।
মনে মনে ভ্রমিয়াছি দূর সিন্ধুপারে
মহামেরুদেশে—যেখানে লয়েছে ধরা
অনন্তকুমারীব্রত, হিমবস্ত্রপরা,
নিঃসঙ্গ, নিঃস্পৃহ, সর্ব-আভরণহীন;
যেথা দীর্ঘরাত্রিশেষে ফিরে আসে দিন
শব্দশূন্য সংগীতবিহীন; রাত্রি আসে,
ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে
অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো।
নূতন দেশের নাম যত পাঠ করি,
বিচিত্র বর্ণনা শুনি, চিত্ত অগ্রসরি
সমস্ত স্পর্শিতে চাহে—সমুদ্রের তটে
ছোটো ছোটো নীলবর্ণ পর্বতসংকটে
একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে জাল,
জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল,
জেলে ধরিতেছে মাছ, গিরিমধ্যপথে
সংকীর্ণ নদীটি চলি আসে কোনোমতে
আঁকিয়া বাঁকিয়া; ইচ্ছা করে সে নিভৃত
গিরিক্রোড়ে সুখাসীন ঊর্মিমুখরিত
লোকনীড়খানি হৃদয়ে বেষ্টিয়া ধরি
বাহুপাশে। ইচ্ছা করে, আপনার করি
যেখানে যা-কিছু আছে; নদীস্রোতোনীরে
আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তীরে
নব নব লোকালয়ে করে যাই দান
পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান
দিবসে নিশীথে; পৃথিবীর মাঝখানে
উদয়সমুদ্র হতে অস্তসিন্ধু-পানে
প্রসারিয়া আপনারে, তুঙ্গ গিরিরাজি
আপনার সুদুর্গম রহস্যে বিরাজি,
কঠিন পাষাণক্রোড়ে তীব্র হিমবায়ে
মানুষ করিয়া তুলি লুকায়ে লুকায়ে
নব নব জাতি। ইচ্ছা করে মনে মনে,
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোকসনে
দেশে দেশান্তরে; উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই আরব-সন্তান

দুর্দম স্বাধীন; তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরী-মাঝে, বৌদ্ধমঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক
গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান
কর্ম-অনুরত—সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ ক'রে লই হেন ইচ্ছা করে।
অরুগ্ণ বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা—
নাহি কোনো ধর্মাধর্ম, নাহি সাধু প্রথা,
নাহি কোনো বাধাবন্ধ, নাহি চিন্তাজ্বর,
নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাহি ঘর পর,
উন্মুক্ত জীবনস্রোতে বহে দিনরাত
সম্মুখে আঘাত করি সহিয়া আঘাত
অকাতরে; পরিতাপ-জর্জর পরানে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে,
ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়—
বর্তমান-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি—
উচ্ছৃঙ্খল সে-জীবন সেও ভালোবাসি;
কত বার ইচ্ছা করে সেই প্রাণঝড়ে
ছুটিয়া চলিয়া যাই পূর্ণপালভরে
লঘু তরী-সম।

হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর—
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে; দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন, রুদ্র মেঘমন্দ্র স্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের 'পরে
বিদ্যুতের বেগে; অনায়াস সে মহিমা,
হিংসাতীব্র সে আনন্দ, সে দৃপ্ত গরিমা,
ইচ্ছা করে একবার লভি তার স্বাদ।
ইচ্ছা করে বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে।

হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা-পানে চেয়ে
কত বার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে; ইচ্ছা করিয়াছে
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে

সমুদ্রমেখলাপরা তব কটিদেশ;
প্রভাত-রৌদ্রের মতো অনন্ত অশেষ
ব্যাপ্ত হয়ে দিকে দিকে, অরণ্যে ভূধরে
কম্পমান পল্লবের হিল্লোলের 'পরে
করি নৃত্য সারাবেলা, করিয়া চুম্বন
প্রত্যেক কুসুমকলি, করি' আলিঙ্গন
সঘন কোমল শ্যাম তৃণক্ষেত্রগুলি,
প্রত্যেক তরঙ্গ-'পরে সারাদিন দুলি'
আনন্দ-দোলায়। রজনীতে চুপে চুপে
নিঃশব্দ চরণে, বিশ্বব্যাপী নিদ্রারূপে
তোমার সমস্ত পশুপক্ষীর নয়নে
অঙ্গুলি বুলায়ে দিই, শয়নে শয়নে
নীড়ে নীড়ে গৃহে গৃহে গুহায় গুহায়
করিয়া প্রবেশ, বৃহৎ অঞ্চলপ্রায়
আপনারে বিস্তারিয়া ঢাকি বিশ্বভূমি
সুস্নিগ্ধ আঁধারে।

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু। তাই আজি
কোনো দিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে
কী জীবন-রসধারা অহর্নিশি ধরে
করিতেছে সঞ্চরণ, কুসুমমুকুল
কী অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল
সুন্দর বৃন্তের মুখে, নব রৌদ্রালোকে
তরুলতাতৃণগুল্ম কী গূঢ় পুলকে
কী মূঢ় প্রমোদরসে উঠে হরষিয়া—
মাতৃস্তনপানশ্রান্ত পরিতৃপ্ত-হিয়া
সুখস্বপ্নহাস্যমুখ শিশুর মতন।
তাই আজি কোনো দিন—শরৎ-কিরণ
পড়ে যবে পক্কশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র-'পরে,
নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে

আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা,
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বানরবে শত বার করে
সমস্ত ভুবন; সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হতে, মিশ্রিত মর্মরবৎ
শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দ-খেলার
পরিচিত রব। সেথায় ফিরায়ে লহো
মোরে আরবার; দূর করো সে বিরহ
যে বিরহ থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে
হেরি যবে সম্মুখেতে সন্ধ্যার কিরণে
বিশাল প্রান্তর, যবে ফিরে গাভীগুলি
দূর গোষ্ঠে— মাঠপথে উড়াইয়া ধূলি,
তরুঘেরা গ্রাম হতে উঠে ধূম্রলেখা
সন্ধ্যাকাশে; যবে চন্দ্র দূরে দেয় দেখা
শ্রান্ত পথিকের মতো অতি ধীরে ধীরে
নদীপ্রান্তে জনশূন্য বালুকার তীরে,
মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী
নির্বাসিত, বাহু বাড়াইয়া ধেয়ে আসি
সমস্ত বাহিরখানি লইতে অন্তরে—
এ আকাশ, এ ধরণী, এই নদী-'পরে
শুভ্র শান্ত সুপ্ত জ্যোৎস্নারাশি। কিছু নাহি
পারি পরশিতে, শুধু শূন্যে থাকি চাহি
বিষাদব্যাকুল। আমারে ফিরায়ে লহো
সেই সর্ব-মাঝে, যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে, গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষ সুরে, উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গিতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু,
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু,
তোমারে সহস্র দিকে করিছে দোহন
তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন
তৃষিত পরানি যত, আনন্দের রস
কত রূপে হতেছে বর্ষণ, দিক দশ
ধ্বনিছে কল্লোলগীতে। নিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্তেই
একত্রে করিব আস্বাদন, এক হয়ে
সকলের সনে। আমার আনন্দ লয়ে

হবে না কি শ্যামতর অরণ্য তোমার,
প্রভাত-আলোক-মাঝে হবে না সঞ্চার
নবীন কিরণকম্প? মোর মুগ্ধ ভাবে
আকাশ ধরণীতল আঁকা হয়ে যাবে
হৃদয়ের রঙে—যা দেখে কবির মনে
জাগিবে কবিতা, প্রেমিকের দু-নয়নে
লাগিবে ভাবের ঘোর, বিহঙ্গের মুখে
সহসা আসিবে গান। সহস্রের সুখে
রঞ্জিত হইয়া আছে সর্বাঙ্গ তোমার
হে বসুধে, জীবস্রোত কত বারংবার
তোমারে মণ্ডিত করি আপন জীবনে
গিয়েছে ফিরেছে, তোমার মৃত্তিকাসনে
মিশায়েছে অন্তরের প্রেম, গেছে লিখে
কত লেখা, বিছায়েছে কত দিকে দিকে
ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন, তারি সনে
আমার সমস্ত প্রেম মিশায়ে যতনে
তোমার অঞ্চলখানি দিব রাঙাইয়া
সজীব বরনে; আমার সকল দিয়া
সাজাব তোমারে। নদীজলে মোর গান
পাবে না কি শুনিবারে কোনো মুগ্ধ কান
নদীকূল হতে? উষালোকে মোর হাসি
পাবে না কি দেখিবারে কোনো মর্ত্যবাসী
নিদ্রা হতে উঠি? আজ শতবর্ষ পরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরান? ঘরে ঘরে
কত শত নরনারী চিরকাল ধ'রে
পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি রব না আমি? আসিব না নেমে
তাদের মুখের 'পরে হাসির মতন,
তাদের সর্বাঙ্গ-মাঝে সরস যৌবন,
তাদের বসন্তদিনে অকস্মাৎ সুখ,
তাদের মনের কোণে নবীন উন্মুখ
প্রেমের অঙ্কুররূপে? ছেড়ে দিবে তুমি
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি,
যুগযুগান্তের মহা মৃত্তিকা-বন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে? করিব গমন
ছাড়ি লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড়খানি?
চতুর্দিক হতে মোরে লবে না কি টানি
এই সব তরু লতা গিরি নদী বন,
এই চিরদিবসের সুনীল গগন,
এ জীবনপরিপূর্ণ উদার সমীর,
জাগরণপূর্ণ আলো, সমস্ত প্রাণীর

অন্তরে অন্তরে গাঁথা জীবন-সমাজ?
ফিরিব তোমারে ঘিরি, করিব বিরাজ
তোমার আত্মীয়-মাঝে; কীট পশু পাখি
তরু গুল্ম লতা রূপে বারংবার ডাকি
আমারে লইবে তব প্রাণতপ্ত বুকে;
যুগে যুগে জন্মে জন্মে স্তন দিয়ে মুখে
মিটাইবে জীবনের শত লক্ষ ক্ষুধা
শত লক্ষ আনন্দের স্তন্যরসসুধা
নিঃশেষে নিবিড় স্নেহে করাইয়া পান।
তার পরে ধরিত্রীর যুবক সন্তান
বাহিরিব জগতের মহাদেশ-মাঝে
অতি দূর দূরান্তরে জ্যোতিষ্কসমাজে
সুদুর্গম পথে। এখনো মিটে নি আশা,
এখনো তোমার স্তন-অমৃত-পিপাসা
মুখেতে রয়েছে লাগি, তোমার আনন
এখনো জাগায় চোখে সুন্দর স্বপন,
এখনো কিছুই তব করি নাই শেষ,
সকলি রহস্যপূর্ণ, নেত্র অনিমেষ
বিস্ময়ের শেষতল খুঁজে নাহি পায়,
এখনো তোমার বুকে আছি শিশুপ্রায়
মুখপানে চেয়ে। জননী, লহো গো মোরে
সঘনবন্ধন তব বাহুযুগে ধরে
আমারে করিয়া লহো তোমার বুকের,
তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের
উৎস উঠিতেছে যেথা, সে গোপন পুরে
আমারে লইয়া যাও—রাখিয়ো না দূরে।

২৬ কার্তিক ১৩০০

মায়াবাদ

হা রে নিরানন্দ দেশ, পরিজীর্ণ জরা,
বহি বিজ্ঞতার বোঝা, ভাবিতেছ মনে
ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা
সুচতুর সূক্ষ্মদৃষ্টি তোমার নয়নে!
লয়ে কুশাঙ্কুর বুদ্ধি শাণিত প্রখরা
কর্মহীন রাত্রিদিন বসি গৃহকোণে
মিথ্যা ব'লে জানিয়াছ বিশ্ব-বসুন্ধরা
গ্রহতারাময় সৃষ্টি অনন্ত গগনে।
যুগযুগান্তর ধ'রে পশু পক্ষী প্রাণী
অচল নির্ভয়ে হেথা নিতেছে নিশ্বাস

বিধাতার জগতেরে মাতৃক্রোড় মানি;
তুমি বৃদ্ধ কিছুরেই কর না বিশ্বাস!
লক্ষ কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা
তুমি জানিতেছ মনে, সব ছেলেখেলা।

খেলা

হোক খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে
আনন্দকল্লোলাকুল নিখিলের সনে।
সব ছেড়ে মৌনী হয়ে কোথা বসে রবে
আপনার অন্তরের অন্ধকার কোণে!
জেনো মনে শিশু তুমি এ বিপুল ভবে
অনন্ত কালের কোলে, গগনপ্রাঙ্গণে—
যত জান মনে কর কিছুই জান না।
বিনয়ে বিশ্বাসে প্রেমে হাতে লহ তুলি
বর্ণগন্ধগীতময় যে মহা-খেলনা
তোমারে দিয়াছে মাতা; হয় যদি ধূলি
হোক ধূলি, এ ধূলির কোথায় তুলনা!
থেকো না অকালবৃদ্ধ বসিয়া একেলা—
কেমনে মানুষ হবে না করিলে খেলা!

বন্ধন

বন্ধন? বন্ধন বটে, সকলি বন্ধন
স্নেহ প্রেম সুখতৃষ্ণা; সে যে মাতৃপাণি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি,
নব নব রসস্রোতে পূর্ণ করি মন
সদা করাইছে পান। স্তন্যের পিপাসা
কল্যাণদায়িনীরূপে থাকে শিশুমুখে—
তেমনি সহজ তৃষ্ণা আশা ভালোবাসা
সমস্ত বিশ্বের রস কত সুখে দুখে
করিতেছে আকর্ষণ, জনমে জনমে
প্রাণে মনে পূর্ণ করি গঠিতেছে ক্রমে
দুর্লভ জীবন; পলে পলে নব আশ
নিয়ে যায় নব নব আস্বাদে আশ্রমে।
স্তন্যতৃষ্ণা নষ্ট করি মাতৃবন্ধপাশ
ছিন্ন করিবারে চাস কোন্ মুক্তিভ্রমে!

গতি

জানি আমি সুখে দুঃখে হাসি ও ক্রন্দনে
পরিপূর্ণ এ জীবন, কঠোর বন্ধনে
ক্ষতচিহ্ন পড়ে যায় গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে,
জানি আমি সংসারের সমুদ্র মন্থিতে
কারো ভাগ্যে সুধা ওঠে, কারো হলাহল।
জানি না কেন এ সব, কোন্ ফলাফল
আছে এই বিশ্বব্যাপী কর্মশৃঙ্খলার।
জানি না কী হবে পরে, সবই অন্ধকার
আদি অন্ত এ সংসারে— নিখিল দুঃখের
অন্ত আছে কি না আছে, সুখ-বুভুক্ষের
মিটে কি না চির-আশা। পণ্ডিতের দ্বারে
চাহি না এ জনমরহস্য জানিবারে।
চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর,
লক্ষ কোটি প্রাণী-সাথে এক গতি মোর।

মুক্তি

চক্ষু কর্ণ বুদ্ধি মন সব রুদ্ধ করি,
বিমুখ হইয়া সর্ব জগতের পানে,
শুদ্ধ আপনার ক্ষুদ্র আত্মাটিরে ধরি
মুক্তি-আশে সন্তরিব কোথায় কে জানে।
পার্শ্ব দিয়ে ভেসে যাবে বিশ্বমহাতরী
অম্বর আকুল করি যাত্রীদের গানে,
শুভ্র কিরণের পালে দশ দিক ভরি',
বিচিত্র সৌন্দর্যে পূর্ণ অসংখ্য পরানে।
ধীরে ধীরে চলে যাবে দূর হতে দূরে
অখিল ক্রন্দন-হাসি আঁধার-আলোক,
বহে যাবে শূন্যপথে সকরুণ সুরে
অনন্ত জগৎ-ভরা যত দুঃখশোক।
বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব মুক্তি-সমাধিতে?

অক্ষমা

যেখানে এসেছি আমি, আমি সেথাকার,
দরিদ্র সন্তান আমি দীন ধরণীর।
জন্মাবধি যা পেয়েছি সুখদুঃখভার
বহু ভাগ্য বলে তাই করিয়াছি স্থির।

অসীম ঐশ্বর্যরাশি নাই তোর হাতে,
হে শ্যামলা সর্বসহা জননী মৃন্ময়ী।
সকলের মুখে অন্ন চাহিস জোগাতে,
পারিস নে কত বার—কই অন্ন কই
কাঁদে তোর সন্তানেরা ম্লান শুষ্ক মুখ।
জানি মা গো, তোর হাতে অসম্পূর্ণ সুখ,
যা-কিছু গড়িয়া দিস ভেঙে ভেঙে যায়,
সব-তাতে হাত দেয় মৃত্যু সর্বভুক,
সব আশা মিটাইতে পারিস নে হায়
তা বলে কি ছেড়ে যাব তোর তপ্ত বুক!

দরিদ্রা

দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালোবাসি
হে ধরিত্রী, স্নেহ তোর বেশি ভালো লাগে,
বেদনাকাতর মুখে সকরুণ হাসি,
দেখে মোর মর্ম-মাঝে বড়ো ব্যথা জাগে।
আপনার বক্ষ হতে রস রক্ত নিয়ে
প্রাণটুকু দিয়েছিস সন্তানের দেহে,
অহর্নিশি মুখে তার আছিস তাকিয়ে,
অমৃত নারিস দিতে প্রাণপণ স্নেহে।
কত যুগ হতে তুই বর্ণগন্ধগীতে
সৃজন করিতেছিস আনন্দ-আবাস,
আজও শেষ নাহি হল দিবসে নিশীথে—
স্বর্গ নাই, রচেছিস স্বর্গের আভাস।
তাই তোর মুখখানি বিষাদ-কোমল,
সকল সৌন্দর্যে তোর ভরা অশ্রুজল।

আত্মসমর্পণ

তোমার আনন্দগানে আমি দিব সুর
যাহা জানি দু-একটি প্রীতি-সুমধুর
অন্তরের ছন্দোগাথা; দুঃখের ক্রন্দনে
বাজিবে আমার কণ্ঠ বিষাদবিধুর
তোমার কণ্ঠের সনে; কুসুমে চন্দনে
তোমারে পূজিব আমি; পরাব সিন্দুর
তোমার সীমন্তে ভালে; বিচিত্র বন্ধনে
তোমারে বাঁধিব আমি, প্রমোদসিন্ধুর
তরঙ্গেতে দিব দোলা নব ছন্দে তানে।
মানব-আত্মার গর্ব আর নাহি মোর,

চেয়ে তোর স্নিগ্ধশ্যাম মাতৃমুখ-পানে
ভালোবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর।
জন্মেছি যে মর্ত্য-কোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।

৫ অগ্রহায়ণ ১৩০০

অচল স্মৃতি

আমার হৃদয়ভূমি-মাঝখানে
জাগিয়া রয়েছে নিতি
অচল ধবল শৈলসমান
একটি অচল স্মৃতি।
প্রতিদিন ঘিরি ঘিরি
সে নীরব হিমগিরি
আমার দিবস আমার রজনী
আসিছে যেতেছে ফিরি।

যেখানে চরণ রেখছে, সে মোর
মর্ম গভীরতম,
উন্নত শির রয়েছে তুলিয়া
সকল উচ্চে মম।
মোর কল্পনা শত
রঙিন মেঘের মতো
তাহারে ঘেরিয়া হাসিছে কাঁদিছে
সোহাগে হতেছে নত।

আমার শ্যামল তরুলতাগুলি
ফুলপল্লবভারে
সরস কোমল বাহুবেষ্টনে
বাঁধিতে চাহিছে তারে।
শিখর গগন-লীন
দুর্গম জনহীন,
বাসনা-বিহগ একেলা সেথায়
ধাইছে রাত্রিদিন।

চারি দিকে তার কত আসা-যাওয়া
কত গীত কত কথা,
মাঝখানে শুধু ধ্যানের মতন
নিশ্চল নীরবতা।

দূরে গেলে তবু, একা
সে শিখর যায় দেখা,
চিত্তগগনে আঁকা থাকে তার
নিত্য-নীহার-রেখা।

উড্‌ফীল্ড্। সিমলা
১১ অগ্রহায়ণ ১৩০০

কণ্টকের কথা

একদা পুলকে প্রভাত-আলোকে
গাহিছে পাখি,
কহে কণ্টক বাঁকা কটাক্ষে
কুসুমে ডাকি—
তুমি তো কোমল বিলাসী কমল,
দুলায় বায়ু,
দিনের কিরণ ফুরাতে ফুরাতে
ফুরায় আয়ু;
এ পাশে মধুপ মধুমদে ভোর,
ও পাশে পবন পরিমল-চোর,
বনের দুলাল, হাসি পায় তোর
আদর দেখে।
আহা মরি মরি কী রঙিন বেশ,
সোহাগহাসির নাহি আর শেষ,
সারাবেলা ধরি রসালসাবেশ
গন্ধ মেখে।
হায় কদিনের আদর-সোহাগ
সাধের খেলা,
ললিত মাধুরী, রঙিন বিলাস,
মধুপ-মেলা।

ওগো নহি আমি তোদের মতন
সুখের প্রাণী,
হাব ভাব হাস, নানারঙা বাস
নাহিকো জানি।
রয়েছি নগ্ন, জগতে লগ্ন
আপন বলে;
কে পারে তাড়াতে, আমারে মাড়াতে
ধরণীতলে।
তোদের মতন নহি নিমেষের,
আমি এ নিখিলে চিরদিবসের,

বৃষ্টি-বাদল ঝড়-বাতাসের
না রাখি ভয়।
সতত একাকী, সঙ্গীবিহীন,
কারো কাছে কোনো নাহি প্রেম-ঋণ,
চাটুগান শুনি সারা নিশিদিন
করি না ক্ষয়।
আসিবে তো শীত, বিহঙ্গগীত
যাইবে থামি,
ফুলপল্লব ঝরে যাবে সব,
রহিব আমি।

চেয়ে দেখো মোরে, কোনো বাহুল্য
কোথাও নাই,
স্পষ্ট সকলি, আমার মূল্য
জানে সবাই।
এ ভীরু জগতে যার কাঠিন্য
জগৎ তারি।
নখের আঁচড়ে আপন চিহ্ন
রাখিতে পারি।
কেহ জগতেরে চামর ঢুলায়,
চরণে কোমল হস্ত বুলায়,
নতমস্তকে লুটায়ে ধুলায়
প্রণাম করে।
ভুলাইতে মন কত করে ছল—
কাহারো বর্ণ, কারো পরিমল,
বিফল বাসরসজ্জা, কেবল
দুদিন-তরে।
কিছুই করি না, নীরবে দাঁড়ায়ে
তুলিয়া শির
বিঁধিয়া রয়েছি অন্তর-মাঝে
এ পৃথিবীর।

আমারে তোমরা চাহ না চাহিতে
চোখের কোণে,
গরবে ফাটিয়া উঠেছ ফুটিয়া
আপন মনে।
আছে তব মধু, থাক্ সে তোমার,
আমার নাহি।
আছে তব রূপ—মোর পানে কেহ
দেখে না চাহি।

কারো আছে শাখা, কারো আছে দল,
কারো আছে ফুল, কারো আছে ফল,
আমারি হস্ত রিক্ত কেবল
দিবসযামী।
ওহে তরু, তুমি বৃহৎ প্রবীণ,
আমাদের প্রতি অতি উদাসীন,
আমি বড়ো নহি, আমি ছায়াহীন,
ক্ষুদ্র আমি।
হই না ক্ষুদ্র, তবুও রুদ্র
ভীষণ ভয়,
আমার দৈন্য সে মোর সৈন্য,
তাহারি জয়।'

২৯ কার্তিক ১৩০০

নিরুদ্দেশ যাত্রা

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী?
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী।
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু, মধুরহাসিনী,
বুঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে
তোমার মনে।
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি,
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগনকোণে।
কী আছে হোথায়—চলেছি কিসের
অন্বেষণে?

বলো দেখি মোরে, শুধাই তোমায়
অপরিচিতা—
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছলছল-আঁখি
অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
ঊর্মিমুখর সাগরের পার,

মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
চরণতলে?
তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে
কথা না ব'লে।

হুহু ক'রে বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘশ্বাস।
অন্ধ আবেগে করে গর্জন
জলোচ্ছ্বাস।
সংশয়ময় ঘননীল নীর,
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
দুলিছে যেন।
তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তারি 'পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ,
তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি
হাসিছ কেন?
আমি তো বুঝি না কী লাগি তোমার
বিলাস হেন।

যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি
'কে যাবে সাথে'
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে
নবীন প্রাতে।
দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিম-পানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
সোনার ফলে?
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
কথা না ব'লে।

তার পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ,
কখনো রবি,
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর, কখনো
শান্ত ছবি।
বেলা বহে যায়, পালে লাগে বায়,
সোনার তরণী কোথা চলে যায়,
পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন
অস্তাচলে।

এখন বারেক শুধাই তোমায়
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,
আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি
তিমির-তলে?
হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন
কথা না ব'লে।

আঁধার রজনী আসিবে এখনি
মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক
পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ,
শুধু কানে আসে জল-কলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব
কেশের রাশি।
বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর—
'কোথা আছ ওগো করহ পরশ
নিকটে আসি।'
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না
নীরব হাসি।

২৭ অগ্রহায়ণ ১৩০০

নদী

পরমস্নেহাস্পদ
শ্রীমান বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তে
তাঁহার শুভপরিণয়দিনে
এই গ্রন্থখানি
উপহৃত
হইল।

২২ মাঘ
১৩০২

নদী

ওরে   তোরা কি জানিস কেউ
জলে   কেন ওঠে এত ঢেউ।
ওরা   দিবস রজনী নাচে,
তাহা   শিখেছে কাহার কাছে।
শোন্   চলচল্ ছলছল্
সদাই   গাহিয়া চলেছে জল।
ওরা   কারে ডাকে বাহু তুলে,
ওরা   কার কোলে ব'সে দুলে।
সদা   হেসে করে লুটোপুটি,
চলে   কোন্খানে ছুটোছুটি।
ওরা   সকলের মন তুষি
আছে   আপনার মনে খুশি।

আমি   বসে বসে তাই ভাবি,
নদী   কোথা হতে এল নাবি।
কোথায়   পাহাড় সে কোন্খানে,
তাহার   নাম কি কেহই জানে।
কেহ   যেতে পারে তার কাছে,
সেথায়   মানুষ কি কেউ আছে।
সেথা   নাহি তরু নাহি ঘাস,
নাহি   পশুপাখিদের বাস,
সেথা   শব্দ কিছু না শুনি,
পাহাড়   বসে আছে মহামুনি।

তাহার   মাথার উপরে শুধু
সাদা   বরফ করিছে ধুধু।
সেথা   রাশি রাশি মেঘ যত
থাকে   ঘরের ছেলের মতো।
শুধু   হিমের মতন হাওয়া,
সেথায়   করে সদা আসা-যাওয়া,
শুধু   সারা রাত তারাগুলি
তারে   চেয়ে দেখে আঁখি খুলি।
শুধু   ভোরের কিরণ এসে
তারে   মুকুট পরায় হেসে।

সেই   নীল আকাশের পায়ে,
সেথা   কোমল মেঘের গায়ে,

সেথা সাদা বরফের বুকে
নদী ঘুমায় স্বপন-সুখে।
কবে মুখে তার রোদ লেগে
নদী আপনি উঠিল জেগে,
কবে একদা রোদের বেলা
তাহার মনে পড়ে গেল খেলা।
সেথায় একা ছিল দিনরাতি
কেহই ছিল না খেলার সাথী।
সেথায় কথা নাহি কারো ঘরে,
সেথায় গান কেহ নাহি করে।
তাই ঝুরু ঝুরু ঝিরি ঝিরি
নদী বাহিরিল ধীরি ধীরি।
মনে ভাবিল, যা আছে ভবে
সবই দেখিয়া লইতে হবে।

নিচে পাহাড়ের বুক জুড়ে
গাছ উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে।
তারা বুড়ো বুড়ো তরু যত
তাদের বয়স কে জানে কত।
তাদের খোপে খোপে গাঁঠে গাঁঠে
পাখি বাসা বাঁধে কুটো-কাঠে।
তারা ডাল তুলে কালো কালো
আড়াল করেছে রবির আলো।
তাদের শাখায় জটার মতো
ঝুলে পড়েছে শেওলা যত।
তারা মিলায়ে মিলায়ে কাঁধ
যেন পেতেছে আঁধার-ফাঁদ।
তাদের তলে তলে নিরিবিলি
নদী হেসে চলে খিলি খিলি।
তারে কে পারে রাখিতে ধরে,
সে যে ছুটোছুটি যায় সরে।
সে যে সদা খেলে লুকোচুরি,
তাহার পায়ে পায়ে বাজে নুড়ি।
পথে শিলা আছে রাশি রাশি,
তাহা ঠেলে চলে হাসি হাসি।
পাহাড় যদি থাকে পথ জুড়ে
নদী হেসে যায় বেঁকেচুরে।
সেথায় বাস করে শিং-তোলা
যত বুনো ছাগ দাড়ি-ঝোলা।
সেথায় হরিণ রোঁয়ায় ভরা
তারা কারেও দেয় না ধরা।

'নদী' গ্রন্থ অবলম্বনে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী-অঙ্কিত দুটি চিত্র

সেথায় মানুষ নূতনতরো,
তাদের শরীর কঠিন বড়ো।
তাদের চোখ দুটো নয় সোজা,
তাদের কথা নাহি যায় বোঝা।
তারা পাহাড়ের ছেলেমেয়ে
সদাই কাজ করে গান গেয়ে।
তারা সারা দিনমান খেটে
আনে বোঝাভরা কাঠ কেটে।
তারা চড়িয়া শিখর-'পরে
বনের হরিণ শিকার করে।

নদী যত আগে আগে চলে
ততই সাথী জোটে দলে দলে।
তারা তারি মতো, ঘর হতে
সবাই বাহির হয়েছে পথে।
পায়ে ঠুনু ঠুনু বাজে নুড়ি
যেন বাজিতেছে মল চুড়ি.
গায়ে আলো করে ঝিকিঝিক
যেন পরেছে হীরার চিক।
মুখে কলকল কত ভাষে
এত কথা কোথা হতে আসে।
শেষে সখীতে সখীতে মেলি
হেসে গায়ে গায়ে হেলাহেলি।
শেষে কোলাকুলি কলরবে
তারা এক হয়ে যায় সবে।
তখন কলকল ছুটে জল,
কাঁপে টলমল ধরাতল,
কোথাও নিচে পড়ে ঝরঝর,
পাথর কেঁপে ওঠে থরথর,
শিলা খান্ খান্ যায় টুটে,
নদী চলে পথ কেটে কুটে।
ধারে গাছগুলো বড়ো বড়ো
তারা হয়ে পড়ে পড়ো-পড়ো।
কত বড়ো পাথরের চাপ
জলে খসে পড়ে ঝুপঝাপ।
তখন মাটি-গোলা ঘোলা জলে
ফেনা ভেসে যায় দলে দলে।
জলে পাক ঘুরে ঘুরে ওঠে,
যেন পাগলের মতো ছোটে।

শেষে পাহাড় ছাড়িয়ে এসে
নদী পড়ে বাহিরের দেশে।

হেথা যেখানে চাহিয়া দেখে
চোখে সকলি নূতন ঠেকে।
হেথা চারি দিকে খোলা মাঠ,
হেথা সমতল পথঘাট।
কোথাও চাষিরা করিছে চাষ,
কোথাও গোরুতে খেতেছে ঘাস।
কোথাও বৃহৎ অশথ গাছে
পাখি শিস দিয়ে দিয়ে নাচে।
কোথাও রাখাল ছেলের দলে
খেলা করিছে গাছের তলে।
কোথাও নিকটে গ্রামের মাঝে
লোকে ফিরিছে নানান কাজে।
কোথাও বাধা কিছু নাহি পথে,
নদী চলেছে আপন মতে।
পথে বরষার জলধারা
আসে চারি দিক হতে তারা,
নদী দেখিতে দেখিতে বাড়ে,
এখন কে রাখে ধরিয়া তারে।

তাহার দুই কূলে উঠে ঘাস,
সেথায় যতেক বকের বাস।
সেথা মহিষের দল থাকে,
তারা লুটায় নদীর পাঁকে।
যত বুনো বরা সেথা ফেরে
তারা দাঁত দিয়ে মাটি চেরে।
সেথা শেয়াল লুকায়ে থাকে,
রাতে হুয়া হুয়া করে ডাকে।

দেখে এইমতো কত দেশ,
কেবা গণিয়া করিবে শেষ।
কোথাও কেবল বালির ডাঙা,
কোথাও মাটিগুলো রাঙা রাঙা,
কোথাও ধারে ধারে উঠে বেত,
কোথাও দুধারে গমের খেত।
কোথাও ছোটোখাটো গ্রামখানি,
কোথাও মাথা তোলে রাজধানী,
সেথায় নবাবের বড়ো কোঠা,
তারি পাথরের থাম মোটা।
তারি ঘাটের সোপান যত,
জলে নামিয়াছে শত শত।
কোথাও সাদা পাথরের পুলে
নদী বাঁধিয়াছে দুই কূলে।

কোথাও লোহার সাঁকোয় গাড়ি
চলে ধকো ধকো ডাক ছাড়ি।

নদী এইমতো অবশেষে
এল নরম মাটির দেশে।
হেথা যেথায় মোদের বাড়ি
নদী আসিল দুয়ারে তারি।
হেথায় নদী নালা বিল খালে
দেশ ঘিরেছে জলের জালে।
কত মেয়েরা নাহিছে ঘাটে,
কত ছেলেরা সাঁতার কাটে;
কত জেলেরা ফেলিছে জাল,
কত মাঝিরা ধরেছে হাল,
সুখে সারিগান গায় দাঁড়ি,
কত খেয়া-তরী দেয় পাড়ি।

কোথাও পুরাতন শিবালয়
তীরে সারি সারি জেগে রয়।
সেথায় দু-বেলা সকালে সাঁঝে
পূজার কাঁসর-ঘণ্টা বাজে।
কত জটাধারী ছাইমাখা
ঘাটে বসে আছে যেন আঁকা।
তীরে কোথাও বসেছে হাট,
নৌকা ভরিয়া রয়েছে ঘাট।
মাঠে কলাই সরিষা ধান,
তাহার কে করিবে পরিমাণ।
কোথাও নিবিড় আখের বনে
শালিক চরিছে আপন মনে।

কোথাও ধু ধু করে বালুচর
সেথায় গাঙশালিকের ঘর।
সেথায় কাছিম বালির তলে
আপন ডিম পেড়ে আসে চলে।
সেথায় শীতকালে বুনো হাঁস
কত ঝাঁকে ঝাঁকে করে বাস।
সেথায় দলে দলে চখাচখী
করে সারাদিন বকাবকি।
সেথায় কাদাখোঁচা তীরে তীরে
কাদায় খোঁচা দিয়ে দিয়ে ফিরে।

কোথাও ধানের খেতের ধারে,
ঘন কলাবন বাঁশঝাড়ে,

ঘন আম-কাঁঠালের বনে,
গ্রাম দেখা যায় এক কোণে।
সেথা আছে ধান গোলাভরা
সেথা খড়গুলা রাশ-করা।
সেথা গোয়ালেতে গোরু বাঁধা
কত কালো পাটকিলে সাদা।
কোথাও কলুদের কুঁড়েখানি,
সেথায় ক্যাঁ কোঁ ক'রে ঘোরে ঘানি।
কোথাও কুমারের ঘোরে চাক
দেয় সারাদিন ধরে পাক।
মুদি দোকানেতে সারাখন
বসে পড়িতেছে রামায়ণ।
কোথাও বসি পাঠশালা-ঘরে
যত ছেলেরা চেঁচিয়ে পড়ে,
বড়ো বেতখানি লয়ে কোলে
ঘুমে গুরুমহাশয় ঢোলে।
হেথায় এঁকে বেঁকে ভেঙে চুরে
গ্রামের পথ গেছে বহু দূরে।
সেথায় বোঝাই গোরুর গাড়ি
ধীরে চলিয়াছে ডাক ছাড়ি।
রোগা গ্রামের কুকুরগুলো
ক্ষুধায় শুঁকিয়া বেড়ায় ধুলো।
যেদিন পূর্ণিমা রাতি আসে
চাঁদ আকাশ জুড়িয়া হাসে।
বনে ও পারে আঁধার কালো,
জলে ঝিকিমিকি করে আলো।
বালি চিকিচিকি করে চরে,
ছায়া ঝোপে বসি থাকে ডরে।
সবাই ঘুমায় কুটীরতলে,
তরী একটিও নাহি চলে।
গাছে পাতাটিও নাহি নড়ে,
জলে ঢেউ নাহি ওঠে পড়ে।
কভু ঘুম যদি যায় ছুটে
কোকিল কুহু কুহু গেয়ে উঠে,
কভু ও পারে চরের পাখি
রাতে স্বপনে উঠিছে ডাকি।

নদী চলেছে ডাহিনে বামে,
কভু কোথাও সে নাহি থামে।
সেথায় গহন গভীর বন,
তীরে নাহি লোক নাহি জন।

শুধু কুমির নদীর ধারে
সুখে রোদ পোহাইছে পাড়ে।
বাঘ ফিরিতেছে ঝোপে ঝোপে,
ঘাড়ে পড়ে আসি এক লাফে।
কোথাও দেখা যায় চিতাবাঘ,
তাহার গায়ে চাকা চাকা দাগ।
রাতে চুপিচুপি আসে ঘাটে
জল চকো চকো করি চাটে।

হেথায় যখন জোয়ার ছোটে,
নদী ফুলিয়ে ঘুলিয়ে ওঠে।
তখন কানায় কানায় জল,
কত ভেসে আসে ফুল ফল,
ঢেউ হেসে ওঠে খলখল,
তরী করি ওঠে টলমল।
নদী অজগর-সম ফুলে
গিলে খেতে চায় দুই কূলে।
আবার ক্রমে আসে ভাঁটা পড়ে,
তখন জল যায় সরে সরে।
তখন নদী রোগা হয়ে আসে,
কাদা দেখা দেয় দুই পাশে।
বেরোয় ঘাটের সোপান যত
যেন বুকের হাড়ের মতো।

নদী চলে যায় যত দূরে
ততই জল ওঠে পূরে পূরে।
শেষে দেখা নাহি যায় কূল,
চোখে দিক হয়ে যায় ভুল,
ক্রমে নীল হয় জলধারা,
মুখে লাগে যেন নুন-পারা।
ক্রমে নিচে নাহি পাই তল,
ক্রমে আকাশে মিশায় জল,
ডাঙা কোন্‌খানে পড়ে রয়,
শুধু জলে জলে জলময়।

ওরে এ কী শুনি কোলাহল,
হেরি এ কী ঘন নীল জল।
ওই বুঝি রে সাগর হোথা,
উহার কিনারা কে জানে কোথা।
ওই লাখো লাখো ঢেউ উঠে
সদাই মরিতেছে মাথা কুটে।

ওঠে সাদা সাদা ফেনা যত
যেন বিষম রাগের মতো।
জল গরজি গরজি ধায়,
যেন আকাশ কাড়িতে চায়।
বায়ু কোথা হতে আসে ছুটে,
ঢেউয়ে হাহা ক'রে পড়ে লুটে।
যেন পাঠশালা-ছাড়া ছেলে
ছুটে লাফায়ে বেড়ায় খেলে।
হেথা যতদূর পানে চাই
কোথাও কিছু নাই কিছু নাই।
শুধু আকাশ বাতাস জল,
শুধুই কলকল কোলাহল,
শুধু ফেনা আর শুধু ঢেউ—
আর নাহি কিছু নাহি কেউ।

হেথায় ফুরাইল সব দেশ,
নদীর ভ্রমণ হইল শেষ।
হেথা সারাদিন সারাবেলা
তাহার ফুরাবে না আর খেলা।
তাহার সারাদিন নাচ গান
কভু হবে নাকো অবসান।
এখন কোথাও হবে না যেতে,
সাগর নিল তারে বুক পেতে।
তারে নীল বিছানায় থুয়ে
তাহার কাদামাটি দিবে ধুয়ে।
তারে ফেনার কাপড়ে ঢেকে,
তারে ঢেউয়ের দোলায় রেখে,
তার কানে কানে গেয়ে সুর
তার শ্রম করি দিবে দূর।
নদী চিরদিন চিরনিশি
রবে অতল আদরে মিশি।

চিত্রা

সূচনা

ভক্ত যখন বলেন, ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি, তখন হৃষীকেশের থেকে ভক্ত নিজেকে পৃথক্ করে দেখেন, সুতরাং তাঁর নিজের জীবনের সমস্ত দায়িত্ব গিয়ে পড়ে একা হৃষীকেশের 'পরেই। চিত্রা কাব্যে আমি একদিন বলেছিলুম আমার অন্তর্যামী আমাকে দিয়ে যা বলাতে চান আমি তাই বলি, কথাটা এই রকম শুনতে হয়। কিন্তু চিত্রায় আমার যে উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে সেটি অন্য শ্রেণীর। আমার একটি যুগ্মসত্তা আমি অনুভব করেছিলুম যেন যুগ্ম নক্ষত্রের মতো, সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, তারই আকর্ষণ প্রবল। তারই সংকল্প পূর্ণ হচ্ছে আমার মধ্য দিয়ে, আমার সুখে দুঃখে, আমার ভালোয় মন্দয়। এই সংকল্প-সাধনায় এক আমি যন্ত্র এবং দ্বিতীয় আমি যন্ত্রী হতে পারে, কিন্তু সংগীত যা উদ্ভূত হচ্ছে— যন্ত্রেরও স্বকীয় বিশিষ্টতা তার একটি প্রধান অঙ্গ। পদে পদে তার সঙ্গে রফা করে তবেই দুয়ের যোগে সৃষ্টি। এ যেন অর্ধনারীশ্বরের মতো ভাবখানা। সেই জন্যেই বলা হয়েছে—

জেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার
রহস্যঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দিরতলে।

পরমদেবতার পূজা যুগ্মসত্তায় মিলে, এক সত্তায় ভিতর থেকে আদর্শের প্রেরণা, আর-এক সত্তায় বাহিরে কর্মযোগে তার প্রকাশ। সংসারে এই দুই সত্তার বিরোধ সর্বদাই ঘটে, নিজের অন্তরে পূর্ণতার যে অনুশাসন মানুষ গূঢ়ভাবে বহন করছে তার সম্পূর্ণ প্রতিবাদে জীবন ব্যর্থ হয়েছে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। নিজের মধ্যে নিজের সামঞ্জস্য ঘটতে পারে নি, এই ভ্রষ্টতা মানুষের পক্ষে সব চেয়ে শোচনীয়। আপনার দুই সত্তার সামঞ্জস্য ঘটেছে কি না এই আশঙ্কাসূচক প্রশ্ন চিত্রার কবিতায় অনেক বার প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত চিত্রায় জীবনরঙ্গভূমিতে যে মিলন-নাট্যের উল্লেখ হয়েছে তার কোনো নায়ক-নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থানাভিষিক্ত নয়। মানুষের আত্মিক সৃষ্টি কেন, প্রাকৃতিক সৃষ্টিতেও আদিকাল থেকে মূল আদর্শের সঙ্গে বাহ্য প্রকাশের সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া গেছে। আঙ্গারিক যুগের শ্রীহীন গাছগুলো কেন টিকতে পারল না। আজ পরবর্তী গাছ-গুলিতে সমস্ত পৃথিবীকে দিয়েছে শোভা। কোন্ শিল্পী রচনার সূত্রপাতে প্রথম ব্যর্থ হয়েছিল, মাথা নেড়েছিল, হাতের কাজ নিষ্ঠুর ভাবে মুছতে মুছতে সংস্কার সাধন করেছে—এ কথা যখন ভাবি তখন সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে দুই সত্তার মিলনচেষ্টা স্পষ্ট দেখতে পাই। সেই চেষ্টা কী নিষ্ঠুর ভাবে নিজেকে জয়যুক্ত করতে চায়, মানুষের ইতিহাসে বারংবার তার প্রমাণ পাওয়া যায়, আজ তার সেই আত্মঘাতী প্রমাণ যেমন প্রকট হয়েছে এমন আর কখনো হয় নি। চিত্রার প্রথম কবিতায় তার একটি সূচনায় বলা হয়েছে—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

তার পর আছে—

অন্তর-মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

আজ ব্যাখ্যা করে যে কথা বলবার চেষ্টা করছি সেই কথাটাই এই কবিতার মধ্যে ফুটতে চেয়েছিল। বাইরে যার প্রকাশ বাস্তবে সে বহু, অন্তরে যার প্রকাশ সে একা। এই দুই ধারার প্রবাহেই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কর্ম-জীবনের সেই বিচিত্রের ডাক পড়েছে। 'আবেদন' কবিতায় ঠিক তার উলটো কথা। কবি বলেছে, 'কর্মক্ষেত্রে, যেখানে কার্যক্ষেত্রের জনতায় কর্মীরা কর্ম করছে, সেখানে আমার স্থান নয়। আমার স্থান সৌন্দর্যের সাধকরূপে একা তোমার কাছে।' জীবনের দুই ভিন্ন মহলে কবির এই ভিন্ন ভিন্ন কথা। জগতে বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরে একাকিনী কবির কাছে এ দুইই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য। 'ব্রাহ্মণ' 'পুরাতন ভৃত্য' 'দুই বিঘা জমি' এইগুলির কাব্যকাকলি নীড়ের, বাসার; 'স্বর্গ হইতে বিদায়' এখানে সুর নেমেছে ঊর্ধ্বলোক থেকে মর্ত্যের পথে; 'প্রেমের অভিষেক'-এর প্রথম যে পাঠ লিখেছিলুম তাতে কেরানি-জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি ছিল অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা, পালিত অত্যন্ত ধিক্‌কার দেওয়াতে সেটা তুলে দিয়েছিলুম; 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় বাঙালিঘরের ঘরকন্নার যে আভাস আছে তার প্রতিও লোকেন কটাক্ষ বর্ষণ করেছিল, ভাগ্যক্রমে তাতে বিচলিত হই নি, হয়তো দু-চারটে লাইন বাদ পড়েছে। লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ মঙ্গল এবং ঔপনিষদিক মোহ বিস্তার করে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি এমন অপবাদ কেউ কেউ আমাকে দিয়েছেন। আমার কাব্য সমগ্রভাবে আলোচনা করে দেখলে হয়তো তাঁরা দেখবেন আমার প্রতি অবিচার করেছেন। আমার বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত আমি এই বাণীর পন্থাতেই আমার পদ্য ও গদ্য রচনাকে চালনা করেছি—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

চিত্রা

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে,
তুমি চঞ্চলগামিনী।
মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে,
অলকগন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে,
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে
কত মঞ্জুল রাগিণী।
কত-না বর্ণে কত-না স্বর্ণে গঠিত,
কত-যে ছন্দে কত সংগীতে রটিত,
কত-না গ্রন্থে কত-না কণ্ঠে পঠিত,
তব অসংখ্য কাহিনী।
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

অন্তর-মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্তশয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে,
চারি দিকে চিরযামিনী।
অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।
ধীর গম্ভীর গভীর মৌনমহিমা,
স্বচ্ছ অতল স্নিগ্ধ নয়ননীলিমা,
স্থির হাসিখানি উষালোক-সম অসীমা,
অয়ি প্রশান্তহাসিনী।
অন্তর-মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

১৮ অগ্রহায়ণ ১৩০২

সুখ

আজি মেঘমুক্ত দিন; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মতো; সুমন্দ বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর—
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্‌বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে। ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে। অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে। ভাঙা উচ্চতীর;
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু; প্রচ্ছন্ন কুটীর;
বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত জিহ্বার মতো। গ্রামবধূগণ
অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠমগন
করিছে কৌতুকালাপ। উচ্চ মিষ্ট হাসি
জলকলস্বরে মিশি পশিতেছে আসি
কর্ণে মোর। বসি এক বাঁধা নৌকা-'পরি
বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নতশির করি
রৌদ্রে পিঠ দিয়া। উলঙ্গ বালক তার
আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারংবার
কলহাস্যে; ধৈর্যময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে তার স্নেহ-জ্বালাতন।
তরী হতে সম্মুখেতে দেখি দুই পার—
স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্মল বিস্তার;
মধ্যাহ্ন-আলোকপ্লাবে জলে স্থলে বনে
বিচিত্র বর্ণের রেখা; আতপ্ত পবনে
তীর-উপবন হতে কভু আসে বহি
আম্রমুকুলের গন্ধ, কভু রহি রহি
বিহঙ্গের শ্রান্ত স্বর।

আজি বহিতেছে
প্রাণে মোর শান্তিধারা— মনে হইতেছে
সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মতো, শিশু-আননের
হাসির মতন, পরিব্যাপ্ত বিকশিত;
উন্মুখ অধরে ধরি চুম্বন-অমৃত
চেয়ে আছে সকলের পানে, বাক্যহীন
শৈশব-বিশ্বাসে, চিররাত্রি চিরদিন।
বিশ্ববীণা হতে উঠি গানের মতন
রেখেছে নিমগ্ন করি নিথর গগন।

সে সংগীত কী ছন্দে গাঁথিব, কী করিয়া
শুনাইব, কী সহজ ভাষায় ধরিয়া
দিব তারে উপহার ভালোবাসি যারে,
রেখে দিব ফুটাইয়া কী হাসি আকারে
নয়নে অধরে, কী প্রেমে জীবনে তারে
করিব বিকাশ। সহজ আনন্দখানি
কেমনে সহজে তারে তুলে ঘরে আনি
প্রফুল্ল সরস। কঠিন আগ্রহভরে
ধরি তারে প্রাণপণে—মুঠির ভিতরে
টুটি যায়। হেরি তারে তীব্রগতি ধাই—
অন্ধবেগে বহুদূরে লঙ্ঘি চলি যাই,
আর তার না পাই উদ্দেশ।

চারি দিকে
দেখে আজি পূর্ণপ্রাণে মুগ্ধ অনিমিখে
এই স্তব্ধ নীলাম্বর স্থির শান্ত জল,
মনে হল সুখ অতি সহজ সরল।

রামপুর বোয়ালিয়া
১৩ চৈত্র ১২৯৯

জ্যোৎস্নারাত্রে

শান্ত করো শান্ত করো এ ক্ষুব্ধ হৃদয়
হে নিস্তব্ধ পূর্ণিমাযামিনী। অতিশয়
উদ্‌ভ্রান্ত বাসনা বক্ষে করিছে আঘাত
বারংবার, তুমি এসো স্নিগ্ধ অশ্রুপাত
দগ্ধ বেদনার 'পরে। শুভ্র সুকোমল
মোহভরা নিদ্রাভরা করপদ্মদল,
আমার সর্বাঙ্গে মনে দাও বুলাইয়া
বিভাবরী, সর্ব ব্যথা দাও ভুলাইয়া।

বহু দিন পরে আজি দক্ষিণ বাতাস
প্রথম বহিছে। মুগ্ধ হৃদয় দুরাশ
তোমার চরণপ্রান্তে রাখি তপ্ত শির
নিঃশব্দে ফেলিতে চাহে রুদ্ধ অশ্রুনীর
হে মৌন রজনী। পাণ্ডুর অম্বর হতে
ধীরে ধীরে এসো নামি লঘু জ্যোৎস্নাস্রোতে
মৃদুহাস্যে নতনেত্রে দাঁড়াও আসিয়া
নির্জন শিয়রতলে। বেড়াক ভাসিয়া
রজনীগন্ধার গন্ধ মদির লহরী
সমীরহিল্লোলে; স্বপ্নে বাজুক বাঁশরি

চন্দ্রলোকপ্রান্ত হতে; তোমার অঞ্চল
বায়ুভরে উড়ে এসে পুলকচঞ্চল
করুক আমার তনু; অধীর মর্মরে
শিহরি উঠুক বন; মাথার উপরে
চকোর ডাকিয়া যাক দূরশ্রুত তান;
সম্মুখে পড়িয়া থাক্‌ তটান্তশয়ান,
সুপ্ত নটিনীর মতো, নিস্তব্ধ তটিনী
স্বপ্নালসা।

হেরো আজি নিদ্রিতা মেদিনী,
ঘরে ঘরে রুদ্ধ বাতায়ন। আমি একা
আছি জেগে, তুমি একাকিনী দেহো দেখা
এই বিশ্বসুপ্তি-মাঝে, অসীম সুন্দর,
ত্রিলোকনন্দনমূর্তি। আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষায়, আমি নিত্য নিদ্রাহীন,
সদা উৎকণ্ঠিত, আমি চিররাত্রিদিন
আনিতেছি অর্ঘ্যভার অন্তরমন্দিরে
অজ্ঞাত দেবতা লাগি— বাসনার তীরে
একা বসে গড়িতেছি কত যে প্রতিমা
আপন হৃদয় ভেঙে, নাহি তার সীমা।
আজি মোরে করো দয়া, এসো তুমি, অয়ি,
অপার রহস্য তব, হে রহস্যময়ী,
খুলে ফেলো— আজি ছিন্ন করে ফেলো ওই
চিরস্থির আচ্ছাদন অনন্ত অম্বর।
মৌনশান্ত অসীমতা নিশ্চল সাগর,
তারি মাঝখান হতে উঠে এসো ধীরে
তরুণী লক্ষ্মীর মতো হৃদয়ের তীরে
আঁখির সম্মুখে। সমস্ত প্রহরগুলি
ছিন্ন পুষ্পদল-সম পড়ে যাক খুলি
তব চারি দিকে— বিদীর্ণ নিশীথখানি
খসে যাক নিচে। বক্ষ হতে লহো টানি
অঞ্চল তোমার, দাও অবারিত করি
শুভ্র ভাল, আঁখি হতে লহো অপসরি
উন্মুক্ত অলক। কোনো মর্ত্য দেখে নাই
যে দিব্য মুরতি, আমারে দেখাও তাই
এ বিশ্রব্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে।
উৎসুক উন্মুখ চিত্ত চরণের তলে
চকিতে পরশ করো; একটি চুম্বন
ললাটে রাখিয়া যাও, একান্ত নির্জন
সন্ধ্যার তারার মতো; আলিঙ্গনস্মৃতি
অঙ্গে তরঙ্গিয়া দাও, অনন্তের গীতি
বাজায়ে শিরার তন্ত্রে। ফাটুক হৃদয়

ভূমানন্দে—ব্যাপ্ত হয়ে যাক শূন্যময়
গানের তানের মতো। একরাত্রি-তরে
হে অমরী, অমর করিয়া দাও মোরে।

তোমাদের বাসরকুঞ্জের বহির্দ্বারে
বসে আছি—কানে আসিতেছে বারে বারে
মৃদুমন্দ কথা, বাজিতেছে সুমধুর
রিনিঝিনি রুনুঝুনু সোনার নূপুর—
কার কেশপাশ হতে খসি পুষ্পদল
পড়িছে আমার বক্ষে, করিছে চঞ্চল
চেতনাপ্রবাহ। কোথায় গাহিছ গান।
তোমরা কাহারা মিলি করিতেছ পান
কিরণকনকপাত্রে সুগন্ধি অমৃত,
মাথায় জড়ায়ে মালা পূর্ণবিকশিত
পারিজাত—গন্ধ তারি আসিছে ভাসিয়া
মন্দ সমীরণে—উন্মাদ করিছে হিয়া
অপূর্ব বিরহে। খোলো দ্বার, খোলো দ্বার
তোমাদের মাঝে মোরে লহো একবার
সৌন্দর্যসভায়। নন্দনবনের মাঝে
নির্জন মন্দিরখানি—সেথায় বিরাজে
একটি কুসুমশয্যা, রত্নদীপালোকে
একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী বালা-
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা।

রাঁচি ৫-৬ মাঘ ১৩০০

প্রেমের অভিষেক

তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরবমুকুট। পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর; তব রাজটিকা
দীপিছে ললাট-মাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি। আমার সকল দৈন্য-লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ-আস্তরণে। হৃদিশয্যাতল
শুভ্র দুগ্ধফেননিভ, কোমল শীতল,
তারি মাঝে বসায়েছ, সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ
সে অন্তর-অন্তঃপুরে। নিভৃত সভায়
আমারে চৌদিকে ঘিরি সদা গান গায়

বিশ্বের কবিরা মিলি; অমরবীণায়
উঠিয়াছে কী ঝংকার। নিত্য শুনা যায়
দূর-দূরান্তর হতে দেশবিদেশের
ভাষা, যুগ-যুগান্তের কথা, দিবসের
নিশীথের গান, মিলনের বিরহের
গাথা, তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের
উৎকণ্ঠিত তান।
প্রেমের অমরাবতী—
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তী সতী
বিচরে নলের সনে দীর্ঘনিশ্বসিত
অরণ্যের বিষাদমর্মরে; বিকশিত
পুষ্পবীথিতলে, শকুন্তলা আছে বসি,
করপদ্মতললীন ম্লান মুখশশী
ধ্যানরতা; পুরূরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে, গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ
বিস্তারিয়া বিশ্ব-মাঝে; মহারণ্যে যেথা
বীণা হস্তে লয়ে, তপস্বিনী মহাশ্বেতা
মহেশমন্দিরতলে বসি একাকিনী
অন্তরবেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণী
সান্ত্বনাসিঞ্চিত; গিরিতটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্তা কহিবার ছলে
সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনি; ভিখারী শিবের কোল
সদা আগলিয়া আছে প্রিয়া পার্বতীরে
অনন্তব্যগ্রতাপাশে; সুখদুঃখনীরে
বহে অশ্রুমন্দাকিনী, মিনতির স্বরে
কুসুমিত বনানীরে ম্লানচ্ছবি করে
করুণায়; বাঁশরির ব্যথাপূর্ণ তান
কুঞ্জে কুঞ্জে তরুচ্ছায়ে করিছে সন্ধান
হৃদয়সাথীরে; হাত ধরে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয়যৌবনময় দেবতাসমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী; সেথা মোর সভাসদ
রবিচন্দ্রতারা, পরি নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে তারা নব নব গান
নব অর্থভরা; চিরসুহৃদ্‌সমান
সর্বচরাচর।
হেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন—সদা বহি

সংসারের ক্ষুদ্র ভার, কত অনুগ্রহ
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ।
সেই শতসহস্রের পরিচয়হীন
প্রবাহ হইতে, এই তুচ্ছ কর্মাধীন
মোরে তুমি লয়েছ তুলিয়া, নাহি জানি
কী কারণে। অয়ি মহীয়সী মহারানী
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান। আজি
এই যে আমারে ঠেলি চলে জনরাজি
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে
নিশিদিন তোমার সোহাগ-সুধাপানে
অঙ্গ মোর হয়েছে অমর। তাহারা কি
পায় দেখিবারে— নিত্য মোরে আছে ঢাকি
মন তব অভিনব লাবণ্যবসনে।
তব স্পর্শ তব প্রেম রেখেছি যতনে,
তব সুধাকণ্ঠবাণী, তোমার চুম্বন,
তোমার আঁখির দৃষ্টি, সর্ব দেহমন
পূর্ণ করি— রেখেছে যেমন সুধাকর
দেবতার গুপ্ত সুধা যুগ-যুগান্তর
আপনারে সুধাপাত্র করি, বিধাতার
পুণ্য অগ্নি জ্বালায়ে রেখেছে অনিবার
সবিতা যেমন সযতনে, কমলার
চরণকিরণে যথা পরিয়াছে হার
সুনির্মল গগনের অনন্ত ললাট।
হে মহিমাময়ী মোরে করেছ সম্রাট।

জোড়াসাঁকো
১৮ মাঘ ১৩০০

সন্ধ্যা

ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা। ওরে মন,
নত করো শির। দিবা হল সমাপন,
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী। তিমিরের তীরে
অসংখ্য-প্রদীপ-জ্বালা এ বিশ্বমন্দিরে
এল আরতির বেলা। ওই শুন বাজে
নিঃশব্দ গম্ভীর মন্দ্রে অনন্তের মাঝে
শঙ্খঘণ্টাধ্বনি। ধীরে নামাইয়া আনো
বিদ্রোহের উচ্চ কণ্ঠ পূরবীর ম্লান-
মন্দ স্বরে। রাখো রাখো অভিযোগ তব,
মৌন করো বাসনার নিত্য নব নব

নিষ্ফল বিলাপ। হেরো মৌন নভস্তল,
ছায়াচ্ছন্ন মৌন বন, মৌন জলস্থল
স্তম্ভিত বিষাদে নম্র। নির্বাক নীরব
দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাসতী—নয়নপল্লব
নত হয়ে ঢাকে তার নয়নযুগল,
অনন্ত আকাশপূর্ণ অশ্রু ছলছল
করিয়া গোপন। বিষাদের মহাশান্তি
ক্লান্ত ভুবনের ভালে করিছে একান্তে
সান্ত্বনা-পরশ। আজি এই শুভক্ষণে,
শান্ত মনে, সন্ধি করো অনন্তের সনে
সন্ধ্যার আলোকে। বিন্দু-দুই অশ্রুজলে
দাও উপহার—অসীমের পদতলে
জীবনের স্মৃতি। অন্তরের যত কথা
শান্ত হয়ে গিয়ে, মর্মান্তিক নীরবতা
করুক বিস্তার।

হেরো ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিয়েছে নীড়ে,
শিশুরা খেলে না; শূন্য মাঠ জনহীন;
ঘরে-ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটি দুই-তিন
কুটীর-অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়। গৃহকার্য হল সমাপন—
কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কী জানি
ধূসর সন্ধ্যায়।

অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে
বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম-অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি
দিগন্তের পানে। ধীরে যেতেছে প্রবাহি
সম্মুখে আলোকস্রোত অনন্ত অম্বরে
নিঃশব্দ চরণে; আকাশের দূরান্তরে
একে একে অন্ধকারে হতেছে বাহির
একেকটি দীপ্ত তারা, সুদূর পল্লীর
প্রদীপের মতো। ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লানচ্ছবি ধরণীর নয়ননিমেষে
কত যুগ-যুগান্তের অতীত আভাস,
কত জীব-জীবনের জীর্ণ ইতিহাস।
যেন মনে পড়ে সেই বাল্যনীহারিকা,
তার পরে প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা,
তার পরে স্নিগ্ধশ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে
জীবধাত্রী জননীর কাজ, বক্ষে লয়ে

লক্ষ কোটি জীব—কত দুঃখ, কত ক্লেশ,
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তার শেষ।

ক্রমে ঘনতর হয়ে নামে অন্ধকার,
গাঢ়তর নীরবতা—বিশ্ব-পরিবার
সুপ্ত নিশ্চেতন। নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
বিশাল অন্তর হতে উঠে সুগম্ভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন, ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর
শূন্য-পানে—"আরো কোথা? আরো কত দূর?"

পতিসর
সন্ধ্যা। ৯ ফাল্গুন ১৩০০

এবার ফিরাও মোরে

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূর-বনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। ওরে তুই ওঠ্ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে? কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল? কোন্ অন্ধকারা-মাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়? স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া; বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার; সংকুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে। ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে—ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা—এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে

ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা—ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে;
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে
পথকুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে;
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।

কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখো না বসায়ে আর। দিন যায়, সন্ধ্যা হয়ে আসে।
অন্ধকারে ঢাকে দিশি, নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে
নিশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন। বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে
জনতার মাঝখানে। কোথা যাও, পান্থ, কোথা যাও,
আমি নহি পরিচিত, মোর পানে ফিরিয়া তাকাও।
বলো মোরে নাম তব, আমারে কোরো না অবিশ্বাস।
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি-মাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রিদিন; তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নূতনতর, তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,
বক্ষে জ্বলে ক্ষুধানল। যেদিন জগতে চলে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা। সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীতে
কর্মহীন জীবনের এক প্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,

সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি—তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ।

কী গাহিবে, কী শুনাবে! বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।
মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সংকট আবর্ত-মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন—
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম-অর্ঘ্য-উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ। শুনিয়াছি, তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে—অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্যপ্রতিমা। তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে। শুধু জানি, তাহারি মহান
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে,
তাহারি অঞ্চলপ্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে,
তারি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্তিখানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জনমুখে। শুধু জানি

সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্কতিলক। তাহারে অন্তরে রাখি
জীবনকণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী,
সুখে দুঃখে ধৈর্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,
প্রতিদিবসের কর্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি
সুখী করি সর্বজনে। তার পরে দীর্ঘপথশেষে
জীবযাত্রা-অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে। প্রসন্নবদনে মন্দ হেসে
পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্তকণ্ঠে বরমাল্যখানি,
করপদ্মপরশনে শান্ত হবে সর্ব দুঃখগ্লানি
সর্ব অমঙ্গল। লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে
ধৌত করি দিব পদ আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে।
সুচিরসঞ্চিত আশা সম্মুখে করিয়া উদ্‌ঘাটন
জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,
মাগিব অনন্ত ক্ষমা। হয়তো ঘুচিবে দুঃখনিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা।

রামপুর বোয়ালিয়া
২৩ ফাল্গুন ১৩০০

স্নেহস্মৃতি

সেই চাঁপা, সেই বেলফুল,
কে তোরা আজি এ প্রাতে এনে দিলি মোর হাতে
জল আসে আঁখিপাতে, হৃদয় আকুল।
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল!

কত দিন, কত সুখ, কত হাসি, স্নেহমুখ,
কত কী পড়িল মনে প্রভাতবাতাসে,
স্নিগ্ধ প্রাণ সুধাভরা শ্যামল সুন্দর ধরা,
তরুণ অরুণরেখা নির্মল আকাশে।
সকলি জড়িত হয়ে অন্তরে যেতেছে বয়ে,
ডুবে যায় অশ্রুজলে হৃদয়ের কূল,
মনে পড়ে তারি সাথে জীবনের কত প্রাতে
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল!

বড়ো বেসেছিনু ভালো এই শোভা, এই আলো,
এ আকাশ, এ বাতাস, এই ধরাতল।

কতদিন বসি তীরে শুনেছি নদীর নীরে
নিশীথের সমীরণে সংগীত তরল।
কতদিন পরিয়াছি সন্ধ্যাবেলা মালাগাছি
স্নেহের হস্তের গাঁথা বকুল-মুকুল;
বড়ো ভালো লেগেছিল যেদিন এ হাতে দিল
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল!

কত শুনিয়াছি বাঁশি, কত দেখিয়াছি হাসি,
কত উৎসবের দিনে কত যে কৌতুক।
কত বরষার বেলা সঘন আনন্দ-মেলা,
কত গানে জাগিয়াছে সুনিবিড় সুখ।
এ প্রাণ বীণার মতো ঝংকারি উঠেছে কত
আসিয়াছে শুভক্ষণ কত অনুকূল,
মনে পড়ে তারি সাথে কতদিন কত প্রাতে
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল!

সেই সব এই সব, তেমনি পাখির রব,
তেমনি চলেছে হেসে জাগ্রত সংসার।
দক্ষিণ-বাতাসে-মেশা ফুলের গন্ধের নেশা
দিকে দিকে ব্যাকুলতা করিছে সঞ্চার।
অবোধ অন্তরে তাই চারি দিক-পানে চাই,
অকস্মাৎ আনমনে জেগে উঠে ভুল—
বুঝি সেই স্নেহসনে ফিরে এল এ জীবনে
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল!

আনন্দ-পাথেয় যত, সকলি হয়েছে গত,
দুটি রিক্তহস্তে মোর আজি কিছু নাই।
তবু সম্মুখের পানে চলেছি কঠিন প্রাণে,
যেতে হবে গম্যস্থানে, ফিরে না তাকাই।
দাঁড়ায়ো না, চলো চলো, কী আছে কে জানে বলো,
ধূলিময় শুষ্কপথ, সংশয় বিপুল।
শুধু জানিয়াছি সার কভু ফুটিবে না আর
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল!

আমি কিছু নাহি চাই, যাহা দিবে লব তাই,
চিরসুখ এ জগতে কে পেয়েছে কবে।
প্রাণে লয়ে উপবাস কাটে কত বর্ষমাস,
তৃষিত তাপিত চিত্ত কত আছে ভবে।
শুধু এক ভিক্ষা আছে, যেদিন আসিবে কাছে
জীবনের পথশেষে মরণ অকূল
সেদিন স্নেহের সাথে তুলে দিয়ো এই হাতে
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল।

হয়তো মৃত্যুর পারে ঢাকা সব অন্ধকারে
স্বপ্নহীন চিরসুপ্তি বক্ষে চেপে রহে,
গীতগান হেথাকার সেথা নাহি বাজে আর,
হেথাকার বনগন্ধ সেথা নাহি বহে।
কে জানে সকল স্মৃতি জীবনের সব প্রীতি
জীবনের অবসানে হবে কি উন্মূল?
জানি নে গো এই হাতে নিয়ে যাব কি না সাথে
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল!

জোড়াসাঁকো
বর্ষশেষ ১৩০০

নববর্ষে

নিশি অবসানপ্রায়, ওই পুরাতন
বর্ষ হয় গত।
আমি আজি ধূলিতলে এ জীর্ণ জীবন
করিলাম নত।
বন্ধু হও, শত্রু হও, যেখানে যে কেহ রও,
ক্ষমা করো আজিকার মতো
পুরাতন বরষের সাথে
পুরাতন অপরাধ যত।

আজি বাঁধিতেছি বসি সংকল্প নূতন
অন্তরে আমার।
সংসারে ফিরিয়া গিয়া হয়তো কখন
ভুলিব আবার।
তখন কঠিন ঘাতে এনো অশ্রু আঁখিপাতে
অধমের করিয়ো বিচার।
আজি নব-বরষ-প্রভাতে
ভিক্ষা চাহি মার্জনা সবার।

আজ চলে গেলে কাল কী হবে না হবে
নাহি জানে কেহ।
আজিকার প্রীতিসুখ রবে কি না রবে,
আজিকার স্নেহ।
যতটুকু আলো আছে, কাল নিবে যায় পাছে,
অন্ধকারে ঢেকে যায় গেহ,
আজ এসো নববর্ষদিনে
যতটুকু আছে তাই দেহো।

বিস্তীর্ণ এ বিশ্বভূমি সীমা তার নাই,
কত দেশ আছে!
কোথা হতে কয় জনা হেথা এক ঠাঁই
কেন মিলিয়াছে?
করো সুখী, থাকো সুখে, প্রীতিভরে হাসিমুখে,
পুষ্পগুচ্ছ যেন এক গাছে।
তা যদি না পার চিরদিন,
একদিন এসো তবু কাছে।

সময় ফুরায়ে গেলে কখন আবার
কে যাবে কোথায়।
অনন্তের মাঝখানে পরস্পরে আর
দেখা নাহি যায়।
বড়ো সুখ বড়ো ব্যথা চিহ্ন না রাখিবে কোথা,
মিলাইবে জলবিম্ব প্রায়,
এক দিন প্রিয়মুখ যত
ভালো করে দেখে লই, আয়।

আপন সুখের লাগি সংসারের মাঝে
তুলি হাহাকার!
আত্ম-অভিমানে অন্ধ, জীবনের কাজে
আনি অবিচার।
আজি করি প্রাণপণ করিলাম সমর্পণ
এ জীবনে যা আছে আমার।
তোমরা যা দিবে তাই লব,
তার বেশি চাহিব না আর।

লইব আপন করি নিত্যধৈর্যভরে
দুঃখভার যত।
চলিব কঠিন পথে অটল অন্তরে
সাধি মহাব্রত।
যদি ভেঙে যায় পণ, দুর্বল এ শ্রান্ত মন
সবিনয়ে করি শির নত
তুলি লব আপনার 'পরে
আপনার অপরাধ যত।

যদি ব্যর্থ হয় প্রাণ, যদি দুঃখ ঘটে—
ক-দিনের কথা!
একদা মুছিয়া যাবে সংসারের পটে
শূন্য নিষ্ফলতা।
জগতে কি তুমি একা? চতুর্দিকে যায় দেখা
সুদুর্ভর কত দুঃখব্যথা।

তুমি শুধু ক্ষুদ্র এক জন,
এ সংসারে অনন্ত জনতা।

যতক্ষণ আছ হেথা, স্থিরদীপ্তি থাকো
তারার মতন।
সুখ যদি নাহি পাও, শান্তি মনে রাখো
করিয়া যতন।
যুদ্ধ করি নিরবধি, বাঁচিতে না পার যদি,
পরাভব করে আক্রমণ,
কেমনে মরিতে হয় তবে
শেখো তাই করি প্রাণপণ।

জীবনের এই পথ, কে বলিতে পারে
বাকি আছে কত?
মাঝে কত বিঘ্নশোক, কত ক্ষুরধারে
হৃদয়ের ক্ষত?
পুনর্বার কালি হতে চলিব সে তপ্ত পথে,
ক্ষমা করো আজিকার মতো
পুরাতন বরষের সাথে
পুরাতন অপরাধ যত।

ওই যায়, চলে যায় কাল-পরপারে
মোর পুরাতন।
এই বেলা, ওরে মন, বল্ অশ্রুধারে
কৃতজ্ঞ বচন।
বল্ তারে—দুঃখসুখ দিয়েছ ভরিয়া বুক,
চিরকাল রহিবে স্মরণ।
যাহা-কিছু লয়ে গেলে সাথে
তোমারে করিনু সমর্পণ।

ওই এল এ জীবনে নূতন প্রভাতে
নূতন বরষ।
মনে করি প্রীতিভরে বাঁধি হাতে হাতে
না পাই সাহস।
নব অতিথিরে তবু ফিরাইতে নাই কভু,
এসো, এসো, নূতন দিবস!
ভরিলাম পুণ্য অশ্রুজলে
আজিকার মঙ্গলকলস।

জোড়াসাঁকো
নববর্ষ ১৩০১

দুঃসময়

বিলম্বে এসেছ, রুদ্ধ এবে দ্বার,
জনশূন্য পথ, রাত্রি অন্ধকার,
গৃহহারা বায়ু করি হাহাকার
ফিরিয়া মরে।
তোমারে আজিকে ভুলিয়াছে সবে,
শুধাইলে কেহ কথা নাহি কবে,
এহেন নিশীথে আসিয়াছ তবে
কী মনে করে।
এ দুয়ারে মিছে হানিতেছ কর,
ঝটিকার মাঝে ডুবে যায় স্বর,
ক্ষীণ আশাখানি ত্রাসে থরথর
কাঁপিছে বুকে।
যেথা এক দিন ছিল তোর গেহ
ভিখারীর মতো আসে সেথা কেহ?
কার লাগি জাগে উপবাসী স্নেহ
ব্যাকুল মুখে।
ঘুমায়েছে যারা তাহারা ঘুমাক,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে কেন দাও ডাক,
তোমারে হেরিলে হইবে অবাক
সহসা রাতে।
যাহারা জাগিছে নবীন উৎসবে
রুদ্ধ করি দ্বার মত্ত কলরবে,
কী তোমার যোগ আজি এই ভবে
তাদের সাথে।
দ্বার-ছিদ্র দিয়ে কী দেখিছ আলো,
বাহির হইতে ফিরে যাওয়া ভালো,
তিমির ক্রমশ হতেছে ঘোরালো
নিবিড় মেঘে।
বিলম্বে এসেছ, রুদ্ধ এবে দ্বার,
তোমার লাগিয়া খুলিবে না আর,
গৃহহারা ঝড় করি হাহাকার
বহিছে বেগে।

জোড়াসাঁকো
৫ বৈশাখ ১৩০১

মৃত্যুর পরে

আজিকে হয়েছে শান্তি,
জীবনের ভুলভ্রান্তি
সব গেছে চুকে।
রাত্রিদিন ধুক্‌ধুক্‌
তরঙ্গিত দুঃখসুখ
থামিয়াছে বুকে।
যত কিছু ভালোমন্দ
যত কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব
কিছু আর নাই।
বলো শান্তি, বলো শান্তি,
দেহসাথে সব ক্লান্তি
হয়ে যাক ছাই।

গুঞ্জরি করুণ তান
ধীরে ধীরে করো গান
বসিয়া শিয়রে।
যদি কোথা থাকে লেশ
জীবন-স্বপ্নের শেষ
তাও যাক মরে।
তুলিয়া অঞ্চলখানি
মুখ-'পরে দাও টানি,
ঢেকে দাও দেহ।
করুণ মরণ যথা
ঢাকিয়াছে সব ব্যথা,
সকল সন্দেহ।

বিশ্বের আলোক যত
দিগ্‌বিদিকে অবিরত
যাইতেছে বয়ে,
শুধু ওই আঁখি-'পরে
নামে তাহা স্নেহভরে
অন্ধকার হয়ে।
জগতের তন্ত্রীরাজি
দিনে উচ্চে উঠে বাজি,
রাত্রে চুপে চুপে,
সে শব্দ তাহার 'পরে
চুম্বনের মতো পড়ে
নীরবতারূপে।

মিছে আনিয়াছ আজি
বসন্তকুসুমরাজি
দিতে উপহার।
নীরবে আকুল চোখে
ফেলিতেছ বৃথা শোকে
নয়নাশ্রুধার।
ছিলে যারা রোষভরে
বৃথা এতদিন পরে
করিছ মার্জনা।
অসীম নিস্তব্ধ দেশে
চিররাত্রি পেয়েছে সে
অনন্ত সান্ত্বনা।

গিয়েছে কি আছে বসে,
জাগিল কি ঘুমাল সে
কে দিবে উত্তর।
পৃথিবীর শ্রান্তি তারে
ত্যজিল কি একেবারে,
জীবনের জ্বর।
এখনি কি দুঃখসুখে
কর্মপথ-অভিমুখে
চলেছে আবার।
অস্তিত্বের চক্রতলে
এক বার বাঁধা প'লে
পায় কি নিস্তার।

বসিয়া আপন দ্বারে
ভালোমন্দ বলো তারে
যাহা ইচ্ছা তাই।
অনন্ত জনম-মাঝে
গেছে সে অনন্ত কাজে,
সে আর সে নাই।
আর পরিচিত মুখে
তোমাদের দুখে সুখে
আসিবে না ফিরে,
তবে তার কথা থাক্,
যে গেছে সে চলে যাক
বিস্মৃতির তীরে।

জানি না কিসের তরে
যে যাহার কাজ করে
সংসারে আসিয়া,

ভালোমন্দ শেষ করি
যায় জীর্ণ জন্মতরী
কোথায় ভাসিয়া।
দিয়ে যায় যত যাহা
রাখো তাহা ফেলো তাহা
যা ইচ্ছা তোমার।
সে তো নহে বেচাকেনা
ফিরিবে না, ফেরাবে না
জন্ম-উপহার।

কেন এই আনাগোনা,
কেন মিছে দেখাশোনা
দুদিনের তরে,
কেন বুকভরা আশা,
কেন এত ভালোবাসা
অন্তরে অন্তরে।
আয়ু যার এতটুক,
এত দুঃখ এত সুখ
কেন তার মাঝে,
অকস্মাৎ এ সংসারে
কে বাঁধিয়া দিল তারে
শত লক্ষ কাজে।

হেথায় যে অসম্পূর্ণ,
সহস্র আঘাতে চূর্ণ
বিদীর্ণ বিকৃত,
কোথাও কি একবার
সম্পূর্ণতা আছে তার
জীবিত কি মৃত।
জীবনে যা প্রতিদিন
ছিল মিথ্যা অর্থহীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি
তারে গাঁথিয়াছে আজি
অর্থপূর্ণ করি।

হেথা যারে মনে হয়
শুধু বিফলতাময়
অনিত্য চঞ্চল
সেথায় কি চুপে চুপে
অপূর্ব নূতন রূপে
হয় সে সফল।

চিরকাল এই সব
রহস্য আছে নীরব
রুদ্ধ-ওষ্ঠাধর,
জন্মান্তের নবপ্রাতে
সে হয়তো আপনাতে
পেয়েছে উত্তর।

সে হয়তো দেখিয়াছে
পড়ে যাহা ছিল পাছে
আজি তাহা আগে;
ছোটো যাহা চিরদিন
ছিল অন্ধকারে লীন,
বড়ো হয়ে জাগে।
যেথায় ঘৃণার সাথে
মানুষ আপন হাতে
লেপিয়াছে কালি
নূতন নিয়মে সেথা
জ্যোতির্ময় উজ্জ্বলতা
কে দিয়াছে জ্বালি।

কত শিক্ষা পৃথিবীর
খসে পড়ে জীর্ণচীর
জীবনের সনে,
সংসারের লজ্জাভয়
নিমেষেতে দগ্ধ হয়
চিতাহুতাশনে।
সকল অভ্যাস-ছাড়া
সর্ব আবরণহারা
সদা শিশুসম
নগ্নমূর্তি মরণের
নিষ্কলঙ্ক চরণের
সম্মুখে প্রণমো।

আপন মনের মতো
সংকীর্ণ বিচার যত
রেখে দাও আজ।
ভুলে যাও কিছুক্ষণ
প্রত্যহের আয়োজন,
সংসারের কাজ।
আজি ক্ষণেকের তরে
বসি বাতায়ন-'পরে
বাহিরেতে চাহো।

অসীম আকাশ হতে
বহিয়া আসুক স্রোতে
বৃহৎ প্রবাহ।

উঠিছে ঝিল্লির গান,
তরুর মর্মরতান,
নদীকলস্বর,
প্রহরের আনাগোনা
যেন রাত্রে যায় শোনা
আকাশের 'পর।
উঠিতেছে চরাচরে
অনাদি অনন্ত স্বরে
সংগীত উদার,
সে নিত্য-গানের সনে
মিশাইয়া লহো মনে
জীবন তাহার।

ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে
দেখো তারে সর্বদৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া,
জীবনের ধূলি ধুয়ে
দেখো তারে দূরে থুয়ে
সম্মুখে ধরিয়া।
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে
ভাগ করি খণ্ডে খণ্ডে
মাপিয়ো না তারে।
থাক্‌ তব ক্ষুদ্র মাপ
ক্ষুদ্র পুণ্য, ক্ষুদ্র পাপ
সংসারের পারে।

আজ বাদে কাল যারে
ভুলে যাবে একেবারে
পরের মতন
তারে লয়ে আজি কেন
বিচার-বিরোধ হেন,
এত আলাপন।
যে বিশ্ব কোলের 'পরে
চিরদিবসের তরে
তুলে নিল তারে
তার মুখে শব্দ নাহি,
প্রশান্ত সে আছে চাহি
ঢাকি আপনারে।

বৃথা তারে প্রশ্ন করি,
বৃথা তার পায়ে ধরি,
বৃথা মরি কেঁদে,
খুঁজে ফিরি অশ্রুজলে—
কোন্ অঞ্চলের তলে
নিয়েছে সে বেঁধে।
ছুটিয়া মৃত্যুর পিছে,
ফিরে নিতে চাহি মিছে,
সে কি আমাদের?
পলেক বিচ্ছেদে হায়
তখনি তো বুঝা যায়
সে যে অনন্তের।

চক্ষের আড়ালে তাই
কত ভয় সংখ্যা নাই,
সহস্র ভাবনা।
মুহূর্ত মিলন হলে
টেনে নিই বুকে কোলে,
অতৃপ্ত কামনা।
পার্শ্বে বসে ধরি মুঠি,
শব্দমাত্রে কেঁপে উঠি,
চাহি চারি ভিতে,
অনন্তের ধনটিরে
আপনার বুক চিরে
চাহি লুকাইতে।

হায় রে নির্বোধ নর,
কোথা তোর আছে ঘর,
কোথা তোর স্থান।
শুধু তোর ওইটুক
অতিশয় ক্ষুদ্র বুক
ভয়ে কম্পমান।
ঊর্ধ্বে ওই দেখ্ চেয়ে
সমস্ত আকাশ ছেয়ে
অনন্তের দেশ,
সে যখন একধারে
লুকায়ে রাখিবে তারে
পাবি কি উদ্দেশ?

ওই হেরো সীমাহারা
গগনেতে গ্রহতারা

অসংখ্য জগৎ,
ওরি মাঝে পরিভ্রান্ত
হয়তো সে একা পান্থ
খুঁজিতেছে পথ।
ওই দূর-দূরান্তরে
অজ্ঞাত ভুবন-'পরে
কভু কোনোখানে
আর কি গো দেখা হবে,
আর কি সে কথা কবে,
কেহ নাহি জানে।

যা হবার তাই হোক,
ঘুচে যাক সর্ব শোক,
সর্ব মরীচিকা।
নিবে যাক চিরদিন
পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ
মর্ত্যজন্মশিখা।
সব তর্ক হোক শেষ,
সব রাগ সব দ্বেষ,
সকল বালাই।
বলো শান্তি, বলো শান্তি-
দেহসাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক ছাই।

জোড়াসাঁকো
৫ বৈশাখ ১৩০২

ব্যাঘাত

কোলে ছিল সুরে-বাঁধা বীণা
মনে ছিল বিচিত্র রাগিণী,
মাঝখানে ছিঁড়ে যাবে তার
সে কথা ভাবি নি।
ওগো আজি প্রদীপ নিবাও,
বন্ধ করো দ্বার,
সভা ভেঙে ফিরে চলে যাও
হৃদয় আমার।
তোমরা যা আশা করেছিলে
নারিনু পুরাতে,
কে জানিত ছিঁড়ে যাবে তার
গীত না ফুরাতে।

ভেবেছিনু ঢেলে দিব মন,
প্লাবন করিব দশ দিশি,
পুষ্পগন্ধে আনন্দে মিশিয়া
পূর্ণ হবে পূর্ণিমার নিশি।
ভেবেছিনু ঘিরিয়া বসিবে
তোমরা সকলে
গীতশেষে হেসে ভালোবেসে
মালা দিবে গলে.
শেষ করে যাব সব কথা.
সকল কাহিনী—
মাঝখানে ছিঁড়ে যাবে তার
সে কথা ভাবি নি।

আজি হতে সবে দয়া ক'রে
ভুলে যাও, ঘরে যাও চলে,
করিয়ো না মোরে অপরাধী
মাঝখানে থামিলাম ব'লে।
আমি চাহি আজি রজনীতে
নীরব নির্জন,
ভূমিতলে ঘুমায়ে পড়িতে
স্তব্ধ অচেতন।
খ্যাতিহীন শান্তি চাহি আমি
স্নিগ্ধ অন্ধকার।
সাঙ্গ না হইতে সব গান
ছিন্ন হল তার।

জোড়াসাঁকো
৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১

অন্তর্যামী

এ কী কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী.
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তর-মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,

সংগীতস্রোতে কূল নাহি পাই,
কোথা ভেসে যাই দূরে।
বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত—
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে,
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মতো।
সে মায়ামূরতি কী কহিছে বাণী,
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি,
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগন।
এ যে সংগীত কোথা হতে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হতে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হতে টুটে
অন্তরবিদারণ।
নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণীভরে।
যে কথা ভাবি নি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।
কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বার বার,
দেখে তুমি হাস বুঝি।
কে গো তুমি, কোথা রয়েছ গোপনে,
আমি মরিতেছি খুঁজি।

এ কী কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী।
যে দিকে পান্থ চাহে চলিবারে
চলিতে দিতেছ কই।
গ্রামের যে পথ ধায় গৃহপানে,
চাষীগণ ফিরে দিবা-অবসানে,
গোঠে ধায় গোরু, বধূ জল আনে
শত বার যাতায়াতে,

একদা প্রথম প্রভাতবেলায়
সে পথে বাহির হইনু হেলায়,
মনে ছিল, দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে।
পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্তহৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।
কখনো উদার গিরির শিখরে,
কভু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে পথ সে পথের 'পরে
চলেছি পাগল-বেশে।
কভু বা পন্থ গহন জটিল,
কভু পিচ্ছল ঘনপঙ্কিল,
কভু সংকটছায়া-শঙ্কিল,
বঙ্কিম দুরগম—
খরকণ্টকে ছিন্ন চরণ,
ধুলায় রৌদ্রে মলিন বরন,
আশেপাশে হতে তাকায় মরণ,
সহসা লাগায় ভ্রম।
তারি মাঝে বাঁশি বাজিছে কোথায়,
কাঁপিছে বক্ষ সুখের ব্যথায়,
তীব্র তপ্ত দীপ্ত নেশায়
চিত্ত মাতিয়া উঠে।
কোথা হতে আসে ঘন সুগন্ধ,
কোথা হতে বায়ু বহে আনন্দ,
চিন্তা ত্যজিয়া পরান অন্ধ
মৃত্যুর মুখে ছুটে।
খেপার মতন কেন এ জীবন,
অর্থ কী তার, কোথা এ ভ্রমণ,
চুপ করে থাকি শুধায় যখন—
দেখে তুমি হাস বুঝি।
কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে,
আমি যে তোমারে খুঁজি।

রাখো কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী।
আমার অর্থ, তোমার তত্ত্ব
বলে দাও মোরে অয়ি।
আমি কি গো বীণাযন্ত্র তোমার,
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার

মূর্ছনাভরে গীতঝংকার
  ধ্বনিছ মর্মমাঝে?
আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ, অপার বাসনা,
কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
  মোর বেদনায় বাজে?
মোর প্রেমে দিয়ে তোমার রাগিণী
কহিতেছ কোন্ অনাদি কাহিনী,
কঠিন আঘাতে ওগো মায়াবিনী
  জাগাও গভীর সুর।
হবে যবে তব লীলা অবসান,
ছিঁড়ে যাবে তার, থেমে যাবে গান,
আমারে কি ফেলে করিবে প্রয়াণ
  তব রহস্যপুর?
জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার
রহস্যঘেরা অসীম আঁধার
  মহামন্দিরতলে?
নাহি জানি, তাই কার লাগি প্রাণ
মরিছে দহিয়া নিশিদিনমান,
যেন সচেতন বহ্নিসমান
  নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বলে।
অর্ধনিশীথে নিভৃতে নীরবে
এই দীপখানি নিবে যাবে যবে
বুঝিব কি, কেন এসেছিনু ভবে,
  কেন জ্বলিলাম প্রাণে?
কেন নিয়ে এলে তব মায়ারথে
তোমার বিজন নূতন এ পথে,
কেন রাখিলে না সবার জগতে
  জনতার মাঝখানে?
জীবন-পোড়ানো এ হোম-অনল
সেদিন কি হবে সহসা সফল?
সেই শিখা হতে রূপ নির্মল
  বাহিরি আসিবে বুঝি।
সব জটিলতা হইবে সরল
  তোমারে পাইব খুঁজি।

ছাড়ি কৌতুক নিত্যনূতন
  ওগো কৌতুকময়ী,
জীবনের শেষে কী নূতন বেশে
  দেখা দিবে মোরে অয়ি।

চিরদিবসের মর্মের ব্যথা,
শত জনমের চিরসফলতা,
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা,
আমার বিশ্বরূপী,
মরণনিশায় উষা বিকাশিয়া
শ্রান্তজনের শিয়রে আসিয়া
মধুর অধরে করুণ হাসিয়া
দাঁড়াবে কি চুপি চুপি?
ললাট আমার চুম্বন করি
নব চেতনায় দিবে প্রাণ ভরি,
নয়ন মেলিয়া উঠিব শিহরি,
জানি না চিনিব কি না।
শূন্য গগন নীলনির্মল,
নাহি রবিশশী গ্রহমণ্ডল,
না বহে পবন, নাই কোলাহল,
বাজিছে নীরব বীণা।
অচল আলোকে রয়েছ দাঁড়ায়ে,
কিরণবসন অঙ্গ জড়ায়ে
চরণের তলে পড়িছে গড়ায়ে
ছড়ায়ে বিবিধ ভঙ্গে।
গন্ধ তোমার ঘিরে চারি ধার,
উড়িছে আকুল কুন্তলভার,
নিখিল গগন কাঁপিছে তোমার
পরশ-রস-তরঙ্গে।
হাসিমাখা তব আনত দৃষ্টি
আমারে করিছে নূতন সৃষ্টি
অঙ্গে অঙ্গে অমৃতবৃষ্টি
বরষি করুণাভরে।
নিবিড় গভীর প্রেম-আনন্দ
বাহুবন্ধনে করেছে বন্ধ,
মুগ্ধ নয়ন হয়েছে অন্ধ
অশ্রুবাষ্প-থরে।
নাহিকো অর্থ, নাহিকো তত্ত্ব,
নাহিকো মিথ্যা, নাহিকো সত্য,
আপনার মাঝে আপনি মত্ত—
দেখিয়া হাসিবে বুঝি।
আমি হতে তুমি বাহিরে আসিবে,
ফিরিতে হবে না খুঁজি।

যদি কৌতুক রাখ চিরদিন
ওগো কৌতুকময়ী,

যদি অন্তরে লুকায়ে বসিয়া
হবে অন্তরজয়ী,
তবে তাই হোক। দেবী, অহরহ
জনমে জনমে রহো তবে রহো,
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে।
নব নব রূপে ওগো রূপময়,
লুণ্ঠিয়া লহো আমার হৃদয়,
কাঁদাও আমারে, ওগো নির্দয়,
চঞ্চল প্রেম দিয়ে।
কখনো হৃদয়ে, কখনো বাহিরে,
কখনো আলোকে, কখনো তিমিরে,
কভু বা স্বপনে, কভু সশরীরে
পরশ করিয়া যাবে।
বক্ষোবীণায় বেদনার তার
এইমতো পুন বাঁধিব আবার,
পরশমাত্রে গীতঝংকার
উঠিবে নূতন ভাবে।
এমনি টুটিয়া মর্ম-পাথর
ছুটিবে আবার অশ্রু-নির্ঝর,
জানি না খুঁজিয়া কী মহাসাগর
বহিয়া চলিবে দূরে।
বরষ বরষ দিবসরজনী
অশ্রুনদীর আকুল সে ধ্বনি
রহিয়া রহিয়া মিশিবে এমনি
আমার গানের সুরে।
যত শত ভুল করেছি এবার
সেইমতো ভুল ঘটিবে আবার,
ওগো মায়াবিনী, কত ভুলাবার
মন্ত্র তোমার আছে।
আবার তোমারে ধরিবার তরে
ফিরিয়া মরিব বনে প্রান্তরে,
পথ হতে পথে, ঘর হতে ঘরে
দুরাশার পাছে পাছে।
এবারের মতো পূরিয়া পরান
তীব্র বেদনা করিয়াছি পান,
সে সুরা তরল অগ্নিসমান
তুমি ঢালিতেছ বুঝি।
আবার এমনি বেদনার মাঝে
তোমারে ফিরিব খুঁজি।

ভাদ্র ১৩০১

সাধনা

দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি;
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে
ব্যর্থ সাধনখানি।
তুমি জান মোর মনের বাসনা,
যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না,
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা
দিবসনিশি।
মনে যাহা ছিল হয়ে গেল আর,
গড়িতে ভাঙিয়া গেল বারবার,
ভালোয় মন্দে আলোয় আঁধার
গিয়েছে মিশি।
তবু ওগো, দেবী, নিশিদিন করি পরানপণ,
চরণে দিতেছি আনি
মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধের ধন
ব্যর্থ সাধনখানি।
ওগো ব্যর্থ সাধনখানি
দেখিয়া হাসিছে সার্থকফল
সকল ভক্ত প্রাণী।
তুমি যদি দেবী, পলকে কেবল
কর কটাক্ষ স্নেহসুকোমল,
একটি বিন্দু ফেল আঁখিজল
করুণা মানি,
সব হতে তবে সার্থক হবে
ব্যর্থ সাধনখানি।

দেবী, আজি আসিয়াছে অনেক যন্ত্রী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি,
আমি আনিয়াছি ছিন্নতন্ত্রী নীরব ম্লান
এই দীন বীণাখানি।
তুমি জান ওগো করি নাই হেলা,
পথে প্রান্তরে করি নাই খেলা,
শুধু সাধিয়াছি বসি সারাবেলা
শতেক বার।
মনে যে গানের আছিল আভাস,
যে তান সাধিতে করেছিনু আশ,
সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস—
ছিঁড়িল তার।
স্তবহীন তাই রয়েছি দাঁড়ায়ে সারাটি ক্ষণ,
আনিয়াছি গীতহীনা

আমার প্রাণের একটি যন্ত্র বুকের ধন
ছিন্নতন্ত্রী বীণা।
ওগো ছিন্নতন্ত্রী বীণা
দেখিয়া তোমার গুণীজন সবে
হাসিছে করিয়া ঘৃণা।
তুমি যদি এরে লহ কোলে তুলি,
তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি
সকল অগীত সংগীতগুলি,
হৃদয়াসীনা।
ছিল যা আশায় ফুটাবে ভাষায়
ছিন্নতন্ত্রী বীণা।

দেবী, এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি অনেক গান,
পেয়েছি অনেক ফল—
সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান,
ভরেছি ধরণীতল।
যার ভালো লাগে সেই নিয়ে যাক,
যতদিন থাকে ততদিন থাক্,
যশ-অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক
ধুলার মাঝে।
বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ
আমার সে নয় সবার সে আজ,
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসারমাঝ
বিবিধ সাজে।
যা কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠ ধন
দিতেছি চরণে আসি—
অকৃত কার্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,
বিফল বাসনারাশি।
ওগো বিফল বাসনারাশি
হেরিয়া আজিকে ঘরে পরে সবে
হাসিছে হেলার হাসি।
তুমি যদি দেবী, লহ কর পাতি,
আপনার হাতে রাখ মালা গাঁথি,
নিত্য নবীন রবে দিনরাতি
সুবাসে ভাসি,
সফল করিবে জীবন আমার
বিফল বাসনারাশি।

৪ কার্তিক ১৩০১

ব্রাহ্মণ

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৪ প্রপাঠক। ৪ অধ্যায়

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি আহরণ
বনান্তর হতে; ফিরায়ে এনেছে ডাকি
তপোবন-গোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি
শ্রান্ত হোমধেনুগণে; করি সমাপন
সন্ধ্যাস্নান, সবে মিলি লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি কুটীর-প্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি-আলোকে। শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি; নক্ষত্রমণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ-কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মতো। নিভৃত আশ্রম
উঠিল চকিত হয়ে; মহর্ষি গৌতম
কহিলেন, "বৎসগণ, ব্রহ্মবিদ্যা কহি,
করো অবধান।"

হেনকালে অর্ঘ্য বহি
করপুট ভরি, পশিলা প্রাঙ্গণতলে
তরুণ বালক; বন্দি ফলফুলদলে
ঋষির চরণ-পদ্ম, নমি ভক্তিভরে
কহিলা কোকিলকণ্ঠে সুধাস্নিগ্ধ স্বরে,
"ভগবন্‌, ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষা-অভিলাষী
আসিয়াছি দীক্ষাতরে কুশক্ষেত্রবাসী
সত্যকাম নাম মোর।"

শুনি স্মিতহাসে
ব্রহ্মর্ষি কহিলা তারে স্নেহশান্ত ভাষে,
"কুশল হউক সৌম্য। গোত্র কী তোমার।
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।"

বালক কহিলা ধীরে,
"ভগবন্‌, গোত্র নাহি জানি। জননীরে
শুধায়ে আসিব কল্য, করো অনুমতি।"
এত কহি ঋষিপদে করিয়া প্রণতি

গেলা চলি সত্যকাম, ঘন-অন্ধকার
বনবীথি দিয়া পদব্রজে হয়ে পার
ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী— বালুতীরে
সুপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননী-কুটীরে
করিলা প্রবেশ।

ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা;
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি জননী জবালা
পুত্রপথ চাহি; হেরি তারে বক্ষে টানি
আঘ্রাণ করিয়া শির কহিলেন বাণী
কল্যাণ কুশল। শুধাইলা সত্যকাম,
"কহো গো জননী, মোর পিতার কী নাম,
কী বংশে জনম। গিয়াছিনু দীক্ষাতরে
গৌতমের কাছে; গুরু কহিলেন মোরে,
'বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।' মাতঃ, কী গোত্র আমার।"

শুনি কথা মৃদুকণ্ঠে অবনতমুখে
কহিলা জননী, "যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি, তাত।"

পরদিন
তপোবন-তরুশিরে প্রসন্ন নবীন
জাগিল প্রভাত। যত তাপস বালক
শিশির-সুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা,
প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্রসিক্তজটা,
শুচিশোভা সৌম্যমূর্তি সমুজ্জ্বলকায়ে
বসেছে বেষ্টন করি বৃদ্ধবটচ্ছায়ে
গুরু গৌতমেরে। বিহঙ্গ-কাকলিগান,
মধুপ-গুঞ্জনগীতি, জল-কলতান,
তারি সাথে উঠিতেছে গম্ভীর মধুর
বিচিত্র তরুণ কণ্ঠে সম্মিলিত সুর—
শান্ত সামগীতি।

হেনকালে সত্যকাম
কাছে আসি ঋষিপদে করিলা প্রণাম—
মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে।
আচার্য আশিস্ করি শুধাইলা তবে,
"কী গোত্র তোমার সৌম্য, প্রিয়দরশন।"

তুলি শির কহিলা বালক, "ভগবন্,
নাহি জানি কী গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে; কহিলেন তিনি, 'সত্যকাম,
বহু পরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি'।"

শুনি সে-বারতা
ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা—
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মতো—সবে বিস্ময়-বিকল,
কেহ বা হাসিল, কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্যের হেরি অহংকার।

উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি, বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন, "অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত,
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।"

৭ ফাল্গুন ১৩০১

পুরাতন ভৃত্য

ভূতের মতন চেহারা যেমন, নির্বোধ অতি ঘোর—
যা-কিছু হারায়, গিন্নি বলেন, "কেষ্টা বেটাই চোর।"
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে।
যত পায় বেত না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।
বড়ো প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ চীৎকার করি "কেষ্টা"—
যত করি তাড়া নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা।
তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে;
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা করে আনে।
যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা;
মহাকলরবে গালি দেই যবে "পাজি হতভাগা গাধা"—
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে, দেখে জ্বলে যায় পিত্ত।
তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার— বড়ো পুরাতন ভৃত্য।

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্তি বলে, "আর পারি নাকো,
রহিল তোমার এ ঘর-দুয়ার, কেষ্টারে লয়ে থাকো।
না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যত
কোথায় কী গেল, শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মতো।

গেলা চলি সত্যকাম, ঘন-অন্ধকার
বনবীথি দিয়া পদব্রজে হয়ে পার
ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী— বালুতীরে
সুপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননী-কুটীরে
করিলা প্রবেশ।

ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা;
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি জননী জবালা
পুত্রপথ চাহি; হেরি তারে বক্ষে টানি
আঘ্রাণ করিয়া শির কহিলেন বাণী
কল্যাণ কুশল। শুধাইলা সত্যকাম,
"কহো গো জননী, মোর পিতার কী নাম,
কী বংশে জনম। গিয়াছিনু দীক্ষাতরে
গৌতমের কাছে; গুরু কহিলেন মোরে,
'বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।' মাতঃ, কী গোত্র আমার।"

শুনি কথা মৃদুকণ্ঠে অবনতমুখে
কহিলা জননী, "যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি, তাত।"

পরদিন
তপোবন-তরুশিরে প্রসন্ন নবীন
জাগিল প্রভাত। যত তাপস বালক
শিশির-সুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা,
প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্রসিক্তজটা,
শুচিশোভা সৌম্যমূর্তি সমুজ্জ্বলকায়ে
বসেছে বেষ্টন করি বৃদ্ধবটচ্ছায়ে
গুরু গৌতমেরে। বিহঙ্গ-কাকলিগান,
মধুপ-গুঞ্জনগীতি, জল-কলতান,
তারি সাথে উঠিতেছে গম্ভীর মধুর
বিচিত্র তরুণ কণ্ঠে সম্মিলিত সুর—
শান্ত সামগীতি।

হেনকালে সত্যকাম
কাছে আসি ঋষিপদে করিলা প্রণাম—
মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে।
আচার্য আশিস্ করি শুধাইলা তবে,
"কী গোত্র তোমার সৌম্য, প্রিয়দরশন।"

তুলি শির কহিলা বালক, “ভগবন্‌,
নাহি জানি কী গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে; কহিলেন তিনি, ‘সত্যকাম,
বহু পরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি’।”

শুনি সে-বারতা
ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা—
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মতো—সবে বিস্ময়-বিকল,
কেহ বা হাসিল, কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্যের হেরি অহংকার।

উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি, বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন, “অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত,
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।”

৭ ফাল্গুন ১৩০১

পুরাতন ভৃত্য

ভূতের মতন চেহারা যেমন, নির্বোধ অতি ঘোর—
যা-কিছু হারায়, গিন্নি বলেন, “কেষ্টা বেটাই চোর।”
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে।
যত পায় বেত না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।
বড়ো প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ চীৎকার করি “কেষ্টা”—
যত করি তাড়া নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা।
তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে;
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা করে আনে।
যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা;
মহাকলরবে গালি দেই যবে “পাজি হতভাগা গাধা”—
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে, দেখে জ্বলে যায় পিত্ত।
তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার— বড়ো পুরাতন ভৃত্য।

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্তি বলে, “আর পারি নাকো,
রহিল তোমার এ ঘর-দুয়ার, কেষ্টারে লয়ে থাকো।
না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যত
কোথায় কী গেল, শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মতো।

গেলে সে বাজার, সারা দিনে আর দেখা পাওয়া তার ভার -
করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর!"
শুনে মহা রেগে ছুটে যাই বেগে, আনি তার টিকি ধরে;
বলি তারে, "পাজি, বেরো তুই আজই, দূর করে দিনু তোরে।"
ধীরে চলে যায়, ভাবি গেল দায়; পরদিনে উঠে দেখি,
হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি।
প্রসন্ন মুখ, নাহি কোনো দুখ, অতি অকাতর চিত্ত।
ছাড়ালে না ছাড়ে, কী করিব তারে মোর পুরাতন ভৃত্য!

সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালালগিরি।
করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি।
পরিবার তায় সাথে যেতে চায়, বুঝায়ে বলিনু তারে –
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে।
লয়ে রশারশি করি কষাকষি পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধি
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে গৃহিণী কহিল কাঁদি,
"পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে কষ্ট অনেক পাবে।"
আমি কহিলাম, "আরে রাম রাম! নিবারণ সাথে যাবে।"
রেলগাড়ি ধায়; হেরিলাম হায় নামিয়া বর্ধমানে—
কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত তামাক সাজিয়া আনে!
স্পর্ধা তাহার হেনমতে আর কত বা সহিব নিত্য।
যত তারে দুষি তবু হনু খুশি হেরি পুরাতন ভৃত্য।

নামিনু শ্রীধামে—দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পান্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।
জন ছয়-সাতে মিলি একসাথে পরম বন্ধুভাবে
করিলাম বাসা, মনে হল আশা, আরামে দিবস যাবে।
কোথা ব্রজবালা, কোথা বনমালা, কোথা বনমালী হরি!
কোথা হা হন্ত, চিরবসন্ত! আমি বসন্তে মরি।
বন্ধু যে যত স্বপ্নের মতো বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ।
আমি একা ঘরে, ব্যাধি-খরশরে ভরিল সকল অঙ্গ।
ডাকি নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ, "কেষ্ট, আয় রে কাছে।
এত দিনে শেষে আসিয়া বিদেশে প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে।"
হেরি তার মুখ ভরে ওঠে বুক, সে যেন পরম বিত্ত—
নিশিদিন ধরে দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর পুরাতন ভৃত্য।

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত;
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম, মুখে নাই তার ভাত।
বলে বারবার, "কর্তা, তোমার কোনো ভয় নাই, শুন—
যাবে দেশে ফিরে, মাঠাকুরানীরে দেখিতে পাইবে পুন।"
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম; তাহারে ধরিল জ্বরে;
নিল সে আমার কালব্যাধিভার আপনার দেহ-'পরে।

হয়ে জ্ঞানহীন কাটিল দুদিন, বন্ধ হইল নাড়ী;
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে, এতদিনে গেল ছাড়ি।
বহুদিন পরে আপনার ঘরে ফিরিনু সারিয়া তীর্থ;
আজ সাথে নেই চিরসাথী সেই মোর পুরাতন ভৃত্য।

১২ ফাল্গুন ১৩০১

দুই বিঘা জমি

শুধু বিঘে-দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবই গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, "বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।"
কহিলাম আমি, "তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো-জোর মরিবার মতো ঠাঁই।"
শুনি রাজা কহে, "বাপু, জান তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা—
ওটা দিতে হবে।" কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজলচক্ষে, "করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি!
সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!"
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে।"

পরে মাস-দেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রি, সকলি বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি!
মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্ব-নিখিল দু-বিঘার পরিবর্তে।
সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য,
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য।
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি,
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিঘা জমি।
হাটে মাঠে বাটে এইমতো কাটে বছর পনেরো-ষোলো,
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হল।

নমোনমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি—
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ—
স্তব্ধ অতল দিঘি-কালোজল, নিশীথ-শীতল স্নেহ।

বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে—
"মা" বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে,
কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে
রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।

ধিক্ ধিক্ ওরে, শতধিক্ তোরে, নিলাজ কুলটা ভূমি।
যখনি যাহার তখনি তাহার, এই কি জননী তুমি।
সে কি মনে হবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্র-মাতা,
আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফলফুল শাকপাতা।
আজ কোন্ রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছ বিলাস-বেশ,
পাঁচরঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা, পুষ্পে খচিত কেশ!
আমি তোর লাগি ফিরেছি বিবাগি গৃহহারা সুখহীন,
তুই হেথা বসি ওরে রাক্ষসী হাসিয়া কাটাস দিন।
ধনীর আদরে গরব না ধরে! এতই হয়েছ ভিন্ন
কোনোখানে লেশ নাহি অবশেষ সেদিনের কোনো চিহ্ন।
কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি, ক্ষুধাহরা সুধারাশি;
যত হাস আজ, যত কর সাজ, ছিলে দেবী, হলে দাসী।

বিদীর্ণ-হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারি দিকে চেয়ে দেখি;
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে সেই আমগাছ, এ কি!
বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালক-কালের কথা।
সেই মনে পড়ে, জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিকো ঘুম—
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম;
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন—
ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন!
সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে;
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
ভাবিলাম মনে বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা,
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।

হেনকালে হায় যমদূতপ্রায় কোথা হতে এল মালী,
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি!
কহিলাম তবে, "আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব—
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব!"
চিনিল না মোরে, নিয়ে গেল ধরে কাঁধে তুলি লাঠিগাছ;
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ-সাথে ধরিতেছিলেন মাছ।
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, "মারিয়া করিব খুন!"
বাবু যত বলে, পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ।

আমি কহিলাম, "শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয়,"
বাবু কহে হেসে, "বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।"
আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে।
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

শীতে ও বসন্তে

প্রথম শীতের মাসে
শিশির লাগিল ঘাসে,
হুহু করে হাওয়া আসে,
হিহি করে কাঁপে গাত্র।
আমি ভাবলাম মনে,
এবার মাতিব রণে,
বৃথা কাজে অকারণে
কেটে গেছে দিনরাত্র।
লাগিব দেশের হিতে
গরমে বাদলে শীতে,
কবিতা নাটকে গীতে
করিব না অনাসৃষ্টি।
লেখা হবে সারবান
অতিশয় ধারবান,
খাড়া রব দ্বারবান
দশ দিকে রাখি দৃষ্টি।
এত বলি গৃহকোণে
বসিলাম দৃঢ়মনে
লেখকের যোগাসনে,
পাশে লয়ে মসীপাত্র।
নিশিদিন রুধি দ্বার,
স্বদেশের শুধি ধার,
নাহি হাঁফ ছাড়িবার
অবসর তিলমাত্র।
রাশি রাশি লিখে লিখে
একেবারে দিকে দিকে
মাসিকে ও সাপ্তাহিকে
করিলাম লেখাবৃষ্টি।
ঘরেতে জ্বলে না চুলো,
শরীরে উড়িছে ধুলো,
আঙুলের ডগাগুলো
হয়ে গেল কালিকৃষ্টি।

খুঁটিয়া তারিখ মাস
করিলাম রাশ রাশ,
গাঁথিলাম ইতিহাস,
রচিলাম পুরাতত্ত্ব।
গালি দিয়া মহা রাগে
দেখালেম দাগে দাগে
যে যাহা বলেছে আগে
কিছু তার নহে সত্য।
পুরাণে বিজ্ঞানে গোটা
করিয়াছি সিদ্ধি-ঘোঁটা,
যাহা-কিছু ছিল মোটা
হয়ে গেছে অতি সূক্ষ্ম।
করেছি সমালোচনা
আছে তাহে গুণপনা,
কেহ তাহা বুঝিল না,
মনে রয়ে গেল দুঃখ।
মেঘদূত—লোকে যাহা
কাব্যভ্রমে বলে "আহা"—
আমি দেখায়েছি, তাহা
দর্শনের নব সূত্র।
নৈষধের কবিতাটি
ডারুয়িন-তত্ত্ব খাঁটি,
মোর আগে এ কথাটি
বলো কে বলেছে কুত্র।
কাব্য কহিবার ভানে
নীতি বলি কানে কানে
সে কথা কেহ না জানে,
না বুঝে হতেছে ইষ্ট।
নভেল লেখার ছলে
শিখায়েছি সুকৌশলে
সাদাটিরে সাদা বলে,
কালো যাহা তাই কৃষ্ট।
কত মাস এইমতো
একে একে হল গত,
আমি দেশহিতে রত
সব দ্বার করি বন্ধ।
হাসি-গীত-গল্পগুলি
ধূলিতে হইল ধূলি,
বেঁধে দিয়ে চোখে ঠুলি
কল্পনারে করি অন্ধ।
নাহি জানি চারি পাশে
কী ঘটিছে কোন্ মাসে,

কোন্ ঋতু কবে আসে,
কোন্ রাতে উঠে চন্দ্র।
আমি জানি রুশিয়ান
কত দূরে আগুয়ান,
বজেটের খতিয়ান
কোথা তার আছে রন্ধ্র।
আমি জানি কোন্ দিন
পাস হল কী আইন,
কুইনের বেহাইন
বিধবা হইল কল্য;
জানি সব আটঘাট
গেজেটে করেছি পাঠ
আমাদের ছোটোলাট
কোথা হতে কোথা চলল।
একদিন বসে বসে
লিখিয়া যেতেছি কষে
এ দেশেতে কার দোষে
ক্রমে কমে আসে শস্য;
কেনই বা অপঘাতে
মরে লোক দিবারাতে,
কেন ব্রাহ্মণের পাতে
নাহি পড়ে চর্ব্য চোষ্য।
হেন কালে দুদ্দাড়
খুলে গেল সব দ্বার,
চারি দিকে তোলপাড়
বেধে গেছে মহাকাণ্ড।
নদীজলে, বনে, গাছে
কেহ গাহে কেহ নাচে,
উলটিয়া পড়িয়াছে
দেবতার সুধাভাণ্ড।
উতলা পাগল-বেশে
দক্ষিণে বাতাস এসে
কোথা হতে হাহা হেসে
প'ল যেন মদমত্ত।
লেখাপত্র কেড়েকুড়ে—
কোথা কী যে গেল উড়ে,
ওই রে আকাশ জুড়ে
ছড়ায় 'সমাজতত্ত্ব'।
'রুশিয়ার অভিপ্রায়'
ওই কোথা উড়ে যায়,
গেল বুঝি হায় হায়
'আমিরের ষড়যন্ত্র'।

'প্রাচীন ভারত' বুঝি
আর পাইব না খুঁজি,
কোথা গিয়ে হল পুঁজি
'জাপানের রাজতন্ত্র'।
গেল গেল, ও কী কর,
আরে আরে, ধরো ধরো।
হাসে বন মরমর,
হাসে বায়ু কলহাস্যে।
উঠে হাসি নদীজলে
ছলছল কলকলে,
ভাসায়ে লইয়া চলে
'মনুর নূতন ভাষ্যে'।
বাদ প্রতিবাদ যত
শুকনো পাতার মতো
কোথা হল অপগত,
কেহ তাহে নহে ক্ষুণ্ণ।
ফুলগুলি অনায়াসে
মুচকি মুচকি হাসে,
সুগভীর পরিহাসে
হাসিতেছে নীল শূন্য।
দেখিতে দেখিতে মোর
লাগিল নেশার ঘোর
কোথা হতে মন-চোর
পশিল আমার বক্ষে।
যেমনি সমুখে চাওয়া
অমনি সে ভূতে-পাওয়া
লাগিল হাসির হাওয়া
আর বুঝি নাহি রক্ষে।
প্রথমে প্রাণের কূলে
শিহরি শিহরি দুলে,
ক্রমে সে মরম-মূলে
লহরী উঠিল চিত্তে।
তার পরে মহা হাসি
উচ্ছ্বসিল রাশি রাশি,
হৃদয় বাহিরে আসি
মাতিল জগৎ-নৃত্যে।
এসো এসো বঁধু এসো
আধেক আঁচরে বোসো,
অবাক অধরে হাসো
ভুলাও সকল তত্ত্ব।
তুমি শুধু চাহো ফিরে,
ডুবে যাক ধীরে ধীরে

সুধাসাগরের নীরে
    যত মিছা যত সত্য।
আনো গো যৌবনগীতি,
দূরে চলে যাক নীতি,
আনো পরানের প্রীতি,
    থাক্‌ প্রবীণের ভাষ্য।
এসো হে আপনাহারা,
প্রভাত সন্ধ্যার তারা,
বিষাদের আঁখিধারা,
    প্রমোদের মধুহাস্য।
আনো বাসনার ব্যথা,
অকারণ চঞ্চলতা,
আনো কানে কানে কথা,
    চোখে চোখে লাজ-দৃষ্টি।
অসম্ভব, আশাতীত,
অনাবশ্য, অনাদৃত,
এনে দাও অযাচিত
    যত কিছু অনাসৃষ্টি।
হৃদয়-নিকুঞ্জমাঝ
এসো আজি ঋতুরাজ,
ভেঙে দাও সব কাজ
    প্রেমের মোহন মন্ত্রে।
হিতাহিত হোক দূর,
গাব গীত সুমধুর,
ধরো তুমি ধরো সুর
    সুধাময়ী বীণাযন্ত্রে।

৮ আষাঢ় ১৩০২

নগর-সংগীত

কোথা গেল সেই মহান শান্ত
নব নির্মল শ্যামলকান্ত
উজ্জ্বলনীল বসনপ্রান্ত
    সুন্দর শুভ ধরণী।
আকাশ আলোক-পুলকপুঞ্জ,
ছায়াসুশীতল নিভৃত কুঞ্জ,
কোথা সে গভীর ভ্রমরগুঞ্জ,
    কোথা নিয়ে এল তরণী।

ওই রে নগরী—জনতারণ্য,
শত রাজপথ, গৃহ অগণ্য,
কতই বিপণি, কতই পণ্য
কত কোলাহল-কাকলি।
কত-না অর্থ, কত অনর্থ
আবিল করিছে স্বর্গমর্ত্য,
তপনতপ্ত ধূলি-আবর্ত
উঠিছে শূন্য আকুলি।
সকলি ক্ষণিক, খণ্ড, ছিন্ন,
পশ্চাতে কিছু রাখে না চিহ্ন,
পলকে মিলিছে, পলকে ভিন্ন,
ছুটিছে মৃত্যু-পাথারে।
করুণ রোদন, কঠিন হাস্য,
প্রভূত দম্ভ, বিনীত দাস্য,
ব্যাকুল প্রয়াস, নিঠুর ভাষ্য,
চলিছে কাতারে কাতারে।
স্থির নহে কিছু নিমেষমাত্র,
চাহে নাকো কিছু প্রবাসযাত্র
বিরামবিহীন দিবসরাত্র
চলিছে আঁধারে আলোকে।
কোন্ মায়ামৃগ কোথায় নিত্য
স্বর্ণ-ঝলকে করিছে নৃত্য,
তাহারে বাঁধিতে লোলুপচিত্ত
ছুটিছে বৃদ্ধ-বালকে।
এ যেন বিপুল যজ্ঞকুণ্ড,
আকাশে আলোড়ি শিখার শুণ্ড
হোমের অগ্নি মেলিছে তুণ্ড
ক্ষুধার দহন জ্বালিয়া।
নরনারী সবে আনিয়া তূর্ণ,
প্রাণের পাত্র করিয়া চূর্ণ
বহ্নির মুখে দিতেছে পূর্ণ
জীবন-আহুতি ঢালিয়া।
চারি দিকে ঘিরি যতেক ভক্ত
স্বর্ণবরন-মরণাসক্ত,
দিতেছে অস্থি, দিতেছে রক্ত,
সকল শক্তিসাধনা।
জ্বলি উঠে শিখা ভীষণ মন্দ্রে,
ধূমায়ে শূন্য রন্ধ্রে রন্ধ্রে,
লুপ্ত করিছে সূর্যচন্দ্রে
বিশ্বব্যাপিনী দাহনা।
বায়ুদলবল হইয়া ক্ষিপ্ত
ঘিরি ঘিরি সেই অনল দীপ্ত

কাঁদিয়া ফিরিছে অপরিতৃপ্ত,
    ফুঁসিয়া উষ্ণ শ্বসনে।
যেন প্রসারিয়া কাতর পক্ষ
কেঁদে উড়ে আসে লক্ষ লক্ষ
পক্ষীজননী, করিয়া লক্ষ্য
    খাণ্ডব-হুত-অশনে।
বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র,
মিলিয়া সকলে মহৎ ক্ষুদ্র
খুলেছে জীবনযজ্ঞ রুদ্র
    আবালবৃদ্ধরমণী।
হেরি এ বিপুল দহন-রঙ্গ
আকুল হৃদয় যেন পতঙ্গ,
ঢালিবারে চাহে আপন অঙ্গ
    কাটিবারে চাহে ধমনী।
হে নগরী, তব ফেনিল মদ্য
উছসি উছলি পড়িছে সদ্য,
আমি তাহা পান করিব অদ্য,
    বিস্মৃত হব আপনা।
অয়ি মানবের পাষাণী-ধাত্রী,
আমি হব তব মেলার যাত্রী,
সুপ্তিবিহীন মত্ত রাত্রি
    জাগরণে করি যাপনা।
ঘূর্ণচক্র জনতা-সংঘ,
বন্ধনহীন মহা-আসঙ্গ,
তারি মাঝে আমি করিব ভঙ্গ
    আপন গোপন স্বপনে।
ক্ষুদ্র শান্তি করিব তুচ্ছ,
পড়িব নিম্নে, চড়িব উচ্চ,
ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ,
    বাহু বাড়াইব তপনে।
নব নব খেলা খেলে অদৃষ্ট,
কখনো ইষ্ট, কভু অনিষ্ট,
কখনো তিক্ত, কখনো মিষ্ট,
    যখন যা দেয় তুলিয়া—
সুখের দুখের চক্রমধ্যে
কখনো উঠিব উধাও পদ্যে,
কখনো লুটিব গভীর গদ্যে,
    নাগরদোলায় দুলিয়া।
হাতে তুলি লব বিজয়বাদ্য
আমি অশান্ত, আমি অবাধ্য,
যাহা-কিছু আছে অতি অসাধ্য
    তাহারে ধরিব সবলে।

আমি নির্মম, আমি নৃশংস,
সবেতে বসাব নিজের অংশ,
পরমুখ হতে করিয়া ভ্রংশ
তুলিব আপন কবলে।
মনেতে জানিব সকল পৃথ্বী
আমারি চরণ-আসন-ভিত্তি,
রাজার রাজ্য, দস্যুবৃত্তি,
কোনো ভেদ নাহি উভয়ে।
ধনসম্পদ করিব নস্য,
লুণ্ঠন করি আনিব শস্য,
অশ্বমেধের মুক্ত অশ্ব
ছুটাব বিশ্বে অভয়ে।
নব নব ক্ষুধা, নূতন তৃষ্ণা,
নিত্যনূতন কর্মনিষ্ঠা,
জীবনগ্রন্থে নূতন পৃষ্ঠা
উলটিয়া যাব ত্বরিতে।
জটিল কুটিল চলেছে পন্থ,
নাহি তার আদি, নাহিকো অন্ত,
উদ্দামবেগে ধাই তুরন্ত
সিন্ধু শৈল সরিতে।
শুধু সম্মুখ চলেছি লক্ষি
আমি নীড়হারা নিশার পক্ষী,
তুমিও ছুটিছ চপলা লক্ষ্মী
আলেয়াহাস্যে ধাঁধিয়া।
পূজা দিয়া পদে করি না ভিক্ষা,
বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা,
কে কারে জিনিবে হবে পরীক্ষা,
আনিব তোমারে বাঁধিয়া।
মানবজন্ম নহে তো নিত্য
ধনজনমান খ্যাতি ও বিত্ত
নহে তারা কারো অধীন ভৃত্য,
কাল-নদী ধায় অধীরা।
তবে দাও ঢালি— কেবলমাত্র
দু-চারি দিবস, দু-চারি রাত্র,
পূর্ণ করিয়া জীবনপাত্র
জন-সংঘাতমদিরা।

পূর্ণিমা

পড়িতেছিলাম গ্রন্থ বসিয়া একেলা,
সঙ্গীহীন প্রবাসের শূন্য সন্ধ্যাবেলা

করিবারে পরিপূর্ণ। পণ্ডিতের লেখা
সমালোচনার তত্ত্ব; পড়ে হয় শেখা
সৌন্দর্য কাহারে বলে— আছে কী কী বীজ
কবিত্বকলায়; শেলি, গেটে, কোল্‌রীজ
কার কোন্ শ্রেণী। পড়ি পড়ি বহুক্ষণ
তাপিয়া উঠিল শির, শ্রান্ত হল মন,
মনে হল সব মিথ্যা, কবিত্ব কল্পনা
সৌন্দর্য সুরুচি রস সকলি জল্পনা
লিপি-বণিকের— অন্ধ গ্রন্থকীটগণ
বহু বর্ষ ধরি শুধু করিছে রচন
শব্দমরীচিকাজাল, আকাশের 'পরে
অকর্ম আলস্যাবেশে দুলিবার তরে
দীর্ঘ রাত্রিদিন।
অবশেষে শ্রান্তি মানি
তন্দ্রাতুর চোখে, বন্ধ করি গ্রন্থখানি
ঘড়িতে দেখিনু চাহি দ্বিপ্রহর রাতি,
চমকি আসন ছাড়ি নিবাইনু বাতি।
যেমনি নিবিল আলো, উচ্ছ্বসিত স্রোতে
মুক্ত দ্বারে, বাতায়নে, চতুর্দিক হতে
চকিতে পড়িল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আসি
ত্রিভুবনবিপ্লাবিনী মৌন সুধাহাসি।
হে সুন্দরী, হে প্রেয়সী, হে পূর্ণ পূর্ণিমা,
অনন্তের অন্তরশায়িনী। নাহি সীমা
তব রহস্যের। এ কী মিষ্ট পরিহাসে
সংশয়ীর শুষ্ক চিত্ত সৌন্দর্য-উচ্ছ্বাসে
মুহূর্তে ডুবালে। কখন দুয়ারে এসে
মুখখানি বাড়ায়ে, অভিসারিকার বেশে
আছিলে দাঁড়ায়ে, এক প্রান্তে, সুররানী,
সুদূর নক্ষত্র হতে সাথে করে আনি
বিশ্বভরা নীরবতা। আমি গৃহকোণে
তর্কজালবিজড়িত ঘন বাক্যবনে
শুষ্কপত্রপরিকীর্ণ অক্ষরের পথে
একাকী ভ্রমিতেছিনু শূন্য মনোরথে
তোমারি সন্ধানে। উদ্‌ভ্রান্ত এ ভকতেরে
এতক্ষণ ঘুরাইলে ছলনার ফেরে।
কী জানি কেমন করে লুকায়ে দাঁড়ালে
একটি ক্ষণিক ক্ষুদ্র দীপের আড়ালে
হে বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী। মুগ্ধ কর্ণপুটে
গ্রন্থ হতে গুটিকত বৃথা বাক্য উঠে
আচ্ছন্ন করিয়াছিল, কেমনে না জানি
লোকলোকান্তরপূর্ণ তব মৌন বাণী।

।। ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩০২

আবেদন

ভৃত্য। জয় হোক মহারানী। রাজরাজেশ্বরী,
দীন ভৃত্যে করো দয়া।
রানী। সভা ভঙ্গ করি
সকলেই গেল চলি যথাযোগ্য কাজে
আমার সেবকবৃন্দ বিশ্বরাজ্য-মাঝে,
মোর আজ্ঞা মোর মান লয়ে শীর্ষদেশে
জয়শঙ্খ সগর্বে বাজায়ে। সভাশেষে
তুমি এলে নিশান্তের শশাঙ্ক-সমান
ভক্ত ভৃত্য মোর। কী প্রার্থনা?
ভৃত্য। মোর স্থান
সর্বশেষে, আমি তব সর্বাধম দাস
মহোত্তমে। একে একে পরিতৃপ্ত-আশ
সবাই আনন্দে যবে ঘরে ফিরে যায়
সেইক্ষণে আমি আসি নির্জন সভায়,
একাকী আসীনা তব চরণতলের
প্রান্তে বসে ভিক্ষা মাগি শুধু সকলের
সর্ব-অবশেষটুকু।
রানী। অবোধ ভিক্ষুক,
অসময়ে কী তোরে মিলিবে।
ভৃত্য। হাসিমুখ
দেখে চলে যাব। আছে দেবী, আরো আছে-
নানা কর্ম নানা পদ নিল তোর কাছে
নানা জনে; এক কর্ম কেহ চাহে নাই,
ভৃত্য-'পরে দয়া করে দেহো মোরে তাই—
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।
রানী। মালাকর?
ভৃত্য। ক্ষুদ্র মালাকর। অবসর
লব সব কাজে। যুদ্ধ-অস্ত্র ধনুঃশর
ফেলিনু ভূতলে, এ উষ্ণীষ রাজসাজ
রাখিনু চরণে তব—যত উচ্চকাজ
সব ফিরে লও দেবী। তব দূত করি
মোরে আর পাঠায়ো না, তব স্বর্ণতরী
দেশে দেশান্তরে লয়ে। জয়ধ্বজা তব
দিগ্‌দিগন্তে করিয়া প্রচার, নব নব
দিগ্বিজয়ে পাঠায়ো না মোরে। পরপারে
তব রাজ্য কর্মযশ ধনজনভারে
অসীমবিস্তৃত—কত নগর-নগরী,
কত লোকালয়, বন্দরেতে কত তরী,
বিপণিতে কত পণ্য—ওই দেখো দূরে
মন্দিরশিখরে আর কত হর্ম্যচূড়ে

দিগন্তেরে করিছে দংশন, কলোচ্ছ্বাস
শ্বসিয়া উঠিছে শূন্যে করিবারে গ্রাস
নক্ষত্রের নিত্য নীরবতা। বহু ভৃত্য
আছে হোথা, বহু সৈন্য তব, জাগে নিত্য
কতই প্রহরী। এ পারে নির্জন তীরে
একাকী উঠেছে ঊর্ধ্বে উচ্চ গিরিশিরে
রঞ্জিত মেঘের মাঝে তুষারধবল
তোমার প্রাসাদ-সৌধ, অনিন্দ্যনির্মল
চন্দ্রকান্তমণিময়। বিজনে বিরলে
হেথা তব দক্ষিণের বাতায়নতলে
মঞ্জরিত ইন্দুমল্লী বল্লরীবিতানে,
ঘনচ্ছায়ে, নিভৃত কপোত-কলগানে
একান্তে কাটিবে বেলা; স্ফটিকপ্রাঙ্গণে
জলযন্ত্রে উৎসধারা কল্লোল-ক্রন্দনে
উচ্ছ্বসিবে দীর্ঘদিন ছল ছল ছল—
মধ্যাহ্নেরে করি দিবে বেদনাবিহ্বল
করুণা-কাতর। অদূরে অলিন্দ-'পরে
পুঞ্জ পুচ্ছ বিস্ফারিয়া স্ফীত গর্বভরে
নাচিবে ভবনশিখী, রাজহংসদল
চরিবে শৈবালবনে করি কোলাহল
বাঁকায়ে ধবল গ্রীবা, পাটলা হরিণী
ফিরিবে শ্যামল ছায়ে। অয়ি একাকিনী,
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

রানী। ওরে তুই কর্মভীরু অলস কিংকর,
কী কাজে লাগিবি।

ভৃত্য। অকাজের কাজ যত,
আলস্যের সহস্র সঞ্চয়। শত শত
আনন্দের আয়োজন। যে অরণ্যপথে
কর তুমি সঞ্চরণ বসন্তে শরতে
প্রত্যূষে অরুণোদয়ে, শ্লথ অঙ্গ হতে
তপ্ত নিদ্রালসখানি স্নিগ্ধ বায়ুস্রোতে
করি দিয়া বিসর্জন, সে বনবীথিকা
রাখিব নবীন করি। পুষ্পাক্ষরে লিখা
তব চরণের স্তুতি প্রত্যহ উষায়
বিকশি উঠিবে তব পরশ-তৃষায়
পুলকিত তৃণপুঞ্জতলে। সন্ধ্যাকালে
যে মঞ্জু মালিকাখানি জড়াইবে ভালে
কবরী বেষ্টন করি, আমি নিজ করে
রচি সে বিচিত্র মালা সান্ধ্য যূথীস্তরে,
সাজায়ে সুবর্ণ পাত্রে তোমার সম্মুখে
নিঃশব্দে ধরিব আসি অবনত মুখে—
যেথায় নিভৃত কক্ষে, ঘন কেশপাশ,

তিমির নির্ঝর-সম উন্মত্ত-উচ্ছ্বাস
তরঙ্গ-কুটিল, এলাইয়া পৃষ্ঠ-'পরে,
কনক মুকুর অঙ্কে, শুভ্র পদ্মকরে
বিনাইবে বেণী। কুমুদসরসীকূলে
বসিবে যখন, সপ্তপর্ণ-তরুমূলে
মালতী-দোলায়— পত্রচ্ছেদ-অবকাশে
পড়িবে ললাটে চক্ষে বক্ষে বেশবাসে
কৌতূহলী চন্দ্রমার সহস্র চুম্বন,
আনন্দিত তনুখানি করিয়া বেষ্টন
উঠিবে বনের গন্ধ বাসনা-বিভোল
নিশ্বাসের প্রায়, মৃদু ছন্দে দিব দোল
মৃদুমন্দ সমীরের মতো। অনিমেষে
যে প্রদীপ জ্বলে তব শয্যাশিরোদেশে
সারা সুপ্তনিশি, সুরনরস্বপ্নাতীত
নিদ্রিত শ্রীঅঙ্গপানে স্থির অকম্পিত
নিদ্রাহীন আঁখি মেলি— সে প্রদীপখানি
আমি জ্বালাইয়া দিব গন্ধতৈল আনি।
শেফালির বৃন্ত দিয়া রাঙাইব, রানী,
বসন বাসন্তী রঙে। পাদপীঠখানি
নব ভাবে নব রূপে শুভ আলিম্পনে
প্রত্যহ রাখিব অঙ্কি কুঙ্কুমে চন্দনে
কল্পনার লেখা। নিকুঞ্জের অনুচর,
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

রানী। কী লইবে পুরস্কার।

ভৃত্য। প্রত্যহ প্রভাতে
ফুলের কঙ্কণ গড়ি কমলের পাতে
আনিব যখন, পদ্মের কলিকা-সম
ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি করে ধরি মম
আপনি পরায়ে দিব, এই পুরস্কার।
অশোকের কিশলয়ে গাঁথি দিব হার
প্রতি সন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্তে
চিত্রি পদতল চরণ-অঙ্গুলিপ্রান্তে
লেশমাত্র রেণু চুম্বিয়া মুছিয়া লব,
এই পুরস্কার।

রানী। ভৃত্য, আবেদন তব
করিনু গ্রহণ। আছে মোর বহু মন্ত্রী
বহু সৈন্য বহু সেনাপতি— বহু যন্ত্রী
কর্মযন্ত্রে রত— তুই থাক্ চিরদিন
স্বেচ্ছাবন্দী দাস, খ্যাতিহীন কর্মহীন।
রাজসভা-বহিঃপ্রান্তে রবে তোর ঘর—
তুই মোর মালঞ্চের হবি মালাকর।

২২ অগ্রহায়ণ ১৩০২

উর্বশী

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি,
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।
উষার উদয়-সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা।

বৃন্তহীন পুষ্প-সম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী।
আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে,
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিল পদপ্রান্তে, উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা,
তুমি অনিন্দিতা।

কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকা-বয়সী
হে অনন্তযৌবনা উর্বশী।
আঁধার পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মানিক মুকুতা লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা,
মণিদীপ-দীপ্ত কক্ষে সমুদ্রের কল্লোলসংগীতে
অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল-পালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে।
যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে গঠিতা
পূর্ণপ্রস্ফুটিতা।

যুগ-যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব শোভনা উর্বশী।
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারি ভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গ-সম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধচিতে,
উদ্দাম সংগীতে।
নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা।

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি
হে বিলোল-হিল্লোল উর্বশী।
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু-মাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে।

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্বশী।
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা,
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার—
অখিল মানসস্বর্গে অনন্তরঙ্গিণী,
হে স্বপ্নসঙ্গিনী।

ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্বশী।
আদিযুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর,
অতল অকূল হতে সিক্তকেশে উঠিবে আবার?
প্রথম সে তনুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে,
সর্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের নয়ন-আঘাতে
বারিবিন্দুপাতে।
অকস্মাৎ মহাম্বুধি অপূর্ব সংগীতে
রবে তরঙ্গিতে।

ফিরিবে না, ফিরিবে না—অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী।
তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে,
পূর্ণিমানিশীথে যবে দশ দিকে পরিপূর্ণ হাসি,
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি,
ঝরে অশ্রুরাশি।
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে
অয়ি অবন্ধনে।

২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২

স্বর্গ হইতে বিদায়

ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দারমালিকা,
হে মহেন্দ্র, নির্বাপিত জ্যোতির্ময় টিকা
মলিন ললাটে। পুণ্যবল হল ক্ষীণ,
আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন
হে দেব, হে দেবীগণ। বর্ষ লক্ষশত
যাপন করেছি হর্ষে দেবতার মতো
দেবলোকে। আজি শেষ বিচ্ছেদের ক্ষণে
লেশমাত্র অশ্রুরেখা স্বর্গের নয়নে
দেখে যাব এই আশা ছিল। শোকহীন
হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি, উদাসীন
চেয়ে আছে। লক্ষ লক্ষ বর্ষ তার
চক্ষের পলক নহে; অশ্বত্থশাখার
প্রান্ত হতে খসি গেলে জীর্ণতম পাতা
যতটুকু বাজে তার, ততটুকু ব্যথা
স্বর্গে নাহি লাগে, যবে মোরা শত শত
গৃহচ্যুত হতজ্যোতি নক্ষত্রের মতো
মুহূর্তে খসিয়া পড়ি দেবলোক হতে
ধরিত্রীর অন্তহীন জন্মমৃত্যুস্রোতে।
সে বেদনা বাজিত যদ্যপি, বিরহের
ছায়ারেখা দিত দেখা, তবে স্বরগের
চিরজ্যোতি ম্লান হত মর্ত্যের মতন
কোমল শিশিরবাষ্পে—নন্দনকানন
মর্মরিয়া উঠিত নিশ্বসি, মন্দাকিনী
কূলে কূলে গেয়ে যেত করুণ কাহিনী
কলকণ্ঠে, সন্ধ্যা আসি দিবা-অবসানে
নির্জন প্রান্তর-পারে দিগন্তের পানে
চলে যেত উদাসিনী, নিস্তব্ধ নিশীথ
ঝিল্লিমন্ত্রে শুনাইত বৈরাগ্য-সংগীত
নক্ষত্রসভায়। মাঝে মাঝে সুরপুরে
নৃত্যপরা মেনকার কনকনূপুরে
তালভঙ্গ হত। হেলি উর্বশীর স্তনে
স্বর্ণবীণা থেকে থেকে যেন অন্য মনে
অকস্মাৎ ঝংকারিত কঠিন পীড়নে
নিদারুণ করুণ মূর্ছনা। দিত দেখা
দেবতার অশ্রুহীন চোখে জলরেখা
নিষ্কারণে। পতিপাশে বসি একাসনে
সহসা চাহিত শচী ইন্দ্রের নয়নে
যেন খুঁজি পিপাসার বারি। ধরা হতে
মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসি আসিত বায়ুস্রোতে

ধরণীর সুদীর্ঘ নিশ্বাস— খসি ঝরি
পড়িত নন্দনবনে কুসুম-মঞ্জরী।

থাকো স্বর্গ হাস্যমুখে, করো সুধাপান
দেবগণ। স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান—
মোরা পরবাসী। মর্তভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি— তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দুদিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দুদণ্ডের তরে।
যত ক্ষুদ্র, যত ক্ষীণ, যত অভাজন,
যত পাপীতাপী, মেলি ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমল বক্ষে বাঁধিবারে চায়—
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্তে থাক্‌ সুখে দুঃখে অনন্তমিশ্রিত
প্রেমধারা— অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।

হে অপ্সরী,

তোমার নয়নজ্যোতি প্রেমবেদনায়
কভু না হউক ম্লান— লইনু বিদায়।
তুমি কারে কর না প্রার্থনা, কারো তরে
নাহি শোক। ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোনো-এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে
অশ্বত্থছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হলে
জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্যগণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নত নয়নে
চন্দনচর্চিত ভালে রক্তপট্টাম্বরে,
উৎসবের বাঁশরি-সংগীতে। তার পরে
সুদিনে দুর্দিনে, কল্যাণকঙ্কণ করে,
সীমন্তসীমায় মঙ্গলসিন্দুরবিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র-শিয়রে। দেবগণ,
মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ

দুঃস্বপ্ন-সম, যবে কোনো অর্ধরাতে
সহসা হেরিব জাগি নির্মল শয্যাতে
পড়েছে চন্দ্রের আলো, নিদ্রিতা প্রেয়সী,
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি
গ্রন্থি শরমের— মৃদু সোহাগচুম্বনে
সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর— দক্ষিণ অনিল
আনিবে ফুলের গন্ধ, জাগ্রত কোকিল
গাহিবে সুদূর শাখে।
অয়ি দীনহীনা,
অশ্রু-আঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা,
অয়ি মর্ত্যভূমি। আজি বহুদিন পরে
কাঁদিয়া উঠেছে মোর চিত্ত তোর তরে।
যেমনি বিদায়-দুঃখে শুষ্ক দুই চোখ
অশ্রুতে পুরিল, অমনি এ স্বর্গলোক
অলস কল্পনাপ্রায় কোথায় মিলাল
ছায়াচ্ছবি। তব নীলাকাশ, তব আলো,
তব জনপূর্ণ লোকালয়, সিন্ধুতীরে
সুদীর্ঘ বালুকাতট, নীল গিরিশিরে
শুভ্র হিমরেখা, তরুশ্রেণীর মাঝারে
নিঃশব্দ অরুণোদয়, শূন্য নদীপারে
অবনতমুখী সন্ধ্যা— বিন্দু-অশ্রুজলে
যত প্রতিবিম্ব যেন দর্পণের তলে
পড়েছে আসিয়া।
হে জননী পুত্রহারা,
শেষ বিচ্ছেদের দিনে যে শোকাশ্রুধারা
চক্ষু হতে ঝরি পড়ি তব মাতৃস্তন
করেছিল অভিষিক্ত, আজি এতক্ষণ
সে অশ্রু শুকায়ে গেছে। তবু জানি মনে
যখনি ফিরিব পুন তব নিকেতনে
তখনি দুখানি বাহু ধরিবে আমায়,
বাজিবে মঙ্গলশঙ্খ, স্নেহের ছায়ায়
দুঃখে সুখে ভয়ে ভরা প্রেমের সংসারে
তব গেহে, তব পুত্রকন্যার মাঝারে,
আমারে লইবে চিরপরিচিত-সম—
তার পরদিন হতে শিয়রেতে মম
সারাক্ষণ জাগি রবে কম্পমান প্রাণে,
শঙ্কিত অন্তরে, ঊর্ধ্বে দেবতার পানে
মেলিয়া করুণ দৃষ্টি, চিন্তিত সদাই
যাহারে পেয়েছি তারে কখন হারাই।

২৪ অগ্রহায়ণ ১৩০২

দিনশেষে

দিন শেষ হয়ে এল, আঁধারিল ধরণী,
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
'হাঁ গো এ কাদের দেশে
বিদেশী নামিনু এসে,'
তাহারে শুধানু হেসে যেমনি—
অমনি কথা না বলি
ভরা ঘট ছলছলি
নতমুখে গেল চলি তরুণী।
এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী।

নামিছে নীরব ছায়া ঘনবন-শয়নে,
এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে।
স্থির জলে নাহি সাড়া,
পাতাগুলি গতিহারা,
পাখি যত ঘুমে সারা কাননে—
শুধু এ সোনার সাঁঝে
বিজনে পথের মাঝে
কলস কাঁদিয়া বাজে কাঁকনে।
এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে।

ঝলিছে মেঘের আলো কনকের ত্রিশূলে,
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।
শ্বেত পাথরেতে গড়া
পথখানি ছায়া-করা
ছেয়ে গেছে ঝরে-পড়া বকুলে।
সারি সারি নিকেতন,
বেড়া-দেওয়া উপবন,
দেখে পথিকের মন আকুলে।
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।

রাজার প্রাসাদ হতে অতি দূর বাতাসে
ভাসিছে পূরবীগীতি আকাশে।
ধরণী সমুখ-পানে
চলে গেছে কোন্‌খানে,
পরান কেন কে জানে উদাসে।
ভালো নাহি লাগে আর
আসা-যাওয়া বারবার
বহুদূর দূরাশার প্রবাসে।
পূরবীরাগিণী বাজে আকাশে।

কাননে প্রাসাদচূড়ে নেমে আসে রজনী,
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
যদি কোথা খুঁজে পাই
মাথা রাখিবার ঠাঁই,
বেচাকেনা ফেলে যাই এখনি—
যেখানে পথের বাঁকে
গেল চলি নত আঁখে
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে তরুণী।
এই ঘাটে বাঁধো মোর তরণী।

২৮ অগ্রহায়ণ ১৩০২

সান্ত্বনা

কোথা হতে দুই চক্ষে ভরে নিয়ে এলে জল
হে প্রিয় আমার।
হে ব্যথিত, হে অশান্ত, বলো আজি গাব গান
কোন্ সান্ত্বনার।
হেথায় প্রান্তর-পারে
নগরীর এক ধারে
সায়াহ্নের অন্ধকারে
জ্বালি দীপখানি
শূন্য গৃহে অন্য মনে
একাকিনী বাতায়নে
বসে আছি পুষ্পাসনে
বাসরের রানী—
কোথা বক্ষে বিঁধি কাঁটা ফিরিলে আপন নীড়ে
হে আমার পাখি।
ওরে ক্লিষ্ট, ওরে ক্লান্ত, কোথা তোর বাজে ব্যথা,
কোথা তোরে রাখি।

চারি দিকে তমস্বিনী রজনী দিয়েছে টানি
মায়ামন্ত্র-ঘের—
দুয়ার রেখেছি রুধি, চেয়ে দেখো কিছু হেথা
নাহি বাহিরের।
এ যে দুজনের দেশ,
নিখিলের সব শেষ,
মিলনের রসাবেশ
অনন্ত ভবন,

শুধু এই এক ঘরে
দুখানি হৃদয় ধরে,
দুজনে সৃজন করে
নূতন ভুবন।
একটি প্রদীপ শুধু এ আঁধারে যতটুকু
আলো করে রাখে
সেই আমাদের বিশ্ব, তাহার বাহিরে আর
চিনি না কাহাকে।

একখানি বীণা আছে, কভু বাজে মোর বুকে
কভু তব কোরে।
একটি রেখেছি মালা, তোমারে পরায়ে দিলে
তুমি দিবে মোরে।
এক শয্যা রাজধানী,
আধেক আঁচলখানি
বক্ষ হতে লয়ে টানি
পাতিব শয়ন।
একটি চুম্বন গড়ি
দোঁহে লব ভাগ করি—
এ রাজত্বে, মরি মরি,
এত আয়োজন।
একটি গোলাপফুল রেখেছি বক্ষের মাঝে,
তব ঘ্রাণশেষে
আমারে ফিরায়ে দিলে অধরে পরশি তাহা
পরি লব কেশে।

আজ করেছিনু মনে তোমারে করিব রাজা
এই রাজ্যপাটে,
এ অমর বরমাল্য আপনি যতনে তব
জড়াব ললাটে।
মঙ্গলপ্রদীপ ধ'রে
লইব বরণ করে,
পুষ্প-সিংহাসন-'পরে
বসাব তোমায়—
তাই গাঁথিয়াছি হার,
আনিয়াছি ফুলভার,
দিয়েছি নূতন তার
কনক-বীণায়।
আকাশে নক্ষত্রসভা নীরবে বসিয়া আছে
শান্ত কৌতূহলে—
আজি কি এ মালাখানি সিক্ত হবে, হে রাজন্,
নয়নের জলে।

রুদ্ধকণ্ঠ, গীতহারা! কহিয়ো না কোনো কথা,
কিছু শুধাব না।
নীরবে লইব প্রাণে তোমার হৃদয় হতে
নীরব বেদনা।
প্রদীপ নিবায়ে দিব,
বক্ষে মাথা তুলি নিব,
স্নিগ্ধ করে পরশিব
সজল কপোল—
বেণীমুক্ত কেশজাল
স্পর্শিবে তাপিত ভাল,
কোমল বক্ষের তাল
মৃদুমন্দ দোল।
নিশ্বাস-বীজনে মোর কাঁপিবে কুন্তল তব,
মুদিবে নয়ন—
অর্ধরাতে শান্তবায়ে নিদ্রিত ললাটে দিব
একটি চুম্বন।

২৯ অগ্রহায়ণ ১৩০২

শেষ উপহার

যাহা-কিছু ছিল সব দিনু শেষ করে
ডালাখানি ভরে—
কাল কী আনিয়া দিব যুগল চরণে
তাই ভাবি মনে।
বসন্তে সকল ফুল নিঃশেষে ফুটায়ে দিয়ে
তরু তার পরে
এক দিনে দীনহীন, শূন্যে দেবতার পানে
চাহে রিক্ত করে।

আজি দিন শেষ হলে যদি মোর গান
হয় অবসান,
কাল প্রাতে এ গানের স্মৃতিসুখলেশ
রবে না কি শেষ।
শূন্য থালে মৌনকণ্ঠে নতমুখে আসি যদি
তোমার সম্মুখে,
তখন কি অগৌরবে চাহিবে না একবার
ভকতের মুখে।

দিই নি কি প্রাণপূর্ণ হৃদিপদ্মখানি
পাদপদ্মে আনি?

দিই নি কি কোনো ফুল অমর করিয়া
অশ্রুতে ভরিয়া?
এত গান গাহিয়াছি, তার মাঝে নাহি কি গো
হেন কোনো গান
আমি চলে গেলে তবু বহিবে যে চিরদিন
অনন্ত পরান।

সেই কথা মনে করে দিবে না কি, নব
বরমাল্য তব,
ফেলিবে না আঁখি হতে এক বিন্দু জল
করুণা-কোমল,
আমার বসন্তশেষে রিক্তপুষ্প দীনবেশে
নীরবে যেদিন
ছলছল আঁখিজলে দাঁড়াইব সভাতলে
উপহারহীন।

১ পৌষ ১৩০২

বিজয়িনী

অচ্ছোদসরসীনীরে রমণী যেদিন
নামিলা স্নানের তরে, বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মতো কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি শিহরি। সমীরণ
প্রলাপ বকিতেছিল প্রচ্ছায়সঘন
পল্লবশয়নতলে, মধ্যাহ্নের জ্যোতি
মূর্ছিত বনের কোলে, কপোত-দম্পতি
বসি শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘন চঞ্চু-চুম্বনের অবসরকালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন।

তীরে শ্বেত শিলাতলে সুনীল বসন
লুটাইছে একপ্রান্তে স্খলিতগৌরব
অনাদৃত—শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ
এখনো জড়িত তাহে—আয়ুপরিশেষ
মূর্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ—
লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে। নূপুর রয়েছে পড়ি,
বক্ষের নিচোল-বাস যায় গড়াগড়ি
ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।

কনকদর্পণখানি চাহে শূন্য-পানে
কার মুখ স্মরি। স্বর্ণপাত্রে সুসজ্জিত
চন্দনকুঙ্কুমপঙ্ক, লুণ্ঠিত লজ্জিত
দুটি রক্ত শতদল, অম্লান সুন্দর
শ্বেতকরবীর মালা— ধৌত শুভ্রাম্বর
লঘু স্বচ্ছ, পূর্ণিমার আকাশের মতো।
পরিপূর্ণ নীল নীর স্থির অনাহত—
কূলে কূলে প্রসারিত বিহ্বল গভীর
বুক-ভরা আলিঙ্গনরাশি। সরসীর
প্রান্তদেশে, বকুলের ঘনচ্ছায়াতলে
শ্বেত শিলাপটে, আবক্ষ ডুবায়ে জলে
বসিয়া সুন্দরী, কম্পমান ছায়াখানি
প্রসারিয়া স্বচ্ছ নীরে— বক্ষে লয়ে টানি
সযত্নপালিত শুভ্র রাজহংসীটিরে
করিছে সোহাগ— নগ্ন বাহুপাশে ঘিরে
সুকোমল ডানা দুটি, লম্ব গ্রীবা তার
রাখি স্কন্ধ-'পরে, কহিতেছে বারংবার
স্নেহের প্রলাপবাণী— কোমল কপোল
বুলাইছে হংসপৃষ্ঠে পরশ-বিভোল।

চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিণী
জলে স্থলে নভস্তলে; সুন্দর কাহিনী
কে যেন রচিতেছিল ছায়া-রৌদ্রকরে
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্মরে,
বসন্তদিনের কত স্পন্দনে কম্পনে
নিশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাষে আভাসে গুঞ্জনে
চমকে ঝলকে। যেন আকাশ-বীণার
রবিরশ্মি-তন্ত্রীগুলি সুরবালিকার
চম্পক-অঙ্গুলি-ঘাতে সংগীত-ঝংকারে
কাঁদিয়া উঠিতেছিল— মৌন স্তব্ধতারে
বেদনায় পীড়িয়া মূর্ছিয়া। তরুতলে
স্খলিয়া পড়িতেছিল নিঃশব্দে বিরলে
বিবশ বকুলগুলি; কোকিল কেবলি
অশ্রান্ত গাহিতেছিল— বিফল কাকলি
কাঁদিয়া ফিরিতেছিল বনান্তর ঘুরে
উদাসিনী প্রতিধ্বনি; ছায়ায় অদূরে
সরোবরপ্রান্তদেশে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী
কলনৃত্যে বাজাইয়া মাণিক্য-কিঙ্কিণী
কল্লোলে মিশিতেছিল; তৃণাঞ্চিত তীরে
জলকলকলস্বরে মধ্যাহ্নসমীরে
সারস ঘুমায়ে ছিল দীর্ঘ গ্রীবাখানি
ভঙ্গিভরে বাঁকাইয়া পৃষ্ঠে লয়ে টানি

ধূসর ডানার মাঝে; রাজহংসদল
আকাশে বলাকা বাঁধি সত্বর-চঞ্চল
ত্যজি কোন্ দূর নদীসৈকত-বিহার
উড়িয়া চলিতেছিল গলিত-নীহার
কৈলাসের পানে। বহু বনগন্ধ বহে
অকস্মাৎ শ্রান্ত বায়ু উত্তপ্ত আগ্রহে
লুটায়ে পড়িতেছিল সুদীর্ঘ নিশ্বাসে
মুগ্ধ সরসীর বক্ষে স্নিগ্ধ বাহুপাশে।

মদন, বসন্তসখা, ব্যগ্র কৌতূহলে
লুকায়ে বসিয়াছিল বকুলের তলে
পুষ্পাসনে, হেলায় হেলিয়া তরু-'পরে
প্রসারিয়া পদযুগ নবতৃণস্তরে।
পীত উত্তরীয়প্রান্ত লুণ্ঠিত ভূতলে,
গ্রন্থিত মালতীমালা কুঞ্চিত কুন্তলে,
গৌর কণ্ঠতটে—সহাস্য কটাক্ষ করি
কৌতুকে হেরিতেছিল মোহিনী সুন্দরী
তরুণীর স্নানলীলা। অধীর চঞ্চল
উৎসুক অঙ্গুলি তার, নির্মল কোমল
বক্ষস্থল লক্ষ্য করি লয়ে পুষ্পশর
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর।
গুঞ্জরি ফিরিতেছিল লক্ষ মধুকর
ফুলে ফুলে, ছায়াতলে সুপ্ত হরিণীরে
ক্ষণে ক্ষণে লেহন করিতেছিল ধীরে
বিমুগ্ধনয়ন মৃগ; বসন্ত-পরশে
পূর্ণ ছিল বনচ্ছায়া আলসে লালসে।

জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী-
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে, তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র—ললাটে অধরে
উরু-'পরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহুযুগে, সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে। ঘিরি তার চারি পাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্বাঙ্গ চুম্বিল তার, সেবকের মতো

সিক্ত তনু মুছি নিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে—ছায়াখানি রক্তপদতলে
চ্যুত বসনের মতো রহিল পড়িয়া।
অরণ্য রহিল স্তব্ধ, বিস্ময়ে মরিয়া।

ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি
উঠিল অনঙ্গদেব।
সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল-তরে। পরক্ষণে ভূমি-'পরে
জানু পাতি বসি, নির্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদন-পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

১ মাঘ ১৩০২

গৃহশত্রু

আমি একাকিনী যবে চলি রাজপথে
নব অভিসারসাজে,
নিশীথে নীরব নিখিল ভুবন,
না গাহে বিহগ, না চলে পবন,
মৌন সকল পৌর ভবন
সুপ্তনগর-মাঝে,
শুধু আমার নূপুর আমারি চরণে
ঝিমরি ঝিমরি বাজে।
অধীর মুখর শুনিয়া সে স্বর
পদে পদে মরি লাজে।

আমি চরণশব্দ শুনিব বলিয়া
বসি বাতায়ন কাছে—
অনিমেষ তারা নিবিড় নিশায়,
লহরীর লেশ নাহি যমুনায়,
জনহীন পথ আঁধারে মিশায়,
পাতাটি কাঁপে না গাছে;
শুধু আমারি উরসে আমারি হৃদয়
উলসি বিলসি নাচে।

উতলা পাগল করে কলরোল,
বাঁধন টুটিলে বাঁচে।

আমি কুসুমশয়নে মিলাই শরমে,
মধুর মিলনরাতি—
স্তব্ধ যামিনী ঢাকে চারি ধার,
নির্বাণ দীপ, রুদ্ধ দুয়ার,
শ্রাবণগগন করে হাহাকার
তিমিরশয়ন পাতি—
শুধু আমার মানিক আমারি বক্ষে
জ্বালায়ে রেখেছে বাতি।
কোথায় লুকাই, কেমনে নিবাই
নিলাজ ভূষণ-ভাতি।

আমি আমার গোপন মরমের কথা
রেখেছি মরমতলে।
মলয় কহিছে আপন কাহিনী,
কোকিল গাহিছে আপন রাগিণী,
নদী বহি চলে কাঁদি একাকিনী
আপনার কলকলে।
শুধু আমার কোলের আমারি বীণাটি
গীতঝংকার-ছলে
যে কথা যখন করিব গোপন
সে কথা তখনি বলে।

১৫ মাঘ ১৩০২

মরীচিকা

কেন আসিতেছ মুগ্ধ মোর পানে ধেয়ে
ওগো দিগ্‌ভ্রান্ত পান্থ, তৃষার্ত নয়ানে
লুব্ধ বেগে। আমি যে তৃষিত তোমা চেয়ে।
আমি চিরদিন থাকি এ মরুশয়ানে
সঙ্গীহারা। এ তো নহে পিপাসার জল,
এ তো নহে নিকুঞ্জের ছায়া, পক্ক ফল
মধুরসে ভরা, এ তো নহে উৎসধারে
সিঞ্চিত সরস স্নিগ্ধ নবীন শাদ্বল
নয়ননন্দন শ্যাম। পল্লব-মাঝারে
কোথায় বিহঙ্গ, কোথা মধুকরদল।

শুধু জেনো, একখানি বহ্নিসম শিখা
তপ্ত বাসনার তুলি আমার সম্বল—
অনন্ত পিপাসাপটে এ কেবল লিখা
চিরতৃষার্তের স্বপ্ন মায়া-মরীচিকা।

১৬ মাঘ ১৩০২

উৎসব

মোর অঙ্গে অঙ্গে যেন আজি বসন্ত উদয়
কত পত্রপুষ্পময়।
যেন মধুপের মেলা
গুঞ্জরিছে সারাবেলা,
হেলাভরে করে খেলা
অলস মলয়।
ছায়া আলো অশ্রু হাসি
নৃত্য গীত বীণা বাঁশি,
যেন মোর অঙ্গে আসি
বসন্ত উদয়
কত পত্রপুষ্পময়।

তাই মনে হয় আমি আজি পরম সুন্দর,
আমি অমৃত-নির্ঝর।
সুখসিক্ত নেত্র মম
শিশিরিত পুষ্পসম,
ওষ্ঠে হাসি নিরুপম
মাধুরী-মন্থর।
মোর পুলকিত হিয়া
সর্বদেহে বিলসিয়া
বক্ষে উঠে বিকশিয়া
পরম সুন্দর,
নব অমৃত-নির্ঝর।

ওগো, যে-তুমি আমার মাঝে নূতন নবীন
সদা আছ নিশিদিন,
তুমি কি বসেছ আজি
নব বরবেশে সাজি,
কুন্তলে কুসুমরাজি,
অঙ্কে লয়ে বীন।

ভরিয়া আরতি-থালা
জ্বালায়েছ দীপমালা,
সাজায়েছ পুষ্পডালা
নূতন নবীন
আজি বসন্তের দিন।

ওগো তুমি কি উতলা-সম বেড়াইছ ফিরে
মোর হৃদয়ের তীরে?
তোমারি কি চারি পাশ
কাঁপে শত অভিলাষ,
তোমারি কি পট্টবাস
উড়িছে সমীরে?
নব গান তব মুখে
ধ্বনিছে আমার বুকে,
উচ্ছ্বসিয়া সুখে দুখে
হৃদয়ের তীরে
তুমি বেড়াইছ ফিরে।

আজি তুমি কি দেখিছ এই শোভা রাশি রাশি
ওগো মনোবনবাসী।
আমার নিশ্বাসবায়
লাগিছে কি তব গায়,
বাসনার পুষ্প পায়
পড়িছে কি আসি।
উঠিছে কি কলতান
মর্মর গুঞ্জরগান,
তুমি কি করিছ পান
মোর সুধারাশি
ওগো মনোবনবাসী।

আজি এ উৎসব কলরব কেহ নাহি জানে,
শুধু আছে তাহা প্রাণে।
শুধু এ বক্ষের কাছে
কী জানি কাহারা নাচে,
সর্বদেহ মাতিয়াছে
শব্দহীন গানে।
যৌবন-লাবণ্যধারা
অঙ্গে অঙ্গে পথহারা,
এ আনন্দ তুমি ছাড়া
কেহ নাহি জানে—
তুমি আছ মোর প্রাণে।

২২ মাঘ ১৩০২

প্রস্তরমূর্তি

হে নির্বাক অচঞ্চল পাষাণ-সুন্দরী,
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি কত বর্ষ ধরি
অনম্বরা অনাসক্তা চির একাকিনী
আপন সৌন্দর্যধ্যানে দিবসযামিনী
তপস্যা-মগনা। সংসারের কোলাহল
তোমারে আঘাত করে নিয়ত নিষ্ফল—
জন্মমৃত্যু দুঃখসুখ অস্ত-অভ্যুদয়
তরঙ্গিত চারি দিকে চরাচরময়,
তুমি উদাসিনী। মহাকাল পদতলে
মুগ্ধনেত্রে ঊর্ধ্বমুখে রাত্রিদিন বলে,
‘কথা কও, কথা কও, কথা কও প্রিয়ে,
কথা কও, মৌন বধূ, রয়েছি চাহিয়ে।’
তুমি চির বাক্যহীনা, তব মহাবাণী
পাষাণে আবদ্ধ, ওগো সুন্দরী পাষাণী।

২৪ মাঘ ১৩০২

নারীর দান

একদা প্রাতে কুঞ্জতলে
অন্ধ বালিকা
পত্রপুটে আনিয়া দিল
পুষ্পমালিকা।
কণ্ঠে পরি অশ্রুজল
ভরিল নয়নে;
বক্ষে লয়ে চুমিনু তার
স্নিগ্ধ বয়নে।
কহিনু তারে, ‘অন্ধকারে
দাঁড়ায়ে রমণী
কী ধন তুমি করিছ দান
না জান আপনি।
পুষ্পসম অন্ধ তুমি
অন্ধ বালিকা,
দেখ নি নিজে মোহন কী যে
তোমার মালিকা।’

২৫ মাঘ ১৩০২

জীবনদেবতা

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম।
কত যে বরন, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী, কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন
বাসরশয়ন তব—
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মুরতি নিত্যনব।

আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে
না জানি কিসের আশে।
লেগেছে কি ভালো, হে জীবননাথ,
আমার রজনী আমার প্রভাত,
আমার নর্ম আমার কর্ম
তোমার বিজন বাসে।
বরষা শরতে বসন্তে শীতে
ধ্বনিয়াছে হিয়া যত সংগীতে
শুনেছ কি তাহা একেলা বসিয়া
আপন সিংহাসনে।
মানসকুসুম তুলি অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে,
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ
মম যৌবনবনে।

কী দেখিছ বঁধু মরম-মাঝারে
রাখিয়া নয়ন দুটি।
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার
স্খলন পতন ত্রুটি।
পূজাহীন দিন, সেবাহীন রাত,
কত বারবার ফিরে গেছে নাথ,
অর্ঘ্যকুসুম ঝরে পড়ে গেছে
বিজন বিপিনে ফুটি।

যে সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বারবার,
হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী
আমি কি গাহিতে পারি।
তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া,
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া
এনেছি অশ্রুবারি।

এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ
যা-কিছু আছিল মোর।
যত শোভা যত গান যত প্রাণ,
জাগরণ, ঘুমঘোর।
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,
মদিরাবিহীন মম চুম্বন,
জীবনকুঞ্জে অভিসার-নিশা
আজি কি হয়েছে ভোর?
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহো আরবার
চিরপুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবন-ডোরে।

২৯ মাঘ ১৩০২

রাত্রে ও প্রভাতে

কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে
কুঞ্জকাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা
ধরেছি তোমার মুখে।
তুমি চেয়ে মোর আঁখি-'পরে
ধীরে পাত্র লয়েছ করে,
হেসে করিয়াছ পান চুম্বনভরা
সরস বিম্বাধরে,
কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে
মধুর আবেশভরে।
তব অবগুণ্ঠনখানি
আমি খুলে ফেলেছিনু টানি,

আমি কেড়ে রেখেছিনু বক্ষে, তোমার
কমল-কোমল পাণি—
ভাবে নিমীলিত তব যুগল নয়ন,
মুখে নাহি ছিল বাণী।
আমি শিথিল করিয়া পাশ
খুলে দিয়েছিনু কেশরাশ,
তব আনমিত মুখখানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি,
তুমি সকল সোহাগ সয়েছিল, সখী,
হাসিমুকুলিত মুখে,
কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে
নবীন মিলনসুখে।

আজি নির্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জন নদীতীরে
স্নান-অবসানে শুভ্রবসনা
চলিয়াছ ধীরে ধীরে।
তুমি বাম করে লয়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি,
দূরে দেবালয়তলে উষার রাগিণী
বাঁশিতে উঠিছে বাজি
এই নির্মলবায় শান্ত উষায়
জাহ্নবীতীরে আজি।
দেবী, তব সিঁথিমূলে লেখা
নব অরুণ সিঁদুররেখা,
তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খবলয়
তরুণ ইন্দুলেখা।
এ কী মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি
প্রভাতে দিয়েছ দেখা।
রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে—
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে
আজি নির্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জন নদীতীরে।

১ ফাল্গুন ১৩০২

১৪০০ সাল

আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে—
আজি হতে শত বর্ষ পরে।
আজি নববসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ—
আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,
আজিকার কোনো রক্তরাগ
অনুরাগে সিক্ত করি পারিব না পাঠাইতে
তোমাদের করে
আজি হতে শতবর্ষ পরে।

তবু তুমি এক বার খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার
বসি বাতায়নে
সুদূর দিগন্তে চাহি কল্পনায় অবগাহি
ভেবে দেখো মনে—
এক দিন শতবর্ষ আগে
চঞ্চল পুলকরাশি কোন্ স্বর্গ হতে ভাসি
নিখিলের মর্মে আসি লাগে,
নবীন ফাল্গুনদিন সকল বন্ধনহীন
উন্মত্ত অধীর—
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণুগন্ধমাখা
দক্ষিণসমীর—
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়েছে ধরা
যৌবনের রাগে
তোমাদের শতবর্ষ আগে।
সেদিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে,
কবি এক জাগে—
কত কথা, পুষ্পপ্রায় বিকশি তুলিতে চায়
কত অনুরাগে
এক দিন শতবর্ষ আগে।

আজি হতে শতবর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে?
আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।

আমার বসন্তগান তোমার বসন্তদিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে
হৃদয়স্পন্দনে তব ভ্রমরগুঞ্জনে নব
পল্লবমর্মরে
আজি হতে শতবর্ষ পরে।

২ ফাল্গুন ১৩০২

নীরব তন্ত্রী

'তোমার বীণায় সব তার বাজে,
ওহে বীনকার,
তারি মাঝে কেন নীরব কেবল
একখানি তার।'
'ভবনদীতীরে হৃদিমন্দিরে
দেবতা বিরাজে,
পূজা সমাপিয়া এসেছি ফিরিয়া
আপনার কাজে।
বিদায়ের ক্ষণে শুধাল পূজারী,
'দেবীরে কী দিলে?
তব জনমের শ্রেষ্ঠ কী ধন
ছিল এ নিখিলে?'
কহিলাম আমি, সঁপিয়া এসেছি
পূজা-উপহার
আমার বীণায় ছিল যে একটি
সুবর্ণ তার;
যে-তারে আমার হৃদয়বনের
যত মধুকর
ক্ষণেকে ক্ষণেকে ধ্বনিয়া তুলিত
গুঞ্জনস্বর,
যে-তারে আমার কোকিল গাহিত
বসন্তগান—
সেইখানি আমি দেবতাচরণে
করিয়াছি দান।
তাই এ বীণায় বাজে না কেবল
একখানি তার—
আছে তাহা শুধু মৌন মহৎ
পূজা-উপহার।'

৪ ফাল্গুন ১৩০২

দুরাকাঙ্ক্ষা

কেন নিবে গেল বাতি।
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে
জাগিয়া বাসররাতি,
তাই নিবে গেল বাতি।

কেন ঝরে গেল ফুল।
আমি বক্ষে চাপিয়া ধরেছিনু তারে
চিন্তিত ভয়াকুল,
তাই ঝরে গেল ফুল।

কেন মরে গেল নদী।
আমি বাঁধ বাঁধি তারে চাহি ধরিবারে
পাইবারে নিরবধি,
তাই মরে গেল নদী।

কেন ছিঁড়ে গেল তার।
আমি অধিক আবেগে প্রাণপণ বলে
দিয়েছিনু ঝংকার,
তাই ছিঁড়ে গেল তার।

৪ ফাল্গুন ১৩০২

প্রৌঢ়

যৌবননদীর স্রোতে তীব্র বেগভরে
একদিন ছুটেছিনু; বসন্তপবন
উঠেছিল উচ্ছ্বসিয়া; তীর-উপবন
ছেয়েছিল ফুল্ল ফুলে; তরুশাখা-'পরে
গেয়েছিল পিককুল— আমি ভালো করে
দেখি নাই শুনি নাই কিছু— অনুক্ষণ
দুলেছিনু আলোড়িত তরঙ্গশিখরে
মত্ত সন্তরণে। আজি দিবা-অবসানে
সমাপ্ত করিয়া খেলা উঠিয়াছি তীরে,
বসিয়াছি আপনার নিভৃত কুটীরে—
বিচিত্র কল্লোলগীত পশিতেছে কানে,
কত গন্ধ আসিতেছে সায়াহ্নসমীরে;
বিস্মিত নয়ন মেলি হেরি শূন্য-পানে
গগনে অনন্তলোক জাগে ধীরে ধীরে।

৭ ফাল্গুন ১৩০২

ধূলি

অয়ি ধূলি, অয়ি তুচ্ছ, অয়ি দীনহীনা,
সকলের নিম্নে থাক নীচতম জনে
বক্ষে বাঁধিবার তরে; সহি সর্ব ঘৃণা
কারে নাহি কর ঘৃণা। গৈরিক বসনে
হে ব্রতচারিণী তুমি সাজি উদাসীনা
বিশ্বজনে পালিতেছ আপন ভবনে।
নিজেরে গোপন করি, অয়ি বিমলিনা,
সৌন্দর্য বিকশি তোল বিশ্বের নয়নে।
বিস্তারিছ কোমলতা হে শুষ্ক কঠিনা—
হে দরিদ্রা, পূর্ণা তুমি রত্নে ধান্যে ধনে।
হে আত্মবিস্মৃতা, বিশ্ব-চরণবিলীনা,
বিস্মৃতেরে ঢেকে রাখ অঞ্চল-বসনে।
নূতনেরে নির্বিচারে কোলে লহ তুলি,
পুরাতনে বক্ষে ধর হে জননী ধূলি।

১৫ ফাল্গুন ১৩০২

সিন্ধুপারে

পউষ প্রখর শীতে জর্জর, ঝিল্লিমুখর রাতি;
নিদ্রিত পুরী, নির্জন ঘর, নির্বাণ দীপ-বাতি।
অকাতর দেহে আছিনু মগন সুখনিদ্রার ঘোরে—
তপ্ত শয্যা প্রিয়ার মতন সোহাগে ঘিরেছে মোরে।
হেনকালে হায় বাহির হইতে কে ডাকিল মোর নাম—
নিদ্রা টুটিয়া সহসা চকিতে চমকিয়া বসিলাম।
তীক্ষ্ম শাণিত তীরের মতন মর্মে বাজিল স্বর—
ঘর্ম বহিল ললাট বাহিয়া, রোমাঞ্চকলেবর।
ফেলি আবরণ, ত্যজিয়া শয়ন বিরলবসন বেশে
দুরু দুরু বুকে খুলিয়া দুয়ার বাহিরে দাঁড়ানু এসে।

দূর নদীপারে শূন্য শ্মশানে শৃগাল উঠিল ডাকি,
মাথার উপরে কেঁদে উড়ে গেল কোন্‌ নিশাচর পাখি।
দেখিনু দুয়ারে রমণীমুরতি অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
কৃষ্ণ অশ্বে বসিয়া রয়েছে, চিত্রে যেন সে আঁকা।
আরেক অশ্ব দাঁড়ায়ে রয়েছে, পুচ্ছ ভূতল চুমে,
ধূম্রবরন, যেন দেহ তার গঠিত শ্মশানধূমে।
নড়িল না কিছু, আমারে কেবল হেরিল আঁখির পাশে,
শিহরি শিহরি সর্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল ত্রাসে।

পাণ্ডু আকাশে খণ্ড চন্দ্র হিমানীর গ্লানি মাখা,
পল্লবহীন বৃদ্ধ অশথ শিহরে নগ্ন শাখা।
নীরব রমণী অঙ্গুলি তুলি দিল ইঙ্গিত করি—
মন্ত্রমুগ্ধ অচেতন-সম চড়িনু অশ্ব-'পরি।

বিদ্যুৎবেগে ছুটে যায় ঘোড়া—বারেক চাহিনু পিছে,
ঘরদ্বার মোর বাষ্পসমান, মনে হল সব মিছে।
কাতর রোদন জাগিয়া উঠিল সকল হৃদয় ব্যেপে,
কণ্ঠের কাছে সুকঠিন বলে কে তারে ধরিল চেপে।
পথের দুধারে রুদ্ধ দুয়ারে দাঁড়ায়ে সৌধসারি,
ঘরে ঘরে হায় সুখশয্যায় ঘুমাইছে নরনারী।
নির্জন পথ চিত্রিতবৎ, সাড়া নাই সারা দেশে।
রাজার দুয়ারে দুইটি প্রহরী ঢুলিছে নিদ্রাবেশে।
শুধু থেকে থেকে ডাকিছে কুকুর সুদূর পথের মাঝে—
গম্ভীর স্বরে প্রাসাদশিখরে প্রহরঘণ্টা বাজে।

অফুরান পথ, অফুরান রাতি, অজানা নূতন ঠাঁই,
অপরূপ এক স্বপ্নসমান, অর্থ কিছুই নাই।
কী যে দেখেছিনু মনে নাহি পড়ে, ছিল নাকো আগাগোড়া—
লক্ষ্যবিহীন তীরের মতন ছুটিয়া চলেছে ঘোড়া।
চরণে তাদের শব্দ বাজে না, উড়ে নাকো ধূলিরেখা—
কঠিন ভূতল নাই যেন কোথা, সকলি বাষ্পে লেখা।
মাঝে মাঝে যেন চেনা-চেনা-মতো মনে হয় থেকে থেকে—
নিমেষ ফেলিতে দেখিতে না পাই কোথা পথ যায় বেঁকে।
মনে হল মেঘ, মনে হল পাখি, মনে হল কিশলয়,
ভালো করে যেই দেখিবারে যাই মনে হল কিছু নয়।
দুই ধারে এ কি প্রাসাদের সারি? অথবা তরুর মূল?
অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারি মনের ভুল?
মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি রমণীর অবগুণ্ঠিত মুখে—
নীরব নিদয় বসিয়া রয়েছে, প্রাণ কেঁপে ওঠে বুকে।
ভয়ে ভুলে যাই দেবতার নাম, মুখে কথা নাহি ফুটে;
হুহু রবে বায়ু বাজে দুই কানে ঘোড়া চলে যায় ছুটে।

চন্দ্র যখন অস্তে নামিল তখনো রয়েছে রাতি,
পূর্বদিকের অলস নয়নে মেলিছে রক্ত ভাতি।
জনহীন এক সিন্ধুপুলিনে অশ্ব থামিল আসি—
সমুখে দাঁড়ায়ে কৃষ্ণ শৈল গুহামুখ পরকাশি।
সাগরে না শুনি জলকলরব, না গাহে উষার পাখি,
বহিল না মৃদু প্রভাতপবন বনের গন্ধ মাখি।
অশ্ব হইতে নামিল রমণী, আমিও নামিনু নীচে,
আঁধার-ব্যাদান গুহার মাঝারে চলিনু তাহার পিছে।

ভিতরে খোদিত উদার প্রাসাদ শিলাস্তম্ভ-'পরে,
কনকশিকলে সোনার প্রদীপ দুলিতেছে থরে থরে।
ভিত্তির গায়ে পাষাণ মূর্তি চিত্রিত আছে কত,
অপরূপ পাখি, অপরূপ নারী, লতাপাতা নানা-মতো।
মাঝখানে আছে চাঁদোয়া খাটানো, মুক্তা ঝালরে গাঁথা—
তারি তলে মণিপালঙ্ক-'পরে অমল শয়ন পাতা।
তারি দুই ধারে ধূপাধার হতে উঠিছে গন্ধধূপ,
সিংহবাহিনী নারীর প্রতিমা দুই পাশে অপরূপ।
নাহি কোনো লোক, নাহিকো প্রহরী, নাহি হেরি দাসদাসী।
গুহাগৃহতলে তিলেক শব্দ হয়ে উঠে রাশি রাশি।
নীরবে রমণী আবৃত বদনে বসিলা শয্যা-'পরে,
অঙ্গুলি তুলি ইঙ্গিত করি পাশে বসাইল মোরে।
হিম হয়ে এল সর্বশরীর, শিহরি উঠিল প্রাণ—
শোণিতপ্রবাহে ধ্বনিতে লাগিল ভয়ের ভীষণ তান।

সহসা বাজিয়া বাজিয়া উঠিল দশ দিকে বীণা-বেণু,
মাথার উপরে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িল পুষ্পরেণু।
দ্বিগুণ আভায় জ্বলিয়া উঠিল দীপের আলোকরাশি—
ঘোমটা-ভিতরে হাসিল রমণী মধুর উচ্চহাসি।
সে হাসি ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া উঠিল বিজন বিপুল ঘরে—
শুনিয়া চমকি ব্যাকুল হৃদয়ে কহিলাম জোড়করে,
'আমি যে বিদেশী অতিথি, আমায় ব্যথিয়ো না পরিহাসে,
কে তুমি নিদয় নীরব ললনা কোথায় আনিলে দাসে।'

অমনি রমণী কনক দণ্ড আঘাত করিল ভূমে,
আঁধার হইয়া গেল সে ভবন রাশি রাশি ধূপধূমে।
বাজিয়া উঠিল শতেক শঙ্খ হুলুকলরব-সাথে—
প্রবেশ করিল বৃদ্ধ বিপ্র ধান্যদূর্বা হাতে।
পশ্চাতে তার বাঁধি দুই সার কিরাতনারীর দল
কেহ বহে মালা, কেহ বা চামর, কেহ বা তীর্থজল।
নীরবে সকলে দাঁড়ায়ে রহিল— বৃদ্ধ আসনে বসি
নীরবে গণনা করিতে লাগিল গৃহতলে খড়ি কষি।
আঁকিতে লাগিল কত-না চক্র, কত-না রেখার জাল,
গণনার শেষে কহিল, 'এখন হয়েছে লগ্ন-কাল।'
শয়ন ছাড়িয়া উঠিল রমণী বদন করিয়া নত,
আমিও উঠিয়া দাঁড়াইনু পাশে মন্ত্রচালিত-মতো।
নারীগণ সবে ঘেরিয়া দাঁড়াল একটি কথা না বলি,
দোঁহাকার মাথে ফুলদল-সাথে বরষি লাজাঞ্জলি।
পুরোহিত শুধু মন্ত্র পড়িল আশিস করিয়া দোঁহে—
কী ভাষা কী কথা কিছু না বুঝিনু, দাঁড়ায়ে রহিনু মোহে।
অজানিত বধূ নীরবে সঁপিল শিহরিয়া কলেবর—
হিমের মতন মোর করে, তার তপ্ত কোমল কর।

চলি গেল ধীরে বৃদ্ধ বিপ্র; পশ্চাতে বাঁধি সার
গেল নারীদল মাথায় কক্ষে মঙ্গল-উপচার।
শুধু এক সখী দেখাইল পথ হাতে লয়ে দীপখানি—
মোরা দোঁহে পিছে চলিনু তাহার, কারো মুখে নাহি বাণী।
কত-না দীর্ঘ আঁধার কক্ষ সভয়ে হইয়া পার
সহসা দেখিনু সমুখে কোথায় খুলে গেল এক দ্বার।
কী দেখিনু ঘরে কেমনে কহিব হয়ে যায় মনোভুল,
নানা বরনের আলোক সেথায়, নানা বরনের ফুল।
কনকে রজতে রতনে জড়িত বসন বিছানো কত,
মণিবেদিকায় কুসুমশয়ন স্বপ্নরচিত-মতো।
পাদপীঠ-'পরে চরণ প্রসারি শয়নে বসিলা বধূ—
আমি কহিলাম, 'সব দেখিলাম, তোমারে দেখি নি শুধু।'

চারি দিক হতে বাজিয়া উঠিল শত কৌতুকহাসি।
শত ফোয়ারায় উছসিল যেন পরিহাস রাশি রাশি।
সুধীরে রমণী দু-বাহু তুলিয়া, অবগুণ্ঠনখানি
উঠায়ে ধরিয়া মধুর হাসিল মুখে না কহিয়া বাণী।
চকিত নয়ানে হেরি মুখপানে পড়িনু চরণতলে,
'এখানেও তুমি জীবনদেবতা!' কহিনু নয়নজলে।
সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি, সেই সুধাভরা আঁখি—
চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি।
খেলা করিয়াছে নিশিদিন মোর সব সুখে সব দুখে,
এ অজানাপুরে দেখা দিল পুন সেই পরিচিত মুখে।
অমল কোমল চরণকমলে চুমিনু বেদনাভরে—
বাধা না মানিয়া ব্যাকুল অশ্রু পড়িতে লাগিল ঝ'রে।
অপরূপ তানে ব্যথা দিয়ে প্রাণে বাজিতে লাগিল বাঁশি।
বিজন বিপুল ভবনে রমণী হাসিতে লাগিল হাসি।

২০ ফাল্গুন ১৩০২

সংযোজন

বিকাশ

বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে
আমার নিভৃত নব-জীবন-'পরে!
প্রভাত কমল-সম ফুটিল হৃদয় মম,
কার দুটি নিরুপম চরণ-তরে!
জেগে উঠে সব শোভা, সব মাধুরী,
পলকে পলকে হিয়া পুলকে পুরি।
কোথা হতে সমীরণ আনে নব জাগরণ,
পরানের আবরণ মোচন করে!
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে।
লাগে বুকে সুখে দুখে কত যে ব্যথা,
কেমনে বুঝায়ে কব না জানি কথা!
আমার বাসনা আজি ত্রিভুবনে উঠে বাজি,
কাঁপে নদী বনরাজি বেদনাভরে!
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে।

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১

বিস্ময়

বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।
কোথা হতে এলে তুমি হৃদি-মাঝারে।
ওই মুখ ওই হাসি কেন এত ভালোবাসি,
কেন গো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে!
তোমারে হেরিয়া যেন জাগে স্মরণে
তুমি চির-পুরাতন চির জীবনে!
তুমি না দাঁড়ালে আসি হৃদয়ে বাজে না বাঁশি,
যত আলো যত হাসি ডুবে আঁধারে!

১৩ জ্যৈষ্ঠ

বন্দনা

সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি, নন্দনফুলহার!
তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার!
নীল অম্বর চুম্বন-নত চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,
অঞ্চল ঘেরি সংগীত যত গুঞ্জরে শতবার!

ঝলকিছে কত ইন্দুকিরণ পুলকিছে ফুলগন্ধ!
চরণভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ!
ছিঁড়ি মর্মের শত বন্ধন তোমাপানে ধায় যত ক্রন্দন,
লহো হৃদয়ের ফুল চন্দন বন্দন উপহার!

১৪ জ্যৈষ্ঠ

মনের কথা

কথা তারে ছিল বলিতে!
চোখে চোখে দেখা হল পথ চলিতে।
বসে বসে দিবারাতি বিজনে সে কথা গাঁথি,
কত যে পুরবীরাগে কত ললিতে!
সে কথা ফুটিয়া উঠে কুসুম বনে।
সে কথা ব্যাপিয়া যায় নীল গগনে।
সে কথা লইয়া খেলি হৃদয়ে বাহিরে মেলি,
মনে মনে গাহি, কার মন ছলিতে!
কথা তারে ছিল বলিতে।

১৬ জ্যৈষ্ঠ

আত্মোৎসর্গ

আমারে করো তোমার বীণা, লহো গো লহো তুলে!
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে।
কোমল তব কমল করে পরশ করো পরান-'পরে,
উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণমূলে!
কখনো সুখে কখনো দুখে কাঁদিবে চাহি তোমার মুখে,
চরণে পড়ি রবে নীরবে রহিবে যবে ভুলে।
কেহ না জানে কী নব তানে উঠিবে গীত শূন্য-পানে
আনন্দের বারতা যাবে অনন্তের কূলে।

১৯ জ্যৈষ্ঠ

অতিথি

কে দিল আবার আঘাত আমার
দুয়ারে!
এ নিশীথকালে কে আসি দাঁড়ালে
খুঁজিতে আসিলে কাহারে!
বহুকাল হল বসন্ত দিন
এসেছিল এক অতিথি নবীন,
আকুল জীবন করিল মগন
অকূল পুলক-পাথারে!
আজি এ বরষা নিবিড় তিমির,
ঝর ঝর জল, জীর্ণ কুটীর,
বাদলের বায়ে প্রদীপ নিবায়ে
জেগে বসে আছি একা রে!
অতিথি অজানা, তব গীতসুর
লাগিতেছে কানে ভীষণ মধুর,
ভাবিতেছি মনে যাব তব সনে
অচেনা অসীম আঁধারে।

১২ আশ্বিন ১৩০২

নব জীবন

এসো গো নূতন জীবন!
এসো গো কঠোর নিঠুর নীরব
এসো গো ভীষণ শোভন!
এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এসো গো অশ্রুসলিলসিক্ত,
এসো গো ভূষণবিহীন, রিক্ত,
এসো গো চিত্তপাবন!
থাক্ বীণা বেণু, মালতী মালিকা,
পূর্ণিমা নিশি, মায়া-কুহেলিকা,
এসো গো প্রখর হোমানল শিখা,
হৃদয়-শোণিত-প্রাশন!
এসো গো পরম দুঃখ নিলয়,
আশা-অঙ্কুর করহ বিলয়,
এসো সংগ্রাম, এসো মহাজয়,
এসো গো মরণ সাধন!

১৩ আশ্বিন ১৩০২

মানস বসন্ত

পুষ্প বনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে!
পরানে বসন্ত এল কার মন্তরে!
মুঞ্জরিল শুষ্ক শাখী, কুহরিল মৌন পাখি,
বহিল আনন্দধারা মরু প্রান্তরে।
দুখেরে করি না ডর, বিরহে বেঁধেছি ঘর,
মনঃকুঞ্জে মধুকর তবু গুঞ্জরে!
হৃদয়ে সুখের বাসা, মরমে অমর আশা,
চিরবন্দী ভালোবাসা প্রাণ পিঞ্জরে।

১৪ আশ্বিন ১৩০২

ভঙ্গ

উঠ রে মলিন মুখ, চলো এইবার!
এসো রে তৃষিত বুক রাখো হাহাকার!
হেরো ওই গেল বেলা, ভাঙিল ভাঙিল মেলা,
গেল সবে ছাড়ি খেলা ঘরে যে যাহার!
হে ভিখারী কারে তুমি শুনাইছ সুর!
রজনী আঁধার হল পথ অতি দূর!
ক্ষুধিত তৃষিত প্রাণে আর কাজ নাহি গানে,
এখন বেসুরো তানে বাজিছে সেতার!
উঠ রে মলিন মুখ, চলো এইবার!

২৬ ভাদ্র ১৩০২

চৈতালি

সূচনা

নদীর প্রবাহের একধারে সামান্য একটা ভাঙা ডাল আটকা পড়েছিল। সেইটেতে ঘোলা জল থেকে পলি ছেঁকে নিতে লাগল। সেইখানে ক্রমে একটা দ্বীপ জমিয়ে তুললে। ভেসে-আসা নানা-কিছু অবান্তর জিনিস দল বাঁধল সেখানে, শৈবাল ঘন হয়ে সেখানে ঠেকল এসে, মাছ পেল আশ্রয়, এক পায়ে বক রইল দাঁড়িয়ে শিকারের লোভে, খানিকটুকু সীমানা নিয়ে একটা অভাবিত দৃশ্য জেগে উঠল—তার সঙ্গে চার দিকের বিশেষ মিল নেই। চৈতালি তেমনি একটুকরো কাব্য, যা অপ্রত্যাশিত। স্রোত চলছিল যে-রূপ নিয়ে, অল্প-কিছু বাইরের জিনিসের সঞ্চয় জমে ক্ষণকালের জন্যে তার মধ্যে আকস্মিকের আবির্ভাব হল।

পতিসরের নাগর নদী নিতান্তই গ্রাম্য। অল্প তার পরিসর, মন্থর তার স্রোত। তার এক তীরে দরিদ্র লোকালয়, গোয়ালঘর, ধানের মরাই, বিচালির স্তূপ, অন্য তীরে বিস্তীর্ণ ফসল-কাটা শস্যখেত ধূ ধূ করছে। কোনো এক গ্রীষ্মকাল এইখানে আমি বোট বেঁধে কাটিয়েছি। দুঃসহ গরম। মন দিয়ে বই পড়বার মতো অবস্থা নয়। বোটের জানলা বন্ধ করে খড়খড়ি খুলে সেই ফাঁকে দেখছি বাইরের দিকে চেয়ে। মনটা আছে ক্যামেরার চোখ নিয়ে, ছোটো ছোটো ছবির ছায়া ছাপ দিচ্ছে অন্তরে। অল্প পরিধির মধ্যে দেখছি বলেই এত স্পষ্ট করে দেখছি। সেই স্পষ্ট দেখার স্মৃতিকে ভরে রাখছিলুম নিরলংকৃত ভাষায়। অলংকারপ্রয়োগের চেষ্টা জাগে মনে যখন প্রত্যক্ষবোধের স্পষ্টতা সম্বন্ধে সংশয় থাকে। যেটা দেখছি মন যখন বলে 'এটাই যথেষ্ট' তখন তার উপরে রঙ লাগাবার ইচ্ছাই থাকে না। চৈতালির ভাষা এত সহজ হয়েছে এইজন্যেই।

এর প্রথম কয়েকটি কবিতায় পূর্বতন কাব্যের ধারা চলে এসেছে। অর্থাৎ সেগুলি যাকে বলে লিরিক।

আমার অল্প বয়সের লেখাগুলিকে একদিন ছবি ও গান এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেম। তখন আমার মনে ছিল আমার কবিতার সহজ প্রবৃত্তিই ঐ দুটি শাখায় নিজেকে প্রকাশ করা। বাইরে আমার চোখে ছবি পড়ে, অন্তরে আমি গান গাই। চৈতালিতে অনেক কবিতা দেখতে পাই যাতে গানের বেদনা আছে, কিন্তু গানের রূপ নেই। কেননা তখন যে-আঙ্গিকে আমার লেখনীকে পেয়ে বসেছিল তাতে গানের রস যদি বা নামে, গানের সুর জায়গা পায় না।

শান্তিনিকেতন
২০ জুলাই ১৯৪০

তুমি যদি বক্ষোমাঝে থাক নিরবধি,
তোমার আনন্দমূর্তি নিত্য হেরে যদি
এ মুগ্ধ নয়ন মোর,—পরান-বল্লভ,
তোমার কোমল কান্ত চরণ পল্লব
চিরস্পর্শ রেখে দেয় জীবনতরীতে,
কোনো ভয় নাহি করি বাঁচিতে মরিতে।

উৎসর্গ

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে
মুহূর্তেই বুঝি ফেটে পড়ে,
বসন্তের দুরন্ত বাতাসে
নুয়ে বুঝি নমিবে ভূতল,
রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
থরে থরে ফলিয়াছে ফল।

তুমি এসো নিকুঞ্জ-নিবাসে,
এসো মোর সার্থক-সাধন।
লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল,
নীরবে নিতান্ত অবনত
বসন্তের সর্ব-সমর্পণ;
হাসিমুখে নিয়ে যাও যত
বনের বেদন-নিবেদন।

শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত
ছিন্ন করি ফেলো বৃন্তগুলি,
সুখাবেশে বসি লতামূলে
সারাবেলা অলস অঙ্গুলে
বৃথা কাজে যেন অন্য মনে
খেলাচ্ছলে লহো তুলি তুলি
তব ওষ্ঠে দশন-দংশনে
টুটে যাক পূর্ণ ফলগুলি।

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুঞ্জরিছে ভ্রমর চঞ্চল।
সারাদিন অশান্ত বাতাস
ফেলিতেছে মর্মর নিশ্বাস,
বনের বুকের আন্দোলনে
কাঁপিতেছে পল্লব-অঞ্চল।
আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
পুঞ্জ পুঞ্জ ধরিয়াছে ফল।

১৩ চৈত্র ১৩০২

গীতহীন

চলে গেছে মোর বীণাপাণি।
কতদিন হল সে না জানি।
কী জানি কী অনাদরে বিস্মৃত ধূলির 'পরে
ফেলে রেখে গেছে বীণাখানি।

ফুটেছে কুসুমরাজি— নিখিল জগতে আজি
আসিয়াছে গাহিবার দিন,
মুখরিত দশ দিক অশ্রান্ত পাগল পিক,
উচ্ছ্বসিত বসন্ত-বিপিন।
বাজিয়া উঠেছে ব্যথা, প্রাণভরা ব্যাকুলতা,
মনে ভরি উঠে কত বাণী,
বসে আছি সারাদিন গীতিহীন স্তুতিহীন—
চলে গেছে মোর বীণাপাণি।

আর সে নবীন সুরে বীণা উঠিবে না পুরে,
বাজিবে না পুরানো রাগিণী;
যৌবনে যোগিনী-মতো, লয়ে নিত্য মৌনব্রত
তুই বীণা রবি উদাসিনী।
কে বসিবে এ আসনে মানসকমলবনে,
কার কোলে দিব তোরে আনি—
থাক্ পড়ে ওইখানে চাহিয়া আকাশ-পানে—
চলে গেছে মোর বীণাপাণি।

কখনো মনের ভুলে যদি এরে লই তুলে
বাজে বুকে বাজাইতে বীণা;
যদিও নিখিল ধরা বসন্তে সংগীতে ভরা,
তবু আজি গাহিতে পারি না।
কথা আজি কথা সার, সুর তাহে নাহি আর,
গাঁথা ছন্দ বৃথা বলে মানি—
অশ্রুজলে ভরা প্রাণ, নাহি তাহে কলতান—
চলে গেছে মোর বীণাপাণি।

ভাবিতাম সুরে বাঁধা এ বীণা আমারি সাধা,
এ আমার দেবতার বর;
এ আমারি প্রাণ হতে মন্ত্রভরা সুধাস্রোতে
পেয়েছে অক্ষয় গীতস্বর।

এক দিন সন্ধ্যালোকে অশ্রুজল ভরি চোখে
বক্ষে এরে লইলাম টানি—
আর না বাজিতে চায়— তখনি বুঝিনু হায়
চলে গেছে মোর বীণাপাণি।

১৩ চৈত্র ১৩০২

স্বপন

কাল রাতে দেখিনু স্বপন—
দেবতা-আশিস-সম শিয়রে সে বসি মম
মুখে রাখি করুণ নয়ন
কোমল অঙ্গুলি শিরে বুলাইছে ধীরে ধীরে
সুধামাখা প্রিয়-পরশন—
কাল রাতে হেরিনু স্বপন।

হেরি সেই মুখপানে বেদনা ভরিল প্রাণে
দুই চক্ষু জলে ছলছলি—
বুকভরা অভিমান আলোড়িয়া মর্মস্থান
কণ্ঠে যেন উঠিল উছলি।
সে শুধু আকুল চোখে নীরবে গভীর শোকে
শুধাইল, "কী হয়েছে তোর?"
কী বলিতে গিয়ে প্রাণ ফেটে হল শতখান
তখনি ভাঙিল ঘুমঘোর।

অন্ধকার নিশীথিনী ঘুমাইছে একাকিনী,
অরণ্যে উঠিছে ঝিল্লিস্বর,
বাতায়নে ধ্রুবতারা চেয়ে আছে নিদ্রাহারা,
নতনেত্রে গণিছে প্রহর।
দীপ-নির্বাপিত ঘরে শুয়ে শূন্য শয্যা-'পরে
ভাবিতে লাগিনু কতক্ষণ—
শিথানে মাথাটি থুয়ে সেও একা শুয়ে শুয়ে
কী জানি কী হেরিছে স্বপন,
দ্বিপ্রহরা যামিনী যখন।

১৪ চৈত্র ১৩০২

আশার সীমা

সকল আকাশ সকল বাতাস
সকল শ্যামল ধরা
সকল কান্তি সকল শান্তি
সন্ধ্যাগগন-ভরা,
যত কিছু সুখ, যত সুধামুখ,
যত মধুমাখা হাসি,
যত নব নব বিলাস-বিভব,
প্রমোদ-মদিরারাশি,
সকল পৃথ্বী সকল কীর্তি
সকল অর্ঘ্যভার,
বিশ্ব-মথন সকল যতন,
সকল রতনহার—
সব পাই যদি তবু নিরবধি
আরো পেতে চায় মন—
যদি তারে পাই তবে শুধু চাই
একখানি গৃহকোণ।

১৪ চৈত্র ১৩০২

দেবতার বিদায়

দেবতামন্দির-মাঝে ভকত প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাখা দেহে
বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে।
কহিল কাতরকণ্ঠে, "গৃহ মোর নাই,
এক পাশে দয়া করে দেহো মোরে ঠাঁই।"
সসংকোচে ভক্তবর কহিলেন তারে,
"আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যা রে।"
সে কহিল, "চলিলাম"—চক্ষের নিমেষে
ভিখারী ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, "প্রভু মোরে কী ছল ছলিলে।"
দেবতা কহিল, "মোরে দূর করি দিলে।
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়াতরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।"

১৪ চৈত্র ১৩০২

পুণ্যের হিসাব

সাধু যবে স্বর্গে গেল, চিত্রগুপ্তে ডাকি
কহিলেন—আনো মোর পুণ্যের হিসাব।
চিত্রগুপ্ত খাতাখানি সম্মুখেতে রাখি
দেখিতে লাগিল তার মুখের কী ভাব।
সাধু কহে চমকিয়া—মহা ভুল এ কী!
প্রথমের পাতাগুলো ভরিয়াছ আঁকে,
শেষের পাতায় এ যে সব শূন্য দেখি।
যতদিন ডুবে ছিনু সংসারের পাঁকে
ততদিন এত পুণ্য কোথা হতে আসে।
শুনি কথা চিত্রগুপ্ত মনে মনে হাসে।
সাধু মহা রেগে বলে—যৌবনের পাতে
এত পুণ্য কেন লেখ দেবপূজা-খাতে।
চিত্রগুপ্ত হেসে বলে—বড়ো শক্ত বুঝা।
যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা।

১৪ চৈত্র ১৩০২

বৈরাগ্য

কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী
“গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে?”
দেবতা কহিলা, “আমি।”—শুনিল না কানে।
সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল, “কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা?”
দেবতা কহিলা, “আমি।”—কেহ শুনিল না।
ডাকিল শয়ন ছাড়ি, “তুমি কোথা প্রভু।”
দেবতা কহিলা, “হেথা।”—শুনিল না তবু।
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি—
দেবতা কহিলা, “ফির।”—শুনিল না বাণী।
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, “হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়।”

১৪ চৈত্র ১৩০২

মধ্যাহ্ন

বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্ধমগ্ন তরী-'পরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্য ঘাটতলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝটপটি। শ্যামশষ্পতটে তীরে
খঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি ফিরে।
চিত্রবর্ণ পতঙ্গম স্বচ্ছ পক্ষভরে
আকাশে ভাসিয়া উড়ে, শৈবালের 'পরে
ক্ষণে ক্ষণে লভিয়া বিশ্রাম। রাজহাঁস
অদূরে গ্রামের ঘাটে তুলি কলভাষ
শুভ্র পক্ষ ধৌত করে সিক্ত চঞ্চুপুটে।
শুষ্কতৃণগন্ধ বহি ধেয়ে আসে ছুটে
তপ্ত সমীরণ—চলে যায় বহু দূর।
থেকে থেকে ডেকে ওঠে গ্রামের কুকুর
কলহে মাতিয়া। কভু শান্ত হাম্বাস্বর,
কভু শালিকের ডাক, কখনো মর্মর
জীর্ণ অশথের, কভু দূর শূন্য-'পরে
চিলের সুতীব্র ধ্বনি, কভু বায়ুভরে
আর্ত শব্দ বাঁধা তরণীর—মধ্যাহ্নের
অব্যক্ত করুণ একতান, অরণ্যের
স্নিগ্ধচ্ছায়া, গ্রামের সুষুপ্ত শান্তিরাশি,
মাঝখানে বসে আছি আমি পরবাসী।
প্রবাস-বিরহদুঃখ মনে নাহি বাজে;
আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে;
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে—ধরণীর বক্ষতলে
পশু পাখি পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে
পূর্বজন্মে, জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে, মাতৃস্তনে শিশুর মতন—
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ।

১৫ চৈত্র ১৩০২

পল্লীগ্রামে

হেথায় তাহারে পাই কাছে,
যত কাছে ধরাতল, যত কাছে ফুলফল,
যত কাছে বায়ু জল আছে।
যেমন পাখির গান, যেমন জলের তান,
যেমনি এ প্রভাতের আলো,
যেমনি এ কোমলতা, অরণ্যের শ্যামলতা,
তেমনি তাহারে বাসি ভালো।
যেমন সুন্দর সন্ধ্যা, যেমন রজনীগন্ধা,
শুকতারা আকাশের ধারে,
যেমন সে অকলুষা শিশির-নির্মলা উষা
তেমনি সুন্দর হেরি তারে।
যেমন বৃষ্টির জল, যেমন আকাশতল,
সুখসুপ্তি যেমন নিশার,
যেমন তটিনীনীর, বটচ্ছায়া অটবীর
তেমনি সে মোর আপনার।
যেমন নয়ন ভরি অশ্রুজল পড়ে ঝরি
তেমনি সহজ মোর গীতি;
যেমন রয়েছে প্রাণ ব্যাপ্ত করি মর্মস্থান
তেমনি রয়েছে তার প্রীতি।

১৬ চৈত্র ১৩০২

সামান্য লোক

সন্ধ্যাবেলা লাঠি কাঁখে বোঝা বহি শিরে
নদীতীরে পল্লীবাসী ঘরে যায় ফিরে।
শত শতাব্দীর পরে যদি কোনোমতে
মন্ত্রবলে, অতীতের মৃত্যুরাজ্য হতে
এই চাষী দেখা দেয় হয়ে মূর্তিমান
এই লাঠি কাঁখে লয়ে, বিস্মিত নয়ান,
চারি দিকে ঘিরি তারে অসীম জনতা
কাড়াকাড়ি করি লবে তার প্রতি কথা।
তার সুখদুঃখ যত, তার প্রেম স্নেহ,
তার পাড়াপ্রতিবেশী, তার নিজ গেহ,
তার খেত, তার গোরু, তার চাষবাস,
শুনে শুনে কিছুতেই মিটিবে না আশ।
আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম
সেদিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম।

১৭ চৈত্র ১৩০২

প্রভাত

নির্মল তরুণ উষা, শীতল সমীর,
শিহরি শিহরি উঠে শান্ত নদীনীর।
এখনো নামে নি জলে রাজহাঁসগুলি,
এখনো ছাড়ে নি নৌকা সাদা পাল তুলি।
এখনো গ্রামের বধূ আসে নাই ঘাটে,
চাষী নাহি চলে পথে, গোরু নাই মাঠে।
আমি শুধু একা বসি মুক্ত বাতায়নে
তপ্ত ভাল পাতিয়াছি উদার গগনে।
বাতাস সোহাগস্পর্শ বুলাইছে কেশে,
প্রসন্ন কিরণখানি মুখে পড়ে এসে।
পাখির আনন্দগান দশ দিক হতে
দুলাইছে নীলাকাশ অমৃতের স্রোতে।
ধন্য আমি হেরিতেছি আকাশের আলো,
ধন্য আমি জগতেরে বাসিয়াছি ভালো।

১১ চৈত্র ১৩০২

দুর্লভ জন্ম

এক দিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ,
পড়িবে নয়ন-'পরে অন্তিম নিমেষ।
পরদিনে এইমতো পোহাইবে রাত,
জাগ্রত জগৎ-'পরে জাগিবে প্রভাত।
কলরবে চলিবেক সংসারের খেলা,
সুখে দুঃখে ঘরে ঘরে বহি যাবে বেলা।
সে কথা স্মরণ করি নিখিলের পানে
আমি আজি চেয়ে আছি উৎসুক নয়ানে।
যাহা-কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ ব'লে আজি মনে হয়।
দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।
যা পাই নি তাও থাক্, যা পেয়েছি তাও,
তুচ্ছ ব'লে যা চাই নি তাই মোরে দাও।

১৮ চৈত্র ১৩০২

খেয়া

খেয়ানৌকা পারাপার করে নদীস্রোতে,
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।
দুই তীরে দুই গ্রাম আছে জানাশোনা,
সকাল হইতে সন্ধ্যা করে আনাগোনা।
পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব কত সর্বনাশ,
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস,
রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে।
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা,
উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা।
শুধু হেথা দুই তীরে—কে বা জানে নাম-
দোঁহা-পানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে,
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।

১৮ চৈত্র ১৩০২

কর্ম

ভৃত্যের না পাই দেখা প্রাতে।
দুয়ার রয়েছে খোলা, স্নানজল নাই তোলা,
মূর্খাধম আসে নাই রাতে।
মোর ধৌত বস্ত্রখানি কোথা আছে নাহি জানি,
কোথা আহারের আয়োজন,
বাজিয়া যেতেছে ঘড়ি, বসে আছি রাগ করি—
দেখা পেলে করিব শাসন।
বেলা হলে অবশেষে প্রণাম করিল এসে,
দাঁড়াইল করি করজোড়,
আমি তারে রোষভরে কহিলাম, "দূর হ রে,
দেখিতে চাহি নে মুখ তোর।"
শুনিয়া মূঢ়ের মতো ক্ষণকাল বাক্যহত
মুখে মোর রহিল সে চেয়ে,
কহিল গদ্‌গদস্বরে, "কালি রাত্রি দ্বিপ্রহরে
মারা গেছে মোর ছোটো মেয়ে।"
এত কহি ত্বরা করি গামোছাটি কাঁধে ধরি
নিত্যকাজে গেল সে একাকী।
প্রতিদিবসের মতো ঘষা মাজা মোছা কত,
কোনো কর্ম রহিল না বাকি।

১৮ চৈত্র ১৩০২

বনে ও রাজ্যে

সারাদিন কাটাইয়া সিংহাসন-'পরে
সন্ধ্যায় পশিলা রাম শয়নের ঘরে।
শয্যার আধেক অংশ শূন্য বহুকাল,
তারি 'পরে রাখিলেন পরিশ্রান্ত ভাল।
দেবশূন্য দেবালয়ে ভক্তের মতন
বসিলেন ভূমি-'পরে সজল নয়ন,
কহিলেন নতজানু কাতর নিশ্বাসে,
যতদিন দীনহীন ছিনু বনবাসে
নাহি ছিল স্বর্ণমণি মাণিক্যমুকুতা,
তুমি সদা ছিলে লক্ষ্মী প্রত্যক্ষ দেবতা।
আজি আমি রাজ্যেশ্বর, তুমি নাই আর,
আছে স্বর্ণমাণিক্যের প্রতিমা তোমার।
নিত্যসুখ দীনবেশে বনে গেল ফিরে,
স্বর্ণময়ী চিরব্যথা রাজার মন্দিরে।

১৯ চৈত্র ১৩০২

সভ্যতার প্রতি

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা। হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবার-ধান্যের মুষ্টি, বল্কল বসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণপিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব—
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,
পরানে স্পর্শিতে চাই—ছিঁড়িয়া বন্ধন—
অনন্ত এ জগতের হৃদয়-স্পন্দন।

১৯ চৈত্র ১৩০২

বন

শ্যামল সুন্দর সৌম্য, হে অরণ্যভূমি,
মানবের পুরাতন বাসগৃহ তুমি।
নিশ্চল নির্জীব নহ সৌধের মতন—
তোমার মুখশ্রীখানি নিত্যই নূতন
প্রাণে প্রেমে ভাবে অর্থে সজীব সচল।
তুমি দাও ছায়াখানি, দাও ফুল ফল,
দাও বস্ত্র দাও শয্যা, দাও স্বাধীনতা;
নিশিদিন মর্মরিয়া কহ কত কথা
অজানা ভাষার মন্ত্র; বিচিত্র সংগীতে
গাও জাগরণ-গাথা; গভীর নিশীথে
পাতি দাও নিস্তব্ধতা অঞ্চলের মতো
জননী-বক্ষের; বিচিত্র হিল্লোলে কত
খেলা কর শিশুসনে; বৃদ্ধের সহিত
কহ সনাতন বাণী বচন-অতীত।

১৯ চৈত্র ১৩০২

তপোবন

মনশ্চক্ষে হেরি যবে ভারত প্রাচীন—
পূরব পশ্চিম হতে উত্তর দক্ষিণ
মহারণ্য দেখা দেয় মহাচ্ছায়া লয়ে।
রাজা রাজ্য-অভিমান রাখি লোকালয়ে
অশ্বরথ দূরে বাঁধি যায় নতশিরে
গুরুর মন্ত্রণা লাগি—স্রোতস্বিনীতীরে
মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে, শিষ্যগণ
বিরলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন
প্রশান্ত প্রভাতবায়ে, ঋষিকন্যাদলে
পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বল্কলে
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।
প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা পক্ক কেশজালে
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে।

১৯ চৈত্র ১৩০২

প্রাচীন ভারত

দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিরাট,
অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাঞ্চী উদ্ধত-ললাট;
স্পর্ধিছে অম্বরতল অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে,
অশ্বের হ্রেষায় আর হস্তীর বৃংহিতে,
অসির ঝঞ্ঝনা আর ধনুর টংকারে,
বীণার সংগীত আর নূপুর-ঝংকারে,
বন্দীর বন্দনারবে, উৎসব-উচ্ছ্বাসে,
উন্মাদ শঙ্খের গর্জে, বিজয়-উল্লাসে,
রথের ঘর্ঘরমন্দ্রে, পথের কল্লোলে
নিয়ত ধ্বনিত ধ্মাত কর্মকলরোলে।
ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার,
নির্বাক গম্ভীর শান্ত সংযত উদার।
হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা।

১ শ্রাবণ ১৩০৩

ঋতুসংহার

হে কবীন্দ্র কালিদাস, কল্পকুঞ্জবনে
নিভৃতে বসিয়া আছ প্রেয়সীর সনে
যৌবনের যৌবরাজ্য-সিংহাসন-'পরে।
মরকত পাদপীঠ বহনের তরে
রয়েছে সমস্ত ধরা, সমস্ত গগন
স্বর্ণ রাজছত্র ঊর্ধ্বে করেছে ধারণ
শুধু তোমাদের 'পরে; ছয় সেবাদাসী
ছয় ঋতু ফিরে ফিরে নৃত্য করে আসি;
নব নব পাত্র ভরি ঢালি দেয় তারা
নব নব বর্ণময়ী মদিরার ধারা
তোমাদের তৃষিত যৌবনে; ত্রিভুবন
একখানি অন্তঃপুর, বাসরভবন।
নাই দুঃখ নাই দৈন্য নাই জনপ্রাণী,
তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রানী।

২০ চৈত্র ১৩০২

মেঘদূত

নিমেষে টুটিয়া গেল সে মহাপ্রতাপ।
ঊর্ধ্ব হতে এক দিন দেবতার শাপ
পশিল সে সুখরাজ্যে, বিচ্ছেদের শিখা
করিয়া বহন; মিলনের মরীচিকা,
যৌবনের বিশ্বগ্রাসী মত্ত অহমিকা
মুহূর্তে মিলায়ে গেল মায়া-কুহেলিকা
খররৌদ্রকরে। ছয় ঋতু সহচরী
ফেলিয়া চামরছত্র, সভাভঙ্গ করি
সহসা তুলিয়া দিল রঙ্গ-যবনিকা—
সহসা খুলিয়া গেল, যেন চিত্রে লিখা,
আষাঢ়ের অশ্রুপ্লুত সুন্দর ভুবন।
দেখা দিল চারি দিকে পর্বত কানন
নগর নগরী গ্রাম; বিশ্বসভা-মাঝে
তোমার বিরহবীণা সকরুণ বাজে।

২১ চৈত্র ১৩০২

দিদি

নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা
পশ্চিমি মজুর। তাহাদেরি ছোটো মেয়ে
ঘাটে করে আনাগোনা; কত ঘষামাজা
ঘটি বাটি থালা লয়ে, আসে ধেয়ে ধেয়ে
দিবসে শতেক বার; পিত্তল কঙ্কণ
পিতলের থালি-'পরে বাজে ঠন্ ঠন্;
বড়ো ব্যস্ত সারাদিন, তারি ছোটো ভাই,
নেড়ামাথা, কাদামাখা, গায়ে বস্ত্র নাই,
পোষা প্রাণীটির মতো পিছে পিছে এসে
বসি থাকে উচ্চ পাড়ে দিদির আদেশে
স্থির ধৈর্যভরে। ভরা ঘট লয়ে মাথে
বাম কক্ষে থালি, যায় বালা ডান হাতে
ধরি শিশুকর; জননীর প্রতিনিধি,
কর্মভারে অবনত অতি ছোটো দিদি।

২১ চৈত্র ১৩০২

পরিচয়

একদিন দেখিলাম উলঙ্গ সে ছেলে
ধূলি-'পরে বসে আছে পা দুখানি মেলে।
ঘাটে বসি মাটি ঢেলা লইয়া কুড়ায়ে
দিদি মাজিতেছে ঘটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে।
অদূরে কোমল-লোম ছাগবৎস ধীরে
চরিয়া ফিরিতেছিল নদী তীরে তীরে।
সহসা সে কাছে আসি থাকিয়া থাকিয়া
বালকের মুখ চেয়ে উঠিল ডাকিয়া।
বালক চমকি কাঁপি কেঁদে ওঠে ত্রাসে,
দিদি ঘাটে ঘটি ফেলি ছুটে চলে আসে।
এক কক্ষে ভাই লয়ে অন্য কক্ষে ছাগ
দুজনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ।
পশুশিশু, নরশিশু—দিদি মাঝে প'ড়ে
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয়-ডোরে।

২১ চৈত্র ১৩০২

অনন্ত পথে

বাতায়নে বসি ওরে হেরি প্রতিদিন
ছোটো মেয়ে খেলাহীন, চপলতাহীন,
গম্ভীর কর্তব্যরত, তৎপর-চরণে
আসে যায় নিত্যকাজে; অশ্রুভরা মনে
ওর মুখপানে চেয়ে হাসি স্নেহভরে।
আজি আমি তরী খুলি যাব দেশান্তরে;
বালিকাও যাবে কবে কর্ম-অবসানে
আপন স্বদেশে; ও আমারে নাহি জানে,
আমিও জানি নে ওরে; দেখিবারে চাহি
কোথা ওর হবে শেষ জীবসূত্র বাহি।
কোন্ অজানিত গ্রামে, কোন্ দূরদেশে
কার ঘরে বধূ হবে, মাতা হবে শেষে,
তার পরে সব শেষ—তারো পরে, হায়,
এই মেয়েটির পথ চলেছে কোথায়।

২১ চৈত্র ১৩০২

ক্ষণমিলন

পরম আত্মীয় বলে যারে মনে মানি
তারে আমি কতদিন কতটুকু জানি।
অসীম কালের মাঝে তিলেক মিলনে
পরশে জীবন তার আমার জীবনে।
যতটুকু লেশমাত্র চিনি দুজনায়,
তাহার অনন্তগুণ চিনি নাকো হায়।
দুজনের এক জন এক দিন যবে
বারেক ফিরাবে মুখ, এ নিখিল ভবে
আর কভু ফিরিবে না মুখামুখি পথে,
কে কার পাইবে সাড়া অনন্ত জগতে।
এ ক্ষণমিলনে তবে, ওগো মনোহর,
তোমারে হেরিনু কেন এমন সুন্দর।
মুহূর্ত আলোকে কেন, হে অন্তরতম,
তোমারে চিনিনু চিরপরিচিত মম?

২২ চৈত্র ১৩০২

প্রেম

নিবিড় তিমির নিশা অসীম কান্তার,
লক্ষ দিকে লক্ষ জন হইতেছে পার।
অন্ধকারে অভিসার, কোন্ পথপানে
কার তরে, পান্থ তাহা আপনি না জানে।
শুধু মনে হয় চিরজীবনের সুখ
এখনি দিবেক দেখা লয়ে হাসিমুখ।
কত স্পর্শ কত গন্ধ কত শব্দ গান,
কাছ দিয়ে চলে যায় শিহরিয়া প্রাণ।
দৈবযোগে ঝলি উঠে বিদ্যুতের আলো,
যারেই দেখিতে পাই তারে বাসি ভালো;
তাহারে ডাকিয়া বলি—ধন্য এ জীবন,
তোমারি লাগিয়া মোর এতেক ভ্রমণ।
অন্ধকারে আর সবে আসে যায় কাছে,
জানিতে পারি নে তারা আছে কি না আছে।

২২ চৈত্র ১৩০২

পুঁটু

চৈত্রের মধ্যাহ্নবেলা কাটিতে না চাহে।
তৃষাতুরা বসুন্ধরা দিবসের দাহে।
হেনকালে শুনিলাম বাহিরে কোথায়
কে ডাকিল দূর হতে, "পুঁটুরানী আয়।"

জনশূন্য নদীতটে তপ্ত দ্বিপ্রহরে
কৌতূহল জাগি উঠে স্নেহকণ্ঠস্বরে।
গ্রন্থখানি বন্ধ করি উঠিলাম ধীরে,
দুয়ার করিয়া ফাঁক দেখিনু বাহিরে।
মহিষ বৃহৎকায় কাদামাখা গায়ে
স্নিগ্ধনেত্রে নদীতীরে রয়েছে দাঁড়ায়ে।
যুবক নামিয়া জলে ডাকিছে তাহায়
স্নান করাবার তরে, "পুটুরানী আয়।"
হেরি সে যুবারে, হেরি পুটুরানী তারি
মিশিল কৌতুকে মোর স্নিগ্ধ সুধাবারি।

২৩ চৈত্র ১৩০২

হৃদয়ধর্ম

হৃদয় পাষাণভেদী নির্ঝরের প্রায়,
জড়জন্তু সবাপানে নামিবারে চায়।
মাঝে মাঝে ভেদচিহ্ন আছে যত যার
সে চাহে করিতে মগ্ন লুপ্ত একাকার।
মধ্যাদিনে দগ্ধ দেহে ঝাঁপ দিয়ে নীরে
মা বলে সে ডেকে ওঠে স্নিগ্ধ তটিনীরে।
যে চাঁদ ঘরের মাঝে হেসে দেয় উঁকি,
সে যেন ঘরেরই মেয়ে শিশু সুধামুখী।
যে-সকল তরুলতা রচি উপবন
গৃহপার্শ্বে বাড়িয়াছে, তারা ভাইবোন।
যে পশুরে জন্ম হতে আপনার জানি,
হৃদয় আপনি তারে ডাকে পুটুরানী।
বুদ্ধি শুনে হেসে ওঠে, বলে, কী মূঢ়তা।
হৃদয় লজ্জায় ঢাকে হৃদয়ের কথা।

১ শ্রাবণ ১৩০৩

মিলনদৃশ্য

হেসো না হেসো না তুমি বুদ্ধি-অভিমানী,
একবার মনে আনো, ওগো ভেদজ্ঞানী,
সে মহাদিনের কথা, যবে শকুন্তলা
বিদায় লইতেছিল স্বজনবৎসলা
জন্মতপোবন হতে— সখা সহকার,
লতাভগ্নী মাধবিকা, পশু-পরিবার,
মাতৃহারা মৃগশিশু, মৃগী গর্ভবতী,
দাঁড়াইল চারি দিকে—স্নেহের মিনতি

গুঞ্জরি উঠিল কাঁদি পল্লব-মর্মরে,
ছলছল মালিনীর জলকলস্বরে;
ধ্বনিল তাহারি মাঝে বৃদ্ধ তপস্বীর
মঙ্গলবিদায়মন্ত্র গদ্‌গদ-গম্ভীর।
তরুলতা পশুপক্ষী নদনদীবন
নরনারী সবে মিলি করুণ মিলন।

২ শ্রাবণ ১৩০৩

দুই বন্ধু

মূঢ় পশু ভাষাহীন নির্বাক হৃদয়,
তার সাথে মানবের কোথা পরিচয়!
কোন্ আদি স্বর্গলোকে সৃষ্টির প্রভাতে
হৃদয়ে হৃদয়ে যেন নিত্য যাতায়াতে
পথচিহ্ন পড়ে গেছে, আজো চিরদিনে
লুপ্ত হয় নাই তাহা, তাই দোঁহে চিনে।
সেদিনের আত্মীয়তা গেছে বহুদূরে;
তবুও সহসা কোন্ কথাহীন সুরে
পরানে জাগিয়া উঠে ক্ষীণ পূর্বস্মৃতি,
অন্তরে উচ্ছলি উঠে সুধাময়ী প্রীতি,
মুগ্ধ মূঢ় স্নিগ্ধ চোখে পশু চাহে মুখে—
মানুষ তাহারে হেরে স্নেহের কৌতুকে।
যেন দুই ছদ্মবেশে দু-বন্ধুর মেলা—
তার পরে দুই জীবে অপরূপ খেলা।

২ শ্রাবণ ১৩০৩

সঙ্গী

আরেক দিনের কথা পড়ি গেল মনে।
একদা মাঠের ধারে শ্যাম তৃণাসনে
একটি বেদের মেয়ে অপরাহ্নবেলা
কবরী বাঁধিতেছিল বসিয়া একেলা।
পালিত কুকুরশিশু আসিয়া পিছনে
কেশের চাঞ্চল্য হেরি খেলা ভাবি মনে
লাফায়ে লাফায়ে উচ্চে করিয়া চীৎকার
দংশিতে লাগিল তার বেণী বারংবার।
বালিকা ভর্ৎসিল তারে গ্রীবাটি নাড়িয়া,
খেলার উৎসাহ তাহে উঠিল বাড়িয়া।
বালিকা মারিল তারে তুলিয়া তর্জনী,
দ্বিগুণ উঠিল মেতে খেলা মনে গণি।

তখন হাসিয়া উঠি লয়ে বক্ষ-'পরে
বালিকা ব্যথিল তারে আদরে আদরে।

২৩ চৈত্র ১৩০২

সতী

সতীলোকে বসি আছে কত পতিব্রতা
পুরাণে উজ্জ্বল আছে যাঁহাদের কথা।
আরো আছে শত লক্ষ অজ্ঞাত-নামিনী
খ্যাতিহীনা কীর্তিহীনা কত-না কামিনী—
কেহ ছিল রাজসৌধে কেহ পর্ণঘরে,
কেহ ছিল সোহাগিনী কেহ অনাদরে;
শুধু প্রীতি ঢালি দিয়া মুছি লয়ে নাম
চলিয়া এসেছে তারা ছাড়ি মর্ত্যধাম।
তারি মাঝে বসি আছে পতিতা রমণী
মর্ত্যে কলঙ্কিনী, স্বর্গে সতী-শিরোমণি।
হেরি তারে সতীগর্বে গরবিনী যত
সাধ্বীগণ লাজে শির করে অবনত।
তুমি কী জানিবে বার্তা, অন্তর্যামী যিনি
তিনিই জানেন তার সতীত্বকাহিনী।

২৪ চৈত্র ১৩০২

স্নেহদৃশ্য

বয়স বিংশতি হবে, শীর্ণ তনু তার
বহু বরষের রোগে অস্থিচর্মসার।
হেরি তার উদাসীন হাসিহীন মুখ
মনে হয় সংসারের লেশমাত্র সুখ
পারে না সে কোনোমতে করিতে শোষণ
দিয়ে তার সর্বদেহ সর্বপ্রাণমন।
স্বল্পপ্রাণ শীর্ণ দীর্ঘ জীর্ণ দেহভার
শিশুসম কক্ষে বহি জননী তাহার
আশাহীন দৃঢ়ধৈর্য মৌনম্লানমুখে
প্রতিদিন লয়ে আসে পথের সম্মুখে।
আসে যায় রেলগাড়ি, ধায় লোকজন—
সে চাঞ্চল্যে মুমূর্ষুর অনাসক্ত মন
যদি কিছু ফিরে চায় জগতের পানে,
এইটুকু আশা ধরি মা তাহারে আনে।

২৪ চৈত্র ১৩০২

করুণা

অপরাহ্ণে ধূলিচ্ছন্ন নগরীর পথে
বিষম লোকের ভিড়; কর্মশালা হতে
ফিরে চলিয়াছে ঘরে পরিশ্রান্ত জন
বাঁধমুক্ত তটিনীর স্রোতের মতন।
ঊর্ধ্বশ্বাসে রথ-অশ্ব চলিয়াছে ধেয়ে
ক্ষুধা আর সারথির কষাঘাত খেয়ে।
হেনকালে দোকানির খেলামুগ্ধ ছেলে
কাটা ঘুড়ি ধরিবারে চলে বাহু মেলে।
অকস্মাৎ শকটের তলে গেল পড়ি,
পাষাণ-কঠিন পথ উঠিল শিহরি।
সহসা উঠিল শূন্যে বিলাপ কাহার,
স্বর্গে যেন দয়াদেবী করে হাহাকার।
ঊর্ধ্বপানে চেয়ে দেখি স্খলিতবসনা
লুটায়ে লুটায়ে ভূমে কাঁদে বারাঙ্গনা।

২৪ চৈত্র ১৩০২

পদ্মা

হে পদ্মা আমার।
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার।
এক দিন জনহীন তোমার পুলিনে,
গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে,
সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য অস্তমান
তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরান।
অবসান সন্ধ্যালোকে আছিলে সেদিন
নতমুখী বধূসম শান্ত বাক্যহীন;
সন্ধ্যাতারা একাকিনী সস্নেহ কৌতুকে
চেয়ে ছিল তোমাপানে হাসিভরা মুখে।
সেদিনের পর হতে, হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার।

নানা কর্মে মোর কাছে আসে নানা জন,
নাহি জানে আমাদের পরান-বন্ধন,
নাহি জানে কেন আসি সন্ধ্যা-অভিসারে
বালুকা-শয়ন-পাতা নির্জন এ পারে।
যখন মুখর তব চক্রবাকদল
সুপ্ত থাকে জলাশয়ে ছাড়ি কোলাহল;

যখন নিস্তব্ধ গ্রামে তব পূর্বতীরে
রুদ্ধ হয়ে যায় দ্বার কুটীরে কুটীরে,
তুমি কোন্ গান কর আমি কোন্ গান
দুই তীরে কেহ তার পায় নি সন্ধান।
নিভৃতে শরতে গ্রীষ্মে শীতে বরষায়
শত বার দেখাশুনা তোমায় আমায়।

কতদিন ভাবিয়াছি বসি তব তীরে
পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে,
যদি কোনো দূরতর জন্মভূমি হতে
তরী বেয়ে ভেসে আসি তব খরস্রোতে—
কত গ্রাম কত মাঠ কত ঝাউঝাড়
কত বালুচর কত ভেঙে-পড়া পাড়
পার হয়ে এই ঠাঁই আসিব যখন
জেগে উঠিবে না কোনো গভীর চেতন?
জন্মান্তরে শত বার যে নির্জন তীরে
গোপনে হৃদয় মোর আসিত বাহিরে,
আর বার সেই তীরে সে সন্ধ্যাবেলায়
হবে না কি দেখাশুনা তোমায় আমায়?

২৫ চৈত্র ১৩০২

স্নেহগ্রাস

অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি।
রেখো না বসায়ে দ্বারে জাগ্রত প্রহরী
হে জননী, আপনার স্নেহ-কারাগারে
সন্তানেরে চিরজন্ম বন্দী রাখিবারে।
বেষ্টন করিয়া তারে আগ্রহ-পরশে,
জীর্ণ করি দিয়া তারে লালনের রসে,
মনুষ্যত্ব-স্বাধীনতা করিয়া শোষণ
আপন ক্ষুধিত চিত্ত করিবে পোষণ?
দীর্ঘ গর্ভবাস হতে জন্ম দিলে যার
স্নেহগর্ভে গ্রাসিয়া কি রাখিবে আবার?
চলিবে সে এ সংসারে তব পিছু পিছু?
সে কি শুধু অংশ তব, আর নহে কিছু?
নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্ব-দেবতার,
সন্তান নহে গো মাতঃ, সম্পত্তি তোমার।

২৫ চৈত্র ১৩০২

বঙ্গমাতা

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।
দেশদেশান্তর-মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ-সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ কর নি।

২৬ চৈত্র ১৩০২

দুই উপমা

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে;
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে,
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোনোমতে;
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ-'পরে
তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতায় চরণ না সরে।

২৬ চৈত্র ১৩০২

অভিমান

কারে দিব দোষ বন্ধু, কারে দিব দোষ!
বৃথা কর আস্ফালন, বৃথা কর রোষ।
যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,
কেহ কভু তাহাদের করে নি সম্মান।
যতই কাগজে কাঁদি, যত দিই গালি,
কালামুখে পড়ে তত কলঙ্কের কালি।
যে তোমারে অপমান করে অহর্নিশ
তারি কাছে তারি 'পরে তোমার নালিশ!

নিজের বিচার যদি নাই নিজ হাতে,
পদাঘাত খেয়ে যদি না পার ফিরাতে,
তবে ঘরে নতশিরে চুপ করে থাক্,
সাপ্তাহিকে দিগ্বিদিকে বাজাস নে ঢাক।
এক দিকে অসি আর অবজ্ঞা অটল,
অন্য দিকে মসী আর শুধু অশ্রুজল।

২৬ চৈত্র ১৩০২

পর-বেশ

কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ।
ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুর্গুণ লাজ।
পরবস্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান
তোমারেই করিছে না নিত্য অপমান?
বলিছে না, "ওরে দীন, যত্নে মোরে ধরো,
তোমার চর্মের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠতর?"
চিত্তে যদি নাহি থাকে আপন সম্মান,
পৃষ্ঠে তবে কালো বস্ত্র কলঙ্ক-নিশান।
ওই তুচ্ছ টুপিখানা চড়ি তব শিরে
ধিক্কার দিতেছে না কি তব স্বজাতিরে?
বলিতেছে, যে মস্তক আছে মোর পায়
হীনতা ঘুচেছে তার আমারি কৃপায়।
সর্বাঙ্গে লাঞ্ছনা বহি এ কী অহংকার।
ওর কাছে জীর্ণ চীর জেনো অলংকার।

২৬ চৈত্র ১৩০২

সমাপ্তি

যদিও বসন্ত গেছে তবু বারে বারে
সাধ যায় বসন্তের গান গাহিবারে।
সহসা পঞ্চম রাগ আপনি সে বাজে,
তখনি থামাতে চাই শিহরিয়া লাজে।
যত না মধুর হোক মধুরসাবেশ
যেখানে তাহার সীমা সেথা করো শেষ।
যেখানে আপনি থামে যাক থেমে গীতি,
তার পরে থাক্ তার পরিপূর্ণ স্মৃতি।
পূর্ণতারে পূর্ণতর করিবারে, হায়,
টানিয়া কোরো না ছিন্ন বৃথা দুরাশায়।

নিঃশব্দে দিনের অন্তে আসে অন্ধকার,
তেমনি হউক শেষ শেষ যা হবার।
আসুক বিষাদভরা শান্ত সান্ত্বনায়
মধুর মিলন-অন্তে সুন্দর বিদায়।

২৭ চৈত্র ১৩০২

ধরাতল

ছোটো কথা ছোটো গীত আজি মনে আসে।
চোখে পড়ে যাহা-কিছু হেরি চারি পাশে।
আমি যেন চলিয়াছি বাহিয়া তরণী,
কূলে কূলে দেখা যায় শ্যামল ধরণী।
সবি বলে, যাই যাই, নিমেষে নিমেষে—
ক্ষণকাল দেখি ব'লে দেখি ভালোবেসে।
তীর হতে দুঃখ সুখ দুই ভাইবোনে
মোর মুখপানে চায় করুণ নয়নে।
ছায়াময় গ্রামগুলি দেখা যায় তীরে,
মনে ভাবি, কত প্রেম আছে তারে ঘিরে।
যবে চেয়ে চেয়ে দেখি উৎসুক নয়ানে
আমার পরান হতে ধরার পরানে—
ভালো মন্দ দুঃখ সুখ অন্ধকার আলো
মনে হয়, সব নিয়ে এ ধরণী ভালো।

২৭ চৈত্র ১৩০২

তত্ত্ব ও সৌন্দর্য

শুনিয়াছি নিম্নে তব, হে বিশ্বপাথার,
নাহি অন্ত মহামূল্য মণিমুকুতার।
নিশিদিন দেশে দেশে পণ্ডিত ডুবারী
রত রহিয়াছে কত অন্বেষণে তারি।
তাহে মোর নাহি লোভ, মহাপারাবার।
যে আলোক জ্বলিতেছে উপরে তোমার,
যে রহস্য দুলিতেছে তব বক্ষতলে,
যে মহিমা প্রসারিত তব নীল জলে,
যে সংগীত উঠে তব নিয়ত আঘাতে,
যে বিচিত্র লীলা তব মহানৃত্যে মাতে,
এ জগতে কভু তার অন্ত যদি জানি,
চিরদিনে কভু তাহে শ্রান্তি যদি মানি,
তোমার অতল-মাঝে ডুবিব তখন,
যেথায় রতন আছে অথবা মরণ।

২৭ চৈত্র ১৩০২

তত্ত্বজ্ঞানহীন

যার খুশি রুদ্ধচক্ষে করো বসি ধ্যান,
বিশ্ব সত্য কিংবা ফাঁকি লভো সেই জ্ঞান।
আমি ততক্ষণ বসি তৃপ্তিহীন চোখে
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে।

২৭ চৈত্র ১৩০২

মানসী

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে। বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার 'পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
কত বর্ণ কত গন্ধ ভূষণ কত-না,
সিন্ধু হতে মুক্তা আসে খনি হতে সোনা,
বসন্তের বন হতে আসে পুষ্পভার,
চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তার।
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন।
পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা,
অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।

২৮ চৈত্র ১৩০২

নারী

তুমি এ মনের সৃষ্টি, তাই মনোমাঝে
এমন সহজে তব প্রতিমা বিরাজে।
যখন তোমারে হেরি জগতের তীরে
মনে হয় মন হতে এসেছ বাহিরে।
যখন তোমারে দেখি মনোমাঝখানে
মনে হয় জন্ম-জন্ম আছ এ পরানে।
মানসীরূপিণী তুমি, তাই দিশে দিশে
সকল সৌন্দর্যসাথে যাও মিলে মিশে।
চন্দ্রে তব মুখশোভা, মুখে চন্দ্রোদয়,
নিখিলের সাথে তব নিত্য বিনিময়।

মনের অনন্ত তৃষ্ণা মরে বিশ্ব ঘুরি
মিশায় তোমার সাথে নিখিল মাধুরী।
তার পরে মনগড়া দেবতারে, মন
ইহকাল পরকাল করে সমর্পণ।

২৮ চৈত্র ১৩০২

প্রিয়া

শত বার ধিক্ আজি আমারে, সুন্দরী,
তোমারে হেরিতে চাহি এত ক্ষুদ্র করি।
তোমার মহিমাজ্যোতি তব মূর্তি হতে
আমার অন্তরে পড়ি ছড়ায় জগতে।
যখন তোমার 'পরে পড়ে নি নয়ন
জগৎ-লক্ষ্মীর দেখা পাই নি তখন।
স্বর্গের অঞ্জন তুমি মাখাইলে চোখে,
তুমি মোরে রেখে গেছ অনন্ত এ লোকে।
এ নীল আকাশ এত লাগিত কি ভালো,
যদি না পড়িত মনে তব মুখ-আলো।
অপরূপ মায়াবলে তব হাসি-গান
বিশ্ব-মাঝে লভিয়াছে শত শত প্রাণ।
তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে,
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।

২৮ চৈত্র ১৩০২

ধ্যান

যত ভালোবাসি, যত হেরি বড়ো ক'রে
তত প্রিয়তমে, আমি সত্য হেরি তোরে।
যত অল্প করি তোরে, তত অল্প জানি,
কখনো হারায়ে ফেলি, কভু মনে আনি।
আজি এ বসন্ত-দিনে বিকশিত মন
হেরিতেছি আমি এক অপূর্ব স্বপন—
যেন এ জগৎ নাহি, কিছু নাহি আর,
যেন শুধু আছে এক মহাপারাবার।
নাহি দিন নাহি রাত্রি নাহি দণ্ড পল,
প্রলয়ের জলরাশি স্তব্ধ অচঞ্চল।
যেন তারি মাঝখানে পূর্ণ বিকাশিয়া
একমাত্র পদ্ম তুমি রয়েছ ভাসিয়া।
নিত্যকাল মহাপ্রেমে বসি বিশ্বভূপ
তোমা-মাঝে হেরিছেন আত্মপ্রতিরূপ।

২৮ চৈত্র ১৩০২

মৌন

যাহা-কিছু বলি আজি সব বৃথা হয়,
মন বলে মাথা নাড়ি—এ নয়, এ নয়।
যে-কথায় প্রাণ মোর পরিপূর্ণতম
সে-কথা বাজে না কেন এ বীণায় মম।
সে শুধু ভরিয়া উঠি অশ্রুর আবেগে
হৃদয়-আকাশ ঘিরে ঘনঘোর মেঘে;
মাঝে মাঝে বিদ্যুতের বিদীর্ণ রেখায়
অন্তর করিয়া ছিন্ন কী দেখাতে চায়।
মৌন মূক মূঢ়-সম ঘনায়ে আঁধারে
সহসা নিশীথরাত্রে কাঁদে শত ধারে।
বাক্যভারে রুদ্ধকণ্ঠ, রে স্তম্ভিত প্রাণ,
কোথায় হারায়ে এলি তোর যত গান।
বাঁশি যেন নাই, বৃথা নিশ্বাস কেবল।
রাগিণীর পরিবর্তে শুধু অশ্রুজল।

২৯ চৈত্র ১৩০২

অসময়

বৃথা চেষ্টা রাখি দাও। স্তব্ধ নীরবতা
আপনি গড়িবে তুলি আপনার কথা।
আজি সে রয়েছে ধ্যানে—এ হৃদয় মম
তপোভঙ্গ-ভয়ভীত তপোবন-সম।
এমন সময়ে হেথা বৃথা তুমি প্রিয়া
বসন্তকুসুমমালা এসেছ পরিয়া;
এনেছ অঞ্চল ভরি যৌবনের স্মৃতি—
নিভৃত নিকুঞ্জে আজি নাই কোনো গীতি।
শুধু এ মর্মরহীন বনপথ-'পরি
তোমারি মঞ্জীর দুটি উঠিছে গুঞ্জরি।
প্রিয়তমে, এ কাননে এলে অসময়ে,
কালিকার গান আজি আছে মৌন হয়ে।
তোমারে হেরিয়া তারা হতেছে ব্যাকুল,
অকালে ফুটিতে চাহে সকল মুকুল।

২৯ চৈত্র ১৩০২

গান

তুমি পড়িতেছ হেসে তরঙ্গের মতো এসে
হৃদয়ে আমার।
যৌবনসমুদ্র-মাঝে কোন্ পূর্ণিমায় আজি
এসেছে জোয়ার।

উচ্ছল পাগল নীরে তালে তালে ফিরে ফিরে
এ মোর নির্জন তীরে কী খেলা তোমার
মোর সর্ব বক্ষ জুড়ে কত নৃত্যে কত সুরে
এসো কাছে যাও দূরে শত লক্ষ বার।
তুমি পড়িতেছ হেসে তরঙ্গের মতো এসে
হৃদয়ে আমার।

জাগরণ-সম তুমি আমার ললাট চুমি
উদিছ নয়নে।
সুষুপ্তির প্রান্ততীরে দেখা দাও ধীরে ধীরে
নবীন কিরণে।
দেখিতে দেখিতে শেষে সকল হৃদয়ে এসে
দাঁড়াও আকুল কেশে রাতুল চরণে—
সকল আকাশ টুটে তোমাতে ভরিয়া উঠে;
সকল কানন ফুটে জীবনে যৌবনে।
জাগরণ-সম তুমি আমার ললাট চুমি
উদিছ নয়নে।

কুসুমের মতো শ্বসি পড়িতেছ খসি খসি
মোর বক্ষ-'পরে।
গোপন শিশিরছলে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজলে
প্রাণ সিক্ত করে।
নিঃশব্দ সৌরভরাশি পরানে পশিছে আসি
সুখস্বপ্ন পরকাশি নিভৃত অন্তরে।
পরশ-পুলকে ভোর চোখে আসে ঘুমঘোর,
তোমার চুম্বন মোর সর্বাঙ্গে সঞ্চরে।
কুসুমের মতো শ্বসি পড়িতেছ খসি খসি
মোর বক্ষ-'পরে।

২৯ চৈত্র ১৩০২

শেষ কথা

মাঝে মাঝে মনে হয়, শত কথা-ভারে
হৃদয় পড়েছে যেন নুয়ে একেবারে।
যেন কোন্ ভাব-যজ্ঞ বহু আয়োজনে
চলিতেছে অন্তরের সুদূর সদনে।
অধীর সিন্ধুর মতো কলধ্বনি তার
অতি দূর হতে কানে আসে বারংবার।
মনে হয় কত ছন্দ, কত-না রাগিণী
কত-না আশ্চর্য গাথা, অপূর্ব কাহিনী,

যত কিছু রচিয়াছে যত কবিগণে
সব মিলিতেছে আসি অপূর্ব মিলনে;
এখনি বেদনাভরে ফাটি গিয়া প্রাণ
উচ্ছ্বসি উঠিবে যেন সেই মহাগান।
অবশেষে বুক ফেটে শুধু বলি আসি—
হে চিরসুন্দর, আমি তোরে ভালোবাসি।

৩০ চৈত্র ১৩০২

বর্ষশেষ

নির্মল প্রত্যুষে আজি যত ছিল পাখি
বনে বনে শাখে শাখে উঠিয়াছে ডাকি।
দোয়েল শ্যামার কণ্ঠে আনন্দ-উচ্ছ্বাস,
গেয়ে গেয়ে পাপিয়ার নাহি মিটে আশ।
করুণ মিনতিস্বরে অশ্রান্ত কোকিল
অন্তরের আবেদনে ভরিছে নিখিল।
কেহ নাচে, কেহ গায়, উড়ে মত্তবৎ,
ফিরিয়া পেয়েছে যেন হারানো জগৎ।
পাখিরা জানে না কেহ আজি বর্ষশেষ,
বকবৃদ্ধ-কাছে নাহি শুনে উপদেশ।
যত দিন এ আকাশে এ জীবন আছে,
বরষের শেষ নাহি তাহাদের কাছে।
মানুষ আনন্দহীন নিশিদিন ধরি
আপনারে ভাগ করে শতখানা করি।

৩০ চৈত্র ১৩০২

অভয়

আজি বর্ষশেষদিনে, গুরুমহাশয়,
কারে দেখাইছ বসে অন্তিমের ভয়।
অনন্ত আশ্বাস আজি জাগিছে আকাশে,
অনন্ত জীবনধারা বহিছে বাতাসে,
জগৎ উঠেছে হেসে জাগরণ-সুখে,
ভয় শুধু লেগে আছে তব শুষ্ক মুখে।
দেবতা রাক্ষস নহে মেলি মৃত্যুগ্রাস;
প্রবঞ্চনা করি তুমি দেখাইছ ত্রাস।
বরঞ্চ ঈশ্বরে ভুলি স্বল্প তাহে ক্ষতি,
ভয় ঘোর অবিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি।

তিনি নিজে মৃত্যুকথা ভুলায়ে ভুলায়ে
রেখেছেন আমাদের সংসার-কুলায়ে।
তুমি কে কর্কশ কণ্ঠ তুলিছ ভয়ের।
আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের।

৩০ চৈত্র ১৩০২

অনাবৃষ্টি

শুনেছিনু পুরাকালে মানবীর প্রেমে
দেবতারা স্বর্গ হতে আসিতেন নেমে।
সেকাল গিয়েছে। আজি এই বৃষ্টিহীন
শুষ্কনদী দগ্ধক্ষেত্র বৈশাখের দিন
কাতরে কৃষক-কন্যা অনুনয়-বাণী
কহিতেছে বারংবার— আয় বৃষ্টি হানি।
ব্যাকুল প্রত্যাশাভরে গগনের পানে
চাহিতেছে থেকে থেকে করুণ নয়ানে।
তবু বৃষ্টি নাহি নামে, বাতাস বধির
উড়ায়ে সকল মেঘ ছুটেছে অধীর;
আকাশের সর্বরস রৌদ্র-রসনায়
লেহন করিল সূর্য। কলিযুগে, হায়
দেবতারা বৃদ্ধ আজি। নারীর মিনতি
এখন কেবল খাটে মানবের প্রতি।

২ বৈশাখ ১৩০৩

অজ্ঞাত বিশ্ব

জন্মেছি তোমার মাঝে ক্ষণিকের তরে
অসীম প্রকৃতি। সরল বিশ্বাসভরে
তবু তোরে গৃহ বলে মাতা বলে মানি।
আজ সন্ধ্যাবেলা তোর নখদন্ত হানি
প্রচণ্ড পিশাচীরূপে ছুটিয়া গর্জিয়া
আপনার মাতৃবেশ শূন্যে বিসর্জিয়া
কুটি কুটি ছিন্ন করি, বৈশাখের ঝড়ে
ধেয়ে এলি ভয়ংকরী ধূলিপক্ষ-'পরে,
তৃণসম করিবারে প্রাণ উৎপাটন।
সভয়ে শুধাই আজি, হে মহাভীষণ,
অনন্ত আকাশপথ রুধি চারি ধারে
কে তুমি সহস্রবায়ু ঘিরেছ আমারে।
আমার ক্ষণিক প্রাণ কে এনেছে যাচি।
কোথা মোরে যেতে হবে, কেন আমি আছি।

২ বৈশাখ ১৩০৩

ভয়ের দুরাশা

জননী জননী বলে ডাকি তোরে ত্রাসে,
যদি জননীর স্নেহ মনে তোর আসে
শুনি আর্তস্বর। যদি ব্যাঘ্রিনীর মতো
অকস্মাৎ ভুলে গিয়ে হিংসা লোভ যত
মানবপুত্রেরে কর স্নেহের লেহন।
নখর লুকায়ে ফেলি পরিপূর্ণ স্তন
যদি দাও মুখে তুলি, চিত্রাঙ্কিত বুকে
যদি ঘুমাইতে দাও মাথা রাখি সুখে।
এমনি দুরাশা। আছ তুমি লক্ষ কোটি
গ্রহতারা চন্দ্রসূর্য গগনে প্রকটি
হে মহামহিম। তুলি তব বজ্রমুঠি
তুমি যদি ধর আজি বিকট ভ্রূকুটি,
আমি ক্ষীণ ক্ষুদ্রপ্রাণ কোথা পড়ে আছি,
মা বলিয়া ভুলাইব তোমারে, পিশাচী!

২ বৈশাখ ১৩০৩

ভক্তের প্রতি

সরল সরস স্নিগ্ধ তরুণ হৃদয়,
কী গুণে তোমারে আমি করিয়াছি জয়
তাই ভাবি মনে। উৎফুল্ল উস্তান চোখে
চেয়ে আছ মুখপানে প্রীতির আলোকে
আমারে উজ্জ্বল করি। তারুণ্য তোমার
আপন লাবণ্যখানি লয়ে উপহার
পরায় আমার কণ্ঠে, সাজায় আমারে
আপন মনের মতো দেবতা-আকারে
ভক্তির উন্নত লোকে প্রতিষ্ঠিত করি।
সেথায় একাকী আমি সসংকোচে মরি।
সেথা নিত্য ধূপে দীপে পূজা-উপচারে
অচল আসন-'পরে কে রাখে আমারে।
গেয়ে গেয়ে ফিরি পথে আমি শুধু কবি।
নহি আমি ধ্রুবতারা, নহি আমি রবি।

২১ আষাঢ় ১৩০৩

নদীযাত্রা

চলেছে তরণী মোর শান্ত বায়ুভরে।
প্রভাতের শুভ্র মেঘ দিগন্ত-শিয়রে।
বরষার ভরা নদী তৃপ্ত শিশুপ্রায়
নিস্তরঙ্গ পুষ্ট অঙ্গ নিঃশব্দে ঘুমায়।

দুই কূলে স্তব্ধ ক্ষেত্র শ্যামশস্যে ভরা,
আলস্য-মন্থর যেন পূর্ণগর্ভা ধরা।
আজি সর্ব জলস্থল কেন এত স্থির।
নদীতে না হেরি তরী, জনশূন্য তীর।
পরিপূর্ণ ধরা-মাঝে বসিয়া একাকী
চিরপুরাতন মৃত্যু আজি ম্লান-আঁখি।
সেজেছে সুন্দর বেশে, কেশে মেঘভার
পড়েছে মলিন আলো ললাটে তাহার।
গুঞ্জরিয়া গাহিতেছে সকরুণ তানে,
ভুলায়ে নিতেছে মোর উতলা পরানে।

৭ শ্রাবণ ১৩০৩

মৃত্যুমাধুরী

পরান কহিছে ধীরে—হে মৃত্যু মধুর,
এই নীলাম্বর, এ কি তব অন্তঃপুর।
আজি মোর মনে হয় এ শ্যামলা ভূমি
বিস্তীর্ণ কোমল শয্যা পাতিয়াছ তুমি।
জলে স্থলে লীলা আজি এই বরষার,
এই শান্তি, এ লাবণ্য, সকলি তোমার।
মনে হয়, যেন তব মিলন-বিহনে
অতিশয় ক্ষুদ্র আমি এ বিশ্বভুবনে।
প্রশান্ত করুণ চক্ষে, প্রসন্ন অধরে
তুমি মোরে ডাকিতেছ সর্ব চরাচরে।
প্রথম মিলনভীতি ভেঙেছে বধূর
তোমার বিরাট মূর্তি নিরখি মধুর।
সর্বত্র বিবাহবাঁশি উঠিতেছে বাজি,
সর্বত্র তোমার ক্রোড় হেরিতেছি আজি।

৭ শ্রাবণ ১৩০৩

স্মৃতি

সে ছিল আরেক দিন এই তরী-'পরে,
কণ্ঠ তার পূর্ণ ছিল সুধাগীতিস্বরে।
ছিল তার আঁখি দুটি ঘনপক্ষ্মচ্ছায়,
সজল মেঘের মতো ভরা করুণায়।
কোমল হৃদয়খানি উদ্বেলিত সুখে,
উচ্ছ্বসি উঠিত হাসি সরল কৌতুকে।
পাশে বসি বলে যেত কলকণ্ঠকথা,
কত কী কাহিনী তার কত আকুলতা।

প্রত্যূষে আনন্দভরে হাসিয়া হাসিয়া
প্রভাত-পাখির মতো জাগাত আসিয়া।
স্নেহের দৌরাত্ম্য তার নির্ঝরের প্রায়
আমারে ফেলিত ঘেরি বিচিত্র লীলায়।
আজি সে অনন্ত বিশ্বে আছে কোন্‌খানে
তাই ভাবিতেছি বসি সজল নয়ানে।

৭ শ্রাবণ ১৩০৩

বিলয়

যেন তার আঁখি দুটি নবনীল ভাসে
ফুটিয়া উঠিছে আজি অসীম আকাশে।
বৃষ্টিধৌত প্রভাতের আলোক-হিল্লোলে
অশ্রুমাখা হাসি তার বিকাশিয়া তোলে।
তার সেই স্নেহলীলা সহস্র আকারে
সমস্ত জগৎ হতে ঘিরিছে আমারে।
বরষার নদী-'পরে ছলছল আলো,
দূর তীরে কাননের ছায়া কালো কালো,
দিগন্তের শ্যামপ্রান্তে শান্ত মেঘরাজি
তারি মুখখানি যেন শতরূপ সাজি।
আঁখি তার কহে যেন মোর মুখে চাহি,
'আজ প্রাতে সব পাখি উঠিয়াছে গাহি—
শুধু মোর কণ্ঠস্বর এ প্রভাতবায়ে
অনন্ত জগৎ-মাঝে গিয়েছে হারায়ে।'

৭ শ্রাবণ ১৩০৩

প্রথম চুম্বন

স্তব্ধ হল দশ দিক নত করি আঁখি—
বন্ধ করি দিল গান যত ছিল পাখি।
শান্ত হয়ে গেল বায়ু, জলকলস্বর
মুহূর্তে থামিয়া গেল, বনের মর্মর
বনের মর্মের মাঝে মিলাইল ধীরে।
নিস্তরঙ্গ তটিনীর জনশূন্য তীরে
নিঃশব্দে নামিল আসি সায়াহ্নচ্ছায়ায়
নিস্তব্ধ গগনপ্রান্ত নির্বাক ধরায়।
সেইক্ষণে বাতায়নে নীরব নির্জন
আমাদের দুজনের প্রথম চুম্বন।

দিক-দিগন্তরে বাজি উঠিল তখনি
দেবালয়ে আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি।
অনন্ত নক্ষত্রলোক উঠিল শিহরি,
আমাদের চক্ষে এল অশ্রুজল ভরি।

১০ শ্রাবণ ১৩০৩

শেষ চুম্বন

দূরে স্বর্গে বাজে যেন নীরব ভৈরবী।
উষার করুণ চাঁদ শীর্ণ মুখচ্ছবি।
ম্লান হয়ে এল তারা; পূর্বদিগ্‌বধূর
কপোল শিশিরসিক্ত, পাণ্ডুর বিধুর।
ধীরে ধীরে নিবে গেল শেষ দীপশিখা,
খসে গেল যামিনীর স্বপ্ন-যবনিকা।
প্রবেশিল বাতায়নে পরিতাপ-সম
রক্তরশ্মি প্রভাতের আঘাত নির্মম।
সেইক্ষণে গৃহদ্বারে সত্বর সঘন
আমাদের সর্বশেষ বিদায়-চুম্বন।
মুহূর্তে উঠিল বাজি চারি দিক হতে
কর্মের ঘর্ঘরমন্দ্র সংসারের পথে।
মহারবে সিংহদ্বার খুলে বিশ্বপুরে;
অশ্রুজল মুছে ফেলি চলি গেনু দূরে।

১০ শ্রাবণ ১৩০৩

যাত্রী

ওরে যাত্রী, যেতে হবে বহুদূরদেশে।
কিসের করিস চিন্তা বসি পথশেষে,
কোন্ দুঃখে কাঁদে প্রাণ। কার পানে চাহি
বসে বসে দিন কাটে শুধু গান গাহি
শুধু মুগ্ধনেত্র মেলি। কার কথা শুনে
মরিস জ্বলিয়া মিছে মনের আগুনে।
কোথায় রহিবে পড়ি এ তোর সংসার।
কোথায় পশিবে সেথা কলরব তার।
মিলাইবে যুগ যুগ স্বপনের মতো,
কোথা রবে আজিকার কুশাঙ্কুর-ক্ষত।
নীরবে জ্বলিবে তব পথের দু-ধারে
গ্রহতারকার দীপ কাতারে কাতারে।
তখনো চলেছ একা অনন্ত ভুবনে,
কোথা হতে কোথা গেছ না রহিবে মনে।

১১ শ্রাবণ ১৩০৩

তৃণ

হে বন্ধু প্রসন্ন হও, দূর করো ক্রোধ।
তোমাদের সাথে মোর বৃথা এ বিরোধ।
আমি চলিবারে চাই যেই পথ বাহি
সেথা কারো তরে কিছু স্থানাভাব নাহি।
সপ্তলোক সেই পথে চলে পাশে পাশে
তবু তার অন্ত নাই মহান আকাশে।
তোমার ঐশ্বর্যরাশি গৃহভিত্তি-মাঝে
ব্রহ্মাণ্ডেরে তুচ্ছ করি দীপ্তগর্বে সাজে।
তারে সেই বিশ্বপথে করিলে বাহির
মুহূর্তে সে হবে ক্ষুদ্র ম্লান নতশির—
সেথা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নবতৃণদল
বরষার বৃষ্টিধারে সরস শ্যামল।
সেথা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, ওগো অভিমান,
এ আমার আজিকার অতি ক্ষুদ্র গান।

১১ শ্রাবণ ১৩০৩

ঐশ্বর্য

ক্ষুদ্র এই তৃণদল ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে
সরল মাহাত্ম্য লয়ে সহজে বিরাজে।
পূরবের নবসূর্য, নিশীথের শশী,
তৃণটি তাদেরি সাথে একাসনে বসি।
আমার এ গান এও জগতের গানে
মিশে যায় নিখিলের মর্মমাঝখানে;
শ্রাবণের ধারাপাত, বনের মর্মর
সকলের মাঝে তার আপনার ঘর।
কিন্তু, হে বিলাসী, তব ঐশ্বর্যের ভার
ক্ষুদ্র রুদ্ধদ্বারে শুধু একাকী তোমার।
নাহি পড়ে সূর্যালোক, নাহি চাহে চাঁদ,
নাহি তাহে নিখিলের নিত্য আশীর্বাদ।
সম্মুখে দাঁড়ালে মৃত্যু মুহূর্তেই হায়
পাংশুপাণ্ডু শীর্ণ ম্লান মিথ্যা হয়ে যায়।

১৪ শ্রাবণ ১৩০৩

স্বার্থ

কে রে তুই, ওরে স্বার্থ, তুই কতটুক,
তোর স্পর্শে ঢেকে যায় ব্রহ্মাণ্ডের মুখ,
লুকায় অনন্ত সত্য—স্নেহ সখ্য প্রীতি
মুহূর্তে ধারণ করে নির্লজ্জ বিকৃতি,

থেমে যায় সৌন্দর্যের গীতি চিরন্তন
তোর তুচ্ছ পরিহাসে। ওগো বন্ধুগণ,
সব স্বার্থ পূর্ণ হোক। ক্ষুদ্রতম কণা
ভাণ্ডারে টানিয়া আনো—কিছু ত্যজিয়ো না।
আমি লইলাম বাছি চিরপ্রেমখানি
জাগিছে যাহার মুখে অনন্তের বাণী
অমৃতে অশ্রুতে মাখা। মোর তরে থাক্
পরিহাস্য পুরাতন বিশ্বাস নির্বাক।
থাক্ মহাবিশ্ব, থাক্ হৃদয়-আসীনা
অন্তরের মাঝখানে যে বাজায় বীণা।

১১ শ্রাবণ ১৩০৩

প্রেয়সী

হে প্রেয়সী, হে শ্রেয়সী, হে বীণাবাদিনী,
আজি মোর চিত্তপদ্মে বসি একাকিনী
ঢালিতেছ স্বর্গসুধা; মাথার উপর
সদ্যস্নাত বরষার স্বচ্ছ নীলাম্বর
রাখিয়াছে স্নিগ্ধহস্ত আশীর্বাদে ভরা,
সম্মুখেতে শস্যপূর্ণ হিল্লোলিত ধরা
বুলায় নয়নে মোর অমৃত-চুম্বন;
উতলা বাতাস আসি করে আলিঙ্গন;
অন্তরে সঞ্চার করি আনন্দের বেগ
বহে যায় ভরা নদী; মধ্যাহ্নের মেঘ
স্বপ্নমালা গাঁথি দেয় দিগন্তের ভালে।
তুমি আজি মুগ্ধমুখী আমারে ভুলালে,
ভুলাইলে সংসারের শতলক্ষ কথা—
বীণাস্বরে রচি দিলে মহা নীরবতা।

১১ শ্রাবণ ১৩০৩

শান্তিমন্ত্র

কাল আমি তরী খুলি লোকালয়-মাঝে
আবার ফিরিয়া যাব আপনার কাজে—
হে অন্তর্যামিনী দেবী ছেড়ো না আমারে,
যেয়ো না একেলা ফেলি জনতা-পাথারে
কর্মকোলাহলে। সেথা সর্ব ঝঞ্ঝনায়
নিত্য যেন বাজে চিত্তে তোমার বীণায়
এমনি মঙ্গলধ্বনি। বিদ্বেষের বাণে
বক্ষ বিদ্ধ করি যবে রক্ত টেনে আনে

তোমার সান্ত্বনাসুধা অশ্রুবারি-সম
পড়ে যেন বিন্দু বিন্দু ক্ষতপ্রাণে মম।
বিরোধ উঠিবে গর্জি শতফণা ফণী,
তুমি মৃদুস্বরে দিয়ো শান্তিমন্ত্রধ্বনি—
স্বার্থ মিথ্যা, সব মিথ্যা—বোলো কানে কানে-
আমি শুধু নিত্য সত্য তোর মাঝখানে।

১১ শ্রাবণ ১৩০৩

কালিদাসের প্রতি

আজ তুমি কবি শুধু, নহ আর কেহ—
কোথা তব রাজসভা, কোথা তব গেহ.
কোথা সেই উজ্জয়িনী—কোথা গেল আজ
প্রভু তব, কালিদাস, রাজ-অধিরাজ।
কোনো চিহ্ন নাহি কারো। আজ মনে হয়
ছিলে তুমি চিরদিন চিরানন্দময়
অলকার অধিবাসী। সন্ধ্যাভ্রশিখরে
ধ্যান ভাঙি উমাপতি ভূমানন্দভরে
নৃত্য করিতেন যবে, জলদ সজল
গর্জিত মৃদঙ্গরবে, তড়িৎ চপল
ছন্দে ছন্দে দিত তাল, তুমি সেই ক্ষণে
গাহিতে বন্দনা-গান—গীতিসমাপনে
কর্ণ হতে বর্হ খুলি স্নেহহাস্যভরে
পরায়ে দিতেন গৌরী তব চূড়া-’পরে।

১১ শ্রাবণ ১৩০৩

কুমারসম্ভবগান

যখন শুনালে কবি, দেবদম্পতিরে
কুমারসম্ভবগান, চারি দিকে ঘিরে
দাঁড়াল প্রমথগণ—শিখরের ’পর
নামিল মন্থর শান্ত সন্ধ্যামেঘস্তর,
স্থগিত বিদ্যুৎলীলা, গর্জন বিরত,
কুমারের শিখী করি পুচ্ছ অবনত
স্থির হয়ে দাঁড়াইল পার্বতীর পাশে
বাঁকায়ে উন্নত গ্রীবা। কভু স্মিতহাসে
কাঁপিল দেবীর ওষ্ঠ, কভু দীর্ঘশ্বাস
অলক্ষ্যে বহিল, কভু অশ্রুজলোচ্ছ্বাস

দেখা দিল আঁখিপ্রান্তে—যবে অবশেষে
ব্যাকুল শরমখানি নয়ন-নিমেষে
নামিল নীরবে, কবি, চাহি দেবীপানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে।

১৫ শ্রাবণ ১৩০৩

মানসলোক

মানসকৈলাসশৃঙ্গে নির্জন ভুবনে
ছিলে তুমি মহেশের মন্দির-প্রাঙ্গণে
তাঁহার আপন কবি, কবি কালিদাস।
নীলকণ্ঠদ্যুতি-সম স্নিগ্ধনীল-ভাস
চিরস্থির আষাঢ়ের ঘনমেঘদলে,
জ্যোতির্ময় সপ্তর্ষির তপোলোকতলে।
আজিও মানসধামে করিছ বসতি;
চিরদিন রবে সেথা ওহে কবিপতি,
শংকরচরিতগানে ভরিয়া ভুবন।—
মাঝে হতে উজ্জয়িনী রাজনিকেতন,
নৃপতি বিক্রমাদিত্য, নবরত্নসভা,
কোথা হতে দেখা দিল স্বপ্ন ক্ষণপ্রভা।
সে স্বপ্ন মিলায়ে গেল, সে বিপুলচ্ছবি,
রহিলে মানসলোকে তুমি চিরকবি।

১৫ শ্রাবণ ১৩০৩

কাব্য

তবু কি ছিল না তব সুখদুঃখ যত
আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরি মতো
হে অমর কবি। ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভা ষড়চক্র, আঘাত গোপন।
কখনো কি সহ নাই অপমানভার,
অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,
অভাব কঠোর ক্রূর—নিদ্রাহীন রাতি
কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি।
তবু সে সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্য-কমল
আনন্দের সূর্য-পানে; তার কোনো ঠাঁই
দুঃখদৈন্যদুর্দিনের কোনো চিহ্ন নাই।
জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান,
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

১১ শ্রাবণ ১৩০৩

প্রার্থনা

আজি কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমারে
কোন্ জনে করে বঞ্চিত—
তব চরণ-কমল-রতন-রেণুকা
অন্তরে আছে সঞ্চিত।
কত নিঠুর কঠোর ঘরষে ঘরষে
মর্ম-মাঝারে শল্য বরষে
তবু প্রাণমন পীযূষ-পরশে
পলে পলে পুলকাঞ্চিত।
আজি কিসের পিপাসা মিটিল না, ওগো
পরম পরান-বল্লভ।
চিতে চিরসুধা করে সঞ্চার, তব
সকরুণ করপল্লব।
হেথা কত দিনে রাতে অপমান-ঘাতে
আছি নতশির গঞ্জিত,
তবু চিত্তললাট তোমারি স্বকরে
রয়েছে তিলকরঞ্জিত।
হেথা কে আমার কানে কঠিন বচনে
বাজায় বিরোধ-ঝঞ্ঝনা।
প্রাণে দিবসরজনী উঠিতেছে ধ্বনি
তোমারি বীণার গুঞ্জনা।
নাথ, যার যাহা আছে তার তাই থাক্
আমি থাকি চিরলাঞ্ছিত,
শুধু তুমি এ জীবনে নয়নে নয়নে
থাকো থাকো চিরবাঞ্ছিত।

১৪ শ্রাবণ ১৩০০

ইছামতী নদী

অয়ি তন্বী ইছামতী, তব তীরে তীরে
শান্তি চিরকাল থাক্ কুটীরে কুটীরে—
শস্যে পূর্ণ হোক ক্ষেত্র তব তটদেশে।
বর্ষে বর্ষে বরষায় আনন্দিত বেশে
ঘনঘোরঘটা-সাথে বজ্রবাদ্যরবে
পূর্ববায়ু-কল্লোলিত তরঙ্গ-উৎসবে
তুলিয়া আনন্দধ্বনি দক্ষিণে ও বামে
আশ্রিত পালিত তব দুই তট-গ্রামে
সমারোহে চলে এসো শৈলগৃহ হতে
সৌভাগ্যে শোভায় গর্বে উল্লাসিত স্রোতে।

যখন রব না আমি, রবে না এ গান,
তখনো ধরার বক্ষে সঞ্চারিয়া প্রাণ,
তোমার আনন্দগাথা এ বঙ্গে, পার্বতী,
বর্ষে বর্ষে বাজিবেক অয়ি ইছামতী।

১৪ শ্রাবণ ১৩০৩

শুশ্রূষা

ব্যথাক্ষত মোর প্রাণ লয়ে তব ঘরে
অতিথিবৎসলা নদী কত স্নেহভরে
শুশ্রূষা করিলে আজি—স্নিগ্ধ হস্তখানি
দগ্ধ হৃদয়ের মাঝে সুধা দিল আনি।
সায়াহ্ন আসিল নামি, পশ্চিমের তীরে
ধান্যক্ষেত্রে রক্ত রবি অস্ত গেল ধীরে।
পূর্বতীরে গ্রাম বন নাহি যায় দেখা,
জ্বলন্ত দিগন্তে শুধু মসীপুঞ্জরেখা;
সেথা অন্ধকার হতে আনিছে সমীর
কর্ম-অবসানধ্বনি অজ্ঞাত পল্লীর।
দুই তীর হতে তুলি দুই শান্তিপাখা
আমারে বুকের মাঝে দিলে তুমি ঢাকা।
চুপি চুপি বলি দিলে—বৎস, জেনো সার,
সুখ দুঃখ বাহিরের, শান্তি সে আত্মার।

১৪ শ্রাবণ ১৩০৩

আশিস-গ্রহণ

চলিয়াছি রণক্ষেত্রে সংগ্রামের পথে।
সংসার-বিপ্লবধ্বনি আসে দূর হতে।
বিদায় নেবার আগে, পারি যতক্ষণ
পরিপূর্ণ করি লই মোর প্রাণমন
নিত্য-উচ্চারিত তব কলকণ্ঠস্বরে
উদার মঙ্গলমন্ত্রে—হৃদয়ের 'পরে
লই তব শুভস্পর্শ, কল্যাণসঞ্চয়।
এই আশীর্বাদ করো, জয়পরাজয়
ধরি যেন নম্রচিত্তে করি শির নত
দেবতার আশীর্বাদী কুসুমের মতো।

বিশ্বস্ত স্নেহের মূর্তি দুঃস্বপ্নের প্রায়
সহসা বিরূপ হয়—তবু যেন তায়
আমার হৃদয়সুধা না পায় বিকার,
আমি যেন আমি থাকি নিত্য আপনার।

১৪ শ্রাবণ ১৩০৩

বিদায়

হে তটিনী সে নগরে নাই কলস্বন
তোমার কণ্ঠের মতো; উদার গগন,
অলিখিত মহাশাস্ত্র, নীল পত্রগুলি
দিক হতে দিগন্তরে নাহি রাখে খুলি;
শান্ত স্নিগ্ধ বসুন্ধরা শ্যামল অঞ্চলে
সত্যের স্বরূপখানি নির্মল নয়নে
রাখে না নবীন করি; সেথায় কেবল
একমাত্র আপনার অন্তর সম্বল
অকূলের মাঝে। তাই ভীত শিশুপ্রায়
হৃদয় চাহে না আজি লইতে বিদায়
তোমা-সবাকার কাছে। তাই প্রাণপণে
আঁকড়িয়া ধরিতেছে আর্ত আলিঙ্গনে
নির্জন লক্ষ্মীরে। শুভশান্তিপত্র তব
অন্তরে বাঁধিয়া দাও, কণ্ঠে পরি লব।

১৪ শ্রাবণ ১৩০৩

কণিকা

সাদর উৎসর্গ

পরম প্রেমাস্পদ
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী
মহাশয়ের করকমলে

শিলাইদহ
৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৬

যথার্থ আপন

কুষ্মাণ্ডের মনে মনে বড়ো অভিমান
বাঁশের মাচাটি তার পুষ্পক বিমান।
ভুলেও মাটির পানে তাকায় না তাই,
চন্দ্রসূর্যতারকারে করে ভাই ভাই।
নভশ্চর ব'লে তার মনের বিশ্বাস,
শূন্য-পানে চেয়ে তাই ছাড়ে সে নিশ্বাস।
ভাবে শুধু মোটা এই বোঁটাখানা মোরে
বেঁধেছে ধরার সাথে কুটুম্বিতা-ডোরে।
বোঁটা যদি কাটা পড়ে তখনি পলকে
উড়ে যাব আপনার জ্যোতির্ময় লোকে।
বোঁটা যবে কাটা গেল, বুঝিল সে খাঁটি,
সূর্য তার কেহ নয়, সবই তার মাটি।

শক্তির সীমা

কহিল কাঁসার ঘটি খন্ খন্ স্বর—
কূপ, তুমি কেন খুড়া হলে না সাগর।
তাহা হলে অসংকোচে মারিতাম ডুব,
জল খেয়ে লইতাম পেট ভরে খুব।
কূপ কহে, সত্য বটে ক্ষুদ্র আমি কূপ,
সেই দুঃখে চিরদিন করে আছি চুপ।
কিন্তু বাপু তার লাগি তুমি কেন ভাব।
যতবার ইচ্ছা যায় ততবার নাবো—
তুমি যত নিতে পার সব যদি নাও
তবু আমি টিঁকে রব দিয়ে থুয়ে তাও।

নূতন চাল

এক দিন গরজিয়া কহিল মহিষ,
ঘোড়ার মতন মোর থাকিবে সহিস।
একেবারে ছাড়িয়াছি মহিষি-চলন,
দুই বেলা চাই মোর দলন-মলন।
এইভাবে প্রতিদিন, রজনী পোহালে,
বিপরীত দাপাদাপি করে সে গোহালে।

প্রভু কহে, চাই বটে—ভালো, তাই হোক।
পশ্চাতে রাখিল তার দশ জন লোক।
দুটো দিন না যাইতে কেঁদে কয় মোষ,
আর কাজ নেই প্রভু, হয়েছে সন্তোষ।
সহিসের হাত হতে দাও অব্যাহতি,
দলন-মলনটার বাড়াবাড়ি অতি।

অকর্মার বিভ্রাট

লাঙল কাঁদিয়া বলে ছাড়ি দিয়ে গলা,
তুই কোথা হতে এলি ওরে ভাই ফলা।
যেদিন আমার সাথে তোরে দিল জুড়ি
সেই দিন হতে মোর মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি।
ফলা কহে, ভালো ভাই, আমি যাই খসে,
দেখি তুমি কী আরামে থাক ঘরে ব'সে।
ফলাখানা টুটে গেল, হলখানা তাই
খুশি হয়ে পড়ে থাকে, কোনো কর্ম নাই।
চাষা বলে, এ আপদ আর কেন রাখা,
এরে আজ চালা করে ধরাইব আখা।
হল বলে, ওরে ফলা, আয় ভাই ধেয়ে,
খাটুনি যে ভালো ছিল জ্বলুনির চেয়ে।

হার-জিত

ভিমরুলে মৌমাছিতে হল রেষারেষি,
দুজনায় মহাতর্ক শক্তি কার বেশি।
ভিমরুল কহে, আছে সহস্র প্রমাণ
তোমার দংশন নহে আমার সমান।
মধুকর নিরুত্তর ছলছল আঁখি—
বনদেবী কহে তারে কানে কানে ডাকি,
কেন বাছা নতশির, এ কথা নিশ্চিত
বিষে তুমি হার মান, মধুতে যে জিত।

ভার

টুনটুনি কহিলেন, রে ময়ূর, তোকে
দেখে করুণায় মোর জল আসে চোখে।
ময়ূর কহিল, বটে! কেন, কহো শুনি,
ওগো মহাশয় পক্ষী, ওগো টুনটুনি।

টুনটুনি কহে, এ যে দেখিতে বেআড়া,
দেহ তব যত বড়ো পুচ্ছ তারো বাড়া।
আমি দেখো লঘুভারে ফিরি দিনরাত,
তোমার পশ্চাতে পুচ্ছ বিষম উৎপাত।
ময়ূর কহিল, শোক করিয়ো না মিছে,
জেনো ভাই, ভার থাকে গৌরবের পিছে।

কীটের বিচার

মহাভারতের মধ্যে ঢুকেছেন কীট,
কেটেকুটে ফুঁড়েছেন এপিঠ-ওপিঠ।
পণ্ডিত খুলিয়া দেখি হস্ত হানে শিরে,
বলে, ওরে কীট তুই এ কী করিলি রে।
তোর দন্তে শান দেয়, তোর পেট ভরে,
হেন খাদ্য কত আছে ধূলির উপরে।
কীট বলে, হয়েছে কী, কেন এত রাগ,
ওর মধ্যে ছিল কী বা, শুধু কালো দাগ।
আমি যেটা নাহি বুঝি সেটা জানি ছার,
আগাগোড়া কেটেকুটে করি ছারখার।

যথাকর্তব্য

ছাতা বলে, ধিক্ ধিক্ মাথা মহাশয়,
এ অন্যায় অবিচার আমারে না সয়।
তুমি যাবে হাটে বাটে দিব্য অকাতরে,
রৌদ্র বৃষ্টি যত কিছু সব আমা-'পরে।
তুমি যদি ছাতা হতে কী করিতে দাদা।
মাথা কয়, বুঝিতাম মাথার মর্যাদা,
বুঝিতাম তার গুণে পরিপূর্ণ ধরা,
মোর একমাত্র গুণ তারে রক্ষা করা।

অসম্পূর্ণ সংবাদ

চকোরী ফুকারি কাঁদে, ওগো পূর্ণ চাঁদ,
পণ্ডিতের কথা শুনি গণি পরমাদ।
তুমি নাকি এক দিন রবে না ত্রিদিবে,
মহাপ্রলয়ের কালে যাবে নাকি নিবে।

হায় হায় সুধাকর, হায় নিশাপতি,
তা হইলে আমাদের কী হইবে গতি।
চাঁদ কহে, পণ্ডিতের ঘরে যাও প্রিয়া,
তোমার কতটা আয়ু এসো শুধাইয়া!

ঈর্ষার সন্দেহ

লেজ নড়ে, ছায়া তারি নড়িছে মুকুরে,
কোনোমতে সেটা সহ্য করে না কুকুরে।
দাস যবে মনিবেরে দোলায় চামর
কুকুর চটিয়া ভাবে, এ কোন্ পামর।
গাছ যদি নড়ে ওঠে, জলে ওঠে ঢেউ,
কুকুর বিষম রাগে করে ঘেউ ঘেউ।
সে নিশ্চয় বুঝিয়াছে ত্রিভুবন দোলে
ঝাঁপ দিয়া উঠিবারে তারি প্রভু-কোলে।
মনিবের পাতে ঝোল খাবে চুকুচুকু,
বিশ্বে শুধু নড়িবেক তারি লেজটুকু।

অধিকার

অধিকার বেশি কার বনের উপর
সেই তর্কে বেলা হল, বাজিল দুপর।
বকুল কহিল, শুন বান্ধব সকল,
গন্ধে আমি সর্ব বন করেছি দখল।
পলাশ কহিল শুনি মস্তক নাড়িয়া,
বর্ণে আমি দিগ্‌বিদিক রেখেছি কাড়িয়া।
গোলাপ রাঙিয়া উঠি করিল জবাব,
গন্ধে ও শোভায় বনে আমারি প্রভাব।
কচু কহে, গন্ধ শোভা নিয়ে খাও ধুয়ে,
হেথা আমি অধিকার গাড়িয়াছি ভুঁয়ে।
মাটির ভিতরে তার দখল প্রচুর,
প্রত্যক্ষ প্রমাণে জিত হইল কচুর।

নিন্দুকের দুরাশা

মালা গাঁথিবার কালে ফুলের বোঁটায়
ছুঁচ নিয়ে মালাকর দুবেলা ফোটায়।
ছুঁচ বলে মনোদুঃখে, ওরে জুঁই দিদি,
হাজার হাজার ফুল প্রতিদিন বিঁধি,

কত গন্ধ কোমলতা যাই ফুঁড়ে ফুঁড়ে
কিছু তার নাহি পাই এত মাথা খুঁড়ে।
বিধি-পায়ে মাগি বর জুড়ি কর দুটি
ছুঁচ হয়ে না ফোটাই, ফুল হয়ে ফুটি।
জুঁই কহে নিশ্বসিয়া, আহা হোক তাই,
তোমারো পুরুক বাঞ্ছা, আমি রক্ষা পাই।

রাষ্ট্রনীতি

কুড়ালি কহিল, ভিক্ষা মাগি ওগো শাল,
হাতল নাহিকো, দাও একখানি ডাল।
ডাল নিয়ে হাতল প্রস্তুত হল যেই,
তার পরে ভিক্ষুকের চাওয়া-চিন্তা নেই—
একেবারে গোড়া ঘেঁষে লাগাইল কোপ,
শাল বেচারার হল আদি অন্ত লোপ।

গুণজ্ঞ

আমি প্রজাপতি ফিরি রঙিন পাখায়,
কবি তো আমার পানে তবু না তাকায়।
বুঝিতে না পারি আমি, বলো তো ভ্রমর,
কোন্ গুণে কাব্যে তুমি হয়েছ অমর।
অলি কহে, আপনি সুন্দর তুমি বটে,
সুন্দরের গুণ তব মুখে নাহি রটে।
আমি ভাই মধু খেয়ে গুণ গেয়ে ঘুরি,
কবি আর ফুলের হৃদয় করি চুরি।

চুরি নিবারণ

সুয়োরানী কহে, রাজা, দুয়োরানীটার
কত মতলব আছে বুঝে ওঠা ভার।
গোয়ালঘরের কোণে দিলে ওরে বাসা,
তবু দেখো অভাগীর মেটে নাই আশা।
তোমারে ভুলায়ে শুধু মুখের কথায়
কালো গোরুটিরে তব দুয়ে নিতে চায়।

রাজা বলে, ঠিক ঠিক, বিষম চাতুরী,
এখন কী ক'রে ওর ঠেকাইব চুরি।
সুয়ো বলে, একমাত্র রয়েছে ওষুধ,
গোরুটা আমারে দাও, আমি খাই দুধ।

আত্মশত্রুতা

খোঁপা আর এলোচুলে বিবাদ হামাশা,
পাড়ার লোকেরা জোটে দেখিতে তামাশা।
খোঁপা কয়, এলোচুল, কী তোমার ছিরি।
এলো কয়, খোঁপা তুমি রাখো বাবুগিরি।
খোঁপা কহে, টাক ধরে হই তবে খুশি।
তুমি যেন কাটা পড়, এলো কয় রুষি।
কবি মাঝে পড়ি বলে, মনে ভেবে দেখ্
দুজনেই এক তোরা, দুজনেই এক।
খোঁপা গেলে চুল যায়, চুলে যদি টাক
খোঁপা, তবে কোথা রবে তব জয়ঢাক।

দানরিক্ত

জলহারা মেঘখানি বরষার শেষে
পড়ে আছে গগনের এক কোণ ঘেঁষে।
বর্ষাপূর্ণ সরোবর তারি দশা দেখে
সারাদিন ঝিকিঝিকি হাসে থেকে থেকে।
কহে, ওটা লক্ষ্মীছাড়া, চালচুলাহীন,
নিজেরে নিঃশেষ করি কোথায় বিলীন।
আমি দেখো চিরকাল থাকি জলভরা,
সারবান, সুগম্ভীর, নাই নড়াচড়া।
মেঘ কহে, ওহে বাপু, কোরো না গরব,
তোমার পূর্ণতা সে তো আমারি গৌরব।

স্পষ্টভাষী

বসন্ত এসেছে বনে, ফুল ওঠে ফুটি,
দিনরাত্রি গাহে পিক, নাহি তার ছুটি।
কাক বলে, অন্য কাজ নাহি পেলে খুঁজি,
বসন্তের চাটুগান শুরু হল বুঝি।
গান বন্ধ করি পিক উঁকি মারি কয়,
তুমি কোথা হতে এলে কে গো মহাশয়।

আমি কাক স্পষ্টভাষী, কাক ডাকি বলে।
পিক কয়, তুমি ধন্য, নাম পদতলে;
স্পষ্টভাষা তব কণ্ঠে থাক্‌ বারো মাস,
মোর থাক্‌ মিষ্টভাষা আর সত্যভাষ।

প্রতাপের তাপ

ভিজা কাঠ অশ্রুজলে ভাবে রাত্রিদিবা,
জ্বলন্ত কাঠের আহা দীপ্তি তেজ কী বা।
অন্ধকার কোণে প'ড়ে মরে ঈর্ষারোগে,
বলে, আমি হেন জ্যোতি পাব কী সুযোগে।
জ্বলন্ত অঙ্গার বলে, কাঁচা কাঠ ওগো,
চেষ্টাহীন বাসনায় বৃথা তুমি ভোগো।
আমরা পেয়েছি যাহা মরিয়া পুড়িয়া,
তোমারি হাতে কি তাহা আসিবে উড়িয়া।
ভিজা কাঠ বলে, বাবা, কে মরে আগুনে।
জ্বলন্ত অঙ্গার বলে, তবে থাক্‌ ঘুণে।

নম্রতা

কহিল কঞ্চির বেড়া, ওগো পিতামহ
বাঁশবন, নুয়ে কেন পড় অহরহ।
আমরা তোমারি বংশে ছোটো ছোটো ডাল,
তবু মাথা উঁচু করে থাকি চিরকাল।
বাঁশ কহে, ভেদ তাই ছোটোতে বড়োতে,
নত হই, ছোটো নাহি হই কোনোমতে।

ভিক্ষা ও উপার্জন

বসুমতী, কেন তুমি এতই কৃপণা,
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা।
দিতে যদি হয় দে মা প্রসন্ন সহাস,
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস।
বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি।
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী,
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।

উচ্চের প্রয়োজন

কহিল মনের খেদে মাঠ সমতল,
হাট ভ'রে দিই আমি কত শস্য ফল।
পর্বত দাঁড়ায়ে রন কী জানি কী কাজ,
পাষাণের সিংহাসনে তিনি মহারাজ।
বিধাতার অবিচার কেন উঁচুনিচু
সে কথা বুঝিতে আমি নাহি পারি কিছু।
গিরি কহে, সব হলে সমভূমি-পারা
নামিত কি ঝরনার সুমঙ্গলধারা।

অচেতন মাহাত্ম্য

হে জলদ, এত জল ধরে আছ বুকে
তবু লঘুবেগে ধাও বাতাসের মুখে।
পোষণ করিছ শত ভীষণ বিজুলি
তবু স্নিগ্ধ নীল রূপে নেত্র যায় ভুলি।
এ অসাধ্য সাধিতেছ অতি অনায়াসে
কী করিয়া, সে রহস্য কহি দাও দাসে।
গুরুগুরু গরজনে মেঘ কহে বাণী,
আশ্চর্য কী আছে ইথে আমি নাহি জানি।

শক্তের ক্ষমা

নারদ কহিল আসি, হে ধরণী দেবী,
তব নিন্দা করে নর তব অন্ন সেবি।
বলে মাটি, বলে ধূলি, বলে জড় স্থূল,
তোমারে মলিন বলে অকৃতজ্ঞকুল।
বন্ধ করো অন্নজল, মুখ হোক চুন,
ধূলামাটি কী জিনিস বাছারা বুঝুন।
ধরণী কহিলা হাসি, বালাই, বালাই,
ওরা কি আমার তুল্য, শোধ লব তাই?
ওদের নিন্দায় মোর লাগিবে না দাগ,
ওরা যে মরিবে যদি আমি করি রাগ।

প্রকারভেদ

বাবলাশাখারে বলে আম্রশাখা, ভাই,
উনানে পুড়িয়া তুমি কেন হও ছাই।

হায় হায়, সখী, তব ভাগ্য কী কঠোর।
বাবলার শাখা বলে, দুঃখ নাহি মোর।
বাঁচিয়া সফল তুমি, ওগো চূতলতা,
নিজেরে করিয়া ভস্ম মোর সফলতা।

খেলেনা

ভাবে শিশু, বড়ো হলে শুধু যাবে কেনা
বাজার উজাড় করি, সমস্ত খেলেনা।
বড়ো হলে খেলা যত ঢেলা বলি মানে,
দুই হাত তুলে চায় ধনজন-পানে।
আরো বড়ো হবে না কি যবে অবহেলে
ধরার খেলার হাট হেসে যাবে ফেলে।

এক-তরফা হিসাব

সাতাশ, হলে না কেন একশো সাতাশ,
থলিটি ভরিত, হাড়ে লাগিত বাতাস।
সাতাশ কহিল, তাহে টাকা হত মেলা,
কিন্তু কী করিতে বাপু বয়সের বেলা।

অল্প জানা ও বেশি জানা

তৃষিত গর্দভ গেল সরোবরতীরে,
ছি ছি কালো জল, বলি চলি এল ফিরে।
কহে জল, জল কালো জানে সব গাধা,
যে জন অধিক জানে বলে জল সাদা।

মূল

আগা বলে, আমি বড়ো, তুমি ছোটো লোক।
গোড়া হেসে বলে, ভাই, ভালো তাই হোক।
তুমি উচ্চে আছ ব'লে গর্বে আছ ভোর,
তোমারে করেছি উচ্চ এই গর্ব মোর।

হাতে-কলমে

বোলতা কহিল, এ যে ক্ষুদ্র মউ-চাক,
এরি তরে মধুকর এত করে জাঁক।
মধুকর কহে তারে, তুমি এসো ভাই,
আরো ক্ষুদ্র মউ-চাক রচো দেখে যাই।

পর-বিচারে গৃহভেদ

আম্র কহে, এক দিন, হে মাকাল ভাই,
আছিনু বনের মধ্যে সমান সবাই—
মানুষ লইয়া এল আপনার রুচি,
মূল্যভেদ শুরু হল, সাম্য গেল ঘুচি।

গরজের আত্মীয়তা

কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে,
আমরা কুটুম্ব দোঁহে ভুলে গেলি কি রে।
থলি বলে, কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে
আমার যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে।

সাম্যনীতি

কহিল ভিক্ষার ঝুলি, হে টাকার তোড়া,
তোমাতে আমাতে ভাই ভেদ অতি থোড়া—
আদান-প্রদান হোক। তোড়া কহে রাগে,
সে থোড়া প্রভেদটুকু ঘুচে যাক আগে।

কুটুম্বিতা-বিচার

কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে,
ভাই ব'লে ডাক যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরোসিন বলি উঠে, এসো মোর দাদা।

উদারচরিতানাম্‌

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোটো ফুল অতিশয় দীন।
ধিক্‌ ধিক্‌ করে তারে কাননে সবাই—
সূর্য উঠি বলে তারে, ভালো আছ ভাই?

জ্ঞানের দৃষ্টি ও প্রেমের সম্ভোগ

'কালো তুমি'—শুনি জাম কহে কানে কানে,
যে আমারে দেখে সেই কালো বলি জানে,
কিন্তু সেইটুকু জেনে ফের কেন জাদু,
যে আমারে খায় সেই জানে আমি স্বাদু।

সমালোচক

কানা-কড়ি পিঠ তুলি কহে টাকাটিকে,
তুমি ষোলো-আনা মাত্র, নহ পাঁচ সিকে।
টাকা কয়, আমি তাই, মূল্য মোর যথা,
তোমার যা মূল্য তার ঢের বেশি কথা।

স্বদেশদ্বেষী

কেঁচো কয়, নীচ মাটি, কালো তার রূপ।
কবি তারে রাগ ক'রে বলে, চুপ চুপ।
তুমি যে মাটির কীট, খাও তারি রস,
মাটির নিন্দায় বাড়ে তোমারি কি যশ।

ভক্তি ও অতিভক্তি

ভক্তি আসে রিক্তহস্ত প্রসন্নবদন,
অতিভক্তি বলে, দেখি কী পাইলে ধন।
ভক্তি কয়, মনে পাই, না পারি দেখাতে।
অতিভক্তি কয়, আমি পাই হাতে হাতে।

প্রবীণ ও নবীন

পাকা চুল মোর চেয়ে এত মান্য পায়,
কাঁচা চুল সেই দুঃখে করে হায় হায়।
পাকা চুল বলে, মান সব লও বাছা,
আমারে কেবল তুমি করে দাও কাঁচা।

আকাঙ্ক্ষা

আম্র, তোর কী হইতে ইচ্ছা যায় বল।
সে কহে, হইতে ইক্ষু সুমিষ্ট সরল।
ইক্ষু, তোর কী হইতে মনে আছে সাধ।
সে কহে, হইতে আম্র সুগন্ধ সুস্বাদ।

কৃতীর প্রমাদ

টিকি মুণ্ডে চড়ি উঠি কহে ডগা নাড়ি,
হাত-পা প্রত্যেক কাজে ভুল করে ভারি।
হাত-পা কহিল হাসি, হে অভ্রান্ত চুল,
কাজ করি আমরা যে, তাই করি ভুল।

অসম্ভব ভালো

যথাসাধ্য-ভালো বলে, ওগো আরো-ভালো,
কোন্ স্বর্গপুরী তুমি করে থাক আলো।
আরো-ভালো কেঁদে কহে, আমি থাকি হায়,
অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষায়।

নদীর প্রতি খাল

খাল বলে, মোর লাগি মাথা-কোটাকুটি,
নদীগুলো আপনি গড়ায়ে আসে ছুটি।
তুমি খাল মহারাজ, কহে পারিষদ,
তোমারে জোগাতে জল আছে নদীনদ।

স্পর্ধা

হাউই কহিল, মোর কী সাহস, ভাই,
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই।
কবি কহে, তার গায়ে লাগে নাকো কিছু,
সে ছাই ফিরিয়া আসে তোরি পিছু পিছু।

অযোগ্যের উপহাস

নক্ষত্র খসিল দেখি দীপ মরে হেসে।
বলে, এত ধুমধাম, এই হল শেষে।
রাত্রি বলে, হেসে নাও, বলে নাও সুখে,
যতক্ষণ তেলটুকু নাহি যায় চুকে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ

বজ্র কহে, দূরে আমি থাকি যতক্ষণ,
আমার গর্জনে বলে মেঘের গর্জন,
বিদ্যুতের জ্যোতি বলি মোর জ্যোতি রটে,
মাথায় পড়িলে তবে বলে— বজ্র বটে।

পরের কর্ম-বিচার

নাক বলে, কান কভু ঘ্রাণ নাহি করে,
রয়েছে কুণ্ডল দুটো পরিবার তরে।
কান বলে, কারো কথা নাহি শুনে নাক,
ঘুমোবার বেলা শুধু ছাড়ে হাঁকডাক।

গদ্য ও পদ্য

শর কহে, আমি লঘু, গুরু তুমি গদা,
তাই বুক ফুলাইয়া খাড়া আছ সদা।
করো তুমি মোর কাজ, তর্ক যাক চুকে—
মাথা ভাঙা ছেড়ে দিয়ে বেঁধো গিয়ে বুকে।

ভক্তিভাজন

রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি,
মূর্তি ভাবে আমি দেব— হাসে অন্তর্যামী।

ক্ষুদ্রের দম্ভ

শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির,
লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির।

সন্দেহের কারণ

কত বড়ো আমি, কহে নকল হীরাটি।
তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।

নিরাপদ নীচতা

তুমি নিচে পাঁকে পড়ি ছড়াইছ পাঁক,
যে জন উপরে আছে তারি তো বিপাক।

পরিচয়

দয়া বলে, কে গো তুমি, মুখে নাই কথা,
অশ্রুভরা আঁখি বলে, আমি কৃতজ্ঞতা।

অকৃতজ্ঞ

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,
ধ্বনি-কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।

অসাধ্য চেষ্টা

শক্তি যার নাই নিজে বড়ো হইবারে
বড়োকে করিতে ছোটো তাই সে কি পারে।

ভালো মন্দ

জাল কহে, পঙ্ক আমি উঠাব না আর।
জেলে কহে, মাছ তবে পাওয়া হবে ভার।

একই পথ

দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি।
সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি।

কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ

দেহটা যেমনি ক'রে ঘোরাও যেখানে
বাম হাত বামে থাকে, ডান হাত ডানে।

গালির ভঙ্গি

লাঠি গালি দেয়, ছড়ি, তুই সরু কাঠি।
ছড়ি তারে গালি দেয়, তুমি মোটা লাঠি।

কলঙ্কব্যবসায়ী

ধূলা, করো কলঙ্কিত সবার শুভ্রতা
সেটা কি তোমারি নয় কলঙ্কের কথা।

প্রভেদ

অনুগ্রহ দুঃখ করে, দিই, নাহি পাই।
করুণা কহেন, আমি দিই, নাহি চাই।

নিজের ও সাধারণের

চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে,
কলঙ্ক যা আছে, তাহা আছে মোর গায়ে।

মাঝারির সতর্কতা

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

শত্রুতাগৌরব

পেঁচা রাষ্ট্র করি দেয় পেলে কোনো ছুতা,
জান না আমার সাথে সূর্যের শত্রুতা!

উপলক্ষ

কাল বলে, আমি সৃষ্টি করি এই ভব।
ঘড়ি বলে, তা হলে আমিও স্রষ্টা তব।

নূতন ও সনাতন

রাজা ভাবে, নব নব আইনের ছলে
ন্যায় সৃষ্টি করি আমি। ন্যায়ধর্ম বলে,
আমি পুরাতন, মোরে জন্ম কেবা দেয়
যা তব নূতন সৃষ্টি সে শুধু অন্যায়।

দীনের দান

মরু কহে, অধমেরে এত দাও জল,
ফিরে কিছু দিব হেন কী আছে সম্বল।
মেঘ কহে, কিছু নাহি চাই, মরুভূমি,
আমারে দানের সুখ দান করো তুমি।

কুয়াশার আক্ষেপ

কুয়াশা, নিকটে থাকি, তাই হেলা মোরে,
মেঘ ভায়া দূরে রন, থাকেন গুমরে।
কবি কুয়াশারে কয়, শুধু তাই নাকি।
মেঘ দেয় বৃষ্টিধারা, তুমি দাও ফাঁকি।

গ্রহণে ও দানে

কৃতাঞ্জলি কর কহে, আমার বিনয়
হে নিন্দুক, কেবল নেবার বেলা নয়।
নিই যবে নিই বটে অঞ্জলি জুড়িয়া,
দিই যবে সেও দিই অঞ্জলি পুরিয়া।

অনাবশ্যকের আবশ্যকতা

কী জন্যে রয়েছ সিন্ধু তৃণশস্যহীন
অর্ধেক জগৎ জুড়ি নাচ নিশিদিন।
সিন্ধু কহে, অকর্মণ্য না রহিত যদি
ধরণীর স্তন হতে কে টানিত নদী।

তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে

গন্ধ চলে যায়, হায়, বন্ধ নাহি থাকে,
ফুল তারে মাথা নাড়ি ফিরে ফিরে ডাকে।
বায়ু বলে, যাহা গেল সেই গন্ধ তব,
যেটুকু না দিবে তারে গন্ধ নাহি কব।

নতিস্বীকার

তপন-উদয়ে হবে মহিমার ক্ষয়
তবু প্রভাতের চাঁদ শান্তমুখে কয়,
অপেক্ষা করিয়া আছি অস্তসিন্ধুতীরে
প্রণাম করিয়া যাব উদিত রবিরে।

পরস্পর

বাণী কহে, তোমারে যখন দেখি, কাজ,
আপনার শূন্যতায় বড়ো পাই লাজ।
কাজ শুনি কহে, অয়ি পরিপূর্ণা বাণী,
নিজেরে তোমার কাছে দীন বলে জানি।

বলের অপেক্ষা বলী

ধাইল প্রচণ্ড ঝড়, বাধাইল রণ—
কে শেষে হইল জয়ী?—মৃদু সমীরণ।

কর্তব্যগ্রহণ

কে লইবে মোর কার্য, কহে সন্ধ্যা-রবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।

ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি

রাত্রে যদি সূর্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা
সূর্য নাহি ফেরে শুধু ব্যর্থ হয় তারা।

মোহ

নদীর এ পার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
ও পারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ও পার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
কহে, যাহা-কিছু সুখ সকলি ও পারে।

ফুল ও ফল

ফুল কহে ফুকারিয়া, ফল, ওরে ফল,
কত দূরে রয়েছিস বল্ মোরে বল্।
ফল কহে, মহাশয়, কেন হাঁকাহাঁকি,
তোমারি অন্তরে আমি নিরন্তর থাকি।

অস্ফুট ও পরিস্ফুট

ঘটিজল বলে, ওগো মহাপারাবার,
আমি স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল, তুমি অন্ধকার।
ক্ষুদ্র সত্য বলে, মোর পরিষ্কার কথা,
মহাসত্য তোমার মহান নীরবতা।

প্রশ্নের অতীত

হে সমুদ্র, চিরকাল কী তোমার ভাষা।
সমুদ্র কহিল, মোর অনন্ত জিজ্ঞাসা।
কিসের স্তব্ধতা তব ওগো গিরিবর।
হিমাদ্রি কহিল, মোর চির-নিরুত্তর।

স্বাধীনতা

শর ভাবে, ছুটে চলি, আমি তো স্বাধীন,
ধনুকটা এক ঠাঁই বদ্ধ চিরদিন।
ধনু হেসে বলে, শর, জান না সে কথা
আমারি অধীন জেনো তব স্বাধীনতা।

বিফল নিন্দা

তোরে সবে নিন্দা করে গুণহীন ফুল।
শুনিয়া নীরবে হাসি কহিল শিমুল,
যতক্ষণ নিন্দা করে, আমি চুপে চুপে
ফুটে উঠি আপনার পরিপূর্ণ রূপে।

মোহের আশঙ্কা

শিশু পুষ্প আঁখি মেলি হেরিল এ ধরা
শ্যামল, সুন্দর, স্নিগ্ধ, গীতগন্ধভরা।
বিশ্বজগতেরে ডাকি কহিল, হে প্রিয়,
আমি যত কাল থাকি তুমিও থাকিয়ো।

স্তুতি নিন্দা

স্তুতি নিন্দা বলে আসি, গুণ মহাশয়,
আমরা কে মিত্র তব? গুণ শুনি কয়,
দুজনেই মিত্র তোরা শত্রু দুজনেই—
তাই ভাবি শত্রু মিত্র কারে কাজ নেই।

পর ও আত্মীয়

ছাই বলে, শিখা মোর ভাই আপনার,
ধোঁয়া বলে, আমি তো যমজ ভাই তার।
জোনাকি কহিল, মোর কুটুম্বিতা নাই
তোমাদের চেয়ে আমি বেশি তার ভাই।

আদিরহস্য

বাঁশি বলে, মোর কিছু নাহিকো গৌরব,
কেবল ফুঁয়ের জোরে মোর কলরব।
ফুঁ কহিল, আমি ফাঁকি, শুধু হাওয়াখানি—
যে জন বাজায় তারে কেহ নাহি জানি।

অদৃশ্য কারণ

রজনী গোপনে বনে ডালপালা ভ'রে
কুঁড়িগুলি ফুটাইয়া নিজে যায় স'রে।
ফুল জাগি বলে, মোরা প্রভাতের ফুল,
মুখর প্রভাত বলে, নাহি তাহে ভুল।

সত্যের সংযম

স্বপ্ন কহে, আমি মুক্ত, নিয়মের পিছে
নাহি চলি। সত্য কহে, তাই তুমি মিছে।
স্বপ্ন কয়, তুমি বদ্ধ অনন্ত শৃঙ্খলে।
সত্য কয়, তাই মোরে সত্য সবে বলে।

সৌন্দর্যের সংযম

নর কহে, বীর মোরা যাহা ইচ্ছা করি।
নারী কহে জিহ্বা কাটি, শুনে লাজে মরি।
পদে পদে বাধা তব, কহে তারে নর।
কবি কহে, তাই নারী হয়েছে সুন্দর।

মহতের দুঃখ

সূর্য দুঃখ করি বলে নিন্দা শুনি স্বীয়,
কী করিলে হব আমি সকলের প্রিয়।
বিধি কহে, ছাড়ো তবে এ সৌর সমাজ,
দু-চারি জনেরে লয়ে করো ক্ষুদ্র কাজ।

অনুরাগ ও বৈরাগ্য

প্রেম কহে, হে বৈরাগ্য, তব ধর্ম মিছে।
প্রেম, তুমি মহামোহ—বৈরাগ্য কহিছে—
আমি কহি, ছাড়্ স্বার্থ, মুক্তিপথ দেখ্।
প্রেম কহে, তা হলে তো তুমি আমি এক।

বিরাম

বিরাম কাজেরই অঙ্গ এক সাথে গাঁথা,
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।

জীবন

জন্ম মৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা,
যেমন চলার অঙ্গ পা-তোলা পা-ফেলা।

অপরিবর্তনীয়

এক যদি আর হয় কী ঘটিবে তবে।
এখনো যা হয়ে থাকে, তখনো তা হবে।
তখন সকল দুঃখ ঘোচে যদি ভাই,
এখন যা সুখ আছে দুঃখ হবে তাই।

অপরিহরণীয়

মৃত্যু কহে, পুত্র নিব, চোর কহে, ধন,
ভাগ্য কহে, সব নিব যা তোর আপন।
নিন্দুক কহিল, লব তব যশোভার,
কবি কহে, কে লইবে আনন্দ আমার।

সুখদুঃখ

শ্রাবণের মোটা ফোঁটা বাজিল যূথীরে,
কহিল, মরিনু হায় কার মৃত্যুতীরে।
বৃষ্টি কহে, শুভ আমি নামি মর্ত্য-মাঝে,
কারে সুখরূপে লাগে কারে দুঃখ বাজে।

চালক

অদৃষ্টেরে শুধালেম, চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে।
সে কহিল, ফিরে দেখো। দেখিলাম থামি
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি।

সত্যের আবিষ্কার

কহিলেন বসুন্ধরা, দিনের আলোকে
আমি ছাড়া আর কিছু পড়িত না চোখে।
রাত্রে আমি লুপ্ত যবে, শূন্যে দিল দেখা
অনন্ত এ জগতের জ্যোতির্ময়ী লেখা।

সুসময়

শোকের বরষা দিন এসেছে আঁধারি
ও ভাই গৃহস্থ চাষী ছেড়ে আয় বাড়ি।
ভিজিয়া নরম হল শুষ্ক মরু মন,
এই বেলা শস্য তোর করে নে বপন।

ছলনা

সংসার মোহিনী নারী কহিল সে মোরে,
তুমি আমি বাঁধা রব নিত্য প্রেমডোরে।
যখন ফুরায়ে গেল সব লেনা-দেনা,
কহিল, ভেবেছ বুঝি উঠিতে হবে না।

সজ্ঞান আত্মবিসর্জন

বীর কহে, হে সংসার, হায় রে পৃথিবী,
ভাবিস নে মোরে কিছু ভুলাইয়া নিবি।
আমি যাহা দিই তাহা দিই জেনেশুনে,
ফাঁকি দিয়ে যা পেতিস তার শতগুণে।

স্পষ্ট সত্য

সংসার কহিল, মোর নাহি কপটতা,
জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ, সবই স্পষ্ট কথা।
আমি নিত্য কহিতেছি যথাসত্য বাণী,
তুমি নিত্য লইতেছ মিথ্যা অর্থখানি।

আরম্ভ ও শেষ

শেষ কহে, এক দিন সব শেষ হবে,
হে আরম্ভ, বৃথা তব অহংকার তবে।
আরম্ভ কহিল, ভাই, যেথা শেষ হয়
সেইখানে পুনরায় আরম্ভ উদয়।

বস্ত্রহরণ

সংসারে জিনেছি ব'লে দুরন্ত মরণ
জীবন বসন তার করিছে হরণ।
যত বস্ত্রে টান দেয়, বিধাতার বরে
বস্ত্র বাড়ি চলে তত নিত্যকাল ধ'রে।

চিরনবীনতা

দিনান্তের মুখ চুম্বি রাত্রি ধীরে কয়,
আমি মৃত্যু তোর মাতা, নাহি মোরে ভয়।
নব নব জন্মদানে পুরাতন দিন
আমি তোরে ক'রে দিই প্রত্যহ নবীন।

মৃত্যু

ওগো মৃত্যু, তুমি যদি হতে শূন্যময়
মুহূর্তে নিখিল তবে হয়ে যেত লয়।
তুমি পরিপূর্ণ রূপ, তব বক্ষে কোলে
জগৎ শিশুর মতো নিত্যকাল দোলে।

শক্তির শক্তি

দিবসে চক্ষুর দম্ভ দৃষ্টিশক্তি লয়ে,
রাত্রি যেই হল সেই অশ্রু যায় বয়ে।
আলোরে কহিল, আজ বুঝিয়াছি ঠিক
তোমারি প্রসাদবলে তোমারেই দেখি।

ধ্রুব সত্য

আমি বিন্দুমাত্র আলো, মনে হয় তবু
আমি শুধু আছি আর কিছু নাই কভু।
পলক পড়িলে দেখি আড়ালে আমার
তুমি আছ হে অনাদি আদি অন্ধকার।

এক পরিণাম

শেফালি কহিল, আমি ঝরিলাম, তারা।
তারা কহে, আমারো তো হল কাজ সারা—
ভরিলাম রজনীর বিদায়ের ডালি
আকাশের তারা আর বনের শেফালি।

কথা

বিজ্ঞাপন

প্রথম সংস্করণ

এই গ্রন্থে যে-সকল বৌদ্ধ কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সংকলিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধীয় ইংরাজি গ্রন্থ হইতে গৃহীত। রাজপুত কাহিনী-গুলি টডের রাজস্থান ও শিখ বিবরণগুলি দুই-একটি ইংরাজি শিখ ইতিহাস হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ভক্তমাল হইতে বৈষ্ণব গল্পগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। মূলের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে— আশা করি সেই পরিবর্তনের জন্য সাহিত্যনীতি-বিধানমতে দণ্ডনীয় গণ্য হইব না।

গ্রন্থকার

সূচনা

একদিন এল যখন আর-একটা ধারা বন্যার মতো মনের মধ্যে নামল। কিছুদিন ধরে দিল তাকে প্লাবিত করে। ইংরেজি অলংকারশাস্ত্রে এই শ্রেণীর ধারাকে বলে ন্যারেটিভ। অর্থাৎ কাহিনী। এর আনন্দবেগ যেন থামতে চাইল না। আমার কাব্যভূগোলে আর-একটা দ্বীপ তৈরি হয়ে উঠল। মনের সেই অবস্থায় কখনো কখনো কাহিনী বড়ো ধারায় উৎসারিত হয়ে নাট্যরূপ নিল।

এ-সব লেখার ভালোমন্দ বিচার করা অনাবশ্যক, চিন্তার বিষয় এর মনস্তত্ত্ব। রচনার প্রবৃত্তি অনেক থাকে নিষ্ক্রিয় হয়ে, হঠাৎ কোনো-একটা প্রান্তে উদ্বোধিত হলে যারা ছিল অজ্ঞাতবাসে তারা যথোচিত সূত্রে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে। ভালো করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে 'কথা'র কবিতাগুলিকে ন্যারেটিভ শ্রেণীতে গণ্য করলেও তারা চিত্রশালা। তাদের মধ্যে গল্পের শিকল গাঁথা নেই, তারা এক-একটি খণ্ড খণ্ড দৃশ্য।

ছবির অভিমুখিতা বাইরের দিকে, নিরাবিল দৃষ্টিতে স্পষ্ট রেখায়। সেইজন্যে মনের মধ্যে এই ছবির প্রবর্তনা এমন বিষয়বস্তুকে স্বভাবত বেছে নেয় যার ভিত্তি বাস্তবে। এই সন্ধানে এক সময়ে গিয়ে পড়েছিলুম ইতিহাসের রাজ্যে। সেই সময়ে এই বহির্দৃষ্টির প্রেরণা কাব্যে ও নাট্যে ভিড় করে এসেছিল ইতিহাসের সঞ্চয় নিয়ে। এমনি করে এই সময়ে আমার কাব্যে একটা মহল তৈরি হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে, যার রস নেমেছে কাহিনীতে, যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তায়।

২০ জুলাই ১৯৪০
শান্তিনিকেতন

উৎসর্গ

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানাচার্য
করকমলেষু

সত্য রত্ন তুমি দিলে, পরিবর্তে তার
কথা ও কল্পনামাত্র দিনু উপহার।

শিলাইদহ
অগ্রহায়ণ ১৩০৬

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা

অবদানশতক

অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন

'প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী কে রয়েছ জাগি'
অনাথপিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ-
নিনাদে।
সদ্য মেলিতেছে তরুণ তপন
আলস্যে অরুণ সহাস্য লোচন
শ্রাবস্তীপুরীর গগন-লগন-
প্রাসাদে।
বৈতালিকদল সুপ্তিতে শয়ান,
এখনো ধরে নি মাঙ্গলিক গান,
দ্বিধাভরে পিক মৃদু কুহুতান
কুহরে।
ভিক্ষু কহে ডাকি, 'হে নিদ্রিত পুর,
দেহো ভিক্ষা মোরে, করো নিদ্রা দূর'—
সুপ্ত পৌরজন শুনি সেই সুর
শিহরে।
সাধু কহে, 'শুন, মেঘ বরিষার
নিজেরে নাশিয়া দেয় বৃষ্টিধার,
সব ধর্ম-মাঝে ত্যাগধর্ম সার
ভুবনে।'
কৈলাসশিখর হতে দূরাগত
ভৈরবের মহাসংগীতের মতো
সে বাণী মন্দ্রিল সুখতন্দ্রারত
ভবনে।
রাজা জাগি ভাবে বৃথা রাজ্য ধন,
গৃহী ভাবে মিছা তুচ্ছ আয়োজন,
অশ্রু অকারণে করে বিসর্জন
বালিকা।
যে ললিত সুখে হৃদয় অধীর,
মনে হল, তাহা গত যামিনীর
স্খলিত দলিত শুষ্ক কামিনীর
মালিকা।
বাতায়ন খুলে যায় ঘরে ঘরে,
ঘুম-ভাঙা আঁখি ফুটে থরে থরে

অন্ধকার পথ কৌতূহলভরে
নেহারি।
'জাগো, ভিক্ষা দাও' সবে ডাকি ডাকি,
সুপ্ত সৌধে তুলি নিদ্রাহীন আঁখি,
শূন্য রাজবাটে চলেছে একাকী
ভিখারী।
ফেলি দিল পথে বণিক-ধনিকা
মুঠি মুঠি তুলি রতন-কণিকা,
কেহ কণ্ঠহার, মাথার মণিকা
কেহ গো।
ধনী স্বর্ণ আনে থালি পুরে পুরে,
সাধু নাহি চাহে, পড়ে থাকে দূরে,
ভিক্ষু কহে, 'ভিক্ষা আমার প্রভুরে
দেহো গো।'
বসনে ভূষণে ঢাকি গেল ধূলি,
কনকে রতনে খেলিল বিজুলি,
সন্ন্যাসী ফুকারে লয়ে শূন্য ঝুলি
সঘনে—
'ওগো পৌরজন, করো অবধান,
ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ তিনি, বুদ্ধ ভগবান,
দেহো তাঁরে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ দান
যতনে।'
ফিরে যায় রাজা, ফিরে যায় শেঠ,
মিলে না প্রভুর যোগ্য কোনো ভেট,
বিশাল নগরী লাজে রহে হেঁট-
আননে।
রৌদ্র উঠে ফুটে, জেগে উঠে দেশ,
মহানগরীর পথ হল শেষ,
পুরপ্রান্তে সাধু করিলা প্রবেশ
কাননে।
দীন নারী এক ভূতল-শয়ন
না ছিল তাহার অশন ভূষণ,
সে আসি নমিল সাধুর চরণ-
কমলে।
অরণ্য-আড়ালে রহি কোনোমতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে,
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
ভূতলে।
ভিক্ষু ঊর্ধ্বভুজে করে জয়নাদ,
কহে, 'ধন্য মাতঃ, করি আশীর্বাদ,
মহাভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ
পলকে।'

চলিলা সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর,
সঁপিতে বুদ্ধের চরণ-নখর-
আলোকে।

৫ কার্তিক ১৩০৪

প্রতিনিধি

অ্যাক্‌ওয়ার্থ্‌ সাহেব কয়েকটি মারাঠি গাথার যে ইংরেজি অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই ভূমিকা হইতে বর্ণিত ঘটনা গৃহীত। শিবাজির গেরুয়া পতাকা 'ভাগোয়া ঝন্ডা' নামে খ্যাত।

বসিয়া প্রভাতকালে সেতারার দুর্গভালে
শিবাজি হেরিলা এক দিন—
রামদাস গুরু তাঁর ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার
ফিরিছেন যেন অন্নহীন।
ভাবিলা, এ কী এ কাণ্ড! গুরুজির ভিক্ষাভাণ্ড!
ঘরে যাঁর নাই দৈন্যলেশ!
সবই যাঁর হস্তগত, রাজেশ্বর পদানত,
তাঁরো নাই বাসনার শেষ?

এ কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে।
কহিলা, 'দেখিতে হবে কতখানি দিলে তবে
ভিক্ষাঝুলি ভরে একেবারে।'
তখনি লেখনী আনি কী লিখি দিলা কী জানি,
বালাজিরে কহিলা ডাকায়ে,
'গুরু যবে ভিক্ষা-আশে আসিবেন দুর্গ-পাশে
এই লিপি দিয়ো তাঁর পায়ে।'

গুরু চলেছেন গেয়ে, সম্মুখে চলেছে ধেয়ে
কত পান্থ, কত অশ্বরথ;
'হে ভবেশ, হে শংকর, সবারে দিয়েছ ঘর,
আমারে দিয়েছ শুধু পথ।
অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছে বিশ্বের ভার,
সুখে আছে সর্ব চরাচর—
মোরে তুমি হে ভিখারী, মার কাছ হতে কাড়ি,
করেছ আপন অনুচর।'

সমাপন করি গান সারিয়া মধ্যাহ্ন-স্নান
দুর্গদ্বারে আসিলা যখন—
বালাজি নমিয়া তাঁরে দাঁড়াইল এক ধারে
পদমূলে রাখিয়া লিখন।

গুরু কৌতূহলভরে তুলিয়া লইলা করে,
পড়িয়া দেখিলা পত্রখানি—
বন্দি' তাঁর পাদপদ্ম শিবাজি সঁপিছে অদ্য
তাঁরে নিজ রাজ্য-রাজধানী।

পরদিনে রামদাস গেলেন রাজার পাশ,
কহিলেন, 'পুত্র, কহো শুনি,
রাজ্য যদি মোরে দেবে কী কাজে লাগিবে এবে—
কোন্ গুণ আছে তব, গুণী?'
'তোমারি দাসত্বে প্রাণ আনন্দে করিব দান'
শিবাজি কহিলা নমি তাঁরে,
গুরু কহে, 'এই ঝুলি লহো তবে স্কন্ধে তুলি,
চলো আজি ভিক্ষা করিবারে।'

শিবাজি গুরুর সাথে ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে
ফিরিলেন পুরম্বারে দ্বারে।
নৃপে হেরি ছেলেমেয়ে ভয়ে ঘরে যায় ধেয়ে
ডেকে আনে পিতারে মাতারে।
অতুল ঐশ্বর্যে রত, তাঁর ভিখারীর ব্রত,
এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা!
ভিক্ষা দেয় লজ্জাভরে, হস্ত কাঁপে থরথরে,
ভাবে, ইহা মহতের লীলা।

দুর্গে দ্বিপ্রহর বাজে, ক্ষান্ত দিয়া কর্মকাজে
বিশ্রাম করিছে পুরবাসী।
একতারে দিয়ে তান রামদাস গাহে গান
আনন্দে নয়নজলে ভাসি,
'ওহে ত্রিভুবনপতি, বুঝি না তোমার মতি,
কিছুই অভাব তব নাহি,
হৃদয়ে হৃদয়ে তবু ভিক্ষা মাগি ফির প্রভু,
সবার সর্বস্বধন চাহি।'

অবশেষে দিবসান্তে নগরের এক প্রান্তে
নদীকূলে সন্ধ্যা-স্নান সারি—
ভিক্ষা-অন্ন রাঁধি সুখে গুরু কিছু দিলা মুখে,
প্রসাদ পাইল শিষ্য তাঁরি।
রাজা তবে কহে হাসি, 'নৃপতির গর্ব নাশি
করিয়াছ পথের ভিক্ষুক—
প্রস্তুত রয়েছে দাস, আরো কিবা অভিলাষ,
গুরু কাছে লব গুরু দুখ।'

গুরু কহে, 'তবে শোন্, করিলি কঠিন পণ,
অনুরূপ নিতে হবে ভার,
এই আমি দিনু কয়ে মোর নামে মোর হয়ে
রাজ্য তুমি লহো পুনর্বার।
তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি,
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন।
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।

'বৎস, তবে এই লহো মোর আশীর্বাদসহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস—
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো'
কহিলেন গুরু রামদাস।
নৃপশিষ্য নতশিরে বসি রহে নদীতীরে,
চিন্তারাশি ঘনায় ললাটে।
থামিল রাখাল-বেণু, গোঠে ফিরে গেল ধেনু,
পরপারে সূর্য গেল পাটে।

পূরবীতে ধরি তান একমনে রচি গান
গাহিতে লাগিলা রামদাস,
'আমারে রাজার সাজে বসায়ে সংসার-মাঝে
কে তুমি আড়ালে কর বাস!
হে রাজা, রেখেছি আনি, তোমারি পাদুকাখানি
আমি থাকি পাদপীঠতলে;
সন্ধ্যা হয়ে এল ওই, আর কত বসে রই!
তব রাজ্যে তুমি এসো চলে।'

৬ কার্তিক ১৩০৪

দেবতার গ্রাস

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে
মৈত্রমহাশয় যাবে সাগরসংগমে
তীর্থস্নান লাগি। সঙ্গীদল গেল জুটি
কত বালবৃদ্ধ নরনারী; নৌকা দুটি
প্রস্তুত হইল ঘাটে।
পুণ্যলোভাতুর
মোক্ষদা কহিল আসি, 'হে দাদাঠাকুর,
আমি তব হব সাথী।' বিধবা যুবতী,
দুখানি করুণ আঁখি মানে না যুকতি,
কেবল মিনতি করে, অনুরোধ তার
এড়ানো কঠিন বড়ো— 'স্থান কোথা আর'

মৈত্র কহিলেন তারে। 'পায়ে ধরি তব'
বিধবা কহিল কাঁদি, 'স্থান করি লব
কোনোমতে এক ধারে।' ভিজে গেল মন,
তবু দ্বিধাভরে তারে শুধাল ব্রাহ্মণ,
'নাবালক ছেলেটির কী করিবে তবে?'
উত্তর করিল নারী, 'রাখাল? সে রবে
আপন মাসির কাছে। তার জন্মপরে
বহুদিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে—
বাঁচিব ছিল না আশা; অন্নদা তখন
আপন শিশুর সাথে দিয়ে তারে স্তন
মানুষ করেছে যত্নে—সেই হতে ছেলে
মাসির আদরে আছে মার কোল ফেলে।
দুরন্ত মানে না কারে, করিলে শাসন
মাসি আসি অশ্রুজলে ভরিয়া নয়ন
কোলে তারে টেনে লয়। সে থাকিবে সুখে
মার চেয়ে আপনার মাসিমার বুকে।'

সম্মত হইল বিপ্র। মোক্ষদা সত্বর
প্রস্তুত হইল—বাঁধি জিনিসপত্তর,
প্রণমিয়া গুরুজনে, সখীদলবলে
ভাসাইয়া বিদায়ের শোক-অশ্রুজলে।
ঘাটে আসি দেখে, সেথা আগেভাগে ছুটি
রাখাল বসিয়া আছে তরী-'পরে উঠি
নিশ্চিন্ত নীরবে। 'তুই হেথা কেন ওরে'
মা শুধাল; সে কহিল, 'যাইব সাগরে।'
'যাইবি সাগরে! আরে, ওরে দস্যু ছেলে,
নেমে আয়।' পুনরায় দৃঢ় চক্ষু মেলে
সে কহিল দুটি কথা, 'যাইব সাগরে।'
যত তার বাহু ধরি টানাটানি করে
রহিল সে তরণী আঁকড়ি। অবশেষে
ব্রাহ্মণ করুণ স্নেহে কহিলেন হেসে,
'থাক্ থাক্ সঙ্গে যাক।' মা রাগিয়া বলে,
'চল্ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে!'
যেমনি সে কথা গেল আপনার কানে
অমনি মায়ের বক্ষ অনুতাপ-বাণে
বিঁধিয়া কাঁদিয়া উঠে। মুদিয়া নয়ন
'নারায়ণ নারায়ণ' করিল স্মরণ।
পুত্রে নিল কোলে তুলি, তার সর্বদেহে
করুণ কল্যাণহস্ত বুলাইল স্নেহে।
মৈত্র তারে ডাকি ধীরে চুপিচুপি কয়,
'ছি ছি ছি, এমন কথা বলিবার নয়।'

রাখাল যাইবে সাথে স্থির হল কথা—
অন্নদা লোকের মুখে শুনি সে বারতা
ছুটে আসি বলে, 'বাছা, কোথা যাবি ওরে!'
রাখাল কহিল হাসি, 'চলিনু সাগরে,
আবার ফিরিব মাসি!' পাগলের প্রায়
অন্নদা কহিল ডাকি, 'ঠাকুরমশায়,
বড়ো যে দুরন্ত ছেলে রাখাল আমার,
কে তাহারে সামালিবে? জন্ম হতে তার
মাসি ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকে নি কোথাও,
কোথা এরে নিয়ে যাবে, ফিরে দিয়ে যাও।'
রাখাল কহিল, 'মাসি, যাইব সাগরে,
আবার ফিরিব আমি।' বিপ্র স্নেহভরে
কহিলেন, 'যতক্ষণ আমি আছি ভাই,
তোমার রাখাল লাগি কোনো ভয় নাই।
এখন শীতের দিন শান্ত নদীনদ,
অনেক যাত্রীর মেলা, পথের বিপদ
কিছু নাই, যাতায়াতে মাস-দুই কাল,
তোমারে ফিরায়ে দিব তোমার রাখাল।'

শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি নৌকা দিল ছাড়ি।
দাঁড়ায়ে রহিল ঘাটে যত কুলনারী
অশ্রুচোখে। হেমন্তের প্রভাত-শিশিরে
ছলছল করে গ্রাম চূর্ণীনদীতীরে।

যাত্রীদল ফিরে আসে; সাঙ্গ হল মেলা।
তরণী তীরেতে বাঁধা অপরাহ্ণবেলা
জোয়ারের আশে। কৌতূহল অবসান,
কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ
মাসির কোলের লাগি। জল শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছল-ভরা, তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের, লালায়িত মুখ।
হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক,
অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন,
সর্ব-উপদ্রবসহা আনন্দভবন
শ্যামলকোমলা! যেথা যে কেহই থাকে
অদৃশ্য দু-বাহু মেলি টানিছ তাহাকে
অহরহ, অয়ি মুগ্ধে, কী বিপুল টানে
দিগন্তবিস্তৃত তব শান্ত বক্ষ-প্যানে!

চঞ্চল বালক আসি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
অধীর উৎসুক কণ্ঠে শুধায় ব্রাহ্মণে,
'ঠাকুর, কখন আজি আসিবে জোয়ার?'
সহসা স্তিমিত জলে আবেগসঞ্চার
দুই কূল চেতাইল আশার সংবাদে।
ফিরিল তরীর মুখ, মৃদু আর্তনাদে
কাছিতে পড়িল টান, কলশব্দগীতে
সিন্ধুর বিজয়রথ পশিল নদীতে—
আসিল জোয়ার। মাঝি দেবতারে স্মরি
ত্বরিত উত্তর-মুখে খুলে দিল তরী।
রাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের কাছে,
'দেশে পঁহুছিতে আর কত দিন আছে?'

সূর্য অস্ত না যাইতে, ক্রোশ-দুই ছেড়ে
উত্তর-বায়ুর বেগ ক্রমে ওঠে বেড়ে।
রূপনারানের মুখে পড়ি বালুচর
সংকীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তর-সমীরে
উত্তাল উদ্দাম। 'তরণী ভিড়াও তীরে'
উচ্চকণ্ঠে বারংবার কহে যাত্রীদল।
কোথা তীর? চারি দিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্র নৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে। এক দিকে যায় দেখা
অতিদূর তীরপ্রান্তে নীল বনরেখা,
অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্যাস্ত-পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধত বিদ্রোহভরে। নাহি মানে হাল,
ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল
মূঢ়সম। তীব্র শীতপবনের সনে
মিশিয়া ত্রাসের হিম নরনারীগণে
কাঁপাইছে থরথরি। কেহ হতবাক,
কেহ বা ক্রন্দন করে ছাড়ি উর্ধ্বডাক,
ডাকি আত্মজনে। মৈত্র শুষ্ক পাংশুমুখে
চক্ষু মুদি করে জপ। জননীর বুকে
রাখাল লুকায়ে মুখ কাঁপিছে নীরবে।
তখন বিপন্ন মাঝি ডাকি কহে সবে,
'বাবারে দিয়েছে ফাঁকি তোমাদের কেউ,
যা মেনেছে দেয় নাই, তাই এত ঢেউ,
অসময়ে এ তুফান! শুন এই বেলা,
করহ মানত রক্ষা—করিয়ো না খেলা

ক্রুদ্ধ দেবতার সনে।' যার যত ছিল
অর্থ বস্ত্র যাহা-কিছু জলে ফেলি দিল
না করি বিচার। তবু তখনি পলকে
তরীতে উঠিল জল দারুণ ঝলকে।
মাঝি কহে পুনর্বার, 'দেবতার ধন
কে যায় ফিরায়ে লয়ে এই বেলা শোন্।'
ব্রাহ্মণ সহসা উঠি কহিলা তখনি
মোক্ষদারে লক্ষ্য করি, 'এই সে রমণী
দেবতারে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে
চুরি করে নিয়ে যায়।' 'দাও তারে ফেলে'
এক বাক্যে গর্জি ওঠে তরাসে নিষ্ঠুর
যাত্রী সবে। কহে নারী, 'হে দাদাঠাকুর,
রক্ষা করো, রক্ষা করো!' দুই দৃঢ় করে
রাখালেরে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরে।
ভর্ৎসিয়া গর্জিয়া উঠি কহিলা ব্রাহ্মণ,
'আমি তোর রক্ষাকর্তা! রোষে নিশ্চেতন
মা হয়ে আপন পুত্র দিলি দেবতারে,
শেষকালে আমি রক্ষা করিব তাহারে!
শোধ্ দেবতার ঋণ; সত্য ভঙ্গ করে
এতগুলি প্রাণী তুই ডুবাবি সাগরে!'

মোক্ষদা কহিল, 'অতি মূর্খ নারী আমি,
কী বলেছি রোষবশে—ওগো অন্তর্যামী,
সেই সত্য হল? সে যে মিথ্যা কতদূর
তখনি শুনে কি তুমি বোঝ নি ঠাকুর।
শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা।
শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা।'
বলিতে বলিতে যত মিলি মাঝি-দাঁড়ি
বল করি রাখালেরে নিল ছিঁড়ি কাড়ি
মার বক্ষ হতে। মৈত্র মুদি দুই আঁখি
ফিরায়ে রহিল মুখ কানে হাত ঢাকি,
দন্তে দন্ত চাপি বলে। কে তারে সহসা
মর্মে মর্মে আঘাতিল বিদ্যুতের কশা,
দংশিল বৃশ্চিকদংশ। 'মাসি, মাসি, মাসি'
বিন্ধিল বহ্নির শলা রুদ্ধ কর্ণে আসি
নিরুপায় অনাথের অন্তিমের ডাক।
চীৎকারি উঠিল বিপ্র, 'রাখ্ রাখ্ রাখ্!'
চকিতে হেরিল চাহি মূর্ছি আছে প'ড়ে
মোক্ষদা চরণে তাঁর। মুহূর্তের তরে
ফুটন্ত তরঙ্গ-মাঝে মেলি আর্ত চোখ
'মাসি' বলি ফুকারিয়া মিলাল বালক

অনন্ততিমিরতলে; শুধু ক্ষীণ মুঠি
বারেক ব্যাকুল বলে ঊর্ধ্ব-পানে উঠি
আকাশে আশ্রয় খুঁজি ডুবিল হতাশে।
'ফিরায়ে আনিব তোরে' কহি ঊর্ধ্বশ্বাসে
ব্রাহ্মণ মুহূর্ত-মাঝে ঝাঁপ দিল জলে!
আর উঠিল না। সূর্য গেল অস্তাচলে।

১৩ কার্তিক ১৩০৪

মস্তকবিক্রয়

মহাবস্তুবদান

কোশলনৃপতির তুলনা নাই,
জগৎ জুড়ি যশোগাথা;
ক্ষীণের তিনি সদা শরণ-ঠাঁই,
দীনের তিনি পিতামাতা।
সে কথা কাশীরাজ শুনিতে পেয়ে
জ্বলিয়া মরে অভিমানে—
'আমার প্রজাগণ আমার চেয়ে
তাহারে বড়ো করি মানে!
আমার হতে যার আসন নিচে
তাহার দান হল বেশি!
ধর্ম দয়া মায়া সকলি মিছে,
এ শুধু তার রেষারেষি।'
কহিলা, 'সেনাপতি, ধরো কৃপাণ,
সৈন্য করো সব জড়ো।
আমার চেয়ে হবে পুণ্যবান,
স্পর্ধা বাড়িয়াছে বড়ো!'
চলিলা কাশীরাজ যুদ্ধসাজে—
কোশলরাজ হারি রণে
রাজ্য ছাড়ি দিয়া ক্ষুব্ধ লাজে
পলায়ে গেল দূর বনে।
কাশীর রাজা হাসি কহে তখন
আপন সভাসদ-মাঝে,
'ক্ষমতা আছে যার রাখিতে ধন
তারেই দাতা হওয়া সাজে।'

সকলে কাঁদি বলে, 'দারুণ রাহু
এমন চাঁদেরেও হানে!
লক্ষ্মী খোঁজে শুধু বলীর বাহু,
চাহে না ধর্মের পানে!'

'আমরা হইলাম পিতৃহারা'
কাঁদিয়া কহে দশ দিক—
'সকল জগতের বন্ধু যাঁরা
তাঁদের শত্রুরে ধিক্!'
শুনিয়া কাশীরাজ উঠিল রাগি,
'নগরে কেন এত শোক!
আমি তো আছি, তবু কাহার লাগি
কাঁদিয়া মরে যত লোক!
আমার বাহুবলে হারিয়া তবু
আমারে করিবে সে জয়!
অরির শেষ নাহি রাখিবে কভু,
শাস্ত্রে এইমতো কয়।
মন্ত্রী, রটি দাও নগর-মাঝে,
ঘোষণা করো চারি ধারে—
যে ধরি আনি দিবে কোশলরাজে
কনক শত দিব তারে।'
ফিরিয়া রাজদূত সকল বাটী
রটনা করে দিনরাত:
যে শোনে আঁখি মুদি রসনা কাটি
শিহরি কানে দেয় হাত।

রাজ্যহীন রাজা গহনে ফিরে
মলিন চীর দীনবেশে,
পথিক একজন অশ্রুনীরে
একদা শুধাইল এসে,
'কোথা গো বনবাসী, বনের শেষ,
কোশলে যাব কোন্ মুখে?'
শুনিয়া রাজা কহে, 'অভাগা দেশ,
সেথায় যাবে কোন্ দুখে!'
পথিক কহে, 'আমি বণিকজাতি,
ডুবিয়া গেছে মোর তরী।
এখন দ্বারে দ্বারে হস্ত পাতি
কেমনে রব প্রাণ ধরি!
করুণা-পারাবার কোশলপতি
শুনেছি নাম চারি ধারে,
অনাথনাথ তিনি দীনের গতি,
চলেছে দীন তাঁরি দ্বারে।'
শুনিয়া নৃপসুত ঈষৎ হেসে
রুধিলা নয়নের বারি,
নীরবে ক্ষণকাল ভাবিয়া শেষে
কহিলা নিশ্বাস ছাড়ি,

'পান্থ, যেথা তব বাসনা পূরে
দেখায়ে দিব তারি পথ।
এসেছ বহু দুখে অনেক দূরে,
সিদ্ধ হবে মনোরথ।'

বসিয়া কাশীরাজ সভার মাঝে;
দাঁড়াল জটাধারী এসে।
'হেথায় আগমন কিসের কাজে'
নৃপতি শুধাইল হেসে।
'কোশলরাজ আমি, বন-ভবন'
কহিলা বনবাসী ধীরে,
'আমার ধরা পেলে যা দিবে পণ
দেহো তা মোর সাথীটিরে।'
উঠিল চমকিয়া সভার লোকে,
নীরব হল গৃহতল,
বর্ম-আবরিত দ্বারীর চোখে
অশ্রু করে ছলছল।
মৌন রহি রাজা ক্ষণেকতরে
হাসিয়া কহে, 'ওহে বন্দী,
মরিয়া হবে জয়ী আমার 'পরে
এমনি করিয়াছ ফন্দি!
তোমার সে আশায় হানিব বাজ,
জিনিব আজিকার রণে—
রাজ্য ফিরি দিব হে মহারাজ,
হৃদয় দিব তারি সনে।'
জীর্ণ-চীর-পরা বনবাসীরে
বসাল নৃপ রাজাসনে,
মুকুট তুলি দিল মলিন শিরে—
ধন্য কহে পুরজনে।

২১ কার্তিক ১৩০৪

পূজারিনী

অবদানশতক

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা
পাদ-নখ-কণা তাঁর।
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদ-কাননে
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ
শিল্পশোভার সার।

সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি
 রাজবধূ রাজবালা
আসিতেন ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্তূপপদমূলে সোনার থালায়
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে
 কনক-প্রদীপমালা।

অজাতশত্রু রাজা হল যবে,
 পিতার আসনে আসি
পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হতে,
সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে
 বৌদ্ধশাস্ত্ররাশি।

কহিলা ডাকিয়া অজাতশত্রু
 রাজপুরনারী সবে,
'বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার,
এই ক'টি কথা জেনো মনে সার—
 ভুলিলে বিপদ হবে।'

সে দিন শারদ-দিবা অবসান—
 শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্যশীতল সলিলে নাহিয়া
পুষ্পপ্রদীপ থালায় বাহিয়া,
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
 নীরবে দাঁড়াল আসি।

শিহরি সভয়ে মহিষী কহিলা,
 'এ কথা নাহি কি মনে
অজাতশত্রু করেছে রটনা
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা
শূলের উপরে মরিবে সে জনা
 অথবা নির্বাসনে?'

সেথা হতে ফিরি গেল চলি ধীরি
 বধূ অমিতার ঘরে।
সমুখে রাখিয়া স্বর্ণ মুকুর
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর
 সীমন্তসীমা-'পরে।

শ্রীমতীরে হেরি বাঁকি গেল রেখা,
কাঁপি গেল তার হাত—
কহিল, 'অবোধ, কী সাহস-বলে
এনেছিস পূজা, এখনি যা চলে,
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা হলে
বিষম বিপদপাত।'

অস্ত-রবির রশ্মি-আভায়
খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি একাকিনী
পড়িতে নিরত কাব্যকাহিনী,
চমকি উঠিল শুনি কিঙ্কিণী
চাহিয়া দেখিল দ্বারে।

শ্রীমতীরে হেরি পুঁথি রাখি ভূমে
দ্রুতপদে গেল কাছে।
কহে সাবধানে তার কানে কানে,
'রাজার আদেশ আজি কে না জানে,
এমন ক'রে কি মরণের পানে
ছুটিয়া চলিতে আছে।'

দ্বার হতে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী
লইয়া অর্ঘ্যথালি।
'হে পুরবাসিনী' সবে ডাকি কয়,
'হয়েছে প্রভুর পূজার সময়'—
শুনি ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়,
কেহ দেয় তারে গালি।

দিবসের শেষ আলোক মিলাল
নগরসৌধ-'পরে।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
কলকোলাহল হয়ে এল ক্ষীণ,
আরতিঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন
রাজ-দেবালয় ঘরে।

শারদ-নিশির স্বচ্ছ তিমিরে
তারা অগণ্য জ্বলে।
সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
'মন্ত্রণাসভা হল সমাধান'
দ্বারী ফুকারিয়া বলে।

এমন সময়ে হেরিলা চমকি
প্রাসাদে প্রহরী যত—
রাজার বিজন কানন-মাঝারে
স্তূপপদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন যেন সারে সারে
প্রদীপমালার মতো।

মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক
তখনি ছুটিয়া আসি
শুধাল, 'কে তুই ওরে দুর্মতি,
মরিবার তরে করিস আরতি!'
মধুর কণ্ঠে শুনিল, 'শ্রীমতী
আমি বুদ্ধের দাসী।'

সে দিন শুভ্র পাষাণ-ফলকে
পড়িল রক্তলিখা।
সে দিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ-কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা!

১৮ আশ্বিন ১৩০৬

অভিসার

বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে
একদা ছিলেন সুপ্ত—
নগরীর দীপ নিবেছে পবনে,
দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে,
নিশীথের তারা শ্রাবণ-গগনে
ঘন মেঘে অবলুপ্ত।

কাহার নূপুরশিঞ্জিত পদ
সহসা বাজিল বক্ষে!
সন্ন্যাসীবর চমকি জাগিল,
স্বপ্নজড়িমা পলকে ভাগিল,
রূঢ় দীপের আলোক লাগিল
ক্ষমাসুন্দর চক্ষে।

নগরীর নটী চলে অভিসারে
যৌবনমদে মত্তা।
অঙ্গে আঁচল সুনীল বরন,
রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ;
সন্ন্যাসী-গায়ে পড়িতে চরণ
থামিল বাসবদত্তা।

প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার
নবীন গৌরকান্তি,
সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণাকিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দু-সমান
ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।

কহিল রমণী ললিত কণ্ঠে,
নয়নে জড়িত লজ্জা,
'ক্ষমা করো মোরে কুমার কিশোর,
দয়া কর যদি গৃহে চলো মোর,
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর,
এ নহে তোমার শয্যা।'

সন্ন্যাসী কহে করুণ বচনে,
'অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে,
এখনো আমার সময় হয় নি,
যেথায় চলেছ, যাও তুমি ধনী,
সময় যে দিন আসিবে, আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে।'

সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎশিখায়
মেলিল বিপুল আস্য।
রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে,
প্রলয়শঙ্খ বাজিল বাতাসে,
আকাশে বজ্র ঘোর পরিহাসে
হাসিল অট্টহাস্য।

বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ,
এসেছে চৈত্রসন্ধ্যা।
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,
পথতরুশাখে ধরেছে মুকুল,
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল
পারুল রজনীগন্ধা।

অতি দূর হতে আসিছে পবনে
বাঁশির মদির মন্দ্র।
জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে
গেছে মধুবনে ফুল-উৎসবে,
শূন্য নগরী নিরখি নীরবে
হাসিছে পূর্ণচন্দ্র।

নির্জন পথে জ্যোৎস্না-আলোতে
সন্ন্যাসী একা যাত্রী।
মাথার উপরে তরুবীথিকার
কোকিল কুহরি উঠে বারবার,
এতদিন পরে এসেছে কি তাঁর
আজি অভিসাররাত্রি?

নগর ছাড়ায়ে গেলেন দণ্ডী
বাহির প্রাচীর-প্রান্তে।
দাঁড়ালেন আসি পরিখার পারে,
আম্রবনের ছায়ার আঁধারে
কে ওই রমণী প'ড়ে এক ধারে
তাঁহার চরণোপান্তে!

নিদারুণ রোগে মারী-গুটিকায়
ভরে গেছে তার অঙ্গ,
রোগমসী-ঢালা কালি তনু তার
লয়ে প্রজাগণে পুর-পরিখার
বাহিরে ফেলেছে, করি পরিহার
বিষাক্ত তার সঙ্গ।

সন্ন্যাসী বসি আড়ষ্ট শির
তুলি নিল নিজ অঙ্কে।
ঢালি দিল জল শুষ্ক অধরে,
মন্ত্র পড়িয়া দিল শির-'পরে,
লেপি দিল দেহ আপনার করে
শীতচন্দনপঙ্কে।

ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল,
যামিনী জোছনামত্তা।
'কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়'
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়—
'আজি রজনীতে হয়েছে সময়,
এসেছি বাসবদত্তা।'

১৯ আশ্বিন ১৩০৬

পরিশোধ

মহাবস্ত্ববদান

'রাজকোষ হতে চুরি! ধরে আন্ চোর,
নহিলে নগরপাল, রক্ষা নাহি তোর,
মুণ্ড রহিবে না দেহে!' রাজার শাসনে
রক্ষীদল পথে পথে ভবনে ভবনে
চোর খুঁজে খুঁজে ফিরে। নগর-বাহিরে
ছিল শুয়ে বজ্রসেন বিদীর্ণ মন্দিরে,
বিদেশী বণিক পান্থ তক্ষশিলাবাসী;
অশ্ব বেচিবার তরে এসেছিল কাশী,
দস্যুহস্তে খোয়াইয়া নিঃস্ব রিক্ত শেষে
ফিরিয়া চলিতেছিল আপনার দেশে
নিরাশ্বাসে। তাহারে ধরিল চোর বলি;
হস্তে পদে বাঁধি তার লোহার শিকলি
লইয়া চলিল বন্দীশালে।

সেই ক্ষণে

সুন্দরী-প্রধানা শ্যামা বসি বাতায়নে
প্রহর যাপিতেছিল আলস্যে কৌতুকে
পথের প্রবাহ হেরি; নয়নসম্মুখে
স্বপ্নসম লোকযাত্রা। সহসা শিহরি
কাঁপিয়া কহিল শ্যামা, 'আহা মরি মরি!
মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে। শীঘ্র যা লো সহচরী,
বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে; বন্দী সাথে লয়ে
এক বার আসে যেন এ ক্ষুদ্র আলয়ে
দয়া করি।' শ্যামার নামের মন্ত্রগুণে
উতলা নগররক্ষী আমন্ত্রণ শুনে
রোমাঞ্চিত; সত্বর পশিল গৃহমাঝে,
পিছে বন্দী বজ্রসেন নতশির লাজে
আরক্তকপোল। কহে রক্ষী হাস্যভরে,
'অতিশয় অসময়ে অভাজন-'পরে
অযাচিত অনুগ্রহ, চলেছি সম্প্রতি
রাজকার্যে। সুদর্শনে, দেহো অনুমতি।'
বজ্রসেন তুলি শির সহসা কহিলা,
'এ কী লীলা, হে সুন্দরী, এ কী তব লীলা।
পথ হতে ঘরে আনি কিসের কৌতুকে
নির্দোষ এ প্রবাসীর অবমানদুখে
করিতেছ অবমান।' শুনি শ্যামা কহে,

'হায় গো বিদেশী পান্থ, কৌতুক এ নহে,
আমার অঙ্গেতে যত স্বর্ণ অলংকার
সমস্ত সঁপিয়া দিয়া শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে; তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।'
এত বলি সিক্তপক্ষ্ম দুটি চক্ষু দিয়া
সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া
বিদেশীর অঙ্গ হতে। কহিল রক্ষীরে
'আমার যা আছে লয়ে নির্দোষ বন্দীরে
মুক্ত করে দিয়ে যাও।' কহিল প্রহরী
'তব অনুনয় আজি ঠেলিনু সুন্দরী,
এত এ অসাধ্য কাজ। হৃত রাজকোষ,
বিনা কারো প্রাণপাতে নৃপতির রোষ
শান্তি মানিবে না।' ধরি প্রহরীর হাত
কাতরে কহিল শ্যামা, 'শুধু দুটি রাত
বন্দীরে বাঁচায়ে রেখো এ মিনতি করি।'
'রাখিব তোমার কথা' কহিল প্রহরী।

দ্বিতীয় রাত্রির শেষে খুলি বন্দীশালা
রমণী পশিল কক্ষে, হাতে দীপ জ্বালা,
লোহার শৃঙ্খলে বাঁধা যেথা বজ্রসেন—
মৃত্যুর প্রভাত চেয়ে মৌনী জপিছেন
ইষ্টনাম। রমণীর কটাক্ষ-ইঙ্গিতে
রক্ষী আসি খুলি দিল শৃঙ্খল চকিতে।
বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে বন্দী নিরখিল
সেই শুভ্র সুকোমল কমল-উন্মীল
অপরূপ মুখ। কহিল গদ্‌গদস্বরে,
'বিকারের বিভীষিকা-রজনীর পরে
করধৃত শুকতারা শুভ্র উষা-সম
কে তুমি উদিলে আসি কারাকক্ষে মম—
মুমূর্ষুর প্রাণরূপা, মুক্তিরূপা অয়ি,
নিষ্ঠুর নগরী-মাঝে লক্ষ্মী দয়াময়ী।'
'আমি দয়াময়ী!' রমণীর উচ্চহাসে
চকিতে উঠিল জাগি নব ভয়ত্রাসে
ভয়ংকর কারাগার। হাসিতে হাসিতে
উন্মত্ত উৎকট হাস্য শোকাশ্রুরাশিতে
শতধা পড়িল ভাঙি। কাঁদিয়া কহিলা,
'এ পুরীর পথমাঝে যত আছে শিলা
কঠিন শ্যামার মতো কেহ নাহি আর।'
এত বলি দৃঢ়বলে ধরি হস্ত তার
বজ্রসেনে লয়ে গেল কারার বাহিরে।

তখন জাগিছে উষা বরুণার তীরে,
পূর্ব বনান্তরে। ঘাটে বাঁধা আছে তরী।
'হে বিদেশী, এসো এসো' কহিল সুন্দরী
দাঁড়ায়ে নৌকার 'পরে, 'হে আমার প্রিয়,
শুধু এই কথা মোর স্মরণে রাখিয়ো,
তোমা-সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি
সকল বন্ধন টুটি হে হৃদয়স্বামী,
জীবন-মরণ-প্রভু।' নৌকা দিল খুলি।
দুই তীরে বনে বনে গাহে পাখিগুলি
আনন্দ-উৎসব-গান। প্রেয়সীর মুখ
দুই বাহু দিয়া তুলি ভরি নিজ বুক
বজ্রসেন শুধাইল, 'কহো মোরে প্রিয়ে,
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।
সম্পূর্ণ জানিতে চাহি অয়ি বিদেশিনী,
এ দীনদরিদ্রজন তব কাছে ঋণী
কত ঋণে।' আলিঙ্গন ঘনতর করি,
'সে কথা এখন নহে' কহিল সুন্দরী।

নৌকা ভেসে চলে যায় পূর্ণবায়ুভরে
তূর্ণস্রোতোবেগে। মধ্যগগনের 'পরে
উদিল প্রচণ্ড সূর্য। গ্রামবধূগণ
গৃহে ফিরে গেছে করি স্নান সমাপন
সিক্তবস্ত্রে কাংস্যঘটে লয়ে গঙ্গাজল।
ভেঙে গেছে প্রভাতের হাট; কোলাহল
থেমে গেছে দুই তীরে; জনপদ-বাট
পান্থহীন। বটতলে পাষাণের ঘাট,
সেথায় বাঁধিল নৌকা স্নানাহার-তরে
কর্ণধার। তন্দ্রাঘন বটশাখা-'পরে
ছায়ামগ্ন পক্ষীনীড় গীতশব্দহীন।
অলস পতঙ্গ শুধু গুঞ্জে দীর্ঘ দিন;
পক্বশস্যগন্ধহরা মধ্যাহ্নের বায়ে
শ্যামার ঘোমটা যবে ফেলিল খসায়ে
অকস্মাৎ, পরিপূর্ণ প্রণয়-পীড়ায়
ব্যথিত ব্যাকুল বক্ষ, কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়
বজ্রসেন কানে কানে কহিল শ্যামারে,
'ক্ষণিক শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া আমারে
বাঁধিয়াছ অনন্ত শৃঙ্খলে। কী করিয়া
সাধিলে দুঃসাধ্য ব্রত কহো বিবরিয়া।
মোর লাগি কী করেছ জানি যদি, প্রিয়ে,
পরিশোধ দিব তাহা এ জীবন দিয়ে
এই মোর পণ।' বস্ত্র টানি মুখ-'পরি,
'সে কথা এখনো নহে' কহিল সুন্দরী।

গুটায়ে সোনার পাল সুদূরে নীরবে
দিনের আলোকতরী চলি গেল যবে
অস্ত-অচলের ঘাটে, তীর-উপবনে
লাগিল শ্যামার নৌকা সন্ধ্যার পবনে।
শুক্ল চতুর্থীর চন্দ্র অস্তগতপ্রায়,
নিস্তরঙ্গ শান্ত জলে সুদীর্ঘ রেখায়
ঝিকিমিকি করে ক্ষীণ আলো. ঝিল্লিস্বনে
তরুমূল-অন্ধকার কাঁপিছে সঘনে
বীণার তন্ত্রের মতো। প্রদীপ নিবায়ে
তরী-বাতায়নতলে দক্ষিণের বায়ে
ঘন-নিশ্বসিতমুখে যুবকের কাঁধে
হেলিয়া বসেছে শ্যামা। পড়েছে অবাধে
উন্মুক্ত সুগন্ধ কেশরাশি. সুকোমল
তরঙ্গিত তমোজালে ছেয়ে বক্ষতল
বিদেশীর. সুনিবিড় তন্দ্রাজাল-সম।
কহিল অস্ফুটকণ্ঠে শ্যামা. 'প্রিয়তম,
তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ,
সুকঠিন—তারো চেয়ে সুকঠিন আজ
সে কথা তোমারে বলা। সংক্ষেপে সে কব—
একবার শুনে মাত্র মন হতে তব
সে কাহিনী মুছে ফেলো।—
বালক কিশোর
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি-অপবাদ নিজস্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ। এ জীবনে মম
সর্বাধিক পাপ মোর, ওগো সর্বোত্তম,
করেছি তোমার লাগি এ মোর গৌরব।'

ক্ষীণ চন্দ্র অস্ত গেল। অরণ্য নীরব
শত শত বিহঙ্গের সুপ্তি বহি শিরে
দাঁড়ায়ে রহিল স্তব্ধ। অতি ধীরে ধীরে
রমণীর কটি হতে প্রিয়বাহুডোর
শিথিল পড়িল খসে; বিচ্ছেদ কঠোর
নিঃশব্দে বসিল দোঁহা-মাঝে; বাক্যহীন
বজ্রসেন চেয়ে রহে আড়ষ্ট কঠিন
পাষাণপুত্তলি; মাথা রাখি তার পায়ে
ছিন্নলতা-সম শ্যামা পড়িল লুটায়ে
আলিঙ্গনচ্যুতা; মসীকৃষ্ণ নদীনীরে
তীরের তিমিরপুঞ্জ ঘনাইল ধীরে।

সহসা যুবার জানু সবলে বাঁধিয়া
বাহুপাশে, আর্তনারী উঠিল কাঁদিয়া
অশ্রুহারা শুষ্ককণ্ঠে, 'ক্ষমা করো নাথ,
এ পাপের যাহা দণ্ড সে-অভিসম্পাত
হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর—
তোমা লাগি যা করেছি তুমি ক্ষমা করো।'
চরণ কাড়িয়া লয়ে চাহি তার পানে
বজ্রসেন বলি উঠে, 'আমার এ প্রাণে
তোমার কী কাজ ছিল। এ জন্মের লাগি
তোর পাপ-মূল্যে কেনা মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্‌কৃত। কলঙ্কিনী,
ধিক্ এ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী।
ধিক্ এ নিমেষপাত প্রত্যেক নিমেষে।'
এত বলি উঠিল সবলে। নিরুদ্দেশে
নৌকা ছাড়ি চলি গেলা তীরে, অন্ধকারে
বনমাঝে। শুষ্কপত্ররাশি পদভারে
শব্দ করি অরণ্যেরে করিল চকিত
প্রতিক্ষণে। ঘন গুল্মগন্ধ পুঞ্জীকৃত
বায়ুশূন্য বনতলে তরুকাণ্ডগুলি
চারি দিকে আঁকাবাঁকা নানা শাখা তুলি
অন্ধকারে ধরিয়াছে অসংখ্য আকার
বিকৃত বিরূপ। রুদ্ধ হল চারি ধার।
নিস্তব্ধ নিষেধ-সম প্রসারিল কর
লতাশৃঙ্খলিত বন। শ্রান্তকলেবর
পথিক বসিল ভূমে। কে তার পশ্চাতে
দাঁড়াইল উপচ্ছায়া-সম। সাথে সাথে
অন্ধকারে পদে পদে তারে অনুসরি
আসিয়াছে দীর্ঘ পথ মৌনী অনুচরী
রক্তসিক্তপদে। দুই মুষ্টি বদ্ধ করে
গর্জিল পথিক, 'তবু ছাড়িবি না মোরে?'
রমণী বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া পড়িয়া
বন্যার তরঙ্গ-সম দিল আবরিয়া
আলিঙ্গনে কেশপাশে স্রস্ত বেশবাসে
আঘ্রাণে চুম্বনে স্পর্শে সঘন নিশ্বাসে
সর্ব অঙ্গ তার; আর্দ্রগদ্‌গদবচনা
কণ্ঠরুদ্ধপ্রায় 'ছাড়িব না' 'ছাড়িব না'
কহে বারংবার, 'তোমা লাগি পাপ, নাথ,
তুমি শাস্তি দাও মোরে, করো মর্মঘাত,
শেষ করে দাও মোর দণ্ড পুরস্কার।'
অরণ্যের গ্রহতারাহীন অন্ধকার
অন্ধভাবে কী যেন করিল অনুভব
বিভীষিকা। লক্ষ লক্ষ তরুমূল সব

মাটির ভিতরে থাকি শিহরিল ত্রাসে।
বারেক ধ্বনিল রুদ্ধ নিষ্পেষিত শ্বাসে
অন্তিম কাকুতি স্বর, তারি পরক্ষণে
কে পড়িল ভূমি-'পরে অসাড় পতনে।

বজ্রসেন বন হতে ফিরিল যখন
প্রথম উষার করে বিদ্যুৎ-বরন
মন্দির ত্রিশূল-চূড়া জাহ্নবীর পারে।
জনহীন বালুতটে নদী ধারে ধারে
কাটাইল দীর্ঘ দিন ক্ষিপ্তের মতন
উদাসীন। মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত তপন
হানিল সর্বাঙ্গে তার অগ্নিময়ী কশা।
ঘটকক্ষে গ্রামবধূ হেরি তার দশা
কহিল করুণ কণ্ঠে, 'কে গো গৃহছাড়া
এসো আমাদের ঘরে।' দিল না সে সাড়া।
তৃষায় ফাটিল ছাতি, তবু স্পর্শিল না
সম্মুখের নদী হতে জল এক কণা।
দিনশেষে জ্বরতপ্ত দগ্ধ কলেবরে
ছুটিয়া পশিল গিয়া তরণীর 'পরে,
পতঙ্গ যেমন বেগে অগ্নি দেখে ধায়
উগ্র আগ্রহের ভরে। হেরিল শয্যায়
একটি নূপুর আছে পড়ি। শতবার
রাখিল বক্ষেতে চাপি। ঝংকার তাহার
শতমুখ শরসম লাগিল বর্ষিতে
হৃদয়ের মাঝে। ছিল পড়ি এক ভিতে
নীলাম্বর বস্ত্রখানি, রাশীকৃত করি
তারি 'পরে মুখ রাখি রহিল সে পড়ি—
সুকুমার দেহগন্ধ নিশ্বাসে নিঃশেষে
লইল শোষণ করি অতৃপ্ত আবেশে।
শুক্ল পঞ্চমীর শশী অস্তাচলগামী
সপ্তপর্ণ-তরুশিরে পড়িয়াছে নামি
শাখা-অন্তরালে। দুই বাহু প্রসারিয়া
ডাকিতেছে বজ্রসেন, 'এসো এসো প্রিয়া'
চাহি অরণ্যের পানে। হেনকালে তীরে
বালুতটে ঘনকৃষ্ণ বনের তিমিরে
কার মূর্তি দেখা দিল উপচ্ছায়া-সম।
'এসো এসো প্রিয়া।' 'আসিয়াছি প্রিয়তম।'
চরণে পড়িল শ্যামা, 'ক্ষমো মোরে ক্ষমো।
গেল না তো সুকঠিন এ পরান মম
তোমার করুণ করে।' শুধু ক্ষণতরে
বজ্রসেন তাকাইল তার মুখ-'পরে,
ক্ষণতরে আলিঙ্গন লাগি বাহু মেলি,

চমকি উঠিল, তারে দূরে দিল ঠেলি,
গরজিল, 'কেন এলি, কেন ফিরে এলি।'
বক্ষ হতে নূপুর লইয়া দিল ফেলি,
জ্বলন্ত অঙ্গার-সম নীলাম্বরখানি
চরণের কাছ হতে ফেলে দিল টানি;
শয্যা যেন অগ্নিশয্যা, পদতলে থাকি
লাগিল দহিতে তারে। মুদি দুই আঁখি
কহিল ফিরায়ে মুখ, 'যাও যাও ফিরে,
মোরে ছেড়ে চলে যাও।' নারী নতশিরে
ক্ষণতরে রহিল নীরবে। পরক্ষণে
ভূতলে রাখিয়া জানু যুবার চরণে
প্রণমিল, তার পরে নামি নদীতীরে
আঁধার বনের পথে চলি গেল ধীরে,
নিদ্রাভঙ্গে ক্ষণিকের অপূর্ব স্বপন
নিশার তিমির-মাঝে মিলায় যেমন।

২৩ আশ্বিন ১৩০৬

বিসর্জন

দুইটি কোলের ছেলে গেছে পর-পর
বয়স না হতে হতে পুরা দু-বছর।
এবার ছেলেটি তার জন্মিল যখন,
স্বামীরেও হারাল মল্লিকা। বন্ধুজন
বুঝাইল—পূর্বজন্মে ছিল বহু পাপ,
এ জনমে তাই হেন দারুণ সন্তাপ।
শোকানলদগ্ধ নারী একান্ত বিনয়ে
অজ্ঞাত জন্মের পাপ শিরে বহি লয়ে
প্রায়শ্চিত্তে দিল মন। মন্দিরে মন্দিরে
যেথা সেথা গ্রামে গ্রামে পূজা দিয়ে ফিরে,
ব্রত ধ্যান উপবাসে আহ্নিকে তর্পণে
কাটে দিন, ধূপে দীপে নৈবেদ্যে চন্দনে
পূজাগৃহে; কেশে বাঁধি রাখিল মাদুলি
কুড়াইয়া শত ব্রাহ্মণের পদধূলি;
শুনে রামায়ণ-কথা; সন্ন্যাসী সাধুরে
ঘরে আনি আশীর্বাদ করায় শিশুরে।
বিশ্বমাঝে আপনারে রাখি সর্বনিচে
সবার প্রসন্নদৃষ্টি অভাগী মাগিছে
আপন সন্তান লাগি। সূর্য চন্দ্র হতে
পশুপক্ষী পতঙ্গ অবধি কোনোমতে
কেহ পাছে কোনো অপরাধ লয় মনে,
পাছে কেহ করে ক্ষোভ, অজানা কারণে

পাছে কারো লাগে ব্যথা— সকলের কাছে
আকুল বেদনা-ভরে দীন হয়ে আছে।

যখন বছর দেড় বয়স শিশুর
যকৃতের ঘটিল বিকার; জ্বরাতুর
দেহখানি শীর্ণ হয়ে আসে। দেবালয়ে
মানিল মানত মাতা, পদামৃত লয়ে
করাইল পান, হরিসংকীর্তন-গানে
কাঁপিল প্রাঙ্গণ। ব্যাধি শান্তি নাহি মানে।
কাঁদিয়া শুধাল নারী, 'ব্রাহ্মণ ঠাকুর,
এত দুঃখে তবু পাপ নাহি হল দূর?
দিনরাত্রি দেবতার মেনেছি দোহাই,
দিয়েছি এত যে পূজা তবু রক্ষা নাই?
তবু কি নেবেন তাঁরা আমার বাছারে?
এত ক্ষুধা দেবতার? এত ভারে ভারে
নৈবেদ্য দিলাম খেতে বেচিয়া গহনা,
সর্বস্ব খাওয়ানু তবু ক্ষুধা মিটিল না?'
ব্রাহ্মণ কহিল, "বাছা, এ যে ঘোর কলি,
অনেক করেছ বটে তবু এও বলি,
আজকাল তেমন কি ভক্তি আছে কারো।
সত্যযুগে যা পারিত তা কি আজ পার।
দানবীর কর্ণ-কাছে ধর্ম যবে এসে
পুত্রেরে চাহিল খেতে ব্রাহ্মণের বেশে,
নিজ হস্তে সন্তানে কাটিল; তখনি সে
শিশুরে ফিরিয়া পেল চক্ষের নিমিষে।
শিবি রাজা শ্যেনরূপী ইন্দ্রের মুখেতে
আপন বুকের মাংস কাটি দিল খেতে,
পাইল অক্ষয় দেহ। নিষ্ঠা এরে বলে।
তেমন কি একালেতে আছে ভূমণ্ডলে।
মনে আছে ছেলেবেলা গল্প শুনিয়াছি
মার কাছে— তাঁদের গ্রামের কাছাকাছি
ছিল এক বন্ধ্যা নারী, না পাইয়া পথ
প্রথম গর্ভের ছেলে করিল মানত
মা গঙ্গার কাছে; শেষে পুত্রজন্ম-পরে
অভাগী বিধবা হল, গেল সে সাগরে,
কহিল সে নিষ্ঠাভরে মা গঙ্গারে ডেকে,
'মা, তোমারি কোলে আমি দিলাম ছেলেকে—
এ মোর প্রথম পুত্র, শেষ পুত্র এই,
এ জন্মের তরে আর পুত্র-আশা নেই।'
যেমনি জলেতে ফেলা, মাতা ভাগীরথী
মকরবাহিনী-রূপে হয়ে মূর্তিমতী

শিশু লয়ে আপনার পদ্মকরতলে
মার কোলে সমর্পিল। নিষ্ঠা এরে বলে।"
মল্লিকা ফিরিয়া এল নতশির করে,
আপনারে ধিক্কারিল—এতদিন ধরে
বৃথা ব্রত করিলাম, বৃথা দেবার্চনা,
নিষ্ঠাহীনা পাপিষ্ঠারে ফল মিলিল না।

ঘরে ফিরে এসে দেখে শিশু অচেতন
জ্বরাবেশে। অঙ্গ যেন অগ্নির মতন;
ঔষধ গিলাতে যায় যত বারবার
পড়ে যায়, কণ্ঠ দিয়া নামিল না আর।
দন্তে দন্তে গেল আঁটি। বৈদ্য শির নাড়ি
ধীরে ধীরে চলি গেল রোগীগৃহ ছাড়ি।
সন্ধ্যার আঁধারে শূন্য বিধবার ঘরে
একটি মলিন দীপ শয়নশিয়রে,
একা শোকাতুরা নারী। শিশু একবার
জ্যোতিহীন আঁখি মেলি যেন চারি ধার
খুঁজিল কাহারে। নারী কাঁদিল কাতর,
"ও মানিক, ওরে সোনা, এই যে মা তোর,
এই যে মায়ের কোল, ভয় কী রে বাপ।"
বক্ষে তারে চাপি ধরি তার জ্বর-তাপ
চাহিল কাড়িয়া নিতে অঙ্গে আপনার
প্রাণপণে। সহসা বাতাসে গৃহদ্বার
খুলে গেল, ক্ষীণ দীপ নিবিল তখনি—
সহসা বাহির হতে কলকলধ্বনি
পশিল গৃহের মাঝে। চমকিল নারী।
দাঁড়ায়ে উঠিল বেগে শয্যাতল ছাড়ি,
কহিল, "মায়ের ডাক ওই শুনা যায়—
ও মোর দুঃখীর ধন পেয়েছি উপায়—
তোর মার কোল চেয়ে সুশীতল কোল
আছে ওরে বাছা।" জাগিয়াছে কলরোল
অদূরে জাহ্নবীজলে, এসেছে জোয়ার
পূর্ণিমায়। শিশুর তাপিত দেহভার
বক্ষে লয়ে মাতা গেল শূন্যঘাট-পানে।
কহিল, "মা, মার ব্যথা যদি বাজে প্রাণে
তবে এ শিশুর তাপ দে গো মা জুড়ায়ে।
একমাত্র ধন মোর দিনু তোর পায়ে
একমনে।" এত বলি সমর্পিল জলে
অচেতন শিশুটিরে লয়ে করতলে
চক্ষু মুদি। বহুক্ষণ আঁখি মেলিল না;
ধ্যানে নিরখিল বসি মকরবাহনা

জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি ক্ষুদ্র শিশুটিরে
কোলে ক'রে এসেছেন, রাখি তার শিরে
একটি পদ্মের দল; হাসিমুখে ছেলে
অনিন্দিত কান্তি ধরি দেবী-কোল ফেলে
মার কোলে আসিবারে বাড়ায়েছে কর।
কহে দেবী, "রে দুঃখিনী, এই তুই ধর্‌
তোর ধন তোরে দিনু।" রোমাঞ্চিতকায়
নয়ন মেলিয়া কহে, "কই মা—কোথায়!"
পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে বিহ্বলা রজনী;
গঙ্গা বহি চলি যায় করি কলধ্বনি।
চীৎকারি উঠিল নারী, "দিবি নে ফিরায়ে?"
মর্মরিল বনভূমি দক্ষিণের বায়ে।

২৯ আশ্বিন ১৩০৬

সামান্য ক্ষতি

দিব্যাবদানমালা

বহে মাঘমাসে শীতের বাতাস,
স্বচ্ছসলিলা বরুণা।
পুরী হতে দূরে গ্রামে নির্জনে
শিলাময় ঘাট চম্পকবনে,
স্নানে চলেছেন শতসখীসনে
কাশীর মহিষী করুণা।

সে পথ সে ঘাট আজি এ প্রভাতে
জনহীন রাজশাসনে।
নিকটে যে ক'টি আছিল কুটীর
ছেড়ে গেছে লোক, তাই নদীতীর
স্তব্ধ গভীর, কেবল পাখির
কূজন উঠিছে কাননে।

আজি উতরোল উত্তর বায়ে
উতলা হয়েছে তটিনী।
সোনার আলোক পড়িয়াছে জলে,
পুলকে উছলি ঢেউ ছলছলে,
লক্ষ মানিক ঝলকি আঁচলে
নেচে চলে যেন নটিনী।

কলকল্লোলে লাজ দিল আজ
নারীকণ্ঠের কাকলি।

মৃণাল-ভুজের ললিত বিলাসে,
চঞ্চলা নদী মাতে উল্লাসে,
আলাপে প্রলাপে হাসি-উচ্ছ্বাসে,
আকাশ উঠিল আকুলি।

স্নান সমাপন করিয়া যখন
কূলে উঠে নারী সকলে—
মহিষী কহিলা, 'উহু! শীতে মরি,
সকল শরীর উঠিছে শিহরি,
জ্বেলে দে আগুন ওলো সহচরী,
শীত নিবারিব অনলে।'

সখীগণ সবে কুড়াইতে কুটা
চলিল কুসুম-কাননে।
কৌতুকরসে পাগলপরানী
শাখা ধরি সবে করে টানাটানি,
সহসা সবারে ডাক দিয়া রানী
কহে সহাস্য আননে,

'ওলো তোরা আয়! ওই দেখা যায়
কুটীর কাহার অদূরে,
ওই ঘরে তোরা লাগাবি অনল,
তপ্ত করিব করপদতল,'
এত বলি রানী রঙ্গে বিভল
হাসিয়া উঠিল মধুরে।

কহিল মালতী সকরুণ অতি,
'এ কী পরিহাস রানী মা!
আগুন জ্বালায়ে কেন দিবে নাশি।
এ কুটীর কোন্ সাধু সন্ন্যাসী
কোন্ দীনজন কোন্ পরবাসী
বাঁধিয়াছে নাহি জানি মা।'

রানী কহে রোষে, 'দূর করি দাও
এই দীনদয়াময়ীরে।'
অতি দুর্দাম কৌতুক-রত
যৌবনমদে নিষ্ঠুর যত
যুবতীরা মিলি পাগলের মতো
আগুন লাগাল কুটীরে।

ঘন ঘোর ধূম ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ফুলিয়া ফুলিয়া উড়িল।

দেখিতে দেখিতে হুহু হুংকারি
ঝলকে ঝলকে উল্কা উগারি
শত শত লোল জিহ্বা প্রসারি
বহ্নি আকাশ জুড়িল।

পাতাল ফুঁড়িয়া উঠিল যেন রে
জ্বালাময়ী যত নাগিনী।
ফণা নাচাইয়া অম্বর-পানে
মাতিয়া উঠিল গর্জনগানে
প্রলয়মত্ত রমণীর কানে
বাজিল দীপক রাগিণী।

প্রভাত-পাখির আনন্দগান
ভয়ের বিলাপে টুটিল;
দলে দলে কাক করে কোলাহল,
উত্তর-বায়ু হইল প্রবল,
কুটীর হইতে কুটীরে অনল
উড়িয়া উড়িয়া ছুটিল।

ছোটো গ্রামখানি লেহিয়া লইল
প্রলয়-লোলুপ রসনা।
জনহীন পথে মাঘের প্রভাতে
প্রমোদক্লান্ত শত সখী-সাথে
ফিরে গেল রানী কুবলয় হাতে
দীপ্ত অরুণ-বসনা।

তখন সভায় বিচার-আসনে
বসিয়াছিলেন ভূপতি।
গৃহহীন প্রজা দলে দলে আসে,
দ্বিধাকম্পিত গদগদ ভাষে
নিবেদিল দুখ সংকোচে ত্রাসে
চরণে করিয়া বিনতি।

সভাসন ছাড়ি উঠি গেল রাজা
রক্তিমমুখ শরমে।
অকালে পশিলা রানীর আগার—
কহিলা, 'মহিষী, এ কী ব্যবহার।
গৃহ জ্বালাইলে অভাগা প্রজার
বলো কোন্ রাজধরমে।'

রুষিয়া কহিল রাজার মহিষী,
'গৃহ কহ তারে কী বোধে।

গেছে গুটিকত জীর্ণ কুটীর,
কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর।
কত ধন যায় রাজমহিষীর
এক প্রহরের প্রমোদে।'

কহিলেন রাজা উদ্যত-রোষ
রুধিয়া দীপ্ত হৃদয়ে—
'যতদিন তুমি আছ রাজরানী
দীনের কুটীরে দীনের কী হানি
বুঝিতে নারিবে জানি তাহা জানি—
বুঝাব তোমারে নিদয়ে।'

রাজার আদেশে কিংকরী আসি
ভূষণ ফেলিল খুলিয়া;
অরুণবরন অম্বরখানি
নির্মম করে খুলে দিল টানি,
ভিখারী নারীর চীরবাস আনি
দিল রানী-দেহে তুলিয়া।

পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা,
'মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে;
এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে-কটি কুটীর হল ছারখার
যত দিনে পার সে-কটি আবার
গড়ি দিতে হবে তোমারে।

'বৎসরকাল দিলেম সময়,
তার পরে ফিরে আসিয়া,
সভায় দাঁড়ায়ে করিয়া প্রণতি
সবার সমুখে জানাবে যুবতী
হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষতি
জীর্ণ কুটীর নাশিয়া।'

২৫ আশ্বিন ১৩০৬

মূল্যপ্রাপ্তি

অবদানশতক

অঘ্রানে শীতের রাতে নিষ্ঠুর শিশিরঘাতে
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া;
সুদাস মালীর ঘরে কাননের সরোবরে
একটি ফুটেছে কী করিয়া।

তুলি লয়ে, বেচিবারে গেল সে প্রসাদ-দ্বারে,
মাগিল রাজার দরশন—
হেনকালে হেরি ফুল আনন্দে পুলকাকুল
পথিক কহিল এক জন,
'অকালের পদ্ম তব আমি এটি কিনি লব,
কত মূল্য লইবে ইহার।
বুদ্ধ ভগবান্ আজ এসেছেন পুরমাঝ
তাঁর পায়ে দিব উপহার।'
মালী কহে, 'এক মাষা স্বর্ণ পাব মনে আশা।'
পথিক চাহিল তাহা দিতে—
হেনকালে সমারোহে বহু পূজা-অর্ঘ্য বহে
নৃপতি বাহিরে আচম্বিতে।
রাজেন্দ্র প্রসেনজিৎ উচ্চারি মঙ্গলগীত
চলেছেন বুদ্ধ-দরশনে—
হেরি অকালের ফুল শুধালেন, 'কত মূল।
কিনি দিব প্রভুর চরণে।'
মালী কহে, 'হে রাজন্ স্বর্ণমাষা দিয়ে পণ
কিনিছেন এই মহাশয়।'
'দশ মাষা দিব আমি' কহিলা ধরণী-স্বামী,
'বিশ মাষা দিব'—পান্থ কয়।
দোঁহে কহে 'দেহো দেহো', হার নাহি মানে কেহ,
মূল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত।
মালী ভাবে, যাঁর তরে এ দোঁহে বিবাদ করে
তাঁরে দিলে আরো পাব কত।
কহিল সে করজোড়ে, 'দয়া করে ক্ষমো মোরে—
এ ফুল বেচিতে নাহি মন।'
এত বলি ছুটিল সে যেথা রয়েছেন বসে
বুদ্ধদেব উজলি কানন।
বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে,
নিরঞ্জন আনন্দমুরতি।
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, স্ফুরিছে অধর-'পরে
করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি।
সুদাস রহিল চাহি, নয়নে নিমেষ নাহি,
মুখে তার বাক্য নাহি সরে।
সহসা ভূতলে পড়ি, পদ্মটি রাখিল ধরি
প্রভুর চরণপদ্ম-'পরে।
বরষি অমৃতরাশি বুদ্ধ শুধালেন হাসি,
'কহো বৎস, কী তব প্রার্থনা।'
ব্যাকুল সুদাস কহে, 'প্রভু, আর কিছু নহে,
চরণের ধূলি এক কণা।'

২৬ আশ্বিন ১৩০৬

নগরলক্ষ্মী

কল্পদ্রুমাবদান

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহারবে,
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে শুধালেন জনে জনে,
'ক্ষুধিতেরে অন্নদান-সেবা
তোমরা লইবে বলো কেবা।'

শুনি তাহা রত্নাকর শেঠ
করিয়া রহিল মাথা হেঁট।
কহিল সে কর জুড়ি, 'ক্ষুধার্ত বিশাল পুরী,
এর ক্ষুধা মিটাইব আমি,
এমন ক্ষমতা নাই স্বামী।'

কহিল সামন্ত জয়সেন,
'যে-আদেশ প্রভু করিছেন
তাহা লইতাম শিরে যদি মোর বুক চিরে
রক্ত দিলে হ'ত কোনো কাজ,
মোর ঘরে অন্ন কোথা আজ।'

নিশ্বাসিয়া কহে ধর্মপাল,
'কী কব, এমন দগ্ধ ভাল,
আমার সোনার খেত শুষিছে অজন্মা-প্রেত,
রাজকর জোগানো কঠিন,
হয়েছি অক্ষম দীনহীন।'

রহে সবে মুখে মুখে চাহি,
কাহারো উত্তর কিছু নাহি।
নির্বাক সে সভাঘরে ব্যথিত নগরী-'পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারা-সম রহে ফুটি।

তখন উঠিল ধীরে ধীরে
রক্তভাল লাজনম্রশিরে
অনাথপিণ্ডদ-সুতা বেদনায় অশ্রুপ্লুতা,
বুদ্ধের চরণরেণু লয়ে
মধুকণ্ঠে কহিল বিনয়ে—

'ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া।

কাঁদে যারা খাদ্যহারা আমার সন্তান তারা,
নগরীরে অন্ন বিলাবার
আমি আজি লইলাম ভার।'

বিস্ময় মানিল সবে শুনি—
'ভিক্ষুকন্যা তুমি যে ভিক্ষুণী,
কোন্ অহংকারে মাতি লইলে মস্তক পাতি
এ হেন কঠিন গুরু কাজ।
কী আছে তোমার কহো আজ।'

কহিল সে নমি সবা-কাছে,
'শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে।
আমি দীনহীন মেয়ে অক্ষম সবার চেয়ে,
তাই তোমাদের পাব দয়া—
প্রভু-আজ্ঞা হইবে বিজয়া।

'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে,
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা—
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।'

২৭ আশ্বিন ১৩০৬

অপমান-বর

ভক্তমাল

ভক্ত কবীর সিদ্ধপুরুষ খ্যাতি রটিয়াছে দেশে।
কুটীর তাহার ঘিরিয়া দাঁড়াল লাখো নরনারী এসে।
কেহ কহে, 'মোর রোগ দূর করি মন্ত্র পড়িয়া দেহো',
সন্তান লাগি করে কাঁদাকাটি বন্ধ্যা রমণী কেহ।
কেহ বলে, 'তব দৈব ক্ষমতা চক্ষে দেখাও মোরে',
কেহ কয়, 'ভবে আছেন বিধাতা বুঝাও প্রমাণ করে।'

কাঁদিয়া ঠাকুরে কাতর কবীর কহে দুই জোড়করে,
'দয়া করে হরি জন্ম দিয়েছ নীচ যবনের ঘরে,
ভেবেছিনু কেহ আসিবে না কাছে অপার কৃপায় তব,
সবার চোখের আড়ালে কেবল তোমায় আমায় রব।
এ কী কৌশল খেলেছ মায়াবী, বুঝি দিলে মোরে ফাঁকি।
বিশ্বের লোক ঘরে ডেকে এনে তুমি পালাইবে নাকি!'

ব্রাহ্মণ যত নগরে আছিল উঠিল বিষম রাগি,
লোক নাহি ধরে যবন জোলার চরণধূলার লাগি।
চারি পোওয়া কলি পূরিয়া আসিল পাপের বোঝায় ভরা,
এর প্রতিকার না করিলে আর রক্ষা না পায় ধরা।
ব্রাহ্মণদল যুক্তি করিল নষ্ট নারীর সাথে,
গোপনে তাহারে মন্ত্রণা দিল, কাঞ্চন দিল হাতে।

বসন বেচিতে এসেছে কবীর একদা হাটের বারে,
সহসা কামিনী সবার সামনে কাঁদিয়া ধরিল তারে।
কহিল, 'রে শঠ নিঠুর কপট, কহি নে কাহারো কাছে
এমনি করে কি সরলা নারীরে ছলনা করিতে আছে।
বিনা অপরাধে আমারে ত্যজিয়া সাধু সাজিয়াছ ভালো,
অন্নবসন বিহনে আমার বরন হয়েছে কালো।

কাছে ছিল যত ব্রাহ্মণদল করিল কপট কোপ,
'ভণ্ড-তাপস, ধর্মের নামে করিছ ধর্মলোপ।
তুমি সুখে ব'সে ধুলা ছড়াইছ সরল লোকের চোখে,
অবলা অখলা পথে পথে আহা ফিরিছে অন্নশোকে।'
কহিল কবীর, 'অপরাধী আমি, ঘরে এসো নারী তবে,
আমার অন্ন রহিতে কেন বা তুমি উপবাসী রবে।'

দুষ্টা নারীরে আনি গৃহ-মাঝে বিনয়ে আদর করি
কবীর কহিল, 'দীনের ভবনে তোমারে পাঠাল হরি।'
কাঁদিয়া তখন কহিল রমণী লাজে ভয়ে পরিতাপে,
'লোভে পড়ে আমি করিয়াছি পাপ, মরিব সাধুর শাপে।'
কহিল কবীর, 'ভয় নাই মাতঃ, লইব না অপরাধ;
এনেছ আমার মাথার ভূষণ অপমান অপবাদ।'

ঘুচাইল তার মনের বিকার, করিল চেতনা দান,
সঁপি দিল তার মধুর কণ্ঠে হরিনামগুণগান।
রটি গেল দেশে—কপট কবীর, সাধুতা তাহার মিছে।
শুনিয়া কবীর কহে নতশির, 'আমি সকলের নিচে।
যদি কূল পাই তরণী-গরব রাখিতে না চাহি কিছু;
তুমি যদি থাক আমার উপরে, আমি রব সব-নিচু।'

রাজার চিত্তে কৌতুক হল শুনিতে সাধুর গাথা,
দূত আসি তাঁরে ডাকিল যখন, সাধু নাড়িলেন মাথা।
কহিলেন, 'থাকি সবা হতে দূরে আপন হীনতা-মাঝে;
আমার মতন অভাজন জন রাজার সভায় সাজে?'
দূত কহে, 'তুমি না গেলে ঘটিবে আমাদের পরমাদ,
যশ শুনে তব হয়েছে রাজার সাধু দেখিবার সাধ।'

রাজা বসে ছিল সভার মাঝারে, পারিষদ সারি সারি,
কবীর আসিয়া পশিল সেথায় পশ্চাতে লয়ে নারী।
কেহ হাসে কেহ করে ভুরুকুটি, কেহ রহে নতশিরে,
রাজা ভাবে—এটা কেমন নির্লাজ, রমণী লইয়া ফিরে।
ইঙ্গিতে তাঁর সাধুরে সভার বাহির করিল দ্বারী,
বিনয়ে কবীর চলিল কুটীরে সঙ্গে লইয়া নারী।

পথমাঝে ছিল ব্রাহ্মণদল, কৌতুকভরে হাসে;
শুনায়ে শুনায়ে বিদ্রূপবাণী কহিল কঠিন ভাষে।
তখন রমণী কাঁদিয়া পড়িল সাধুর চরণমূলে—
কহিল, 'পাপের পঙ্ক হইতে কেন নিলে মোরে তুলে।
কেন অধমারে রাখিয়া দুয়ারে সহিতেছ অপমান।'
কহিল কবীর, 'জননী, তুমি যে আমার প্রভুর দান।'

২৮ আশ্বিন ১৩০৬

স্বামীলাভ

ভক্তমাল

একদা তুলসীদাস জাহ্নবীর তীরে
নির্জন শ্মশানে
সন্ধ্যায় আপন মনে একা একা ফিরে
মাতি নিজ গানে।
হেরিলেন, মৃত পতি-চরণের তলে
বসিয়াছে সতী;
তারি সনে একসাথে এক চিতানলে
মরিবারে মতি।
সঙ্গীগণ মাঝে মাঝে আনন্দ-চীৎকারে
করে জয়নাদ,
পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা ঘেরি চারি ধারে
গাহে সাধুবাদ।

সহসা সাধুরে নারী হেরিয়া সম্মুখে
করিয়া প্রণতি
কহিল বিনয়ে, 'প্রভো, আপন শ্রীমুখে
দেহো অনুমতি।'
তুলসী কহিল, 'মাতঃ, যাবে কোন্‌খানে,
এত আয়োজন!'
সতী কহে, 'পতিসহ যাব স্বর্গপানে
করিয়াছি মন।'

'ধরা ছাড়ি কেন নারী, স্বর্গ চাহ তুমি,'
সাধু হাসি কহে,
'হে জননী, স্বর্গ যাঁর, এ ধরণীভূমি
তাঁহারি কি নহে।'

বুঝিতে না পারি কথা নারী রহে চাহি
বিস্ময়ে অবাক—
কহে করজোড় করি, 'স্বামী যদি পাই
স্বর্গ দূরে থাক্।'
তুলসী কহিল হাসি, 'ফিরে চলো ঘরে,
কহিতেছি আমি,
ফিরে পাবে আজ হতে মাসেকের পরে
আপনার স্বামী।'
রমণী আশার বশে গৃহে ফিরে যায়
শ্মশান তেয়াগি;
তুলসী জাহ্নবীতীরে নিস্তব্ধ নিশায়
রহিলেন জাগি।

নারী রহে শুদ্ধচিতে নির্জন ভবনে.
তুলসী প্রত্যহ
কী তাহারে মন্ত্র দেয়. নারী একমনে
ধ্যায় অহরহ।
এক মাস পূর্ণ হতে প্রতিবেশীদলে
আসি তার দ্বারে
শুধাইল, 'পেলে স্বামী?' নারী হাসি বলে,
'পেয়েছি তাঁহারে।'
শুনি ব্যগ্র কহে তারা, 'কহো তবে কহো
আছে কোন্ ঘরে।'
নারী কহে, 'রয়েছেন প্রভু অহরহ
আমারি অন্তরে।'

২৯ আশ্বিন ১৩০৬

স্পর্শমণি

ভক্তমাল

নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে
জপিছেন নাম,
হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম।

শুধালেন সনাতন, "কোথা হতে আগমন,
কী নাম ঠাকুর।"
বিপ্র কহে, "কী বা কব, পেয়েছি দর্শন তব
ভ্রমি বহুদূর;
জীবন আমার নাম, মানকরে মোর ধাম,
জিলা বর্ধমানে,
এতবড়ো ভাগ্যহত দীনহীন মোর মতো
নাই কোনোখানে।
জমিজমা আছে কিছু, করে আছি মাথা নিচু,
অল্পস্বল্প পাই।
ক্রিয়াকর্ম যজ্ঞযাগে বহু খ্যাতি ছিল আগে
আজ কিছু নাই।
আপন উন্নতি লাগি শিব-কাছে বর মাগি
করি আরাধনা।
একদিন নিশিভোরে স্বপ্নে দেব কন মোরে—
'পুরিবে প্রার্থনা;
যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর
ধরো দুটি পায়,
তাঁরে পিতা বলি মেনো, তাঁরি হাতে আছে জেনো
ধনের উপায়।'"
শুনি কথা সনাতন ভাবিয়া আকুল হন,
"কী আছে আমার,
যাহা ছিল সে সকলি ফেলিয়া এসেছি চলি,
ভিক্ষামাত্র সার।"
সহসা বিস্মৃতি ছুটে, সাধু ফুকারিয়া উঠে,
"ঠিক বটে ঠিক।
এক দিন নদীতটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে
পরশমানিক।
যদি কভু লাগে দানে সেই ভেবে ওইখানে
পুঁতেছি বালুতে;
নিয়ে যাও হে ঠাকুর, দুঃখ তব হবে দূর
ছুঁতে নাহি ছুঁতে।"
বিপ্র তাড়াতাড়ি আসি খুঁড়িয়া বালুকারাশি
পাইল সে মণি,
লোহার মাদুলি দুটি সোনা হয়ে উঠে ফুটি,
ছুঁইল যেমনি।
ব্রাহ্মণ বালুর 'পরে বিস্ময়ে বসিয়া পড়ে—
ভাবে নিজে নিজে।
যমুনা কল্লোল-গানে চিন্তিতের কানে কানে
কহে কত কী যে।
নদীপারে রক্তছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি
গেল অস্তাচলে,

তখন ব্রাহ্মণ উঠে সাধুর চরণে লুটে
কহে অশ্রুজলে,
"যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি
তাহারি খানিক
মাগি আমি নতশিরে।" এত বলি নদীনীরে
ফেলিল মানিক।

২৯ আশ্বিন ১৩০৬

বন্দী বীর

পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠেছে শিখ—
নির্মম নির্ভীক।
হাজার কণ্ঠে গুরুজীর জয়
ধ্বনিয়া তুলেছে দিক।
নূতন জাগিয়া শিখ
নূতন উষার সূর্যের পানে
চাহিল নির্নিমিখ।

'অলখ নিরঞ্জন'—
মহারব উঠে বন্ধন টুটে
করে ভয়-ভঞ্জন।
বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে
অসি বাজে ঝনঝন।
পঞ্জাব আজি গরজি উঠিল,
'অলখ নিরঞ্জন!'

এসেছে সে এক দিন
লক্ষ পরানে শঙ্কা না জানে
না রাখে কাহারো ঋণ।
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য,
চিত্ত ভাবনাহীন।
পঞ্চনদীর ঘিরি দশ তীর
এসেছে সে এক দিন।

দিল্লি-প্রাসাদ-কূটে
হোথা বারবার বাদশাজাদার
তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।

কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে,
নিবিড় নিশীথ টুটে,
কাদের মশালে আকাশের ভালে
আগুন উঠেছে ফুটে।

পঞ্চনদীর তীরে
ভক্ত-দেহের রক্তলহরী
মুক্ত হইল কি রে।
লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী-সমান
ছুটে যেন নিজ নীড়ে।
বীরগণ জননীরে
রক্ত-তিলক ললাটে পরাল
পঞ্চনদীর তীরে।

মোগল-শিখের রণে
মরণ-আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি
দুইজনা দুইজনে।
দংশন-ক্ষত শ্যেনবিহঙ্গ
যুঝে ভুজঙ্গ-সনে।
সেদিন কঠিন রণে
'জয় গুরুজীর' হাঁকে শিখ বীর
সুগভীর নিঃস্বনে।
মত্ত মোগল রক্তপাগল
'দীন্ দীন্' গরজনে।

গুরুদাসপুর গড়ে
বন্দা যখন বন্দী হইল
তুরানি সেনার করে,
সিংহের মতো শৃঙ্খলগত
বাঁধি লয়ে গেল ধরে
দিল্লিনগর-'পরে।
বন্দা সমরে বন্দী হইল
গুরুদাসপুর গড়ে।

সম্মুখে চলে মোগল সৈন্য
উড়ায়ে পথের ধূলি,
ছিন্ন শিখের মুণ্ড লইয়া
বর্শাফলকে তুলি।
শিখ সাত শত চলে পশ্চাতে,
বাজে শৃঙ্খলগুলি।

রাজপথ-'পরে লোক নাহি ধরে,
বাতায়ন যায় খুলি।
শিখ গরজয়, 'গুরুজীর জয়'
পরানের ভয় ভুলি।
মোগলে ও শিখে উড়াল আজিকে
দিল্লি-পথের ধূলি।

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি,
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি।
দিন গেলে প্রাতে ঘাতকের হাতে
বন্দীরা সারি সারি
'জয় গুরুজীর' কহি শত বীর
শত শির দেয় ডারি।

সপ্তাহকালে সাত শত প্রাণ
নিঃশেষ হয়ে গেলে
বন্দার কোলে কাজি দিল তুলি
বন্দার এক ছেলে :
কহিল, 'ইহারে বধিতে হইবে
নিজ হাতে অবহেলে।'
দিল তার কোলে ফেলে—
কিশোর কুমার, বাঁধা বাহু তার,
বন্দার এক ছেলে।

কিছু না কহিল বাণী,
বন্দা সুধীরে ছোটো ছেলেটিরে
লইল বক্ষে টানি।
ক্ষণকালতরে মাথার উপরে
রাখে দক্ষিণ পাণি,
শুধু একবার চুম্বিল তার
রাঙা উষ্ণীষখানি।

তার পরে ধীরে কটিবাস হতে
ছুরিকা খসায়ে আনি—
বালকের মুখ চাহি
'গুরুজীর জয়' কানে কানে কয়,
'রে পুত্র, ভয় নাহি।'
নবীন বদনে অভয় কিরণ
জ্বলি উঠে উৎসাহি—
কিশোর কণ্ঠে কাঁপে সভাতল
বালক উঠিল গাহি

'গুরুজীর জয়, কিছু নাহি ভয়'
বন্দার মুখ চাহি।

বন্দা তখন বামবাহুপাশ
জড়াইল তার গলে,
দক্ষিণ করে ছেলের বক্ষে
ছুরি বসাইল বলে,
'গুরুজীর জয়' কহিয়া বালক
লুটাল ধরণীতলে।

সভা হল নিস্তব্ধ।
বন্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক
সাঁড়াশি করিয়া দগ্ধ।
স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি
একটি কাতর শব্দ।
দর্শকজন মুদিল নয়ন,
সভা হল নিস্তব্ধ।

৩০ আশ্বিন ১৩০৬

মানী

আরঙজেব ভারত যবে
করিতেছিল খান খান,
মারবপতি কহিলা আসি,
'করহ প্রভু অবধান,
গোপন রাতে অচলগড়ে
নহর যাঁরে এনেছে ধরে
বন্দী তিনি আমার ঘরে
সিরোহিপতি সুরতান,
কী অভিলাষ তাঁহার 'পরে
আদেশ মোরে করো দান।'

শুনিয়া কহে আরঙজেব,
'কী কথা শুনি অদ্ভুত।
এতদিনে কি পড়িল ধরা
অশনিভরা বিদ্যুৎ।
পাহাড়ি লয়ে কয়েক শত
পাহাড়ে বনে ফিরিতে রত,
মরুভূমির মরীচি-মতো
স্বাধীন ছিল রাজপুত,

দেখিতে চাহি, আনিতে তারে
    পাঠাও কোনো রাজদূত।'

মাড়োয়ারাজ যশোবন্ত
    কহিলা তবে জোড়কর,
'ক্ষত্রকুল-সিংহশিশু
    লয়েছে আজি মোর ঘর,
বাদশা তাঁরে দেখিতে চান,
বচন আগে করুন দান
কিছুতে কোনো অসম্মান
    হবে না কভু তাঁর 'পর।
সভায় তবে আপনি তাঁরে
    আনিব করি সমাদর।'

আরঙজেব কহিলা হাসি,
    'কেমন কথা কহ আজ।
প্রবীণ তুমি প্রবল বীর
    মাড়োয়াপতি মহারাজ।
তোমার মুখে এমন বাণী,
শুনিয়া মনে শরম মানি,
মানীর মান করিব হানি
    মানীরে শোভে হেন কাজ?
কহিনু আমি, চিন্তা নাহি,
    আনহ তাঁরে সভামাঝ।'

সিরোহিপতি সভায় আসে
    মাড়োয়ারাজে লয়ে সাথ;
উচ্চশির উচ্চে রাখি
    সমুখে করে আঁখিপাত।
কহিল সবে বজ্রনাদে,
'সেলাম করো বাদশাজাদে,
হেলিয়া যশোবন্ত-কাঁধে
    কহিলা ধীরে নরনাথ,
'গুরুজনের চরণ ছাড়া
    করি নে কারে প্রণিপাত।'

কহিলা রোষে রক্ত-আঁখি
    বাদশাহের অনুচর,
'শিখাতে পারি কেমনে মাথা
    লুটিয়া পড়ে ভূমি-'পর।'
হাসিয়া কহে সিরোহিপতি,
'এমন যেন না হয় মতি

ভয়েতে কারে করিব নতি,
জানি নে কভু ভয় ডর।'
এতেক বলি দাঁড়াল রাজা
কৃপাণ-'পরে করি ভর।

বাদশা ধরি সুরতানেরে
বসায়ে নিল নিজপাশ।
কহিলা, 'বীর, ভারত-মাঝে
কী দেশ-'পরে তব আশ।'
কহিলা রাজা, 'অচলগড়
দেশের সেরা জগৎ-'পর।'
সভার মাঝে পরস্পর
নীরবে উঠে পরিহাস।
বাদশা কহে, 'অচল হয়ে
অচলগড়ে করো বাস।'

১ কার্তিক ১৩০৬

প্রার্থনাতীত দান

শিখের পক্ষে বেণীচ্ছেদন ধর্মপরিত্যাগের ন্যায় দূষণীয়

পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল
বন্দী শিখের দল—
সুহিদ্‌গঞ্জে রক্ত-বরন
হইল ধরণীতল।
নবাব কহিল, 'শুন তরুসিং,
তোমারে ক্ষমিতে চাই।'
তরুসিং কহে, 'মোরে কেন তব
এত অবহেলা ভাই।'
নবাব কহিল, 'মহাবীর তুমি,
তোমারে না করি ক্রোধ,
বেণীটি কাটিয়া দিয়ে যাও মোরে
এই শুধু অনুরোধ।'
তরুসিং কহে, 'করুণা তোমার
হৃদয়ে রহিল গাঁথা—
যা চেয়েছ তার কিছু বেশি দিব,
বেণীর সঙ্গে মাথা।'

২ কার্তিক ১৩০৬

রাজবিচার

রাজস্থান

বিপ্র কহে, 'রমণী মোর
আছিল যেই ঘরে,
নিশীথে সেথা পশিল চোর
ধর্মনাশ-তরে।
বেঁধেছি তারে, এখন কহো
চোরে কী দিব সাজা।'
'মৃত্যু' শুধু কহিলা তারে
রতনরাও রাজা।

ছুটিয়া আসি কহিল দূত,
'চোর সে যুবরাজ;
বিপ্র তাঁরে ধরেছে রাতে,
কাটিল প্রাতে আজ।
ব্রাহ্মণেরে এনেছি ধরে,
কী তারে দিব সাজা।'
'মুক্তি দাও' কহিলা শুধু
রতনরাও রাজা।

৪ কার্তিক ১৩০৬

শেষ শিক্ষা

এক দিন শিখগুরু গোবিন্দ নির্জনে
একাকী ভাবিতেছিলা আপনার মনে
আপন জীবন-কথা: যে-সংকল্পলেখা
অখণ্ড সম্পূর্ণরূপে দিয়েছিল দেখা
যৌবনের স্বর্ণপটে, যে আশা একদা
ভারত গ্রাসিয়াছিল, সে আজি শতধা,
সে আজি সংকীর্ণ শীর্ণ সংশয়সংকুল,
সে আজি সংকটমগ্ন। তবে এ কি ভুল।
তবে কি জীবন ব্যর্থ। দারুণ দ্বিধায়
শ্রান্তদেহে ক্ষুব্ধচিত্তে আঁধার সন্ধ্যায়
গোবিন্দ ভাবিতেছিল; হেনকালে এসে
পাঠান কহিল তাঁরে, 'যাব চলি দেশে,
ঘোড়া-যে কিনেছ তুমি দাও তার দাম।'
কহিল গোবিন্দ গুরু, 'শেখজী, সেলাম,
মূল্য কালি পাবে, আজি ফিরে যাও ভাই।'
পাঠান কহিল রোষে, 'মূল্য আজই চাই।'

এত বলি জোর করি ধরি তাঁর হাত—
চোর বলি দিল গালি। শুনি অকস্মাৎ
গোবিন্দ বিজুলি-বেগে খুলি নিল অসি,
পলকে সে পাঠানের মুণ্ড গেল খসি;
রক্তে ভেসে গেল ভূমি। হেরি নিজ কাজ
মাথা নাড়ি কহে গুরু, 'বুঝিলাম আজ
আমার সময় গেছে। পাপ তরবার
লঙ্ঘন করিল আজি লক্ষ্য আপনার
নিরর্থক রক্তপাতে। এ বাহুর 'পরে
বিশ্বাস ঘুচিয়া গেল চিরকালতরে।
ধুয়ে মুছে যেতে হবে এ পাপ এ লাজ—
আজ হতে জীবনের এই শেষ কাজ।'

পুত্র ছিল পাঠানের বয়স নবীন,
গোবিন্দ লইল তারে ডাকি। রাত্রিদিন
পালিতে লাগিল তারে সন্তানের মতো
চোখে চোখে। শাস্ত্র আর শস্ত্রবিদ্যা যত
আপনি শিখাল তারে। ছেলেটির সাথে
বৃদ্ধ সেই বীরগুরু সন্ধ্যায় প্রভাতে
খেলিত ছেলের মতো। ভক্তগণ দেখি
গুরুরে কহিল আসি, 'এ কী প্রভু, এ কী।
আমাদের শঙ্কা লাগে। ব্যাঘ্র-শাবকেরে
যত যত্ন কর, তার স্বভাব কি ফেরে।
যখন সে বড়ো হবে তখন নখর,
গুরুদেব, মনে রেখো হবে যে প্রখর।'
গুরু কহে, 'তাই চাই, বাঘের বাচ্ছারে
বাঘ না করিনু যদি কী শিখানু তারে।'

বালক যুবক হল গোবিন্দের হাতে
দেখিতে দেখিতে। ছায়া হেন ফিরে সাথে,
পুত্র হেন করে তাঁর সেবা। ভালোবাসে
প্রাণের মতন—সদা জেগে থাকে পাশে
ডান হস্ত যেন। যুদ্ধে হয়ে গেছে গত
শিখগুরু গোবিন্দের পুত্র ছিল যত—
আজি তাঁর প্রৌঢ়কালে পাঠান-তনয়
জুড়িয়া বসিল আসি শূন্য সে-হৃদয়
গুরুজীর। বাজে-পোড়া বটের কোটরে
বাহির হইতে বীজ পড়ি বায়ুভরে
বৃক্ষ হয়ে বেড়ে বেড়ে কবে ওঠে ঠেলি,
বৃদ্ধ বটে ঢেকে ফেলে ডালপালা মেলি।

একদা পাঠান কহে নমি গুরু-পায়,
'শিক্ষা মোর শেষ হল চরণকৃপায়,
এখন আদেশ পেলে নিজ ভুজবলে
উপার্জন করি গিয়া রাজসৈন্যদলে।'
গোবিন্দ কহিলা তার পিঠে হাত রাখি,
'আছে তব পৌরুষের এক শিক্ষা বাকি।'

পরদিন বেলা গেলে গোবিন্দ একাকী
বাহিরিলা; পাঠানেরে কহিলেন ডাকি,
'অস্ত্র হাতে এসো মোর সাথে।' ভক্তদল
'সঙ্গে যাব, সঙ্গে যাব' করে কোলাহল—
গুরু কন, 'যাও সবে ফিরে।'

দুই জনে
কথা নাই ধীরগতি চলিলেন বনে
নদীতীরে। পাথর-ছড়ানো উপকূলে
বরষার জলধারা সহস্র আঙুলে
কেটে গেছে রক্তবর্ণ মাটি। সারি সারি
উঠেছে বিশাল শাল, তলায় তাহারি
ঠেলাঠেলি ভিড় করে শিশু তরুদল
আকাশের অংশ পেতে। নদী হাঁটুজল
ফটিকের মতো স্বচ্ছ, চলে এক ধারে
গেরুয়া বালির কিনারায়। নদীপারে
ইশারা করিল গুরু, পাঠান দাঁড়াল।
নিবে-আসা দিবসের দগ্ধ রাঙা আলো
বাদুড়ের পাখা-সম দীর্ঘ ছায়া জুড়ি
পশ্চিমপ্রান্তর-পারে চলেছিল উড়ি
নিঃশব্দ আকাশে। গুরু কহিলা পাঠানে,
'মামুদ, হেথায় এসো, খোঁড়ো এইখানে।'
উঠিল সে-বালু খুঁড়ি একখণ্ড শিলা
অঙ্কিত লোহিত রাগে। গোবিন্দ কহিলা,
'পাষাণে এই যে রাঙা দাগ, এ তোমার
আপন বাপের রক্ত। এইখানে তার
মুণ্ড ফেলেছিনু কেটে, না শুধিয়া ঋণ,
না দিয়া সময়। আজ আসিয়াছে দিন,
রে পাঠান, পিতার সুপুত্র হও যদি
খোলো তরবার— পিতৃঘাতকেরে বধি
উষ্ণ রক্ত-উপহারে করিবে তর্পণ
তৃষাতুর প্রেতাত্মার।' বাঘের মতন
হুংকারিয়া লম্ফ দিয়া রক্তনেত্রে বীর
পড়িল গুরুর 'পরে; গুরু রহে স্থির

কাঠের মূর্তির মতো। ফেলি অস্ত্রখান
তখনি চরণে তাঁর পড়িল পাঠান।
কহিল, 'হে গুরুদেব, লয়ে শয়তানে
কোরো না এমনতরো খেলা। ধর্ম জানে
ভুলেছিনু পিতৃরক্তপাত; একাধারে
পিতা গুরু বন্ধু বলে জেনেছি তোমারে
এতদিন। ছেয়ে থাক্ মনে সেই স্নেহ,
ঢাকা পড়ে হিংসা যাক মরে। প্রভু দেহো
পদধূলি।' এত বলি বনের বাহিরে
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল, না চাহিল ফিরে,
না থামিল একবার। দুটি বিন্দু জল
ভিজাইল গোবিন্দের নয়নযুগল।

পাঠান সেদিন হতে থাকে দূরে দূরে।
নিরালা শয়নঘরে জাগাতে গুরুরে
দেখা নাহি দেয় ভোরবেলা। গৃহদ্বারে
অস্ত্র হাতে নাহি থাকে রাতে। নদীপারে
গুরু সাথে মৃগয়ায় নাহি যায় একা।
নির্জনে ডাকিলে গুরু দেয় না সে দেখা।

একদিন আরম্ভিল শতরঞ্জ খেলা
গোবিন্দ পাঠান সাথে। শেষ হল বেলা
না জানিতে কেহ। হার মানি বারে বারে
মাতিছে মামুদ। সন্ধ্যা হয়, রাত্রি বাড়ে।
সঙ্গীরা যে যার ঘরে চলে গেল ফিরে।
ঝাঁ ঝাঁ করে রাতি। একমনে হেঁটশিরে
পাঠান ভাবিছে খেলা। কখন হঠাৎ
চতুরঙ্গ বল ছুঁড়ি করিল আঘাত
মামুদের শিরে গুরু, কহে অট্টহাসি,
'পিতৃঘাতকের সাথে খেলা করে আসি
এমন যে কাপুরুষ, জয় হবে তার?'
তখনি বিদ্যুৎ-হেন ছুরি খরধার
খাপ হতে খুলি লয়ে গোবিন্দের বুকে
পাঠান বিঁধিয়া দিল। গুরু হাসিমুখে
কহিলেন, 'এতদিনে হল তোর বোধ
কী করিয়া অন্যায়ের লয় প্রতিশোধ।
শেষ শিক্ষা দিয়ে গেনু— আজি শেষবার
আশীর্বাদ করি তোরে হে পুত্র আমার।'

৬ কার্তিক ১৩০৬

নকল গড়

রাজস্থান

জলস্পর্শ করব না আর—
চিতোর রানার পণ,
বুঁদির কেল্লা মাটির 'পরে
থাকবে যতক্ষণ।
'কী প্রতিজ্ঞা, হায় মহারাজ,
মানুষের যা অসাধ্য কাজ
কেমন ক'রে সাধবে তা আজ,'
কহেন মন্ত্রীগণ।
কহেন রাজা, 'সাধ্য না হয়
সাধব আমার পণ।'

বুঁদির কেল্লা চিতোর হতে
যোজন তিনেক দূর।
সেথায় হারাবংশী সবাই
মহা মহা শূর।
হামু রাজা দিচ্ছে থানা,
ভয় কারে কয় নাইকো জানা,
তাহার সদ্য প্রমাণ রানা
পেয়েছেন প্রচুর।
হারাবংশীর কেল্লা বুঁদি
যোজন তিনেক দূর।

মন্ত্রী কহে যুক্তি করি,
'আজকে সারারাতি
মাটি দিয়ে বুঁদির মতো
নকল কেল্লা পাতি।
রাজা এসে আপন করে
দিবেন ভেঙে ধূলির 'পরে,
নইলে শুধু কথার তরে
হবেন আত্মঘাতী।'
মন্ত্রী দিল চিতোর-মাঝে
নকল কেল্লা পাতি।

কুম্ভ ছিল রানার ভৃত্য
হারাবংশী বীর,
হরিণ মেরে আসছে ফিরে
স্কন্ধে ধনু তীর।

খবর পেয়ে কহে, 'কে রে
নকল বুঁদি কেল্লা মেরে
হারাবংশী রাজপুতেরে
    করবে নতশির।
নকল বুঁদি রাখব আমি
    হারাবংশী বীর।'

মাটির কেল্লা ভাঙতে আসেন
    রানা মহারাজ।
'দূরে রহো'—কহে কুম্ভ,
    গর্জে যেন বাজ।
'বুঁদির নামে করবে খেলা,
সইব না সে অবহেলা,
নকল গড়ের মাটির ঢেলা
    রাখব আমি আজ।'
কহে কুম্ভ, 'দূরে রহো
    রানা মহারাজ।'

ভূমির 'পরে জানু পাতি
    তুলি ধনুঃশর
একা কুম্ভ রক্ষা করে
    নকল বুঁদিগড়।
রানার সেনা ঘিরি তারে
মুণ্ড কাটে তরবারে,
খেলা গড়ের সিংহদ্বারে
    পড়ল ভূমি-'পর।
রক্তে তাহার ধন্য হল
    নকল বুঁদিগড়।

৭ কার্তিক ১৩০৬

হোরিখেলা

রাজস্থান

পত্র দিল পাঠান কেসর খাঁরে
    কেতুন হতে ভূনাগ রাজার রানী,
'লড়াই করি আশ মিটেছে মিঞা?
বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া,
এসো তোমার পাঠান সৈন্য নিয়া
    হোরি খেলব আমরা রাজপুতানী।'
যুদ্ধে হারি কোটা শহর ছাড়ি
    কেতুন হতে পত্র দিল রানী।

পত্র পড়ি কেসর উঠে হাসি
　　মনের সুখে গোঁফে দিল চাড়া।
রঙিন দেখে পাগড়ি পরে মাথে,
সুর্মা আঁকি দিল আঁখির পাতে,
গন্ধভরা রুমাল নিল হাতে
　　সহস্রবার দাড়ি দিল ঝাড়া।
পাঠান-সাথে হোরি খেলবে রানী,
　　কেসর হাসি গোঁফে দিল চাড়া।

ফাগুন মাসে দখিন হতে হাওয়া
　　বকুলবনে মাতাল হয়ে এল।
বোল ধরেছে আমের বনে বনে,
ভ্রমরগুলো কে কার কথা শোনে,
গুন্‌গুনিয়ে আপন মনে মনে
　　ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এলোমেলো।
কেতুনপুরে দলে দলে আজি
　　পাঠান-সেনা হোরি খেলতে এল।

কেতুনপুরে রাজার উপবনে
　　তখন সবে ঝিকিমিকি বেলা।
পাঠানেরা দাঁড়ায় বনে আসি
মুলতানেতে তান ধরেছে বাঁশি,
এল তখন একশো রানীর দাসী
　　রাজপুতানী করতে হোরিখেলা;
রবি তখন রক্তরাগে রাঙা,
　　সবে তখন ঝিকিমিকি বেলা।

পায়ে পায়ে ঘাগরা উঠে দুলে,
　　ওড়না ওড়ে দক্ষিণে বাতাসে।
ডাহিন হাতে বহে ফাগের থারি,
নীবিবন্ধে ঝুলিছে পিচকারি,
বামহস্তে গুলাব-ভরা ঝারি
　　সারি সারি রাজপুতানী আসে।
পায়ে পায়ে ঘাগরা উঠে দুলে,
　　ওড়না ওড়ে দক্ষিণে বাতাসে।

আঁখির ঠারে চতুর হাসি হেসে
　　কেসর তবে কহে কাছে আসি,
'বেঁচে এলেম অনেক যুদ্ধ করি
আজকে বুঝি জানে-প্রাণে মরি।'
শুনে রানীর শতেক সহচরী
　　হঠাৎ সবে উঠল অট্টহাসি।

রাঙা পাগড়ি হেলিয়ে কেসর খাঁ
রঙ্গভরে সেলাম করে আসি।

শুরু হল হোরির মাতামাতি,
উড়তেছে ফাগ রাঙা সন্ধ্যাকাশে।
নব বরন ধরল বকুল ফুলে,
রক্তরেণু ঝরল তরুমূলে,
ভয়ে পাখি কূজন গেল ভুলে
রাজপুতানীর উচ্চ উপহাসে।
কোথা হতে রাঙা কুজ্ঝটিকা
লাগল যেন রাঙা সন্ধ্যাকাশে।

চোখে কেন লাগছে নাকো নেশা,
মনে মনে ভাবছে কেসর খাঁ।
বক্ষ কেন উঠছে নাকো দুলি,
নারীর পায়ে বাঁকা নূপুরগুলি
কেমন যেন বলছে বেসুর বুলি,
তেমন ক'রে কাঁকন বাজছে না।
চোখে কেন লাগছে নাকো নেশা,
মনে মনে ভাবছে কেসর খাঁ।

পাঠান কহে, 'রাজপুতানীর দেহে
কোথাও কিছু নাই কি কোমলতা।
বাহুযুগল নয় মৃণালের মতো,
কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত,
বড়ো কঠিন শুষ্ক স্বাধীন যত
মঞ্জরীহীন মরুভূমির লতা।'
পাঠান ভাবে দেহে কিংবা মনে
রাজপুতানীর নাইকো কোমলতা।

তান ধরিয়া ইমন ভূপালিতে
বাঁশি বেজে উঠল দ্রুত তালে।
কুণ্ডলেতে দোলে মুক্তামালা,
কঠিন হাতে মোটা সোনার বালা,
দাসীর হাতে দিয়ে ফাগের থালা
রানী বনে এলেন হেনকালে।
তান ধরিয়া ইমন ভূপালিতে
বাঁশি তখন বাজছে দ্রুত তালে।

কেসর কহে, 'তোমারি পথ চেয়ে
দুটি চক্ষু করেছি প্রায় কানা।'
রানী কহে, 'আমারো সেই দশা।'

একশো সখী হাসিয়া বিবশা,
পাঠানপতির ললাটে সহসা
মারেন রানী কাঁসার থালাখানা।
রক্তধারা গড়িয়ে পড়ে বেগে
পাঠানপতির চক্ষু হল কানা।

বিনা মেঘে বজ্ররবের মতো
উঠল বেজে কাড়া-নাকাড়া।
জ্যোৎস্নাকাশে চমকে ওঠে শশী,
ঝন্‌ঝনিয়ে ঝিকিয়ে ওঠে অসি,
সানাই তখন দ্বারের কাছে বসি
গভীর সুরে ধরল কানাড়া।
কুঞ্জবনের তরু-তলে-তলে
উঠল বেজে কাড়া-নাকাড়া।

বাতাস বেয়ে ওড়না গেল উড়ে,
পড়ল খসে ঘাগরা ছিল যত।
মন্ত্রে যেন কোথা হতে কে রে
বাহির হল নারীর সজ্জা ছেড়ে,
এক শত বীর ঘিরল পাঠানেরে
পুষ্প হতে একশো সাপের মতো।
স্বপ্নসম ওড়না গেল উড়ে,
পড়ল খসে ঘাগরা ছিল যত।

যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।
ফাগুন-রাতে কুঞ্জবিতানে
মত্ত কোকিল বিরাম না জানে,
কেতুনপুরে বকুল-বাগানে
কেসর খাঁয়ের খেলা হল সারা।
যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।

৯ কার্তিক ১৩০৬

বিবাহ

রাজস্থান

প্রহরখানেক রাত হয়েছে শুধু,
ঘন ঘন বেজে ওঠে শাঁখ।
বর-কন্যা যেন ছবির মতো
আঁচলবাঁধা দাঁড়িয়ে আঁখি-নত,

জানলা খুলে পুরাঙ্গনা যত
 দেখছে চেয়ে ঘোমটা করি ফাঁক।
বর্ষারাতে মেঘের গুরুগুরু—
 তারি সঙ্গে বাজে বিয়ের শাঁখ।

ঈশান কোণে থমকে আছে হাওয়া,
 মেঘে মেঘে আকাশ আছে ঘেরি।
সভাকক্ষে হাজার দীপালোকে
মণিমালায় ঝিলিক হানে চোখে:
সভার মাঝে হঠাৎ এল ও কে,
 বাহির-দ্বারে বেজে উঠল ভেরী।
চমকে ওঠে সভার যত লোকে,
 উঠে দাঁড়ায় বর-কনেরে ঘেরি।

টোপর-পরা মেত্রি-রাজকুমারে
 কহে তখন মাড়োয়ারের দূত,
যুদ্ধ বাধে বিদ্রোহীদের সনে,
রামসিংহ রানা চলেন রণে,
তোমরা এসো তাঁরি নিমন্ত্রণে
 যে যে আছ মর্তিয়া রাজপুত।
জয় রানা রামসিঙের জয়—
 গর্জি উঠে মাড়োয়ারের দূত।

'জয় রানা রামসিঙের জয়'
 মেত্রিপতি ঊর্ধ্বস্বরে কয়।
কনের বক্ষ কেঁপে ওঠে ডরে,
দুটি চক্ষু ছল ছল করে,
বরযাত্রী হাঁকে সমস্বরে,
 জয় রানা রামসিঙের জয়।
সময় নাহি মেত্রি-রাজকুমার—
 মহারানার দূত উচ্চে কয়।

বৃথা কেন ওঠে হুলুধ্বনি,
 বৃথা কেন বেজে ওঠে শাঁখ।
বাঁধা আঁচল খুলে ফেলে বর,
মুখের পানে চাহে পরস্পর,
কহে, প্রিয়ে, নিলেম অবসর,
 এসেছে ওই মৃত্যুসভার ডাক।
বৃথা এখন ওঠে হুলুধ্বনি,
 বৃথা এখন বেজে ওঠে শাঁখ।

বরের বেশে টোপর পরি শিরে
ঘোড়ায় চড়ি ছুটে রাজকুমার।
মলিন মুখে নম্র নতশিরে
কন্যা গেল অন্তঃপুরে ফিরে.
হাজার বাতি নিবল ধীরে ধীরে
রাজার সভা হল অন্ধকার।
গলায় মালা টোপর-পরা শিরে
ঘোড়ায় চড়ি ছুটে রাজকুমার।

মাতা কেঁদে কহেন, বধূবেশ
খুলিয়া ফেল্‌ হায় রে হতভাগী।
শান্তমুখে কন্যা কহে মায়ে,
কেঁদো না মা, ধরি তোমার পায়ে,
বধূসজ্জা থাক্‌ মা আমার গায়ে,
মৈত্রিপুরে যাইব তাঁর লাগি।
শুনে মাতা কপালে কর হানি
কেঁদে কহেন, হায় রে হতভাগী।

গ্রহবিপ্র আশীর্বাদ করি
ধানদূর্বা দিল তাহার মাথে।
চড়ে কন্যা চতুর্দোলা-'পরে,
পুরনারী হুলুধ্বনি করে,
রঙিন বেশে কিংকরী কিংকরে
সারি সারি চলে বালার সাথে।
মাতা আসি চুমো খেলেন মুখে,
পিতা আসি হস্ত দিলেন মাথে।

নিশীথ-রাতে আকাশ আলো করি
কে এল রে মৈত্রিপুরদ্বারে।
থামাও বাঁশি—কহে, থামাও বাঁশি—
চতুর্দোলা নামাও রে দাসদাসী,
মিলেছি আজ মৈত্রিপুরবাসী
মৈত্রিপতির চিতা রচিবারে।
মৈত্ররাজা যুদ্ধে হত আজি,
দুঃসময়ে কারা এলে দ্বারে।

বাজাও বাঁশি, ওরে বাজাও বাঁশি
চতুর্দোলা হতে বধূ বলে—
এবার লগ্ন আর হবে না পার,
আঁচলে গাঁঠ খুলবে না তো আর,
শেষের মন্ত্র উচ্চারো এইবার
শ্মশান-সভায় দীপ্ত চিতানলে।

বাজাও বাঁশি, ওরে বাজাও বাঁশি
চতুর্দোলা হতে বধূ বলে।

বরের বেশে মোতির মালা গলে
মৌরিপতি চিতার 'পরে শুয়ে।
দোলা হতে নামল আসি নারী,
আঁচল বাঁধি রক্তবাসে তাঁরি
শিয়র-'পরে বৈসে রাজকুমারী
বরের মাথা কোলের 'পরে থুয়ে।
নিশীথ-রাতে মিলনসজ্জা-পরা
মৌরিপতি চিতার 'পরে শুয়ে।

ঘন ঘন জাগল হুলুধ্বনি,
দলে দলে আসে পুরাঙ্গনা।
কয় পুরোহিত—ধন্য সুচরিতা,
গাহিছে ভাট—ধন্য মৃত্যুজিতা,
ধূ ধূ করে জ্বলে উঠল চিতা—
কন্যা বসে আছেন যোগাসনা।
জয়ধ্বনি ওঠে শ্মশান-মাঝে,
হুলুধ্বনি করে পুরাঙ্গনা।

১১ কার্তিক ১৩০৬

বিচারক

পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন-প্রণীত চরিতমালা হইতে গৃহীত। অ্যাক্‌ওআর্থ সাহেব-প্রণীত Ballads of the Marathas নামক গ্রন্থে রঘুনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণ রাওয়ের হত্যা সম্বন্ধে প্রচলিত মারাঠি গাথার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

পুণ্য নগরে রঘুনাথ রাও
পেশোয়া নৃপতি বংশ,
রাজাসনে উঠি কহিলেন বীর,
'হরণ করিব ভার পৃথিবীর,
মৈসুরপতি হৈদরালির
দর্প করিব ধ্বংস।'

দেখিতে দেখিতে পুরিয়া উঠিল
সেনানী আশি সহস্র।
নানা দিকে দিকে নানা পথে পথে
মারাঠার যত গিরিদরি হতে
বীরগণ যেন শ্রাবণের স্রোতে
ছুটিয়া আসে অজস্র।

উড়িল গগনে বিজয়পতাকা,
ধ্বনিল শতেক শঙ্খ।
হুলুরব করে অঙ্গনা সবে,
মারাঠা নগরী কাঁপিল গরবে,
রহিয়া রহিয়া প্রলয়-আরবে
বাজে ভৈরব ডঙ্ক।

ধুলার আড়ালে ধ্বজ-অরণ্যে
লুকাল প্রভাতসূর্য।
রক্ত অশ্বে রঘুনাথ চলে
আকাশ বধির জয়-কোলাহলে,
সহসা যেন কী মন্ত্রের বলে
থেমে গেল রণতূর্য।

সহসা কাহার চরণে ভূপতি
জানাল পরম দৈন্য।
সমরোন্মাদে ছুটিতে ছুটিতে
সহসা নিমেষে কার ইঙ্গিতে
সিংহদুয়ারে থামিল চকিতে
আশি সহস্র সৈন্য।

ব্রাহ্মণ আসি দাঁড়াল সমুখে
ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী।
দুই বাহু তাঁর তুলিয়া উধাও,
কহিলেন ডাকি, 'রঘুনাথ রাও,
নগর ছাড়িয়া কোথা চলে যাও,
না লয়ে পাপের শাস্তি।'

নীরব হইল জয়-কোলাহল,
নীরব সমর-বাদ্য।
'প্রভু, কেন আজি' কহে রঘুনাথ,
'অসময়ে পথ রুধিলে হঠাৎ
চলেছি করিতে যবন নিপাত
জোগাতে যমের খাদ্য।'

কহিলা শাস্ত্রী, 'বধিয়াছ তুমি
আপন ভ্রাতার পুত্রে।
বিচার তাহার না হয় য-দিন
ততকাল তুমি নহ তো স্বাধীন,
বন্দী রয়েছ অমোঘ কঠিন
ন্যায়ের বিধান-সূত্রে।'

রুষিয়া উঠিলা রঘুনাথ রাও,
কহিলা করিয়া হাস্য,
'নৃপতি কাহারো বাঁধন না মানে,
চলেছি দীপ্ত মুক্ত কৃপাণে,
শুনিতে আসি নি পথ-মাঝখানে
ন্যায়-বিধানের ভাষ্য।'

কহিলা শাস্ত্রী, 'রঘুনাথ রাও,
যাও করো গিয়ে যুদ্ধ।
আমিও দণ্ড ছাড়িনু এবার,
ফিরিয়া চলিনু গ্রামে আপনার,
বিচারশালার খেলাঘরে আর
না রহিব অবরুদ্ধ।'

বাজিল শঙ্খ, বাজিল ডঙ্ক,
সেনানী ধাইল ক্ষিপ্র।
ছাড়ি দিয়া গেলা গৌরব-পদ,
দূরে ফেলি দিলা সব সম্পদ
গ্রামের কুটীরে চলি গেলা ফিরে
দীন দরিদ্র বিপ্র।

৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৬

পণরক্ষা

'মারাঠা দস্যু আসিছে রে ওই
করো করো সবে সাজ।'
আজমীর গড়ে কহিলা হাঁকিয়া
দুর্গেশ দুমরাজ।
বেলা দু-পহরে যে-যাহার ঘরে
সেঁকিছে জোয়ারি রুটি,
দুর্গতোরণে নাকাড়া বাজিতে
বাহিরে আসিল ছুটি।
প্রাকারে চড়িয়া দেখিল চাহিয়া
দক্ষিণে বহুদূরে
আকাশ জুড়িয়া উড়িয়াছে ধুলা
মারাঠি অশ্বখুরে।
'মারাঠার যত পতঙ্গপাল
কৃপাণ-অনলে আজ
ঝাঁপ দিয়া পড়ি ফিরে নাকো যেন'
গর্জিলা দুমরাজ।

মাড়োয়ার হতে দূত আসি বলে,
'বৃথা এ সৈন্যসাজ,
হেরো এ প্রভুর আদেশপত্র
দুর্গেশ দুমরাজ।
সিন্দে আসিছে, সঙ্গে তাঁহার
ফিরিঙ্গি সেনাপতি,
সাদরে তাঁদের ছাড়িবে দুর্গ,
আজ্ঞা তোমার প্রতি।
বিজয়লক্ষ্মী হয়েছে বিমুখ
বিজয়সিংহ-'পরে :
বিনা সংগ্রামে আজমীর গড়
দিবে মারাঠার করে।'
'প্রভুর আদেশে বীরের ধর্মে
বিরোধ বাধিল আজ'—
নিশ্বাস ফেলি কহিলা কাতরে
দুর্গেশ দুমরাজ।

মাড়োয়ার দূত করিল ঘোষণা,
'ছাড়ো ছাড়ো রণসাজ।'
রহিল পাষাণ-মুরতি-সমান
দুর্গেশ দুমরাজ।
বেলা যায় যায়, ধূ ধূ করে মাঠ
দূরে দূরে চরে ধেনু,
তরুতলছায়ে সকরুণ রবে
বাজে রাখালের বেণু।
'আজমীর গড় দিলা যবে মোরে
পণ করিলাম মনে,
প্রভুর দুর্গ শত্রুর করে
ছাড়িব না এ জীবনে।
প্রভুর আদেশে সে সত্য হায়
ভাঙিতে হবে কি আজ।'
এতেক ভাবিয়া ফেলে নিশ্বাস
দুর্গেশ দুমরাজ।

রাজপুত সেনা সরোষে শরমে
ছাড়িল সমর-সাজ।
নীরবে দাঁড়ায়ে রহিল তোরণে
দুর্গেশ দুমরাজ।
গেরুয়া-বসনা সন্ধ্যা নামিল
পশ্চিম মাঠ পারে;
মারাঠি সৈন্য ধুলা উড়াইয়া
থামিল দুর্গদ্বারে।

'দুয়ারের কাছে কে ওই শয়ান,
ওঠো ওঠো খোলো দ্বার।'
নাহি শোনে কেহ, প্রাণহীন দেহ
সাড়া নাহি দিল আর।
প্রভুর কর্মে বীরের ধর্মে
বিরোধ মিটাতে আজ
দুর্গদুয়ারে ত্যজিয়াছে প্রাণ
দুর্গেশ দুমরাজ।

অগ্রহায়ণ ১৩০৬

সংযোজন

দীন দান

নিবেদিল রাজভৃত্য, 'মহারাজ, বহু অনুনয়ে
সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তোমার সোনার দেবালয়ে
না লয়ে আশ্রয় আজি পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়াতলে
করিছেন নাম-সংকীর্তন। ভক্তবৃন্দ দলে দলে
ঘেরি তাঁরে দরদর উদ্বেলিত আনন্দধারায়
ধৌত ধন্য করিছেন ধরণীর ধূলি। শূন্যপ্রায়
দেবাঙ্গন; ভৃঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাণ্ড ফেলি
সহসা কমলগন্ধে মত্ত হয়ে দ্রুত পক্ষ মেলি
ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মীলিত পদ্ম-উপবনে
উন্মুখ পিপাসাভরে, সেইমতো নরনারীগণে
সোনার দেউল-পানে না তাকায়ে চলিয়াছে ছুটি
যেথায় পথের প্রান্তে ভক্তের হৃদয়পদ্ম ফুটি
বিতরিছে স্বর্গের সৌরভ। রত্নবেদিকার 'পরে
একা দেব রিক্ত দেবালয়ে।'

শুনি রাজা ক্ষোভভরে
সিংহাসন হতে নামি গেলা চলি, যেথা তরুচ্ছায়ে
সাধু বসি তৃণাসনে; কহিলেন নমি তাঁর পায়ে,
'হেরো প্রভু, স্বর্ণশীর্ষ নৃপতিনির্মিত নিকেতন
অভ্রভেদী দেবালয়, তারে কেন করিয়া বর্জন
দেবতার স্তবগান গাহিতেছ পথপ্রান্তে বসে।'
'সে মন্দিরে দেব নাই' কহে সাধু।

রাজা কহে রোষে,
'দেব নাই! হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মতো কথা কহ।
রত্নসিংহাসন-'পরে দীপিতেছে রতন-বিগ্রহ--
শূন্য তাহা?'

'শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ', সাধু কহে,
'আপনায় স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নহে।'
ভ্রূ কুঞ্চিয়া কহে রাজা, 'বিংশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া
রচিয়াছি অনিন্দিত যে মন্দির, অম্বর ভেদিয়া
পূজামন্ত্রে নিবেদিয়া দেবতারে করিয়াছি দান,
তুমি কহ সে মন্দিরে দেবতার নাহি কোনো স্থান?'
শান্ত মুখে কহে সাধু, 'যে বৎসর বহ্নিদাহে দীন
বিংশতি সহস্র প্রজা গৃহহীন অন্নবস্ত্রহীন
দাঁড়াইল দ্বারে তব, কেঁদে গেল ব্যর্থ প্রার্থনায়
অরণ্যে, গুহার গর্ভে, পথপ্রান্তে তরুর ছায়ায়,
অশ্বত্থবিদীর্ণ জীর্ণ মন্দির-প্রাঙ্গণে, সে বৎসর
বিংশ লক্ষ মুদ্রা দিয়া রচি তব স্বর্ণদীপ্ত ঘর
দেবতারে সমর্পিলে। সে দিন কহিলা ভগবান—
'আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান
অনন্ত নীলিমা-মাঝে; মোর ঘরে ভিত্তি চিরন্তন

সত্য শান্তি দয়া প্রেম। দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ
নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে,
সে আমারে গৃহ করে দান!' চলি গেলা সেই ক্ষণে
পথপ্রান্তে তরুতলে দীন-সাথে দীনের আশ্রয়।
অগাধ সমুদ্র-মাঝে স্ফীত ফেন যথা শূন্যময়,
তেমনি পরম শূন্য তোমার মন্দির বিশ্বতলে,
স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্‌বুদ।'

রাজা জ্বলি রোষানলে,
কহিলেন, 'রে ভণ্ড পামর, মোর রাজ্য ত্যাগ করে
এ মুহূর্তে চলি যাও।'

সন্ন্যাসী কহিলা শান্ত স্বরে,
'ভক্তবৎসলেরে তুমি যেথায় পাঠালে নির্বাসনে
সেইখানে, মহারাজ, নির্বাসিত কর ভক্তজনে।'

২০ শ্রাবণ ১৩০৭

কল্পনা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
সুহৃৎকরকমলে

বৈশাখ ১৩০০

দুঃসময়

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

এ নহে মুখর বন-মর্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে।
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুমরঞ্জিত,
ফেন-হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে।
কোথা রে সে তীর ফুলপল্লবপুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়-শাখা।
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্বরী,
ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে।
বিশ্বজগৎ নিশ্বাসবায়ু সম্বরি
স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে।
সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি
দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমা-পানে আছে চাহিয়া।
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি
শত তরঙ্গে তোমা-পানে উঠে ধাইয়া।
বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
এসো এসো সুরে করুণ মিনতি-মাখা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহবন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।

ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা,
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

জোড়াসাঁকো
১৫ বৈশাখ ১৩০৪

বর্ষামঙ্গল

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে;
নিখিল-চিত্ত-হরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা
কোথা তোরা অভিসারিকা।
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা

আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটীরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জপাতায় নব গীত করো রচনা
মেঘমল্লার রাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী।

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,

কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন-শিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিতবিকশিত বয়নে,
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে।

স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে,
শশীতারাহীনা অন্ধতামসী যামিনী;
কোথা তোরা পুরকামিনী।
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী;
শূন্যশয়নে কোথা জাগে পুরকামিনী।

যূথী-পরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরী তমালকুঞ্জ-তিমিরে,
জাগো সহচরী আজিকার নিশি ভুলো না,
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।
কুসুম-পরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে,
কোথা পুলকের তুলনা।
নীপশাখে সখী ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা।

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা।
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।
শত শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা।

জোড়াসাঁকো
১৭ বৈশাখ ১৩০৪

চৌর-পঞ্চাশিকা

ওগো সুন্দর চোর,
বিদ্যা তোমার কোন্ সন্ধ্যার
কনকচাঁপার ডোর।
কত বসন্ত চলি গেছে হায়,
কত কবি আজি কত গান গায়,
কোথা রাজবালা চির শয্যায়
ওগো সুন্দর চোর,
কোনো গানে আর ভাঙে না যে তার
অনন্ত ঘুমঘোর।

ওগো সুন্দর চোর,
কত কাল হল কবে সে প্রভাতে
তব প্রেমনিশি ভোর।
কবে নিবে গেছে নাহি তাহা লিখা
তোমার বাসরে দীপানলশিখা,
খসিয়া পড়েছে সোহাগ-লতিকা,
ওগো সুন্দর চোর,
শিথিল হয়েছে নবীন প্রেমের
বাহুপাশ সুকঠোর।

তবু সুন্দর চোর,
মৃত্যু হারায়ে কেঁদে কেঁদে ঘুরে
পঞ্চাশ শ্লোক তোর।
পঞ্চাশ বার ফিরিয়া ফিরিয়া
বিদ্যার নাম ঘিরিয়া ঘিরিয়া
তীব্র ব্যথায় মর্ম চিরিয়া
ওগো সুন্দর চোর,
যুগে যুগে তারা কাঁদিয়া মরিছে
মুঢ় আবেগে ভোর।

ওগো সুন্দর চোর,
অবোধ তাহারা বধির তাহারা
অন্ধ তাহারা ঘোর।
দেখে না শোনে না কে আসে কে যায়,
জানে না কিছুই কারে তারা চায়,
শুধু এক নাম এক সুরে গায়
ওগো সুন্দর চোর,
না জেনে না বুঝে ব্যর্থ ব্যথায়
ফেলিছে নয়নলোর।

ওগো সুন্দর চোর,
এক সুরে বাঁধা পঞ্চাশ গাথা
শুনে মনে হয় মোর—
রাজভবনের গোপনে পালিত,
রাজবালিকার সোহাগে লালিত,
তব বুকে বসি শিখেছিল গীত
ওগো সুন্দর চোর,
পোষা শুকসারী মধুরকণ্ঠ
যেন পঞ্চাশ জোড়।

ওগো সুন্দর চোর,
তোমারি রচিত সোনার ছন্দ-
পিঞ্জরে তারা ভোর।
দেখিতে পায় না কিছু চারি ধারে,
শুধু চিরনিশি গাহে বারে বারে
তোমাদের চিরশয়নদুয়ারে
ওগো সুন্দর চোর,
আজি তোমাদের দুজনের চোখে
অনন্ত ঘুমঘোর।

২৩ বৈশাখ ১৩০৫
পরিবর্ধন : ৯ জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা

স্বপ্ন

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে।

মহাকাল মন্দিরের মাঝে
তখন গম্ভীর মন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে।
জনশূন্য পণ্যবীথি, ঊর্ধ্বে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্য-'পরে সন্ধ্যারশ্মিরেখা।

প্রিয়ার ভবন
বঙ্কিম সংকীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন।
দ্বারে আঁকা শঙ্খ চক্র, তারি দুই ধারে
দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।
তোরণের শ্বেতস্তম্ভ-'পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্তি বসি দম্ভভরে।

প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এল ঘরে,
ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণদণ্ড-'পরে।
হেনকালে হাতে দীপশিখা
ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা।
দেখা দিল দ্বারপ্রান্তে সোপানের 'পরে
সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মতো সন্ধ্যাতারা করে।
অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশ-ধূপবাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।
প্রকাশিল অর্ধচ্যুত বসন-অন্তরে
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে।
দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায়
নগরগুঞ্জনক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়।

মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে— মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীরবে শুধাল শুধু, সকরুণ আঁখি,
'হে বন্ধু, আছ তো ভালো?' মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু, কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি, নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত— মনে নাহি আর।
দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহা-পানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।

দুজনে ভাবিনু কত দ্বারতরুতলে।
নাহি জানি কখন কী ছলে
সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণ করে কুলায়প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখির মতো, মুখখানি তার
নতবৃন্ত পদ্ম-সম এ বক্ষে আমার
নমিয়া পড়িল ধীরে, ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আসি নিশ্বাসে নিশ্বাস।

রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।

দীপ দ্বারপাশে
কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।
শিপ্রানদীতীরে
আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে।

বোলপুর
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

মদনভস্মের পূর্বে

একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে
মরি মরি অনঙ্গ দেবতা।
কুসুমরথে মকরকেতু উড়িত মধু-পবনে
পথিকবধূ চরণে প্রণতা।
ছড়াত পথে আঁচল হতে অশোক চাঁপা করবী
মিলিয়া যত তরুণ তরুণী,
বকুলবনে পবন হত সুরার মতো সুরভি
পরান হত অরুণবরনী।

সন্ধ্যা হলে কুমারীদলে বিজন তব দেউলে
জ্বালায়ে দিত প্রদীপ যতনে,
শূন্য হলে তোমার তূণ বাছিয়া ফুল-মুকুলে
সায়ক তারা গড়িত গোপনে।
কিশোর কবি মুগ্ধ ছবি বসিয়া তব সোপানে
বাজায়ে বীণা রচিত রাগিণী।
হরিণ-সাথে হরিণী আসি চাহিত দীন নয়ানে,
বাঘের সাথে আসিত বাঘিনী।

হাসিয়া যবে তুলিতে ধনু প্রণয়ভীরু ষোড়শী
চরণে ধরি করিত মিনতি।
পঞ্চশর গোপনে লয়ে কৌতুহলে উলসি
পরখছলে খেলিত যুবতী।
শ্যামল তৃণশয়নতলে ছড়ায়ে মধু-মাধুরী
ঘুমাতে তুমি গভীর আলসে,
ভাঙাতে ঘুম লাজুক বধূ করিত কত চাতুরী
নূপুর দুটি বাজাত লালসে।

কাননপথে কলস লয়ে চলিত যবে নাগরী
কুসুমশর মারিতে গোপনে,
যমুনাকূলে মনের ভুলে ভাসায়ে দিয়ে গাগরি
রহিত চাহি আকুল নয়নে।

বাহিয়া তব কুসুমতরী সমুখে আসি হাসিতে
শরমে বালা উঠিত জাগিয়া,
শাসনতরে বাঁকায়ে ভুরু নামিয়া জলরাশিতে
মারিত জল হাসিয়া রাগিয়া।

তেমনি আজো উদিছে বিধু মাতিছে মধুযামিনী
মাধবীলতা মুদিছে মুকুলে।
বকুলতলে বাঁধিছে চুল একেলা বসি কামিনী
মলয়ানিল-শিথিল দুকূলে।
বিজন নদীপুলিনে আজো ডাকিছে চখা চখীরে,
মাঝেতে বহে বিরহ-বাহিনী।
গোপন-ব্যথা-কাতরা বালা বিরলে ডাকি সখীরে
কাঁদিয়া কহে করুণ কাহিনী।

এসো গো আজি অঙ্গ ধরি সঙ্গে করি সখারে
বন্যমালা জড়ায়ে অলকে,
এসো গোপনে মৃদুচরণে বাসরগৃহ-দুয়ারে
স্তিমিতশিখা প্রদীপ-আলোকে।
এসো চতুর মধুর হাসি তড়িৎ-সম সহসা
চকিত করো বধূরে হরষে,
নবীন করো মানব-ঘর, ধরণী করো বিবশা
দেবতাপদ-সরস-পরশে।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

মদনভস্মের পর

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতি-বিলাপ-সংগীতে
সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।
ফাগুন মাসে নিমেষ-মাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি মুরছি পড়ে অবনী।

আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণা
হৃদয়-বীণাযন্ত্রে মহা পুলকে,
তরুণী বসি ভাবিয়া মরে কী দেয় তারে মন্ত্রণা
মিলিয়া সবে দ্যুলোকে আর ভূলোকে।

কী কথা উঠে মর্মরিয়া বকুল-তরু-পল্লবে,
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা।
ঊর্ধ্বমুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে,
নির্ঝরিণী বহিছে কোন্ পিপাসা।

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত
নয়ন কার নীরব নীল গগনে।
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে।
পরশ কার পুষ্পবাসে পরান মন উল্লাসি
হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে,
পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

মার্জনা

ওগো প্রিয়তম, আমি তোমারে যে ভালোবেসেছি
মোরে দয়া করে কোরো মার্জনা, কোরো মার্জনা।
ভীরু পাখির মতন তব পিঞ্জরে এসেছি
ওগো তাই ব'লে দ্বার কোরো না রুদ্ধ কোরো না।
মোর যাহা-কিছু ছিল কিছুই পারি নি রাখিতে,
মোর উতলা হৃদয় তিলেক পারি নি ঢাকিতে,
সখা, তুমি রাখো ঢাকি, তুমি করো মোরে করুণা,
ওগো আপনার গুণে অবলারে কোরো মার্জনা, কোরো মার্জনা।

ওগো প্রিয়তম, যদি নাহি পার ভালোবাসিতে
তবু ভালোবাসা কোরো মার্জনা, কোরো মার্জনা।
তব দুটি আঁখিকোণ ভরি দুটি কণা হাসিতে
এই অসহায়া-পানে চেয়ো না বন্ধু চেয়ো না।
আমি সম্বরি বাস ফিরে যাব দ্রুতচরণে,
আমি চকিত শরমে লুকাব আঁধার মরণে,
আমি দু-হাতে ঢাকিব নগ্ন হৃদয়-বেদনা,
ওগো প্রিয়তম, তুমি অভাগীরে কোরো মার্জনা, কোরো মার্জনা।

ওগো প্রিয়তম, যদি চাহ মোরে ভালোবাসিয়া
মোর সুখরাশি কোরো মার্জনা, কোরো মার্জনা।
যবে সোহাগের স্রোতে যাব নিরুপায় ভাসিয়া
তুমি দূর হতে বসি হেসো না গো সখা হেসো না।

যবে রানীর মতন বসিব রতন-আসনে,
যবে বাঁধিব তোমারে নিবিড় প্রণয়শাসনে,
যবে দেবীর মতন পুরাব তোমার বাসনা,
ওগো তখন হে নাথ, গরবীরে কোরো মার্জনা, কোরো মার্জনা।

বোলপুর
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

চৈত্ররজনী

আজি উন্মাদ মধুনিশি, ওগো
চৈত্রনিশীথশশী।
তুমি এ বিপুল ধরণীর পানে
কী দেখিছ একা বসি
চৈত্রনিশীথশশী।

কত নদীতীরে, কত মন্দিরে,
কত বাতায়নতলে,
কত কানাকানি, মন-জানাজানি,
সাধাসাধি কত ছলে।
শাখা-প্রশাখার, দ্বার-জানালার
আড়ালে আড়ালে পশি
কত সুখদুখ কত কৌতুক
দেখিতেছ একা বসি।
চৈত্রনিশীথশশী।

মোরে দেখো চাহি, কেহ কোথা নাহি,
শূন্য ভবন-ছাদে
নৈশ পবন কাঁদে।
তোমারি মতন একাকী আপনি
চাহিয়া রয়েছি বসি
চৈত্রনিশীথশশী।

জোড়াসাঁকো
১৯ বৈশাখ ১৩০৪

স্পর্ধা

সে আসি কহিল, 'প্রিয়ে, মুখ তুলে চাও।'
দুষিয়া তাহারে রুষিয়া কহিনু, 'যাও!'
সখী ওলো সখী, সত্য করিয়া বলি,
তবু সে গেল না চলি।

দাঁড়াল সমুখে, কহিনু তাহারে, 'সরো!'
ধরিল দু-হাত, কহিনু, 'আহা কী কর!'
সখী ওলো সখী, মিছে না কহিব তোরে,
তবু ছাড়িল না মোরে।

শ্রুতিমূলে মুখ আনিল সে মিছিমিছি,
নয়ন বাঁকায়ে কহিনু তাহারে, 'ছি ছি!'
সখী ওলো সখী, কহিনু শপথ ক'রে
তবু সে গেল না সরে।

অধরে কপোল পরশ করিল তবু,
কাঁপিয়া কহিনু, 'এমন দেখি নি কভু!'
সখী ওলো সখী, এ কী তার বিবেচনা,
তবু মুখ ফিরাল না।

আপন মাল্যটি আমারে পরায়ে দিল,
কহিনু তাহারে, 'মালায় কী কাজ ছিল!'
সখী ওলো সখী, নাহি তার লাজ ভয়,
মিছে তারে অনুনয়।

আমার মাল্যটি চলিল গলায় লয়ে,
চাহি তার পানে রহিনু অবাক হয়ে।
সখী ওলো সখী, ভাসিতেছি আঁখিনীরে,
কেন সে এল না ফিরে।

১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

পিয়াসী

আমি তো চাহি নি কিছু।
বনের আড়ালে দাঁড়ায়ে ছিলাম
নয়ন করিয়া নিচু।
তখনো ভোরের আলস-অরুণ
আঁখিতে রয়েছে ঘোর,
তখনো বাতাসে জড়ানো রয়েছে
নিশির শিশির-লোর।
নূতন তৃণের উঠিছে গন্ধ
মন্দ প্রভাতবায়ে:
তুমি একাকিনী কুটীরবাহিরে
বসিয়া অশথছায়ে

নবীন-নবনী-নিন্দিত করে
দোহন করিছ দুগ্ধ;
আমি তো কেবল বিধুর বিভোল
দাঁড়ায়ে ছিলাম মুগ্ধ।

আমি তো কহি নি কথা।
বকুলশাখায় জানি না কী পাখি
কী জানাল ব্যাকুলতা।
আম্রকাননে ধরেছে মুকুল,
ঝরিছে পথের পাশে.
গুঞ্জনস্বরে দুয়েকটি করে
মউমাছি উড়ে আসে।
সরোবরপারে খুলিছে দুয়ার
শিবমন্দির-ঘরে.
সন্ন্যাসী গাহে ভোরের ভজন
শান্ত গভীর স্বরে।
ঘট লয়ে কোলে বসি তরুতলে
দোহন করিছ দুগ্ধ;
শূন্য পাত্র বহিয়া মাত্র
দাঁড়ায়ে ছিলাম লুব্ধ।

আমি তো যাই নি কাছে।
উতলা বাতাস অলকে তোমার
কী জানি কী করিয়াছে।
ঘণ্টা তখন বাজিছে দেউলে
আকাশ উঠিছে জাগি;
ধরণী চাহিছে ঊর্ধ্বগগনে
দেবতা-আশিস মাগি।
গ্রামপথ হতে প্রভাত-আলোতে
উড়িছে গোখুর-ধূলি—
উছলিত ঘট বেড়ি কটিতটে
চলিয়াছে বধূগুলি।
তোমার কাঁকন বাজে ঘনঘন
ফেনায়ে উঠিছে দুগ্ধ,
পিয়াসী নয়নে ছিনু এক কোণে
পরান নীরবে ক্ষুব্ধ।

১৩০৪

পসারিনী

ওগো পসারিনী, দেখি আয়
কী রয়েছে তব পসরায়।
এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছ ধরি
কোমল করুণ ক্লান্তকায়।
কোথা কোন্ রাজপুরে যাবে আরো কত দূরে
কিসের দুরূহ দুরাশায়।
সম্মুখে দেখো তো চাহি, পথের যে সীমা নাহি,
তপ্ত বালু অগ্নিবাণ হানে।
পসারিনী কথা রাখো, দূর পথে যেয়ো নাকো,
ক্ষণেক দাঁড়াও এইখানে।

হেথা দেখো শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতল,
কূলে কূলে ভরা দিঘি, কাকচক্ষু জল।
ঢালু পাড়ি চারি পাশে কচি কচি কাঁচা ঘাসে
ঘনশ্যাম চিকনকোমল।
পাষাণের ঘাটখানি, কেহ নাই জনপ্রাণী,
আম্রবন নিবিড় শীতল।
থাক্ তব বিকি-কিনি, ওগো শ্রান্ত পসারিনী,
এইখানে বিছাও অঞ্চল।

ব্যথিত চরণ দুটি ধুয়ে নিবে জলে,
বনফুলে মালা গাঁথি পরি নিবে গলে।
আম্রমঞ্জরীর গন্ধ বহি আনি মৃদুমন্দ
বায়ু তব উড়াবে অলক,
ঘুঘু-ডাকে ঝিল্লিরবে কী মন্ত্র শ্রবণে কবে,
মুদে যাবে চোখের পলক।
পসরা নামায়ে ভূমে যদি ঢুলে পড় ঘুমে,
অঙ্গে লাগে সুখালসঘোর,
যদি ভুলে তন্দ্রাভরে, ঘোমটা খসিয়া পড়ে,
তাহে কোনো শঙ্কা নাহি তোর।

যদি সন্ধ্যা হয়ে আসে, সূর্য যায় পাটে;
পথ নাহি দেখা যায় জনশূন্য মাঠে,
নাই গেলে বহু দূরে, বিদেশের রাজপুরে,
নাই গেলে রতনের হাটে।
কিছু না করিয়ো ডর, কাছে আছে মোর ঘর,
পথ দেখাইয়া যাব আগে।
শশীহীন অন্ধ রাত, ধরিয়ো আমার হাত
যদি মনে বড়ো ভয় লাগে।

শয্যা শুভ্রফেননিভ স্বহস্তে পাতিয়া দিব,
গৃহকোণে দীপ দিব জ্বালি,
দুগ্ধ-দোহনের রবে কোকিল জাগিবে যবে
আপনি জাগায়ে দিব কালি।

ওগো পসারিনী,
মধ্যদিনে রুদ্ধ ঘরে সবাই বিশ্রাম করে,
দগ্ধ পথে উড়ে তপ্ত বালি,
দাঁড়াও, যেয়ো না আর, নামাও পসরাভার,
মোর হাতে দাও তব ডালি।

বোট। শিলাইদহ
২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

ভ্রষ্ট লগ্ন

শয়ন-শিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে,
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিলরবে।
অলসচরণে বসি বাতায়নে এসে
নূতন মালিকা পরেছি শিথিল কেশে।
এমন সময়ে অরুণ-ধূসর পথে
তরুণ পথিক দেখা দিল রাজরথে।
সোনার মুকুটে পড়েছে উষার আলো,
মুকুতার মালা গলায় সেজেছে ভালো।
শুধাল কাতরে, 'সে কোথায়, সে কোথায়।'
ব্যগ্রচরণে আমারি দুয়ারে নামি—
শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
'নবীন পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।'

গোধূলিবেলায় তখনো জ্বালে নি দীপ,
পরিতেছিলাম কপালে সোনার টিপ—
কনক-মুকুর হাতে লয়ে বাতায়নে
বাঁধিতেছিলাম কবরী আপন মনে।
হেনকালে এল সন্ধ্যা-ধূসর পথে
করুণনয়ন তরুণ পথিক রথে।
ফেনায় ঘর্মে আকুল অশ্বগুলি
বসনে ভূষণে ভরিয়া গিয়াছে ধূলি।
শুধাল কাতরে, 'সে কোথায়, সে কোথায়।'
ক্লান্ত চরণে আমারি দুয়ারে নামি—
শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
'শ্রান্ত পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।'

ফাগুন যামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে,
দখিন বাতাস মরিছে বুকের 'পরে।
সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা সারী,
দুয়ার সমুখে ঘুমায়ে পড়েছে দ্বারী।
ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসর-গেহ,
অগুরুগন্ধে আকুল সকল দেহ।
ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি,
দূর্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি।
রয়েছি বিজন রাজপথ-পানে চাহি,
বাতায়নতলে বসেছি ধুলায় নামি—
ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি,
'হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।'

বোলপুর
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

প্রণয়-প্রশ্ন

এ কি তবে সবি সত্য
হে আমার চিরভক্ত।
আমার চোখের বিজুলি-উজল আলোকে
হৃদয়ে তোমার ঝঞ্জার মেঘ ঝলকে,
এ কি সত্য।
আমার মধুর অধর, বধূর
নব লাজ-সম রক্ত,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য।

চিরমন্দার ফুটেছে আমার মাঝে কি?
চরণে আমার বীণা-ঝংকার বাজে কি?
এ কি সত্য।
নিশির শিশির ঝরে কি আমারে হেরিয়া?
প্রভাত-আলোকে পুলক আমারে ঘেরিয়া,
এ কি সত্য।
তপ্ত কপোল-পরশে অধীর
সমীর মদিরমত্ত,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য।

কালো কেশপাশে দিবস লুকায় আঁধারে,
মরণ-বাঁধন মোর দুই ভুজে বাঁধা রে
এ কি সত্য।

ভুবন মিলায় মোর অঞ্চলখানিতে,
বিশ্ব নীরব মোর কণ্ঠের বাণীতে,
এ কি সত্য।
ত্রিভুবন লয়ে শুধু আমি আছি,
আছে মোর অনুরক্ত,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য।

তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া।
এ কি সত্য।
আমার বচনে নয়নে অধরে অলকে
চিরজনমের বিরাম লভিলে পলকে
এ কি সত্য।
মোর সুকুমার ললাট-ফলকে
লেখা অসীমের তত্ত্ব,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য।

রেলপথে
১০ আশ্বিন ১৩০৪

আশা

এ জীবন-সূর্য যবে অস্তে গেল চলি,
হে বঙ্গজননী মোর, 'আয় বৎস' বলি
খুলি দিলে অন্তঃপুরে প্রবেশ-দুয়ার,
ললাটে চুম্বন দিলে; শিয়রে আমার
জ্বালিলে অনন্ত দীপ। ছিল কণ্ঠে মোর
একখানি কণ্টকিত কুসুমের ডোর
সংগীতের পুরস্কার, তারি ক্ষতজ্বালা
হৃদয়ে জ্বলিতেছিল—তুলি সেই মালা
প্রত্যেক কণ্টক তার নিজ হস্তে বাছি
ধূলি তার ধুয়ে ফেলি শুভ্র মাল্যগাছি
গলায় পরায়ে দিয়ে লইলে বরিয়া
মোরে তব চিরন্তন সন্তান করিয়া।
অশ্রুতে ভরিয়া উঠি খুলিল নয়ন;
সহসা জাগিয়া দেখি, এ শুধু স্বপন।

১৩০৫

বঙ্গলক্ষ্মী

তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে,
তব আম্রবনে-ঘেরা সহস্র কুটীরে,
দোহনমুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে,
গঙ্গার পাষাণঘাটে দ্বাদশ দেউলে,
হে নিত্যকল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গজননী,
আপন অজস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশি হাস্যমুখে।
এ বিশ্বসমাজে
তোমার পুত্রের হাত নাহি কোনো কাজে
নাহি জান সে বারতা। তুমি শুধু, মা গো,
নিদ্রিত শিয়রে তার নিশিদিন জাগ
মলয় বীজন করি। রয়েছ মা ভুলি
তোমার শ্রীঅঙ্গ হতে একে একে খুলি
সৌভাগ্যভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ,
তোমার ললাটশোভা সীমন্তরতন,
তোমার গৌরব, তারা বাঁধা রাখিয়াছে
বহুদূর বিদেশের বণিকের কাছে।
নিত্যকর্মে রত শুধু, অয়ি মাতৃভূমি,
প্রত্যুষে পূজার ফুল ফুটাইছ তুমি,
মধ্যাহ্নে পল্লবাঞ্চল প্রসারিয়া ধরি
রৌদ্র নিবারিছ, যবে আসে বিভাবরী
চারি দিক হতে তব যত নদনদী
ঘুম পাড়াবার গান গাহে নিরবধি
ঘেরি ক্লান্ত গ্রামগুলি শত বাহুপাশে।
শরৎ-মধ্যাহ্নে আজি স্বল্প অবকাশে
ক্ষণিক বিরাম দিয়া পুণ্য গৃহকাজে
হিল্লোলিত হৈমন্তিক মঞ্জরীর মাঝে
কপোতকূজনাকুল নিস্তব্ধ প্রহরে
বসিয়া রয়েছ মাতঃ, প্রফুল্ল অধরে
বাক্যহীন প্রসন্নতা; স্নিগ্ধ আঁখিদ্বয়
ধৈর্যশান্ত দৃষ্টিপাতে চতুর্দিকময়
ক্ষমাপূর্ণ আশীর্বাদ করে বিকিরণ।
হেরি সেই স্নেহপ্লুত আত্মবিস্মরণ,
মধুর মঙ্গলচ্ছবি মৌন অবিচল,
নতশির কবি-চক্ষে ভরি আসে জল।

শরৎ

আজি কি তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে।
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জলধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন-সভাতে।
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
শরৎকালের প্রভাতে।

জননী তোমার শুভ আহ্বান
গিয়েছে নিখিল ভুবনে—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে।
অবসর আর নাহিকো তোমার—
আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননী তোমার আহ্বানলিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে।

তুলি মেঘভার আকাশ তোমার
করেছ সুনীলবরনী;
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী।
স্থলে জলে আর গগনে গগনে
বাঁশি বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বারতলে
দিশি দিশি হতে তরণী।
আকাশ করেছ সুনীল অমল
স্নিগ্ধশীতল ধরণী।

বহিছে প্রথম শিশিরসমীর
ক্লান্ত শরীর জুড়ায়ে—
কুটীরে কুটীরে নব নব আশা
নবীন জীবন উড়ায়ে।
দিকে দিকে মাতা কত আয়োজন,
হাসিভরা মুখ তব পরিজন

ভান্ডারে তব সুখ নব নব
মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে।
ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার
নবীন জীবন উড়ায়ে।

আয় আয় আয়, আছ যে যেথায়
আয় তোরা সবে ছুটিয়া,
ভান্ডারদ্বার খুলেছে জননী,
অন্ন যেতেছে লুটিয়া।
ও পার হইতে আয় খেয়া দিয়ে,
ও পাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে,
কে কাঁদে ক্ষুধায় জননী শুধায়
আয় তোরা সবে জুটিয়া।
ভান্ডারদ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া।

মাতার কণ্ঠে শেফালিমালা
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।
পরেছ কিরীট কনক কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম-ভূষণ জড়িত-চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী।
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী।

মাতার আহ্বান

বারেক তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে
ফুকারিয়া ডাকো জননী।
প্রান্তরে তব সন্ধ্যা নামিছে
আঁধারে ঘেরিছে ধরণী।
ডাকো 'চলে আয়, তোরা কোলে আয়',
ডাকো সকরুণ আপন ভাষায়—
সে বাণী হৃদয়ে করুণা জাগায়,
বেজে উঠে শিরা ধমনী,
হেলায় খেলায় যে আছে যেথায়
সচকিয়া উঠে অমনি।

আমরা প্রভাতে নদী পার হনু
ফিরিনু কিসের দুরাশে।
পরের উঞ্ছ অঞ্চলে লয়ে
ঢালিনু জঠর-হুতাশে।
খেয়া বহে নাকো, চাহি ফিরিবারে,
তোমার তরণী পাঠাও এ পারে,
আপনার খেত গ্রামের কিনারে
পড়িয়া রহিল কোথা সে।
বিজন বিরাট শূন্য সে মাঠ
কাঁদিছে উতলা বাতাসে।

কাঁপিয়া কাঁপিয়া দীপখানি তব
নিবু-নিবু করে পবনে,
জননী, তাহারে করিয়ো রক্ষা
আপন বক্ষোবসনে।
তুলি ধরো তারে দক্ষিণ করে,
তোমার ললাটে যেন আলো পড়ে,
চিনি দূর হতে, ফিরে আসি ঘরে,
না ভুলি আলেয়া-ছলনে।
এ পারে দুয়ার রুদ্ধ জননী,
এ পর-পুরীর ভবনে।

তোমার বনের ফুলের গন্ধ
আসিছে সন্ধ্যাসমীরে।
শেষ গান গাহে তোমার কোকিল
সুদূর কুঞ্জতিমিরে।
পথে কোনো লোক নাহি আর বাকি,
গহন কাননে জ্বলিছে জোনাকি,
আকুল অশ্রু ভরি দুই আঁখি
উচ্ছ্বসি উঠে অধীরে।
'তোরা যে আমার' ডাকো একবার
দাঁড়ায়ে দুয়ার-বাহিরে।

নাগর নদী। আত্রাই-পথে
৭ আষাঢ় ১৩০৫

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে,
হে মোর স্বদেশ,
মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে
পরি তারি বেশ।

বিদেশী জানে না তোরে অনাদরে তাই
 করে অপমান,
মোরা তারি পিছে থাকি যোগ দিতে চাই
 আপন সন্তান।
তোমার যা দৈন্য মাতঃ, তাই ভূষা মোর
 কেন তাহা ভুলি,
পরধনে ধিক্ গর্ব, করি করজোড়
 ভরি ভিক্ষাঝুলি।
পুণ্যহস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাতে
 তাই যেন রুচে,
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
 তাহে লজ্জা ঘুচে।
সেই সিংহাসন, যদি অঞ্চলটি পাত,
 কর স্নেহ দান।
যে তোমারে তুচ্ছ করে, সে আমারে মাতঃ,
 কী দিবে সম্মান।

১৩০৪

হতভাগ্যের গান

বন্ধু,
 কিসের তরে অশ্রু ঝরে,
  কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস।
 হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
  করব মোরা পরিহাস।
 রিক্ত যারা সর্বহারা
 সর্বজয়ী বিশ্বে তারা,
 গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর
  নয়কো তারা ক্রীতদাস।
 হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
  করব মোরা পরিহাস।

 আমরা সুখের স্ফীত বুকের
  ছায়ার তলে নাহি চরি।
 আমরা দুখের বক্র মুখের
  চক্র দেখে ভয় না করি।
 ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য
 বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য,
 ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে
  ভিন্ন করব নীলাকাশ।
 হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
  করব মোরা পরিহাস।

হে অলক্ষ্মী, রুক্ষকেশী
তুমি দেবী অচঞ্চলা।
তোমার রীতি সরল অতি,
নাহি জান ছলাকলা।
জ্বালাও পেটে অগ্নিকণা
নাইকো তাহে প্রতারণা,
টান যখন মরণ-ফাঁসি
বল নাকো মিষ্টভাষ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

ধরার যারা সেরা সেরা
মানুষ তারা তোমার ঘরে।
তাদের কঠিন শয্যাখানি
তাই পেতেছ মোদের তরে।
আমরা বরপুত্র তব,
যাহাই দিবে তাহাই লব,
তোমায় দিব ধন্যধ্বনি
মাথায় বহি সর্বনাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা
লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে।
ভাঙা কুলোয় করুক পাখা
তোমার যত ভৃত্যগণে।
দগ্ধ ভালে প্রলয়-শিখা
দিক্‌ মা এঁকে তোমার টিকা,
পরাও সজ্জা লজ্জাহারা
জীর্ণ কন্থা, ছিন্ন বাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

লুকোক তোমার ডঙ্কা শুনে
কপট সখার শূন্য হাসি।
পালাক ছুটে পুচ্ছ তুলে
মিথ্যে চাটু মক্কা কাশী।
আত্মপরের প্রভেদ-ভোলা
জীর্ণ দুয়োর নিত্য খোলা,

'কল্পনা'-পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

থাকবে তুমি থাকব আমি
 সমানভাবে বারো মাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
 করব মোরা পরিহাস।

শঙ্কা-তরাস লজ্জা-শরম,
 চুকিয়ে দিলেম স্তুতি নিন্দে।
ধুলো, সে তোর পায়ের ধুলো,
 তাই মেখেছি ভক্তবৃন্দে।
আশারে কই, 'ঠাকুরানী,
তোমার খেলা অনেক জানি,
যাহার ভাগ্যে সকল ফাঁকি
 তারেও ফাঁকি দিতে চাস!'
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
 করব মোরা পরিহাস।

মৃত্যু যেদিন বলবে 'জাগো,
 প্রভাত হল তোমার রাতি',
নিবিয়ে যাব আমার ঘরের
 চন্দ্র সূর্য দুটো বাতি।
আমরা দোঁহে ঘেঁষাঘেঁষি
চিরদিনের প্রতিবেশী,
বন্ধুভাবে কণ্ঠে সে মোর
 জড়িয়ে দেবে বাহুপাশ,
বিদায়-কালে অদৃষ্টেরে
 করে যাব পরিহাস।

নড়ল নদী। ৭ আশ্বিন ১৩০৪
পরিবর্ধন : নাগর নদী। পতিসর
৭ আষাঢ় ১৩০৫

জুতা-আবিষ্কার

কহিলা হবু, 'শুন গো গোবু রায়,
 কালিকে আমি ভেবেছি সারা রাত্র—
মলিন ধুলা লাগিবে কেন পায়
 ধরণী-মাঝে চরণ ফেলা মাত্র।
তোমরা শুধু বেতন লহ বাঁটি
 রাজার কাজে কিছুই নাহি দৃষ্টি।

আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি,
রাজ্যে মোর একি এ অনাসৃষ্টি।
শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর।'

শুনিয়া গোবু ভাবিয়া হল খুন,
দারুণ ত্রাসে ঘর্ম বহে গাত্রে।
পণ্ডিতের হইল মুখ চুন
পাত্রদের নিদ্রা নাহি রাত্রে।
রান্নাঘরে নাহিকো চড়ে হাঁড়ি,
কান্নাকাটি পড়িল বাড়ি-মধ্যে,
অশ্রুজলে ভাসায়ে পাকা দাড়ি
কহিলা গোবু হবুর পাদপদ্মে,
'যদি না ধুলা লাগিবে তব পায়ে
পায়ের ধুলা পাইব কী উপায়ে।'

শুনিয়া রাজা ভাবিল দুলি দুলি,
কহিল শেষে, 'কথাটা বটে সত্য,
কিন্তু আগে বিদায় করো ধুলি,
ভাবিয়ো পরে পদধুলির তত্ত্ব।
ধুলো-অভাবে না পেলে পদধুলা
তোমরা সবে মাহিনা খাও মিথ্যে,
কেন বা তবে পুষিনু এতগুলা
উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্যে।
আগের কাজ আগে তো তুমি সারো
পরের কথা ভাবিয়ো পরে আরো।'

আঁধার দেখে রাজার কথা শুনি,
যতনভরে আনিল তবে মন্ত্রী
যেখানে যত আছিল জ্ঞানীগুণী
দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী।
বসিল সবে চশমা চোখে আঁটি,
ফুরায়ে গেল উনিশ পিপে নস্য।
অনেক ভেবে কহিল, 'গেলে মাটি
ধরায় তবে কোথায় হবে শস্য।'
কহিল রাজা, 'তাই যদি না হবে,
পণ্ডিতেরা রয়েছ কেন তবে?'

সকলে মিলি যুক্তি করি শেষে
কিনিল ঝাঁটা সাড়ে সতেরো লক্ষ,
ঝাঁটের চোটে পথের ধুলা এসে
ভরিয়া দিল রাজার মুখ বক্ষ।

ধুলায় কেহ মেলিতে নারে চোখ,
    ধুলার মেঘে পড়িল ঢাকা সূর্য।
ধুলার বেগে কাশিয়া মরে লোক,
    ধুলার মাঝে নগর হল উহ্য।
কহিল রাজা, 'করিতে ধুলা দূর,
    জগৎ হল ধুলায় ভরপুর।'

তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁক
    মশক কাঁখে একুশ লাখ ভিস্তি।
পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাঁক,
    নদীর জলে নাহিকো চলে কিস্তি।
জলের জীব মরিল জল বিনা,
    ডাঙার প্রাণী সাঁতার করে চেষ্টা।
পাঁকের তলে মজিল বেচা-কিনা,
    সর্দিজ্বরে উজাড় হল দেশটা।
কহিল রাজা, 'এমনি সব গাধা
    ধুলারে মারি করিয়া দিল কাদা।'

আবার সবে ডাকিল পরামর্শে;
    বসিল পুন যতেক গুণবন্ত;
ঘুরিয়া মাথা হেরিল চোখে সর্ষে,
    ধুলার হায় নাহিকো পায় অন্ত।
কহিল, 'মহী মাদুর দিয়ে ঢাকো,
    ফরাশ পাতি করিব ধুলা বন্ধ।'
কহিল কেহ, 'রাজারে ঘরে রাখো
    কোথাও যেন না থাকে কোনো রন্ধ্র।
ধুলার মাঝে না যদি দেন পা
    তা হলে পায়ে ধুলা তো লাগে না।'

কহিল রাজা, 'সে কথা বড়ো খাঁটি,
    কিন্তু মোর হতেছে মনে সন্ধ
মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
    দিবস রাতি রহিলে আমি বন্ধ।'
কহিল সবে, 'চামারে তবে ডাকি
    চর্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী।
ধূলির মহী ঝুলির মাঝে ঢাকি
    মহীপতির রহিবে মহাকীর্তি।'
কহিল সবে, 'হবে সে অবহেলে,
    যোগ্যমতো চামার যদি মেলে।'

রাজার চর ধাইল হেথা হোথা,
    ছুটিল সবে ছাড়িয়া সব কর্ম।

যোগ্যমতো চামার নাহি কোথা,
না মিলে তত উচিত-মতো চর্ম।
তখন ধীরে চামার-কুলপতি
কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,
'বলিতে পারি করিলে অনুমতি
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের দুটি চরণ ঢাকো, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।'

কহিল রাজা, 'এত কি হবে সিধে,
ভাবিয়া ম'ল সকল দেশসুদ্ধ।'
মন্ত্রী কহে, 'বেটারে শূল বিঁধে
কারার মাঝে করিয়া রাখো রুদ্ধ।'
রাজার পদ চর্ম-আবরণে
ঢাকিল বুড়া বসিয়া পদোপান্তে।
মন্ত্রী কহে, 'আমারো ছিল মনে,
কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে।'
সেদিন হতে চলিল জুতো পরা,
বাঁচিল গোবু, রক্ষা পেল ধরা।

১৩০৪

সে আমার জননী রে

কে এসে যায় ফিরে ফিরে
আকুল নয়নের নীরে।
কে বৃথা আশাভরে
চাহিছে মুখ-'পরে।
সে যে আমার জননী রে।

কাহার সুধাময়ী বাণী
মিলায় অনাদর মানি।
কাহার ভাষা হায়
ভুলিতে সবে চায়!
সে যে আমার জননী রে।

ক্ষণেক স্নেহকোল ছাড়ি
চিনিতে আর নাহি পারি।
আপন সন্তান
করিছে অপমান—
সে যে আমার জননী রে।

পুণ্য কুটীরে বিষন্ন
কে ব'সে সাজাইয়া অন্ন।
সে স্নেহ-উপহার
রুচে না মুখে আর।
সে যে আমার জননী রে।

জগদীশচন্দ্র বসু

বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম-মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে
হে বন্ধু গিয়েছ তুমি; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।

বিদেশের মহোজ্জ্বল-মহিমা-মণ্ডিত
পণ্ডিতসভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে।
সে ধ্বনি গম্ভীরমন্দ্রে ছায় চারি ধার
হয়ে সিন্ধু পার।

আজি মাতা পাঠাইছে—অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্বাদখানি
জগৎ-সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে ভ্রাত।
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে।

১৩০৪

ভিখারী

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই?
ওগো ভিখারী, আমার ভিখারী, চলেছ
কী কাতর গান গাই'।
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে
তুষিব তোমারে সাধ ছিল মনে
ভিখারী, আমার ভিখারী।

হায় পলকে সকলি সঁপেছি চরণে,
আর তো কিছুই নাই।
ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই?

আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া
তোমারে পরানু বাস;
আমি আমার ভুবন শূন্য করেছি
তোমার পুরাতে আশ।
মম প্রাণমন যৌবন নব
করপুটতলে পড়ে আছে তব,
ভিখারী, আমার ভিখারী।
হায় আরো যদি চাও, মোরে কিছু দাও,
ফিরে আমি দিব তাই।
ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই?

পতিসর
১২ আশ্বিন

যাচনা

ভালোবেসে সখী, নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো— তোমার
মনের মন্দিরে।
আমার পরানে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি শিখিয়ো— তোমার
চরণ-মঞ্জীরে।

ধরিয়া রাখিয়ো সোহাগে আদরে
আমার মুখর পাখিটি— তোমার
প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে।
মনে করে সখী, বাঁধিয়া রাখিয়ো
আমার হাতের রাখিটি— তোমার
কনক-কঙ্কণে।

আমার লতার একটি মুকুল
ভুলিয়া তুলিয়া রাখিয়ো— তোমার
অলক-বন্ধনে।
আমার স্মরণ-শুভ-সিন্দুরে
একটি বিন্দু আঁকিয়ো— তোমার
ললাট-চন্দনে।

আমার মনের মোহের মাধুরী
মাখিয়া রাখিয়া দিয়ো গো— তোমার
অঙ্গসৌরভে।
আমার আকুল জীবনমরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিয়ো গো— তোমার
অতুল গৌরবে।

সাহাজাদপুর। বোট
৮ আশ্বিন ১৩০৪

বিদায়

এবার চলিনু তবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।
উচ্ছল জল করে ছলছল,
জাগিয়া উঠেছে কল-কোলাহল,
তরণী-পতাকা চল-চঞ্চল
কাঁপিছে অধীর রবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর
নির্মম আমি আজি।
আর নাই দেরি, ভৈরব-ভেরী
বাহিরে উঠেছে বাজি।
তুমি ঘুমাইছ নিমীল-নয়নে,
কাঁপিয়া উঠিল বিরহ-স্বপনে,
প্রভাতে জাগিয়া শূন্য শয়নে
কাঁদিয়া চাহিয়া রবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

অরুণ তোমার তরুণ অধর,
করুণ তোমার আঁখি,
অমিয়-রচন সোহাগ-বচন
অনেক রয়েছে বাকি।
পাখি উড়ে যাবে সাগরের পার,
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার,
মহাকাশ হতে ওই বারে বার
আমারে ডাকিছে সবে।

সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর।
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর।
কিসেরই বা সুখ, ক-দিনের প্রাণ?
ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম-গান,
অমর মরণ রক্তচরণ
নাচিছে সগৌরবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

ইছামতী
৭ আশ্বিন ১৩০৪

লীলা

কেন বাজাও কাঁকন কনকন, কত
ছলভরে।
ওগো ঘরে ফিরে চলো, কনক-কলসে
জল ভরে।
কেন জলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি
কর খেলা,
কেন চাহ খনে খনে চকিত নয়নে
কার তরে
কত ছলভরে।

হেরো যমুনা-বেলায় আলসে হেলায়
গেল বেলা,
যত হাসিভরা ঢেউ করে কানাকানি
কলস্বরে
কত ছলভরে।
হেরো নদী-পরপারে গগন-কিনারে
মেঘ-মেলা,
তারা হাসিয়া হাসিয়া চাহিছে তোমারি
মুখ-'পরে
কত ছলভরে।

১৩০৪

নব বিরহ

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।
অধর করুণামাখা
মিনতি-বেদনা-আঁকা,
নীরবে চাহিয়া থাকা
বিদায়-খনে
হেরিলা শ্যামল ঘন নীল গগনে।

ঝর ঝর ঝরে জল, বিজুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।
আমার পরান-পুটে
কোন্‌খানে ব্যথা ফুটে,
কার কথা বেজে উঠে
হৃদয়কোণে।
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে।

ইছামতী
৬ আশ্বিন ১৩০৪

লজ্জিতা

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন,
বেলা হল মরি লাজে।
শরমে জড়িত চরণে কেমনে
চলিব পথের মাঝে।
আলোক-পরশে মরমে মরিয়া
হেরো গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,
কোনোমতে আছে পরান ধরিয়া
কামিনী শিথিল সাজে।
যামিনী না যেতে জাগালে না কেন
বেলা হল মরি লাজে।

নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ
উষার বাতাস লাগি।
রজনীর শশী গগনের কোণে
লুকায় শরণ মাগি।
পাখি ডাকি বলে—গেল বিভাবরী,
বধূ চলে জলে লইয়া গাগরি,

আমি এ আকুল কবরী আবরি
কেমনে যাইব কাজে।
যামিনী না যেতে জাগালে না কেন
বেলা হল মরি লাজে।

যমুনা
৭ আশ্বিন ১৩০৪

কাল্পনিক

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে—
তাই আকাশকুসুম করিনু চয়ন
হতাশে।
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী,
কূল নাহি পায় আশার তরণী,
মানসপ্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায়
আকাশে।
কিছু বাঁধা পড়িল না শুধু এ বাসনা-
বাঁধনে।
কেহ নাহি দিল ধরা শুধু এ সুদূর-
সাধনে।
আপনার মনে বসিয়া একেলা
অনল-শিখায় কী করিনু খেলা,
দিন-শেষে দেখি ছাই হল সব
হুতাশে।
আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে।

বলেশ্বরী
৮ আশ্বিন ১৩০৪

মানসপ্রতিমা

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য-গগন-বিহারী।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম-গগন-বিহারী।

মম হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে, তব
চরণ দিয়েছি রাঙিয়া,
অয়ি সন্ধ্যা-স্বপন-বিহারী।
তব অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে
মম সুখদুখ ভাঙিয়া—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম বিজন-জীবন-বিহারী।

মম মোহের স্বপন-অঞ্জন তব
নয়নে দিয়েছি পরায়ে
অয়ি মুগ্ধ নয়ন-বিহারী।
মম সংগীত তব অঙ্গে অঙ্গে
দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে।
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম জীবন-মরণ-বিহারী।

চলন বিল। ঝড়বৃষ্টি
৯ আশ্বিন ১৩০৪

সংকোচ

যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।
যদি শরম লাগে, মুখে
চাহিব না।
যদি বিরলে মালা গাঁথা
সহসা পায় বাধা,
তোমার ফুলবনে
যাইব না।
যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।

যদি থমকি থেমে যাও
পথমাঝে
আমি চমকি চলে যাব
আন কাজে।

যদি তোমার নদীকূলে
ভুলিয়া ঢেউ তুলে,
আমার তরীখানি
বাহিব না।
যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।

চলন বিল। ঝড়। বোট টলমল
৯ আশ্বিন ১৩০৪

প্রার্থী

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা,
তব নবপ্রভাতের নবীনশিশির-ঢালা।
শরমে জড়িত কত-না গোলাপ
কত-না গরবী করবী
কত-না কুসুম ফুটেছে তোমার
মালঞ্চ করি আলা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা।

অমল শরত শীতল সমীর
বহিছে তোমার কেশে,
কিশোর অরুণ-কিরণ, তোমার
অধরে পড়েছে এসে।
অঞ্চল হতে বনপথে ফুল
যেতেছে পড়িয়া ঝরিয়া,
অনেক কুন্দ অনেক শেফালি
ভরেছে তোমার ডালা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা।

নাগর নদী
১০ আশ্বিন ১৩০৪

সকরুণা

সখী প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে।
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে।
যদি শুধায় কে দিল, কোন্ ফুল-কাননে,
তোর শপথ, আমার নামটি বলিস নে।
সখী প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে।

সখী তরুর তলায় বসে সে ধুলায় যে।
সেথা বকুলমালায় আসন বিছায়ে দে।
সে যে করুণা জাগায় সকরুণ নয়নে
কেন কী বলিতে চায় না বলিয়া যায় সে।
সখী প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে।

নাগর নদী। মেঘবৃষ্টি। অমাবস্যা
১০ আশ্বিন ১৩০৪

বিবাহ-মঙ্গল

দুইটি হৃদয়ে একটি আসন
পাতিয়া বোসো হে হৃদয়নাথ।
কল্যাণ-করে মঙ্গলডোরে
বাঁধিয়া রাখো হে দোঁহার হাত।
প্রাণেশ, তোমারি প্রেম অনন্ত
জাগাক জীবনে নববসন্ত,
যুগল প্রাণের নবীন মিলনে
করো হে করুণনয়নপাত।
সংসারপথ দীর্ঘ দারুণ,
বাহিরিবে দুটি পান্থ তরুণ,
আজিকে তোমারি প্রসাদ-অরুণ
করুক উদয় নব-প্রভাত।
তব মঙ্গল তব মহত্ত্ব
তোমারি মাধুরী তোমারি সত্য
দোঁহার চিত্তে রহুক নিত্য
নব নব রূপে দিবসরাত।

১৩০৫

ভারতলক্ষ্মী

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী।
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনকজননী-জননী।
নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী।

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবীযমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযূষ-স্তন্যবাহিনী।

পৌষ ১৩০৪

প্রকাশ

হাজার হাজার বছর কেটেছে, কেহ তো কহে নি কথা।
ভ্রমর ফিরেছে মাধবীকুঞ্জে, তরুরে ঘিরেছে লতা;
চাঁদেরে চাহিয়া চকোরী উড়েছে, তড়িৎ খেলেছে মেঘে,
সাগর কোথায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনী ছুটেছে বেগে;
ভোরের গগনে অরুণ উঠিতে কমল মেলেছে আঁখি,
নবীন আষাঢ় যেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি;
এত যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে,
সে কথা কেমনে হইল প্রকাশ প্রথম কাহার কাছে।

না জানি সে কবি জগতের কোণে কোথা ছিল দিবানিশি,
লতাপাতা চাঁদ-মেঘের সহিত এক হয়ে ছিল মিশি।
ফুলের মতন ছিল সে মৌন মনের আড়ালে ঢাকা,
চাঁদের মতন চাহিতে জানিত নয়ন স্বপনমাখা;
বায়ুর মতন পারিত ফিরিতে অলক্ষ্য মনোরথে
ভাবনা-সাধনা-বেদনা-বিহীন বিফল ভ্রমণপথে;
মেঘের মতন আপনার মাঝে ঘনায়ে আপন ছায়া
একা বসি কোণে জানিত রচিতে ঘনগম্ভীর মায়া।

দ্যুলোকে ভূলোকে ভাবে নাই কেহ আছে সে কিসের খোঁজে,
হেন সংশয় ছিল না কাহারো, সে যে কোনো কথা বোঝে।
বিশ্বপ্রকৃতি তার কাছে তাই ছিল নাকো সাবধানে,
ঘন ঘন তার ঘোমটা খসিত ভাবে ইঙ্গিতে গানে।
বাসরঘরের বাতায়ন যদি খুলিয়া যাইত কভু
দ্বারপাশে তারে বসিতে দেখিয়া রুধিয়া দিত না তবু।
যদি সে নিভৃত শয়নের পানে চাহিত নয়ন তুলি
শিয়রের দীপ নিবাইতে কেহ ছুঁড়িত না ফুলধূলি।

শশী যবে নিত নয়নে নয়নে কুমুদীর ভালোবাসা
এরে দেখি হেসে ভাবিত এ লোক জানে না চোখের ভাষা।
নলিনী যখন খুলিত পরান চাহি তপনের পানে
ভাবিত এ জন ফুলগন্ধের অর্থ কিছু না জানে।
তড়িৎ যখন চকিত নিমেষে পালাত চুমিয়া মেঘে,
ভাবিত, এ খ্যাপা কেমনে বুঝিবে কী আছে অগ্নিবেগে।
সহকারশাখে কাঁপিতে কাঁপিতে ভাবিত মালতীলতা
আমি জানি আর তরু জানে শুধু কলমর্মরকথা।

একদা ফাগুনে সন্ধ্যা-সময়ে সূর্য নিতেছে ছুটি,
পূর্ব-গগনে পূর্ণিমা চাঁদ করিতেছে উঠি-উঠি;
কোনো পুরনারী তরু-আলবালে জল সেচিবার ভানে
ছল করে শাখে আঁচল বাধায়ে ফিরে চায় পিছুপানে;
কোনো সাহসিকা দুলিছে দোলায় হাসির বিজুলি হানি,
না চাহে নামিতে না চাহে থামিতে না মানে বিনয়বাণী;
কোনো মায়াবিনী মৃগশিশুটিরে তৃণ দেয় একমনে,
পাশে কে দাঁড়ায়ে চিনেও তাহারে চাহে না চোখের কোণে।

হেনকালে কবি গাহিয়া উঠিল—নরনারী, শুন সবে,
কত কাল ধরে কী যে রহস্য ঘটিছে নিখিল ভবে।
এ কথা কে কবে স্বপনে জানিত, আকাশের চাঁদ চাহি
পাণ্ডুকপোল কুমুদীর চোখে সারারাত নিদ নাহি।
উদয়-অচলে অরুণ উঠিলে কমল ফুটে যে জলে
এত কাল ধরে তাহার তত্ত্ব ছাপা ছিল কোন্ ছলে।
এত যে মন্ত্র পড়িল ভ্রমর নবমালতীর কানে
বড়ো বড়ো যত পণ্ডিতজনা বুঝিল না তার মানে।

শুনিয়া তপন অস্তে নামিল শরমে গগন ভরি,
শুনিয়া চন্দ্র থমকি রহিল বনের আড়াল ধরি।
শুনে সরোবরে তখনি পদ্ম নয়ন মুদিল ত্বরা,
দখিন-বাতাস বলে গেল তারে—সকলি পড়েছে ধরা।
শুনে 'ছিছি' ব'লে শাখা নাড়ি নাড়ি শিহরি উঠিল লতা,
ভাবিল, মুখর এখনি না জানি আরো কী রটাবে কথা।
ভ্রমর কহিল যূথীর সভায়—যে ছিল বোবার মতো
পরের কুৎসা রটাবার বেলা তারো মুখ ফোটে কত।

শুনিয়া তখনি করতালি দিয়ে হেসে উঠে নরনারী—
যে যাহারে চায় ধরিয়া তাহায় দাঁড়াইল সারি সারি।
'হয়েছে প্রমাণ, হয়েছে প্রমাণ' হাসিয়া সবাই কহে—
'যে কথা রটেছে, একটি বর্ণ বানানো কাহারো নহে।'

বাহুতে বাহুতে বাঁধিয়া কহিল নয়নে নয়নে চাহি,
'আকাশে পাতালে মরতে আজি তো গোপন কিছুই নাহি।'
কহিল হাসিয়া মালা হাতে লয়ে পাশাপাশি কাছাকাছি,
'ত্রিভুবন যদি ধরা পড়ি গেল তুমি আমি কোথা আছি।'

হায় কবি হায়, সে হতে প্রকৃতি হয়ে গেছে সাবধানী—
মাথাটি ঘেরিয়া বুকের উপরে আঁচল দিয়েছে টানি।
যত ছলে আজ যত ঘুরে মরি জগতের পিছু পিছু
কোনোদিন কোনো গোপন খবর নূতন মেলে না কিছু।
শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে
লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন বন হতে উপবনে;
মনে হয় যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কী ভাব ভরা—
হায় কবি হায়, হাতে হাতে আর কিছুই পড়ে না ধরা।

১৩০৪

উন্নতি-লক্ষণ

১

ওগো পুরবাসী, আমি পরবাসী
জগৎব্যাপারে অজ্ঞ,
শুধাই তোমায় এ পুরশালায়
আজি এ কিসের যজ্ঞ?
সিংহদুয়ারে পথের দু-ধারে
রথের না দেখি অন্ত--
কার সম্মানে ভিড়েছে এখানে
যত উষ্ণীষবন্ত?
বসেছেন ধীর অতি গম্ভীর
দেশের প্রবীণ বিজ্ঞ,
প্রবেশিয়া ঘরে সংকোচে ডরে
মরি আমি অনভিজ্ঞ।
কোন্ শুরবীর জন্মভূমির
ঘুচাল হীনতাপঙ্ক?
ভারতের শুচি যশশশীরুচি
কে করিল অকলঙ্ক?
রাজা মহারাজ মিলেছেন আজ
কাহারে করিতে ধন্য?
বসেছেন এঁরা পুজ্যজনেরা
কাহার পুজার জন্য?

উত্তর

গেল যে সাহেব ভরি দুই জেব
করিয়া উদর পূর্তি;
এঁরা বড়োলোক করিবেন শোক
স্থাপিয়া তাহারি মূর্তি।

—

অভাগা কে ওই মাগে নাম-সই,
দ্বারে দ্বারে ফিরে খিন্ন,
তবু উৎসাহে রচিবারে চাহে
কাহার স্মরণচিহ্ন?
সন্ধ্যাবেলায় ফিরে আসে হায়
নয়ন অশ্রুসিক্ত,
হৃদয় ক্ষুণ্ণ, খাতাটি শূন্য,
থলি একেবারে রিক্ত।
যাহার লাগিয়া ফিরিছে মাগিয়া
মুছি ললাটের ঘর্ম,
স্বদেশের কাছে কী সে করিয়াছে?
কী অপরাধের কর্ম?

উত্তর

আর কিছু নহে, পিতাপিতামহে
বসায়ে গেছে সে উচ্চে,
জন্মভূমিরে সাজায়েছে ঘিরে
অমর-পুষ্পগুচ্ছে।

২

দেবী দশভুজা, হবে তাঁরি পূজা,
মিলিবে স্বজনবর্গ:
হেথা এল কোথা দ্বিতীয় দেবতা,
নূতন পূজার অর্ঘ্য?
কার সেবা-তরে আসিতেছে ঘরে
আয়ুহীন মেষবৎস?
নিবেদিতে কারে আনে ভারে ভারে
বিপুল ভেট্‌কি মৎস্য?
কী আছে পাত্রে যাহার গাত্রে
বসেছে তৃষিত মক্ষী?
শলায় বিদ্ধ হতেছে সিদ্ধ
মন্দ-নিষিদ্ধ পক্ষী।

দেবতার সেরা কী দেবতা এঁরা
পূজাভবনের পূজ্য?
যাঁহাদের পিছে পড়ে গেছে নিচে
দেবী হয়ে গেছে উহ্য?

উত্তর

ম্যাকে, ম্যাকিনন, অ্যালেন, ডিলন
দোকান ছাড়িয়া সদ্য
সরবে গরবে পূজার পরবে
তুলেছেন পাদপদ্ম।

—

এসেছিল দ্বারে পূজা দেখিবারে
দেবীর বিনীত ভক্ত,
কেন যায় ফিরে অবনতশিরে
অবমানে আঁখি রক্ত?
উৎসবশালা, জ্বলে দীপমালা,
রবি চলে গেছে অস্তে—
কুতূহলীদলে কী বিধান-বলে
বাধা পায় দ্বারীহস্তে?
ইহারা কি তবে অনাচারী হবে,
সমাজ হইতে ভিন্ন?
পূজাদানধ্যানে ছেলেখেলা জ্ঞানে
এরা মনে মানে ঘৃণ্য?

উত্তর

না, না, এরা সবে ফিরিছে নীরবে
দীন প্রতিবেশীবৃন্দে,
সাহেব-সমাজ আসিবেন আজ,
এরা এলে হবে নিন্দে।

৩

লোকটি কে ইনি, যেন চিনি চিনি,
বাঙালি মুখের ছন্দ—
ধরনে ধারণে অতি অকারণে
ইংরাজিতরো গন্ধ।
কালিয়া-বরন, অঙ্গে পরন
কালো হ্যাট কালো কুর্তি,

যদি নিজদেশী কাছে আসে ঘেঁষি
কিছু যেন কড়ামূর্তি।
ধুতিপরা দেহ দেখা দিলে কেহ
অতিশয় লাগে লজ্জা,
বাংলা আলাপে রোষে সন্তাপে
জ্বলে ওঠে হাড় মজ্জা।
ইঁহারা কি শেষ ছাড়িবেন দেশ?
এঁরা কি ভারত-দ্বেষ্টা?
এঁদের কি তবে দলে দলে সবে
বিজাতি হবার চেষ্টা?

উত্তর

এঁরা সবে বীর, এঁরা স্বদেশীর
প্রতিনিধি ব'লে গণ্য;
কোটপরা কায় সঁপেছেন হায়
শুধু স্বজাতির জন্য।

—

অনুরাগভরে ঘুচাবার তরে
বঙ্গভূমির দুঃখ
এ সভা মহতী, এর সভাপতি
সভোরা দেশমুখ্য।
এরা দেশহিতে চাহিছে সঁপিতে
আপন রক্তমাংস,
তবে এ সভাকে ছেড়ে কেন থাকে
এ দেশের অধিকাংশ?
কেন দলে দলে দূরে যায় চলে,
বুঝে না নিজের ইষ্ট,
যদি কুতূহলে আসে সভাতলে,
কেন বা নিদ্রাবিষ্ট?
তবে কি ইহারা নিজ-দেশছাড়া?
রুধিয়া রয়েছে কর্ণ
দৈবের বশে পাছে কানে পশে
শুভকথা এক বর্ণ?

উত্তর

না, না, এঁরা হন জন-সাধারণ,
জানে দেশভাষামাত্র,
স্বদেশসভায় বসিবারে হায়
তাই অযোগ্য পাত্র।

৪

বেশভূষা ঠিক যেন আধুনিক,
    মুখ দাড়ি-সমাকীর্ণ,
কিন্তু বচন অতি পুরাতন,
    ঘোরতর জরাজীর্ণ।
উচ্চ আসনে বসি একমনে
    শূন্যে মেলিয়া দৃষ্টি
তরুণ এ লোক লয়ে মনুশ্লোক
    করিছে বচনবৃষ্টি।
জলের সমান করিছে প্রমাণ
    কিছু নহে উৎকৃষ্ট
শালিবাহনের পূর্ব সনের
    পূর্বে যা নহে সৃষ্ট।
শিশুকাল থেকে গেছেন কি পেকে
    নিখিল পুরাণ-তন্ত্রে?
বয়স নবীন করিছেন ক্ষীণ
    প্রাচীন বেদের মন্ত্রে?
আছেন কি তিনি লইয়া পাণিনি,
    পুঁথি লয়ে কীটদষ্ট?
বায়ুপুরাণের খুঁজি পাঠ-ফের
    আয়ু করিছেন নষ্ট?
প্রাচীনের প্রতি গভীর আরতি
    বচন-রচনে সিদ্ধ,
কহো তো মশায়, প্রাচীন ভাষায়
    কতদূর কৃতবিদ্য?

উত্তর

ঋজুপাঠ দুটি নিয়েছেন লুটি,
    দু-সর্গ রঘুবংশ,
মোক্ষমুলার হ'তে অধিকার
    শাস্ত্রের বাকি অংশ।

—

পণ্ডিত ধীর মুণ্ডিতশির
    প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষা,
নবীন সভায় নব্য উপায়ে
    দিবেন ধর্মদীক্ষা।
কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ,
    হিন্দুধর্ম সত্য,
মূলে আছে তার কেমিস্ট্রি, আর
    শুধু পদার্থতত্ত্ব।

টিকিটা যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্‌ শক্তি,
তিলকরেখায় বৈদ্যুত ধায়
তাই জেগে ওঠে ভক্তি।
সন্ধ্যাটি হলে প্রাণপণবলে
বাজালে শঙ্খঘণ্টা
মথিত বাতাসে তাড়িত প্রকাশে
সচেতন হয় মনটা।
এম-এ ঝাঁকে ঝাঁক শুনিছে অবাক
অপরূপ বৃত্তান্ত—
বিদ্যাভূষণ এমন ভীষণ
বিজ্ঞানে দুর্দান্ত।
তবে ঠাকুরের পড়া আছে ঢের—
অন্তত গ্যানো-খণ্ড,
হেলম্‌হৎস অতি বীভৎস
করেছে লণ্ডভণ্ড।

উত্তর

কিছু না, কিছু না, নাই জানাশুনা
বিজ্ঞান কানাকৌড়ি,
লয়ে কল্পনা লম্বা রসনা
করিছে দৌড়াদৌড়ি।

১৩০৬

অশেষ

আবার আহ্বান?
যত কিছু ছিল কাজ, সাঙ্গ তো করেছি আজ
দীর্ঘ দিনমান।
জাগায়ে মাধবীবন চলে গেছে বহুক্ষণ
প্রত্যুষ নবীন,
প্রখর পিপাসা হানি পুষ্পের শিশির টানি
গেছে মধ্যাদিন।
মাঠের পশ্চিম শেষে অপরাহ্ণ ম্লান হেসে
হল অবসান,
পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরণীতে
আবার আহ্বান?

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল খসা,
হাতে দীপশিখা,
দিনের কল্লোল-'পর টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা।
ও পারের কালো কূলে কালি ঘনাইয়া তুলে
নিশার কালিমা,
গাঢ় সে তিমিরতলে চক্ষু কোথা ডুবে চলে
নাহি পায় সীমা।
নয়নপল্লব-'পরে স্বপ্ন জড়াইয়া ধরে
থেমে যায় গান।
ক্লান্তি টানে অঙ্গ মম প্রিয়ার মিনতি-সম ;
এখনো আহ্বান ?

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস হ'রে
আমার যামিনী ?
জগতে সবারি আছে সংসারসীমার কাছে
কোনোখানে শেষ,
কেন আসে মর্মচ্ছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি
তোমার আদেশ ?
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান,
কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যুতের মতো বাজে
তোমার আহ্বান ?

দক্ষিণসমুদ্রপারে, তোমার প্রাসাদদ্বারে,
হে জাগ্রত রানী,
বাজে না কি সন্ধ্যাকালে শান্ত সুরে ক্লান্ত তালে
বৈরাগ্যের বাণী ?
সেথায় কি মূক বনে ঘুমায় না পাখিগণে
আঁধার শাখায় ?
তারাগুলি হর্ম্যশিরে উঠে না কি ধীরে ধীরে
নিঃশব্দ পাখায় ?
লতাবিতানের তলে বিছায় না পুষ্পদলে
নিভৃত শয়ান ?
হে অশ্রান্ত শান্তিহীন, শেষ হয়ে গেল দিন,
এখনো আহ্বান ?

রহিল রহিল তবে আমার আপন সবে,
আমার নিরালা,

মোর সন্ধ্যাদীপালোক, পথ-চাওয়া দুটি চোখ,
যত্নে গাঁথা মালা।
খেয়াতরী যাক বয়ে গৃহ-ফেরা লোক লয়ে
ও পারের গ্রামে,
তৃতীয়ার ক্ষীণ শশী ধীরে পড়ে যাক খসি
কুটীরের বামে।
রাত্রি মোর, শান্তি মোর, রহিল স্বপ্নের ঘোর,
সুস্নিগ্ধ নির্বাণ,
আবার চলিনু ফিরে বহি ক্লান্ত নতশিরে
তোমার আহ্বান।

বলো তবে কী বাজাব, ফুল দিয়ে কী সাজাব
তব দ্বারে আজ,
রক্ত দিয়ে কী লিখিব, প্রাণ দিয়ে কী শিখিব,
কী করিব কাজ?
যদি আঁখি পড়ে ঢুলে, শ্লথ হস্ত যদি ভুলে
পূর্ব নিপুণতা,
বক্ষে নাহি পাই বল, চক্ষে যদি আসে জল
বেধে যায় কথা,
চেয়ো নাকো ঘৃণাভরে, কোরো নাকো অনাদরে
মোরে অপমান,
মনে রেখো, হে নিদয়ে, মেনেছিনু অসময়ে
তোমার আহ্বান।

সেবক আমার মতো রয়েছে সহস্র শত
তোমার দুয়ারে,
তাহারা পেয়েছে ছুটি, ঘুমায় সকলে জুটি
পথের দু-ধারে।
শুধু আমি তোরে সেবি বিদায় পাই নে দেবী,
ডাক ক্ষণে ক্ষণে;
বেছে নিলে আমারেই, দুরূহ সৌভাগ্য সেই
বহি প্রাণপণে।
সেই গর্বে জাগি রব সারা রাত্রি দ্বারে তব
অনিদ্র নয়ান,
সেই গর্বে কণ্ঠে মম বহি বরমাল্য-সম
তোমার আহ্বান।

হবে, হবে, হবে জয় হে দেবী করি নে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রানী,
হে মহিমাময়ী।

কাঁপিবে না ক্লান্ত কর ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা,
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘরাত্রি রব জাগি,
দীপ নিবিবে না।
কর্মভার নবপ্রাতে নবসেবকের হাতে
করি যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান।

২৫ বৈশাখ ১৩০৬

বিদায়

ক্ষমা করো, ধৈর্য ধরো,
হউক সুন্দরতর
বিদায়ের ক্ষণ।
মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়,
নহে বিচ্ছেদের ভয়,
শুধু সমাপন।
শুধু সুখ হতে স্মৃতি,
শুধু ব্যথা হতে গীতি,
তরী হতে তীর,
খেলা হতে খেলাশ্রান্তি,
বাসনা হইতে শান্তি,
নভ হতে নীড়।

দিনান্তের নম্র কর
পড়ুক মাথার 'পর,
আঁখি-'পরে ঘুম,
হৃদয়ের পত্রপুটে
গোপনে উঠুক ফুটে
নিশার কুসুম।
আরতির শঙ্খরবে
নামিয়া আসুক তবে
পূর্ণ পরিণাম,
হাসি নয় অশ্রু নয়
উদার বৈরাগ্যময়
বিশাল বিশ্রাম।

প্রভাতে যে পাখি সবে
গেয়েছিল কলরবে,
থামুক এখন।

প্রভাতে যে ফুলগুলি
জেগেছিল মুখ তুলি,
মুদুক নয়ন।
প্রভাতে যে বায়ুদল
ফিরেছিল সচঞ্চল
যাক থেমে যাক।
নীরবে উদয় হোক
অসীম নক্ষত্রলোক
পরম নির্বাক।

হে মহাসুন্দর শেষ,
হে বিদায় অনিমেষ,
হে সৌম্য বিষাদ,
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির
মুছায়ে নয়ন-নীর
করো আশীর্বাদ।
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির,
পদতলে নমি শির
তব যাত্রাপথে,
নিষ্কম্প প্রদীপ ধরি
নিঃশব্দে আরতি করি
নিস্তব্ধ জগতে।

১০ চৈত্র ১৩০৫

বর্ষশেষ

১৩০৫ সালে ৩০ চৈত্র ঝড়ের দিনে রচিত

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধহারা
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া
হানি দীর্ঘধারা।
বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন,
চৈত্র অবসান,
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্বশেষ গান।

ধুসর-পাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় উর্ধ্বমুখে,
ছুটে চলে চাষী,
ত্বরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত
তীরপ্রান্তে আসি।

পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি,
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখি।

বীণাতন্ত্রে হানো হানো খরতর ঝংকার ঝঞ্ঝনা,
তোলো উচ্চসুর।
হৃদয় নির্দয়ঘাতে ঝর্ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ুক
প্রবল প্রচুর।
ধাও গান প্রাণভরা ঝড়ের মতন ঊর্ধ্ববেগে
অনন্ত আকাশে।
উড়ে যাক দূরে যাক বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা
বিপুল নিশ্বাসে।

আনন্দে আতঙ্কে মিশি, ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হাহারবে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হোক তবে।
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত-আঘাতে
উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।

মুক্ত করি দিনু দ্বার—আকাশের যত বৃষ্টিঝড়
আয় মোর বুকে,
শঙ্খের মতন তুলি একটি ফুৎকার হানি দাও
হৃদয়ের মুখে।
বিজয়-গর্জন-স্বনে অভ্রভেদ করিয়া উঠুক
মঙ্গলনির্ঘোষ,
জাগায়ে জাগ্রত চিত্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্মল
কঠিন সন্তোষ।

সে পূর্ণ উদাত্ত ধ্বনি বেদগাথা সামমন্ত্র-সম
সরল গম্ভীর
সমস্ত অন্তর হতে মুহূর্তে অখণ্ডমূর্তি ধরি
হউক বাহির।
নাহি তাহে দুঃখ-সুখ পুরাতন তাপ-পরিতাপ
কম্প লজ্জা ভয়,
শুধু তাহা সদ্যঃস্নাত ঋজু শুভ্র মুক্ত জীবনের
জয়ধ্বনিময়।

হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে,
ব্যাপ্ত করি, লুপ্ত করি, স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘন ঘোর স্তূপে।
কোথা হতে আচম্বিতে মুহূর্তেকে দিক দিগন্তর
করি অন্তরাল
স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ংকর তোমার সঘন অন্ধকারে
রহো ক্ষণকাল।

তোমার ইঙ্গিত যেন ঘনগূঢ় ভ্রূকুটির তলে
বিদ্যুতে প্রকাশে,
তোমার সংগীত যেন গগনের শত ছিদ্রমুখে
বায়ুগর্জে আসে,
তোমার বর্ষণ যেন পিপাসারে তীব্র তীক্ষ্ম বেগে
বিদ্ধ করি হানে,
তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর
স্তব্ধ রাত্রি আনে।

এবার আস নি তুমি বসন্তের আবেশ-হিল্লোলে
পুষ্পদল চুমি,
এবার আস নি তুমি মর্মরিত কূজনে গুঞ্জনে,
ধন্য ধন্য তুমি।
রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ী রাজসম
গর্বিত নির্ভয়,
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম,
জয় তব জয়।

হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল।
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল—
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ,
প্রণমি তোমারে।

তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,
অক্লান্ত অম্লান।
সদ্যোজাত মহাবীর, কী এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জান।

উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
জ্বলদর্চিরেখা;
করজোড়ে চেয়ে আছি ঊর্ধ্বমুখে, পড়িতে জানি না
কী তাহাতে লেখা।

হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন রনন,
বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান।
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরান।

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক,
গণিব না দিন ক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি,
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি।

শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি,
লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ
কলহ সংশয়,
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগযুগান্তের।
শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে,
মহান মৃত্যুর সাথে মুখামুখি করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে।

তার পরে ফেলে দাও, চূর্ণ করো, যাহা ইচ্ছা তব,
ভগ্ন করো পাখা।
যেখানে নিক্ষেপ কর হৃত পত্র, চ্যুত পুষ্পদল,
ছিন্নভিন্ন শাখা,
ক্ষণিক খেলনা তব, দয়াহীন তব দস্যুতার
লুণ্ঠনাবশেষ,
সেথা মোরে ফেলে দিয়ো অনন্ত-তমিস্র সেই
বিস্মৃতির দেশ।

নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধারা
বিশ্রামবিহীন;
মেঘের অন্তর পথে অন্ধকার হতে অন্ধকারে
চলে গেল দিন।
শান্ত ঝড়ে, ঝিল্লিরবে, ধরণীর স্নিগ্ধ গন্ধোচ্ছ্বাসে,
মুক্ত বাতায়নে
বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করি দিনু অঞ্জলিয়া
নিশীথগগনে।

৩০ চৈত্র ১৩০৫

ঝড়ের দিনে

আজি এই আকুল আশ্বিনে,
মেঘে-ঢাকা দুরন্ত দুর্দিনে,
হেমন্ত ধানের খেতে বাতাস উঠেছে মেতে
কেমনে চলিবে পথ চিনে?
আজি এই দুরন্ত দুর্দিনে।

দেখিছ না ওগো সাহসিকা
ঝিকিমিকি বিদ্যুতের শিখা।
মনে ভেবে দেখো তবে এ ঝড়ে কি বাঁধা রবে
কবরীর শেফালিমালিকা।
ভেবে দেখো ওগো সাহসিকা।

আজিকার এমন ঝঞ্ঝায়
নূপুর বাঁধে কি কেহ পায়?
যদি আজি বৃষ্টিজল ধুয়ে দেয় নীলাঞ্চল
গ্রামপথে যাবে কি লজ্জায়
আজিকার এমন ঝঞ্ঝায়?

হে উতলা শোনো কথা শোনো,
দুয়ার কি খোলা আছে কোনো?
এ বাঁকা পথের শেষে মাঠ যেথা মেঘে মেশে
বসে কেহ আছে কি এখনো
এ দুর্যোগে, শোনো ওগো শোনো।

আজ যদি দীপ জ্বালে দ্বারে
নিবে কি যাবে না বারে বারে?
আজ যদি বাজে বাঁশি গান কি যাবে না ভাসি
আশ্বিনের অসীম আঁধারে
ঝড়ের ঝাপটে বারে বারে?

মেঘ যদি ডাকে গুরু গুরু,
নৃত্যমাঝে কেঁপে ওঠে উরু,
কাহারে করিবে রোষ, কার 'পরে দিবে দোষ
বক্ষ যদি করে দুরু দুরু,
মেঘ ডেকে ওঠে গুরু গুরু।

যাবে যদি— মনে ছিল না কি,
আমারে নিলে না কেন ডাকি?
আমি তো পথেরি ধারে বসিয়া ঘরের দ্বারে
আনমনে ছিলাম একাকী
আমারে নিলে না কেন ডাকি?

কখন প্রহর গেছে বাজি,
কোনো কাজ নাহি ছিল আজি।
ঘরে আসে নাই কেহ, সারা দিন শূন্য গেহ
বিলাপ করেছে তরুরাজি।
কোনো কাজ নাহি ছিল আজি।

যত বেগে গরজিত ঝড়,
যত মেঘে ছাইত অম্বর,
রাত্রে অন্ধকারে যত পথ অফুরান হ'ত
আমি নাহি করিতাম ডর—
যত বেগে গরজিত ঝড়।

বিদ্যুতের চমকানি-কালে
এ বক্ষ নাচিত তালে তালে,
উত্তরী উড়িত মম উন্মুখ পাখার সম,
মিশে যেতে আকাশে পাতালে
বিদ্যুতের চমকানি-কালে।

তোমায় আমায় একত্তর
সে যাত্রা হইত ভয়ংকর।
তোমার নূপুর আজি প্রলয়ে উঠিত বাজি,
বিজুলি হানিত আঁখি-'পর,
যাত্রা হত মত্ত ভয়ংকর!

কেন আজি যাও একাকিনী?
কেন পায়ে বেঁধেছ কিঙ্কিণী?
এ দুর্দিনে কী কারণে পড়িল তোমার মনে
বসন্তের বিস্মৃত কাহিনী?
কোথা আজি যাও একাকিনী?

১৩০৬

অসময়

হয়েছে কি তবে সিংহদুয়ার বন্ধ রে?
এখনো সময় আছে কি, সময় আছে কি?
দূরে কলরব ধ্বনিছে মন্দ মন্দ রে,
ফুরাল কি পথ, এসেছি পুরীর কাছে কি?
মনে হয় সেই সুদূর মধুর গন্ধ রে,
রহি রহি যেন ভাসিয়া আসিছে বাতাসে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

ওই কি প্রদীপ দেখা যায় পুরমন্দিরে?
ও যে দুটি তারা দূর পশ্চিমগগনে।
ও কি শিঞ্জিত ধ্বনিছে কনকমঞ্জীরে?
ঝিল্লির রব বাজে বনপথে সঘনে।
মরীচিকা-লেখা দিগন্তপথ রঞ্জি রে
সারা দিন আজি ছলনা করেছে হতাশে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

এত দিনে সেথা বন-বনান্ত নন্দিয়া
নব বসন্তে এসেছে নবীন ভূপতি।
তরুণ আশার সোনার প্রতিমা বন্দিয়া
নব আনন্দে ফিরিছে যুবক-যুবতী।
বীণার তন্ত্রী আকুল ছন্দে ক্রন্দিয়া
ডাকিছে সবারে আছে যারা দূর প্রবাসে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

আজিকে সবাই সাজিয়াছে ফুলচন্দনে,
মুক্ত আকাশে যাপিবে জ্যোৎস্না-যামিনী।
দলে দলে চলে বাঁধাবাঁধি বাহু-বন্ধনে,
ধ্বনিছে শূন্যে জয়-সংগীত-রাগিণী।
নূতন পতাকা নূতন প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে
দক্ষিণবায়ে উড়িছে বিজয়বিলাসে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

সারা নিশি ধরে বৃথা করিলাম মন্ত্রণা,
শরৎ-প্রভাত কাটিল শূন্যে চাহিয়া,
বিদায়ের কালে দিতে গেনু কারে সান্ত্বনা,
যাত্রীরা হোথা গেল খেয়াতরী বাহিয়া।
আপনারে শুধু বৃথা করিলাম বঞ্চনা,
জীবন-আহুতি দিলাম কী আশা-হুতাশে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

প্রভাতে আমায় ডেকেছিল সবে ইঙ্গিতে,
বহুজন-মাঝে লয়েছিল মোরে বাছিয়া,
যবে রাজপথ ধ্বনিয়া উঠিল সংগীতে
তখনো বারেক উঠেছিল প্রাণ নাচিয়া।
এখন কি আর পারিব প্রাচীর লঙ্ঘিতে,
দাঁড়ায়ে বাহিরে ডাকিব কাহারে বৃথা সে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

তবু একদিন এই আশাহীন পন্থ রে
অতি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে শেষে ফুরাবে,
দীর্ঘ ভ্রমণ এক দিন হবে অন্ত রে,
শান্তি-সমীর শ্রান্ত শরীর জুড়াবে।
দুয়ার-প্রান্তে দাঁড়ায়ে বাহির প্রান্তরে
ভেরী বাজাইব মোর প্রাণপণ প্রয়াসে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিছে আকাশে।

১৩০৬

বসন্ত

অযুত বৎসর আগে হে বসন্ত, প্রথম ফাল্গুনে,
মত্ত কুতূহলী,
প্রথম যেদিন খুলি নন্দনের দক্ষিণ-দুয়ার
মর্ত্যে এলে চলি,
অকস্মাৎ দাঁড়াইলে মানবের কুটীরপ্রাঙ্গণে
পীতাম্বর পরি,
উতলা উত্তরী হতে উড়াইয়া উন্মাদ পবনে
মন্দার-মঞ্জরী,
দলে দলে নরনারী ছুটে এল গৃহদ্বার খুলি
লয়ে বীণা বেণু
মাতিয়া পাগল নৃত্যে হাসিয়া করিল হানাহানি
ছুঁড়ি পুষ্পরেণু।

সখা, সেই অতি দূর সদ্যোজাত আদি মধুমাসে
তরুণ ধরায়
এনেছিলে যে কুসুম ডুবাইয়া তপ্ত কিরণের
স্বর্ণ মদিরায়,
সেই পুরাতন সেই চিরন্তন অনন্ত প্রবীণ
নব পুষ্পরাজি
বর্ষে বর্ষে আনিয়াছ, তাই লয়ে আজো পুনর্বার
সাজাইলে সাজি।
তাই সেই পুষ্পে লিখা জগতের প্রাচীন দিনের
বিস্মৃত বারতা,
তাই তার গন্ধে ভাসে ক্লান্ত লুপ্ত লোকলোকান্তের
কান্ত মধুরতা।

তাই আজি প্রস্ফুটিত নিবিড় নিকুঞ্জবন হতে
উঠিছে উচ্ছ্বাসি
লক্ষ দিনযামিনীর যৌবনের বিচিত্র বেদনা,
অশ্রু গান হাসি।
যে মালা গেঁথেছি আজি তোমারে সঁপিতে উপহার,
তারি দলে দলে
নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষা-কাহিনী
আঁকা অশ্রুজলে।
সযত্ন-সেচন-সিক্ত নবোন্মুক্ত এই গোলাপের
রক্ত পত্রপুটে
কম্পিত কুণ্ঠিত কত অগণ্য চুম্বন-ইতিহাস
রহিয়াছে ফুটে।

আমার বসন্তরাতে চারি চক্ষে জেগে উঠেছিল
যে-কয়টি কথা,
তোমার কুসুমগুলি হে বসন্ত, সে গুপ্ত সংবাদ,
নিয়ে গেল কোথা?
সে চম্পক, সে বকুল, সে চঞ্চল চকিত চামেলি
স্মিত শুভ্রমুখী,
তরুণী রজনীগন্ধা আগ্রহে উৎসুক উন্নমিতা,
একান্ত কৌতুকী,
কয়েক বসন্তে তারা আমার যৌবন-কাব্যগাথা
লয়েছিল পড়ি।
কণ্ঠে কণ্ঠে থাকি তারা শুনেছিল দুটি বক্ষোমাঝে
বাসনা বাঁশরি।

ব্যর্থ জীবনের সেই কয়খানি পরম অধ্যায়,
ওগো মধুমাস
তোমার কুসুমগন্ধে বর্ষে বর্ষে শূন্যে জলে স্থলে
হইবে প্রকাশ।
বকুলে চম্পকে তারা গাঁথা হয়ে নিত্য যাবে চলি
যুগে যুগান্তরে,
বসন্তে বসন্তে তারা কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিবে আকুলি
কুহুকলস্বরে।
অমর বেদনা মোর হে বসন্ত, রহি গেল তব
মর্মরনিশ্বাসে।
উত্তপ্ত যৌবনমোহ রক্তরৌদ্রে রহিল রঞ্জিত
চৈত্রসন্ধ্যাকাশে।

ভগ্ন মন্দির

ভাঙা দেউলের দেবতা।
তব বন্দনা রচিতে, ছিন্না
বীণার তন্ত্রী বিরতা।
সন্ধ্যাগগনে ঘোষে না শঙ্খ
তোমার আরতি-বারতা।
তব মন্দির স্থির গম্ভীর,
ভাঙা দেউলের দেবতা।

তব জনহীন ভবনে
থেকে থেকে আসে ব্যাকুল গন্ধ
নব-বসন্ত-পবনে।

যে ফুলে রচে নি পূজার অর্ঘ্য,
রাখে নি ও রাঙা চরণে,
সে ফুল ফোটার আসে সমাচার
জনহীন ভাঙা ভবনে।

পূজাহীন তব পূজারী
কোথা সারা দিন ফিরে উদাসীন
কার প্রসাদের ভিখারী।
গোধূলিবেলায় বনের ছায়ায়
চির-উপবাস-ভুখারি
ভাঙা মন্দিরে আসে ফিরে ফিরে
পূজাহীন তব পূজারী।

ভাঙা দেউলের দেবতা।
কত উৎসব হইল নীরব
কত পূজানিশা বিগতা।
কত বিজয়ায় নবীন প্রতিমা
কত যায় কত কব তা,
শুধু চিরদিন থাকে সেবাহীন
ভাঙা দেউলের দেবতা।

বৈশাখ

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।
ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।

ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে।
কী ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন-আকাশে
নিঃশব্দ প্রখর
ছায়ামূর্তি তব অনুচর।

মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।
রহি রহি দহি দহি উগ্রবেগে উঠিছে ঘুরিয়া,
আবর্তিয়া তৃণপর্ণ, ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া
চূর্ণরেণুরাশ
মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।

দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী।
পদ্মাসনে বস আসি রক্তনেত্র তুলিয়া ললাটে,
শুষ্কজল নদীতীরে শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে
উদাসী প্রবাসী,
দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী।

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা, লেহি লেহি বিরাট অম্বর
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার।

হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ।
উদার উদাস কণ্ঠ যাক ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
যাক নদী পার হয়ে, যাক চলি গ্রাম হতে গ্রামে,
পূর্ণ করি মাঠ।
হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ।

সকরুণ তব মন্ত্রসাথে
মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব-'পরে,
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে, ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্তস্বরে,
অশ্বত্থছায়াতে
সকরুণ তব মন্ত্রসাথে।

দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ
তোমার ফুৎকার-ক্ষুব্ধ ধুলাসম উড়ুক গগনে,
ভ'রে দিক নিকুঞ্জের স্খলিত ফুলের গন্ধসনে
আকুল আকাশ।
দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ।

তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
দাও পাতি নভস্তলে, বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষকোটি নরনারী-হিয়া
চিন্তায় বিকল।
দাও পাতি গেরুয়া অঞ্চল।

ছাড়ো ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ।
ভাঙিয়া মধ্যাহ্নতন্দ্রা জাগি উঠি বাহিরিব দ্বারে,
চেয়ে রব প্রাণীশূন্য দগ্ধতৃণ দিগন্তের পারে
নিস্তব্ধ নির্বাক।
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।

১৩০৬

রাত্রি

মোরে করো সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়
হে শর্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা।
তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা।
তোমার তিমিরতলে যে বিপুল নিঃশব্দ উদ্‌যোগ
ভ্রমিতেছে জগতে জগতে
আমারে তুলিয়া লও সেই তার ধ্বজচক্রহীন
নীরবঘর্ঘর মহারথে।

তুমি একেশ্বরী রানী বিশ্বের অন্তর-অন্তঃপুরে
সুগম্ভীরা হে শ্যামাসুন্দরী।
দিবসের ক্ষয়ক্ষীণ বিরাট ভাণ্ডারে প্রবেশিয়া
নীরবে রাখিছ ভাণ্ড ভরি।
নক্ষত্র-রতন-দীপ্ত নীলকান্ত সুপ্তি-সিংহাসনে
তোমার মহান জাগরণ।
আমারে জাগায়ে রাখো সে নিস্তব্ধ জাগরণতলে
নির্নিমেষ পূর্ণ সচেতন।

কত নিদ্রাহীন চক্ষু যুগে যুগে তোমার আঁধারে
খুঁজেছিল প্রশ্নের উত্তর।
তোমার নির্বাক মুখে একদৃষ্টে চেয়েছিল বসি
কত ভক্ত জুড়ি দুই কর।
দিবস মুদিলে চক্ষু, ধীরপদে কৌতূহলীদল
অঙ্গনে পশিয়া সাবধানে
তব দীপহীন কক্ষে সুখদুঃখ জন্মমরণের
ফিরিয়াছে গোপন সন্ধানে।

স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি
সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি।
পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণা-কাতর,
চকিতে বিদ্যুৎ-রেখাবৎ
তোমার নিখিল-লুপ্ত অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী
দেখেছে বিশ্বের মুক্তিপথ।

জগতের সেই সব যামিনীর জাগরূকদল
সঙ্গীহীন তব সভাসদ
কে কোথা বসিয়া আছে আজি রাত্রে ধরণীর মাঝে,
গণিতেছে গোপন সম্পদ;

কেহ কারে নাহি জানে, আপনার স্বতন্ত্র আসনে
আসীন স্বাধীন স্তব্ধচ্ছবি;
হে শর্বরী, সেই তব বাক্যহীন জাগ্রত সভায়
মোরে করি দাও সভাকবি।

১৩০৬

অনবচ্ছিন্ন আমি

আজি মগ্ন হয়েছিনু ব্রহ্মাণ্ড-মাঝারে,
যখন মেলিনু আঁখি, হেরিনু আমারে।
ধরণীর বস্ত্রাঞ্চল দেখিলাম তুলি,
আমার নাড়ীর কম্পে কম্পমান ধূলি।
অনন্ত আকাশতলে দেখিলাম নামি,
আলোক-দোলায় বসি দুলিতেছি আমি।
আজি গিয়েছিনু চলি মৃত্যুপরপারে
সেথা বৃদ্ধ পুরাতন হেরিনু আমারে।
অবিচ্ছিন্ন আপনারে নিরখি ভুবনে
শিহরি উঠিনু কাঁপি আপনার মনে।
জলে স্থলে শূন্যে আমি যত দূরে চাই
আপনারে হারাবার নাই কোনো ঠাঁই।
জলস্থল দূর করি ব্রহ্ম অন্তর্যামী,
হেরিলাম তাঁর মাঝে স্পন্দমান আমি।

১৩০৬

জন্মদিনের গান

ভয় হতে তব অভয়-মাঝারে
নূতন জনম দাও হে।
দীনতা হইতে অক্ষয় ধনে,
সংশয় হতে সত্য-সদনে,
জড়তা হইতে নবীন জীবনে
নূতন জনম দাও হে।
আমার ইচ্ছা হইতে হে প্রভু,
তোমার ইচ্ছা-মাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে হে প্রভু,
তব মঙ্গল কাজে,
অনেক হইতে একের ডোরে,
সুখদুখ হতে শান্তিক্রোড়ে,
আমা হতে নাথ, তোমাতে মোরে
নূতন জনম দাও হে।

পূর্ণকাম

সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি
আপনি সে মন নিয়েছ।
সুখ বলে দুখ চেয়েছিনু, তুমি
দুখ বলে সুখ দিয়েছ।
হৃদয় যাহার শতখানে ছিল
শত স্বার্থের সাধনে,
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে,
বাঁধিলে ভক্তিবাঁধনে।
সুখ সুখ করে দ্বারে দ্বারে মোরে
কত দিকে কত খোঁজালে।
তুমি যে আমার কত আপনার
এবার সে কথা বোঝালে।
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে।
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে
এনেছ তোমারি দুয়ারে।

পরিণাম

জানি হে যবে প্রভাত হবে, তোমার কৃপা-তরণী
লইবে মোরে ভব-সাগর-কিনারে।
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়া যাব চলিয়া,
দাঁড়াব আমি তব অমৃত-দুয়ারে।
জানি হে তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু ঘেরিয়া
রেখেছ মোরে তব অসীম ভুবনে;
জনম মোরে দিয়েছ তুমি আলোক হতে আলোকে,
জীবন হতে নিয়েছ নবজীবনে।
জানি হে নাথ পুণ্যপাপে হৃদয় মোর সতত
শয়ান আছে তব নয়ান-সমুখে;
আমার হাতে তোমার হাত রয়েছে দিন-রজনী
সকল পথে বিপথে সুখে অসুখে।
জানি হে জানি জীবন মম বিফল কভু হবে না,
দিবে না ফেলি বিনাশ-ভয়-পাথারে।
এমন দিন আসিবে যবে করুণাভরে আপনি
ফুলের মতো তুলিয়া লবে তাহারে।

১৩০৬

ক্ষণিকা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত সুহৃত্তমের প্রতি

ক্ষণিকারে দেখেছিলে
　　ক্ষণিক বেশে কাঁচা খাতায়,
সাজিয়ে তারে এনে দিলেম
　　ছাপা বইয়ের বাঁধা পাতায়।
আশা করি নিদেনপক্ষে
　　ছ'টা মাস কি এক বছরই
হবে তোমার বিজনবাসে
　　সিগারেটের সহচরী।
কতকটা তার ধোঁয়ার সঙ্গে
　　স্বপ্নলোকে উড়ে যাবে;
কতকটা কি অগ্নিকণায়
　　ক্ষণে ক্ষণে দীপ্তি পাবে?
কতকটা বা ছাইয়ের সঙ্গে
　　আপনি খসে পড়বে ধুলোয়;
তার পরে সে ঝেঁটিয়ে নিয়ে
　　বিদায় কোরো ভাঙা কুলোয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদ্বোধন

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে!
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়,
ফুটে আর টুটে পলকে,
তাহাদেরি গান গা রে আজি প্রাণ,
ক্ষণিক দিনের আলোকে।

প্রতি নিমেষের কাহিনী
আজি বসে বসে গাঁথিস নে আর,
বাঁধিস নে স্মৃতি-বাহিনী।
যা আসে আসুক, যা হবার হোক,
যাহা চলে যায় মুছে যাক শোক,
গেয়ে ধেয়ে যাক দ্যুলোক ভূলোক
প্রতি পলকের রাগিণী।
নিমেষে নিমেষ হয়ে যাক শেষ
বহি নিমেষের কাহিনী।

ফুরায় যা দে রে ফুরাতে।
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম
ফিরে যাস নেকো কুড়াতে।
বুঝি নাই যাহা, চাই না বুঝিতে,
জুটিল না যাহা চাই না খুঁজিতে,
পুরিল না যাহা কে রবে যুঝিতে
তারি গহ্বর পুরাতে!
যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ,
ফুরাইলে দিস ফুরাতে।

ওরে থাক্, থাক্ কাঁদনি।
দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দে রে
নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনি।
যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নে রে বুকে,
আজিকার মতো যাক যাক চুকে
যত অসাধ্য-সাধনি।

ক্ষণিক সুখের উৎসব আজি,
ওরে থাক্, থাক্ কাঁদনি।

শুধু অকারণ পুলকে
নদীজলে-পড়া আলোর মতন
ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।
ধরণীর 'পরে শিথিল-বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন
শিরীষ ফুলের অলকে।
মর্মরতানে ভরে ওঠ্ গানে
শুধু অকারণ পুলকে।

যথাসময়

ভাগ্য যবে কৃপণ হয়ে আসে,
বিশ্ব যবে নিঃস্ব তিলে তিলে,
মিষ্ট মুখে ভুবন-ভরা হাসি
ওষ্ঠে শেষে ওজন-দরে মিলে,
বন্ধুজনে বন্ধ করে প্রাণ,
দীর্ঘদিন সঙ্গীহীন একা,
হঠাৎ পড়ে ঋণশোধেরই পালা,
ঋণী জনের না যায় পাওয়া দেখা,
তখন ঘরে বন্ধ হ রে কবি,
খিলের পরে খিল, লাগাও খিল।
কথার সাথে গাঁথো কথার মালা,
মিলের সাথে মিল, মিলাও মিল।

কপাল যদি আবার ফিরে যায়,
প্রভাতকালে হঠাৎ জাগরণে,
শূন্য নদী আবার যদি ভরে
শরৎমেঘে ত্বরিত বরিষনে,
বন্ধু ফিরে বন্দী করে বুকে,
সন্ধি করে অন্ধ অরিদল,
অরুণ ঠোঁটে তরুণ ফোটে হাসি,
কাজল চোখে করুণ আঁখিজল,
তখন খাতা পোড়াও খ্যাপা কবি,
দিলের সাথে দিল, লাগাও দিল।
বাহুর সাথে বাঁধো মৃণাল বাহু,
চোখের সাথে চোখে মিলাও মিল।

মাতাল

ওরে মাতাল, দুয়ার ভেঙে দিয়ে
পথেই যদি করিস মাতামাতি,
থলিঝুলি উজাড় করে ফেলে
যা আছে তোর ফুরাস রাতারাতি,
অশ্লেষাতে যাত্রা করে শুরু
পাঁজিপুঁথি করিস পরিহাস,
অকারণে অকাজ লয়ে ঘাড়ে
অসময়ে অপথ দিয়ে যাস,
হালের দড়ি নিজের হাতে কেটে
পালের 'পরে লাগাস ঝোড়ো হাওয়া,
আমিও ভাই, তোদের ব্রত লব—
মাতাল হয়ে পাতাল-পানে ধাওয়া।

পাড়ার যত জ্ঞানীগুণীর সাথে
নষ্ট হল দিনের পরে দিন,
অনেক শিখে পক্ক হল মাথা,
অনেক দেখে দৃষ্টি হল ক্ষীণ,
কত কালের কত মন্দ ভালো
বসে বসে কেবল জমা করি,
ফেলাছড়া-ভাঙাছেঁড়ার বোঝা
বুকের মাঝে উঠছে ভরি ভরি,
গুঁড়িয়ে সে-সব উড়িয়ে ফেলে দিক
দিক-বিদিকে তোদের ঝোড়ো হাওয়া।
বুঝেছি ভাই, সুখের মধ্যে সুখ
মাতাল হয়ে পাতাল-পানে ধাওয়া।

হোক রে সিধা কুটিল দ্বিধা যত,
নেশায় মোরে করুক দিশাহারা,
দানোয় এসে হঠাৎ কেশে ধরে
এক দমকে করুক লক্ষ্মীছাড়া।
সংসারেতে সংসারী তো ঢের,
কাজের হাটে অনেক আছে কেজো,
মেলাই আছে মস্ত বড়ো লোক,
সঙ্গে তাঁদের অনেক সেজো মেজো,
থাকুন তাঁরা ভবের কাজে লেগে;
লাগুক মোরে সৃষ্টিছাড়া হাওয়া।
বুঝেছি ভাই, কাজের মধ্যে কাজ
মাতাল হয়ে পাতাল-পানে ধাওয়া।

শপথ করে দিলাম ছেড়ে আজই
যা আছে মোর বুদ্ধি বিবেচনা,
বিদ্যা যত ফেলব ঝেড়ে ঝুড়ে
ছেড়ে ছুড়ে তত্ত্ব আলোচনা।
স্মৃতির ঝারি উপুড় করে ফেলে
নয়নবারি শূন্য করি দিব,
উচ্ছ্বসিত মদের ফেনা দিয়ে
অট্টহাসি শোধন করি নিব।
ভদ্রলোকের তকমা-তাবিজ ছিঁড়ে
উড়িয়ে দেবে মদোন্মত্ত হাওয়া।
শপথ করে বিপথ-ব্রত নেব—
মাতাল হয়ে পাতাল-পানে ধাওয়া।

যুগল

ঠাকুর, তব পায়ে নমোনমঃ,
পাপিষ্ঠ এই অক্ষমেরে ক্ষমো,
আজ বসন্তে বিনয় রাখো মম—
বন্ধ করো শ্রীমদ্‌ভাগবত।
শাস্ত্র যদি নেহাত পড়তে হবে
গীতগোবিন্দ খোলা হোক-না তবে।
শপথ মম, বোলো না এই ভবে
জীবনখানা শুধুই স্বপ্নবৎ।
একটা দিনের সন্ধি করিয়াছি,
বন্ধ আছে যমরাজের সমর,
আজকে শুধু এক বেলারই তরে
আমরা দোঁহে অমর, দোঁহে অমর।

স্বয়ং যদি আসেন আজি দ্বারে
মানব নাকো রাজার দারোগারে—
কেল্লা হতে ফৌজ সারে সারে
দাঁড়ায় যদি, ওঁচায় ছোরা-ছুরি,
বলব, 'রে ভাই, বেজার কোরো নাকো,
গোল হতেছে, একটু থেমে থাকো,
কৃপাণ-খোলা শিশুর খেলা রাখো
খ্যাপার মতো কামান-ছোঁড়াছুঁড়ি।
একটুখানি সরে গিয়ে করো
সঙের মতো সঙিন ঝমঝমর,
আজকে শুধু এক বেলারই তরে
আমরা দোঁহে অমর, দোঁহে অমর।

বন্ধুজনে যদি পুণ্যফলে
করেন দয়া, আসেন দলে দলে,
গলায় বস্ত্র কব নয়নজলে,
ভাগ্য নামে অতিবর্ষা-সম।
এক দিনেতে অধিক মেশামেশি
শ্রান্তি বড়োই আনে শেষাশেষি,
জান তো ভাই, দুটি প্রাণীর বেশি
এ কুলায়ে কুলায় নাকো মম।
ফাগুন মাসে ঘরের টানাটানি,
অনেক চাঁপা, অনেকগুলি ভ্রমর,
ক্ষুদ্র আমার এই অমরাবতী
আমরা দুটি অমর, দুটি অমর।

শাস্ত্র

পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে।
বনে এত বকুল ফোটে,
গেয়ে মরে কোকিল পাখি,
লতাপাতার অন্তরালে
বড়ো সরস ঢাকাঢাকি।
চাঁপার শাখে চাঁদের আলো,
সে সৃষ্টি কি কেবল মিছে?
এ-সব যারা বোঝে তারা
পঞ্চাশতের অনেক নিচে।
পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে।

২

ঘরের মধ্যে বকাবকি,
নানান মুখে নানা কথা,
হাজার লোকে নজর পাড়ে,
একটুকু নাই বিরলতা;
সময় অল্প, ফুরায় তাও
অরসিকের আনাগোনায়,

ঘণ্টা ধরে থাকেন তিনি
সৎপ্রসঙ্গ আলোচনায়:
হতভাগ্য নবীন যুবা
কাজেই থাকে বনের খোঁজে,
ঘরের মধ্যে মুক্তি যে নেই
এ কথা সে বিশেষ বোঝে।
পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে।

৩

আমরা সবাই নব্যকালের
সভ্য যুবা অনাচারী,
মনুর শাস্ত্র শুধরে দিয়ে
নতুন বিধি করব জারি—
বুড়ো থাকুন ঘরের কোণে,
পয়সাকড়ি করুন জমা,
দেখুন বসে বিষয়পত্র,
চালান মামলা-মকদ্দমা;
ফাগুন মাসে লগ্ন দেখে
যুবারা যাক বনের পথে,
রাত্রি জেগে সাধ্যসাধন,
থাকুক রত কঠিন ব্রতে।
পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে।

অনবসর

ছেড়ে গেলে হে চঞ্চলা,
হে পুরাতন সহচরী।
ইচ্ছা বটে বছর কতক
তোমার জন্য বিলাপ করি,
সোনার স্মৃতি গড়িয়ে তোমার
বসিয়ে রাখি চিত্ততলে,
একলা ঘরে সাজাই তোমায়
মাল্য গেঁথে অশ্রুজলে,

নির্জনে কাঁদি মাসেক-খানেক
তোমায় চির-আপন জেনেই—
হায় রে আমার হতভাগ্য।
সময় যে নেই, সময় যে নেই।

বর্ষে বর্ষে বয়স কাটে,
বসন্ত যায় কথায় কথায়,
বকুলগুলো দেখতে দেখতে
ঝ'রে পড়ে যথায় তথায়,
মাসের মধ্যে বারেক এসে
অস্তে পালায় পূর্ণ ইন্দু,
শাস্ত্রে শাসায় জীবন শুধু
পদ্মপত্রে শিশির-বিন্দু—
তাঁদের পানে তাকাব না
তোমায় শুধু আপন জেনেই
সেটা বড়োই বর্বরতা—
সময় যে নেই, সময় যে নেই।

এসো আমার শ্রাবণ-নিশি,
এসো আমার শরৎ-লক্ষ্মী,
এসো আমার বসন্ত-দিন
লয়ে তোমার পুষ্পপক্ষী,
তুমি এসো, তুমিও এসো,
তুমি এসো—এবং তুমি,
প্রিয়ে, তোমরা সবাই জান
ধরণীর নাম মর্ত্যভূমি।
যে যায় চলে বিরাগভরে
তারেই শুধু আপন জেনেই
বিলাপ করে কাটাই, এমন
সময় যে নেই, সময় যে নেই।

ইচ্ছে করে ব'সে ব'সে
পদ্যে লিখি গৃহকোণায়—
তুমিই আছ জগৎ জুড়ে—
সেটা কিন্তু মিথ্যে শোনায়।
ইচ্ছে করে কোনো মতেই
সান্ত্বনা আর মানব না রে,
এমন সময় নতুন আঁখি
তাকায় আমার গৃহদ্বারে—

চক্ষু মুছে দুয়ার খুলি,
তারেই শুধু আপন জেনেই,
কখন তবে বিলাপ করি?
সময় যে নেই, সময় যে নেই।

অতিবাদ

আজ বসন্তে বিশ্বখাতায়
হিসেব নেইকো পুষ্পে পাতায়,
জগৎ যেন ঝোঁকের মাথায়
সকল কথাই বাড়িয়ে বলে,
ভুলিয়ে দিয়ে সত্যি মিথ্যে,
ঘুলিয়ে দিয়ে নিত্যানিত্যে,
দু-ধারে সব উদারচিত্তে
বিধিবিধান ছাড়িয়ে চলে।
আমারো শ্বার মন্ত্র পেয়ে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

প্রিয়ার পুণ্যে হলেম রে আজ
একটা রাতের রাজ্যাধিরাজ,
ভাণ্ডারে আজ করছে বিরাজ
সকল প্রকার অজস্রত্ব।
কেন রাখব কথার ওজন?
কৃপণতায় কোন্ প্রয়োজন?
ছুটুক বাণী যোজন যোজন
উড়িয়ে দিয়ে স্বত্ব শত্ব।
চিত্তদুয়ার মুক্ত ক'রে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

হে প্রেয়সী স্বর্গদূতী,
আমার যত কাব্য পুঁথি
তোমার পায়ে পড়ে স্তুতি,
তোমারি নাম বেড়ায় রটি,

থাকো হৃদয়-পদ্মটিতে
এক দেবতা আমার চিতে।
চাই নে তোমায় খবর দিতে
আরো আছেন তিরিশ কোটি।
চিত্তদুয়ার মুক্ত ক'রে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

ত্রিভুবন সবার বাড়া,
একলা তুমি সুধার ধারা,
উষার ভালে একটি তারা,
এ জীবনে একটি আলো—
সন্ধ্যাতারা ছিলেন কে কে
সে-সব কথা যাব ঢেকে,
সময় বুঝে মানুষ দেখে,
তুচ্ছ কথা ভোলাই ভালো।
চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

সত্য থাকুন ধরিত্রীতে
শুষ্ক রুক্ষ ঋষির চিতে,
জ্যামিতি আর বীজগণিতে,
কারো ইথে আপত্তি নেই,
কিন্তু আমার প্রিয়ার কানে,
এবং আমার কবির গানে
পঞ্চশরের পুষ্পবাণে
মিথ্যে থাকুন রাত্রিদিনেই।
চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

ওগো সত্য বেঁটেখাটো,
বীণার তন্ত্রী যতই ছাঁটো,
কণ্ঠ আমার যতই আঁটো,
বলব তবু উচ্চ সুরে—

আমার প্রিয়ার মুগ্ধ দৃষ্টি
করছে ভুবন নূতন সৃষ্টি
মুচকি হাসির সুধার বৃষ্টি
চলছে আজি জগৎ জুড়ে।
চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

যদি বল আর বছরে
এই কথাটাই এমনি ক'রে
বলেছিলি, কিন্তু ওরে
শুনেছিলেন আরেক জনে—
জেনো তবে মূঢ়মত্ত,
আর বসন্তে সেটাই সত্য,
এবারো সেই প্রাচীন তত্ত্ব
ফুটল নূতন চোখের কোণে।
চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

আজ বসন্তে বকুল ফুলে
যে গান বায়ু বেড়ায় বুলে,
কাল সকালে যাবে ভুলে,
কোথায় বাতাস, কোথায় সে ফুল।
হে সুন্দরী তেমনি কবে
এ-সব কথা ভুলব যবে
মনে রেখো আমায় তবে—
ক্ষমা কোরো আমার সে ভুল।
চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

যথাস্থান

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোন্‌খানে তোর স্থান?
পণ্ডিতেরা থাকেন যেথায়
বিদ্যেরত্ন-পাড়ায়—
নস্য উড়ে আকাশ জুড়ে
কাহার সাধ্য দাঁড়ায়,
চলছে সেথায় সূক্ষ্ম তর্ক
সদাই দিবারাত্র—
পাত্রাধার কি তৈল, কিংবা
তৈলাধার কি পাত্র,
পুঁথিপত্র মেলাই আছে
মোহধ্বান্ত-নাশন
তারি মধ্যে একটি প্রান্তে
পেতে চাস কি আসন?
গান তা শুনি গুঞ্জরিয়া
গুঞ্জরিয়া কহে—
নহে, নহে, নহে।

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোন্ দিকে তোর টান?
পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ-'পরে
আছেন ভাগ্যবন্ত,
মেহাগিনির মঞ্চ জুড়ি
পঞ্চ হাজার গ্রন্থ,
সোনার জলে দাগ পড়ে না,
খোলে না কেউ পাতা,
অস্বাদিত মধু যেমন
যূথী অনাঘ্রাতা,
ভৃত্য নিত্য ধুলা ঝাড়ে
যত্ন পুরা মাত্রা,
ওরে আমার ছন্দোময়ী
সেথায় করবি যাত্রা?
গান তা শুনি কর্ণমূলে
মর্মরিয়া কহে—
নহে, নহে, নহে।

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,

কোথায় পাবি মান?
নবীন ছাত্র ঝুঁকে আছে
একজামিনের পড়ায়,
মনটা কিন্তু কোথা থেকে
কোন্ দিকে যে গড়ায়,
অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব
সামনে আছে খোলা,
কর্তৃজনের ভয়ে কাব্য
কুলুঙ্গিতে তোলা—
সেইখানেতে ছেঁড়া-ছড়া
এলোমেলোর মেলা,
তারি মধ্যে ওরে চপল,
করবি কি তুই খেলা?
গান তা শুনে মৌন মুখে
রহে দ্বিধার ভরে—
যাব-যাব করে।

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি ত্রাণ?
ভাণ্ডারেতে লক্ষ্মী বধূ
যেথায় আছে কাজে,
ঘরে ধায় সে, ছুটি পায় সে
যখন মাঝে মাঝে।
বালিশতলে বইটি চাপা
টানিয়া লয় তারে,
পাতাগুলিন ছেঁড়া-খোঁড়া
শিশুর অত্যাচারে—
কাজল-আঁকা সিঁদুর-মাখা
চুলের গন্ধে ভরা
শয্যাপ্রান্তে ছিন্ন বেশে
চাস কি যেতে ত্বরা?
বুকের ’পরে নিশ্বসিয়া
স্তব্ধ রহে গান—
লোভে কম্পমান।

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি প্রাণ?

যেথায় সুখে তরুণ যুগল
পাগল হয়ে বেড়ায়
আড়াল বুঝে আঁধার খুঁজে
সবার আঁখি এড়ায়,
পাখি তাদের শোনায় গীতি,
নদী শোনায় গাথা,
কত রকম ছন্দ শোনায়
পুষ্প লতা পাতা,
সেইখানেতে সরল হাসি
সজল চোখের কাছে
বিশ্ব-বাঁশির ধ্বনির মাঝে
যেতে কি সাধ আছে?
হঠাৎ উঠে উচ্ছ্বসিয়া
কহে আমার গান—
সেইখানে মোর স্থান।

বোঝাপড়া

মনেরে আজ কহো যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

কেউ বা তোমায় ভালোবাসে
কেউ বা বাসতে পারে না যে,
কেউ বিকিয়ে আছে, কেউ বা
সিকি পয়সা ধারে না যে।
কতকটা যে স্বভাব তাদের,
কতকটা বা তোমারো ভাই,
কতকটা এ ভবের গতিক—
সবার তরে নহে সবাই।
তোমায় কতক ফাঁকি দেবে,
তুমিও কতক দেবে ফাঁকি,
তোমার ভোগে কতক পড়বে,
পরের ভোগে থাকবে বাকি।
মান্ধাতারই আমল থেকে
চলে আসছে এমনি রকম
তোমারি কি এমন ভাগ্য
বাঁচিয়ে যাবে সকল জখম।

মনেরে আজ কহো যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বুঝি
এলে সুখের বন্দরেতে,
জলের তলে পাহাড় ছিল
লাগল বুকের অন্দরেতে,
মুহূর্তেকে পাঁজরগুলো
উঠল কেঁপে আর্তরবে—
তাই নিয়ে কি সবার সঙ্গে
ঝগড়া করে মরতে হবে?
ভেসে থাকতে পার যদি
সেইটে সবার চেয়ে শ্রেয়,
না পার তো বিনা বাক্যে
টুপ করিয়া ডুবে যেয়ো।
এটা কিছু অপূর্ব নয়,
ঘটনা সামান্য খুবই—
শঙ্কা যেথায় করে না কেউ
সেইখানে হয় জাহাজ-ডুবি।

মনেরে তাই কহো যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

তোমার মাপে হয় নি সবাই,
তুমিও হও নি সবার মাপে,
তুমি মর কারো ঠেলায়,
কেউ বা মরে তোমার চাপে—
তবু ভেবে দেখতে গেলে
এমনি কিসের টানাটানি?
তেমন করে হাত বাড়ালে
সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।
আকাশ তবু সুনীল থাকে,
মধুর ঠেকে ভোরের আলো,
মরণ এলে হঠাৎ দেখি
মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।
যাহার লাগি চক্ষু বুজে
বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর
তাহারে বাদ দিয়েও দেখি
বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।

মনেরে তাই কহো যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

নিজের ছায়া মস্ত করে
অস্তাচলে বসে বসে
আঁধার করে তোল যদি
জীবনখানা নিজের দোষে,
বিধির সঙ্গে বিবাদ করে
নিজের পায়েই কুড়ুল মার,
দোহাই তবে এ কার্যটা
যত শীঘ্র পার সারো।
খুব খানিকটে কেঁদে কেটে
অশ্রু ঢেলে ঘড়া ঘড়া—
মনের সঙ্গে এক রকমে
করে নে ভাই বোঝাপড়া,
তাহার পরে আঁধার ঘরে
প্রদীপখানি জ্বালিয়ে তোলো।
ভুলে যা ভাই কাহার সঙ্গে
কতটুকুন তফাত হল।

মনেরে তাই কহো যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

অচেনা

কেউ যে কারে চিনি নাকো
সেটা মস্ত বাঁচন।
তা না হলে নাচিয়ে দিত
বিষম তুর্কি-নাচন।
বুকের মধ্যে মনটা থাকে,
মনের মধ্যে চিন্তা—
সেইখানেতেই নিজের ডিমে
সদাই তিনি দিন তা।
বাইরে যা পাই সম্‌জে নেব
তারি আইন-কানুন,
অন্তরেতে যা আছে তা
অন্তর্যামীই জানুন।

চাই নে রে, মন চাই নে।
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই,
যে হাসি আর যে কথাটাই,
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নে রে মন, তাই নে।

বাইরে থাকুক মধুর মূর্তি,
সুধামুখের হাস্য,
তরল চোখে সরল দৃষ্টি
করব না তার ভাষ্য।
বাহু যদি তেমন করে
জড়ায় বাহুবন্ধ
আমি দুটি চক্ষু মুদে
রইব হয়ে অন্ধ,
কে যাবে ভাই মনের মধ্যে
মনের কথা ধরতে?
কীটের খোঁজে কে দেবে হাত
কেউটে সাপের গর্তে?

চাই নে রে, মন চাই নে।
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই,
যে হাসি আর যে কথাটাই,
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নে রে মন, তাই নে।

মন নিয়ে কেউ বাঁচে নাকো,
মন বলে যা পায় রে
কোনো জন্মে মন সেটা নয়
জানে না কেউ হায় রে।
ওটা কেবল কথার কথা,
মন কি কেহ চিনিস?
আছে কারো আপন হাতে
মন ব'লে এক জিনিস?
চলেন তিনি গোপন চালে,
স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছে।
কেই বা তাঁরে দিচ্ছে, এবং
কেই বা তাঁরে নিচ্ছে।

চাই নে রে, মন চাই নে।
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই,
যে হাসি আর যে কথাটাই,

যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নে রে মন, তাই নে।

তথাপি

তুমি যদি আমায় ভালো না বাস
রাগ করি যে এমন আমার সাধ্য নাই;
এমন কথার দেব নাকো আভাসও
আমারো মন তোমার পায়ে বাধ্য নাই।
নাইকো আমার কোনো গরব-গরিমা
যেমন করেই কর আমায় বঞ্চিত,
তুমি না রও তোমার সোনার প্রতিমা
রবে আমার মনের মধ্যে সঞ্চিত।

কিন্তু তবু তুমিই থাকো, সমস্যা যাক ঘুচি।
স্মৃতির চেয়ে আসলটিতেই আমার অভিরুচি।

দৈবে স্মৃতি হারিয়ে যাওয়া শক্ত নয়
সেটা কিন্তু বলে রাখাই সংগত।
তাহা ছাড়া যারা তোমার ভক্ত নয়
নিন্দা তারা করতে পারে অন্তত।
তাহা ছাড়া চিরদিন কি কষ্টে যায়?
আমারো এই অশ্রু হবে মার্জনা।
ভাগ্যে যদি একটি কেহ নষ্টে যায়
সান্ত্বনার্থে হয়তো পাব চার জনা।

কিন্তু তবু তুমিই থাকো, সমস্যা যাক ঘুচি।
চারের চেয়ে একের 'পরেই আমার অভিরুচি।

কবির বয়স

ওরে কবি সন্ধ্যা হয়ে এল,
কেশে তোমার ধরেছে যে পাক।
বসে বসে ঊর্ধ্বপানে চেয়ে
শুনতেছ কি পরকালের ডাক?
কবি কহে, সন্ধ্যা হল বটে,
শুনছি বসে লয়ে শ্রান্ত দেহ
এ পারে ওই পল্লী হতে যদি
আজো হঠাৎ ডাকে আমায় কেহ।

যদি হোথায় বকুলবনচ্ছায়ে
মিলন ঘটে তরুণ-তরুণীতে,
দুটি আঁখির 'পরে দুইটি আঁখি
মিলিতে চায় দুরন্ত সংগীতে—

কে তাহাদের মনের কথা লয়ে
বীণার তারে তুলবে প্রতিধ্বনি,
আমি যদি ভবের কূলে বসে
পরকালের ভালো মন্দই গণি।

২

সন্ধ্যাতারা উঠে অস্তে গেল,
চিতা নিবে এল নদীর ধারে,
কৃষ্ণপক্ষে হলুদবর্ণ চাঁদ
দেখা দিল বনের একটি পারে।
শৃগালসভা ডাকে ঊর্ধ্বরবে
পোড়ো বাড়ির শূন্য আঙিনাতে—
এমন কালে কোনো গৃহত্যাগী
হেথায় যদি জাগতে আসে রাতে,
জোড়হস্তে ঊর্ধ্বে তুলি মাথা
চেয়ে দেখে সপ্ত ঋষির পানে,
প্রাণের কূলে আঘাত করে ধীরে
সুপ্তিসাগর শব্দবিহীন গানে—

ত্রিভুবনের গোপন কথাখানি
কে জাগিয়ে তুলবে তাহার মনে
আমি যদি আমার মুক্তি নিয়ে
যুক্তি করি আপন গৃহকোণে?

৩

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে
তাহার পানে নজর এত কেন?
পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি একবয়সী জেনো।
ওষ্ঠে কারো সরল সাদা হাসি
কারো হাসি আঁখির কোণে কোণে,
কারো অশ্রু উছলে পড়ে যায়,
কারো অশ্রু শুকায় মনে মনে,

কেউ বা থাকে ঘরের কোণে দোঁহে,
জগৎ-মাঝে কেউ বা হাঁকায় রথ,
কেউ বা মরে একলা ঘরের শোকে,
জনারণ্যে কেউ বা হারায় পথ।

সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি,
কখন শুনি পরকালের ডাক?
সবার আমি সমান-বয়সী যে
চুলে আমার যত ধরুক পাক।

বিদায়

তোমরা নিশি যাপন করো
এখনো রাত রয়েছে ভাই,
আমায় কিন্তু বিদায় দেহো—
ঘুমতে যাই, ঘুমতে যাই।
মাথার দিব্য, উঠো না কেউ
আগ বাড়িয়ে দিতে আমায়,
চলছে যেমন চলুক তেমন
হঠাৎ যেন গান না থামায়।
আমার যন্ত্রে একটি তন্ত্রী
একটু যেন বিকল বাজে,
মনের মধ্যে শুনছি যেটা
হাতে সেটা আসছে না যে।
একেবারে থামার আগে
সময় রেখে থামতে যে চাই—
আজকে কিছু শ্রান্ত আছি,
ঘুমতে যাই, ঘুমতে যাই।

আঁধার-আলোয় সাদায়-কালোয়
দিনটা ভালোই গেছে কাটি,
তাহার জন্যে কারো সঙ্গে
নাইকো কোনো ঝগড়াঝাঁটি।
মাঝে মাঝে ভেবেছিলুম
একটু-আধটু এটা-ওটা
বদল যদি পারত হতে
থাকত নাকো কোনো খোঁটা।

বদল হলে তখন মনটা
হয়ে পড়ত ব্যতিব্যস্ত,
এখন যেমন আছে আমার
সেইটে আবার চেয়ে বসত।
তাই ভেবেছি দিনটা আমার
ভালোই গেছে, কিছু না চাই—
আজকে শুধু শ্রান্ত আছি,
ঘুমতে যাই, ঘুমতে যাই।

অপটু

যতবার আজ গাঁথনু মালা
পড়ল খসে খসে—
কী জানি কার দোষে।
তুমি হোথায় চোখের কোণে
দেখছ বসে বসে!
চোখ দুটিরে প্রিয়ে
শুধাও শপথ নিয়ে
আঙুল আমার আকুল হল
কাহার দৃষ্টিদোষে?

আজ যে বসে গান শোনাব
কথাই নাহি জোটে,
কণ্ঠ নাহি ফোটে।
মধুর হাসি খেলে তোমার
চতুর রাঙা ঠোঁটে।
কেন এমন ত্রুটি?
বলুক আঁখি দুটি।
কেন আমার রুদ্ধ কণ্ঠে
কথাই নাহি ফোটে।

রেখে দিলাম মাল্য বীণা,
সন্ধ্যা হয়ে আসে।
ছুটি দাও এ দাসে।
সকল কথা বন্ধ করে
বসি পায়ের পাশে।
নীরব ওষ্ঠ দিয়ে
পারব যে কাজ প্রিয়ে
এমন কোনো কর্ম দেহো
অকর্মণ্য দাসে।

উৎসৃষ্ট

মিথ্যে তুমি গাঁথলে মালা
নবীন ফুলে,
ভেবেছ কি কণ্ঠে আমার
দেবে তুলে?
দাও তো ভালোই, কিন্তু জেনো
হে নির্মলে,
আমার মালা দিয়েছি ভাই
সবার গলে।
যে-কটা ফুল ছিল জমা
অর্ঘ্যে মম
উদ্দেশেতে সবায় দিনু—
নমো নমঃ।

কেউ বা তাঁরা আছেন কোথা
কেউ জানে না,
কারো বা মুখ ঘোমটা-আড়ে
আধেক চেনা,
কেউ বা ছিলেন অতীত কালে
অবন্তীতে,
এখন তাঁরা আছেন শুধু
কবির গীতে।
সবার তনু সাজিয়ে মাল্যে
পরিচ্ছদে
কহেন বিধি—তুভ্যমহং
সম্প্রদদে।

হৃদয় নিয়ে আজ কি প্রিয়ে
হৃদয় দেবে?
হায় ললনা সে প্রার্থনা
ব্যর্থ এবে।
কোথায় গেছে সেদিন আজি
যেদিন মম
তরুণকালে জীবন ছিল
মুকুল-সম;
সকল শোভা সকল মধু
গন্ধ যত
বক্ষোমাঝে বন্ধ ছিল
বন্দী-মতো।

আজ যে তাহা ছড়িয়ে গেছে
অনেক দূরে—
অনেক দেশে অনেক বেশে
অনেক সুরে।
কুড়িয়ে তারে বাঁধতে পারে
একটিখানে
এমনতরো মোহন মন্ত্র
কেই বা জানে!
নিজের মন তো দেবার আশা
চুকেই গেছে.
পরের মনটি পাবার আশায়
রইনু বেঁচে।

ভীরুতা

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
মনে মনে হাসবি কি না
বুঝব কেমন করে?
আপনি হেসে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই—
ঠাট্টা করে ওড়াই সখী
নিজের কথাটাই।
হালকা তুমি কর পাছে
হালকা করি ভাই
আপন ব্যথাটাই।

সত্য কথা সরলভাবে
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
অবিশ্বাসে হাসবি কি না
বুঝব কেমন করে?
মিথ্যা ছলে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই—
উলটা করে বলি আমি
সহজ কথাটাই।
ব্যর্থ তুমি কর পাছে
ব্যর্থ করি ভাই
আপন ব্যথাটাই।

সোহাগভরা প্রাণের কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
সোহাগ ফিরে পাব কি না
বুঝব কেমন করে?
কঠিন কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই—
গর্বছলে দীর্ঘ করি
নিজের কথাটাই।
ব্যথা পাছে না পাও তুমি
লুকিয়ে রাখি তাই
নিজের ব্যথাটাই।

ইচ্ছা করে নীরব হয়ে
রহিব তোর কাছে
সাহস নাহি পাই।
মুখের 'পরে বুকের কথা
উথলে ওঠে পাছে
অনেক কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই—
কথার আড়ে আড়াল থাকে
মনের কথাটাই।
তোমায় ব্যথা লাগিয়ে শুধু
জাগিয়ে তুলি ভাই
আপন ব্যথাটাই।

ইচ্ছা করি সুদূরে যাই
না আসি তোর কাছে।
সাহস নাহি পাই।
তোমার কাছে ভীরুতা মোর
প্রকাশ হয় রে পাছে।
কেবল এসে তাই
দেখা দিয়েই যাই—
স্পর্ধাতলে গোপন করি
মনের কথাটাই।
নিত্য তব নেত্রপাতে
জ্বালিয়ে রাখি ভাই
আপন ব্যথাটাই।

পরামর্শ

সূর্য গেল অস্তপারে—
লাগল গ্রামের ঘাটে
আমার জীর্ণ তরী।
শেষ বসন্তের সন্ধ্যা-হাওয়া
শস্যশূন্য মাঠে
উঠল হা হা করি।
আর কি হবে নূতন যাত্রা
নূতন রানীর দেশে
নূতন সাজে সেজে?
এবার যদি বাতাস উঠে
তুফান জাগে শেষে
ফিরে আসবি নে যে।

অনেক বার তো হাল ভেঙেছে
পাল গিয়েছে ছিঁড়ে
ওরে দুঃসাহসী।
সিন্ধুপানে গেছিস ভেসে
অকূল কালো নীরে
ছিন্ন রশারশি।
এখন কি আর আছে সে বল?
বুকের তলা তোর
ভরে উঠছে জলে।
অশ্রু সেঁচে চলবি কত
আপন ভারে ভোর
তলিয়ে যাবি তলে।

এবার তবে ক্ষান্ত হ রে
ওরে শ্রান্ত তরী।
রাখ্ রে আনাগোনা।
বর্ষশেষের বাঁশি বাজে
সন্ধ্যা-গগন ভরি,
ওই যেতেছে শোনা।
এবার ঘুমো কূলের কোলে
বটের ছায়াতলে
ঘাটের পাশে রহি,
ঘটের ঘায়ে যেটুকু ঢেউ
উঠে তটের জলে
তারি আঘাত সহি।

ইচ্ছা যদি করিস তবে
এ পার হতে পারে
যাস রে খেয়া বেয়ে।
আনবে বহি গ্রামের বোঝা
ক্ষুদ্র ভারে ভারে
পাড়ার ছেলেমেয়ে।
ও পারেতে ধানের খোলা
এই পারেতে হাট,
মাঝে শীর্ণ নদী,
সন্ধ্যা-সকাল করবি শুধু
এ-ঘাট ও-ঘাট,
ইচ্ছা করিস যদি।

হায় রে মিছে প্রবোধ দেওয়া,
অবোধ তরী মম
আবার যাবে ভেসে।
কর্ণ ধরে বসেছে তার
যমদূতের সম
স্বভাব সর্বনেশে।
ঝড়ের নেশা ঢেউয়ের নেশা
ছাড়বে নাকো আর,
হায় রে মরণ-লুভী!
ঘাটে সে কি রইবে বাঁধা,
অদৃষ্টে যাহার
আছে নৌকাডুবি।

ক্ষতিপূরণ

তোমার তরে সবাই মোরে
করছে দোষী
হে প্রেয়সী।

বলছে—কবি তোমার ছবি
আঁকছে গানে,
প্রণয়গীতি গাচ্ছে নিতি
তোমার কানে,
নেশায় মেতে ছন্দে গেঁথে
তুচ্ছ কথা
ঢাকছে শেষে বাংলাদেশে
উচ্চ কথা।

তোমার তরে সবাই মোরে
করছে দোষী
হে প্রেয়সী।

২

সে কলঙ্কে নিন্দা-পঙ্কে
তিলক টানি
এলেম রানী।

ফেলুক মুছি হাস্য-শুচি
তোমার লোচন
বিশ্বসুদ্ধ যতেক ক্রুদ্ধ
সমালোচন।
অনুরক্ত তব ভক্ত
নিন্দিতেরে
করো রক্ষে শীতল বক্ষে
বাহুর ঘেরে।

তাই কলঙ্কে নিন্দা-পঙ্কে
তিলক টানি
এলেম রানী।

৩

আমি নাবব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে—

ঠেকল কখন তোমার কাঁকন-
কিঙ্কিণীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।

আমি নাবব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে।

৪

হায় রে কোথা যুদ্ধকথা
হৈল গত
স্বপ্ন-মতো।

পুরাণ-চিত্র বীর-চরিত্র
অষ্ট সর্গ,
কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড
নয়ন-খড়্গ।
রৈল মাত্র দিবারাত্র
প্রেমের প্রলাপ,
দিলেম ফেলে ভাবীকেলে
কীর্তি-কলাপ।

হায় রে কোথা যুদ্ধকথা
হৈল গত
স্বপ্ন-মতো।

৫

সে-সব ক্ষতি-পূরণ প্রতি
দৃষ্টি রাখি।
হরিণ-আঁখি।

লোকের মনে সিংহাসনে
নাইকো দাবি
তোমার মনোগৃহের কোনো
দাও তো চাবি।
মরার পরে চাই নে ওরে
অমর হতে।
অমর হব আঁখির তব
সুধার স্রোতে।

খ্যাতির ক্ষতি-পূরণ প্রতি
দৃষ্টি রাখি
হরিণ-আঁখি।

সেকাল

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে,
দৈবে হতেম দশম রত্ন
নবরত্নের মালে,
একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে
রাজার কাছে নিতাম চেয়ে
উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে
কানন-ঘেরা বাড়ি।
রেবার তটে চাঁপার তলে
সভা বসত সন্ধ্যা হলে,
ক্রীড়া-শৈলে আপন মনে
দিতাম কণ্ঠ ছাড়ি।
জীবনতরী বহে যেত
মন্দাক্রান্তা তালে,
আমি যদি জন্ম নিতাম
কালিদাসের কালে।

২

চিন্তা দিতেম জলাঞ্জলি,
থাকত নাকো ত্বরা,
মৃদুপদে যেতেম, যেন
নাইকো মৃত্যু জরা।
ছটা ঋতু পূর্ণ ক'রে
ঘটত মিলন স্তরে স্তরে,
ছটা সর্গে বার্তা তাহার
রইত কাব্যে গাঁথা।
বিচ্ছেদও সুদীর্ঘ হত,
অশ্রুজলের নদীর মতো
মন্দগতি চলত রচি
দীর্ঘ করুণ গাথা।
আষাঢ় মাসে মেঘের মতন
মন্থরতায় ভরা
জীবনটাতে থাকত নাকো
কিছুমাত্র ত্বরা।

৩

অশোক-কুঞ্জ উঠত ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে,
বকুল হত ফুল্ল, প্রিয়ার
মুখের মদিরাতে।

প্রিয়সখীর নামগুলি সব
ছন্দ ভরি করিত রব,
রেবার কূলে কলহংসের
কলধ্বনির মতো।
কোনো নামটি মন্দালিকা,
কোনো নামটি চিত্রলিখা,
মঞ্জুলিকা মঞ্জরিণী
ঝংকারিত কত।
আসত তারা কুঞ্জবনে
চৈত্র-জ্যোৎস্না-রাতে,
অশোক-শাখা উঠত ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে।

৪

কুরবকের পরত চূড়া
কালো কেশের মাঝে,
লীলা-কমল রইত হাতে
কী জানি কোন্ কাজে।
অলক সাজত কুন্দফুলে,
শিরীষ পরত কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিত
নব-নীপের মালা।
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে,
লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু
মাখত মুখে বালা।
কালাগুরুর গুরু গন্ধ
লেগে থাকত সাজে,
কুরবকের পরত মালা
কালো কেশের মাঝে।

৫

কুঙ্কুমেরই পত্রলেখায়
বক্ষ রইত ঢাকা,
আঁচলখানির প্রান্তটিতে
হংস-মিথুন আঁকা।
বিরহেতে আষাঢ় মাসে
চেয়ে রইত বঁধুর আশে,
একটি করে পূজার পুষ্পে
দিন গণিত বসে।

বক্ষে তুলি বীণাখানি
গান গাহিতে ভুলত বাণী,
রুক্ষ অলক অশ্রুচোখে
পড়ত খসে খসে।
মিলন-রাতে বাজত পায়ে
নূপুর দুটি বাঁকা,
কুঙ্কুমেরই পত্রলেখায়
বক্ষ রইত ঢাকা।

৬

প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত
সাধের শারিকারে,
নাচিয়ে নিত ময়ূরটিরে
কঙ্কণ-ঝংকারে।
কপোতটিরে লয়ে বুকে
সোহাগ করত মুখে মুখে,
সারসীরে খাইয়ে দিত
পদ্মকোরক বহি।
অলক নেড়ে দুলিয়ে বেণী
কথা কইত শৌরসেনী,
বলত সখীর গলা ধরে—
হলা পিয় সহি।
জল সেঁচিত আলবালে
তরুণ সহকারে।
প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত
সাধের শারিকারে।

৭

নবরত্নের সভার মাঝে
রইতাম একটি টেরে।
দূর হইতে গড় করিতাম
দিঙ্‌নাগাচার্যেরে।
আশা করি নামটা হত
ওরই মধ্যে ভদ্রমতো—
বিশ্বসেন কি দেবদত্ত
কিংবা বসুভূতি।
স্রগ্ধরা কি মালিনীতে
বিম্বাধরের স্তুতিগীতে
দিতাম রচি দুটি-চারটি
ছোটোখাটো পুঁথি।

ঘরে যেতাম তাড়াতাড়ি
শ্লোক-রচনা সেরে,
নবরত্নের সভার মাঝে
রইতাম একটি টেরে।

৮

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে
বন্দী হতেম না জানি কোন্‌
মালবিকার জালে।
কোন্‌ বসন্ত-মহোৎসবে
বেণুবীণার কলরবে
মঞ্জরিত কুঞ্জবনের
গোপন অন্তরালে
কোন্‌ ফাগুনের শুক্লনিশায়
যৌবনেরই নবীন নেশায়
চকিতে কার দেখা পেতেম
রাজার চিত্রশালে।
ছল করে তার বাধত আঁচল
সহকারের ডালে।
আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে।

৯

হায় রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল!
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে
লয়ে তারিখ-সাল।
হারিয়ে গেছে সে-সব অব্দ,
ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ—
গেছে যদি, আপদ গেছে,
মিথ্যা কোলাহল।
হায় রে গেল সঙ্গে তারি
সেদিনের সেই পৌরনারী
নিপুণিকা চতুরিকা
মালবিকার দল।
কোন্‌ স্বরগে নিয়ে গেল
বরমাল্যের থাল।
হায় রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল।

১০

যাদের সঙ্গে হয় নি মিলন
সে-সব বরাঙ্গনা
বিচ্ছেদেরই দুঃখে আমায়
করছে অন্যমনা।
তবু মনে প্রবোধ আছে—
তেমনি বকুল ফোটে গাছে,
যদিও সে পায় না নারীর
মুখমদের ছিটা।
ফাগুন মাসে অশোক-ছায়ে
অলস প্রাণে শিথিল গায়ে
দখিন হতে বাতাসটুকু
তেমনি লাগে মিঠা।
অনেক দিকেই যায় যে পাওয়া
অনেকটা সান্ত্বনা,
যদিও রে নাইকো কোথাও
সে-সব বরাঙ্গনা।

১১

এখন যাঁরা বর্তমানে
আছেন মর্ত্যলোকে,
মন্দ তারা লাগত না কেউ
কালিদাসের চোখে।
পরেন বটে জুতা মোজা,
চলেন বটে সোজা সোজা,
বলেন বটে কথাবার্তা
অন্য দেশীর চালে,
তবু দেখো সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য,
যেমনটি ঠিক দেখা যেত
কালিদাসের কালে।
মরব না ভাই নিপুণিকা
চতুরিকার শোকে,
তাঁরা সবাই অন্য নামে
আছেন মর্ত্যলোকে।

১২

আপাতত এই আনন্দে
গর্বে বেড়াই নেচে—
কালিদাস তো নামেই আছেন
আমি আছি বেঁচে।

তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ
আমি তো পাই মৃদুমন্দ,
আমার কালের কণামাত্র
পান নি মহাকবি।
বিদুষী এই আছেন যিনি
আমার কালের বিনোদিনী
মহাকবির কল্পনাতে
ছিল না তাঁর ছবি।
প্রিয়ে তোমার তরুণ আঁখির
প্রসাদ যেচে যেচে,
কালিদাসকে হারিয়ে দিয়ে
গর্বে বেড়াই নেচে।

প্রতিজ্ঞা

আমি হব না তাপস, হব না, হব না,
যেমনি বলুন যিনি।
আমি হব না তাপস, নিশ্চয় যদি
না মেলে তপস্বিনী।
আমি করেছি কঠিন পণ
যদি না মিলে বকুলবন,
যদি মনের মতন মন
না পাই জিনি,
তবে হব না তাপস, হব না, যদি না
পাই সে তপস্বিনী।

আমি ত্যজিব না ঘর, হব না বাহির
উদাসীন সন্ন্যাসী,
যদি ঘরের বাহিরে না হাসে কেহই
ভুবন-ভুলানো হাসি।
যদি না উড়ে নীলাঞ্চল
মধুর বাতাসে বিচঞ্চল,
যদি না বাজে কাঁকন মল
রিনিকঝিনি,
আমি হব না তাপস, হব না, যদি না
পাই গো তপস্বিনী।

আমি হব না তাপস, তোমার শপথ,
যদি সে তপের বলে
কোনো নূতন ভুবন না পারি গড়িতে
নূতন হৃদয়-তলে।

যদি জাগায়ে বীণার তার
কারো টুটিয়া মরম-দ্বার,
কোনো নূতন আঁখির ঠার
না লই চিনি,
আমি হব না তাপস, হব না, হব না,
না পেলে তপস্বিনী।

পথে

গাঁয়ের পথে চলেছিলেম
অকারণে,
বাতাস বহে বিকালবেলা
বেণুবনে।
ছায়া তখন আলোর ফাঁকে
লতার মতো জড়িয়ে থাকে,
একা একা কোকিল ডাকে
নিজমনে।
আমি কোথায় চলেছিলেম
অকারণে।

জলের ধারে কুটীরখানি
পাতা-ঢাকা,
দ্বারের 'পরে নুয়ে পড়ে
নিম্বশাখা।
ওই যে শুনি মাঝে মাঝে—
না জানি কোন্ নিত্যকাজে
কোথায় দুটি কাঁকন বাজে
গৃহকোণে।
যেতে যেতে এলেম হেথা
অকারণে।

দিঘির জলে ঝলক ঝলে
মানিক হীরা,
সর্ষেখেতে উঠছে মেতে
মৌমাছিরা।
এ পথ গেছে কত গাঁয়ে,
কত গাছের ছায়ে ছায়ে,
কত মাঠের গায়ে গায়ে
কত বনে।
আমি শুধু হেথায় এলেম
অকারণে।

আরেক দিন সে ফাগুন মাসে
বহু আগে
চলেছিলেম এই পথে, সেই
মনে জাগে।
আমের বোলের গন্ধে অবশ
বাতাস ছিল উদাস অলস,
ঘাটের শানে বাজছে কলস
ক্ষণে ক্ষণে।
সে-সব কথা ভাবছি বসে
অকারণে।

দীর্ঘ হয়ে পড়ছে পথে
বাঁকা ছায়া,
গোষ্ঠ-ঘরে ফিরছে ধেনু
শ্রান্তকায়া।
গোধূলিতে খেতের 'পরে
ধূসর আলো ধূ ধূ করে,
বসে আছে খেয়ার তরে
পান্থ জনে।
আবার ধীরে চলছি ফিরে
অকারণে।

জন্মান্তর

আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি
সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাই না হতে নববঙ্গে
নবযুগের চালক।
আমি নাই বা গেলেম বিলাত,
নাই বা পেলেম রাজার খিলাত,
যদি পরজন্মে পাই রে হতে
ব্রজের রাখাল বালক।
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে
সুসভ্যতার আলোক।

২

যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশীবটের তলে,
যারা গুঞ্জা ফুলের মালা গেঁথে
পরে পরায় গলে,

যারা বৃন্দাবনের বনে
সদাই শ্যামের বাঁশি শোনে,
যারা যমুনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে
শীতল কালো জলে।
যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশীবটের তলে।

৩

ওরে বিহান হল জাগো রে ভাই—
ডাকে পরস্পরে।
ওরে ওই যে দধি-মন্থ-ধ্বনি
উঠল ঘরে ঘরে।
হেরো মাঠের পথে ধেনু
চলে উড়িয়ে গোখুর-রেণু,
হেরো আঙিনাতে ব্রজের বধূ
দুগ্ধ দোহন করে।
ওরে বিহান হল জাগো রে ভাই—
ডাকে পরস্পরে।

৪

ওরে শাঙন মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল মূলে,
ওরে এপার ওপার আঁধার হল
কালিন্দীরই কূলে।
ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে
কাঁপে খেয়া-তরীর 'পরে,
হেরো কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর
কলাপখানি তুলে।
ওরে শাঙন মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল মূলে।

৫

মোরা নব-নবীন ফাগুন-রাতে
নীল নদীর তীরে
কোথা যাব চলি অশোকবনে
শিখিপুচ্ছ শিরে।
যবে দোলার ফুলরশি
দিবে নীপশাখায় কষি

যবে দখিন-বায়ে বাঁশির ধ্বনি
উঠবে আকাশ ঘিরে,
মোরা রাখাল মিলে করব মেলা
নীল নদীর তীরে।

৬

আমি হব না ভাই নববঙ্গে
নবযুগের চালক,
আমি জ্বালাব না আঁধার দেশে
সুসভ্যতার আলোক।
যদি ননি-ছানার গাঁয়ে
কোথাও অশোক-নীপের ছায়ে
আমি কোনো জন্মে পারি হতে
ব্রজের গোপবালক
তবে চাই না হতে নববঙ্গে
নবযুগের চালক।

কর্মফল

পরজন্ম সত্য হলে
কী ঘটে মোর সেটা জানি।
আবার আমায় টানবে ধরে
বাংলাদেশের এ রাজধানী।
গদ্য পদ্য লিখনু ফেঁদে,
তারাই আমায় আনবে বেঁধে,
অনেক লেখায় অনেক পাতক,
সে মহাপাপ করব মোচন।
আমায় হয়তো করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

২

ততদিনে দৈবে যদি
পক্ষপাতী পাঠক থাকে
কর্ণ হবে রক্তবর্ণ
এমনি কটু বলব তাকে।
যে বইখানি পড়বে হাতে
দগ্ধ করব পাতে পাতে,

আমার ভাগ্যে হব আমি
দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন।
আমায় হয়তো করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

৩

বলব, এ-সব কী পুরাতন।
আগাগোড়া ঠেকছে চুরি।
মনে হচ্ছে, আমিও এমন
লিখতে পারি ঝুড়ি ঝুড়ি।
আরো যে-সব লিখব কথা
ভাবতে মনে বাজছে ব্যথা,
পরজন্মের নিষ্ঠুরতায়
এ জন্মে হয় অনুশোচন।
আমায় হয়তো করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

৪

তোমরা, যাঁদের বাক্য হয় না
আমার পক্ষে মুখরোচক,
তোমরা যদি পুনর্জন্মে
হও পুনর্বার সমালোচক—
আমি আমায় পাড়ব গালি,
তোমরা তখন ভাববে খালি
কলম কষে বসে বসে
প্রতিবাদের প্রতিবচন।
আমায় হয়তো করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

৫

লিখব, ইনি কবিসভায়
হংসমধ্যে বকো যথা।
তুমি লিখবে—কোন্ পাষণ্ড
বলে এমন মিথ্যা কথা।
আমি তোমায় বলব—মূঢ়,
তুমি আমায় বলবে—রূঢ়,
তার পরে যা লেখালেখি
হবে না সে রুচি-রোচন।
তুমি লিখবে কড়া জবাব
আমি কড়া সমালোচন।

৫ আষাঢ়

কবি

আমি যে বেশ সুখে আছি
    অন্তত নই দুঃখে কৃশ,
সে কথাটা পদ্যে লিখতে
    লাগে একটু বিসদৃশ।
সেই কারণে গভীর ভাবে
    খুঁজে খুঁজে গভীর চিতে
বেরিয়ে পড়ে গভীর ব্যথা
    স্মৃতি কিংবা বিস্মৃতিতে।
কিন্তু সেটা এত সুদূর
    এতই সেটা অধিক গভীর
আছে কি না আছে, তাহার
    প্রমাণ দিতে হয় না কবির।
মুখের হাসি থাকে মুখে,
    দেহের পুষ্টি পোষে দেহ,
প্রাণের ব্যথা কোথায় থাকে
    জানে না সেই খবর কেহ।

কাব্য প'ড়ে যেমন ভাব
    কবি তেমন নয় গো।
আঁধার করে রাখে নি মুখ,
দিবারাত্র ভাঙছে না বুক,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
    হাস্যমুখেই বয় গো।

ভালোবাসে ভদ্রসভায়
    ভদ্র পোশাক পরতে অঙ্গে,
ভালোবাসে ফুল্ল মুখে
    কইতে কথা লোকের সঙ্গে।
বন্ধু যখন ঠাট্টা করে,
    মরে না সে অর্থ খুঁজে,
ঠিক যে কোথায় হাসতে হবে
    একেক সময় দিব্যি বুঝে।
সামনে যখন অন্ন থাকে
    থাকে না সে অন্যমনে,
সঙ্গীদলের সাড়া পেলে
    রয় না বসে ঘরের কোণে।
বন্ধুরা কয়, লোকটা রসিক,
    কয় কি তারা মিথ্যামিথ্যি?
শত্রুরা কয়, লোকটা হালকা,
    কিছু কি তার নাইকো ভিত্তি?

কাব্য দেখে যেমন ভাব
কবি তেমন নয় গো।
চাঁদের পানে চক্ষু তুলে
রয় না পড়ে নদীর কূলে,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
মনের সুখেই বয় গো।

সুখে আছি লিখতে গেলে
লোকে বলে, প্রাণটা ক্ষুদ্র।
আশাটা এর নয়কো বিরাট,
পিপাসা এর নয়কো রুদ্র।
পাঠকদলে তুচ্ছ করে,
অনেক কথা বলে কঠোর—
বলে, একটু হেসে খেলেই
ভরে যায় এর মনের জঠর।
কবিরে তাই ছন্দে বন্ধে
বানাতে হয় দুখের দলিল।
মিথ্যা যদি হয় সে, তবু
ফেলো পাঠক চোখের সলিল।
তাহার পরে আশিস কোরো
রুদ্ধকণ্ঠে ক্ষুব্ধ বুকে,
কবি যেন আজন্মকাল
দুখের কাব্য লেখেন সুখে।

কাব্য যেমন, কবি যেন
তেমন নাহি হয় গো।
বুদ্ধি যেন একটু থাকে,
স্নানাহারের নিয়ম রাখে।
সহজ লোকের মতোই যেন
সরল গদ্য কয় গো।

৬ আষাঢ়

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

কোন্ বাণিজ্যে নিবাস তোমার
কহো আমায় ধনী,
তাহা হলে সেই বাণিজ্যের
করব মহাজনি।

দুয়ার জুড়ে কাঙাল বেশে
ছায়ার মতো চরণদেশে

কঠিন তব নূপুর ঘেঁষে
আর বসে না রইব।
এটা আমি স্থির বুঝেছি
ভিক্ষা নৈব নৈব।

যাবই আমি যাবই ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই।

২

সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি,
বসিয়ে হাজার দাঁড়,
কোন্ নগরে যাব, দিয়ে
কোন্ সাগরে পাড়ি।

কোন্ তারকা লক্ষ্য করি,
কূল-কিনারা পরিহরি,
কোন্ দিকে যে বাইব তরী
অকূল কালো নীরে।
মরব না আর ব্যর্থ আশায়
বালু-মরুর তীরে।

যাবই আমি যাবই ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই।

৩

সাগর উঠে তরঙ্গিয়া,
বাতাস বহে বেগে,
সূর্য যেথায় অস্তে নামে
ঝিলিক মারে মেঘে।

দক্ষিণে চাই উত্তরে চাই
ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই,
যদি কোথাও কূল নাহি পাই
তল পাব তো তবু।
ভিটার কোণে হতাশ মনে
রইব না আর কভু।

যাবই আমি যাবই ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই।

৪

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর-বিহঙ্গেরা।

নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে
বইছে নগ-নদী।
সোনার রেণু আনব ভরি
সেথায় নামি যদি।

যাবই আমি যাবই ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই।

৫

অকূল-মাঝে ভাসিয়ে তরী
যাচ্ছি অজানায়।
আমি শুধু একলা নেয়ে
আমার শূন্য নায়।

নব নব পবনভরে
যাব দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ করে
অপূর্ব ধন যত।
ভিখারী তোর ফিরবে যখন
ফিরবে রাজার মতো।

যাবই আমি যাবই ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই।

বিদায়-রীতি

হায় গো রানী, বিদায়-বাণী
এমনি করে শোনে?
ছি ছি ওই যে হাসিখানি
কাঁপছে আঁখিকোণে।
এতই বারে বারে কি রে
মিথ্যা বিদায় নিয়েছি রে,
ভাবছ তুমি মনে মনে
এ লোকটি নয় যাবার,
দ্বারের কাছে ঘুরে ঘুরে
ফিরে আসবে আবার।

আমায় যদি শুধাও তবে
সত্য করেই বলি
আমারো সেই সন্দেহ হয়
ফিরে আসব চলি।
বসন্তদিন আবার আসে,
পূর্ণিমা-রাত আবার হাসে,
বকুল ফোটে রিক্ত শাখায়—
এরাও তো নয় যাবার।
সহস্র বার বিদায় নিয়ে
এরাও ফেরে আবার।

একটুখানি মোহ তবু
মনের মধ্যে রাখো,
মিথ্যেটারে একেবারেই
জবাব দিয়ো নাকো।
ভ্রমক্রমে ক্ষণেকতরে
এনো গো জল আঁখির 'পরে,
আকুল স্বরে যখন কব—
সময় হল যাবার।
তখন না-হয় হেসো, যখন
ফিরে আসব আবার।

নষ্ট স্বপ্ন

কালকে রাতে মেঘের গরজনে,
রিমিঝিমি বাদল-বরিষনে
ভবতেছিলাম একা একা—
স্বপ্ন যদি যায় রে দেখা

আসে যেন তাহার মূর্তি ধ'রে
বাদলা রাতে আধেক ঘুমঘোরে।

মাঠে মাঠে বাতাস ফিরে মাতি।
বৃথা স্বপ্নে কাটল সারারাতি।
হায় রে, সত্য কঠিন ভারি,
ইচ্ছামতো গড়তে নারি—
স্বপ্ন সেও চলে আপন মতে,
আমি চলি আমার শূন্য পথে।

কালকে ছিল এমন ঘন রাত,
আকুল ধারে এমন বারিপাত,
মিথ্যা যদি মধুর রূপে
আসত কাছে চুপে চুপে
তাহা হলে কাহার হত ক্ষতি?
স্বপন যদি ধরত সে মুরতি?

একটি মাত্র

গিরিনদী বালির মধ্যে
যাচ্ছে বেঁকে বেঁকে,
একটি ধারে স্বচ্ছ ধারায়
শীর্ণ রেখা এঁকে।
মরু-পাহাড় দেশে
শুষ্ক বনের শেষে
ফিরেছিলেম দুই প্রহরে
দগ্ধ চরণতল,
বনের মধ্যে পেয়েছিলেম
একটি আঙুর ফল।

২

রৌদ্র তখন মাথার 'পরে,
পায়ের তলায় মাটি
জলের তরে কেঁদে মরে
তৃষায় ফাটি ফাটি।
পাছে ক্ষুধার ভরে
তুলি মুখের 'পরে,
আকুল ঘ্রাণে নিই নি তাহার
শীতল পরিমল।

রেখেছিলেম লুকিয়ে, আমার
একটি আঙুর ফল।

৩

বেলা যখন পড়ে এল,
রৌদ্র হল রাঙা,
নিশ্বাসিয়া উঠল হু হু
ধু ধু বালুর ডাঙা—
থাকতে দিনের আলো,
ঘরে ফেরাই ভালো,
তখন খুলে দেখনু চেয়ে
চক্ষে লয়ে জল,
মুঠির মাঝে শুকিয়ে আছে
একটি আঙুর ফল।

সোজাসুজি

হৃদয়-পানে হৃদয় টানে,
নয়ন-পানে নয়ন ছোটে,
দুটি প্রাণীর কাহিনীটা
এইটুকু বৈ নয়কো মোটে।
শুক্লসন্ধ্যা চৈত্র মাসে,
হেনার গন্ধ হাওয়ায় ভাসে,
আমার বাঁশি লুটায় ভূমে,
তোমার কোলে ফুলের পুঁজি,
তোমার আমার এই যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজাসুজি।

২

বসন্তী-রঙ বসনখানি
নেশার মতো চক্ষে ধরে,
তোমার গাঁথা যূথীর মালা
স্তুতির মতো বক্ষে পড়ে।
একটু দেওয়া একটু রাখা,
একটু প্রকাশ একটু ঢাকা,
একটু হাসি একটু শরম,
দুজনের এই বোঝাবুঝি।
তোমার আমার এই যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজাসুজি।

৩

মধুমাসের মিলন-মাঝে
  মহান কোনো রহস্য নেই,
অসীম কোনো অবোধ কথা
  যায় না বেধে মনে-মনেই।
আমাদের এই সুখের পিছু
ছায়ার মতো নাইকো কিছু,
দোঁহার মুখে দোঁহে চেয়ে
  নাই হৃদয়ের খোঁজাখুঁজি।
    মধুমাসে মোদের মিলন
      নিতান্তই এ সোজাসুজি।

৪

ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে
  খুঁজি নে ভাই ভাষাতীত,
আকাশ-পানে বাহু তুলে
  চাহি নে ভাই আশাতীত।
যেটুকু দিই, যেটুকু পাই,
তাহার বেশি আর কিছু নাই,
সুখের বক্ষ চেপে ধরে
  করি নে কেউ যোঝাযুঝি।
    মধুমাসে মোদের মিলন
      নিতান্তই এ সোজাসুজি।

৫

শুনেছিনু প্রেমের পাথার
  নাইকো তাহার কোনো দিশা,
শুনেছিনু প্রেমের মধ্যে
  অসীম ক্ষুধা অসীম তৃষা—
বীণার তন্ত্রী কঠিন টানে
ছিঁড়ে পড়ে প্রেমের তানে,
শুনেছিনু প্রেমের কুঞ্জে
  অনেক বাঁকা গলিঘুঁজি।
    আমাদের এই দোঁহার মিলন
      নিতান্তই এ সোজাসুজি।

অসাবধান

আমায় যদি মনটি দেবে
দিয়ো, দিয়ো মন।
মনের মধ্যে ভাবনা কিন্তু
রেখো সারাক্ষণ।
খোলা আমার দুয়ারখানা,
ভোলা আমার প্রাণ,
কখন যে কার আনাগোনা,
নইকো সাবধান।
পথের ধারে বাড়ি আমার,
থাকি গানের ঝোঁকে,
বিদেশী সব পথিক এসে
যেথা-সেথাই ঢোকে।
ভাঙে কতক, হারায় কতক
যা আছে মোর দামি
এমনি ক'রে একে একে
সর্বস্বান্ত আমি।

আমায় যদি মনটি দেবে—দিয়ো, দিয়ো মন।
মনের মধ্যে ভাবনা কিন্তু রেখো সারাক্ষণ।

আমায় যদি মনটি দেবে,
নিষেধ তাহে নাই,
কিছুর তরে আমায় কিন্তু
কোরো না কেউ দায়ী।
ভুলে যদি শপথ ক'রে
বলি কিছু কবে,
সেটা পালন না করি তো
মাপ করিতেই হবে।
ফাগুন মাসে পূর্ণিমাতে
যে নিয়মটা চলে,
রাগ কোরো না চৈত্র মাসে
সেটা ভঙ্গ হলে।
কোনো দিন বা পূজার সাজি
কুসুমে হয় ভরা,
কোনো দিন বা শূন্য থাকে,
মিথ্যা সে দোষ ধরা।

আমায় যদি মনটি দেবে—নিষেধ তাহে নাই,
কিছুর তরে আমায় কিন্তু কোরো না কেউ দায়ী।

আমায় যদি মনটি দেবে
রাখিয়া যাও তবে।
দিয়েছ যে সেটা কিন্তু
ভুলে থাকতে হবে।
দুটি চক্ষে বাজবে তোমার
নবরাগের বাঁশি,
কণ্ঠে তোমার উচ্ছ্বসিয়া
উঠবে হাসিরাশি।
প্রশ্ন যদি শুধাও কভু
মুখটি রাখি বুকে,
মিথ্যা কোনো জবাব পেলে
হেসো সকৌতুকে।
যে দুয়ারটা বন্ধ থাকে
বন্ধ থাকতে দিয়ো।
আপনি যাহা এসে পড়ে
তাহাই হেসে নিয়ো।

আমায় যদি মনটি দেবে—রাখিয়া যাও তবে,
দিয়েছ যে সেটা কিন্তু ভুলে থাকতে হবে।

স্বপ্নশেষ

অধিক কিছু নেই গো কিছু নেই,
কিছু নেই।
যা আছে তা এই গো শুধু এই,
শুধু এই।
যা ছিল তা শেষ করেছি
একটি বসন্তেই।
আজ যা কিছু বাকি আছে
সামান্য এই দান,
তাই নিয়ে কি রচি দিব
একটি ছোটো গান?
একটি ছোটো মালা, তোমার
হাতের হবে বালা,
একটি ছোটো ফুল, তোমার
কানের হবে দুল।
একটি তরুতলায় বসে
একটি ছোটো খেলায়

হারিয়ে দিয়ে যাবে মোরে
একটি সন্ধেবেলায়।

অধিক কিছু নেই গো কিছু নেই,
কিছু নেই।
যা আছে তা এই গো শুধু এই,
শুধু এই।
ঘাটে আমি একলা বসে রই,
ওগো আয়।
বর্ষানদী পার হবি কি ওই?
হায় গো হায়!
অকূল-মাঝে ভাসবি কে গো
ভেলার ভরসায়?
আমার তরীখান
সইবে না তুফান;
তবু যদি লীলাভরে
চরণ কর দান,
শান্ত তীরে তীরে, তোমায়
বাইব ধীরে ধীরে;
একটি কুমুদ তুলে, তোমার
পরিয়ে দেব চুলে।
ভেসে ভেসে শুনবে বসে
কত কোকিল ডাকে
কূলে কূলে কুঞ্জবনে
নীপের শাখে শাখে।
ক্ষুদ্র আমার তরীখানি—
সত্য করি কই,
হায় গো পথিক হায়,
তোমায় নিয়ে একলা নায়ে
পার হব না ওই
আকুল যমুনায়।

কূলে

আমাদের এই নদীর কূলে
নাইকো স্নানের ঘাট,
ধুধু করে মাঠ।
ভাঙা পাড়ির গায়ে শুধু
শালিখ লাখে লাখে
খোপের মধ্যে থাকে।

সকালবেলা অরুণ আলো
পড়ে জলের 'পরে,
নৌকা চলে দু-একখানি
অলস বায়ুভরে।
আঘাটাতে বসে রইলে,
বেলা যাচ্ছে বয়ে—
দাও গো মোরে কয়ে
ভাঙন-ধরা কূলে তোমার
আর কিছু কি চাই?
সে কহিল ভাই,
নাই, নাই, নাই গো আমার
কিছুতে কাজ নাই।

আমাদের এ নদীর কূলে
ভাঙা পাড়ির তল,
ধেনু খায় না জল।
দূর গ্রামের দু-একটি ছাগ
বেড়ায় চরি চরি
সারাদিবস ধরি।
জলের 'পরে বেঁকে-পড়া
খেজুর শাখা হতে
ক্ষণে ক্ষণে মাছরাঙাটি
ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতে।
ঘাসের 'পরে অশথতলে
যাচ্ছে বেলা বয়ে—
দাও আমারে কয়ে
আজকে এমন বিজন প্রাতে
আর কারে কি চাই?
সে কহিল ভাই,
নাই, নাই, নাই গো আমার
কারেও কাজ নাই।

যাত্রী

আছে, আছে স্থান!
একা তুমি, তোমার শুধু
একটি আঁটি ধান।
না-হয় হবে ঘেঁষাঘেঁষি,
এমন কিছু নয় সে বেশি,

না-হয় কিছু ভারি হবে
আমার তরীখান—
তাই বলে কি ফিরবে তুমি?
আছে, আছে স্থান!

এসো, এসো নায়ে!
ধুলা যদি থাকে কিছু
থাক্-না ধুলা পায়ে।
তনু তোমার তনুলতা,
চোখের কোণে চঞ্চলতা,
সজলনীল-জলদ-বরন
বসনখানি গায়ে।
তোমার তরে হবে গো ঠাঁই—
এসো, এসো নায়ে।

যাত্রী আছে নানা।
নানা ঘাটে যাবে তারা
কেউ কারো নয় জানা।
তুমিও গো ক্ষণেকতরে
বসবে আমার তরী-'পরে,
যাত্রা যখন ফুরিয়ে যাবে
মানবে না মোর মানা—
এলে যদি তুমিও এসো,
যাত্রী আছে নানা।

কোথা তোমার স্থান?
কোন্ গোলাতে রাখতে যাবে
একটি আঁটি ধান?
বলতে যদি না চাও, তবে
শুনে আমার কী ফল হবে,
ভাবব ব'সে খেয়া যখন
করব অবসান—
কোন্ পাড়াতে যাবে তুমি,
কোথা তোমার স্থান?

এক গাঁয়ে

আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি
সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ।
তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখি
তাহার গানে আমার নাচে বুক।

তাহার দুটি পালন-করা ভেড়া
চরে বেড়ায় মোদের বটমূলে,
যদি ভাঙে আমার খেতের বেড়া,
কোলের 'পরে নিই তাহারে তুলে।

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

দুইটি পাড়ায় বড়োই কাছাকাছি,
মাঝে শুধু একটি মাঠের ফাঁক।
তাদের বনের অনেক মধুমাছি
মোদের বনে বাঁধে মধুর চাক।
তাদের ঘাটে পূজার জবামালা
ভেসে আসে মোদের বাঁধা ঘাটে,
তাদের পাড়ার কুসুম-ফুলের ডালা
বেচতে আসে মোদের পাড়ার হাটে।

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

আমাদের এই গ্রামের গলি-'পরে
আমের বোলে ভরে আমের বন।
তাদের খেতে যখন তিসি ধরে,
মোদের খেতে তখন ফোটে শণ।
তাদের ছাদে যখন ওঠে তারা
আমার ছাদে দখিন হাওয়া ছোটে।
তাদের বনে ঝরে শ্রাবণধারা,
আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

দুই তীরে

আমি ভালোবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জনে
চকাচকির ঘর।

যেথায় ফুটে কাশ
তটের চারি পাশ,
শীতের দিনে বিদেশী সব
হাঁসের বসবাস।

কচ্ছপেরা ধীরে
রৌদ্র পোহায় তীরে,
দু-একখানি জেলের ডিঙি
সন্ধেবেলায় ভিড়ে।

আমি ভালোবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জনে
চকাচকির ঘর।

২

তুমি ভালোবাস তোমার
ওই ওপারের বন,
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

যেথায় বাঁকা গলি
নদীতে যায় চলি,
দুই ধারে তার বেণুবনের
শাখায় গলাগলি।

সকাল-সন্ধেবেলা
ঘাটে বধূর মেলা,
ছেলের দলে ঘাটের জলে
ভাসে, ভাসায় ভেলা।

তুমি ভালোবাস তোমার
ওই ওপারের বন,
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

৩

তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী,
দুই তটেরে একই গান সে
শোনায় নিরবধি।

আমি শুনি, শুয়ে
বিজন বালু-ভুঁয়ে,
তুমি শোন, কাঁখের কলস
ঘাটের 'পরে থুয়ে।

তুমি তাহার গানে
বোঝ একটা মানে,
আমার কূলে আরেক অর্থ
ঠেকে আমার কানে।

তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী,
দুই তটেরে একই গান সে
শোনায় নিরবধি।

অতিথি

ওই শোনো গো অতিথ বুঝি আজ,
এল আজ।
ওগো বধূ রাখো তোমার কাজ,
রাখো কাজ।
শুনছ না কি তোমার গৃহদ্বারে
রিনিঠিনি শিকলটি কে নাড়ে,
এমন ভরা সাঁঝ।
পায়ে পায়ে বাজিয়ো নাকো মল,
ছুটো নাকো চরণ চঞ্চল,
হঠাৎ পাবে লাজ।
ওই শোনো গো অতিথ এল আজ,
এল আজ।
ওগো বধূ রাখো তোমার কাজ,
রাখো কাজ।

২

নয় গো কভু বাতাস এ নয় নয়,
কভু নয়।
ওগো বধূ মিছে কিসের ভয়,
মিছে ভয়।
আঁধার কিছু নাইকো আঙিনাতে,
আজকে দেখো ফাগুন-পূর্ণিমাতে
আকাশ আলোময়।
না-হয় তুমি মাথার ঘোমটা টানি
হাতে নিয়ো ঘরের প্রদীপখানি,
যদি শংকা হয়।
নয় গো কভু বাতাস এ নয় নয়,
কভু নয়।
ওগো বধূ মিছে কিসের ভয়,
মিছে ভয়।

৩

না-হয় কথা কোয়ো না তার সনে,
পান্থ-সনে।
দাঁড়িয়ে তুমি থেকো একটি কোণে,
দুয়ার-কোণে।
প্রশ্ন যদি শুধায় কোনো-কিছু
নীরব থেকো মুখটি করে নিচু
নম্র দু-নয়নে।
কাঁকন যেন ঝংকারে না হাতে,
পথ দেখিয়ে আনবে যবে সাথে
অতিথি সজ্জনে।
না-হয় কথা কোয়ো না তার সনে,
পান্থ-সনে।
দাঁড়িয়ে তুমি থেকো একটি কোণে,
দুয়ার-কোণে।

৪

ওগো বধূ হয় নি তোমার কাজ?
গৃহ-কাজ?
ওই শোনো কে অতিথ এল আজ,
এল আজ।
সাজাও নি কি পূজারতির ডালা?
এখনো কি হয় নি প্রদীপ জ্বালা
গোষ্ঠ-গৃহের মাঝ?

অতি যত্নে সীমন্তটি চিরে
সিঁদুর-বিন্দু আঁক নাই কি শিরে?
হয় নি সন্ধ্যাসাজ?
ওগো বধূ হয় নি তোমার কাজ?
গৃহ-কাজ?
ওই শোনো কে অতিথ এল আজ,
এল আজ।

সংবরণ

আজকে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে,
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।
আজকে কেবল বউ-কথা-কও ডাকে
কৃষ্ণচূড়ার পুষ্প-পাগল শাখে,
আমি আছি তরুর তলায় পা মেলি,
সামনে অশোক টগর চাঁপা চামেলি।
আজকে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে,
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।

এমনিতরো বাতাস-বওয়া সকালে
নিজেরে মন হাজারো বার ঠকালে।
আপনারে হায় চিত-উদাস গানে
উড়িয়ে দিলে অজানিতের পানে,
চিরদিন যা ছিল নিজের দখলে
দিয়ে দিলে পথের পান্থ সকলে।
আজকে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।

ভেবেছি তাই আজকে কিছুই গাব না,
গানের সঙ্গে গলিয়ে প্রাণের ভাবনা।
আপনা ভুলে ওরে ভাবোন্মাদ,
দিস নে ভেঙে তোর বেদনা-বাঁধ,
মনের সঙ্গে মনের কথা গাঁথা সে।
গাব না গান আজকে দখিন বাতাসে।
আজকে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে,
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।

শিলাইদহ
২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

বিরহ

তুমি যখন চলে গেলে
তখন দুই পহর—
সূর্য তখন মাঝ-গগনে,
রৌদ্র খরতর।
ঘরের কর্ম সাঙ্গ করে
ছিলেম তখন একলা ঘরে,
আপন মনে বসে ছিলেম
বাতায়নের 'পর।
তুমি যখন চলে গেলে
তখন দুই পহর।

২

চৈত্র মাসের নানা খেতের
নানা গন্ধ নিয়ে,
আসতেছিল তপ্ত হাওয়া
মুক্ত দুয়ার দিয়ে।
দুটি ঘুঘু সারাটা দিন
ডাকতেছিল শ্রান্তিবিহীন,
একটি ভ্রমর ফিরতেছিল
কেবল গুন্‌গুনিয়ে।
চৈত্র মাসের নানা খেতের
নানা বার্তা নিয়ে।

৩

তখন পথে লোক ছিল না,
ক্লান্ত কাতর গ্রাম।
ঝাউশাখাতে উঠতেছিল
শব্দ অবিশ্রাম।
আমি শুধু একলা প্রাণে
অতি সুদূর বাঁশির তানে
গেঁথেছিলেম আকাশ ভরে
একটি কাহার নাম।
তখন পথে লোক ছিল না,
ক্লান্ত কাতর গ্রাম।

৪

ঘরে ঘরে দুয়ার দেওয়া,
আমি ছিলেম জেগে।
আবাঁধা চুল উড়তেছিল
উদাস হাওয়া লেগে।

তটতরুর ছায়ার তলে
ঢেউ ছিল না নদীর জলে,
তপ্ত আকাশ এলিয়ে ছিল
শুভ্র অলস মেঘে।
ঘরে ঘরে দুয়ার দেওয়া,
আমি ছিলেম জেগে।

৫

তুমি যখন চলে গেলে
তখন দুই পহর।
শুষ্ক পথে দগ্ধ মাঠে
রৌদ্র খরতর।
নিবিড়-ছায়া বটের শাখে
কপোত দুটি কেবল ডাকে,
একলা আমি বাতায়নে,
শূন্য শয়ন-ঘর।
তুমি যখন গেলে তখন
বেলা দুই পহর।

শিলাইদহ
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

ক্ষণেক দেখা

চলেছিলে পাড়ার পথে
কলস লয়ে কাঁখে,
একটুখানি ফিরে কেন
দেখলে ঘোমটা-ফাঁকে?
ওইটুকু যে চাওয়া,
দিল একটু হাওয়া
কোথা তোমার ওপার থেকে
আমার এপার-'পরে।
অতি দূরের দেখাদেখি
অতি ক্ষণেক-তরে।

২

আমি শুধু দেখেছিলেম
তোমার দুটি আঁখি।
ঘোমটা-ফাঁদা আঁধার-মাঝে
ত্রস্ত দুটি পাখি।

তুমি এক নিমিখে
চেয়ে আমার দিকে
পথের একটি পথিকেরে
দেখলে কতখানি,
একটুমাত্র কৌতূহলে
একটি দৃষ্টি হানি?

৩

যেমন ঢাকা ছিলে তুমি
তেমনি রইলে ঢাকা।
তোমার কাছে যেমন ছিনু
তেমনি রইনু ফাঁকা।
তবে কিসের তরে
থামলে লীলাভরে
যেতে যেতে পাড়ার পথে
কলস লয়ে কাঁখে?
একটুখানি ফিরে কেন
দেখলে ঘোমটা-ফাঁকে?

দার্জিলিং
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

অকালে

ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস
পসরা লয়ে?
সন্ধ্যা হল, ওই যে বেলা
গেল রে বয়ে।

যে-যার বোঝা মাথার 'পরে
ফিরে এল আপন ঘরে,
একাদশীর খণ্ড শশী
উঠল পল্লীশিরে।
পারের গ্রামে যারা থাকে
উচ্চকণ্ঠে নৌকা ডাকে,
হাহা করে প্রতিধ্বনি
নদীর তীরে তীরে।

কিসের আশে ঊর্ধ্বশ্বাসে
এমন সময়ে
ভাঙা হাটে তুই ছুটেছিস
পসরা লয়ে?

সূর্য্য দিল বনের শিরে
হস্ত বুলায়ে,
কা কা ধ্বনি থেমে গেল
কাকের কুলায়ে।

বেড়ার ধারে পুকুর-পাড়ে
ঝিল্লি ডাকে ঝোপে ঝাড়ে,
বাতাস ধীরে পড়ে এল,
স্তব্ধ বাঁশের শাখা।
হেরো ঘরের আঙিনাতে
শ্রান্তজনে শয়ন পাতে,
সন্ধ্যাপ্রদীপ আলোক ঢালে
বিরাম-সুধা-মাখা।

সকল চেষ্টা শান্ত যখন
এমন সময়ে
ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস
পসরা লয়ে?

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

আষাঢ়

নীল নবঘনে আষাঢ়-গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো আজ তোরা যাস নে, ঘরের
বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,
আউশের খেত জলে ভর-ভর,
কালি-মাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে, দেখ্ চাহি রে।
ওগো আজ তোরা যাস নে ঘরের
বাহিরে।

২

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘনঘন,
ধবলীরে আনো গোহালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি?

রাখাল বালক কী জানি কোথায়
সারাদিন আজি খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে।

৩

শোনো শোনো ওই পারে যাবে ব'লে
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে?
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে।
পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দু-কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদরবেগে জলে পড়ি জল
ছলছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে।

৪

ওগো আজ তোরা যাস নে গো তোরা
যাস নে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর
নাহি রে।
ঝরঝরধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ওই বেণুবন দুলে ঘনঘন
পথপাশে দেখ্‌ চাহি রে।
ওগো আজ তোরা যাস নে ঘরের
বাহিরে।

২০ জ্যৈষ্ঠ

দুই বোন

দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আনতে?
দেখেছে কি তারা পথিক কোথায়
দাঁড়িয়ে পথের প্রান্তে?
ছায়ায় নিবিড় বনে
যে আছে আঁধার কোণে

তারে যে কখন কটাক্ষে চায়
  কিছু তো পারি নে জানতে।
    দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
      যায় যবে জল আনতে?

দুটি বোন তারা করে কানাকানি
  কী না জানি জল্পনা।
গুঞ্জনধ্বনি দূরে হতে শুনি,
  কী গোপন মন্ত্রণা?
  আসে যবে এইখানে
  চায় দোঁহে দোঁহাপানে,
কাহারো মনের কোনো কথা তারা
  করেছে কি কল্পনা?
    দুটি বোন তারা করে কানাকানি
      কী না জানি জল্পনা।

এইখানে এসে ঘট হতে কেন
  জল উঠে উচ্ছলি?
চপল চক্ষে তরল তারকা
  কেন উঠে উজ্জ্বলি?
  যেতে যেতে নদীপথে
  জেনেছে কি কোনোমতে
কাছে কোথা এক আকুল হৃদয়
  দুলে উঠে চঞ্চলি?
    এইখানে এসে ঘট হতে জল
      কেন উঠে উচ্ছলি?

দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
  যায় যবে জল আনতে?
বটের ছায়ায় কেহ কি তাদের
  পড়েছে চোখের প্রান্তে?
  কৌতুকে কেন ধায়
  সচকিত দ্রুত পায়?
কলসে কাঁকন ঝলকি ঝনকি
  ভোলায় রে দিক্‌ভ্রান্তে।
    দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
      যায় যবে জল আনতে?

শিলাইদহ
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

নববর্ষা

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।
শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ।
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে।

গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।
ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরি ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে
নয়নে লেগেছে।
নবতৃণদলে ঘনবনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপ-নিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে।

ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে
কবরী এলায়ে?
ওগো নবঘন-নীলবাসখানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি?
তড়িৎ-শিখার চকিত আলোকে
ওগো কে ফিরিছে খেলায়ে?
ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে?

ওগো নদীকূলে তীর-তৃণতলে
কে ব'সে অমল বসনে
শ্যামল বসনে?
সুদূর গগনে কাহারে সে চায়?
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়?
নবমালতীর কচি দলগুলি
আনমনে কাটে দশনে।
ওগো নদীকূলে তীর-তৃণতলে
কে ব'সে শ্যামল বসনে?

ওগো নির্জনে বকুলশাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে
দোদুল দুলিছে?
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক
কবরী খসিয়া খুলিছে।
ওগো নির্জনে বকুলশাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে?

বিকচ-কেতকী তটভূমি-'পরে
কে বেঁধেছে তার তরণী
তরুণ তরণী?
রাশি রাশি তুলি শৈবালদল
ভরিয়া লয়েছে লোল অঞ্চল,
বাদল-রাগিণী সজল নয়নে
গাহিছে পরান-হরণী।
বিকচ-কেতকী তটভূমি-'পরে
বেঁধেছে তরুণ তরণী।

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।
ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে,
তীর ছাপি নদী কল-কল্লোলে
এল পল্লীর কাছে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে।

শিলাইদহ
২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

দুর্দিন

এতদিন পরে প্রভাতে এসেছ
কী জানি কী ভাবি মনে।
ঝড় হয়ে গেছে কাল রজনীতে
রজনীগন্ধার বনে।
কাননের পথ ভেসে গেছে জলে
বেড়াগুলি ভেঙে পড়েছে ভূতলে,
নব ফুটন্ত ফুলের দণ্ড
লুটায় তৃণের সনে।
এতদিন পরে তুমি যে এসেছ
কী জানি কী ভাবি মনে।

২

হেরো গো আজিও প্রভাত-অরুণ
মেঘের আড়ালে হারা।
রহি রহি আজো ঘনায়ে ঘনায়ে
ঝরিছে বাদল-ধারা।
মাতাল বাতাস আজো থাকি থাকি
চেতিয়া চেতিয়া উঠে ডাকি ডাকি,
জড়িত পাখায় সিক্ত শাখায়
দোয়েল দেয় না সাড়া।
আজিও আঁধার প্রভাতে অরুণ
মেঘের আড়ালে হারা।

৩

এ ভরা বাদলে আর্দ্র আঁচলে
একেলা এসেছ আজি,
এনেছ বহিয়া রিক্ত তোমার
পূজার ফুলের সাজি।
এত মধুমাস গেছে বার বার,
ফুলের অভাব ঘটে নি তোমার
বন আলো করি ফুটেছিল যবে
রজনীগন্ধারাজি।
এ ভরা বাদলে আর্দ্র আঁচলে
একেলা এসেছ আজি।

৪

আজি তরুতলে দাঁড়ায়েছে জল,
কোথা বসিবার ঠাঁই?
কাল যাহা ছিল সে ছায়া সে আলো
সে গন্ধগান নাই।

তবু ক্ষণকাল রহো স্বরাহীন,
ছিন্ন কুসুম পঙ্কে মলিন
ভূতল হইতে যতনে তুলিয়া
ধুয়ে ধুয়ে দিব তাই।
আজি তরুতলে দাঁড়ায়েছে জল,
কোথা বসিবার ঠাঁই?

৫

এতদিন পরে তুমি যে এসেছ
কী জানি কী ভাবি মনে।
প্রভাত আজিকে অরুণবিহীন,
কুসুম লুটায় বনে।
যাহা আছে লও প্রসন্ন করে,
ও সাজি তোমার ভরে কি না ভরে,
ওই যে আবার নামে বারিধার
ঝরঝর বরষনে।
এতদিন পরে তুমি যে এসেছ
কী জানি কী ভাবি মনে।

১ আষাঢ়

অবিনয়

হে নিরুপমা,
চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে
করিয়ো ক্ষমা।
এল আষাঢ়ের প্রথম দিবস,
বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,
বকুল-বীথিকা মুকুলে মত্ত
কানন-'পরে—
নব কদম্ব মদিরগন্ধে
আকুল করে।

হে নিরুপমা,
আঁখি যদি আজ করে অপরাধ,
করিয়ো ক্ষমা।
হেরো আকাশের দূর কোণে কোণে
বিজুলি চমকি ওঠে খনে খনে,
বাতায়নে তব দ্রুত কৌতুকে
মারিছে উঁকি।
বাতাস করিছে দুরন্তপনা
অঞ্চল টানি।

হে নিরুপমা,
গানে যদি লাগে বিহ্বল তান
করিয়ো ক্ষমা।
ঝরঝর ধারা আজি উতরোল,
নদী-কূলে কূলে উঠে কল্লোল,
বনে বনে গাহে মর্মরস্বরে
নবীন পাতা—
সজল পবন দিশে দিশে তুলে
বাদল-গাথা।

হে নিরুপমা,
আজিকে আচারে ত্রুটি হতে পারে,
করিয়ো ক্ষমা।
দিবালোকহারা সংসারে আজ
কোনোখানে কারো নাহি কোনো কাজ,
জনহীন পথ ধেনুহীন মাঠ
যেন সে আঁকা।
বর্ষণ-ঘন শীতল আঁধারে
জগৎ ঢাকা।

হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে
করিয়ো ক্ষমা।
তোমার দুখানি কালো আঁখি-'পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে,
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে
যূথীর মালা।
তোমারি ললাটে নববরষার
বরণডালা।

১ আষাঢ়

কৃষ্ণকলি

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে,
মুক্তবেণী পিঠের 'পরে লোটে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

ঘন মেঘে আঁধার হল দেখে
ডাকতেছিল শ্যামল দুটি গাই,
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে
কুটীর হতে ত্রস্ত এল তাই।
আকাশ-পানে হানি যুগল ভুরু
শুনলে বারেক মেঘের গুরু গুরু।
কালো? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

পুবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে,
ধানের খেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ।
আলের ধারে দাঁড়িয়েছিলেম একা,
মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।
আমার পানে দেখলে কিনা চেয়ে
আমিই জানি আর জানে সে মেয়ে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

এমনি করে কালো কাজল মেঘ
জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে।
এমনি করে কালো কোমল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমাল বনে।
এমনি করে শ্রাবণ রজনীতে
হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
আর যা বলে বলুক অন্য লোক।
দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
মাথার 'পরে দেয় নি তুলে বাস,
লজ্জা পাবার পায় নি অবকাশ।
কালো? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

৯ আষাঢ়

ভর্ৎসনা

মিথ্যা আমায় কেন শরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে?
আমি তোমার পাড়ার প্রান্ত দিয়ে
চলেছিলেম আপন গৃহদ্বারে।
যেথা আমার বাঁধা ঘাটের কাছে
দুটি চাঁপায় ছায়া করে আছে,
জামের শাখা ফলে-আঁধার-করা
স্বচ্ছগভীর পদ্মদিঘির ধারে।
তুমি আমায় কেন শরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে?

২

আজ তো আমি মাটির পানে চেয়ে
দীনবেশে যাই নি তোমার ঘরে।
অতিথ হয়ে দিই নি দ্বারে সাড়া,
ভিক্ষাপাত্র নিই নি কাতর-করে।
আমি আমার পথে যেতে যেতে
তোমার ঘরের দ্বারের বাহিরেতে
ঘনশ্যামল তমালতরুমূলে
দাঁড়িয়েছি এই দণ্ড-দুয়ের তরে।
নতশিরে দুখানি হাত জুড়ি
দীনবেশে যাই নি তোমার ঘরে।

৩

আমি তোমার ফুল্ল পুষ্পবনে
তুলি নাই তো যূথীর একটি দল।
আমি তোমার ফলের শাখা হতে
ক্ষুধাভরে ছিঁড়ি নাই তো ফল।
আছি শুধু পথের প্রান্তদেশে,
দাঁড়ায় যেথা সকল পান্থ এসে,
নিয়েছি এই শুধু গাছের ছায়া
পেয়েছি এই তরুণ তৃণতল।
আমি তোমার ফুল্ল পুষ্পবনে
তুলি নাই তো যূথীর একটি দল।

৪

শ্রান্ত বটে আছে চরণ মম,
পথের পঙ্ক লেগেছে দুই পায়।
আষাঢ়-মেঘে হঠাৎ এল ধারা
আকাশ-ভাঙা বিপুল বরষায়।

ঝোড়ো হাওয়ার এলোমেলো তালে
উঠল নৃত্য বাঁশের ডালে ডালে,
ছুটল বেগে ঘন মেঘের শ্রেণী
ভগ্নরণে ছিন্নকেতুর প্রায়।
শ্রান্ত বটে আছে চরণ মম,
পথের পঙ্ক লেগেছে দুই পায়।

৫

কেমন করে জানব মনে আমি
কী যে আমায় ভাবলে মনে মনে?
কাহার লাগি একলা ছিলে বসে
মুক্তকেশে আপন বাতায়নে?
তড়িৎ-শিখা ক্ষণিক দীপ্তালোকে
হানতেছিল চমক তোমার চোখে,
জানত কে বা দেখতে পাবে তুমি
আছি আমি কোথায় যে কোন্ কোণে।
কেমন করে জানব মনে আমি
আমায় কী যে ভাবলে মনে মনে?

৬

বুঝি গো দিন ফুরিয়ে গেল আজি,
এখনো মেঘ আছে আকাশ ভরে।
থেমে এল বাতাস বেণুবনে,
মাঠের 'পরে বৃষ্টি এল ধরে।
তোমার ছায়া দিলেম তবে ছাড়ি,
লও গো তোমার ভূমি-আসন কাড়ি,
সন্ধ্যা হল দুয়ার করো রোধ,
যাব আমি আপন পথ-'পরে।
বুঝি গো দিন ফুরিয়ে গেল আজি,
এখনো মেঘ আছে আকাশ ভরে।

৭

মিথ্যা আমায় কেন শরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে?
আছে আমার নতুন-ছাওয়া ঘর
পাড়ার পরে পদ্মদিঘির ধারে।

কুটীরতলে দিবস হলে গত
জ্বলে প্রদীপ ধ্রুবতারার মতো,
আমি কারো চাই নে কোনো দান
কাঙাল বেশে কোনো ঘরের দ্বারে।
মিথ্যা আমায় কেন শরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে?

শিলাইদহ
৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

সুখদুঃখ

বসেছে আজ রথের তলায়
স্নানযাত্রার মেলা।
সকাল থেকে বাদল হল
ফুরিয়ে এল বেলা।
আজকে দিনের মেলামেশা,
যত খুশি, যতই নেশা
সবার চেয়ে আনন্দময়
ওই মেয়েটির হাসি।
এক পয়সায় কিনেছে ও
তালপাতার এক বাঁশি।
বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি
আনন্দস্বরে।
হাজার লোকের হর্ষধ্বনি
সবার উপরে।

ঠাকুরবাড়ি ঠেলাঠেলি
লোকের নাহি শেষ।
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায়
ভেসে যায় রে দেশ।
আজকে দিনের দুঃখ যত
নাই রে দুঃখ উহার মতো,
ওই যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান-পানে চাহি,
একটি রাঙা লাঠি কিনবে
একটি পয়সা নাহি।

চেয়ে আছে নিমেষহারা,
নয়ন অরুণ।
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ।

শিলাইদহ
৩১ জ্যৈষ্ঠ। স্নানযাত্রা

খেলা

মনে পড়ে সেই আষাঢ়ে
ছেলেবেলা,
নালার জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতার ভেলা।
বৃষ্টি পড়ে দিবস রাতি,
ছিল না কেউ খেলার সাথী,
একলা বসে পেতেছিলেম
সাধের খেলা।
নালার জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতার ভেলা।

হঠাৎ হল দ্বিগুণ আঁধার
ঝড়ের মেঘে,
হঠাৎ বৃষ্টি নামল কখন
দ্বিগুণ বেগে।
ঘোলা জলের স্রোতের ধারা
ছুটে এল পাগল-পারা
পাতার ভেলা ডুবল নালার
তুফান লেগে।
হঠাৎ বৃষ্টি নামল যখন
দ্বিগুণ বেগে।

সেদিন আমি ভেবেছিলেম
মনে মনে,
হত বিধির যত বিবাদ
আমার সনে।
ঝড় এল যে আচম্বিতে
পাতার ভেলা ডুবিয়ে দিতে,

আর কিছু তার ছিল না কাজ
ত্রিভুবনে।
হত বিধির যত বিবাদ
আমার সনে।

আজ আষাঢ়ে একলা ঘরে
কাটল বেলা,
ভাবতেছিলেম এত দিনের
নানান খেলা।
ভাগ্য-'পরে করিয়া রোষ
দিতেছিলেম বিধিরে দোষ।
পড়ল মনে নালার জলে
পাতার ভেলা।
ভাবতেছিলেম এত দিনের
নানান খেলা।

৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

কৃতার্থ

এখনো ভাঙে নি ভাঙে নি মেলা,
নদীর তীরের মেলা।
এ শুধু আষাঢ়-মেঘের আঁধার,
এখনো রয়েছে বেলা।
ভেবেছিনু দিন মিছে গোঙালেম,
যাহা ছিল বুঝি সবই খোয়ালেম,
আছে আছে তবু আছে ভাই, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে আজ ঘটে নাই
কেবলি ফাঁকি।

২

বেচিবার যাহা বেচা হয়ে গেছে
কিনিবার যাহা কেনা,
আমি তো চুকিয়ে দিয়েছি নিয়েছি
সকল পাওনা দেনা।
দিন না ফুরাতে ফিরিব এখন;
প্রহরী চাহিছ পসরার পণ?
ভয় নাই ওগো আছে আছে, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
কেবলি ফাঁকি।

৩

কখন বাতাস মাতিয়া আবার
 মাথায় আকাশ ভাঙে।
কখন সহসা নামিবে বাদল
 তুফান উঠিবে গাঙে।
তাই ছুটাছুটি চলিয়াছি ধেয়ে;
পারানির কড়ি চাহ তুমি নেয়ে?
কিসের ভাবনা, আছে আছে, কিছু
 রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
 কেবলি ফাঁকি।

৪

ধানখেত বেয়ে বাঁকা পথখানি,
 গিয়েছে গ্রামের পারে।
বৃষ্টি আসিতে দাঁড়িয়েছিলেম
 নিরালা কুটীরদ্বারে।
থামিল বাদল, চলিনু এবার—
হে দোকানি চাও মূল্য তোমার?
ভয় নাই ভাই আছে আছে, কিছু
 রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
 সকলি ফাঁকি।

৫

পথের প্রান্তে বটের তলায়
 বসে আছ এইখানে—
হায় গো ভিখারী চাহিছ কাতরে
 আমারো মুখের পানে!
ভাবিতেছ মনে বেচাকেনা সেরে
কত লাভ করে চলিয়াছে কে রে!
আছে আছে বটে আছে ভাই, কিছু
 রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
 সকলি ফাঁকি।

৬

আঁধার রজনী, বিজন এ পথ,
 জোনাকি চমকে গাছে।
কে তুমি আমার সঙ্গ ধরেছ,
 নীরবে চলেছ পাছে?

এ-ক'টি কড়ির মিছে ভার বওয়া,
তোমাদের প্রথা কেড়েকুড়ে লওয়া।
হবে না নিরাশ, আছে আছে, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
কেবলি ফাঁকি।

৭

নিশি দু-পহর পঁহুছিনু ঘর
দু-হাত রিক্ত করি।
তুমি আছ একা সজল নয়নে
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি।
চোখে ঘুম নাই, কথা নাই মুখে,
ভীত পাখি-সম এলে মোর বুকে।
আছে আছে বিধি, এখনো অনেক
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
সকলি ফাঁকি।

২ আষাঢ়

স্থায়ী-অস্থায়ী

তুলেছিলেম কুসুম তোমার
হে সংসার, হে লতা,
পরতে মালা বিঁধল কাঁটা
বাজল বুকে ব্যথা।
হে সংসার, হে লতা।
বেলা যখন প'ড়ে এল
আঁধার এল ছেয়ে,
দেখি তখন চেয়ে
তোমার গোলাপ গেছে, আছে
আমার বুকের ব্যথা।
হে সংসার, হে লতা।

আরো তোমার অনেক কুসুম
ফুটবে যথা-তথা,
অনেক গন্ধ অনেক মধু
অনেক কোমলতা।
হে সংসার, হে লতা।

সে ফুল তোলার সময় তো আর
নাহি আমার হাতে।
আজকে আঁধার রাতে
আমার গোলাপ গেছে, কেবল
আছে বুকের ব্যথা।
হে সংসার, হে লতা।

রেলগাড়ি। দার্জিলিং-পথে
৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

উদাসীন

হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি,
ছুটি নে কাহারো পিছুতে,
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই
কিছুতে।
নির্ভয়ে ধাই সুযোগ-কুযোগ বিছুরি,
খেয়াল-খবর রাখি নে তো কোনো-কিছুরি,
উপরে চড়িতে যদি নাই পাই সুবিধা
সুখে পড়ে থাকি নিচুতেই, থাকি
নিচুতে।
হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি
ছুটি নে কাহারো পিছুতে,
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই
কিছুতে।

২

যেথা-সেথা ধাই, যাহা-তাহা পাই
ছাড়ি নেকো ভাই ছাড়ি নে।
তাই ব'লে কিছু কাড়াকাড়ি ক'রে
কাড়ি নে।
যাহা যেতে চায় ছেড়ে দিই তারে তখুনি,
বকি নে কারেও, শুনি নে কাহারো বকুনি,
কথা যত আছে মনের তলায় তলিয়ে
ভুলেও কখনো সহসা তাদের
নাড়ি নে।
যেথা-সেথা ধাই, যাহা-তাহা পাই
ছাড়ি নেকো ভাই, ছাড়ি নে।
তাই ব'লে কিছু তাড়াতাড়ি ক'রে
কাড়ি নে।

৩

মন-দেয়া-নেয়া অনেক করেছি,
মরেছি হাজার মরণে,
নূপুরের মতো বেজেছি চরণে-
চরণে।
আঘাত করিয়া ফিরেছি দুয়ারে দুয়ারে,
সাধিয়া মরেছি ইঁহারে তাঁহারে উঁহারে,
অশ্রু গাঁথিয়া রচিয়াছি কত মালিকা,
রাঙিয়াছি তাহা হৃদয়-শোণিত-
বরনে।
মন-দেয়া-নেয়া অনেক করেছি,
মরেছি হাজার মরণে,
নূপুরের মতো বেজেছি চরণে-
চরণে।

৪

এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি
মন ফেলে তাই ছুটেছি।
তাড়াতাড়ি করে খেলাঘরে এসে
জুটেছি।
বুকভাঙা বোঝা নেব না রে আর তুলিয়া,
ভুলিবার যাহা একেবারে যাব ভুলিয়া,
যাঁর বেড়ি তাঁরে ভাঙা বেড়িগুলি ফিরায়ে
বহুদিন পরে মাথা তুলে আজ
উঠেছি।
এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি
মন ফেলে তাই ছুটেছি।
তাড়াতাড়ি করে খেলাঘরে এসে
জুটেছি।

৫

কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত
আগে পড়িত না নয়নে—
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম
চয়নে।
মধুকর-সম ছিনু সঞ্চয়-প্রয়াসী,
কুসুম-কান্তি দেখি নাই, মধু-পিয়াসী,
বকুল কেবল দলিত করেছি আলসে,
ছিলাম যখন নিলীন বকুল-
শয়নে।

কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত
আগে পড়িত না নয়নে—
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম
চয়নে।

৬

দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি
মন নাহি মোর কিছুতে,
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারি
পিছুতে।
সবলে কারেও ধরি নে বাসনা-মুঠিতে,
দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে—
যখনি ছেড়েছি উচ্চে উঠার দুরাশা
হাতের নাগালে পেয়েছি সবারে
নিচুতে।
দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি
মন নাহি মোর কিছুতে,
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারি
পিছুতে।

যৌবন-বিদায়

ওগো যৌবন-তরী,
এবার বোঝাই সাঙ্গ করে দিলেম বিদায় করি।
কতই খেয়া, কতই খেয়াল,
কতই-না দাঁড়-বাওয়া,
তোমার পালে লেগেছিল
কত দখিন হাওয়া।
কত ঢেউয়ের টল্‌মলানি,
কত স্রোতের টান,
পূর্ণিমাতে সাগর হতে
কত পাগল বান।
এপার হতে ওপার ছেয়ে
ঘন মেঘের সারি,
শ্রাবণ-দিনে ভরা গাঙে
দু-কূল হারা পাড়ি।
অনেক খেলা অনেক মেলা,
সকলি শেষ ক'রে
চল্লিশেরই ঘাটের থেকে
বিদায় দিনু তোরে।

ওগো তরুণ তরী,
যৌবনেরই শেষ ক'টি গান দিনু বোঝাই করি।
সে-সব দিনের কান্না হাসি,
সত্য মিথ্যা ফাঁকি,
নিঃশেষিয়ে যাস রে নিয়ে—
রাখিস নে আর বাকি।
নোঙর দিয়ে বাঁধিস নে আর,
চাহিস নে আর পাছে,
ফিরে ফিরে ঘুরিস নে আর
ঘাটের কাছে কাছে।
এখন হতে ভাঁটার স্রোতে
ছিন্ন পালটি তুলে,
ভেসে যা রে স্বপ্ন-সমান
অস্তাচলের কূলে।
সেথায় সোনা-মেঘের ঘাটে
নামিয়ে দিয়ো শেষে
বহুদিনের বোঝা তোমার
চিরনিদ্রার দেশে।

ওরে আমার তরী,
পারে যাবার উঠল হাওয়া ছোট্ রে ত্বরা করি।
যেদিন খেয়া ধরেছিলেম
ছায়া-বটের ধারে,
ভোরের সুরে ডেকেছিলেম
কে যাবি আয় পারে।
ভেবেছিলেম ঘাটে ঘাটে
করতে আনাগোনা
এমন চরণ পড়বে নায়ে
নৌকো হবে সোনা।
এতবারের পারাপারে—
এত লোকের ভিড়ে
সোনা-করা দুটি চরণ
দেয় নি পরশ কি রে?
যদি চরণ পড়ে থাকে
কোনো একটি বারে—
যা রে সোনার জন্ম নিয়ে
সোনার মৃত্যু-পারে।

শেষ হিসাব

সন্ধ্যা হয়ে এল, এবার
সময় হল হিসাব নেবার।
যে দেব্‌তারে গড়েছিলেম,
দ্বারে যাঁদের পড়েছিলেম,
আয়োজনটা করেছিলেম
জীবন দিয়ে চরণ-সেবার,
তাঁদের মধ্যে আজ সায়াহ্নে
কে বা আছেন এবং কে নেই.
কেই বা বাকি কেই বা ফাঁকি.
ছুটি নেব সেইটে জেনেই।

২

নাই বা জানলি হায় রে মূর্খ।
কী হবে তোর হিসাব সূক্ষ্ম।
সন্ধ্যা এল, দোকান তোলো,
পারের নৌকা তৈরি হল,
যত পার ততই ভোলো
বিফল সুখের বিরাট দুঃখ।
জীবনখানা খুললে তোমার
শূন্য দেখি শেষের পাতা—
কী হবে ভাই হিসেব নিয়ে,
তোমার নয়কো লাভের খাতা।

৩

আপ্‌নি আঁধার ডাকছে তোরে,
ঢাকছে তোমায় দয়া ক'রে।
তুমি তবে কেনই জ্বাল
মিট্‌মিটে ওই দীপের আলো,
চক্ষু মুদে থাকাই ভালো
শ্রান্ত, পথের প্রান্তে পড়ে।
জানাজানির সময় গেছে,
বোঝাপড়া কর্‌ রে বন্ধ।
অন্ধকারের স্নিগ্ধ কোলে
থাক্‌ রে হয়ে বধির অন্ধ।

৪

যদি তোমায় কেউ না রাখে,
সবাই যদি ছেড়েই থাকে—
জনশূন্য বিশাল ভবে
একলা এসে দাঁড়াও তবে,

তোমার বিশ্ব উদার রবে
হাজার সুরে তোমায় ডাকে।
আঁধার রাতে নির্নিমেষে
দেখতে দেখতে যাবে দেখা,
তুমি একা জগৎ-মাঝে,
প্রাণের মাঝে আরেক একা।

৫

ফুলের দিনে যে মঞ্জরী,
ফলের দিনে যাক সে ঝরি।
মরিস নে আর মিথ্যে ভেবে,
বসন্তেরই অন্তে এবে
যারা যারা বিদায় নেবে
একে একে যাক রে সরি।
হোক রে তিক্ত মধুর কণ্ঠ,
হোক রে রিক্ত কল্পলতা।
তোমার থাকুক পরিপূর্ণ
একলা থাকার সার্থকতা।

শেষ

থাকব না ভাই থাকব না কেউ,
থাকবে না ভাই কিছু।
সেই আনন্দে যাও রে চলে
কালের পিছু পিছু।
অধিক দিন তো বইতে হয় না
শুধু একটি প্রাণ।
অনন্ত কাল একই কবি
গায় না একই গান।
মালা বটে শুকিয়ে মরে—
যে জন মালা পরে
সেও তো নয় অমর, তবে
দুঃখ কিসের তরে?
থাকব না ভাই থাকব না কেউ,
থাকবে না ভাই কিছু।
সেই আনন্দে যাও রে চলে
কালের পিছু পিছু।

২

সবই হেথায় একটা কোথাও
করতে হয় রে শেষ,
গান থামিলে তাই তো কানে
থাকে গানের রেশ।
কাটলে বেলা সাধের খেলা
সমাপ্ত হয় বলে
ভাবনাটি তার মধুর থাকে
আকুল অশ্রুজলে।
জীবন অস্তে যায় চলি, তাই
রঙটি থাকে লেগে,
প্রিয়জনের মনের কোণে
শরৎ-সন্ধ্যা-মেঘে।
থাকব না ভাই থাকব না কেউ,
থাকবে না ভাই কিছু।
সেই আনন্দে যাও রে ধেয়ে
কালের পিছু পিছু।

৩

ফুল তুলি তাই তাড়াতাড়ি,
পাছে ঝ'রেই পড়ে।
সুখ নিয়ে তাই কাড়াকাড়ি,
পাছে যায় সে সরে।
রক্ত নাচে দ্রুতচ্ছন্দে
চক্ষে তড়িৎ ভায়,
চুম্বনেরে কেড়ে নিতে
অধর ধেয়ে যায়।
সমস্ত প্রাণ জাগে রে তাই
বক্ষ-দোলায় দোলে—
বাসনাতে ঢেউ উঠে যায়
মত্ত আকুল রোলে।
থাকব না ভাই থাকব না কেউ,
থাকবে না ভাই কিছু।
সেই আনন্দে চল্‌ রে ছুটে
কালের পিছু পিছু।

৪

কোনো জিনিস চিনব যে রে,
প্রথম থেকে শেষ,
নেব যে সব বুঝে পড়ে—
নাই সে সময় লেশ।

জগৎটা যে জীর্ণ মায়া
সেটা জানার আগে
সকল স্বপ্ন কুড়িয়ে নিয়ে
জীবন-রাত্রি ভাগে।
ছুটি আছে শুধু দুদিন
ভালোবাসার মতো,
কাজের জন্যে জীবন হলে
দীর্ঘজীবন হত।
থাকব না ভাই থাকব না কেউ,
থাকবে না ভাই কিছু।
সেই আনন্দে চল্ রে ছুটে
কালের পিছু পিছু।

৫

আজ তোমাদের যেমন জানছি
তেমনি জানতে জানতে,
ফুরায় যেন সকল জানা
যাই জীবনের প্রান্তে।
এই যে নেশা লাগল চোখে
এইটুকু যেই ছোটে
অমনি যেন সময় আমার
বাকি না রয় মোটে।
জ্ঞানের চক্ষু স্বর্গে গিয়ে
যায় যদি যাক খুলি,
মর্তে যেন না ভেঙে যায়
মিথ্যে মায়াগুলি।
থাকব না ভাই থাকব না কেউ,
থাকবে না ভাই কিছু।
সেই আনন্দে চল্ রে ধেয়ে
কালের পিছু পিছু।

বিলম্বিত

অনেক হল দেরি,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

তখন ছিল দখিন হাওয়া
আধ-ঘুমো আধ-জাগা,
তখন ছিল সর্ষে-খেতে
ফুলের আগুন লাগা,

তখন আমি মালা গেঁথে
পদ্মপাতায় ঢেকে
পথে বাহির হয়েছিলেম
রুদ্ধ কুটীর থেকে।

অনেক হল দেরি,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

২

বসন্তের সে মালা
আজ কি তেমন গন্ধ দেবে
নবীন সুধা-ঢালা?

আজকে বহে পুবে বাতাস,
মেঘে আকাশ জুড়ে,
ধানের খেতে ঢেউ উঠেছে
নব-নবাঙ্কুরে।
হাওয়ায় হাওয়ায় নাইকো রে হায়
হালকা সে হিল্লোল,
নাই বাগানে হাস্যে গানে
পাগল গণ্ডগোল।

অনেক হল দেরি,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

৩

হল কালের ভুল,
পুবে হাওয়ায় ধরে দিলেম
দখিন হাওয়ার ফুল।

এখন এল অন্য সুরে
অন্য গানের পালা,
এখন গাঁথো অন্য ফুলে
অন্য ছাঁদের মালা।
বাজছে মেঘের গুরু গুরু,
বাদল ঝরঝর,
সজল বায়ে কদম্ববন
কাঁপছে থরথর।

অনেক হল দেরি,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

মেঘমুক্ত

ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে,
আয় গো আয়।
কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনের
ভিজে পাতায়।
ঝিকিঝিকি করি কাঁপিতেছে বট,
ওগো ঘাটে আয়, নিয়ে আয় ঘট,
পথের দু-ধারে শাখে শাখে আজি
পাখিরা গায়।
ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে,
আয় গো আয়।

২

তোমাদের সেই ছায়া-ঘেরা দিঘি,
না আছে তল—
কূলে কূলে তার ছেপে ছেপে আজি
উঠেছে জল।
এ-ঘাট হইতে ও-ঘাটে তাহার
কথা-বলাবলি নাহি চলে আর,
একাকার হল তীরে আর নীরে
তাল-তলায়।
আজ ভোর হতে নাই গো বাদল,
আয় গো আয়।

৩

ঘাটে পইঠায় বসিব বিরলে
ডুবায়ে গলা,
হবে পুরাতন প্রাণের কথাটি
নূতন বলা।
সে কথার সাথে রেখে রেখে মিল
থেকে থেকে ডেকে উঠিবে কোকিল,
কানাকানি করে ভেসে যাবে মেঘ
আকাশ-গায়।
আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল,
আয় গো আয়।

৪

তপন-আতপে আতপ্ত হয়ে
উঠেছে বেলা;
খঞ্জন দুটি আলস্যভরে
ছেড়েছে খেলা।
কলস পাকড়ি আঁকড়িয়া বুকে
ভরা জলে তোরা ভেসে যাবি সুখে,
তিমির-নিবিড় ঘনঘোর ঘুমে
স্বপনপ্রায়।
আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল,
আয় গো আয়।

৫

মেঘ ছুটে গেল নাই গো বাদল,
আয় গো আয়।
আজিকে সকালে শিথিল কোমল
বহিছে বায়।
পতঙ্গ যেন ছবিসম আঁকা
শৈবাল-'পরে মেলে আছে পাখা,
জলের কিনারে বসে আছে বক
গাছের ছায়।
আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল,
আয় গো আয়।

শিলাইদহ
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

চিরায়মানা

যেমন আছ তেমনি এসো
আর কোরো না সাজ।
বেণী না হয় এলিয়ে রবে,
সিঁথে না হয় বাঁকা হবে,
নাই বা হল পত্রলেখায়
সকল কারুকাজ।
কাঁচল যদি শিথিল থাকে
নাইকো তাহে লাজ।
যেমন আছ তেমনি এসো,
আর কোরো না সাজ।

এসো দ্রুত চরণ দুটি
তৃণের 'পরে ফেলে।
ভয় কোরো না, অলক্তরাগ
মোছে যদি মুছিয়া যাক,
নূপুর যদি খুলে পড়ে
না হয় রেখে এলে।
খেদ কোরো না, মালা হতে
মুক্তা খসে গেলে।
এসো দ্রুত চরণ দুটি
তৃণের 'পরে ফেলে।

হেরো গো ওই আঁধার হল
আকাশ ঢাকে মেঘে।
ওপার হতে দলে দলে
বকের শ্রেণী উড়ে চলে,
থেকে থেকে শূন্য মাঠে
বাতাস ওঠে জেগে।
ওই রে গ্রামের গোষ্ঠ-মুখে
ধেনুরা ধায় বেগে।
হেরো গো ওই আঁধার হল
আকাশ ঢাকে মেঘে।

প্রদীপখানি নিবে যাবে,
মিথ্যা কেন জ্বাল?
কে দেখতে পায় চোখের কাছে
কাজল আছে কি না আছে?
তরল তব সজল দিঠি
মেঘের চেয়ে কালো।
আঁখির পাতা যেমন আছে
এমনি থাকা ভালো।
কাজল দিতে প্রদীপখানি
মিথ্যা কেন জ্বাল?

এসো হেসে সহজ বেশে,
আর কোরো না সাজ।
গাঁথা যদি না হয় মালা,
ক্ষতি তাহে নাই গো বালা,
ভূষণ যদি না হয় সারা
ভূষণে নাই কাজ।

মেঘে মগন পূর্ব-গগন,
বেলা নাই রে আজ।
এসো হেসে সহজ বেশে
নাই বা হল সাজ।

শিলাইদহ
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

আবির্ভাব

বহুদিন হল কোন্ ফাল্গুনে
ছিনু আমি তব ভরসায়;
এলে তুমি ঘন বরষায়।
আজি উত্তাল তুমুল ছন্দে,
আজি নবঘন বিপুল মন্দ্রে
আমার পরানে যে গান বাজাবে
সে গান তোমার করো সায়।
আজি জলভরা বরষায়।

দূরে একদিন দেখেছিনু তব
কনকাঞ্চল আবরণ,
নব-চম্পক আভরণ।
কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘননীল গুণ্ঠন তব,
চল চপলার চকিত চমকে
করিছে চরণ বিচরণ।
কোথা চম্পক আভরণ।

সেদিন দেখেছি খনে খনে তুমি
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে বনতল,
নুয়ে নুয়ে যেত ফুলদল।
শুনেছিনু যেন মৃদু রিনি রিনি
ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিঙ্কিণী,
পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে
তব নিশ্বাস-পরিমল,
ছুঁয়ে যেতে যবে বনতল।

আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল,
চরণে জড়ায়ে বনফুল।

ঢেকেছ আমারে তোমার ছায়ায়
সঘন সজল বিশাল মায়ায়,
আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে
হৃদয়-সাগর-উপকূল—
চরণে জড়ায়ে বনফুল।

ফাল্গুনে আমি ফুলবনে বসে
গেঁথেছিনু যত ফুলহার
সে নহে তোমার উপহার।
যেথা চলিয়াছ সেথা পিছে পিছে
স্তবগান তব আপনি ধ্বনিছে,
বাজাতে শেখে নি সে গানের সুর
এ ছোটো বীণার ক্ষীণ তার—
এ নহে তোমার উপহার।

কে জানিত সেই ক্ষণিকা মুরতি
দূরে করি দিবে বরষন,
মিলাবে চপল দরশন?
কে জানিত মোরে এত দিবে লাজ?
তোমার যোগ্য করি নাই সাজ,
বাসর-ঘরের দুয়ারে করালে
পূজার অর্ঘ্য বিরচন—
এ কী রূপে দিলে দরশন।

ক্ষমা করো তবে ক্ষমা করো মোর
আয়োজনহীন পরমাদ,
ক্ষমা করো যত অপরাধ।
এই ক্ষণিকের পাতার কুটীরে
প্রদীপ-আলোকে এসো ধীরে ধীরে,
এই বেতসের বাঁশিতে পড়ুক
তব নয়নের পরসাদ—
ক্ষমা করো যত অপরাধ।

আস নাই তুমি নব ফাল্গুনে
ছিনু যবে তব ভরসায়,
এসো এসো ভরা বরষায়।
এসো গো গগনে আঁচল লুটায়ে,
এসো গো সকল স্বপন ছুটায়ে,
এ পরান ভরি যে গান বাজাবে
সে গান তোমার করো সায়—
আজি জলভরা বরষায়।

১০ আষাঢ়

কল্যাণী

বিরল তোমার ভবনখানি
পুষ্পকানন-মাঝে,
হে কল্যাণী নিত্য আছ
আপন গৃহকাজে।
বাইরে তোমার আম্রশাখে
স্নিগ্ধরবে কোকিল ডাকে,
ঘরে শিশুর কলধ্বনি
আকুল হর্ষভরে।
সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে।

২

প্রভাত আসে তোমার দ্বারে,
পূজার সাজি ভরি,
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির
বরণডালা ধরি।
সদা তোমার ঘরের মাঝে
নীরব একটি শঙ্খ বাজে,
কাঁকন দুটির মঙ্গলগীত
উঠে মধুর স্বরে।
সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে।

৩

রূপসীরা তোমার পায়ে
রাখে পূজার থালা,
বিদুষীরা তোমার গলায়
পরায় বরমালা।
ভালে তোমার আছে লেখা
পুণ্যধামের রশ্মিরেখা,
সুধাস্নিগ্ধ হৃদয়খানি
হাসে চোখের 'পরে।
সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে।

৪

তোমার নাহি শীত বসন্ত,
জরা কি যৌবন।
সর্বঋতু সর্বকালে
তোমার সিংহাসন।

নিবে নাকো প্রদীপ তব,
পুষ্প তোমার নিত্য নব,
অচলা শ্রী তোমায় ঘেরি
চির বিরাজ করে।
সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে।

৫

নদীর মতো এসেছিলে
গিরিশিখর হতে,
নদীর মতো সাগর-পানে
চল অবাধ স্রোতে।
একটি গৃহে পড়ছে লেখা
সেই প্রবাহের গভীর রেখা,
দীপ্ত শিরে পুণ্যশীতল
তীর্থসলিল ঝরে।
সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে।

৬

তোমার শান্তি পান্থজনে
ডাকে গৃহের পানে,
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন
গেঁথে গেঁথে আনে।
আমার কাব্যকুঞ্জবনে
কত অধীর সমীরণে
কত যে ফুল, কত আকুল
মুকুল খসে পড়ে।
সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান
আছে তোমার তরে।

২৭ শ্রাবণ

অন্তরতম

আমি যে তোমায় জানি, সে তো কেউ
জানে না।
তুমি মোর পানে চাও, সে তো কেউ
মানে না।

মোর মুখে পেলে তোমার আভাস
কত জনে কত করে পরিহাস,
পাছে সে না পারি সহিতে
নানা ছলে তাই ডাকি যে তোমায়,
কেহ কিছু নারে কহিতে।

তোমার পথ যে তুমি চিনায়েছ
সে কথা বলি নে কাহারে।
সবাই ঘুমালে জনহীন রাতে
একা আসি তব দুয়ারে।
স্তব্ধ তোমার উদার আলয়,
বীণাটি বাজাতে মনে করি ভয়,
চেয়ে থাকি শুধু নীরবে।
চকিতে তোমার ছায়া দেখি যদি
ফিরে আসি তবে গরবে।

প্রভাত না হতে কখন আবার
গৃহকোণ-মাঝে আসিয়া,
বাতায়নে বসে বিহ্বল বীণা
বিজনে বাজাই হাসিয়া।
পথ দিয়ে যে বা আসে যে বা যায়
সহসা থমকি চমকিয়া চায়,
মনে করে তারে ডেকেছি।
জানে না তো কেহ কত নাম দিয়ে
এক নামখানি ঢেকেছি।

ভোরের গোলাপ সে গানে সহসা
সাড়া দেয় ফুলকাননে,
ভোরের তারাটি সে গানে জাগিয়া
চেয়ে দেখে মোর আননে।
সব সংসার কাছে আসে ঘিরে,
প্রিয়জন সুখে ভাসে আঁখিনীরে,
হাসি জেগে ওঠে ভবনে।
যে নামে যে ছলে বীণাটি বাজাই
সাড়া পাই সারা ভুবনে।

নিশীথে নিশীথে বিপুল প্রাসাদে
তোমার মহলে মহলে,
হাজার হাজার সোনার প্রদীপ
জ্বলে অচপল অনলে।

মোর দীপে জেবলে তাহারি আলোক
পথ দিয়ে আসি, হাসে কত লোক,
দ্ৰূরে যেতে হয় পালায়ে—
তাই তো সে শিখা ভবনশিখরে
পারি নে রাখিতে জবালায়ে।

বলি নে তো কারে, সকালে বিকালে
তোমার পথের মাঝেতে,
বাঁশি ব্ৰূকে লয়ে বিনা কাজে আসি
বেড়াই ছদ্ম-সাজেতে।
যাহা ম্ৰূখে আসে গাই সেই গান,
নানা রাগিণীতে দিয়ে নানা তান,
এক গান রাখি গোপনে।
নানা ম্ৰূখপানে আঁখি মেলি চাই,
তোমা-পানে চাই স্বপনে।

৩ আষাঢ়

সমাপ্তি

পথে যতদিন ছিন্ৰু, ততদিন
অনেকের সনে দেখা।
সব শেষ হল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা।
নানা বসন্তে নানা বরষায়
অনেক দিবসে অনেক নিশায়
দেখেছি অনেক, সহেছি অনেক,
লিখেছি অনেক লেখা—
পথে যতদিন ছিন্ৰু, ততদিন
অনেকের সনে দেখা।

কখন যে পথ আপনি ফ্ৰূরাল,
সন্ধ্যা হল যে কবে,
পিছনে চাহিয়া দেখিন্ৰু, কখন
চলিয়া গিয়াছে সবে।
তোমার নীরব নিভৃত ভবনে
জানি না কখন পশিন্ৰু কেমনে।
অবাক রহিন্ৰু আপন প্রাণের
ন্ৰূতন গানের রবে।
কখন যে পথ আপনি ফ্ৰূরাল,
সন্ধ্যা হল যে কবে।

চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে
অশ্রুজলের রেখা?
বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী
আছে কি ললাটে লেখা?
রুধিয়া দিয়েছ তব বাতায়ন,
বিছানো রয়েছে শীতল শয়ন,
তোমার সন্ধ্যাপ্রদীপ-আলোকে
তুমি আর আমি একা।
নয়নে আমার অশ্রুজলের
চিহ্ন কি যায় দেখা?

নৈবেদ্য

এই কাব্যগ্রন্থ
পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেবের
শ্রীচরণকমলে উৎসর্গ
করিলাম।

আষাঢ় ১৩০৮

১

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে,
করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

তোমার অপার আকাশের তলে
বিজনে বিরলে হে,
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

তোমার বিচিত্র এ ভব-সংসারে
কর্মপারাবার-পারে হে,
নিখিল-জগৎ-জনের মাঝারে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

তোমার এ ভবে মোর কাজ যবে
সমাপন হবে হে,
ওগো রাজরাজ, একাকী নীরবে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

২

আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো।
সব দুখশোক সার্থক হোক
লভিয়া তোমারি আলো।

কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার
মরুক ধন্য হয়ে,
তোমারি পুণ্য আলোকে বসিয়া
প্রিয়জনে বাসি ভালো।
আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো।

পরশমণির প্রদীপ তোমার
অচপল তার জ্যোতি,
সোনা করে নিক পলকে আমার
সব কলঙ্ক কালো।

আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো।

আমি যত দীপ জ্বালি, শুধু তার
জ্বালা আর শুধু কালি,
আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে
তোমারি কিরণ ঢালো।
আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো।

৩

নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে
ওগো অন্তরযামী,
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া
তোমারে হেরিব আমি,
ওগো অন্তরযামী।

জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে,
তোমার চরণে নমিয়া পুলকে,
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম
তোমারে সঁপিব স্বামী,
ওগো অন্তরযামী।

দিনের কর্ম সাধিতে সাধিতে
ক্ষণে ক্ষণে ভাবি মনে
কর্ম-অন্তে সন্ধ্যাবেলায়
বসিব তোমার সনে।

সন্ধ্যাবেলায় ভাবি বসে ঘরে
তোমার নিশীথ-বিরাম-সাগরে
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা-বেদনা
নীরবে যাইবে নামি,
ওগো অন্তরযামী।

৪

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো।

তব নন্দন-গন্ধমোদিত
ফিরি সুন্দর ভুবনে,
তব পদরেণু মাখি লয়ে তনু
সাজে যেন সদা সাজে গো।

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো।

সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন
তব মঙ্গলমন্ত্রে,
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে
তব সংগীত-ছন্দে।

তব নির্মল নীরব হাস্য
হেরি অম্বর ব্যাপিয়া,
তব গৌরবে সকল গর্ব
লাজে যেন সদা লাজে গো।

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো।

৫

যদি এ আমার হৃদয়-দুয়ার
বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

যদি কোনোদিন এ বীণার তারে
তব প্রিয়নাম নাহি ঝংকারে,
দয়া ক'রে তুমি ক্ষণেক দাঁড়ায়ো
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

তব আহ্বানে যদি কভু মোর
নাহি ভেঙে যায় সুপ্তির ঘোর
বজ্রবেদনে জাগায়ো আমায়,
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

যদি কোনোদিন তোমার আসনে
আর-কাহারেও বসাই যতনে,
চিরদিবসের হে রাজা আমার,
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

৬

সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগে না যখন প্রাণ,
তখনো হে নাথ প্রণমি তোমায়
গাহি বসে তব গান।
অন্তরযামী ক্ষমো সে আমার
শূন্যমনের বৃথা উপহার,
পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন
ভক্তিবিহীন তান,
সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগে না যখন প্রাণ।

ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে,
আশা করি প্রাণপণে
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা
যদি নেমে আসে মনে।
সহসা একদা আপনা হইতে
ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে
এই ভরসায় করি পদতলে
শূন্য হৃদয় দান,
সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগে না যখন প্রাণ।

৭

জীবনে আমার যত আনন্দ
পেয়েছি দিবসরাত
সবার মাঝারে তোমারে আজিকে
স্মরিব জীবননাথ।
যেদিন তোমার জগৎ নিরখি
হরষে পরান উঠেছে পুলকি,
সেদিন আমার নয়নে হয়েছে
তোমারি নয়নপাত।
সব আনন্দ-মাঝারে তোমারে
স্মরিব জীবননাথ।

বার বার তুমি আপনার হাতে
স্বাদে গন্ধে ও গানে
বাহির হইতে পরশ করেছ
অন্তর-মাঝখানে।

পিতা মাতা ভ্রাতা প্রিয় পরিবার,
মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে হৃদয়ে প্রবেশি
তুমি আছ মোর সাথ।
সব আনন্দ-মাঝারে তোমারে
স্মরিব জীবননাথ।

৮

কাব্যের কথা বাঁধা পড়ে যথা
ছন্দের বাঁধনে,
পরানে তোমায় ধরিয়া রাখিব
সেইমতো সাধনে।
কাঁপায়ে আমার হৃদয়ের সীমা
বাজিবে তোমার অসীম মহিমা,
চিরবিচিত্র আনন্দরূপে
ধরা দিবে জীবনে,
কাব্যের কথা বাঁধা পড়ে যথা
ছন্দের বাঁধনে।

আমার তুচ্ছ দিনের কর্মে
তুমি দিবে গরিমা,
আমার তনুর অণুতে অণুতে
রবে তব প্রতিমা।
সকল প্রেমের স্নেহের মাঝারে
আসন সঁপিব হৃদয়-রাজারে,
অসীম তোমার ভুবনে রহিয়া
রবে মম ভবনে,
কাব্যের কথা বাঁধা রহে যথা
ছন্দের বাঁধনে।

৯

না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।
অর্থের শেষ পাই না, তবুও
বুঝেছি তোমার বাণী।

নিশ্বাসে মোর নিমেষের পাতে,
চেতনা বেদনা ভাবনা আঘাতে,

কে দেয় সর্বশরীরে ও মনে
তব সংবাদ আনি।
না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।

তব রাজত্ব লোক হতে লোকে
সে বারতা আমি পেয়েছি পলকে,
হৃদি-মাঝে যবে হেরেছি তোমার
বিশ্বের রাজধানী।
না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।

আপনার চিতে নিবিড় নিভৃতে
যেথায় তোমারে পেয়েছি জানিতে
সেথায় সকলি স্থির নির্বাক
ভাষা পরাস্ত মানি।
না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।

১০

যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক্,
তারা তো পাবে না জানিতে
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ
আমার হৃদয়খানিতে।

যারা কথা বলে তাহারা বলুক,
আমি কাহারেও করি না বিমুখ,
তারা নাহি জানে ভরা আছে প্রাণ
তব অকথিত বাণীতে।
নীরবে নিয়ত রয়েছ আমার
নীরব হৃদয়খানিতে।

তোমার লাগিয়া কারেও হে প্রভু,
পথ ছেড়ে দিতে বলিব না কভু,
যত প্রেম আছে সব প্রেম মোরে
তোমা-পানে রবে টানিতে।
সকলের প্রেমে রবে তব প্রেম
আমার হৃদয়খানিতে।

সবার সহিতে তোমার বাঁধন
হেরি যেন সদা এ মোর সাধন,

সবার সঙ্গে পারে যেন মনে
তব আরাধনা আনিতে।
সবার মিলনে তোমার মিলন
জাগিবে হৃদয়খানিতে।

১১

আঁধারে আবৃত ঘন সংশয়
বিশ্ব করিছে গ্রাস,
তারি মাঝখানে সংশয়াতীত
প্রত্যয় করে বাস।

বাক্যের ঝড়, তর্কের ধূলি,
অন্ধবুদ্ধি ফিরিছে আকুলি,
প্রত্যয় আছে আপনার মাঝে
নাহি তার কোনো ত্রাস।

সংসার-পথে শত সংকট
ঘুরিছে ঘূর্ণবায়ে,
তারি মাঝখানে অচলা শান্তি
অমর তরুচ্ছায়ে।

নিন্দা ও ক্ষতি মৃত্যু বিরহ
কত বিষবাণ উড়ে অহরহ
স্থির যোগাসনে চির আনন্দ
তাহার নাহিকো নাশ।

১২

অমল কমল সহজে জলের কোলে
আনন্দে রহে ফুটিয়া;
ফিরিতে না হয় আলয় কোথায় ব'লে
ধুলায় ধুলায় লুটিয়া।

তেমনি সহজে আনন্দে হরষিত
তোমার মাঝারে রব নিমগ্নচিত,
পূজা-শতদল আপনি সে বিকশিত
সব সংশয় টুটিয়া।

কোথা আছ তুমি পথ না খুঁজিব কভু,
শুধাব না কোনো পথিকে।
তোমারি মাঝারে ভ্রমিব ফিরিব প্রভু
যখন ফিরিব যে-দিকে।

চলিব যখন তোমার আকাশ-গেহে
তব আনন্দপ্রবাহ লাগিবে দেহে,
তোমার পবন সখার মতন স্নেহে
বক্ষে আসিবে ছুটিয়া।

১৩

সকল গর্ব দূর করি দিব,
তোমার গর্ব ছাড়িব না।
সবারে ডাকিয়া কহিব, যেদিন
পাব তব পদরেণুকণা।
তব আহ্বান আসিবে যখন
সে কথা কেমনে করিব গোপন?
সকল বাক্যে সকল কর্মে
প্রকাশিবে তব আরাধনা।
সকল গর্ব দূর করি দিব,
তোমার গর্ব ছাড়িব না।

যত মান আমি পেয়েছি যে কাজে
সেদিন সকলি যাবে দূরে।
শুধু তব মান দেহে মনে মোর
বাজিয়া উঠিবে এক সুরে।
পথের পথিক সেও দেখে যাবে
তোমার বারতা মোর মুখভাবে,
ভবসংসার-বাতায়নতলে
বসে রব যবে আনমনা।
সকল গর্ব দূর করি দিব,
তোমার গর্ব ছাড়িব না।

১৪

তোমার অসীমে প্রাণ-মন লয়ে
যত দূরে আমি যাই,
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই।

মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ,
দুঃখ সে হয় দুঃখের কূপ
তোমা হতে যবে স্বতন্ত্র হয়ে
আপনার পানে চাই।

হে পূর্ণ তব চরণের কাছে
যাহা-কিছু সব আছে আছে আছে,
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি
নিশিদিন কাঁদি তাই।

অন্তর-গ্লানি, সংসার-ভার
পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
তোমার স্বরূপ জীবনের মাঝে
রাখিবারে যদি পাই।

১৫

আঁধার আসিতে রজনীর দীপ
জেলেছিনু যতগুলি—
নিবাও, রে মন, আজি সে নিবাও
সকল দুয়ার খুলি।
আজি মোর ঘরে জানি না কখন
প্রভাত করেছে রবির কিরণ,
মাটির প্রদীপে নাই প্রয়োজন,
ধুলায় হোক সে ধূলি।
নিবাও, রে মন, রজনীর দীপ
সকল দুয়ার খুলি।

রাখো রাখো আজ তুলিয়ো না সুর
ছিন্ন বীণার তারে।
নীরবে, রে মন, দাঁড়াও আসিয়া
আপন বাহির-দ্বারে।
শুন আজি প্রাতে সকল আকাশ
সকল আলোক সকল বাতাস
তোমার হইয়া গাহে সংগীত
বিরাট কণ্ঠ তুলি।
নিবাও নিবাও রজনীর দীপ
সকল দুয়ার খুলি।

১৬

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ,
ওরে দীন তুই জোড়কর করি
কর্‌ তাহা দরশন।
মিলনের ধারা পড়িতেছে ঝরি,
বহিয়া যেতেছে অমৃত-লহরী,

ভূতলে মাথাটি রাখিয়া, লহো রে
শুভাশিস বরিষন।

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ।

ওই-যে আলোক পড়েছে তাঁহার
উদার ললাট-দেশে
সেথা হতে তারি একটি রশ্মি
পড়ুক মাথায় এসে।
চারি দিকে তার শান্তিসাগর
স্থির হয়ে আছে ভরি চরাচর,
ক্ষণকালতরে দাঁড়া ওরে তীরে
শান্ত কর্ রে মন।

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ।

১৭

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে
প্রাণ করে হায় হায়।
নদীতট-সম কেবলি বৃথাই
প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া
ঢেউগুলি কোথা ধায়।

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়।

যাহা যায় আর যাহা-কিছু থাকে
সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে
তবে নাহি ক্ষয়, সবি জেগে রয়
তব মহা মহিমায়।

তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু,
কভু না হারায় অণু পরমাণু,
আমার ক্ষুদ্র হারাধনগুলি
রবে না কি তব পায়?

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়।

১৮

পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে,
তব আহ্বান করি সে বহন
পার হয়ে এল পারে।
আজি এ রজনী তিমির-আঁধার,
ভয়-ভারাতুর হৃদয় আমার,
তবু দীপ হাতে খুলি দিয়া দ্বার
নমিয়া লইব তারে।
পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে।

পূজিব তাহারে জোড়কর করি
ব্যাকুল নয়নজলে;
পূজিব তাহারে পরানের ধন
সঁপিয়া চরণতলে।
আদেশ পালন করিয়া তোমারি
যাবে সে আমার প্রভাত আঁধারি,
শূন্যভবনে বসি তব পায়ে
অর্পিব আপনারে।
পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে।

১৯

প্রতিদিন তব গাথা
গাব আমি সুমধুর,
তুমি মোরে দাও কথা
তুমি মোরে দাও সুর।
তুমি যদি থাক মনে
বিকচ কমলাসনে,
তুমি যদি কর প্রাণ
তব প্রেমে পরিপূর—

প্রতিদিন তব গাথা
গাব আমি সুমধুর।

তুমি যদি শোন গান
আমার সমুখে থাকি,
সুধা যদি করে দান
তোমার উদার আঁখি,

তুমি যদি দুখ-'পরে
রাখ হাত স্নেহভরে,
তুমি যদি সুখ হতে
দম্ভ করহ দূর—

প্রতিদিন তব গাথা
গাব আমি সুমধুর।

২০

তোমার পতাকা যারে দাও, তারে
বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস
সহিবারে দাও ভকতি।
আমি তাই চাই ভরিয়া পরান
দুঃখেরি সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
দুখ হবে মোর মাথার মানিক
সাথে যদি দাও ভকতি।

যত দিতে চাও কাজ দিয়ো, যদি
তোমারে না দাও ভুলিতে—
অন্তর যদি জড়াতে না দাও
জাল-জঞ্জালগুলিতে।
বাঁধিয়ো আমায় যত খুশি ডোরে,
মুক্ত রাখিয়ো তোমা-পানে মোরে,
ধুলায় রাখিয়ো, পবিত্র ক'রে
তোমার চরণধূলিতে।
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসারতলে,
তোমারে দিয়ো না ভুলিতে।

যে পথে ঘুরিতে দিয়েছ ঘুরিব,
যাই যেন তব চরণে।
সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে
সকল-শ্রান্তি-হরণে।
দুর্গম-পথ এ ভব-গহন,
কত ত্যাগ শোক বিরহ-দহন,
জীবনে মরণ করিয়া বহন
প্রাণ পাই যেন মরণে।
সন্ধ্যাবেলায় লভি গো কুলায়
নিখিল-শরণ চরণে।

২১

ঘাটে বসে আছি আনমনা,
যেতেছে বহিয়া সুসময়।
এ বাতাসে তরী ভাসাব না
তোমা-পানে যদি নাহি বয়।

দিন যায় ওগো দিন যায়,
দিনমণি যায় অস্তে।
নাহি হেরি বাট, দূরতীরে মাঠ
ধূসর গোধূলি-ধূলিময়।

ঘরের ঠিকানা হল না গো
মন করে তবু যাই যাই।
ধ্রুবতারা তুমি যেথা জাগ
সে দিকের পথ চিনি নাই।

এতদিন তরী বাহিলাম,
বাহিলাম তরী যে পথে
শতবার তরী ডুবুডুবু করি
সে পথে ভরসা নাহি পাই।

তীর-সাথে হেরো শত ডোরে
বাঁধা আছে মোর তরীখান।
রশি খুলে দেবে কবে মোরে
ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ।

কোথা বুকজোড়া খোলা হাওয়া,
সাগরের খোলা হাওয়া কই।
কোথা মহাগান ভরি দিবে কান,
কোথা সাগরের মহাগান।

২২

মধ্যাহ্নে নগর-মাঝে পথ হতে পথে
কর্মবন্যা ধায় যবে উচ্ছলিত স্রোতে
শত শাখা-প্রশাখায়; নগরের নাড়ী
উঠে স্ফীত তপ্ত হয়ে, নাচে সে আছাড়ি
পাষাণভিত্তির 'পরে; চৌদিক আকুলি
ধায় পান্থ, ছুটে রথ, উড়ে শুষ্ক ধূলি—

তখন সহসা হেরি মুদিয়া নয়ন
মহা জনারণ্য-মাঝে অনন্ত নির্জন
তোমার আসনখানি—কোলাহল-মাঝে
তোমার নিঃশব্দ সভা নিস্তব্ধে বিরাজে।
সব দুঃখে, সব সুখে, সব ঘরে ঘরে,
সব চিত্তে, সব চিন্তা সব চেষ্টা-'পরে
যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু যায় দেখা
হে সঙ্গবিহীন দেব, তুমি বসি একা।

২৩

আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে।

জনশূন্য ক্ষেত্র-মাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে
শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার
রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্তপ্রসার
স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি। ক্ষীণ নদীরেখা
নাহি করে গান আজি, নাহি লেখে লেখা
বালুকার তটে। দূরে দূরে পল্লী যত
মুদ্রিত নয়নে রৌদ্র পোহাইতে রত
নিদ্রায় অলস ক্লান্ত।
এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।

২৪

মাঝে মাঝে কতবার ভাবি কর্মহীন
আজ নষ্ট হল বেলা, নষ্ট হল দিন।

নষ্ট হয় নাই, প্রভু, সে-সকল ক্ষণ,
আপনি তাদের তুমি করেছ গ্রহণ
ওগো অন্তর্যামী দেব। অন্তরে অন্তরে
গোপনে প্রচ্ছন্ন রহি কোন্ অবসরে
বীজেরে অঙ্কুররূপে তুলেছ জাগায়ে,
মুকুলে প্রস্ফুটবর্ণে দিয়েছ রাঙায়ে,

ফুলেরে করেছ ফল রসে সুমধুর,
বীজে পরিণত গর্ভ। আমি নিদ্রাতুর

আলস্য-শয্যার 'পরে শ্রান্তিতে মরিয়া
ভেবেছিনু সব কর্ম রহিল পড়িয়া।

প্রভাতে জাগিয়া উঠি মেলিনু নয়ন,
দেখিনু ভরিয়া আছে আমার কানন।

২৫

আবার আমার হাতে বীণা দাও তুলি,
আবার আসুক ফিরে হারা গানগুলি।

সহসা কঠিন শীতে মানসের জলে
পদ্মবন মরে যায়, হংস দলে দলে
সারি বেঁধে উড়ে যায় সুদূর দক্ষিণে
জনহীন কাশফুল্ল নদীর পুলিনে;
আবার বসন্তে তারা ফিরে আসে যথা
বহি লয়ে আনন্দের কলমুখরতা—

তেমনি আমার যত উড়ে-যাওয়া গান
আবার আসুক ফিরে, মৌন এ পরান
ভরি উতরোলে; তারা শুনাক এবার
সমুদ্রতীরের তান, অজ্ঞাত রাজার
অগম্য রাজ্যের যত অপরূপ কথা,
সীমাশূন্য নির্জনের অপূর্ব বারতা।

২৬

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে; সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে—বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্রদোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাটায়।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান।

সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।

২৭

দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
এ কী অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার।

এ কী জ্যোতি, এ কী ব্যোম-দীপ্ত দীপ-জ্বালা,
দিবা আর রজনীর চিরনাট্যশালা।
এ কী শ্যাম বসুন্ধরা, সমুদ্রে চঞ্চল,
পর্বতে কঠিন, তরুপল্লবে কোমল,
অরণ্যে আঁধার। এ কী বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ।
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।

তোমারি মিলনশয্যা, হে মোর রাজন,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্রকান্ত। ওগো বিশ্বভূপ,
দেহে মনে প্রাণে আমি এ কী অপরূপ।

২৮

তুমি তবে এসো নাথ, বোসো শুভক্ষণে
দেহে মনে গাঁথা এই মহা সিংহাসনে।

মোর দু-নয়নে ব্যাপ্ত এই নীলাম্বরে
কোনো শূন্য রাখিয়ো না আর কারো তরে,
আমার সাগরে শৈলে কান্তারে কাননে,
আমার হৃদয়ে দেহে, সজনে নির্জনে।

জ্যোৎস্নাসুপ্ত নিশীথের নিস্তব্ধ প্রহরে
আনন্দে বিষাদে গাঁথা ছায়ালোক-'পরে
বোসো তুমি মাঝখানে। শান্তিরস দাও
আমার অশ্রুর জলে, শ্রীহস্ত বুলাও
সকল স্মৃতির 'পরে, প্রেয়সীর প্রেমে
মধুর মঙ্গলরূপে তুমি এসো নেমে।

সকল সংসারবন্ধে বন্ধনবিহীন
তোমার মহান মুক্তি থাক্ রাত্রিদিন।

২৯

ক্রমে ম্লান হয়ে আসে নয়নের জ্যোতি
নয়নতারায়; বিপুলা এ বসুমতী
ধীরে মিলাইয়া আসে ছায়ার মতন
লয়ে তার সিন্ধু শৈল কান্তার কানন;
বিচিত্র এ বিশ্বগান ক্ষীণ হয়ে বাজে
ইন্দ্রিয়বীণার সূক্ষ্ম শততন্ত্রী-মাঝে;
বর্ণে বর্ণে সুরঞ্জিত বিশ্বচিত্রখানি
ধীরে ধীরে মৃদু হস্তে লও তুমি টানি
সর্বাঙ্গ হৃদয় হতে; দীপ্ত দীপাবলী
ইন্দ্রিয়ের স্বারে স্বারে ছিল যা উজ্জ্বলি
দাও নিবাইয়া; তার পরে অর্ধরাতে
যে নির্মল মৃত্যুশয্যা পাত নিজহাতে

সে বিশ্বভুবনহীন নিঃশব্দ আসনে
একা তুমি বসো আসি পরম নির্জনে।

৩০

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।

অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারংবার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির-মাঝে।

ইন্দ্রিয়ের স্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

৩১

তোমার ভুবন-মাঝে ফিরি মুগ্ধসম
হে বিশ্বমোহন নাথ। চক্ষে লাগে মম
প্রশান্ত আনন্দঘন অনন্ত আকাশ;
শরৎমধ্যাহ্নে পূর্ণ সুবর্ণ উচ্ছ্বাস
আমার শিরার মাঝে করিয়া প্রবেশ
মিশায় রক্তের সাথে আতপ্ত আবেশ।

ভুলায় আমারে সবে। বিচিত্র ভাষায়
তোমার সংসার মোরে কাঁদায় হাসায়;
তব নরনারী সবে দিগ্বিদিকে মোরে
টেনে নিয়ে যায় কত বেদনার ডোরে,
বাসনার টানে। সেই মোর মুগ্ধ মন
বীণাসম তব অঙ্কে করিনু অর্পণ—
তার শত মোহতন্ত্রে করিয়া আঘাত
বিচিত্র সংগীত তব জাগাও, হে নাথ।

৩২

নির্জন শয়ন-মাঝে কালি রাত্রিবেলা
ভাবিতেছিলাম আমি বসিয়া একেলা
গতজীবনের কত কথা; হেন ক্ষণে
শুনিলাম, তুমি কহিতেছ মোর মনে—

'ওরে মত্ত, ওরে মুগ্ধ, ওরে আত্মভোলা,
রেখেছিলি আপনার সব দ্বার খোলা,
চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়ালোক,
যত ভুল, যত ধূলি, যত দুঃখশোক,
যত ভালোমন্দ, যত গীতগন্ধ লয়ে
বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে।
সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্যবার এসেছিনু নামি।

দ্বার রুধি জপিতিস যদি মোর নাম
কোন্ পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম।'

৩৩

তখন করি নি নাথ, কোনো আয়োজন;
বিশ্বের সবার সাথে, হে বিশ্বরাজন,
অজ্ঞাতে আসিতে হাসি' আমার অন্তরে

কত শুভদিনে; কত মুহূর্তের 'পরে
অসীমের চিহ্ন লিখে গেছ। লই তুলি
তোমার স্বাক্ষর-আঁকা সেই ক্ষণগুলি—
দেখি তারা স্মৃতি-মাঝে আছিল ছড়ায়ে
কত-না ধূলির সাথে, আছিল জড়ায়ে
ক্ষণিকের কত তুচ্ছ সুখদুঃখ ঘিরে।

হে নাথ, অবজ্ঞা করি যাও নাই ফিরে
আমার সে ধূলাস্তূপ খেলাঘর দেখে।
খেলা-মাঝে শুনিতে পেয়েছি থেকে থেকে
যে চরণধ্বনি—আজ শুনি তাই বাজে
জগৎ-সংগীত সাথে চন্দ্রসূর্য-মাঝে।

৩৪

কারে দূর নাহি কর। যত করি দান
তোমারে হৃদয় মম, তত হয় স্থান
সবারে লইতে প্রাণে। বিদ্বেষ যেখানে
দ্বার হতে কারেও তাড়ায় অপমানে
তুমি সেই সাথে যাও; যেথা অহংকার
ঘৃণাভরে ক্ষুদ্রজনে রুদ্ধ করে দ্বার
সেথা হতে ফির তুমি; ঈর্ষা চিত্তকোণে
বসি বসি ছিদ্র করে তোমারি আসনে
তপ্ত শূলে। তুমি থাক, যেথায় সবাই
সহজে খুঁজিয়া পায় নিজ নিজ ঠাঁই।

ক্ষুদ্র রাজা আসে যবে, ভৃত্য উচ্চরবে
হাঁকি কহে, 'সরে যাও, দূরে যাও সবে।'
মহারাজ, তুমি যবে এস, সেই সাথে
নিখিল জগৎ আসে তোমারি পশ্চাতে।

৩৫

কালি হাস্যে পরিহাসে গানে আলোচনে
অর্ধরাত্রি কেটে গেল বন্ধুজন-সনে;
আনন্দের নিদ্রাহারা শ্রান্তি বহে লয়ে
ফিরি আসিলাম যবে নিভৃত আলয়ে
দাঁড়াইনু আঁধার অঙ্গনে। শীতবায়
বুলাল স্নেহের হস্ত তপ্ত ক্লান্ত গায়
মুহূর্তে চঞ্চল রক্তে শান্তি আনি দিয়া।

মুহূর্তেই মৌন হল স্তব্ধ হল হিয়া
নির্বাণ-প্রদীপ রিক্ত নাট্যশালা-সম।
চাহিয়া দেখিনু ঊর্ধ্বপানে; চিত্ত মম
মুহূর্তেই পার হয়ে অসীম রজনী
দাঁড়াল নক্ষত্রলোকে।

হেরিনু তখনি—
খেলিতেছিলাম মোরা অকুণ্ঠিত মনে
তব স্তব্ধ প্রাসাদের অনন্ত প্রাঙ্গণে।

৩৬

কোথা হতে আসিয়াছি নাহি পড়ে মনে
অগণ্য যাত্রীর সাথে তীর্থ দরশনে
এই বসুন্ধরাতলে; লাগিয়াছে তরী
নীলাকাশ-সমুদ্রের ঘাটের উপরি।

শুনা যায় চারি দিকে দিবসরজনী
বাজিতেছে বিরাট সংসার-শঙ্খধ্বনি
লক্ষ লক্ষ জীবন-ফুৎকারে। এত বেলা
যাত্রী নরনারী সাথে করিয়াছি মেলা
পুরীপ্রান্তে পান্থশালা-'পরে। স্নানে পানে
অপরাহ্ণ হয়ে এল গল্পে হাসি গানে;

এখন মন্দিরে তব এসেছি, হে নাথ,
নির্জনে চরণতলে করি প্রণিপাত
এ জন্মের পূজা সমাপিব। তার পর
নবতীর্থে যেতে হবে, হে বসুধেশ্বর।

৩৭

মহারাজ, ক্ষণেক দর্শন দিতে হবে
তোমার নির্জন ধামে। সেথা ডেকে লবে
সমস্ত আলোক হতে তোমার আলোতে
আমারে একাকী—সর্ব সুখদুঃখ হতে,
সর্ব সঙ্গ হতে, সমস্ত এ বসুধার
কর্মবন্ধ হতে। দেব, মন্দিরে তোমার
পশিয়াছি পৃথিবীর সর্ব যাত্রীসনে,
দ্বার মুক্ত ছিল যবে আরতির ক্ষণে।

দীপাবলী নিবাইয়া চলে যাবে যবে
নানা পথে নানা ঘরে পূজকেরা সবে,
দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে; শান্ত অন্ধকার
আমারে মিলায়ে দিবে চরণে তোমার।

একখানি জীবনের প্রদীপ তুলিয়া
তোমারে হেরিব একা ভুবন ভুলিয়া।

৩৮

প্রভাতে যখন শঙ্খ উঠেছিল বাজি
তোমার প্রাঙ্গণতলে—ভরি লয়ে সাজি
চলেছিল নরনারী তেয়াগিয়া ঘর
নবীন শিশিরসিক্ত গুঞ্জনমুখর
স্নিগ্ধ বনপথ দিয়ে। আমি অন্য মনে
সঘনপল্লবপুঞ্জ ছায়াকুঞ্জবনে
ছিনু শুয়ে তৃণাস্তীর্ণ তরঙ্গিণী-তীরে
বিহঙ্গের কলগীতে সুমন্দ সমীরে।

আমি যাই নাই দেব তোমার পূজায়,
চেয়ে দেখি নাই পথে কারা চলে যায়।
আজ ভাবি ভালো হয়েছিল মোর ভুল,
তখন কুসুমগুলি আছিল মুকুল—

হেরো তারা সারা দিনে ফুটিতেছে আজি।
অপরাহ্নে ভরিলাম এ পূজার সাজি।

৩৯

হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অন্তহীন।

গণনা কেহ না করে, রাত্রি আর দিন
আসে যায়, ফুটে ঝরে যুগযুগান্তরা।
বিলম্ব নাহিকো তব, নাহি তব ত্বরা,
প্রতীক্ষা করিতে জান। শতবর্ষ ধরে
একটি পুষ্পের কলি ফুটাবার তরে
চলে তব ধীর আয়োজন। কাল নাই
আমাদের হাতে; কাড়াকাড়ি করে তাই
সবে মিলে; দেরি কারো নাহি সহে কভু।

আগে তাই সকলের সব সেবা প্রভু,
শেষ করে দিতে দিতে কেটে যায় কাল,
শূন্য পড়ে থাকে হায় তব পূজা-থাল।

অসময়ে ছুটে আসি, মনে বাসি ভয়—
এসে দেখি, যায় নাই তোমার সময়।

৪০

তোমার ইঙ্গিতখানি দেখি নি যখন
ধূলিমুষ্টি ছিল তারে করিয়া গোপন।

যখনি দেখেছি আজ, তখনি পুলকে
নিরখি ভুবনময় আঁধারে আলোকে
জ্বলে সে ইঙ্গিত; শাখে শাখে ফুলে ফুলে
ফুটে সে ইঙ্গিত; সমুদ্রের কূলে কূলে
ধরিত্রীর তটে তটে চিহ্ন আঁকি ধায়
ফেনাঙ্কিত তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
দ্রুত সে ইঙ্গিত; শুভ্রশীর্ষ হিমাদ্রির
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঊর্ধ্বমুখে জাগি রহে স্থির
স্তব্ধ সে ইঙ্গিত।

তখন তোমার পানে
বিমুখ হইয়া ছিনু, কী লয়ে কে জানে।

বিপরীত মুখে তারে পড়েছিনু, তাই
বিশ্বজোড়া সে লিপির অর্থ বুঝি নাই।

৪১

তব পূজা না আনিলে দণ্ড দিবে তারে
যমদূত লয়ে যাবে নরকের দ্বারে
ভক্তিহীনে এই বলি যে দেখায় ভয়
তোমার নিন্দুক সে যে, ভক্ত কভু নয়।

হে বিশ্বভুবনরাজ, এ বিশ্বভুবনে
আপনারে সব চেয়ে রেখেছ গোপনে
আপন মহিমা-মাঝে। তোমার সৃষ্টির
ক্ষুদ্র বালুকণাটুকু, ক্ষণিক শিশির
তারাও তোমার চেয়ে প্রত্যক্ষ আকারে
দিকে দিকে ঘোষণা করিছে আপনারে।

যা-কিছু তোমারি তাই আপনার বলি
চিরদিন এ সংসার চলিয়াছে ছলি—
তবু সে চোরের চৌর্য পড়ে না তো ধরা।

আপনারে জানাইতে নাই তব ত্বরা।

৪২

সেই তো প্রেমের গর্ব ভক্তির গৌরব।
সে তব অগমরুদ্ধ অনন্ত নীরব
নিস্তব্ধ নির্জন-মাঝে যায় অভিসারে
পূজার সুবর্ণথালি ভরি উপহারে।

তুমি চাও নাই পূজা সে চাহে পূজিতে;
একটি প্রদীপ হাতে রহে সে খুঁজিতে
অন্তরের অন্তরালে। দেখে সে চাহিয়া
একাকী বসিয়া আছ ভরি তার হিয়া।

চমকি নিবায়ে দীপ দেখে সে তখন
তোমারে ধরিতে নারে অনন্ত গগন।
চিরজীবনের পূজা চরণের তলে
সমর্পণ করি দেয় নয়নের জলে।

বিনা আদেশের পূজা, হে গোপনচারী,
বিনা আহ্বানের খোঁজ, সেই গর্ব তারি।

৪৩

কত-না তুষারপুঞ্জ আছে সুপ্ত হয়ে
অভ্রভেদী হিমাদ্রির সুদূর আলয়ে
পাষাণপ্রাচীর-মাঝে। হে সিন্ধু মহান,
তুমি তো তাদের কারে কর না আহ্বান
আপন অতল হতে। আপনার মাঝে
আছে তারা অবরুদ্ধ, কানে নাহি বাজে
বিশ্বের সংগীত।

প্রভাতের রৌদ্রকরে
যে তুষার বয়ে যায়, নদী হয়ে ঝরে,
বন্ধ টুটি ছুটি চলে—হে সিন্ধু মহান,
সেও তো শোনে নি কভু তোমার আহ্বান।
সে সুদূর গঙ্গোত্রীর শিখর-চূড়ায়
তোমার গম্ভীর গান কে শুনিতে পায়।

আপন স্রোতের বেগে কী গভীর টানে
তোমারে সে খুঁজে পায় সেই তাহা জানে।

৪৪

মর্ত্যবাসীদের তুমি যা দিয়েছ প্রভু
মর্ত্যের সকল আশা মিটাইয়া তবু
রিক্ত তাহা নাহি হয়। তার সর্বশেষ
আপনি খুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশ।

নদী ধায় নিত্যকাজে, সর্ব কর্ম সারি
অন্তহীন ধারা তার চরণে তোমারি
নিত্য জলাঞ্জলিরূপে ঝরে অনিবার।
কুসুম আপন গন্ধে সমস্ত সংসার
সম্পূর্ণ করিয়া তবু সম্পূর্ণ না হয়—
তোমারি পূজায় তার শেষ পরিচয়।
সংসারে বঞ্চিত করি তব পূজা নহে।

কবি আপনার গানে যত কথা কহে,
নানা জনে লহে তার নানা অর্থ টানি
তোমা-পানে ধায় তার শেষ অর্থখানি।

৪৫

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদ-মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন ভক্তি-মদধারা।
নাহি চাহি নাথ।

দাও ভক্তি শান্তিরস,
স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি মঙ্গল কলস
সংসার-ভবন-দ্বারে। যে ভক্তি-অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর, সর্ব কর্মে দিবে বল,
ব্যর্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দে কল্যাণে। সর্ব প্রেমে দিবে তৃপ্তি,
সর্ব দুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্ব সুখে দীপ্তি
দাহহীন।

সংবরিয়া ভাব-অশ্রুনীর
চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর।

৪৬

মাতৃস্নেহ-বিগলিত স্তন্য-ক্ষীররস
পান করি হাসে শিশু আনন্দে অলস—
তেমনি বিহ্বল হর্ষে ভাবরসরাশি
কৈশোরে করেছি পান; বাজায়েছি বাঁশি
প্রমত্ত পঞ্চম সুরে—প্রকৃতির বুকে
লালন-ললিত চিত্ত শিশুসম সুখে
ছিনু শুয়ে; প্রভাত-শর্বরী-সন্ধ্যা-বধূ
নানা পাত্রে আনি দিত নানাবর্ণ মধু
পুষ্পগন্ধে মাখা।

আজি সেই ভাবাবেশ
সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ,
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়ে থাকে দূরে—
কোনো দুঃখ নাহি। পল্লী হতে রাজপুরে
এবার এনেছ মোরে, দাও চিত্তে বল।
দেখাও সত্যের মূর্তি কঠিন নির্মল।

৪৭

আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলংকাররাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহো
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।

করো মোরে সম্মানিত নব বীরবেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

৪৮

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।

দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার,
এই চিরপেষণ-যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারংবার
মনুষ্য-মর্যাদাগর্ব চিরপরিহার—

এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গল-প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক-মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।

৪৯

অন্ধকার গর্তে থাকে অন্ধ সরীসৃপ;
আপনার ললাটের রতন-প্রদীপ
নাহি জানে, নাহি জানে সূর্যালোকলেশ।
তেমনি আঁধারে আছে এই অন্ধ দেশ
হে দণ্ডবিধাতা রাজা—যে দীপ্তরতন
পরায়ে দিয়েছ ভালে তাহার যতন
নাহি জানে, নাহি জানে তোমার আলোক।

নিত্য বহে আপনার অস্তিত্বের শোক,
জনমের গ্লানি। তব আদর্শ মহান
আপনার পরিমাপে করি খান খান
রেখেছে ধূলিতে। প্রভু, হেরিতে তোমায়
তুলিতে হয় না মাথা ঊর্ধ্বপানে হায়।

যে এক তরণী লক্ষ লোকের নির্ভর
খণ্ড খণ্ড করি তারে তরিবে সাগর?

৫০

তোমারে শতধা করি ক্ষুদ্র করি দিয়া
মাটিতে লুটায় যারা তৃপ্ত সুপ্ত হিয়া
সমস্ত ধরণী আজি অবহেলাভরে
পা রেখেছে তাহাদের মাথার উপরে।

মনুষ্যত্ব তুচ্ছ করি যারা সারাবেলা
তোমারে লইয়া শুধু করে পূজা-খেলা
মুগ্ধভাবভোগে, সেই বৃদ্ধ শিশুদল
সমস্ত বিশ্বের আজি খেলার পুত্তল।

তোমারে আপন সাথে করিয়া সমান
যে খর্ব বামনগণ করে অবমান
কে তাদের দিবে মান। নিজ মন্ত্রস্বরে
তোমারেই প্রাণ দিতে যারা স্পর্ধা করে
কে তাদের দিবে প্রাণ। তোমারেও যারা
ভাগ করে, কে তাদের দিবে ঐক্যধারা।

৫১

হে রাজেন্দ্র, তোমা-কাছে নত হতে গেলে
যে ঊর্ধ্বে উঠিতে হয়, সেথা বাহু মেলে
লহো ডাকি সুদুর্গম বন্ধুর কঠিন
শৈলপথে, অগ্রসর করো প্রতিদিন
যে মহান পথে তব বরপুত্রগণ
গিয়াছেন পদে পদে করিয়া অর্জন
মরণ-অধিক দুঃখ।

ওগো অন্তর্যামী,
অন্তরে যে রহিয়াছে অনির্বাণ আমি
দুঃখে তার লব আর দিব পরিচয়।
তারে যেন ম্লান নাহি করে কোনো ভয়,
তারে যেন কোনো লোভে না করে চঞ্চল।
সে যেন জ্ঞানের পথে রহে সমুজ্জ্বল,
জীবনের কর্মে যেন করে জ্যোতি দান,
মৃত্যুর বিশ্রাম যেন করে মহীয়ান।

৫২

দুর্গম পথের প্রান্তে পান্থশালা-'পরে
যাহারা পড়িয়া ছিল ভাবাবেশভরে,
রসপানে হতজ্ঞান, যাহারা নিয়ত
রাখে নাই আপনারে উদ্যত জাগ্রত—
মুগ্ধ মূঢ় জানে নাই বিশ্বযাত্রীদলে
কখন চলিয়া গেছে সুদূর অচলে
বাজায়ে বিজয়শঙ্খ। শুধু দীর্ঘ বেলা
তোমারে খেলনা করি করিয়াছে খেলা।

কর্মেরে করেছে পঙ্গু নিরর্থ আচারে,
জ্ঞানেরে করেছে হত শাস্ত্রকারাগারে,
আপন কক্ষের মাঝে বৃহৎ ভুবন
করেছে সংকীর্ণ রুধি দ্বার-বাতায়ন—

তারা আজ কাঁদিতেছে। আসিয়াছে নিশা,
কোথা যাত্রী, কোথা পথ, কোথায় রে দিশা।

৫৩

তুমি সর্বাশ্রয়, এ কি শুধু শূন্যকথা?
ভয় শুধু তোমা-'পরে বিশ্বাসহীনতা
হে রাজন।
লোকভয়? কেন লোকভয়,
লোকপাল। চিরদিবসের পরিচয়
কোন্ লোক সাথে?

রাজভয় কার তরে
হে রাজেন্দ্র? তুমি যার বিরাজ অন্তরে
লভে সে কারার মাঝে ত্রিভুবনময়
তব ক্রোড়, স্বাধীন সে বন্দীশালে।

মৃত্যুভয়
কী লাগিয়া, হে অমৃত? দুদিনের প্রাণ
লুপ্ত হলে তখনি কি ফুরাইবে দান,
এত প্রাণদৈন্য প্রভু ভাণ্ডারেতে তব?
সেই অবিশ্বাসে প্রাণ আঁকড়িয়া রব?

কোথা লোক, কোথা রাজা, কোথা ভয় কার।
তুমি নিত্য আছ, আমি নিত্য সে তোমার।

৫৪

আমারে সৃজন করি যে মহাসম্মান
দিয়েছ আপন হস্তে, রহিতে পরান
তার অপমান যেন সহ্য নাহি করি।
যে আলোক জ্বালায়েছ দিবস-শর্বরী
তার উর্ধ্বশিখা যেন সর্ব-উচ্চে রাখি,
অনাদর হতে তারে প্রাণ দিয়া ঢাকি।
মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্ত্বে মম তোমারি মহিমা
মহেশ্বর।

সেথায় যে পদক্ষেপ করে
অবমান বহি আনে অবজ্ঞার ভরে,
হোক-না সে মহারাজ বিশ্বমহীতলে
তারে যেন দণ্ড দিই দেবদ্রোহী বলে

সর্বশক্তি লয়ে মোর। যাক আর সব,
আপন গৌরবে রাখি তোমার গৌরব।

৫৫

তুমি মোরে অর্পিয়াছ যত অধিকার,
ক্ষুণ্ণ না করিয়া কভু কণামাত্র তার
সম্পূর্ণ সঁপিয়া দিব তোমার চরণে
অকুণ্ঠিত রাখি তারে বিপদে মরণে।
জীবন সার্থক হবে তবে।

চিরদিন
জ্ঞান যেন থাকে মুক্ত, শৃঙ্খলাবিহীন।
ভক্তি যেন ভয়ে নাহি হয় পদানত
পৃথিবীর কারো কাছে। শুভ চেষ্টা যত
কোনো বাধা নাহি মানে কোনো শক্তি হতে।
আত্মা যেন দিবারাত্রি অবারিত স্রোতে
সকল উদ্যম লয়ে ধায় তোমা-পানে
সর্ব বন্ধ টুটি। সদা লেখা থাকে প্রাণে
'তুমি যা দিয়েছ মোরে অধিকার-ভার
তাহা কেড়ে নিতে দিলে অমান্য তোমার।'

৫৬

ত্রাসে লাজে নতশিরে নিত্য নিরবধি
অপমান অবিচার সহ্য করে যদি
তবে সেই দীন প্রাণে তব সত্য হায়
দণ্ডে দণ্ডে ম্লান হয়। দুর্বল আত্মায়
তোমারে ধরিতে নারে দৃঢ়নিষ্ঠাভরে।
ক্ষীণপ্রাণ তোমারেও ক্ষুদ্রক্ষীণ করে
আপনার মতো—যত আদেশ তোমার
পড়ে থাকে, আবেশে দিবস কাটে তার।
পুঞ্জ পুঞ্জ মিথ্যা আসি গ্রাস করে তারে
চতুর্দিকে; মিথ্যা মুখে, মিথ্যা ব্যবহারে,
মিথ্যা চিত্তে, মিথ্যা তার মস্তক মাড়ায়ে,
না পারে তাড়াতে তারে উঠিয়া দাঁড়ায়ে।

অপমানে নতশির ভয়ে ভীতজন
মিথ্যারে ছাড়িয়া দেয় তব সিংহাসন।

৫৭

হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর,
তপোবন-তরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্রস্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে, জলেতে, এই বিশ্বচরাচরে,
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য। সে বাক্য উদার
এই ভারতেরই।

যাঁরা সবল স্বাধীন
নির্ভয় সরলপ্রাণ, বন্ধনবিহীন
সদর্পে ফিরিয়াছেন বীর্যজ্যোতিষ্মান
লঙ্ঘিয়া অরণ্য নদী পর্বত পাষাণ
তাঁরা এক মহান বিপুল সত্য-পথে
তোমারে লভিয়াছেন নিখিল জগতে।
কোনোখানে না মানিয়া আত্মার নিষেধ
সবলে সমস্ত বিশ্ব করেছেন ভেদ।

৫৮

তাঁহারা দেখিয়াছেন— বিশ্ব চরাচর
ঝরিছে আনন্দ হতে আনন্দ-নির্ঝর
অগ্নির প্রত্যেক শিখা ভয়ে তব কাঁপে,
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারি প্রতাপে,
তোমারি আদেশ বহি মৃত্যু দিবারাত
চরাচর মর্মরিয়া করে যাতায়াত।
গিরি উঠিয়াছে ঊর্ধ্বে তোমারি ইঙ্গিতে,
নদী ধায় দিকে দিকে তোমারি সংগীতে।
শূন্যে শূন্যে চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা যত
অনন্ত প্রাণের মাঝে কাঁপিছে নিয়ত।

তাঁহারা ছিলেন নিত্য এ বিশ্ব-আলয়ে
কেবল তোমারি ভয়ে, তোমারি নির্ভয়ে,
তোমারি শাসনগর্বে দীপ্তত্বপ্তমুখে
বিশ্ব-ভুবনেশ্বরের চক্ষুর সম্মুখে।

৫৯

আমরা কোথায় আছি, কোথায় সুদূরে
দীপহীন জীর্ণভিত্তি অবসাদপুরে

ভগ্নগৃহে, সহস্রের ভ্রূকুটির নিচে
কুব্জপৃষ্ঠে নতশিরে, সহস্রের পিছে
চলিয়াছি প্রভুত্বের তর্জনী-সংকেতে
কটাক্ষে কাঁপিয়া, লইয়াছি শিরে পেতে
সহস্রশাসনশাস্ত্র।

সংকুচিত-কায়া,
কাঁপিতেছে রচি নিজ কল্পনার ছায়া।
সন্ধ্যার আঁধারে বসি নিরানন্দ ঘরে
দীন আত্মা মরিতেছে শত লক্ষ ডরে।
পদে পদে ত্রস্তচিত্তে হয়ে লুণ্ঠ্যমান
ধূলিতলে, তোমারে যে করি অপ্রমাণ।
যেন মোরা পিতৃহারা ধাই পথে পথে
অনীশ্বর অরাজক ভয়ার্ত জগতে।

৬০

একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান প্রাণ, কী আনন্দবলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে, 'শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।'

আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা আনন্দমন্ত্র, সে উদাত্তবাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্যে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃতবার্তা।

রে মৃত ভারত,
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।

৬১

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল,
এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জনা। ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাতকালে, এ জাগ্রত ভবে

এই কর্মধামে। দুই নেত্র করি আঁধা
জ্ঞানে বাধা, কর্মে বাধা, গতিপথে বাধা,
আচারে বিচারে বাধা করি দিয়া দূর
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর
আনন্দে উদার উচ্চ।

সমস্ত তিমির
ভেদ করি দেখিতে হইবে ঊর্ধ্বশির
এক পূর্ণ জ্যোতির্ময়ে অনন্ত ভুবনে।
ঘোষণা করিতে হবে অসংশয় মনে—
'ওগো দিব্যধামবাসী দেবগণ যত,
মোরা অমৃতের পুত্র তোমাদের মতো।'

৬২

তব চরণের আশা, ওগো মহারাজ,
ছাড়ি নাই। এত যে হীনতা, এত লাজ,
তবু ছাড়ি নাই আশা। তোমার বিধান
কেমনে কী ইন্দ্রজাল করে যে নির্মাণ
সংগোপনে সবার নয়ন-অন্তরালে
কেহ নাহি জানে। তোমার নির্দিষ্ট কালে
মুহূর্তেই অসম্ভব আসে কোথা হতে
আপনারে ব্যক্ত করি' আপন আলোতে
চিরপ্রতীক্ষিত চিরসম্ভবের বেশে।

আছ তুমি অন্তর্যামী এ লজ্জিত দেশে;
সবার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে হৃদয়ে
গৃহে গৃহে রাত্রিদিন জাগরূক হয়ে
তোমার নিগূঢ় শক্তি করিতেছে কাজ।
আমি ছাড়ি নাই আশা, ওগো মহারাজ।

৬৩

পতিত ভারতে তুমি কোন্ জাগরণে
জাগাইবে, হে মহেশ, কোন্ মহাক্ষণে,
সে মোর কল্পনাতীত। কী তাহার কাজ,
কী তাহার শক্তি, দেব, কী তাহার সাজ,
কোন্ পথ তার পথ, কোন্ মহিমায়
দাঁড়াবে সে সম্পদের শিখর-সীমায়
তোমার মহিমাজ্যোতি করিতে প্রকাশ
নবীন প্রভাতে?

আজি নিশার আকাশ
যে আদর্শে রচিয়াছে আলোকের মালা,
সাজায়েছে আপনার অন্ধকার-থালা,
ধরিয়াছে ধরিত্রীর মাথার উপর,
সে আদর্শ প্রভাতের নহে, মহেশ্বর।
জাগিয়া উঠিবে প্রাচী যে অরুণালোকে
সে কিরণ নাই আজি নিশীথের চোখে।

৬৪

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে,
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি, প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি।
শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

৬৫

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতি-মাঝে দারুণ আঘাত
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করে তারে
কাল-ঝঞ্ঝা-ঝংকারিত দুর্যোগ-আঁধারে।
একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান।
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।

স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ-ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে—বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার
জঠরে পুরিতে চায়। বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ
তখন গর্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ।

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।

৬৬

এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগরেখা
নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা
তব নব প্রভাতের। এ শুধু দারুণ
সন্ধ্যার প্রলয়দীপ্তি। চিতার আগুন
পশ্চিম-সমুদ্রতটে করিছে উদ্গার
বিস্ফুলিঙ্গ, স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।

এই শ্মশানের মাঝে শক্তির সাধনা
তব আরাধনা নহে, হে বিশ্বপালক।
তোমার নিখিলপ্লাবী আনন্দ-আলোক
হয়তো লুকায়ে আছে পূর্ব সিন্ধুতীরে
বহু ধৈর্যে নম্র স্তব্ধ দুঃখের তিমিরে
সর্বরিক্ত অশ্রুসিক্ত দৈন্যের দীক্ষায়
দীর্ঘকাল—ব্রাহ্মমুহূর্তের প্রতীক্ষায়।

৬৭

সে পরম পরিপূর্ণ প্রভাতের লাগি
হে ভারত, সর্বদুঃখে রহো তুমি জাগি
সরল নির্মল চিত্ত; সকল বন্ধনে
আত্মারে স্বাধীন রাখি, পুষ্প ও চন্দনে
আপনার অন্তরের মাহাত্ম্যমন্দির
সজ্জিত সুগন্ধি করি, দুঃখনম্রশির
তাঁর পদতলে নিত্য রাখিয়া নীরবে।

তাঁ হতে বঞ্চিত করে তোমারে এ ভবে
এমন কেহই নাই—সেই গর্বভরে
সর্বভয়ে থাকো তুমি নির্ভয় অন্তরে
তাঁর হস্ত হতে লয়ে অক্ষয় সম্মান।
ধরায় হোক-না তব যত নিম্ন স্থান
তাঁর পাদপীঠ করো সে আসন তব।
যাঁর পাদরেণুকণা এ নিখিল ভব।

৬৮

সে উদার প্রত্যুষের প্রথম অরুণ
যখনি মেলিবে নেত্র—প্রশান্ত করুণ—

শুভ্রশির অভ্রভেদী উদয়শিখরে,
হে দুঃখী জাগ্রত দেশ, তব কণ্ঠস্বরে
প্রথম সংগীত তার যেন উঠে বাজি
প্রথম ঘোষণাধ্বনি।

তুমি থেকো সাজি,
চন্দনচর্চিত স্নাত নির্মল ব্রাহ্মণ,
উচ্চশির ঊর্ধ্বে তুলি গাহিয়ো বন্দন—
'এসো শান্তি, বিধাতার কন্যা ললাটিকা,
নিশাচর পিশাচের রক্তদীপশিখা
করিয়া লজ্জিত। তব বিশাল সন্তোষ
বিশ্বলোক-ঈশ্বরের রত্নরাজকোষ।
তব ধৈর্য দৈববীর্য; নম্রতা তোমার
সমুচ্চ মুকুটশ্রেষ্ঠ, তাঁরি পুরস্কার।'

৬৯

তাঁরি হস্ত হতে নিয়ো তব দুঃখভার,
হে দুঃখী, হে দীনহীন। দীনতা তোমার
ধরিবে ঐশ্বর্যদীপ্তি, যদি নত রহে
তাঁরি দ্বারে। আর কেহ নহে নহে নহে,
তিনি ছাড়া আর কেহ নাই ত্রিসংসারে
যার কাছে তব শির লুটাইতে পারে।

পিতৃরূপে রয়েছেন তিনি, পিতৃমাঝে
নমি তাঁরে। তাঁহারি দক্ষিণ হস্ত রাজে
ন্যায়দণ্ড-'পরে, নতশিরে লই তুলি
তাহার শাসন। তাঁরি চরণ-অঙ্গুলি
আছে মহত্ত্বের 'পরে, মহতের দ্বারে
আপনারে নম্র ক'রে পূজা করি তাঁরে।
তাঁরি হস্তস্পর্শরূপে করি অনুভব
মস্তকে তুলিয়া লই দুঃখের গৌরব।

৭০

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের 'পরে
দিয়েছ শাসনভার, হে রাজাধিরাজ।
সে গুরু সম্মান তব সে দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি
সবিনয়ে, তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে।

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গ-সম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে, আর, অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

৭১

ওরে মৌনমূক কেন আছিস নীরবে
অন্তর করিয়া রুদ্ধ। এ মুখর ভবে
তোর কোনো কথা নাই, রে আনন্দহীন?
কোনো সত্য পড়ে নাই চোখে? ওরে দীন
কণ্ঠে নাই কোনো সংগীতের নব তান?

তোর গৃহপ্রান্ত চুম্বি সমুদ্র মহান
গাহিছে অনন্ত গাথা, পশ্চিমে পূরবে।
কত নদী নিরবধি ধায় কলরবে
তরল সংগীতধারা হয়ে মূর্তিমতী।
শুধু তুমি দেখ নাই সে প্রত্যক্ষ জ্যোতি
যাহা সত্যে যাহা গীতে আনন্দে আশায়
ফুটে উঠে নব নব বিচিত্র ভাষায়।
তব সত্য তব গান রুদ্ধ হয়ে রাজে
রাত্রিদিন জীর্ণশাস্ত্রে শুষ্কপত্র-মাঝে।

৭২

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—

নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

৭৩

আমি ভালোবাসি দেব এই বাঙালার
দিগন্তপ্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার
বিরাজ করিছে নিত্য, মুক্ত নীলাম্বরে
অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে
যে ভৈরবীগান, যে মাধুরী একাকিনী
নদীর নির্জন তটে বাজায় কিঙ্কিণী
তরল কল্লোলরোলে, যে সরল স্নেহ
তরুচ্ছায়া-সাথে মিশি স্নিগ্ধপল্লীগেহ
অঞ্চলে আবরি আছে, যে মোর ভবন
আকাশে বাতাসে আর আলোকে মগন
সন্তোষে কল্যাণে প্রেমে—

করো আশীর্বাদ,
যখনি তোমার দূত আনিবে সংবাদ
তখনি তোমার কার্যে আনন্দিত মনে
সব ছাড়ি যেতে পারি দুঃখে ও মরণে।

৭৪

এ নদীর কলধ্বনি যেথায় বাজে না
মাতৃকলকণ্ঠ-সম, যেথায় সাজে না
কোমলা উর্বরা ভূমি নব-নবোৎসবে
নবীন বরন বস্ত্রে যৌবনগৌরবে
বসন্তে শরতে বরষায়, রুদ্ধাকাশ
দিবস-রাত্রিরে যেথা করে না প্রকাশ
পূর্ণপ্রস্ফুটিতরূপে, যেথা মাতৃভাষা
চিত্ত-অন্তঃপুরে নাহি করে যাওয়া-আসা
কল্যাণী হৃদয়লক্ষ্মী, যেথা নিশিদিন
কল্পনা ফিরিয়া আসে পরিচয়হীন
পরগৃহদ্বার হতে পথের মাঝারে—

সেখানেও যাই যদি, মন যেন পারে
সহজে টানিয়া নিতে অন্তহীন স্রোতে
তব সদানন্দধারা সর্ব ঠাঁই হতে।

৭৫

আমার সকল অঙ্গে তোমার পরশ
লগ্ন হয়ে রহিয়াছে রজনী-দিবস
প্রাণেশ্বর, এই কথা নিত্য মনে আনি
রাখিব পবিত্র করি মোর তনুখানি।
মনে তুমি বিরাজিছ, হে পরম জ্ঞান,
এই কথা সদা স্মরি মোর সর্বধ্যান
সর্বচিন্তা হতে আমি সর্বচেষ্টা করি
সর্বমিথ্যা রাখি দিব দূরে পরিহরি।

হৃদয়ে রয়েছে তব অচল আসন
এই কথা মনে রেখে করিব শাসন
সকল কুটিল দ্বেষ, সর্ব অমঙ্গল—
প্রেমেরে রাখিব করি প্রস্ফুট নির্মল।
সর্ব কর্মে তব শক্তি এই জেনে সার,
করিব সকল কর্মে তোমারে প্রচার।

৭৬

অচিন্ত্য এ ব্রহ্মাণ্ডের লোক-লোকান্তরে
অনন্ত শাসন যাঁর চিরকালতরে
প্রত্যেক অণুর মাঝে হতেছে প্রকাশ,
যুগে যুগে মানবের মহা ইতিহাস
বহিয়া চলেছে সদা ধরণীর 'পর
যাঁর তর্জনীর ছায়া, সেই মহেশ্বর
আমার চৈতন্য-মাঝে প্রত্যেক পলকে
করিছেন অধিষ্ঠান, তাঁহারি আলোকে
চক্ষু মোর দৃষ্টিদীপ্ত, তাঁহারি পরশে
অঙ্গ মোর স্পর্শময় প্রাণের হরষে।

যেথা চলি যেথা রহি যেথা বাস করি
প্রত্যেক নিশ্বাসে মোর এই কথা স্মরি'
আপন মস্তক-'পরে সর্বদা সর্বথা
বহিব তাঁহার গর্ব, নিজের নম্রতা।

৭৭

না গণি মনের ক্ষতি ধনের ক্ষতিতে
হে বরেণ্য, এই বর দেহো মোর চিতে।
যে ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ তোমার ভুবন
এই তৃণভূমি হতে সুদূর গগন

যে আলোকে যে সংগীতে যে সৌন্দর্যধনে,
তার মূল্য নিত্য যেন থাকে মোর মনে
স্বাধীন সবল শান্ত সরল সন্তোষ।

অদৃষ্টেরে কভু যেন নাহি দিই দোষ।
কোনো দুঃখ কোনো ক্ষতি অভাবের তরে
বিম্বাদ না জন্মে যেন বিশ্বচরাচরে
ক্ষুদ্রখণ্ড হারাইয়া। ধনীর সমাজে
না হয় না হোক স্থান, জগতের মাঝে
আমার আসন যেন রহে সর্ব ঠাঁই,
হে দেব, একান্তচিত্তে এই বর চাই।

৭৮

এ কথা স্মরণে রাখা কেন গো কঠিন
তুমি আছ সব চেয়ে, আছ নিশিদিন,
আছ প্রতি ক্ষণে—আছ দূরে, আছ কাছে,
যাহা-কিছু আছে, তুমি আছ ব'লে আছে।

যেমনি প্রবেশ আমি করি লোকালয়ে,
যখনি মানুষ আসে স্তুতিনিন্দা লয়ে,
লয়ে রাগ, লয়ে দ্বেষ, লয়ে গর্ব তার
অমনি সংসার ধরে পর্বত-আকার
আবরিয়া ঊর্ধ্বলোক, তরঙ্গিয়া উঠে
লাজভয় লোভক্ষোভ; নরের মুকুটে
যে হীরক জ্বলে তারি আলোক-ঝলকে
অন্য আলো নাহি হেরি দ্যুলোকে ভূলোকে।
মানুষ সম্মুখে এলে কেন সেই ক্ষণে
তোমার সম্মুখে আছি নাহি পড়ে মনে।

৭৯

তোমারে বলেছে যারা পুত্র হতে প্রিয়,
বিত্ত হতে প্রিয়তর, যা-কিছু আত্মীয়
সব হতে প্রিয়তম নিখিল ভুবনে,
আত্মার অন্তরতর, তাদের চরণে
পাতিয়া রাখিতে চাহি হৃদয় আমার।

সে সরল শান্ত প্রেম গভীর উদার—
সে নিশ্চিত নিঃসংশয়, সেই সুনিবিড়
সহজ মিলনাবেগ, সেই চিরস্থির
আত্মার একাগ্র লক্ষ্য, সেই সর্ব কাজে

সহজেই সঞ্চরণ সদা তোমা-মাঝে
গম্ভীর প্রশান্ত চিত্তে, হে অন্তরযামী,
কেমনে করিব লাভ। পদে পদে আমি
প্রেমের প্রবাহ তব সহজ বিশ্বাসে
অন্তরে টানিয়া লব নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

৮০

হে অনন্ত, যেথা তুমি ধারণা-অতীত,
সেথা হতে আনন্দের অব্যক্ত সংগীত
ঝরিয়া পড়িছে নামি, অদৃশ্য অগম
হিমাদ্রিশিখর হতে জাহ্নবীর সম।

সে ধ্যানাভ্রভেদী শৃঙ্গ, যেথা স্বর্ণলেখা
জগতের প্রাতঃকালে দিয়েছিল দেখা
আদি অন্ধকার-মাঝে, যেথা রক্তচ্ছবি
অস্ত যাবে জগতের শ্রান্ত সন্ধ্যারবি,
নব নব ভুবনের জ্যোতির্বাষ্পরাশি
পুঞ্জ পুঞ্জ নীহারিকা যার বক্ষে আসি
ফিরিছে সৃজনবেগে মেঘখণ্ড-সম
যুগে যুগান্তরে— চিত্তবাতায়ন মম
সে অগম্য অচিন্ত্যের পানে রাত্রিদিন
রাখিব উন্মুক্ত করি, হে অন্তবিহীন।

৮১

একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
প্রতি ক্ষণে নানা বর্ণে নানা গন্ধে গীতে
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারি ভিতে।
সেথা উষা ডান হাতে ধরি স্বর্ণথালা
নিয়ে আসে একখানি মাধুর্যের মালা
নীরবে পরায়ে দিতে ধরার ললাটে;
সন্ধ্যা আসে নম্রমুখে ধেনুশূন্য মাঠে
চিহ্নহীন পথ দিয়ে লয়ে স্বর্ণঝারি
পশ্চিম-সমুদ্র হতে ভরি শান্তিবারি।

তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সঞ্চারক্ষেত্র, সেথা শুভ্র ভাস;
দিন নাই রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই গন্ধ নাই— নাই নাই বাণী।

৮২

তব প্রেমে ধন্য তুমি করেছ আমারে
প্রিয়তম, তবু শুধু মাধুর্য-মাঝারে
চাহি না নিমগ্ন করে রাখিতে হৃদয়।
আপনি যেথায় ধরা দিলে, স্নেহময়,
বিচিত্র সৌন্দর্যডোরে, কত স্নেহে প্রেমে
কত রূপে—সেথা আমি রহিব না থেমে
তোমার প্রণয়-অভিমানে। চিত্তে মোর
জড়ায়ে বাঁধিব নাকো সন্তোষের ডোর।

আমার অতীত তুমি যেথা, সেইখানে
অন্তরাত্মা ধায় নিত্য অনন্তের টানে
সকল বন্ধন-মাঝে—যেথায় উদার
অন্তহীন শান্তি আর মুক্তির বিস্তার।

তোমার মাধুর্য যেন বেঁধে নাহি রাখে,
তব ঐশ্বর্যের পানে টানে সে আমাকে।

৮৩

হে দূর হইতে দূর, হে নিকটতম,
যেথায় নিকটে তুমি সেথা তুমি মম,
যেথায় সুদূরে তুমি সেথা আমি তব।
কাছে তুমি নানা ভাবে নিত্য নব নব
সুখে দুঃখে জনমে মরণে। তব গান
জলস্থল শূন্য হতে করিছে আহ্বান
মোরে সর্ব কর্ম-মাঝে—বাজে গূঢ়স্বরে
প্রহরে প্রহরে চিত্তকুহরে-কুহরে
তোমার মঙ্গল-মন্ত্র।

যেথা দূরে তুমি
সেথা আত্মা হারাইয়া সর্ব তটভূমি
তোমার নিঃসীম-মাঝে পূর্ণানন্দভরে
আপনারে নিঃশেষিয়া সমর্পণ করে।
কাছে তুমি কর্মতট আত্মা-তটিনীর,
দূরে তুমি শান্তিসিন্ধু অনন্ত গভীর।

৮৪

মুক্ত করো, মুক্ত করো নিন্দা-প্রশংসার
দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল হতে। সে কঠিন ভার

যদি খসে যায় তবে মানুষের মাঝে
সহজে ফিরিব আমি সংসারের কাজে—
তোমারি আদেশ শুধু জয়ী হবে, নাথ।
তোমার চরণপ্রান্তে করি প্রণিপাত
তব দণ্ড পুরস্কার অন্তরে গোপনে
লইব নীরবে তুলি—

নিঃশব্দ গমনে
চলে যাব কর্মক্ষেত্র-মাঝখান দিয়া
বহিয়া অসংখ্য কাজে একনিষ্ঠ হিয়া,
সঁপিয়া অব্যর্থ গতি সহস্র চেষ্টায়
এক নিত্য ভক্তিবলে, নদী যথা ধায়
লক্ষ লোকালয়-মাঝে নানা কর্ম সারি
সমুদ্রের পানে লয়ে বন্ধহীন বারি।

৮৫

দুর্দিন ঘনায়ে এল ঘন অন্ধকারে,
হে প্রাণেশ। দিগ্‌বিদিক বৃষ্টিবারিধারে
ভেসে যায়, কুটিল কটাক্ষে হেসে যায়
নিষ্ঠুর বিদ্যুৎশিখা, উতরোল বায়
তুলিল উতলা করি অরণ্য কানন।

আজি তুমি ডাকো অভিসারে, হে মোহন,
হে জীবনস্বামী। অশ্রুসিক্ত বিশ্ব-মাঝে
কোনো দুঃখে, কোনো ভয়ে, কোনো বৃথা কাজে
রহিব না রুদ্ধ হয়ে। এ দীপ আমার
পিচ্ছিল তিমির-পথে যেন বারংবার
নিবে নাহি যায়—যেন আর্দ্র সমীরণে
তোমার আহ্বান বাজে। দুঃখের বেষ্টনে
দুর্দিন রচিল আজি নিবিড় নির্জন,
হোক আজি তোমা-সাথে একান্ত মিলন।

৮৬

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অতি দীর্ঘকাল,
হে ইন্দ্র, হৃদয়ে মম। দিক্‌চক্রবাল
ভয়ংকর শূন্য হেরি, নাই কোনোখানে
সরস সজল রেখা—কেহ নাহি আনে
নব-বারিবর্ষণের শ্যামল সংবাদ।

যদি ইচ্ছা হয়, দেব, আনো বজ্রনাদ
প্রলয়-মুখর হিংস্র ঝটিকার সাথে।

পলে পলে বিদ্যুতের বক্র কশাঘাতে
সচকিত করো মোর দিক্ দিগন্তর।
সংহরো সংহরো, প্রভো, নিস্তব্ধ প্রখর
এই রুদ্র, এই ব্যাপ্ত, এ নিঃশব্দ দাহ
নিঃসহ নৈরাশ্যতাপ। চাহো নাথ চাহো
জননী যেমন চাহে সজল নয়ানে,
পিতার ক্রোধের দিনে, সন্তানের পানে।

৮৭

আমার এ মানসের কানন কাঙাল
শীর্ণ শুষ্ক বাহু মেলি বহু দীর্ঘকাল
আছে ক্রুদ্ধ ঊর্দ্ধপানে চাহি। ওহে নাথ,
এ রুদ্র মধ্যাহ্ন-মাঝে কবে অকস্মাৎ
পথিক পবন কোন্ দূর হতে এসে
ব্যগ্র শাখা-প্রশাখায় চক্ষের নিমেষে
কানে কানে রটাইবে আনন্দমর্মর,
প্রতীক্ষায় পুলকিয়া বন-বনান্তর।

গম্ভীর মাভৈঃ মন্দ্র কোথা হতে ব'হে
তোমার প্রসাদপুঞ্জ ঘন সমারোহে
ফেলিবে আচ্ছন্ন করি নিবিড়চ্ছায়ায়।
তার পরে বিপুল বর্ষণ, তার পরে
পরদিন প্রভাতের সৌম্যরবিকরে
রিক্ত মালঞ্চের মাঝে পূজা-পুষ্পরাশি
নাহি জানি কোথা হতে উঠিবে বিকাশি।

৮৮

এ কথা মানিব আমি এক হতে দুই
কেমনে যে হতে পারে জানি না কিছুই।
কেমনে যে কিছু হয়, কেহ হয় কেহ,
কিছু থাকে কোনোরূপে, কারে বলে দেহ,
কারে বলে আত্মা মন, বুঝিতে না পেরে
চিরকাল নিরখিব বিশ্বজগতেরে
নিস্তব্ধ নির্বাক চিত্তে।

বাহিরে যাহার
কিছুতে নারিব যেতে আদি অন্ত তার,
অর্থ তার তত্ত্ব তার বুঝিব কেমনে
নিমেষের তরে। এই শুধু জানি মনে
সুন্দর সে, মহান সে, মহাভয়ংকর,
বিচিত্র সে, অজ্ঞেয় সে, মম মনোহর।

ইহা জানি কিছুই না জানিয়া অজ্ঞাতে
নিখিলের চিত্তস্রোত ধাইছে তোমাতে।

৮৯

জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে
এ আশ্চর্য সংসারের মহানিকেতনে,
সে ক্ষণ অজ্ঞাত মোর। কোন্ শক্তি মোরে
ফুটাইল এ বিপুল রহস্যের ক্রোড়ে
অর্ধরাত্রে মহারণ্যে মুকুলের মতো।

তবু তো প্রভাতে শির করিয়া উন্নত
যখনি নয়ন মেলি নিরখিনু ধরা
কনককিরণ-গাঁথা নীলাম্বর-পরা,
নিরখিনু সুখে দুঃখে খচিত সংসার
তখনি অজ্ঞাত এই রহস্য অপার
নিমেষেই মনে হল মাতৃবক্ষ-সম
নিতান্তই পরিচিত একান্তই মম।

রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি
ধরেছে আমার কাছে জননী-মুরতি।

৯০

মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।
সংসারে বিদায় দিতে, আঁখি ছলছলি
জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি'
দুই ভুজে।

ওরে মূঢ়, জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জনম-মুহূর্ত হতে তোমার অজ্ঞাতে,
তোমার ইচ্ছার পূর্বে। মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তে চেনার মতো। জীবন আমার
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

৯১

বাসনারে খর্ব করি দাও হে প্রাণেশ।
সে শুধু সংগ্রাম করে লয়ে এক লেশ
বৃহতের সাথে। পণ রাখিয়া নিখিল
জিনিয়া নিতে সে চাহে শুধু এক তিল।
বাসনার ক্ষুদ্র রাজ্য করি একাকার
দাও মোরে সন্তোষের মহা অধিকার।

অযাচিত যে সম্পদ অজস্র আকারে
উষার আলোক হতে নিশার আঁধারে
জলে স্থলে রচিয়াছে অনন্ত বিভব—
সেই সর্বলভ্য সুখ অমূল্য দুর্লভ
সব চেয়ে। সে মহা সহজ সুখখানি
পূর্ণ শতদল-সম কে দিবে গো আনি
জল স্থল আকাশের মাঝখান হতে,
ভাসাইয়া আপনারে সহজের স্রোতে।

৯২

শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন।
দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শবিষ তার
শান্তিময় পল্লী যত করে ছারখার।
যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
স্নেহে যাহা রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
ছিল তাহা ভারতের তপোবনতলে।

বস্তুভারহীন মন সর্ব জলে স্থলে
পরিব্যাপ্ত করি দিত উদার কল্যাণ,
জড়ে জীবে সর্বভূতে অবারিত ধ্যান
পশিত আত্মীয়রূপে। আজি তাহা নাশি
চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরাশি,
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর,
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর।

৯৩

কোরো না কোরো না লজ্জা, হে ভারতবাসী,
শক্তিমদমত্ত ওই বণিক বিলাসী

ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষসম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি শান্ত সৌম্যমুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।

শুনো না কী বলে তারা, তব শ্রেষ্ঠ ধন
থাকুক হৃদয়ে তব, থাক্ তাহা ঘরে,
থাক্ তাহা সুপ্রসন্ন ললাটের 'পরে
অদৃশ্য মুকুট তব। দেখিতে যা বড়ো
চক্ষে যাহা স্তূপাকার হইয়াছে জড়ো,
তারি কাছে অভিভূত হয়ে বারে বারে
লুটায়ো না আপনায়। স্বাধীন আত্মারে
দারিদ্র্যের সিংহাসনে করো প্রতিষ্ঠিত,
রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ করি চিত।

৯৪

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ, শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।

ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

৯৫

হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন,
বাহিরে তাহার অতি অল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মতো, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য যত।

আজি সভ্যতার
অন্তহীন আড়ম্বরে, উচ্চ আস্ফালনে,
দরিদ্র-রুধিরপুষ্ট বিলাস লালনে,

অগণ্য চক্রের গর্জে মুখর ঘর্ঘর
লৌহবাহু দানবের ভীষণ বর্বর
রুদ্ররক্ত-অগ্নিদীপ্ত পরম স্পর্ধায়
নিঃসংকোচে শান্তচিত্তে কে ধরিবে, হায়,
নীরব-গৌরব সেই সৌম্য দীনবেশ,
সুবিরল—নাহি যাহে চিন্তাচেষ্টালেশ।
কে রাখিবে ভরি নিজ অন্তর-আগার
আত্মার সম্পদরাশি মঙ্গল উদার।

৯৬

অন্তরের সে সম্পদ ফেলেছি হারায়ে।
তাই মোরা লজ্জানত, তাই সর্ব গায়ে
ক্ষুধার্ত দুর্ভর দৈন্য করিছে দংশন,
তাই আজি ব্রাহ্মণের বিরল বসন
সম্মান বহে না আর, নাহি ধ্যানবল
শুধু জপমাত্র আছে, শুচিত্ব কেবল,
চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার,

সন্তোষের অন্তরেতে বীর্য নাহি আর,
কেবল জড়ত্বপুঞ্জ, ধর্ম প্রাণহীন
ভারসম চেপে আছে আড়ষ্ট কঠিন।
তাই আজি দলে দলে চাই ছুটিবারে
পশ্চিমের পরিত্যক্ত বস্ত্র লুটিবারে
লুকাতে প্রাচীন দৈন্য। বৃথা চেষ্টা, ভাই,
সব সজ্জা লজ্জা-ভরা, চিত্ত যেথা নাই।

৯৭

শক্তি মোর অতি অল্প, হে দীনবৎসল,
আশা মোর অল্প নহে। তব জলস্থল
তব জীবলোক-মাঝে যেথা আমি যাই
যেথায় দাঁড়াই আমি সর্বত্রই চাই
আমার আপন স্থান। দানপত্রে তব
তোমার নিখিলখানি আমি লিখি লব।

আপনারে নিশিদিন আপনি বহিয়া
প্রতি ক্ষণে ক্লান্ত আমি। শ্রান্ত সেই হিয়া
তোমার সবার মাঝে করিব স্থাপন
তোমার সবারে করি আমার আপন।

নিজ ক্ষুদ্র দুঃখ সুখ জলঘট-সম
চাপিছে দুর্ভর ভার মস্তকেতে মম।
ভাঙি তাহা ডুব দিব বিশ্বসিন্ধুনীরে,
সহজে বিপুল জল বহি যাবে শিরে।

৯৮

মাঝে মাঝে কভু যবে অবসাদ আসি
অন্তরের আলোক পলকে ফেলে গ্রাসি,
মন্দপদে যবে শ্রান্তি আসে তিল তিল
তোমার পূজার বৃন্ত করে সে শিথিল
ম্রিয়মাণ—তখনো না যেন করি ভয়,
তখনো অটল আশা যেন জেগে রয়
তোমা-পানে।

তোমা-'পরে করিয়া নির্ভর
সে শ্রান্তির রাত্রে যেন সকল অন্তর
নির্ভয়ে অর্পণ করি পথধূলিতলে
নিদ্রারে আহ্বান করি। প্রাণপণ বলে
ক্লান্ত চিত্তে নাহি তুলি ক্ষীণ কলরব
তোমার পূজার অতি দরিদ্র উৎসব।

রাত্রি এনে দাও তুমি দিবসের চোখে
আবার জাগাতে তারে নবীন আলোকে।

৯৯

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ়বলে, অন্তরের অন্তর হইতে
প্রভু মোর। বীর্য দেহো সুখের সহিতে,
সুখেরে কঠিন করি, বীর্য দেহো দুখে,
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে, ভকতিরে বীর্য দেহো
কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে ওঠে ফুটি, বীর্য দেহো ক্ষুদ্র জনে
না করিতে হীন জ্ঞান, বলের চরণে
না লুটিতে, বীর্য দেহো চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দিতে রাখি।

বীর্য দেহো তোমার চরণে পাতি শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির।

১০০

সংসারে মোরে রাখিয়াছ যেই ঘরে
　　সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া।
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে,
　　রেখে দিয়ো তার একটি দুয়ার খুলিয়া।
মোর সব কাজে মোর সব অবসরে
সে দুয়ার রবে তোমারি প্রবেশ-তরে,
সেথা হতে বায়ু বহিবে হৃদয়-'পরে
　　চরণ হইতে তব পদরজ তুলিয়া।
সে দুয়ার খুলি আসিবে তুমি এ ঘরে,
　　আমি বাহিরিব সে দুয়ারখানি খুলিয়া।

আর যত সুখ পাই বা না পাই, তবু
　　এক সুখ শুধু মোর তরে তুমি রাখিয়ো।
সে সুখ কেবল তোমার আমার, প্রভু,
　　সে সুখের 'পরে তুমি জাগ্রত থাকিয়ো।
তাহারে না ঢাকে আর যত সুখগুলি,
সংসার যেন তাহাতে না দেয় ধুলি,
সব কোলাহল হতে তারে তুমি তুলি
　　যতন করিয়া আপন অঙ্কে ঢাকিয়ো।
আর যত সুখে ভরুক ভিক্ষাঝুলি
　　সেই এক সুখ মোর তরে তুমি রাখিয়ো।

যত বিশ্বাস ভেঙে ভেঙে যায়, স্বামী,
　　এক বিশ্বাস রহে যেন চিতে লাগিয়া।
যে অনলতাপ যখনি সহিব আমি
　　দেয় যেন তাহে তব নাম বুকে দাগিয়া।
দুখ পশে যবে মর্মের মাঝখানে
তোমার লিখন-স্বাক্ষর যেন আনে,
রুক্ষ বচন যতই আঘাত হানে
　　সকল আঘাতে তব সুর উঠে জাগিয়া।
শত বিশ্বাস ভেঙে যদি যায় প্রাণে
　　এক বিশ্বাসে রহে যেন মন লাগিয়া।

মৃণালিনী দেবী

স্মরণ

৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯

১

আজি প্রভাতেও শ্রান্ত নয়নে
রয়েছে কাতর ঘোর।
দুখশয্যায় করি জাগরণ
রজনী হয়েছে ভোর।
নব ফুটন্ত ফুল-কাননের,
নব জাগ্রত শীত-পবনের
সাথী হইবারে পারে নি আজিও
এ দেহ-হৃদয় মোর।

আজি মোর কাছে প্রভাত তোমার
করো গো আড়াল করো।
এ খেলা এ মেলা এ আলো এ গীত
আজি হেথা হতে হরো।
প্রভাত-জগৎ হতে মোরে ছিঁড়ি
করুণ আঁধারে লহো মোরে ঘিরি,
উদাস হিয়ারে তুলিয়া বাঁধুক
তব স্নেহবাহুডোর।

২

সে যখন বেঁচে ছিল গো, তখন
যা দিয়েছে বার বার
তার প্রতিদান দিব যে এখন
সে সময় নাহি আর।
রজনী তাহার হয়েছে প্রভাত,
তুমি তারে আজি লয়েছ হে নাথ,
তোমারি চরণে দিলাম সঁপিয়া
কৃতজ্ঞ উপহার।

তার কাছে যত করেছিনু দোষ,
যত ঘটেছিল ত্রুটি,
তোমা-কাছে তার মাগি লব ক্ষমা
চরণের তলে লুটি।
তারে যাহা-কিছু দেওয়া হয় নাই,
তারে যাহা-কিছু সঁপিবারে চাই,
তোমারি পূজার থালায় ধরিনু
আজি সে প্রেমের হার।

৩

প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি দ্বার—
আর কভু আসিবে না।
বাকি আছে শুধু আরেক অতিথি আসিবার
তারি সাথে শেষ চেনা।
সে আসি প্রদীপ নিবাইয়া দিবে একদিন,
তুলি লবে মোরে রথে,
নিয়ে যাবে মোরে গৃহ হতে কোন্ গৃহহীন
গ্রহতারকার পথে।

ততকাল আমি একা বসি রব খুলি দ্বার
কাজ করি লব শেষ।
দিন হবে যবে আরেক অতিথি আসিবার
পাবে না সে বাধালেশ।
পূজা-আয়োজন সব সারা হবে একদিন,
প্রস্তুত হয়ে রব,
নীরবে বাড়ায়ে বাহু-দুটি সেই গৃহহীন
অতিথিরে বরি লব।

যে জন আজিকে ছেড়ে চলে গেল খুলি দ্বার
সেই বলে গেল ডাকি,
মোছো আঁখিজল, আরেক অতিথি আসিবার
এখনো রয়েছে বাকি।
সেই বলে গেল, গাঁথা সেরে নিয়ো একদিন
জীবনের কাঁটা বাছি,
নব গৃহ-মাঝে বহি এনো, তুমি গৃহহীন,
পূর্ণ মালিকাগাছি।

৪

তখন নিশীথ রাত্রি; গেলে ঘর হতে
যে পথে চল নি কভু সে অজানা পথে।
যাবার বেলায় কোনো বলিলে না কথা,
লইয়া গেলে না কারো বিদায়-বারতা।
সুপ্তিমগ্ন বিশ্ব-মাঝে বাহিরিলে একা,
অন্ধকারে খুঁজিলাম, না পেলাম দেখা।
মঙ্গল মুরতি সেই চিরপরিচিত
অগণ্য তারার মাঝে কোথা অন্তর্হিত।

গেলে যদি একেবারে গেলে রিক্ত হাতে?
এ ঘর হইতে কিছু নিলে না কি সাথে?
বিশ বৎসরের তব সুখদুঃখভার
ফেলে রেখে দিয়ে গেলে কোলেতে আমার!
প্রতি দিবসের প্রেমে কতদিন ধরে
যে ঘর বাঁধিলে তুমি সুমঙ্গল-করে,
পরিপূর্ণ করি তারে স্নেহের সঞ্চয়ে
আজ তুমি চলে গেলে কিছু নাহি লয়ে?

তোমার সংসার-মাঝে, হায়, তোমা-হীন
এখনো আসিবে কত সুদিন-দুর্দিন—
তখন এ শূন্য ঘরে চিরাভ্যাস-টানে
তোমারে খুঁজিতে এসে চাব কার পানে?
আজ শুধু এক প্রশ্ন মোর মনে জাগে—
হে কল্যাণী, গেলে যদি, গেলে মোর আগে,
মোর লাগি কোথাও কি দুটি স্নিগ্ধ করে
রাখিবে পাতিয়া শয্যা চিরসন্ধ্যা-তরে?

৫

আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই,
যাই আর ফিরে আসি, খুঁজিয়া না পাই।
আমার ঘরেতে নাথ, এইটুকু স্থান—
সেথা হতে যা হারায় মেলে না সন্ধান।
অনন্ত তোমার গৃহ, বিশ্বময় ধাম,
হে নাথ, খুঁজিতে তারে সেথা আসিলাম।
দাঁড়ালেম তব সন্ধ্যা-গগনের তলে,
চাহিলাম তোমা-পানে নয়নের জলে।
কোনো মুখ, কোনো সুখ, আশাতৃষা কোনো
যেথা হতে হারাইতে পারে না কখনো,
সেথায় এনেছি মোর পীড়িত এ হিয়া,
দাও তারে, দাও তারে, দাও ডুবাইয়া।
ঘরে মোর নাহি আর যে অমৃতরস,
বিশ্ব-মাঝে পাই সেই হারানো পরশ।

৬

ঘরে যবে ছিলে মোরে ডেকেছিলে ঘরে
তোমার করুণাপূর্ণ সুধাকণ্ঠস্বরে।
আজ তুমি বিশ্ব-মাঝে চলে গেলে যবে
বিশ্ব-মাঝে ডাকো মোরে সে করুণ রবে।

খুলি দিয়া গেলে তুমি যে-গৃহদুয়ার
সে দ্বার রুধিতে কেহ কহিবে না আর।
বাহিরের রাজপথ দেখালে আমায়,
মনে রয়ে গেল তব নিঃশব্দ বিদায়।
আজি বিশ্বদেবতার চরণ-আশ্রয়ে
গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে।
নিখিল নক্ষত্র হতে কিরণের রেখা
সীমন্তে আঁকিয়া দিক্‌ সিন্দুরের লেখা।
একান্তে বসিয়া আজি করিতেছি ধ্যান
সবার কল্যাণে হোক তোমার কল্যাণ।

৭

যত দিন কাছে ছিলে বলো কী উপায়ে
আপনারে রেখেছিলে এমন লুকায়ে?
ছিলে তুমি আপনার কর্মের পশ্চাতে
অন্তর্যামী বিধাতার চোখের সাক্ষাতে।
প্রতি দন্ড-মুহূর্তের অন্তরাল দিয়া
নিঃশব্দে চলিয়া গেছ নম্র-নত-হিয়া।
আপন সংসারখানি করিয়া প্রকাশ
আপনি ধরিয়াছিলে কী অজ্ঞাতবাস!
আজি যবে চলি গেলে খুলিয়া দুয়ার
পরিপূর্ণ রূপখানি দেখালে তোমার।
জীবনের সব দিন সব খন্ড কাজ
ছিন্ন হয়ে পদতলে পড়ি গেল আজ।
তব দৃষ্টিখানি আজি বহে চিরদিন
চির-জনমের দেখা পলক-বিহীন।

৮

মিলন সম্পূর্ণ আজি হল তোমা-সনে
এ বিচ্ছেদ-বেদনার নিবিড় বন্ধনে।
এসেছ একান্ত কাছে, ছাড়ি দেশকাল
হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙি অন্তরাল।
তোমারি নয়নে আজ হেরিতেছি সব,
তোমারি বেদনা বিশ্বে করি অনুভব।
তোমার অদৃশ্য হাত হেরি মোর কাজে,
তোমারি কামনা মোর কামনার মাঝে।
দুজনের কথা দোঁহে শেষ করি লব
সে রাত্রে ঘটে নি হেন অবকাশ তব?

বাণীহীন বিদায়ের সেই বেদনায়
চারি দিকে চাহিয়াছি ব্যর্থ বাসনায়।
আজি এ হৃদয়ে সর্ব-ভাবনার নিচে
তোমার আমার বাণী একত্রে মিলিছে।

৯

হে লক্ষ্মী, তোমার আজি নাই অন্তঃপুর।
সরস্বতী-রূপ আজি ধরেছ মধুর,
দাঁড়ায়েছ সংগীতের শতদল-দলে।
মানস-সরসী আজি তব পদতলে
নিখিলের প্রতিবিম্বে রচিছে তোমায়।
চিত্তের সৌন্দর্য তব বাধা নাহি পায়—
সে আজি বিশ্বের মাঝে মিশিছে পুলকে
সকল আনন্দে আর সকল আলোকে
সকল মঙ্গল-সাথে। তোমার কঙ্কণ
কোমল কল্যাণপ্রভা করেছে অর্পণ
সকল সতীর করে। স্নেহাতুর হিয়া
নিখিল নারীর চিত্তে গিয়েছে লাগিয়া।
সেই বিশ্বমূর্তি তব আমারি অন্তরে
লক্ষ্মী-সরস্বতী-রূপে পূর্ণরূপ ধরে।

শান্তিনিকেতন
৪ পৌষ

১০

তোমার সকল কথা বল নাই, পার নি বলিতে,
আপনারে খর্ব করি রেখেছিলে, তুমি হে লজ্জিতে,
যতদিন ছিলে হেথা। হৃদয়ের গূঢ় আশাগুলি
যখন চাহিত তারা কাঁদিয়া উঠিতে কণ্ঠ তুলি
তর্জনী-ইঙ্গিতে তুমি গোপনে করিতে সাবধান
ব্যাকুল সংকোচবশে, পাছে ভুলে পায় অপমান।
আপনার অধিকার নীরবে নির্মম নিজ করে
রেখেছিলে সংসারের সবার পশ্চাতে হেলাভরে।
লজ্জার অতীত আজি মৃত্যুতে হয়েছ মহীয়সী—
মোর হৃদিপদ্মদলে নিখিলের অগোচরে বসি
নতনেত্রে বলো তব জীবনের অসমাপ্ত কথা
ভাষাবাধাহীন বাক্যে। দেহমুক্ত তব বাহুলতা
জড়াইয়া দাও মোর মর্মের মাঝারে একবার—
আমার অন্তরে রাখো তোমার অন্তিম অধিকার।

শান্তিনিকেতন
৪ পৌষ

১১

মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে
নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহ-মন্দিরে
নিঃশব্দ চরণপাতে। ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি
ঘুচেছে মরণস্নানে। অপরূপ নব রূপখানি
লভিয়াছ এ বিশ্বের লক্ষ্মীর অক্ষয় কৃপা হতে।
স্মিতস্নিগ্ধমুগ্ধমুখে এ চিত্তের নিভৃত আলোতে
নির্বাক দাঁড়ালে আসি। মরণের সিংহদ্বার দিয়া
সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি, প্রিয়া।
আজি বাজে নাই বাদ্য, ঘটে নাই জনতা-উৎসব,
জ্বলে নাই দীপমালা; আজিকার আনন্দ-গৌরব
প্রশান্ত গভীর স্তব্ধ বাক্যহারা অশ্রুনিমগন।
আজিকার এই বার্তা জানে নি শোনে নি কোনো জন।
আমার অন্তর শুধু জ্বেলেছে প্রদীপ একখানি,
আমার সংগীত শুধু একা গাঁথে মিলনের বাণী।

শান্তিনিকেতন
৪ পৌষ

১২

আপনার মাঝে আমি করি অনুভব
পূর্ণতর আজি আমি। তোমার গৌরব
মুহূর্তে মিশায়ে তুমি দিয়েছ আমাতে।
ছোঁয়ায়ে দিয়েছ তুমি আপনার হাতে
মৃত্যুর পরশমণি আমার জীবনে।
উঠেছ আমার শোকযজ্ঞহুতাশনে
নবীন নির্মল মূর্তি, আজি তুমি সতী
ধরিয়াছ অনিন্দিত সতীত্বের জ্যোতি,
নাহি তাহে শোকদাহ, নাহি মলিনিমা—
ক্লান্তিহীন কল্যাণের বহিয়া মহিমা
নিঃশেষে মিশিয়া গেছে মোর চিত্ত-সনে।
তাই আজি অনুভব করি সর্বমনে—
মোর পুরুষের প্রাণ গিয়েছে বিস্তারি
নিত্য তাহে মিলি গিয়া মৃত্যুহীন নারী।

শান্তিনিকেতন
৫ পৌষ

১৩

তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।
চির-বিদায়ের আভা দিয়া
রাঙায়ে গিয়েছ মোর হিয়া,
এঁকে গেছ সব ভাবনায়
সূর্যাস্তের বরন-চাতুরী।
জীবনের দিক্‌চক্রসীমা
লভিয়াছে অপূর্ব মহিমা,
অশ্রুধৌত হৃদয়-আকাশে
দেখা যায় দূর স্বর্গপুরী।
তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।

তুমি ওগো কল্যাণরূপিণী,
মরণেরে করেছ মঙ্গল।
জীবনের পরপার হতে
প্রতি ক্ষণে মর্ত্যের আলোতে
পাঠাইছ তব চিত্তখানি
মৌনপ্রেমে সজল-কোমল।
মৃত্যুর নিভৃত স্নিগ্ধ ঘরে
বসে আছ বাতায়ন-'পরে—
জ্বালায়ে রেখেছ দীপখানি
চিরন্তন আশায় উজ্জ্বল।
তুমি ওগো কল্যাণরূপিণী,
মরণেরে করেছ মঙ্গল।

তুমি মোর জীবন মরণ
বাঁধিয়াছ দুটি বাহু দিয়া।
প্রাণ তব করি অনাবৃত
মৃত্যু-মাঝে মিলালে অমৃত,
মরণেরে জীবনের প্রিয়
নিজ হাতে করিয়াছ, প্রিয়া।
খুলিয়া দিয়াছ দ্বারখানি,
যবনিকা লইয়াছ টানি,
জন্ম-মরণের মাঝখানে
নিস্তব্ধ রয়েছ দাঁড়াইয়া।
তুমি মোর জীবন মরণ
বাঁধিয়াছ দুটি বাহু দিয়া।

বোলপুর। শান্তিনিকেতন
২৯ অগ্রহায়ণ ১৩০৯

১৪

দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি—
স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু-চারিটি
স্মৃতির খেলেনা-ক'টি বহু যত্নভরে
গোপনে সঞ্চয় করি রেখেছিলে ঘরে।
যে প্রবল কালস্রোতে প্রলয়ের ধারা
ভাসাইয়া যায় কত রবিচন্দ্রতারা,
তারি কাছ হতে তুমি বহু ভয়ে ভয়ে
এই ক'টি তুচ্ছ বস্তু চুরি করে লয়ে
লুকায়ে রাখিয়াছিলে, বলেছিলে মনে,
অধিকার নাই কারো আমার এ ধনে।
আশ্রয় আজিকে তারা পাবে কার কাছে?
জগতের কারো নয় তবু তারা আছে।
তাদের যেমন তব রেখেছিল স্নেহ,
তোমারে তেমনি আজ রাখে নি কি কেহ?

বোলপুর
২ পৌষ ১৩০৯

১৫

এ সংসারে একদিন নববধূবেশে
তুমি যে আমার পাশে দাঁড়াইলে এসে,
রাখিলে আমার হাতে কম্পমান হাত
সে কি অদৃষ্টের খেলা, সে কি অকস্মাৎ?
শুধু এক মুহূর্তের এ নহে ঘটনা,
অনাদিকালের এই আছিল মন্ত্রণা।
দোঁহার মিলনে মোরা পূর্ণ হব দোঁহে,
বহু যুগ আসিয়াছি এই আশা বহে।
নিয়ে গেছ কতখানি মোর প্রাণ হতে,
দিয়ে গেছ কতখানি এ জীবনস্রোতে!
কত দিনে কত রাতে কত লজ্জাভয়ে
কত ক্ষতিলাভে কত জয়ে পরাজয়ে
রচিতেছিলাম যাহা মোরা শ্রান্তিহারা
সাঙ্গ কে করিবে তাহা মোরা দোঁহে ছাড়া?

শান্তিনিকেতন
২ পৌষ ১৩০৯

দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি
স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু-চারটি
স্মৃতির খেলেনা গুলি বহুযত্নভরে
গোপনে সঞ্চয় করি রেখেছিলে ঘরে।
যে প্রবল কালস্রোতে প্রলয়ের ধারা
ভাসাইয়া যায় কত রবিচন্দ্র তারা
তারি কাছ হতে তুমি বহু ভয়ে ভয়ে
এই কটি তুচ্ছ বস্তু চুরি করে লয়ে
লুকায়ে রাখিয়াছিলে,—বলেছিলে মনে
অধিকার নাই কারো আমার এ ধনে!
আশ্রয় আজিকে তারা পাবে কার কাছে?
জগতের কারো নয়, তবু তারা আছে!
তাদের যেমন তব রেখেছিল স্নেহ
তোমারে তেমনি আজ রাখেনি কি কেহ?

২৫. পৌষ
বোলপুর.

স্মরণ-পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

১৬

স্বল্প-আয়ু এ জীবনে যে-কয়টি আনন্দিত দিন—
কম্পিত পুলকভরে, সংগীতের বেদনা-বিলীন—
লাভ করেছিলে, লক্ষ্মী, সে কি তুমি নষ্ট করি যাবে?
সে আজি কোথায় তুমি যত্ন করি রাখিছ কী ভাবে
তাই আমি খুঁজিতেছি। সূর্যাস্তের স্বর্ণমেঘস্তরে
চেয়ে দেখি একদৃষ্টে—সেথা কোন্ করুণ অক্ষরে
লিখিয়াছ সে জন্মের সায়াহ্নের হারানো কাহিনী।
আজি এই দ্বিপ্রহরে পল্লবের মর্মর-রাগিণী
তোমার সে কবেকার দীর্ঘশ্বাস করিছে প্রচার।
আতপ্ত শীতের রৌদ্রে নিজহস্তে করিছ বিস্তার
কত শীতমধ্যাহ্নের সুনিবিড় সুখের স্তব্ধতা।
আপনার পানে চেয়ে বসে বসে ভাবি এই কথা—
কত তব রাত্রিদিন কত সাধ মোরে ঘিরে আছে,
তাদের ক্রন্দন শুনি ফিরে ফিরে ফিরিতেছে কাছে।

শান্তিনিকেতন
৩ পৌষ ১৩০৯

১৭

বজ্র যথা বর্ষণেরে আনে অগ্রসরি
কে জানিত তব শোক সেইমতো করি
আনি দিবে অকস্মাৎ জীবনে আমার
বাধাহীন মিলনের নিবিড় সঞ্চার।
মোর অশ্রুবিন্দুগুলি কুড়ায়ে আদরে
গাঁথিয়া সীমন্তে পরি' ব্যর্থশোক-'পরে
নীরবে হানিছ তব কৌতুকের হাসি।
ক্রমে সবা হতে যত দূরে গেলে ভাসি
তত মোর কাছে এলে। জানি না কী করে,
সবারে বঞ্চিয়া তব সব দিলে মোরে।
মৃত্যু-মাঝে আপনারে করিয়া হরণ
আমার জীবনে তুমি ধরেছ জীবন,
আমার নয়নে তুমি পেতেছ আলোক—
এই কথা মনে জানি' নাই মোর শোক।

শান্তিনিকেতন
৬ পৌষ ১৩০৯

১৮

সংসার সাজায়ে তুমি আছিলে রমণী;
আমার জীবন আজি সাজাও তেমনি

নির্মল সুন্দর করে। ফেলি দাও বাছি
যেথা আছে যত ক্ষুদ্র তৃণকুটাগাছি—
অনেক আলস্যক্লান্ত দিনরজনীর
উপেক্ষিত ছিন্নখণ্ড যত। আনো নীর,
সকল কলঙ্ক আজি করো গো মার্জনা,
বাহিরে ফেলিয়া দাও যত আবর্জনা।
যেথা মোর পূজাগৃহ নিভৃত মন্দিরে
সেথায় নীরবে এসো দ্বার খুলি ধীরে—
মঙ্গল-কনক-ঘটে পুণ্যতীর্থ-জল
সযত্নে ভরিয়া রাখো, পূজা-শতদল
স্বহস্তে তুলিয়া আনো। সেথা দুইজনে
দেবতার সম্মুখেতে বসি একাসনে।

৭ পৌষ

১৯

পাগল বসন্ত-দিন কতবার অতিথির বেশে
তোমার আমার দ্বারে বীণা হাতে এসেছিল হেসে;
লয়ে তার কত গীত কত মন্ত্র মন ভুলাবার,
জাদু করিবার কত পুষ্পপত্র আয়োজন-ভার।
কুহুতানে হেঁকে গেছে, 'খোলো ওগো খোলো দ্বার খোলো।
কাজকর্ম ভোলো আজি, ভোলো বিশ্ব, আপনারে ভোলো।'
এসে এসে কত দিন চলে গেছে দ্বারে দিয়ে নাড়া,
আমি ছিনু কোন্ কাজে, তুমি তারে দাও নাই সাড়া।
আজ তুমি চলে গেছ, সে এল দক্ষিণ-বায়ু বাহি,
আজ তারে ক্ষণকাল ভুলে থাকি হেন সাধ্য নাহি।
আনিছে সে দৃষ্টি তব, তোমার প্রকাশহীন বাণী,
মর্মরি তুলিছে কুঞ্জে তোমার আকুল চিত্তখানি।
মিলনের দিনে যারে কতবার দিয়েছিনু ফাঁকি,
তোমার বিচ্ছেদ তারে শূন্যঘরে আনে ডাকি ডাকি।

শান্তিনিকেতন
২৫ পৌষ ১৩০৯

২০

এসো বসন্ত, এসো আজ তুমি
আমারো দুয়ারে এসো।
ফুল তোলা নাই, ভাঙা আয়োজন,
নিবে গেছে দীপ, শূন্য আসন,

আমার ঘরের শ্রীহীন মলিন
দীনতা দেখিয়া হেসো,
তবু বসন্ত, তবু আজ তুমি
আমারো দুয়ারে এসো।

আজিকে আমার সব বাতায়ন
রয়েছে, রয়েছে খোলা।
বাধাহীন দিন পড়ে আছে আজ,
নাই কোনো আশা, নাই কোনো কাজ,
আপনা-আপনি দক্ষিণ-বায়ে
দুলিছে চিত্ত-দোলা।
শূন্য ঘরের সব বাতায়ন
আজিকে রয়েছে খোলা।

কত দিবসের হাসি ও কান্না
হেথা হয়ে গেছে সারা।
ছাড়া পাক তারা তোমার আকাশে,
নিশ্বাস পাক তোমার বাতাসে,
নব নব রূপে লভুক জন্ম
বকুলে চাঁপায় তারা,
গত দিবসের হাসি ও কান্না
যত হয়ে গেছে সারা।

আমার বক্ষে বেদনার মাঝে
করো তব উৎসব।
আনো তব হাসি, আনো তব বাঁশি,
ফুলপল্লব আনো রাশি রাশি,
ফিরিয়া ফিরিয়া গান গেয়ে যাক
যত পাখি আছে সব,
বেদনা আমার ধ্বনিত করিয়া
করো তব উৎসব।

সেই কলরবে অন্তর-মাঝে
পাব, পাব আমি সাড়া।
দ্যুলোকে ভূলোকে বাঁধি এক দল
তোমরা করিবে যবে কোলাহল,
হাসিতে হাসিতে মরণের দ্বারে
বারে বারে দিবে নাড়া—
সেই কলরবে অন্তর-মাঝে
পাব, পাব আমি সাড়া।

শান্তিনিকেতন
২৮ পৌষ ১৩০৯

২১

বহুরে যা এক করে; বিচিত্রেরে করে যা সরস—
প্রভূতেরে করি আনে নিজ ক্ষুদ্র তর্জনীর বশ;
বিবিধ-প্রয়াস-ক্ষুব্ধ দিবসেরে লয়ে আসে ধীরে
সুপ্তি-সুনিবিড় শান্ত স্বর্ণময় সন্ধ্যার তিমিরে
ধ্রুবতারা-দীপ-দীপ্ত সুতৃপ্ত নিভৃত অবসানে;
বহুবাক্য-ব্যাকুলতা ডুবায় যা একখানি গানে
বেদনার সুধারসে—সেই প্রেম হতে মোরে প্রিয়া
রেখো না বঞ্চিত করি; প্রতিদিন থাকিয়ো জাগিয়া;
আমার দিনান্ত-মাঝে কঙ্কণের কনক কিরণ
নিদ্রার আঁধারপটে আঁকি দিবে সোনার স্বপন;
তোমার চরণ-পাত মোর স্তব্ধ সায়াহ্ন-আকাশে
নিঃশব্দে পড়িবে ধরা আরক্তিম অলক্ত-আভাসে;
এ জীবন নিয়ে যাবে অনিমেষ নয়নের টানে
তোমার আপন কক্ষে পরিপূর্ণ মরণের পানে।

শান্তিনিকেতন
১৬ পৌষ

২২

যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি—
যে ভাবে সুন্দর তিনি সর্ব চরাচরে,
যে ভাবে আনন্দ তাঁর প্রেমে খেলা করে,
যে ভাবে লতায় ফুল, নদীতে লহরী,
যে ভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী,
যে ভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি করে দান,
তটিনী ধরারে স্তন্য করাইছে পান,
যে ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচনা,
হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য-আভাসে।

শান্তিনিকেতন
১ মাঘ ১৩০৯

২৩

জ্বালো ওগো জ্বালো ওগো সন্ধ্যাদীপ জ্বালো।
হৃদয়ের এক প্রান্তে ওইটুকু আলো
স্বহস্তে জাগায়ে রাখো। তাহারি পশ্চাতে
আপনি বসিয়া থাকো আসন্ন এ রাতে
যতনে বাঁধিয়া বেণী সাজি রক্তাম্বরে
আমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত কাড়িবার তরে
জীবনের জাল হতে। বুঝিয়াছি আজি
বহুকর্মকীর্তিখ্যাতি আয়োজনরাজি
শুষ্ক বোঝা হয়ে থাকে, সব হয় মিছে
যদি সেই স্তূপাকার উদ্‌যোগের পিছে
না থাকে একটি হাসি; নানা দিক হতে
নানা দর্প নানা চেষ্টা সন্ধ্যার আলোতে
এক গৃহে ফিরে যদি নাহি রাখে স্থির
একটি প্রেমের পায়ে শ্রান্ত নতশির।

১৪ পৌষ

২৪

গোধূলি নিঃশব্দে আসি আপন অঞ্চলে ঢাকে যথা
কর্মক্লান্ত সংসারের যত ক্ষত যত মলিনতা,
ভগ্ন-ভবনের দৈন্য, ছিন্ন-বসনের লজ্জা যত—
তব লাগি স্তব্ধ শোক স্নিগ্ধ দুই হাতে সেইমতো
প্রসারিত ক'রে দিক অবারিত উদার তিমির
আমার এ জীবনের বহু ক্ষুব্ধ দিনযামিনীর
স্খলন খণ্ডতা ক্ষতি ভগ্ন-দীর্ণ জীর্ণতার 'পরে—
সব ভালো-মন্দ নিয়ে মোর প্রাণ দিক এক ক'রে
বিষাদের একখানি স্বর্ণময় বিশাল বেষ্টনে।
আজ কোনো আকাঙ্ক্ষার কোনো ক্ষোভ নাহি থাক্ মনে,
অতীত অতৃপ্তি-পানে যেন নাহি চাই ফিরে ফিরে—
যাহা-কিছু গেছে যাক, আমি চলে যাই ধীরে ধীরে
তোমার মিলনদীপ অকম্পিত যেথায় বিরাজে
ত্রিভুবন-দেবতার ক্লান্তিহীন আনন্দের মাঝে।

শান্তিনিকেতন
৩ জানুয়ারি ১৯০৩

২৫

জাগো রে জাগো রে চিত্ত জাগো রে,
জোয়ার এসেছে অশ্রুসাগরে।

কূল তার নাহি জানে,
বাঁধ আর নাহি মানে,
তাহারি গর্জনগানে জাগো রে।
তরী তোর নাচে অশ্রুসাগরে।

আজি এ উষার পুণ্য-লগনে
উঠেছে নবীন সূর্য গগনে।
দিশাহারা বাতাসেই
বাজে মহামন্ত্র সেই
অজানা যাত্রার এই লগনে
দিক হতে দিগন্তের গগনে।

জানি না উদার শুভ্র আকাশে
কী জাগে অরুণদীপ্ত আভাসে।
জানি না কিসের লাগি
অতল উঠেছে জাগি
বাহু তোলে কারে মাগি আকাশে,
পাগল কাহার দীপ্ত আভাসে।

শূন্য মরুময় সিন্ধু-বেলাতে
বন্যা মাতিয়াছে রুদ্র-খেলাতে।
হেথায় জাগ্রত দিন
বিহঙ্গের গীতহীন,
শূন্য এ বালুকা-লীন বেলাতে,
এই ফেন-তরঙ্গের খেলাতে।

দুলে রে দুলে রে অশ্রু দুলে রে,
আঘাত করিয়া বক্ষ-কূলে রে।
সম্মুখে অনন্ত লোক
যেতে হবে যেথা হোক,
অকূল আকুল শোক দুলে রে,
ধায় কোন্ দূর স্বর্ণ-কূলে রে।

আঁকড়ি থেকো না অন্ধ ধরণী,
খুলে দে খুলে দে বন্ধ তরণী।
অশান্ত পালের 'পরে
বায়ু লাগে হাহা ক'রে,
দূরে তোর থাক্ পড়ে ধরণী।
আর না রাখিস রুদ্ধ তরণী।

১১ পৌষ ১৩০৯

২৬

আজিকে তুমি ঘুমাও আমি জাগিয়া রব দুয়ারে,
রাখিব জ্বালি আলো।
তুমি তো ভালো বেসেছ আজি একাকী শুধু আমারে
বাসিতে হবে ভালো।
আমার লাগি তোমারে আর হবে না কভু সাজিতে,
তোমার লাগি আমি
এখন হতে হৃদয়খানি সাজায়ে ফুলরাজিতে
রাখিব দিনযামী।

তোমার বাহু কত-না দিন শ্রান্তি-দুখ ভুলিয়া
গিয়েছে সেবা করি,
আজিকে তারে সকল তার কর্ম হতে তুলিয়া
রাখিব শিরে ধরি।
এবার তুমি তোমার পূজা সাঙ্গ করি চলিলে
সঁপিয়া মনপ্রাণ,
এখন হতে আমার পূজা লহো গো আঁখি-সলিলে,
আমার স্তবগান।

শান্তিনিকেতন
২৩ পৌষ ১৩০৯

২৭

ভালো তুমি বেসেছিলে এই শ্যাম ধরা,
তোমার হাসিটি ছিল বড়ো সুখে ভরা।
মিলি নিখিলের স্রোতে
জেনেছিলে খুশি হতে,
হৃদয়টি ছিল তাই হৃদিপ্রাণহরা।
তোমার আপন ছিল এই শ্যাম ধরা।

আজি এ উদাস মাঠে আকাশ বাহিয়া
তোমার নয়ন যেন ফিরিছে চাহিয়া।
তোমার সে-হাসিটুক
সে চেয়ে-দেখার সুখ
সবারে পরশি চলে বিদায় গাহিয়া
এই তালবন গ্রাম প্রান্তর বাহিয়া।

তোমার সে ভালো-লাগা মোর চোখে আঁকি,
আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছ রাখি।
আজি আমি একা-একা
দেখি দুজনের দেখা,

তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি,
আমার তারায় তব মুগ্ধদৃষ্টি আঁকি।

এই-যে শীতের আলো শিহরিছে বনে,
শিরীষের পাতাগুলি ঝরিছে পবনে—
তোমার আমার মন
খেলিতেছে সারাক্ষণ
এই ছায়া-আলোকের আকুল কম্পনে,
এই শীত-মধ্যাহ্নের মর্মরিত বনে।

আমার জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো।
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচো।
যেন আমি বুঝি মনে
অতিশয় সংগোপনে
তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ।
আমারি জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো!

১ পৌষ

শিরোনাম-সূচী

প্রথম ছত্রের সূচী

ছত্র। গ্রন্থ পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ | পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ		পৃষ্ঠা
এ সংসারে একদিন নববধূবেশে। স্মরণ	...	১০২০
এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগরেখা। নৈবেদ্য	...	৯৯২
এই-যে জগৎ হেরি আমি। সন্ধ্যাসংগীত	...	২০
একটি মেয়ে একেলা। ছবি ও গান	...	১২৩
একটুখানি সোনার বিন্দু, একটুখানি মুখ। ছবি ও গান	...	১২৫
একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে। নৈবেদ্য	...	৯৮৯
একদা এলোচুলে কোন্ ভুলে ভুলিয়া। মানসী	...	৩০৯
একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে। কল্পনা	...	৮০১
একদা তুলসীদাস জাহ্নবীর তীরে। কথা	...	৭৬১
একদা পুলকে প্রভাত-আলোকে। সোনার তরী	...	৫০৯
একদা প্রাতে কুঞ্জতলে। চিত্রা	...	৬২৭
এক দিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ। চৈতালি	...	৬৫৮
এক দিন গরজিয়া কহিল মহিষ। কণিকা	...	৬৯৫
একদিন দেখিলাম উলঙ্গ সে ছেলে। চৈতালি	...	৬৬৪
এক দিন শিখগুরু গোবিন্দ নির্জনে। কথা	..	৭৭০
এক যদি আর হয় কী ঘটিবে তবে। কণিকা	.	৭১৫
একলা ঘরে বসে আছি, কেউ নেই কাছে। ছবি ও গান	...	১৩৫
একাদশী রজনী। কড়ি ও কোমল, সংযোজন	..	২৮৩
একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়। নৈবেদ্য	...	৯৯৮
এখনো ভাঙে নি ভাঙে নি মেলা। ক্ষণিকা	..	৯৩৩
এতদিন পরে প্রভাতে এসেছ। ক্ষণিকা	...	৯২৫
এত বড়ো এ ধরণী মহাসিন্ধু-ঘেরা। কড়ি ও কোমল	..	২৩১
এত শীঘ্র ফুটিলি কেন রে। কড়ি ও কোমল	..	২১০
এবার চলিনু তবে। কল্পনা	.	৮২৩
এমন ক'দিন কাটে আর। সন্ধ্যাসংগীত	.	১৯
এমন দিনে তারে বলা যায়। মানসী	.	৪০৪
এসো গো নূতন জীবন। চিত্রা, সংযোজন	..	৬৪৩
এসো, ছেড়ে এসো সখী, কুসুমশয়ন। কড়ি ও কোমল	..	২৬১
এসো বসন্ত, এসো আজ তুমি। স্মরণ	..	১০২২
এসো সখি, এসো মোর কাছে। সন্ধ্যাসংগীত, সংযোজন	...	৪৫
ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে। কল্পনা	...	৭৯৬
ও আমার অভিমানী মেয়ে। ছবি ও গান	...	১৫২
ও কী সুরে গান গাস, হৃদয় আমার। সন্ধ্যাসংগীত	...	১৩
ওই আদরের নামে ডেকো সখা মোরে। কড়ি ও কোমল	..	২১২
ওই জানালার কাছে বসে আছে। ছবি ও গান	...	১২০
ওই তনুখানি তব আমি ভালোবাসি। কড়ি ও কোমল	...	২৫৫
ওই দেহ-পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে। কড়ি ও কোমল	...	২৫৫
ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া। প্রভাতসংগীত	...	৯২
ওই যে সৌন্দর্য লাগি পাগল ভুবন। মানসী	...	৩০৭
ওই শোনো গো অতিথ বুঝি আজ। ক্ষণিকা	...	৯১৪
ওই শোনো ভাই বিশু। মানসী	...	৩৯৫
ওগো এত প্রেম-আশা প্রাণের তিয়াষা। কড়ি ও কোমল	...	২৪৫
ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ। কল্পনা	...	৮২১
ওগো, কে তুমি বসিয়া উদাসমুরতি। মানসী	...	৩৯২
ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে। কড়ি ও কোমল	...	২৪৯
ওগো, তুমি অমনি সন্ধ্যার মতো হও। মানসী	...	৪২২
ওগো পসারিনী, দেখি আয়। কল্পনা	...	৮০৭

ছত্র। গ্রন্থ পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ | পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ পৃষ্ঠা

ছত্র। গ্রন্থ | পৃষ্ঠা